CALCUTTA CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

(ভারতবর্ষ)

সম্পাদক—শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

(পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৪)

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অতিথিসৎকারের ভোজবাজি (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ... ৪৫৩
অতীত দিনের স্মৃতির মনে পড়ে (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ১৪০
অভিনয় (নাটক)—শ্রীকানাই বসু ... ৫৩
অমরনাথের পথে (প্রবন্ধ)—শ্রীদুর্গা ...পাধ্যায় ১৩
অর্ধেক মানবী তুমি (কবিতা)—শ্রীমো... ... ১৩৮
অসবর্ণা (গল্প)—শ্রীদীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ১৯০
আপত্তি নাই (প্রবন্ধ)—শ্রীনিবাস ... ১৮৮
আশাবরী (কবিতা)—ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ ... ৩৩১
আশুগিরির অতীত (গল্প)—শ্রীমতী প্রাতিমা গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৮,৩৭১
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার বাণী (প্রবন্ধ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ১২৩
আজ (কবিতা)—শ্রীবীণা দেবী ... ৪৭১
আধুনিক শিক্ষা ও অনিয়ন্ত্রণী শিক্ষা (প্রবন্ধ)
শ্রীউমাপতি ঘটক ... ২৭৭
আধুনিক কৃষি ও চিকিৎসা বিভাট (প্রবন্ধ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ৪১১
আবিষ্কার (গল্প)—শ্রীসুবোধ বসু ... ২৯২
আমাদের গ্রামের পাখী (প্রবন্ধ)—শ্রীসুন্দরলাল মল্লিক ... ১৫১
একটা ভাঙ্গা টিন (প্রবন্ধ)—শ্রীমদনমোহন কুণ্ডু ... ১৮২
একদিন (গল্প)—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৯
একটি ছত্র (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ... ২৯১
একটি মজার যান্ত্রিক (প্রবন্ধ)—যাদুকর পি-সি সরকার ... ৩১৮
এরই নাম (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ... ৮৯
ও জাগে নব যুগ-সূর্য (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৫০
কংগ্রেস কর্মীরা কোনপথে (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ... ১৩৭
কথা ছিল বসিবার ছিল আয়োজন (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ... ৪১০
কবিতার অপমৃত্যু (গল্প)—শ্রীযোগিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৫০১
কমলার কাহিনী (গল্প)—শ্রীসন্তোষকুমার দে ... ৭০৯
কর্মযোগ (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ৩৫৭
কলিকাতার আশেপাশে বাদুড় সমস্যা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীরামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৩০
কলিকাতার মহারাজা গাকীর বাল্যি অভিযান (প্রবন্ধ)
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৩৭৯
কাঁসাইগড়ের পুরাকীর্তি (প্রবন্ধ)—শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯
খেয়াতরী—শ্রীকেদারনাথ রায় ৮৯,১৭৪,২৬৫,৩৫০,৪৩৭,৫৭১
গান (কবিতা)—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় ... ৭৭৮
গান ও স্বরলিপি—কথা ও সুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
স্বরলিপি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ... ৭৩৫
গান্ধীজী (কবিতা)—শ্রীপেলেমহম্মদ চট্টোপাধ্যায় ... ৪১২
গ্রামের জীবন্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীকুসুমরঞ্জন মল্লিক ... ১৯৮
গ্রামের লোকনৃত্য (প্রবন্ধ)—শ্রীসুন্দরলাল মল্লিক ... ১৫৮
চিত্রশিল্পে মহিলার দাবী (প্রবন্ধ)—শ্রীসুচিত্রা চক্রবর্ত্তী ... ১৭৩
চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিন্দু মুখোপাধ্যায় ২৯৮
জাতিপত্র ও জনকল্যাণ কংগ্রেস (প্রবন্ধ)
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৬৭
জাতিস্মর (গল্প)—শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ ... ৫৩৭
টুকরো কবিতা (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্র দে ১১,১৪১,২০৭,২৭৯
তোমার পতাকা যারে দাও, তাকে বহিবারে দাও শকতি (কবিতা)
শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৩৫৩
তপস্বিনী (কবিতা)—শ্রীসুন্দরলাল মল্লিক ... ৫৭৪
১৩৫৪ সাল (প্রবন্ধ)—শ্রীজ্যোতিষ বাচস্পতি ... ৭৬৯
দিগম্বর (গল্প)—শ্রীরামপদ চৌধুরী ... ৭১৪
দীক্ষা (কবিতা)—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ৮
দুনিয়ার অর্থনীতি (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীরামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৫,৩১৯,৪৮১
দেউলিয়া (কবিতা)—শ্রীশচীন দেবগুপ্ত ... ৬৭
দেবব্রত (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সুধার ৬১,১৩৮,৪৫৭
দেশীয় রাজ্য ও ব্যবস্থাপরিষদ (প্রবন্ধ)—শ্রীযোগানন্দচন্দ্র রায় ... ১৪৯
দেহ মনের গঠন ও উৎকর্ষ সাধন (প্রবন্ধ)
ডাঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৬৮১
দৌপদী (প্রবন্ধ)—শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৫৯৮
নব বঙ্গ ও তাহার সীমান্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ... ১২৩
নবদ্বীপের সমস্যা ও তাহার সম্ভাব্য সীমান্ত (প্রবন্ধ)
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ... ৩৯০
নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ... ৫১৭
নারী-পর্ব (প্রবন্ধ)—শ্রীমতিমোহন মজুমদার বাচস্পতি ১৯৩ ১৩৫
নিখিল মৌলিকগণ (প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার রায় ... ১২৩
নিশাশেষ (গল্প)—শ্রীবেলারেশচন্দ্র দাশ ... ৭৫৭
নীলাচল (কবিতা)—শ্রীনিত্য সরস্বতী ... ২৮৯
নৌকাযাত্রী ও নিমুদ্বার পুরুষসূক্তি (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ২১৫

নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)
ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৩
পর্ণশালেরী আশ্রম (প্রবন্ধ)—শ্রীসাধনা বিশ্বাস ... ২২৮
পথ (গল্প)—তাস্কর ... ২৮৩
পাকিস্থানে বাঙ্গালার স্থান (প্রবন্ধ)—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ... ৪৮৩
প্রয়োজন (গল্প)—শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী ... ৯২
প্রশ্ন (কবিতা)—শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ ... ৩৩৯
১৭ই আগষ্ট (১৯৪৭) (প্রবন্ধ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ২০০
১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ১৭৭
ফেলারামবাবুর চিঠি সমস্যা (গল্প)—শ্রীপ্রমাপদ চট্টোপাধ্যায় ১২১
বঙ্গ বিভাগ ও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সংরক্ষণ (প্রবন্ধ)
স্বামী সোমানন্দ ... ৩০৭
বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিম বাঙ্গলার আর্থিক ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫১
বঙ্গীয় সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশনের রায় কি অযৌক্তিক (প্রবন্ধ)
শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ... ৩২৮
বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র (কবিতা)—শ্রীষতীন্দ্রমোহন বাগচী ... ১
বহুরূপে (কবিতা)—বিষ্ণু সরস্বতী ... ৩৮৫
বাংলার মাছ ও মাছধরা (প্রবন্ধ)—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ... ১০১
বাঙ্গলার ভূমি ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ... ২০,২১৪
বালালীর শিক্ষা ও পরীক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ ... ২৭১
বাহির বিশ্ব (প্রবন্ধ)—শ্রীজয়ন্ত দত্ত ৫৯,৪১৭,৪৭৮
বীরভাসা (গল্প)—শ্রীসুধীরকুমার নন্দী ... ৩৪৬
বিপ্লবিনী (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ২১৬
বিপ্লবিণিয়া (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্র বর্মন ... ২৩১
বিচারের ঘণ্টা (কবিতা)—অধ্যাপক শ্রীনীলেশচন্দ্র সরকার ... ১১২
বিধবিনী বিদ্যুল্লতা (প্রবন্ধ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ১৪২
বিভূতা (গল্প)—শ্রীশান্তশীল দাশ ... ১৯৬
বিরহিণী (কবিতা)—শ্রীআশা দেবী ... ১২৮
বেচারা (গল্প)—শ্রীপ্রবোধ ঘোষ ... ৩৭
ভাগ্যনিয়া (গল্প)—শ্রীউমাশশী দেবী সরস্বতী ... ২২
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান (প্রবন্ধ)
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ২৩৭
ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ (প্রবন্ধ)—শ্রীত্রিবিক্রম পাঠক ৩১২
ভীমপল্লী (উপন্যাস)—সমকুল ৩১,১৩৭,২৪৫,৩২৪,৩৯০,৪৩৫
মধ্যযুগের লোক সংগীত (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ ... ১৯৮
মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত ... ২৩৬
মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ইরাণ (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্র দত্ত ... ৪৯৯
মহাত্মা গান্ধীর স্মরণে (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৪৯১
মহাত্মা গান্ধীর ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতি (প্রবন্ধ)
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৪৭৪
মূলধন ও আর্থিক উৎপাদন (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরুণ গুহ ... ১৩
মৃত্যুঞ্জীবন (গল্প)—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত ... ২৩
মৃত্যুর পারে (প্রবন্ধ)—রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায় ... ২৭
মেদিনীপুরের ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণ ... ১১৭
যাত্রীর তর্পণ (কবিতা)—ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ... ৪৭১
রবীন্দ্রসাহিত্যে অক্ষয় বাণী (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ১৬
রামমুকুন্দ লেপ (ভ্রমণ কাহিনী)
শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪১,১২২,২০২,৩[illegible],৩৭৪,৪৭৫
রাজপুর বন্দরনির্মাণ (প্রবন্ধ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ৩০
লাড়েই মহ ইন্দ্রগ্রস্থ (কবিতা)—শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ১১১
লিলি (গল্প)—শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪১২
শকুন্তলা (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ... ৪০৭
শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প (সমালোচনা)—শ্রীকালিদাস রায় ১১৯,২৮২,৬৮৪
শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট (প্রবন্ধ)
শ্রীউর্ম্মিলা দাশ ... ৪৫০
শহীদ সুধীরাম (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ২৭৪
শহিদ-স্মরণে (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ... ৪৪১
শিব রমণী—সলাকোর (প্রবন্ধ)—শ্রীমতী অমিয়া বসু ... ২৩৯
শিলালিপি (উপন্যাস)
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৫,১০৫,২০৮,৩০৩,৪০১,৪৫৬
শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (পরিচিতি) ... ১০৮
শিল্পী মুকুন্দ মজুমদার (পরিচিতি) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৩২২
শ্রীশ্রী মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী (প্রবন্ধ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন ... ২৬৫
শুধু কান্না (গল্প)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৭১
শুভপথে কলিকাতা—নাগপুর—বম্বে (ভ্রমণ কাহিনী)—বিহঙ্গ ৩৬৩
সংস্কৃতি রক্ষার উপায় (প্র[illegible])—শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ১২৫
সংস্কৃত শিক্ষার [illegible]
অধ্যাপ[illegible] ভট্টাচার্য ... ২৪৪
সহজ শিক্ষা (প্রব[illegible] (যোগাল ... ২৭৫
সাময়িকী ১৩,১৫৮,২৪৮,৩৩৭,৪৪১,৫০৫
সাহিত্য সংবাদ ৬৮,১৭৯,২৩৪,৩৫৪,৪২৪
সীমান্তে খীগ আন্দোলন (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৩৫
সেনবংশের প্রাচীন রাজধানী (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীহৃষিকেশ বেদান্তশাস্ত্রী ... ১
সেবাগ্রামে রমিয়ালী বিদ্যালয় (প্রবন্ধ)—শ্রীসমরেন্দ্র সরকার ৪৭৯
স্ত্রী সংকট (গল্প)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশী ... ১৮৪
স্বরাজ ও সংগঠন (প্রবন্ধ)—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়রত্ন ... ২১৫
স্বাধীনতা (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণাবতী দেবী ... ৪৮৮
স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা (প্রবন্ধ)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩,৪০৯
স্বাধীন ভারত (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৩৩৬
হৃষিকেশ নিকেশ (নক্সা)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪,১৭৯,৩৮১
হে মৌন মৃত্তিকা (গল্প)—শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য ... ৩৫৯

চিত্র-সূচী—আসানুক্রমিক

শ্রাবণ, ১৩৫৪—বহুবর্ণচিত্র—'শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত' ও এক রং চিত্র ৩১খানি
শ্রাবণ, " — " —'সুরের মোহ' ও এক রং চিত্র ৪৩ খানি
ভাদ্র, " — " —'ধুনর পাহাড়' এবং 'উৎকণ্ঠিতা' ও এক রং চিত্র ৩৩ খানি
আশ্বিন, " — " —'বরণডালা' ও এক রং চিত্র ২৬ খানি
কার্ত্তিক, " — " —'যুদ্ধের গৃহত্যাগ' ও এক রং চিত্র ৩০খানি
অগ্রহায়ণ, " — " —'মহাকাব্যে উপেক্ষিতা—উর্ম্মিলা' ও এক রং চিত্র ৫১ খানি

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

ভারতবর্ষ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আষাঢ়—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আষাঢ়ের অমারাত্রি। শিবাকণ্ঠে ঘোষিল প্রহর
স্থচিতে দ্বিতীয় যাম। দিনব্যাপী বর্ষণের পর
অধিক ক্লান্তিতে যেন বারিধর লভিল বিশ্রাম।
ঝিল্লীস্বনে শোনা যায় ভেকের নিরত-স্বরগ্রাম
আঁধারের রঙ্গমঞ্চে। মেঘভারে স্তম্ভিত আকাশ।
নক্ষত্রের নাহি দেখা। রুদ্ধপ্রায় বিশ্বের নিঃশ্বাস ;—
বহে কি না বহে বায়ু—মূর্ছার লক্ষণ যেন তায়!
মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্দীপ্ত তপোবনে আশ্রমের দ্বার
বন্ধ সব চারিধারে—যেন-বা তারাও যোগাসনে
রুধি' সব চিত্তবৃত্তি—ধ্যানমগ্ন এ নিশি-নির্জনে।
বশিষ্ঠ-কুটীরে শুধু একটী আলোক দেখা যায়
উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে, রশ্মি যার ফুটে না কুণ্ঠায়।

উঠিলা ব্রহ্মর্ষিবর সন্ধ্যাপূজা করি' সমাপন ;
রাত্রির বিশ্রাম লাগি', শ্রান্তদেহে ছাড়ি' দর্ভাসন
সম্ভাষিলা দিব্য কণ্ঠে—"অরুন্ধতি, কোথা অরুন্ধতি?

(পত্নীরই তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ার বলা বাহুল্য। তিনি
পার্শ্বে শয়ন ও ঘুমিয়েছেন উপবেশনান্তে

—অন্ধকার কোণে দেখা একাকিনী বসিয়া কেন সতী,
কুণ্ঠিত বিষণ্ণ মূর্তি? শোন' কথা, কহি পুনর্বার,
পুত্রশোক বক্ষে পুষি' কতদিন কাটাইবে আর
অনলে বহ্নির মতো?—সময়ে সকলই ধুয়ে যায়,
তোমারই এ চিত্তভার—সেই কি অনন্ত এ ধরায়?
—জানো তো নিয়তিবর্ষে! দেহধর্মে অংশের কর্মি'
কেন তবে অনুক্ষণ দুঃখ পাও পুনঃপুনঃ স্মরি'
গত শোচনার কথা?—বহু কার্য মানবজীবনে,
ঋষি-পত্নী তুমি শুভে, শান্ত হও, ধৈর্য ধরো মনে ;

—ঊর্ধ্বে ঐ দেখ চেয়ে দিগ্বিদিক্-ঘেরে অন্ধকার,—
মূলপ্রকৃতি মহামায়া মসী ছুড়ি' অধিকার তার,
আজিকার মুছিয়াছে ; তা বলিয়া ভাবিছ কি মনে
নব সূর্যোদয় আর হেরিবেনা পুনঃ এ ভবনে ;

—সবই যেথা ক্ষণস্থায়ী—বিচিত্র লীলা এ ধরিত্রীর,
সত্য-শুভ-সুন্দর সে ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অস্থির—
সকলই অনিত্য ভবে—সেই কথা ধ্রুব জানি' মনে
তাঁরই ধ্যানে আত্মজ্ঞান লাভ' কর কর্ত্তব্যসাধনে।"

শুনি' সে সান্ত্বনা-বাণী সতী-চক্ষে দ্বিগুণিত ধারা
বহিল নয়ন-পথে, নদী যেন সেতুবন্ধহারা!
—"একসঙ্গে শতপুত্রে একে-একে গেল যে আমার!
মোর মতো অভাগিনী এ জগতে কে-বা আছে আর?
কও, প্রভু"——

রুদ্ধকণ্ঠে আর বুঝি ফুটিলনা স্বর,—
শুনরি' উঠিল যেন ভয় বক্ষে বিদীর্ণ পঞ্জর!
—সেই ক্ষণে পর্ণপোরও আর্ত্ত বক্ষ গেল যেন ফাটি',—
ভীষণ বজ্রের শব্দে দিগ্বিদিক, নদী, গিরি, মাটি'—
কাঁপিল নিখিল পৃথ্বী বিদ্যুতে ধাঁধিয়া চরাচর!
মহাবীর বিশ্বামিত্র,—সেই শব্দে তাঁহারও অন্তর
উঠিল কাঁপিয়া—দেখা, লুকাইয়া পর্ণাঙ্কের নীচে
উদ্যুক্ত কৃপাণ-হস্তে মুহূর্ত্তের সুযোগ যাচিছে
চিরশত্রু বশিষ্ঠের হত্যাপণে চিত্ত করি' স্থির;
—মহাতপা বিশ্বামিত্র, মহারাজা যে-বা পৃথিবীর।

কহিল বশিষ্ঠ-ঋষি পত্নীশিরে স্নেহ-হস্ত রাখি',
'অধিকন্তু তুমি সতী, এ জগতে তুমিই একাকী
সহিছ এ অকল্পিত বহুপুত্র-বিয়োগের ব্যথা;—
ভেবে দেখ, ক্ষণকাল, তোমারই সম্মুখে পতিব্রতা,
আমিও যে অংশভাগী! এ জগতে সর্ব্বহারা যে-বা,
নারায়ণ,—সে জনও যে নিত্য করে নিয়তির সেবা।
তোমার অজ্ঞাত নয়—এ বিশ্বের দুঃখ-ইতিহাস;—
বিধাতা—জানো তুমি শাস্ত্রপাঠে, তিনিও যে দাস,
আপন নিয়মবদ্ধ বিধিনিষেধের চক্রতলে,
কর্ম্মাকর্ম্ম দুঃখ-সুখ-রহস্যের দুর্ব্বোধ্য শৃঙ্খলে।"

উত্তরিলা অরুন্ধতী, স্বামীপদে রাখিয়া নয়ন,
"কিন্তু কেন তুমি প্রভু, হেন শক্র করিলে সৃজন?
সমর ভারত যাঁরে শ্রেষ্ঠ মানে সতত প্রদ্ধায়,
অস্বীকার করি' সেই তপস্বীর ব্রহ্মর্ষি-আখ্যায়
করনি কি অপমান যাঁহার সভামধ্যস্থানে?
সে দুঃসহ অপমান বহ্নিসম শঙ্কিতা আগে প্রাণে!"

"সত্য, সত্য, অরুন্ধতি, যাহা তব সত্য অনুমানি;—
ভক্তির না হোক্, তাঁর শক্তির তপস্যা-তেজ জানি।
তাই তো বন্ধুরে বরি' রাজর্ষির যোগ্য প্রতিষ্ঠায়
বঞ্চিত করেছি তাঁরে আর্য্যাবর্ত্তে তপস্বী-সভায়;—
তথাপি ব্রহ্মর্ষি বলি' সম্মানিতে পারিনি যে তাঁরে,
সেই অভিমানে বুঝি অমিষ্ট সাধিছে বারে বারে।"

উৎকর্ণ আগ্রহভরে বিশ্বামিত্র শুনিলেন কাণে
উভয়ের বাক্যালাপ বাতায়নমাত্র ব্যবধানে,
অন্ধকার অন্তরালে।

শঙ্কর সে উগ্র তপোবল
শুনিয়া স্বামীর কণ্ঠে, তাঁরই লাগি' আতঙ্কবিহ্বল
কহিলেন পতিপ্রাণা—

"তবু কেন করনা স্বীকার
ব্রহ্মর্ষি মানিতে তাঁরে? শতপুত্র-নিধন আমার—
সেও এই কর্ম্মফলে। হায়, প্রভু, নিখুঁত দেবতা,
সংসার মাগে যে চিত্তে,—কহ এর রহস্য-বারতা,—
একান্ত অধীরা আমি"—

দুটি চক্ষে ভরি' গেল বারি।
কহিলেন ঋষিবর সে বেদনা সহিতে না পারি',
"শোন' তবে অরুন্ধতী, বুদ্ধিমতী তুমি, আমি জানি;—
নহে মোর অহঙ্কার,—এ আমার অন্তরের বাণী—
—বিশ্বামিত্র ক্ষিত্র মোর; কে যে শত্রু,—বুঝিনাক তাই,
সত্বগুণে বঞ্চিত সে, তাই বুঝি ঈর্ষা তোলে নাই!
তবু তার তপস্যার গুণমুগ্ধ—আমি তারে বড় ভালবাসি;
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ তারে দেখিবারে তাই তো প্রয়াসী।
যে রাজসি শক্তি তার পূর্ণতার প্রতিবন্ধকারী,
তারই প্রতীকার তরে ব্রহ্মর্ষি বলিনি আজও আমি।

অদূরে বিপুল শব্দে কি যেন পড়িল ভূমিতলে;—
চমকি' উঠিলা দোঁহে সহসা বিস্ময়ে-কৌতূহলে।
মুহূর্ত্তে করিয়া চূর্ণ দুর্ব্বল সে উটজের দ্বার
উন্মাদের মতো যে-বা প্রবেশিল,—যোদ্ধবেশ তার,—
দস্যু বা তস্কর নয়, চকিতে চিনিল দোঁহে চোখে;—
—মহারাজ বিশ্বামিত্র! কুটিরের দ্বার দীপালোকে।
বিদ্যুৎ-চমকভরে মুহূর্ত্ত না দিয়া অবসর
বশিষ্ঠের পদতলে মুক্ত অসি রাখিল সত্বর

কহিলেন আগন্তুক,—"যে কথা বলিনু আজ রাণে,
ধর্ম জানে, কোনও ইচ্ছা নাই আর এ সাহিত প্রাণে
রহিতে পাপের ভার। প্রভু মোর, এই অসি লহ,
নিজ হস্তে হানো মোরে—এ জীবন বহেছে অসহ!
প্রভু মোর, বন্ধু মোর, এত দয়া তোমার অন্তরে
মহাশত্রু 'পরে তব!—নতুবা এ অভিশপ্ত করে
দাসিব এ ঘৃণ্য প্রাণ, শেষ পাপ সমাধির লাগি'!
—অরুন্ধতি, মাতা মোর, পুত্রহারা হায় রে অভাগি!
—আর নয় গুরুদেব; অসহ্য এ জীবন-যন্ত্রণা
দূর কর এ মুহূর্তে,—দুষ্টজনের এ শেষ প্রার্থনা।"

কহিলা বশিষ্ঠ-ঋষি বিশ্বামিত্রে দিয়া আলিঙ্গন,
বন্ধুবর, আজি তুমি রাহুমুক্ত সূর্যের মতন
ব্রহ্ম-ঋষি একমনে, তপস্যার বিশ্বে তুমি রাজা।
একান্ত প্রার্থনা যদি,—এই তব দিনু
যোগ্য সাজা!
প্রিয়তম, আজি তুমি অনুতাপ-দহনে নির্মল,
সত্ত্বগুণে বিভূষিত নবধর্মে উদার উজ্জ্বল।

আষাঢ়ের অমারাত্রি পুনরায় ঘনতর মেঘে
ঘনাইল চারিধারে। বর্ষাসাথে বায়ু
বহে বেগে।
উর্ধ্বে বেদাম্বিনে বসি' তপস্বী মহেন্দ্র গোতমের
ধারা-উপবাহগারী বৃষ্টিমন্ত্রে হইল মুখর।
বিদ্যুতের তীব্র আঁখি ঘন-ঘন দৃষ্টি মেলি' তার
মর্ত্যলোকে দেখে চাহি' মুক্তবৃষ্টি সত্য-সাধনার।

নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা

ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি

আজ আমরা বিশু দাবি করিয়াছে—বাঙ্গালার নিরাপত্তা, শান্তি, কল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিসাধনের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ চাই। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালার যে-সকল অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাদের লইয়া এই নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে। ইহার সীমা কি হইবে এবং কোন্ কোন্ অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, এসম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অনেক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন প্রদেশের আয়তন ৭৭,৪০০ বর্গ মাইল। মোট লোকসংখ্যা ৩০,৩০৩,৪১৮ জন। ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১০৩,০০০,৪৪৬ (শতকরা ৪৩ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সকলই হিন্দু) ২৭,৩০১,০৭১ (শতকরা ৫৭ জন)।

মুসলমানেরা দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত নহেন—পৃথক জাতি। সুতরাং বাঙ্গালার যে অংশে এইরূপ অমোসলমান লোকের সংখ্যাই বেশী, সেই অংশ হইতে হিন্দু-প্রধান অংশের বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। স্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্য ইহাই। বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী হিন্দু-প্রধান অংশ বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেই একটি প্রদেশ ও তাহার অংশ হইবে।

বাঙ্গালাকে প্রদেশ বিভাগের কোন পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে হইলে, এজন্য আমাদের কতকগুলি মূলনীতি মানিয়া লইতে হইবে।

(ক) বিভাগের ভিত্তি:—শাসনবিভাগের যে-কোন পরিমান ইউনিট, যেমন বিভাগ, মহকুমা বা থানাকে ভিত্তি করিয়া পার্টিশন করিতে হইবে।

(খ) ভৌগোলিক ঐক্য:—নবগঠিত প্রদেশ ভৌগলিক হিসাবে এক ও অখণ্ড হওয়া আবশ্যক, কারণ খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেশের শাসনকার্য পরিচালনা ও উহার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা অসুবিধাজনক।

(গ) সামাজিক, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐক্যসম্বন্ধে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পার্টিশন করা উচিত। অধিকন্তু এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা পার্শ্বস্থ পরিবারে সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক; কারণ অন্যথায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য প্রতিযোগিতাতে অপব্যয়িত হইবে এবং সাম্প্রদায়িকতামূলক কোন কার্যই সম্ভবপর হইবে না।

(ঘ) অল্পসংখ্যকদের প্রতি যত কম হয় ততো ভালো; কারণ বিরাট আকারে অদলবদলের কোন দেশেই সফল হয় নাই।

(ঙ) সীমান্তের অনিশ্চিত কোন স্থানে শত্রুভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থান বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক সীমার তথাকথিত সুবিধার দোহে মুসলিম-অধ্যুষিত পার্বত্য দেশাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-প্রধান অঞ্চল যাহা আসো সুরক্ষিত নয়, এবং এইরূপ স্থানগুলিকে ই সকল দেশ হইতে বাদ দেওয়াই সুবিধাজনক। তবে অন্তর্ভুক্ত হিন্দু সকল

দ্বারা পার্শ্ববর্তী মুসলিম-প্রধান অঞ্চল হিন্দু ভূমির মধ্যে আনিতে দাবা হইবে।

(৫) বাঙ্গালা দেশের মোট ভূমি (৮৬,৪১১ বর্গ মাইল) হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থানুযায়ী অথবা দ্বারা সম্পত্তির অনুপাত অনুপাতে বিভক্ত হওয়াই আবশ্যক। যাবতীয় দেশের অধিকাংশ জমিরই মালিক হিন্দু; সুতরাং সেই হিসাবে হিন্দুরই বেশী জমি পাওয়া উচিত। জনসংখ্যার দিক হইতে হিন্দু পড়তা ১১ জন, অতএব জমির দাবীও এইভাবেও হইতে পারে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুর পাওয়া উচিত ৩২,০০০ বর্গমাইল জমি।

(৬) হস্তান্তরী বিভাগের পরে সীমা নির্দ্ধারণ কমিটির দ্বারা উভয়-প্রদেশের সীমা স্থির করা হইবে।

বঙ্গ বিভাগে বিশেষ অসুবিধা হইবে না, কারণ এই প্রদেশের পশ্চিমাংশে হিন্দু এবং পূর্ব্বাংশে মুসলমানরা অধিকাংশ বাস করে। তাহার উপর হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্থানের বাকি অংশের সহিত সংযুক্ত, সুতরাং ইহাও বিশেষ সুবিধা।

পার্টিশনের ভিত্তি কি হইবে? বর্ত্তমান বিভাগ, জেলা বা থানাকে ভিত্তি করিয়া যেভাবে পার্টিশন করা যাইতে পারে। আমরা যদি বিভাগকে (ডিভিসন) ভিত্তি ধরি, তাহা হইলে মুসলিম-প্রধান রাজসাহী জেলা হইতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দাবি করিতে পারি না। থানাকে জেলাকে যদি ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ দুইটি জেলা পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলা বাদ পড়িবে, কারণ এইগুলিতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, একমাত্র যদি থানাগুলিকে পার্টিশনের ভিত্তি করা যায়। কয়েকটি জেলা মুসলিম-প্রধান হইলেও, ইহাদের অন্তর্গত কতক অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই সকল অঞ্চল পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুপ্রধান অংশের নিকট থাকায় সহজেই হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সুতরাং মুসলিম-প্রধান থানাগুলিকে বাদ দিয়া এবং হিন্দুপ্রধান থানা সকল লইয়া এইরূপ জেলাগুলি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। নবগঠিত জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু-প্রধান জেলাসমূহ এবং পুনর্গঠিত জেলাগুলির সমন্বয়ে যে হিন্দুপ্রদেশ গঠিত হইবে তাহা হইবে এক বিরাট প্রদেশ। এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রদেশে বাঙ্গালা দেশের পড়তা ৭০ জন হিন্দু থাকিবে। থানা-হিসাবে বিভাগ পরিকল্পনাও প্রকৃতপক্ষে জেলা অনুসারে বিভাগ; পার্থক্য শুধু এই যে ইহাতে কেবলমাত্র বর্ত্তমান হিন্দু-প্রধান জেলা-গুলিকেই ধরা হয় নাই, সেই সঙ্গে অন্য কতকগুলি জেলাকে পুনর্গঠিত করিয়া হিন্দু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

থানাকে যদি পার্টিশনের ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান বিভাগ এবং কলিকাতা সহর, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা যোগ হইবেই, তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে মুসলিম-প্রধান আরও কয়েকটি জেলাও পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান বিভাগগুলি, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, মালদহ এবং বাঙ্গালার জেলা যেভাবে গঠিত তাহাতে সেখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এইজন্য বিভাগ-খোপলাচারী এইগুলিকে মুসলিম বঙ্গে ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই জেলাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এমন অঞ্চল আছে যেখানে হিন্দু সংখ্যায় অধিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার মধ্যে পশ্চিমাংশে হিন্দু-বেশী, আর পূর্ব্ব দিকে বেশী মুসলমান; ঠিক যেমন পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা। সুতরাং প্রদেশ বিভাগের পূর্ব্বে এইরূপ জেলাগুলিকেও বিভক্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমান জেলাগুলির গঠন ঘোষের জন্য হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা কেন অসুবিধা ভোগ করিবে? এইরূপ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকেও যদি পাকিস্থানে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবিচার করা হইবে। জেলাগুলির সীমা কৃত্রিম এবং অতীতে সহজই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ জেলাসমূহ হিন্দুপ্রধান থানাগুলি যাহাতে হিন্দু রাষ্ট্রে যোগদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মুসলমান অঞ্চলের পার্শ্ববর্ত্তী জেলার মুসলিম-প্রধান থানাগুলি অনায়াসে পাকিস্থানে যাইতে পারিবে। এই সকল জেলার হিন্দু-প্রধান থানাগুলির হিন্দু অধিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের যুক্তিবলে এই ন্যায়সঙ্গত দাবি নিশ্চয়ই করিতে পারে। জেলার সীমা-পরিবর্ত্তনের জন্য বড়লাট বা পার্লামেন্টের নিকট দরবার করিবার প্রয়োজন হইবে না। প্রাদেশিক সরকারই ইচ্ছা করিলে ইহা করিতে পারেন। নিয়ম-তান্ত্রিক কোন অসুবিধা ইহাতে নাই।

লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে বাঙ্গলার নিম্নলিখিত স্থানগুলি হিন্দু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে :—

বর্দ্ধমান বিভাগ (সম্পূর্ণ)।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে সমগ্র কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা; এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলি।

রাজসাহী বিভাগের মধ্যে :—সমগ্র দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এবং ইহা ছাড়া দিনাজপুর ও মালদহ জেলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলি।

ঢাকা বিভাগের মধ্যে :—ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চল।

উপরে লিখিত জেলাগুলিকে একত্রিত করিয়া যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে, তাহা এক অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন দেশ হইবে। ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলের পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

নূতন বঙ্গ হইবে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রদেশ। ইহার উত্তরে থাকিবে হিমালয় ও ভূটান; পূর্ব্বে আসাম ও মুসলিম বঙ্গ। পশ্চিমে বেহার, উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা। এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

এই নূতন প্রদেশের সীমানা হইবে ৩৯,৩১০ বর্গ মাইল। মোট লোক সংখ্যা আড়াই কোটি; ইহার মধ্যে মাত্র ৭৯ লাখ মুসলমান (শতকরা ১৮ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সকলেই হিন্দু) এক কোটি চুয়াশি লক্ষ (শতকরা ৮২ জন)।

এই সংখ্যায় গবেষণার যে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মুসলিমপ্রধান এলেকাটিকে কালো করিয়া (shaded) দেখানো হইয়াছে। রেখার মধ্যে যে সংখ্যা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে খোলা (unboxed) সংখ্যাটি বর্তমানে ঐ জেলার হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত বুঝাইবে, এবং ঐ জেলাটিকে পুরপটির করিবার পর হিন্দুর জনসংখ্যার যে অনুপাত হইবে তাহা নির্দেশ করিতে চতুষ্কোণের মধ্যে প্রদত্ত (boxed) সংখ্যা। যথা, উপস্থিত অশোহর জেলায় হিন্দু শতকরা মাত্র ৩৩ জন, কিন্তু অশোহরের হিন্দু-প্রধান থানাগুলিকে যদি পৃথক করিয়া লওয়া যায়, সেই অংশে হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত হইবে প্রতি শতে ৫৪ জন।

থানা ভিত্তি করিয়া বিভাগের অসুবিধা এই যে, থানাগুলির সীমা অধিকাংশক্ষেত্রেই মনগড়া; সুতরাং ইহাদের সংযোগে যে প্রদেশ গঠিত হইবে তাহার সীমাও যে খুব সুবিধাজনক হইবে না তাহা ঠিক। তবু পার্টিশন তাড়াতাড়ি করিতে হইলে এই পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কয় জেলার সামান্যতম সীমা যুক্ত একখানি মানচিত্র এবং লোকগণনার কার্য বিবরণী (সেন্সস্ রিপোর্ট ১৯৩১) সম্মুখে থাকিলেই ইহা করা যাইবে। পরে সীমা নির্ধারণ কমিটি উপযুক্ত সীমার ব্যবস্থা করিবেন।

বর্তমান মিদনাপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, অশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত হিন্দু-প্রধান অঞ্চল লইয়া নূতন জেলা গড়িতে হইবে। এইরূপ করা হইলে তিন লক্ষের বেশী হিন্দু নূতন হিন্দু প্রদেশে আসিতে পারিবে। এইবার এই জেলাগুলিকে কিরূপে পার্টিশন করা সুবিধাজনক, তাহা আলোচনা করিব।

মিদনাপুর জেলা—মিদনাপুর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বেশী (৫০·৫%), যদিও তিনটির মধ্যে দুটি মহকুমায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই জেলার পূর্বাংশে হাজুর সীমান্তে মুসলমানের বাস খুব বেশী। এই সামান্য স্থান বাদে মিদনাপুর জেলায় বাকি সব অংশে হিন্দু সংখ্যায় অধিক। কিন্তু তথাপি সারা জেলার জনসংখ্যা ধরিলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া যায়। এই ক্ষুদ্র অংশের মুসলমানদের বাদিলে এই সমস্যায় মিদনাপুরের হিন্দুর সংখ্যাকে ছাপাইয়া যায়। তবু এই কারণে মিদনাপুর জেলা মুসলিম হয়ে যাইবে, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নয়। সদর মহকুমার মুসলিম-প্রধান তিনটি থানা, পাঁশকুড়া, নন্দকুমার ও খেজুরী থানা বাদ দিতে হইবে। এইগুলি মুসলিম রাজ্যভুক্ত হইতে পারে।

পরিবর্তিত মিদনাপুর জেলার অন্য নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি পড়িবে—ঝাড়গ্রাম ও তমলুক মহকুমা (সম্পূর্ণ)। সদর মহকুমার মিদনাপুর, বিনপুর, ঘাটাল, দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী ও খড়্গপুর থানা। নূতন মিদনাপুরের আয়তন হইবে ৩,৫১৮ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ১৭ লক্ষ। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৫৩ জন হিন্দু। যদি স্বাভাবিক সীমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পরে তমলুক মহকুমাকে পূর্ব সীমা ধরা চলিতে পারে।

মালদহ জেলা—মালদহ জেলা পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজশাহীর অংশ লইয়া গড়া হয়; এবং ইহা ১৯১১ পর্যন্ত বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দু অমর প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ভগ্নাবশেষ এই জেলায়। মালদহের উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে হিন্দুর ঘন বসতি। মুসলমান থানাগুলির অবস্থান এমন যে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। ইহাদের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজল এবং হবিবপুর থানার চারিদিকে হিন্দু অঞ্চল; সুতরাং ইহাদের হিন্দু অংশ থানা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মালদহ ছাড়িয়াছে এই কয়টি থানা—গোমস্তাপুর, কানিয়াচক, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ। এই থানাগুলি ঠিক মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর মুখে রাজার পথে অবস্থিত; গোমস্তাপুরনবাবগঞ্জ বাদ দিলেও বাকি চারটি থানা পাওয়াই চাই। ইহাদের মুসলিম জনসংখ্যা কেবলমাত্র আড়াই লক্ষ। মুসলিম-প্রধান থানাগুলির মধ্যে গোমস্তাপুর ও চাপাইনবাবগঞ্জ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র চাপাই নবাবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর থানা বাদ দিয়া নূতন মালদহ গঠন করিলে তাহাতেও মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বেশী থাকিবে। মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যা ৬৮১,৫৩৯ (শতকরা ৫৭ জন) হইবে। হিন্দু হিন্দু অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফলে কোমস্তাপুর, কানিয়াচক ও শিবগঞ্জ থানা দুটি মালদহের অন্তর্ভুক্ত করায় এই জেলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্য হইতেছে। এই তিনটি থানার আড়াই লক্ষ মুসলমানকে রাজ্যের পক্ষের সুযোগ দিলে মালদহ জেলায় হিন্দুর অনুপাত বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ৫০ জন হইবে।

গোমস্তাপুরঘাট ও তাহার সন্নিকটস্থ রেল লাইন যাহা এখন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বন্ধ হইতে মালদহ জেলায় যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। সুতরাং এই রেলপথ নূতন মালদহের পূর্ব সীমা হওয়া উচিত নয়; কারণ উহার ফলে যে রেল লাইন বিহারে যাইবে তাহা মুসলিম রাজ্যের ভিতর দিয়া পড়িবে; সুতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

মুর্শিদাবাদ জেলা—মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা ও ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরের অল্পপরিসর স্থানে হিন্দুর বাস বেশী। মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর মুখে যাইবার পথে পড়ে জঙ্গীপুর মহকুমা। এই মহকুমার মধ্যে সাগরদীঘি থানা বাদে সকল স্থানেই মুসলমানেরা সংখ্যাধিক্য লক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের মধ্যে পথ টুকুন রাখিবার জন্য এই অঞ্চলের ২ লক্ষ মুসলমানদের স্থানত্যাগের সুযোগ দিতে হইবে।

অবশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার রহিবে:—কান্দি মহকুমা (সম্পূর্ণ) সদর মহকুমা জঙ্গীপুর মহকুমা (মালদহের পথে অবস্থিত মুসলিম থানাগুলি বাদে), লালবাগ মহকুমার বরগ্রাম ও জিয়াগঞ্জ থানা এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত বহরমপুর সহর ও বেলডাঙ্গা থানা। বেলডাঙ্গা সামান্য মুসলিম-প্রধান হইলেও নদীয়া হইতে মুর্শিদাবাদের পথে পড়ে।

এই নূতন জেলার জনসংখ্যা হইবে ১৩ লক্ষ; তাহার মধ্যে হিন্দু ৭ লক্ষ (শতকরা ৫২ জন)। যদি জঙ্গীপুর মহকুমার মুসলিম অঞ্চলের ২৩৮, ৩৬৮ জন মুসলমান স্থানান্তরে [illegible], তাহা হইলে

এই জেলার মুসলমান সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে এবং হিন্দু ১ইবে শতকরা ৪২ জন।

নদীয়ার পূর্ব সীমার জন্য বর্তমানে গঙ্গানদী হইতে লালগোলাঘাট পর্যন্ত রেলপথটি কাজে আসিতে পারে। সীমা নির্ধারণ করিতে যদি কিছু কম হয় তখন ভৈরব নদকে পূর্ব সীমা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলে বোধহয় সুবিধা হইবে।

নদীয়া জেলা—নদীয়াজেলার মধ্যে আছে বাঙ্গালার ধাত্রীপট্টী নবদ্বীপ। মায়াপুরের উত্তর ইতিমধ্যে কালেই হিন্দুর বাস বেশী। নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মহকুমার মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য। সুতরাং এই জেলার হিন্দু অঞ্চলকে সহজেই মুসলিম অঞ্চল হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মধ্যে জেলাসীমার কৃষ্ণগঞ্জ থানা হিন্দু প্রধান। মুসলিম-প্রধান অংশ যাহা কিছু নূতন নদীয়া জেলার থাকিবে—সদর বা কৃষ্ণনগর এবং বাগোয়াটি মহকুমা (সদর); এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ থানা। মোট জনসংখ্যা হইবে ৬১৬, ৪৮২; উহার মধ্যে ৩৯৮, ২০৭ (অর্থাৎ শতকরা ৫৯ জন) হিন্দু।

যশোহর জেলা—যশোহর জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক; অধিকন্তু ইহার কোন মহকুমাই হিন্দুপ্রধান নয়। থানাগুলির মধ্যে ঝিনাইদহ, মহম্মদপুর ও নালিয়া হিন্দু প্রধান। নালিয়া থানা মুসলিম অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত; সুতরাং ইহাকে হিন্দু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব। বাকি তিনটি থানাকে খুলনা জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিবে। যশোহর জেলার সীমা পূর্বে বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। একবারে ইছামতী পর্যন্ত যশোহরের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান যশোহর সহরের সহিত বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর বর্তমানে খুলনা জেলার অন্তর্গত।

যশোহরের হিন্দু-প্রধান অংশে পড়িবে নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত নড়াইল ও কালিয়া থানা এবং সদর মহকুমার অভয়নগর থানা। আয়তন ৩৯১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০৪, ২০০; ইহার মধ্যে ১১৪, ০৮৭ (শতকরা ৪৪) জন হিন্দু। এইরূপ ক্ষুদ্র স্থান লইয়া জেলা গঠন হওয়া অসম্ভব হইবে। কিন্তু যশোহরের এই অঞ্চলের সহিত খুলনা জেলার ভৈরব নদের পূর্বে অবস্থিত অংশ যোগ করিয়া একটি নূতন যশোহর জেলা গঠন করা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া আমি মনে করি। ভৈরব এবং মধুমতী নদীর মধ্যবর্তী স্থান লইয়া এই নূতন জেলা গঠিত হইতে পারে।

ফরিদপুর জেলা—ফরিদপুর জেলা মুসলিম-প্রধান হইলেও উহার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে হিন্দু সংখ্যাধিক্য। গোপালগঞ্জ মহকুমায় কয়েকঘর সদ্গোপের বাস। এই গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং উহার সহিত সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান রাজইর থানা লইয়াই একটি নূতন জেলা অনায়াসে গঠিত হইতে পারে; এবং উহার নাম গোপালগঞ্জ জেলা দেওয়া যায়। মোট লোকসংখ্যা ১৪১, ১৮০; ইহার মধ্যে ৪১৩, ২১৯ (শতকরা ৫১ জন) হিন্দু। প্রয়োজন হইলে বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী থানা এই নূতন জেলার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

বাখরগঞ্জ জেলা—বাখরগঞ্জে মুসলিম সংখ্যাধিক্য থাকিলেও, উহার উত্তর-পশ্চিম অংশ হিন্দু-প্রধান। এই অংশ গোপালগঞ্জ মহকুমা ও খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন থাকায়, হিন্দু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। হিন্দুপ্রধান থানাগুলির মধ্যে বাজিতপুর, ঝালকাটি, কাঁঠালিয়া এবং বরিশাল পরস্পর-সংলগ্ন। গৌরনদী থানা এই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু গোপালগঞ্জ মহকুমার সহিত সংলগ্ন।

বাখরগঞ্জ জেলার নিম্নলিখিত থানাগুলি হিন্দু বলে আসিবে:—(ক) সদর মহকুমার অন্তর্গত গৌরনদী, ঝালকাটি ও বরিশাল থানা (বরিশাল সহর ইহার মধ্যে পড়িবে); (খ) পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুর ও স্বরূপকাটি থানা। এই অংশের মোট জনসংখ্যা ১৮৩, ৮৩৪; ইহার মধ্যে ৪৪৪, ২৮৭ (শতকরা ৫৭) জন হিন্দু। গৌরনদী থানা যদি গোপালগঞ্জের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঝালকাটি, বরিশাল, বাজিতপুর ও স্বরূপকাটি এই চারিটি থানার মোট জনসংখ্যা হইবে ৫১২, ৫৯১; উহার মধ্যে ৩২৩, ৪১০ জন হিন্দু। এই অংশ লইয়া একটি পৃথক জেলা গঠন সম্ভব হইবে না; সুতরাং ইহাকে বর্তমান খুলনা জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিতে পারে।

নূতন বরিশাল জেলার প্রাকৃতিক সীমার ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। মুসলিম-প্রধান উজিরপুর ও বানরিপাড়া থানা এবং পিরোজপুর ও বামুণ্ডা থানার কিয়দংশ যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই অংশ নদী বেষ্টিত ও অধিকতর সুরক্ষিত হইবে। ইহার সীমানা হইবে:—পূর্বে আড়িয়াল খাঁ, কাপুর ও ঘাঘরনদখালী নদী; পশ্চিমে—হিন্দু অঞ্চলের খুলনা জেলা; উত্তরে—হিন্দু অঞ্চলের গোপালগঞ্জ; পূর্বে—ঝালকাটি নদী, গাবখান খাল ও পুরাতন ধানোবর নদী।

উপরে যে জেলাগুলির সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তনের যে অনুপাত হইবে, তাহা নিম্নে পাশাপাশি প্রদর্শিত হইল।

	বর্তমানে হিন্দুর শতকরা অনুপাত	পরিবর্তিত জেলায় হিন্দুর শতকরা অনুপাত
দিনাজপুর	৪৮·৫	৫৩
মালদহ	৪৩	৪৭
মুর্শিদাবাদ	৪৪	৫১
নদীয়া	৩৯	৪৪
যশোহর	৪৭	৫৪
ফরিদপুর	৩৬	৪১
বাখরগঞ্জ	২৩	৪৭

উপরে লিখিত জেলাগুলির হিন্দু অধিবাসীগণের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানান। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, গোপালগঞ্জ ও বরিশালের হিন্দুরা বিশেষ ভাবিলে অতিশয় হইবেন।

বর্তমানে বিভাগের সকল জেলাই হিন্দু প্রধান। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, খুলনা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলারও কোনো অদল বদলের আবশ্যকতা নাই।

	হিন্দুর শতকরা অনুপাত	মুসলমানের শতকরা অনুপাত
বর্দ্ধমান বিভাগ	৮৩	১৬
কলিকাতা সহর	৭৯	২১
২৪ পরগণা	৬৬	৩৪
খুলনা জেলা	৪০·৩	৪৯·৯
দার্জিলিং জেলা	৮৭	৩
জলপাইগুড়ি জেলা	৭৭	২৩

ঢাকা বিভাগের রাজ্য—ঢাকা বিভাগ হিন্দু রাজ্য এবং ইহা হিন্দু অঞ্চলের সহিত সহযোগিতা করিবে। ইহার আয়তন ১৩১৮ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩৪০,৩৪২; ইহার মধ্যে ৪০১,৪৯৪ (শতকরা ৪০) জন হিন্দু এবং কেবলমাত্র ২৪২,৩৪৮ জন মুসলমান।

ঢাকা সহর—ঢাকা সহরের মোট জন সংখ্যা ২১০,২১৮ জনের মধ্যে ১৩০,৪২৫ জন হিন্দু এবং মুসলমানরা সংখ্যায় মাত্র শতকরা ৩৯ জন। হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ঢাকা সহর হিন্দু অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়া উচিত। অনেকে আপত্তি করিবেন যে, এইরূপ বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী সহর কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে? তাঁহাদের আপত্তির উত্তর—কলিকাতা চন্দননগরের উদাহরণ। ভাগীরথী তীরবর্তী এই ক্ষুদ্র সহরটি দূরস্থ পণ্ডিচেরী হইতে শাসিত হয়। ইহাতে কখন অসুবিধা হয় না, তখন ফুলীয়া তীরে অবস্থিত ঢাকা বন্দর নূতন বাঙ্গালার অধীনে থাকার পক্ষে কোন অসুবিধাই হইতে পারে না। কলোপসাগর হইতে নদীপথে ঢাকা বন্দরে যাওয়া যায়। মুসলিম অঞ্চলের নিকট বন্দর অবস্থিত চট্টগ্রাম; সুতরাং হিন্দু-প্রধান ঢাকা সহর উহারা কোন কারণেই দাবি করিতে পারে না। হিন্দু অঞ্চলের অধীনে ঢাকা সহর স্বায়ত্তশাসনাধীন পৌরসভা (autonomous) সহর হইবে।

হিন্দু অঞ্চলের আয়তন হইবে ৩৯,৯১০ বর্গ মাইল। মোট জনসংখ্যা ২৫,৮৪৪,১৪৯ জন; তন্মধ্যে মুসলমান ৭,৩৩৯,০১১ (শতকরা ২৮) জন এবং অমুসলমানের (প্রায় সবই হিন্দু) সংখ্যা ১৮,৫৩৫,৯০২ (শতকরা ৭২) জন। ইহার সহিত ঢাকা সহর যুক্ত হইলে মোট জন সংখ্যা হইবে ২৬,০১৮,১৬৭; উহার মধ্যে ১৮,৫১৬,৪২৭ জন হিন্দু।

অঞ্চলের বাহিরে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল

বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি ও সিংভূম জেলার কিয়দংশের অধিবাসীগণ বঙ্গভাষাভাষী। তাঁরা অনুসারে শুল্কলিপি বিভাগের নীতি কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং এই অঞ্চলগুলির দাবি সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বর্তমানে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে এই বিষয় দাবি তুলিয়া সমস্যাকে জটিলতর করা সমীচিন হইবে না। উপযুক্ত সময়ে পর পরিষদের সম্মুখে এ বিষয় দাবি করা চলিবে। বিহারের এই অংশটি জেলার মোট লোক সংখ্যা ৭৭৯৯,৪৭১; ইহার মধ্যে হিন্দু ৬,৩৮৫,১১৪ এবং মুসলমান মাত্র ১,৪১৪,৩৫১ জন।

লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে পার্টিশন হইলে মুসলিমবঙ্গে নিম্নলিখিত থানাগুলি পড়িবে :—

ঢাকা বিভাগে :—নরসিংহ জেলা (আংশিক শাসন অধিকৃত উপজাতি অঞ্চল ব্যতীত) ঢাকা জেলা (ঢাকা সহর বাদে); ফরিদপুর জেলা (গোপালগঞ্জ মধুখালী ও রাজৈর থানা বাদে)।

চট্টগ্রাম বিভাগে :—সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা; নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা (ত্রিপুরা মহারাজের রোশনাবাদ এস্টেট বাদে)। (পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম রাষ্ট্রভুক্ত পড়িবে না)

প্রেসিডেন্সি বিভাগে :—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সমগ্র মহকুমা (বহরমপুর ও কেন্দ্রাগ্রাম থানা বাদে) এবং নদীয়া মহকুমা (কৃষ্ণনগর থানা বাদে); নদীয়া জেলার অন্য সমস্ত মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া মহকুমা এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমা (কৃষ্ণনগর থানা বাদে), যশোহর জেলার মধ্যে সমগ্র ঝিনাইদহ, মাগুরা, ঘর্ণা ও ঝিনাইদহ মহকুমা, নড়াইল মহকুমা (নড়াইল ও লোহাগড়া থানা বাদে) এবং সমগ্র মহকুমা (অভয়নগর থানা বাদে)।

রাজসাহী বিভাগে :—সমগ্র রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, রানীশঙ্কৈল ও বোচাগাঁও থানা; মালদহ জেলার অন্তর্গত গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ থানা।

মুসলিম বঙ্গের আয়তন হইবে ৮০,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৩,২০৪,৫২৩; ইহার মধ্যে মুসলমান ২৫,৩০৯,১১১ (শতকরা ৭৫) জন এবং হিন্দু ৮,৪৮৫,৩০২ (শতকরা ২৫) জন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ২,১০০ জন এবং এবং অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতীয় ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের অধিবাসীগণের স্বার্থে বাহিরে এই জেলাটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকা উচিত।

ত্রিপুরা রাজ্য—ত্রিপুরার হিন্দু রাজ্য হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও আগরতলার সহিত রেল যোগাযোগ রক্ষার সুবিধা আছে। এর আয়তন আয়তন ৪,১১৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৫৮৫,৪৫০ জন। নোয়াখালি জেলার বেবি মহকুমার এবং ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা সহর ও সমর বিভাগের কিয়দংশ ত্রিপুরার মহারাজার রোশনাবাদ এস্টেটের অন্তর্গত। এই অংশ পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঘটনাচক্রে অকস্মাৎ হস্তান্তরকালে ইহা পুনরায় মহারাজাকেই প্রত্যর্পণ করা উচিত।

(ক) লেখকের পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র শাসন একক 'থানাকে' ভিত্তি করা হইয়াছে। যে-সকল জেলায় বহু একটি হিন্দু-প্রধান থানা একত্রে একত্র রহিয়াছে, সেখানে ঐ থানাগুলিকে যুক্ত করিয়া নূতন জেলা গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমানে যে জেলাগুলি হিন্দু-প্রধান

সেইগুলির সহিত এই সকল নবগঠিত জেলার সম্বন্ধে হিন্দু বঙ্গ গঠিত হইবে।

(খ) ভৌগলিক একতা ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাধারণ পারিবারিক জমিটোয়ারার সময় একজন মালিকের সম্পত্তি যদি সামান্য একটু বেঁচের জন্য খণ্ডীভূত ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অংশটুকু উহারই জন্যে দিয়া একটি অখণ্ড জোতভিত্তি-এর ব্যবস্থা করা হয়। সেই নীতি অনুসারে মালদহের দক্ষিণে ও মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে অবস্থিত ছোট ছোট মুসলিম-প্রধান থানাকে হিন্দু-প্রধান করার অযুহাত কল্পিতই হইবে। এই থানাগুলি মালদহের জোতদার, কালিয়াচক ও বিলবন্দর; এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ, সুতী, রঘুনাথগঞ্জ নালগোলা ও ভগবানগোলা। এই ছয়টি থানার ৫০৮,৭৩১ জন মুসলমানের বাস। এই পাঁচ লক্ষ মুসলমানের জন্য হিন্দু বঙ্গের ঐক্য ও প্রায় ৩ কোটি লোকের স্বার্থহানি হইতে কখনই দেওয়া যাইতে পারে না। এই দুইটির মুসলমানদের স্বাধীনভাবে গমনের সুযোগ ও ক্ষতিপূরণ দান সহজসাধ্য হইবে।

(গ) নবগঠিত হিন্দু বঙ্গে বাস্তহারার সমস্ত হিন্দু জনসংখ্যার জন্যে শতকরা ১০ জন থাকিবে। হিন্দু বঙ্গে শতকরা ৭২ জন হইবে হিন্দু; সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাত সর্বদাই উচ্চে হইয়া থাকিতে হইবে না এবং নির্দিষ্ট কালে প্রদেশের মঙ্গলজনক উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সুযোগ লাভ করিবে।

(ঘ) জন-বিনিময়ের একান্ত প্রয়োজন হইলেও এইরূপ জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম হইবে। হিন্দু বঙ্গে মুসলমান থাকিবে ১,৩০৯,০৪৭ জন; পক্ষান্তরে মুসলিম বঙ্গে হিন্দু থাকিবে ৮,৫৮৫,৮১৯ জন।

(ঙ) হিন্দু বঙ্গের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কোন জেলায় মুসলিম প্রধান কোন থানা থাকিবে না। ভবিষ্যতে আশার অভিধানের অনুরূপ কোন আক্রমণ হইলে হিন্দুস্থানের ভিতরে বিপক্ষের অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন প্রবল সম্প্রদায়ের বাস বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে সেই বিপদের ভয় নাই।

(চ) হিন্দু বঙ্গ পাইবে ৩৬,১১০ বর্গ মাইল। এই জমির পরিমাণ বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যানুপাতের অনুরূপ কিন্তু বাংলার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ জমির মালিক হিন্দু; সুতরাং হিন্দু জাতিসত্তাকল্পে আরও বেশী জমি দাবি করিতে পারে।

হিন্দু বঙ্গ উত্তরে দার্জিলিং হইতে দক্ষিণে ২৪ পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অখণ্ড প্রদেশ হইবে। আয়তন ও খাদ্যসম্পদ পরিকল্পনার জন্য এই প্রদেশকে মুসলিম বঙ্গের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। অন্যান্য পরিকল্পনার বিভিন্ন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্বন্ধে এই অসুবিধা আছে।

নূতন প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা হইবে শতকরা ৭০ জন।

ইহার মধ্যে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া ভাবী গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিবে না। যে সকল পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ প্রেসিডেন্সি বিভাগ দাবি করা হইয়াছে তাহাতে এই অসুবিধা আছে।

জনবিনিময় অবশ্যম্ভাবী হইলে, এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রদেশ বেশী সুবিধাজনক।

অন্যান্য পরিকল্পনার তুলনায় ইহাতে মুসলিম বঙ্গে কমসংখ্যক হিন্দু থাকিয়া যাইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পার্টিশন সহজসাধ্য। যমুনেশের যে মানচিত্রে থানাগুলি দেখানো হইল তাহার সাহায্যেই মোটামুটি অস্থায়ী পার্টিশন করা সম্ভবপর হইবে।

এই পরিকল্পনার একমাত্র অসুবিধা পূর্বদিকে প্রাকৃতিক সীমার অভাব। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের যুগে অতীতকালের ন্যায় নদীর ধারা আর দুর্লঙ্ঘ্য নয়। তথাপি সীমা হিসাবে নদী সুবিধাজনক এবং উভয় প্রদেশের সীমানির্ধারণ-কালে তাহাকে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

দীক্ষা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

উচ্চমাধ্যমিকের দুরন্ত ছাত্রীকা-প্রাঙ্গণের আঙিনা দুয়ার
আসে দৃষ্টি যার।
চকিত অন্তরে হেরি তার আবির্ভাব
চেয়ে, চঞ্চলগতি, অকস্মাৎ, স্মিত-প্রতাপ!
ঘনে ঘনে বাজে আগমনী,
বিহঙ্গ-কাকলী-মিতে চন্দনের নূপুরের ধ্বনি।
প্রবল শশিক-শিখা নিঃশেষে সমর্পি
আহরেলি নিল তারে ধরি'।
প্রত্যহীন বিকচার অবিশ্বাস করি পরিহার
ধরিত্রী ধরিল রূপ অপরূপ-কিংশুক ফুলহার,
অনঙ্গ যৌবনবাণি
মুক্তি পেল দুর্বিনের দুরন্তবেগী ভরা-গুরু ধারি।

দর্পিত-রূপ নিয়ে অনঙ্গ-বিলাসে
এই ছাত্রী নিল মধুমাসে
হেলে তার আবর্তিত অনঙ্গ যৌবন
ধার্ষ্যকে বিরূপ করি, তুচ্ছ করি মৃত্যু-আহ্বানে।
যে কাজল, যে অগ্নিতে ধরিত্রীর পূর্ণিত অগ্নিত্ব,
আলতে মাখারে যাও নবীনের সৌম মধুনিশা,
যে অগ্নিস্পর্শেরই অন্ন সম
সে অগ্নির স্পর্শ যাও মম—
আমারে জ্বলিতে যাও মরণাক্ত অমৃত-অগ্নিতে
প্রেমিকের আগ্নিরিক্ত চিতে,
তীক্ষ্ণ করি দৃষ্ট অনুভূতি, কমনীয় শেষ শেল বুঝি
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে করো মোরে শুচি।

একচিত্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

একটা বিরাট শূন্যতা—রিক্ত প্রাণের ক্ষুধা-কাতর একটি সকরুণ নীরব রব চিত্তছলে ধ্বনিত হ'য়ে উঠে প্রতি মুহূর্তে জীবনের অসারত্ব সপ্রমাণ ক'রে দেয়। জীবনটা বাস্তবিকই যেন মনে হয় একটা মরুভূমির মত! সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতার মাঝেও যেন কোথায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা।

চন্দ্রা ভাবে—সত্যিই কি নারীজন্ম এমনিভাবে বয়ে যাবে তার? ভগবান কি তাকে মা হবার অধিকার এ জন্মে দেবেন না? কামনা তো তার বেশী নয়—একটি, মাত্র একটি সন্তান। যাকে বুকে জড়িয়ে সে তার জীবনের সকল বেদনা ভুলতে পারবে। সেই উদ্বেলিত স্নেহ-পারাবার মন্থন করা অমূল্য সম্পদ কি তার জীবনকে ধন্য ক'রে দেবে না? কল্পনার মোহন তুলিকায় যার প্রতিমূর্তি সে মনের মণিকোঠার গোপনে অংকিত ক'রেছে—প্রতি মুহূর্তে যার মৃদু-মধুর আহ্বান তার মর্মের কানে কানে গুঞ্জরিত হ'চ্ছে, সে কি তার একান্ত আপন হ'য়ে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে না? উঃ, কি অভিশপ্ত জীবন! চন্দ্রার চোখে শ্রাবণের বারিধারা নেমে আসে।

এই পনেরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে চন্দ্রা কি না করেছে? একটি সন্তানের কামনায় উন্মাদিনীর মত ছোট বড় সকলের আদেশ উপদেশ মাথা পেতে নিয়েছে সে··· কত দেবতার দ্বারে সকাতরে মানস-পূর্ণের মানসিক জানিয়েছে—দৈব-শক্তিসম্পন্ন অসংখ্য মাদুলী তার অংগের ভার বর্ধন করেছে···গোপনে কতো সাধুর চরণ-ধূলি পরম ভক্তির সংগে সে মাথায় তুলে নিয়েছে। কিন্তু দেবতা কোন কিছুতেই প্রসন্ন হ'লেন না। অথচ এই সমস্ত ব্যাপার তাকে কত সাবধানেই না করতে হয়। পাছে স্বামী জানতে পারেন, তাই প্রত্যেক বিষয় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় তাকে। যা কিছু সে করে সমস্তই স্বামীর অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে। কারণ স্বামী তার ডাক্তার এবং এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক। তুক্-তাক্, দৈব-টৈব বা মানসিক-ফানসিকের 'পরে তাঁর মোটেই আস্থা নেই। তিনি বলেন—'ও সব বাজে। বরাত ছাড়া পথ নেই—বরাতে যদি সন্তান লাভ থাকে তো হবে, নইলে একরাশ মাদুলীই অংগে ধারণ করো, আর সাধু সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো মুঠো মুঠো করেই গেলো, কিছুতেই কিছু হবে না।' চন্দ্রার প্রতি তাঁর কড়া আদেশ —সে যেন ওসব নিয়ে মাতামাতি না করে। বিজ্ঞানের যুগে ঐ সব ধর্ম আজগুবী করণ-কারণ শোভা পায় না।

ডাক্তার স্বামী, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটিও চন্দ্রার হয়নি; কিন্তু তাতেও কোন সুফল ফলে না। স্বামী বলেন —'ক্ষতি কি···মাই বা হ'ল ছেলে! পৃথিবীর সকল নরনারীর ভাগ্যেই যে সন্তান লাভ ঘটবে তার কি মানে আছে!'···অর্থাৎ স্বামীর সন্তানের কামনা খুব বেশী নয়। তাঁর মতে, ও সব না হওয়াই ভালো। ছেলেপুলে হ'লে তার অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এই বেশ।

চন্দ্রার মন কিন্তু এ কথায় সায় দেয় না। সে যেন আরও ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। শাশুড়ী তার মুখের পানে চেয়ে তার দুঃখ নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেন। মাঝে মাঝে কোথাও থেকে একটু জলপড়া নিয়ে এসে চুপি চুপি তাকে ডেকে বলেন—'বৌমা, চুক্ ক'রে এটুকু খেয়ে ফেলো তো মা। এ এ্যাকেবারে সাক্ষেৎ ধন্বন্তরি! আর এই মাদুলিটি শনিবার সকালে চান ক'রে কোমরে ধারণ করবে। অনেক ব'লে ক'য়ে, ও-বাড়ীর বামুনদিকে ধ'রে রামরাজাতলা থেকে এ ওষুধ আনিয়েচি। বামুনদি বললে —এ ওষুধ ডাকলে সাড়া দেয়। ভূতদের মেজবোয়ের ব্যাপার কে না জানে? বাইশ বছর ধ'রে একটি ছেলের পিত্তেশে ছুঁড়ি কি কাণ্ডই না করেচে! তারপর যেই বামুনদিকে ধরে এই জলপড়া আনিয়ে খেলে আর মাদুলি ধারণ করলে, অমনি—আহা কি চমৎকার ফুটফুটে ছেলে যে হয়েছে বৌমা, তা আর তোমাকে কি বলবো!'

সাগ্রহে হাত বাড়ায় চন্দ্রা, কিন্তু পরক্ষণে মনে প'ড়ে যায় স্বামীর কঠিন আদেশ—বিজ্ঞানের যুগে ও-সব দৈব-টৈবর ধারাবাহি অচল। কোন বিবেচক শিক্ষিত লোক এই সব বাজে জিনিষের সমর্থন করে না। সুতরাং সে চায় না

যে, তার স্ত্রী ঐ সব নিয়ে মাতামাতি করে এবং কতকগুলো ফুল বেলপাতা বা সেওড়-মাকড় পোরা মাদুলি পরে দেহের শ্রী নষ্ট করে।

হাতখানা কেঁপে ওঠে চন্দ্রার। নিমেষে তার সকল ব্যগ্রতা অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। শাশুড়ী বধূর মনের কথা বুঝতে পেরে খাটো গলায় বলেন—'অরুণ বকবে ভেবে ভয় পাচ্ছো মা? তা ভাখো মা, অরু আমার ডাক্তার মানুষ, তার ওপর চিরকালই ওর স্বভাব ঐ রকম—এ সবে বড় অবিশ্বাস! ঠাকুর দেবতাও মানতে চায় না। কত্তা তো তাই অনেক সময় দুঃখু ক'রে বলতেন—আমাদের ছেলে হ'য়ে ও অমন নাস্তিক হ'ল কি ক'রে? সবই কপাল বৌমা, সবই কপাল! নইলে অত লেকাপড়া শিখে এটুকু ও বোঝে না যে, একটা ছেলে বিহনে বংশটা শেষে লোপ পাবে।'

চমকে ওঠে চন্দ্রা। একটু কি ভেবে নিয়ে সে কাতর ভাবে বলে—'মা, আপনার পায়ে পড়ি—যেমন ক'রে হোক আপনার ছেলের আবার বিয়ে দিন। আমার কোন দুঃখু হবে না, বরং তার ছেলে হ'লে—'

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বলেন—'পোড়া কপাল! সে চেষ্টারও কি কসুর করেচি মা। কিন্তু ছেলেকে রাজী করায় কে?'

শাশুড়ীর দেওয়া জলপড়াটুকু ভক্তিভরে পান ক'রে নেয় চন্দ্রা। কত আশানিরাশার তরঙ্গাঘাত তার তার মনখানাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। বহু আয়াসপ্রাপ্ত কবচটি সযত্নে মুঠার মধ্যে চেপে ধরে সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে।

এমনি করেই আশার জাল বুনতে বুনতে দিনের পর দিন তার কেটে যায়। কত বিনিদ্র রজনীতে পুত্র কামনায় সে নৈশ-উপাধান সিক্ত করেছে—কতো নিশিথ-স্বপ্নে পুত্রমুখ চুম্বন করতে গিয়ে সে স্বপ্নভঙ্গে নিরাশ হয়েছে। কোথা হ'তে কোন শিশুর ক্রন্দন তার কানে এলে সে ক্ষিপ্তার মত নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে। এমনি করেই দীর্ঘ পনেরোটি বৎসর তার জীবন হ'তে অতীতের দেশে সরে গেছে।

কিন্তু চন্দ্রা আশ্চর্য হ'য়ে যায় তার স্বামীর পানে চেয়ে। ভাবে—আচ্ছা পুরুষ মানুষের মন কী ধাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন! তাদের প্রাণে কি সন্তানের মুখ দেখার সাধ জাগে না? মেয়েদের মত কি পুরুষরা সন্তানের কামনা মনে মনে পোষণ করে না? কই তার স্বামীর চিত্ত তো সন্তান কামনায় তার মত ব্যাকুল নয়!

সেদিন চন্দ্রার শাশুড়ী চুপি চুপি চন্দ্রাকে ডেকে বললেন—'বৌমা, একটা খবর শুনেচ? গোসাই গিন্নীর মুখে শুনলুম—কালীঘাটে নাকি একজন মহাপুরুষ এসেছেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তিনি মুখ দেখে মানুষের মনের কথা বলে দেন। যে যা কামনা নিয়ে তাঁর কাছে যায়—তিনি তা পূরণ ক'রে দেন। সাক্ষেৎ দেবতা বিশেষ লোক! গোসাই গিন্নীর ছেলের চাকরী গেছলো—ঠাকুরের কেরপায় আবার কাল থেকে একটা ভালো চাকরীতে বাহাল হয়ে গেছে। সেই সাধু ঠাকুরকে দেখবার জন্যে নাকি শহর শুদ্ধু লোক কালীঘাটে ভেঙে পড়েচে। যাবে বৌমা একবার ঠাকুরকে দেখতে? যদি তাঁর দয়া হয়—যদি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন! দরকার কি অরুকে জানাবার—কাকদের বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি বলে এক ফাঁকে ঘুরে এলেই হবে।'

প্রতিবারের মত এবার চন্দ্রাকে কেন জানি না—তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গেল না। এত বড় একটা সাধুর আগমন সংবাদেও অন্যান্য বারের মত সে আশান্বিতা হ'য়ে উঠলো না। তার সারা মুখে কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়াই যেন ফুটে উঠলো। ম্লান একটু হেসে সে বললে—'কিন্তু ফল কী কিছু হবে মা? এই পনেরোটা বছর ধরে অনেক কিছুই তো করা হ'ল মা—কী হ'য়েচে?' একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে সে বললে—'বাবা পঞ্চানন্দের দোরে হ'ত্যে পর্যন্ত দিয়েচি। ভেবেছিলুম—বাবার কৃপায় এবার বোধ হয় আশা আমাদের সফল হবে। কিন্তু পোড়া ভাগ্যে কিছুই ফললো না!' তার বড় বড় চক্ষু দুটিতে দুকূলার মত দু'ফোঁটা অশ্রু ঢল ঢল করে উঠলো।

শাশুড়ী বললেন—'সবই তো বুঝতে পারি মা, তবে কি জানো—মন কিছুতেই বোঝে না। মনে হয়—এবার বোধ হয় দেবতা মুখ তুলে চাইবেন। তাই বলচি মা—

একবার শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? আমার মন কি জানি কেন—এবার যেন বাছা ভালো গাইছে।'

—'বেশ, তবে যাবো।'

—'হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। আর কিছু না হোক, একজন সাধুপুরুষ দর্শনও তো হবে। আজকের খবরের কাগজেও নাকি সাধুর গুণাগুণ আর কখন কি ভাবে তাঁর দেখা মিলবে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছে। তুমি পড়ো নি বৌমা?'

—'কৈ না তো!'

হঠাৎ চন্দ্রার মনে পড়লো···আজ সকালে স্বামীকে চা দিতে গিয়ে সে দেখেছে, আজকের কাগজ থেকে খানিকটা অংশ স্বামী যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। সে তাই দেখে প্রশ্ন করেছিল—'কাগজটার অতোখানি ছিঁড়ে ফেললে কেন গো?' উত্তরে স্বামী গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিলেন—'ও কিছু নয়।' কথাটা চাপাই দিয়েছিলেন তিনি। এতক্ষণে চন্দ্রার মনে সেই কাগজ ছেঁড়ার হেতুটা যেন বেশ স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। পাছে চন্দ্রার দৃষ্টিতে খবরটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এবং সে সাধুর দর্শন ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে; তাই তাড়াতাড়ি কাগজের সেই স্থানটুকু তিনি নষ্ট করে ফেললেন।

শাশুড়ীর সংগে কথা শেষ ক'রে চন্দ্রা ঘরে এসে কাগজখানা খুলে দেখলে—একটা পাতার খানিকটা অংশ নেই। সে বুঝলে—এইখানেই সেই সাধুর কথা ছিল।

মুক্ত বাতায়ন পথে স্বচ্ছ আকাশ হতে কিছুটা রৌদ্র ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চেয়ে চন্দ্রা ভাবতে লাগলো—তার স্বামীর অদ্ভুত প্রকৃতির কথা। উঃ, একটি সন্তান লাভ করার জন্য সে এই দীর্ঘ দিন কী না করেছে! আর তার স্বামী? বাস্তবিক পুরুষদের কি পিতা হওয়ার সাধ জাগে না প্রাণে?

সেদিন ছিল অমাবস্যা তিথি···

পূর্ব পরামর্শ মত সন্ধ্যার কিছু আগে গোপনে শাশুড়ী-বধূতে সাধু দর্শনে বার হ'য়ে পড়লেন। ভাগ্যগুণে সেই দিন চন্দ্রার স্বামীও বাড়ী ছিলেন না—প্রভাতেই কোথায় বেরিয়েছিলেন। বলে গেছেন আজ ফিরবেন না। সুতরাং তাদের গমনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি।

যথাসময়ে শাশুড়ীসহ চন্দ্রা এসে পৌঁছালো—কালীঘাটে সাধুর আশ্রম সন্নিকটে। রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য গাড়ী—মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি দাঁড়িয়ে আছে। সাধুর দর্শনাভিলাষী বহু নরনারীর আগমনে সে স্থান যেন এক মেলার আকার ধারণ ক'রেছে। এত লোকের ভীড় এর পূর্বে বোধ হয় আর কখনো দেখেনি চন্দ্রা। সে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল। একটা লোককে দেখবার জন্য এত ভীড়! তবে কি, তবে কি—এতদিনে প্রাণের আশা পূর্ণ হবে তার? ঠাকুর কি তবে মুখ তুলে চাইবেন? একটা অজানা সম্ভাবনার আশায় তার প্রাণটা দুলে উঠলো।

ভীড় বাঁচিয়ে একটা অবহায়া প্রায়ান্ধকার গলি পথ ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলতে লাগলো চন্দ্রারা।

অনেকটা পথ নীরবে চলে আসার পর এক সময় চন্দ্রা শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে—'আর কতটা পথ যেতে হবে মা? রাস্তাটা বড্ড অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। এমন পথও শহরে আছে?'

—'আছে বৈকি মা···কলকাতা শহরে নেই কি?' একটু থেমে শাশুড়ী বললেন—'হবে কি জানো বৌমা, সব দেখে শুনে বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। এই এত্ত লোকের ভীড় ঠেলে আমরা কি সাধুর কাছে পৌঁছাতে পারবো—আশা কি পাবো তাঁর? কিন্তু বৌমা এতদূর যখন এসেছি তখন যাই হোক—আশা না করে ফিরছি না।'

কথা কইতে কইতে অবশেষে এক সময় তাঁরা উভয়ে এসে উপস্থিত হ'লেন সাধুর আশ্রমে। একটা প্রকাণ্ড স্থান ঘিরে এই আশ্রমটি তৈরী হ'য়েছে। চারিদিকে লোকজন গিস্ গিস্ করছে। একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে মহিলাদের আসা যাওয়া এবং বসা দাঁড়ানোর স্থান। কত নরনারী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কে জানে তাদের আশা সফল হবে কি না! চন্দ্রাও শাশুড়ীর সংগে এসে মহিলাদের ভীড়ের মধ্যে একস্থানে জড় সড় হয়ে বসে পড়লো।

অদূরে দেখা গেল—হোমাগ্নি জ্বলছে, আর তারই সামনে শিষ্য ও ভক্ত পরিবেষ্টিত সাধুজী বসে আছেন একটি মৃত্তিকা-নির্মিত বেদীর উপর ব্যাঘ্রাসনে। অপূর্ব সে মূর্তি···মস্তকের

সুদীর্ঘ জটা সর্পিল আকারে পৃষ্ঠদেশ বেয়ে মাটীতে এসে লোটাচ্ছে—দীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষদেশ প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে—নয়ন যেন ধ্যান স্তিমিত—ভস্মাচ্ছাদিত সারা অংগে একমাত্র কৌপীন বাতীত অন্য কোনও আবরণ নেই। আননে এক অনবদ্য হাস্যের রেখা। হাঁ, সাধু বটে! শ্রদ্ধায় অন্তরখানা যেন সাধুর চরণ পরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রার।

অন্ধ খঞ্জ অনাথ আতুর প্রভৃতি কত শত লোক ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে সাধুর মুখের পানে চেয়ে বসে আছে। যদি তিনি কৃপাদৃষ্টি করেন এই আশায়।

সাধু মাঝে মাঝে চক্ষু উন্মীলিত করে সামনের দিকে প্রতীক্ষিত নরনারীর পানে তাকাচ্ছেন এবং তাদের মধ্য হ'তে কখনও বা এক এক জনকে কাছে ডেকে কথাও বলছেন। তারা কেউ কেউ আবার অন্তরের অভিলাষ জ্ঞাপন করে সাধুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে। সাধুও মধুর হাসির সঙ্গে সান্ত্বনার ধুনী হ'তে একটু ছাই কারো হাতে—কারো হাতে বা একটা শুষ্ক বেলপাতা কি ফুল—আবার কাউকে এতটুকু একটু কি এক গাছের শিকড় দিয়ে বলছেন—'ঈশ্বর তোমার আশা পূর্ণ করুন! ওঁ শান্তি···'

শ্রদ্ধানত মনখানি নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে চন্দ্রা! অন্তরের কানায় কানায় তার হাসি-কান্নার ঢেনিলোচ্ছ্বাস। কে জানে—সাধুর কৃপা লাভে তার পোড়া ভাগ্য সমর্থ হবে কি না! বন্ধ্যার মর্ম বেদনা কি সাধু উপলব্ধি করবেন! না সর্বক্ষেত্রের ন্যায় এবারও বিফল হবে তার আয়োজন?

চন্দ্রার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও হয়তো এমনই নানা কথা চিন্তা করছিলেন। এই সময় কি ভেবে বধূর কানে কানে বললেন—'বৌমা, কি জানি—আমার কেমন যেন হঠাৎ ভয় ভয় করচে মা! অরুণ যদি জানতে পারে যে, আমরা এই রাত্তিরকালে এতো দূরে সাধু দেখতে এসেচি, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। যা রাগী ছেলে! একে তো বৈব-টৈব সাধু-সজ্জন মানেই না সে, তার ওপর—কাজ নেই মা—চলো একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যাক্। আর যা দেখচি, তাতে সাধু ঠাকুরের সুনজর যে চট্ করে আমাদের দিকে পড়বে তা তো মনে হয় না। অন্য আর একদিন না হয় সুবিধে মত আসা যাবে, কি বলো?'

চন্দ্রারও মনটা কেমন ছাৎ করে উঠলো—সত্যিই যদি স্বামী তার জানতে পারেন! স্বামীর কঠিন চিত্ত তো তার ব্যথা বুঝবে না। মনে পড়লো স্বামীর নিষেধাজ্ঞা—বিজ্ঞানের যুগে এসব শোভা পায় না। শাশুড়ীর কথার-উত্তরে কি যেন একটা বলতে গেল সে, কিন্তু সহসা একস্থানে দৃষ্টি প'ড়তেই তার কণ্ঠের ভাষা কণ্ঠেই রুদ্ধ হ'য়ে গেল। বিস্ময়ে তার চক্ষু দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হ'ল।—কিন্তু এও কি সম্ভব!

ঠিক এই সময় সাধুজী ইংগিতে এক ব্যক্তিকে কাছে ডাকলেন। লোকটির চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, যুক্তকর—ধীরে ধীরে সাধুর কাছে এসে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলে। স্নিগ্ধ হাস্যের সংগে সাধু আশীর্বাদ ক'রে বললেন—'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে···এক বৎসরের মধ্যেই তুমি ভগবানের দয়ায় পুত্র মুখ দর্শন করবে। ঈশ্বর তোমার মংগল করুন ···ওঁ শান্তি।' বলেই কি একটা শিকড় তার হাতে তুলে দিলেন। লোকটি পরম ভক্তির সংগে সাধুর সে দান বক্ষে চেপে ধরলো।

—'কে ও—কে!'

আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উন্মাদিনীর মত শাশুড়ীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চন্দ্রা বলে উঠলো—'মা, মা, ঐ দেখুন, আপনার ছেলে, আপনার ছেলে'—আর সে বলতে পারলে না, আনন্দাশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

আর, আর চন্দ্রার শাশুড়ী?

নাস্তিক পুত্রের গোপন আস্তিকতা দর্শনে তিনিও গভীর বিস্ময়ে হতবাক। সূর্যের বিপরীত গতি যদি আজ তিনি চোখের ওপর দেখতেন, তাহলেও বোধ হয় এত বিস্মিত হতেন না। তাঁর অরুণ—ডাক্তার ছেলে অরুণ—ক্ষণপূর্বেও যার অবিশ্বাসী অন্তরের কথা চিন্তা ক'রে তিনি ভীতি প্রকাশ করেছেন—সেও পুত্রের কামনায় আপনার আশৈশব দৃঢ় মতামতকে তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে—দৈবজ্ঞের দরবারে! পুত্রের অভাবনীয় আচরণে হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক করতে পারলেন না তিনি। নির্নিমেষহারা দৃষ্টি তাঁর পুত্রের প্রতি স্থির হ'য়ে গেল।

মূলধন ও যান্ত্রিক উৎপাদন

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধনিকবাদের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সমাধানের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিগণ যে কতরকম ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করতে পারে, মার্কসের আমলে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নি, তাই মার্কসের হিসাব থেকে সে সব বাদ পড়েছে। Capitalism বা ধনিকবাদ স্বদেশে যখন পরিপক্ক অবস্থায় (Saturation points) গেল, তখনই তার নূতন বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হল—উপনিবেশিক প্রথায়, সাম্রাজ্যবাদে ও বিশ্ববাণিজ্যে। এর কোনোটাই মার্কসের আমলে তেমন ভাবে দেখা দেয় নি।* লেনিন বলেছেন ধনিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য কেবল পরিমাণগত (Quantitative) নয়,—এটা গুণগতও (Qualitative)। ধনিকবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ হল সাম্রাজ্যবাদ ; তবুও উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধী ভাবও (Opposition) আছে। কিন্তু মার্কস তেমন ভাবে ইহা অনুভব করতে পারেন নি। উপনিবেশের আদিম অবস্থা—অর্থাৎ কেবল কাচামালের (প্রধানত-কৃষিজ) জোগানদারের অবস্থা, মার্কসের আমলে পূর্ণ পরিস্ফুট ও উত্তীর্ণ হয় নি। উপনিবেশসমূহে নূতন নূতন ধন-সম্ভার বের হল—খনিজ তৈল সম্পদ ও রবার চা, পাট প্রভৃতি কৃষিজ সম্পদ এর মধ্যে প্রধান ; অন্যপ্রকারের plantationও আছে। তাতেও ধনিকপ্রথার কাটা-ছেরা অনেকটা ঢাকা পড়ল। তারপর এল বিশ্ববাণিজ্য (International trade) ; তার ফলে ধনিকপ্রথা বিস্তৃত ক্ষেত্র পেল এবং নূতন উদ্যমে বিশ্বকে শোষণ করতে লাগল। গত যুদ্ধের পর আবার এল ফ্যাসিবাদ Fascism ; ধনিকবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ যেমন সাম্রাজ্যবাদ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ হল ফ্যাসিবাদ। গত মহাযুদ্ধে ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানে, শ্রমজীবীরা যে অভিজ্ঞতা করেছে, তাতে তাদের উপর মার্কসের মতো ততটা নির্ভর করা যায় না। মার্কস তাদের আহ্বান করেছিলেন—বিশ্বের শ্রমজীবীরা তোমরা একত্র হও ; শৃঙ্খল ব্যতীত তোমাদের হারাবার কিছু নেই। —"Proletariat of the world, unite ; you have nothing to lose but your chains." মার্কসের এই আহ্বানের মর্যাদা শ্রমজীবীরা রাখে নি। দেখা গেল মুসোলিনী ও হিটলারের হাতে তারা ফ্যাসিবাদের পরিপোষক ও বাহক হয়ে উঠল। দুটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোনটাতেই তারা সেই ভাবে বিশ্বের নামে সাড়া দেয় নি। সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে একদেশের শ্রমিক অপর দেশের শ্রমিককে হত্যা করতে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহায়তা করতেও এরা পরাঙ্মুখ হয় নি। এই যুদ্ধে ভারতেও দেখা গেল essential service বা "অত্যাবশ্যকীয় সেবক" হিসাবে কিছু সুখ-সুবিধা দিলে এরা বিশ্বের সার্থকে আলাদা ক'রে বিচার বা বৃহত্তর সমাজের কথা বেশ ভুলে থাকতে পারে।

তাই গান্ধী সহজ পন্থা নিয়েছেন ;—তিনি যন্ত্রকে একেবারে বাতিল না করলেও অত্যন্ত সঙ্কুচিত ক'রে রাখতে চান—অর্থাৎ মানুষের একান্ত অনুগত সেবক হিসাবে তার কাছ থেকে যতটুকু সেবা আদায় করা যায় ততটুকুই খুব সতর্কতার সহিত তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ; মার্কস যখন বলেছেন যে মানুষের শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে—"Human labour creates value" বা শ্রমই হ'ল সব মূল্যের গোড়া—"labour is the sole source of value"—তখন তার মনের সামনে ছিল কারখানার শ্রমজীবিরা—যাদের দুঃখের জীবন তিনি নিজ জীবনের অঙ্গ ক'রে নিয়েছিলেন। তাই কৃষকদের প্রশ্নকে তিনি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষাই করেছেন। তাঁর এই একান্ত একদেশী সহানুভূতি তাঁকে শ্রমের সহজ স্বাভাবিক ও আদিমরূপ সম্বন্ধে অন্ধ করেছিল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন—মানুষের শ্রমের সহজ, আদিম ও স্বাভাবিকরূপ হ'ল

* মার্কসের "ক্যাপিটাল" (Capital) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের এই দিক সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। এমন কি Imperialism সম্বন্ধেই ঐ গ্রন্থ প্রায় নীরব। উপনিবেশ ও উপনিবেশপ্রথা (Colonies & Colonisation) সম্বন্ধে তাতে কিছু আছে ; কিন্তু Colony শব্দটিকে তিনি মৌলিক ল্যাটিন অর্থে ব্যবহার করেছেন—অর্থাৎ অকর্ষিত জমি Virgin soil—যা নবাগতরা এসে চাষ ক'রে শোষণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের যে রূপ এখন আমরা দেখছি—এর আধিক রূপ,—তা হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ সম্বন্ধে J. A. Hobson লিখেছেন—"The economic taproot, the chief diverting motive of all the modern imperialistic expansion is the pressure of capitalistic industries for markets—for surplus markets, for investments & secondarily to supply products of home industry."—অর্থাৎ বর্তমান সাম্রাজ্যিক বিস্তারের প্রধান উৎস ও প্রধান আধিক তাগিদ হ'ল বাজার প্রসারের চেষ্টা—প্রধানত টাকা খাটাবার বাজার এবং দ্বিতীয়ত দেশের কারখানার উৎপন্ন মাল বিক্রির বাজার। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ মার্কস দেখতে পান নি। ক্রমেই বিদেশে ও সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশে টাকা খাটাবার প্রথা বেড়ে চলছে। ১৯০৪ সালে দেশে খাটাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের মজুদ ছিল ১০ কোটি পাউণ্ড এবং বিদেশে খাটাবার জন্য ছিল ৭ কোটি পাউণ্ড মাত্র। ১৯১৩ সালে এই অঙ্ক পর্য্যায়ক্রমে হয় ৩৯ এবং ১৫ কোটি পাউণ্ড। ১৯১৪ সালে ব্রিটেনের বিদেশে ন্যস্ত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি পাউণ্ড, ফ্রান্সের ছিল ১৮০ কোটি এবং জার্মেনীর ছিল ১২০ কোটি পাউণ্ড।

তার স্বাধীন ব্যবসায়ী এবং—স্বাধীন কৃষক, স্বাধীন কারিগর ও স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর—সমাজসেবায় উপাদানের বা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন-দ্রব্যের উৎপাদনে যার কৃতিত্ব। তাই তার সব দুঃখ নয়, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সব কিছুই কারখানার শ্রমজীবীদের জন্য। সেখানে গান্ধী ব্যাপকতর ও বৃহত্তর সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন; সেই জন্যই তিনি চেয়েছেন কারখানার অন্ধকার ও ব্যক্তিবিনাশী আবহাওয়া হ'তে শ্রমিককে তার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে স্থাপিত করতে,—তার শ্রমের সাথীর জন্য যন্ত্র সে আসবে ও খাটাবে—কিন্তু প্রত্যেকের শ্রমের অধিকার ও গতির অব্যাহত ক্ষেত্রে। শ্রমের যন্ত্র ও উপকরণের মালিক হবে শ্রমিক; অপরের ক্রীতদাস হবে, অপরের মুনাফার জন্য অপরের যন্ত্রে ও উপকরণ নিয়ে সে শ্রম করবে না।

মার্কস কেবল কারখানার শ্রমজীবীদের উপরই জোর দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে সমাজ তাদের উপরই গড়তে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের একটা বৃহৎ অঙ্গ—এবং যাদের শ্রমের মূল্য সমাজের পোষণের পক্ষে সব চেয়ে বেশী, সেই কৃষকদের তিনি কার্যত বাদ দিয়েছেন। তাঁর সমাজ-দর্শনের এই একদেশদর্শিতার ফলে বিশেষভাবে ধরা পড়ল রুশ-বিপ্লবের সময়,—লেনিন ও ট্রটস্কী প্রথম নৈতিক মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সুরু করেছিলেন—War Communism উগ্র সাম্যবাদ; কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁরা বৈজ্ঞানিক সাহসের পরিচয় দিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নিলেন এবং কৃষককে তার স্বাস্থ্য স্থান দিলেন। ষ্টালিন এই কার্যক্রমকে পূর্ণ করলেন, তখন শ্রমিক ও কৃষকের ভোট-ক্ষমতা সমান ক'রে দিলেন।

গত মহাযুদ্ধের পর, প্রাচ্য ইউরোপ—বিশেষ ক'রে বলকান রাজ্য-সমূহে "সবুজ সাম্যবাদ" (Green Socialism) নামে কৃষক-মূলক সাম্যবাদের আন্দোলন সুরু হয়। তাদের কথা ছিল "Peasants of the world, unite"—বিশ্বের কৃষকগণ একজোট হও। বুলগার কৃষক দলের নেতা ষ্টামবুলিস্কী (Stambulisky) ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা; পরে তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নেতৃত্বে এক প্রচার পত্রে বলা হয়েছিল "বুলগেরিয় কৃষক সংঘের এই কংগ্রেস সমস্ত জাতিসমূহের কৃষকদের আহ্বান করছে—নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে আহরণ করার জন্য যেন একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। এই ভাবে সংঘবদ্ধ কৃষকদের পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক কৃষক সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানব সমাজকে নূতন ক'রে গড়বার কাজে এই বিশ্ব-সংঘ বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে।"*

কৃষকের চেয়ে শ্রমজীবীর সংখ্যা বরাবরই কম—এবং দুইও বরাবরই তা থাকবে। কৃষকরাই সমাজের আদিম ও মৌলিক অভাব-পূরণ করে। গান্ধী এটা উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর কার্যক্রমে ও সমাজ-ব্যবস্থায়—এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে কৃষকের দিকে-ই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। খাদ্যের পরই মানুষের প্রধান অভাব বস্ত্র—বস্ত্রের। ইংরাজী বচন আছে—"When Adam delved and Eve span, who was then a gentleman?" —আদিম মানব আদম যখন চাষ করত এবং তার পত্নী ইভ যখন কাপড় বুনত, তখন ভদ্রলোক ছিল কে? পূর্বে বলেছি—ধনিকপ্রথায়—(Capitalism) সুরুপাত হয়েছে—বস্ত্র উৎপাদন দিয়ে। এই ঐতিহাসিক তথ্যের হিসাব গান্ধী করেছেন কি না, জানি না; কিন্তু ধনিকপ্রথা ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে অভিযান তিনি সুরু করেছেন বস্ত্র-উৎপাদন দিয়ে-ই। ধনিকপ্রথার একেবারে গোড়ায় আঘাত ক'রে তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অন্যায়, অসত্য ও হিংসা-মূলক ব'লে ঘোষণা করেছেন।

মার্কসের পর বা সমসময়ে অর্থ-ব্যবস্থার আরও দুটি নূতন প্রথা দেখা দিয়েছে—joint stock company এবং co-operative society.—যৌথ ও সমবায় কারবার। পূর্বে যে সব যৌথ কারবার joint stock Co.) ছিল, তা ছিল প্রায়-ই সরকারী সনদ প্রাপ্ত (chartered) কোম্পানী—উৎপাদনের চেয়ে বাণিজ্যের প্রতি-ই যার লক্ষ্য ছিল বেশী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং (East India Co.)—এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু যেসে সূচনা আরের পরিমাণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সঙ্ঘবেতভাবে ও সীমাবদ্ধ দায়িত্ব (limited responsibility) নিয়ে সম্মিলিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা স্থাপন করতে লাগল। বৃহৎ ধনপতিদের একাধিপত্যে—এক নূতন বাধার উদ্ভব হল। আজ শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কারখানা যৌথ কারবার—বহু লোকের অর্থে তা গঠিত এবং বহুলোক এর লভ্যাংশ পায়। এর ফলে শ্রমজীবীরা এবং মধ্যবিত্তরা-ও ছোট খাটো ধনপতি (capitalist) হবার সুযোগ পেল এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হল। এই অবস্থা-ও মার্কস অনুধাবন করেন নি। এর পর এল সমবায় প্রতিষ্ঠান। Capital গ্রন্থে co-operation শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। সেখানে এর অর্থ হল—এক বিরাট কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমের বিভাগ *। সমাজের অর্থ-ব্যবস্থায় প্রভাবিত জনতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই সমবায় প্রথা যে কতটা সহায়ক—তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—সোভিয়েট রাষ্ট্রে। এই বিষয়েও সোভিয়েট রাষ্ট্র-নৈতিক মার্কসীয়বাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে সমবায় প্রথার আশ্রয় নিয়েছে।

যৌথ কারবারে ও বড় বড় কারখানায় শ্রমজীবী ও ধনপতিদের

---

* "The Congress of the Bulgarian Peasants Union invites the peasants of all nations to organise in the name of their common interests and to take political power into their hands. Peasants thus organised have need of a powerful International Peasant Union. And this Union will play a great role in the rebuilding of humanity.

* When numerous workers labour purposively side by side and jointly, no matter whether in different or in inter-connected processes of production, we speak of this as co-operation."—অর্থাৎ যাকে আমরা বলি division of labour—শ্রমের বিভাগ।

স্বার্থের সাময়িক সাধনের জন্য, অন্য অনেক রকম কমি-ও উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রমজীবীরা যৌথ কারবারের অংশীদার হতে পারে এবং অনেক সময় তাদের সেই সুযোগও দেওয়া হয়। লাভের একটা অংশ আজকাল অনেক কারবারেই প্রমজীবীদের জন্য স্থির ক'রে রাখা হয় ;—profit sharing—লাভের অংশ এবং bonus—বকসিস—এই দুই ভাবে এটা সাধিত হয়। এর ফলে কারখানায় বা কলকারখানায় যাতে বেশী লাভ হয়, সে দিকে প্রমজীবীদের একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগে। অনেক যৌথ কারখানায়, পরিচালনায় (management) প্রমিকদের সহযোগিতা আহ্বান করা হয় ; বিভাগীয় পরিচালক বা তার কমিটি তাদের ভোটে ও তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত হয়। এমন ব্যবস্থাও ২।১ স্থানে হয়েছে—সমস্ত ব্যবসায়টি প্রমিকগণই পরিচালনা করে এবং লাভও তারা পায় ;—কেবল ব্যবসায়ের মূলধন হিসাব ক'রে প্রমিকগণ ধনপতিকে (Capitalist) মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয় মাত্র। এই সব কসি-ফিকিরের ফলে ধনজীবী ও প্রমজীবীর মধ্যে যে শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব তা অনেকটা তোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

প্রমজীবী ও ধনজীবীর যে মৌলিক দ্বন্দ্ব—যার উপর মার্কস তাঁর সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করেছেন, তা আজ নানাভাবে প্রতিহত ও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। প্রমজীবীগণ এক একটা কারখানায় বা ইণ্ডাষ্ট্রির অঞ্চলে জমাট হয়ে বাস করে ; কৃষকদের মতো নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকে না। তাই প্রমজীবীদের ছোটখাটো সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধিকে উস্কিয়ে দিয়ে, তাদের হাত করা অনেক সহজ। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রমিকদের (Specialised and expert) এবং সাধারণ প্রমিকদের মধ্যে ব্যবস্থার পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে প্রমিকদের মধ্যেও কুলীন ও অকুলের পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। বেকার সমস্যা বর্তমানে এমন প্রবল যে তার ফলেও প্রমিকদের সংঘবদ্ধতা খাটো রাখা সম্ভব হয়। ;—ধোলাইয়ের বা অন্যান্য প্রমিকের স্থানে বেকার প্রমিক দিয়ে কাজ চালানো ধনজীবীদের পক্ষে আজ খুবই সহজ হ'য়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও এই গত যুদ্ধের সময়ও প্রমিকগণ অনেক সময়ই বিপ্লব-বিরোধী পন্থা নিয়েছে। ৪২ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টায়ও আমাদের দেশের প্রমিকগণ essential serviceএর ফলে সুখ-সুবিধা পেয়েই, বিপ্লবের অনুকূল না হয়ে বরং প্রতিকূলই হয়েছিল। আজও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক ব্যাপারের দিকেই এদের নজর বেশী ; দেশের বৃহত্তর জনতার মঙ্গল সাধনে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে এদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। অপর দিকে বরং কৃষকগণ সরকারী প্রলোভনের ঝোড়া-জালে তত সহজে ধরা দেয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারীয় (czarist) সরকার প্রমিকদের হাতে রাখার অনেক ব্যবস্থা করে ;—Workers' Group of the War Industry Committee স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল, উহাই। জারীয় সরকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সফলও হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের দেশে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোন সময়ই কোন দেশের সর্বত্র-বিস্তৃত কৃষকদের তেমন ভাবে হাত করা সরকারের পক্ষে তত সহজ হয় না।

১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইউরোপ ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদনে মেতে উঠেছিল। তার সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা এই ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদনের উপরই গ'ড়ে তুলতে লাগল। কৃষির সম্পদ ও কাঁচামালের জন্য তারা নির্ভর করত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উপর। তারা মনে করেছিল এমনি ভাবেই বরাবর চলবে। কিন্তু সাম্রাজ্যিক রেষা-রেষি ও ঈর্ষার ফলে এই ব্যবস্থায় বাধা পড়তে লাগল। কাঁচামাল সংগ্রহের, মূলধন খাটাইবার ও উৎপন্ন মাল বিক্রীর ক্ষেত্র হিসাবে—আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার সাম্রাজ্যিক ও উপনিবেশিক ক্ষেত্র আর তেমন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রইল না। পূর্বে ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদন ও বেচাকেনায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হল না। ক্রমে ইউরোপে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বী হল। পরে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীও এল। জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীনের ও ভারতের কতক অংশ এবং ইউরোপের পরে আগত আমেরিকা ও ইটালী ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদনে ও বেচাকেনায় পূর্বাগত ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতির একচেটিয়া শোষণের বাধা হ'য়ে উঠল। সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ এখন বিশ্বব্যাপী হ'য়ে উঠল এবং যারণ অস্ত্রও এখন ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠল—যে দূর দূর দেশ হতে খাদ্য বা কাঁচা মাল আনা বা দূর দেশে উৎপন্ন মাল বিক্রি ক'রে সমাজের পূর্ব ঠাট বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠল। তার ফলে সব দেশেই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেরও আবার কৃষির দিকে নূতন ক'রে ঝোঁক দিতে হচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে এবং কৃষি ও কৃষককে উপেক্ষা ক'রে যে সমাজ বড় হ'তে পারে না—তা আজ সকলেই বুঝতে পারছে। অর্থাৎ এক শতাব্দী পূর্বে মার্কসের আমলে ইউরোপীয় সমাজে কৃষি ও কৃষক যেমন কতকটা অনাবশ্যক ব'লে বিবেচিত হত, আজ আর তা নয়। প্রত্যেক দেশেই আজ কৃষক সমস্যা—রাজনৈতিক দলসমূহের নজর আকর্ষণ করছে ; সোভিয়েট রুষিয়া এই বিষয়ে প্রায় অগ্রণী। আজ গান্ধীও যদি কৃষকের দিকেই বেশী করে দৃষ্টি দেন, তবে বাস্তব সমস্যার মর্যাদাই তিনি দিচ্ছেন।

সমাজ ব্যবস্থায় এই সব নূতন শক্তি ও ঝোঁকের (tendency) উদ্ভব, আজ আমাদের হিসাব করা দরকার। সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক মার্কসীয়বাদ থেকে কোথাওও কোন বিষয়ে-ও কতটা সরে বা এগিয়ে গিয়েছে, তাদের রাষ্ট্র ও সমাজে মার্কসীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা সফল হয়েছে বা কতটা ব্যর্থ হয়েছে—আজ তা হিসাব ক'রে আমাদের পন্থা নির্ণয় করা দরকার। লেনিন যে অনেকবৃত্তির বিদ্যা ক'রে বলেছেন "learned by rote—without studying the unique living reality"—একমাত্র জীবন্ত বাস্তবকে অধ্যয়ন না করে, পুঁথির মুখস্থ বিদ্যা—সেই মনোভাব নিয়ে তোতাপাখীর মতো মার্কসের বুলি আওড়িয়ে গেলে, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। মার্কসের অভিজ্ঞতা, অনুমান ও আশার অনেক ব্যতিক্রম অর্থব্যবস্থায় এই পৌনে এক শতাব্দীতে হয়েছে ; সোভিয়েট রাষ্ট্র-ও তা কার্যত স্বীকার ক'রে নিয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মার্কসের এমন কি লেনিনের আশাও সোভিয়েট রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে নি। লেনিন বলেছিলেন—স্থায়ী সৈন্য, স্থায়ী পুলিশ

ও আদালতের কর্মনিষ্ঠ-আদর্শমুখী রাষ্ট্রই থাকবে না। (No standing army, no standing police and no bureaucracy in the interim stage.) এই তিনটিই সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ প্রবলভাবে আছে। এর মধ্যে সোভিয়েটরাষ্ট্র-মার্কসের দোষ ত্রুটির কথা বলছি না,—বলছি বাস্তব অবস্থার অভ্রান্তিহত গতির কথা, যে গতির সামনে কেতাবী বাঁধি গৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। তার উপর এসেছে ফাসিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সামরিক রাষ্ট্র (totalitarian state) সমাজের সর্বাঙ্গকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার যার কায়দা-সভ্য মানুষকে শঙ্কিত করেছে।

এমনি অবস্থায় এসেছেন গান্ধী-তাঁর বক্তি 'স্বতন্ত্রবাদ নিয়ে। মার্কসীয় ব্যবস্থার ব্যক্তি হল আত্ম-সত্তা-হীন সমাজের অঙ্গ। তার বিকৃতরূপ আমরা দেখছি—ফ্যাসীবাদে, যার গঠনে ও প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী-দের অবদানও কম নয়। সমষ্টিগত সমাজের মঙ্গলময় রূপ ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস হচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্রে। এর মধ্যে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থান কতটা থাকবে—আজও তা সন্দেহের। ব্যক্তিকে সমষ্টিগত সত্তার নিকট বিসর্জন দিয়ে মঙ্গলকর ব্যবস্থা কি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে, তাও সন্দেহজনক। তাই গান্ধী ব্যক্তির স্বতন্ত্র আধিক ও রাষ্ট্রিক সত্তা মান ক'রে—নূতন অর্থ ব্যবস্থার সূচনা করেছেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ধন সঞ্চয়কে তিনি চৌর্য বলে অভিহিত করেছেন।* গান্ধীর ব্যবস্থার মধ্যে সমবায় প্রথার স্থান বহুলাংশে হতে পারে ;—এবং সর্বোপরি ব্যক্তির আধিক স্বতন্ত্রসত্তা এতে স্বীকৃত হয়েছে।

মার্কস ঐতিহাসিক ডায়েলিকটীকের (historical dialectic) উপর একটু অতিরিক্ত নির্ভর ক'রে আগতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের আর্থিকরূপ যৌথ-কারবার (joint stock co) ও সমবায় সমিতির (co-operative society) সম্ভাবনা দেখতে পান নি,—যদিও তাঁর

* We are thieves in a way if we take anything that we do not need for immediate use and keep it from somebody else who needs it.....So long we have got this inequality, so long I shall have to say we are thieves.

জীবিতকালেই এই সব দেখা দিয়েছিল। তিনি কৃষকের প্রশ্নকে উপেক্ষা করেছেন বৃত্তিহীন শ্রমিকের দুঃখে অভিভূত হ'য়ে এবং সর্বোপরি কল কারখানার এমন তীব্র নিন্দা করেও (বোধ হয় গান্ধীর চেয়েও তাঁর ভাষা এই বিষয়ে কঠোর), তিনি কল-কারখানাকে বাদ দিবার প্রস্তাব করতে সাহস পান নি। আজ গান্ধী মার্কসের এই সব ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পেয়েছেন। আমরা মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অভাব থেকে একথা বলছি না ;—একথা বলছি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি মার্কস একজন যুগপ্রবর্তক ; সমাজের গতি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ ত' সর্বকালের জন্য অভ্রান্ত নন। কিন্তু তিনি যখন শ্রমজীবীর একাধিপত্য বা "Dictatorship of the Proletariat" এর জন্য আহ্বান দিয়েছেন, তখন তিনি যে সমাজের বেশীর ভাগ শ্রমশীল কৃষক জনতাকে উপেক্ষা করেছেন, তখন তিনি যে কারখানার বাইরের শ্রমিকের স্বাধীন ও স্বাবলম্বী রূপকে অসম্ভব ব'লে ধ'রে নিয়েছেন—তা ত অস্বীকার করার নয়। * অবশ্য মার্কস বহু স্থলে কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকা ও সম্ভাবনার কথা পরে বলেছেন ; কিন্তু প্রধানতঃ ইংলণ্ডের অবস্থাকে মনের সামনে রেখে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি বিত্তহীন শ্রমজীবীকে-ই বা proletariat কে-ই একমাত্র বিপ্লবের যন্ত্র হিসাবে নিয়েছেন। আজ গান্ধী যদি এই ত্রুটি সংশোধন করেন, তবে তা ও স্বীকার ক'রে নিতে হবে। †

* অবশ্য পরবর্তী জীবনে আর্মেনীয় কৃষক বিদ্রোহের সংবাদের পর, তিনি কৃষকদের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন থাকতে পারেন নি। কিন্তু তবুও তার ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার শেষ কথা রেখে গেছেন—কারখানার শ্রমজীবীদের একাধিপত্য (Dictatorship of the proletariat), তার মধ্যে কৃষকের কোন স্থান-ই প্রায় নেই।

† বাংলায় Industry শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে চলছে শিল্প। Industrial area-এ বাংলা হ'ল—শিল্পাঞ্চল। আমার মনে হয়—এটা ভাষার ক্ষেত্রের পরিচায়ক এবং শিল্প শব্দটার প্রতি এতে অবিচার করা হয়। তাই আমি বাংলাতে ইণ্ডাষ্ট্রি লিখেছি। এমনি কিছুটা শব্দ ও বাংলায় বহু প্রচলিত করা হয়েছে।

অরুণাচলের ঋষি

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

রাত্রির তৃতীয় যামে তরুণ তাপস তন্দ্রিতাহত হয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে —কে যেন তাঁকে ডাকছে। কার ডাক্ তিনি শুনলেন, কে সে, কোথায় সে—কথাপুরাণে তিনি পড়েছেন,' তীর্থশ্রেষ্ঠ অরুণাচলের কথা, বালারুণের মত রোচমান, যার কেবলমাত্র নিত্য যার কেত্রে অধিষ্ঠান্। দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত বিনাবাধায় প্রীষ্মের পর বরষার ধারা, বর্ষার পরে শরৎসরৎ, আলোছায়ার লুকোচুরি খেলে, হেমন্তের দিগন্তে ফলল করে শস্যশালিনী পৃথিবী, আসে শীত, আসে ঋতুমুকুলিত বসন্ত, পরিব্রাজকের পরিক্রমার কিন্তু শেষ নেই—ক্লান্তিবিহীন পথ। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, খোঁজার আর বিরাম নেই—কোথায় তুমি! উন্মাদ হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান্ দেশে দেশে, আরণ্য কান্তারে—যেখা যাও যেখা যাও। হঠাৎ এক শুভক্ষণে দূর এলো—বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে উঠেছে নিষাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত একটি

রেখা, সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাচল—হাতছানি দিচ্ছে—এসো তুমি বন্ধু সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে আমার এই আশ্রমে। বিদ্যুৎদৃষ্টিতে দেখলেন তিনি পাহাড় বাস্তব, প্রাণময়, তার অণুতে অণুতে স্পন্দন্। ওই তো সেই জ্ঞানসুন্দর, চিরদাস রসিক, প্রশান্ত মহেশ্বর। কর কর করে চোখ দিয়ে জল পড়ে—কি অপরূপ জেগেই তুমি রেখা দিলে প্রভু 'চাড়ি রাখা যেয়ে আঁখকে আগে।

ইনিই তামিল দেশের বিখ্যাত মহর্ষি রমণ্—আজও অরুণাচলের পাদপীঠে তপস্যামগ্ন। ভারত ইতিহাসের প্রথম পরিচিত পর্ব্বে আমরা শুনেছি মানব কল্যাণ কামনায় ঋষিব্রত, ঋষিপত্নী আরণ্যক ঋষিদের কথা —কত শতাব্দীকাল ধোমধূম্রায়িত কলরবমুখরিত বেদগান। তারপর কতযুগ কেটে গেছে, কত শতাব্দী পার হয়ে মানুষ চলেছে, দেশে দেশে সৃষ্টির রূপ বদলেছে, সংস্কৃতির রূপান্তর, নতুন মত, নতুন রীতি চলতি পথে ভিড় জমিয়েছে, কত দুঃখ বেদনা, আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে পড়ল অন্তর্যামীর বন্ধুর পথ বেয়ে সে যাত্রা। শত বাধা বিপর্য্যয় ঘন সংঘর্ষের মধ্যেও ভারতবর্ষের সাধক কবি কর্ম্মী মনীষীরা ঋষিকুলের সেই পুরাতনী বাণী বহন করে চলেছেন আজও এই বিংশশতাব্দীর পঞ্চম পাদে গুহাগহ্বর আশ্রমের উপান্ত থেকে জনসমাকীর্ণ প্রান্তরে, প্রাণোৎসবের সার্থকতায়।

মহর্ষি রমণ্ সেই গোত্রেরই একজন। বাংলাদেশে অপরিচয়ের ব্যবধান ছেড় তাঁর সম্যক্ স্বীকৃতি হয়ত নেই। কিন্তু যাঁরাই এই তপোজ্জ্বল ঋষিকে তাঁর চিরশান্ত সমাহিত তপস্যার অপরূপ আসনে স্থির অচঞ্চল দেখেছেন তারাই মনে মনে নমস্কার জানিয়েছেন। বিখ্যাত লেখক পল্ ব্রন্টনের লেখাতেই তিনি প্রথমে প্রতীচির কাছে প্রচারিত হন্, A Search in Secret India, A message from Arunachala প্রভৃতি পুস্তকে।

মহর্ষি রমণ্ স্বয়ং তামিল ভাষায় তাঁর সাধন্ সন্ধানের গূঢ় কথা, কয়েকটি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তারই ভাবসমষ্টির একটু ক্ষীণ পরিচয় নীচে লিপিবদ্ধ হল।

যৌবনভূমি, ধ্যানী অরুণাচল
উর্দ্ধশীর্ষ, বিলীনাক্ষ হে অচল
উদয় অচল চূড়ার শুভ্র উপান্তে
সমীরিত আকাশের নিবীলিত সীমান্তে
দূর মহাকাল সততই আছ জাগি
যুগ যুগ ধরি তব ভক্ত লাগি
কে বলে তোমায় শুধু পাথরে গড়া অচঞ্চল
নির্বাক্ নিষ্প্রাণ্ নিশ্চল
নও তুমি নও তুমি
পাষাণ ভূখণ্ডের গিরিমরীভূমি
মনীলেখা ধরণীর বুকে
তুমি দিলে এঁকে
কালো ঘেরি মরকতরেখা
আলোক আলোর একটি লেখা
মগ্ন মহি গুহ
হিরণ্ময় হিরণ্যগর্ভ।
নবিতার দ্যুতি নবোজ্জ্বলা
তব অঙ্গন্ তলে কভু হয়নি নিষ্ফলা

হে প্রভু, শ্রাবণ শোভন্
মনপ্রিয়, মনোমোহন্
তোমাতে আমাতে
পরম প্রীতিতে
কি রীতিতে কহিলে উন্নন্
বচনহীন্ নিস্তব্ধ
মনপ্রাণ নিলে হরে
রূপরসে দিলে ভরে
ধ্যানময় সে তুমি
সব দুঃখ সুখ ক্ষয়ী
তাই নিয়েছি শরণ্
মঙ্গল জয়ী ঐ ধবুল চরণ
তোমার হৃদয় কন্দরে
মোর মন আজি মন্দরে।
আমি শুনেছি তব অশ্রুত ভাষা
নীরব বীরাত্মির অপ্রমত্ত আশা
অরুণাবীথির অমৃতে বর্ষিত স্পন্দনে
প্রতিটি ধূলির পত্রে অপরূপের মরণে

শুনেছি তব সাদর সাদগান
আকুতি ব্যাকুল আহ্বান্
নিঃসীম নৈঃশব্দ মাঝে
অনাহত একতারায় বাজে
প্রভুরে সাজাতে
প্রণীত মধ্যাহ্নে
রাত্রির গর্ভাগারে উদ্ভাসি
রিক্ততা পূর্ণতায় মহীয়সী
শান্ত শিব কল্যাণের সে বাণী
জলে স্থলে ব্যাপ্ত অনাদি
অন্তরের আঁখি দিলে খুলে
সৃষ্টি করা দুই দিলে মেলে
মনের মণিকোঠায়
পৃথকের সত্তা যেথা লুকায়
বিলুপ্তির বিরামতটে
চির চরমের ঘটে
পরিপূর্ণ একটি প্রণামে
সেই তুমি প্রাণারামে।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা · শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

(১১)

নীহারিকা সবই শুনল। বন্ধুমহলে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর এই রকম আলোচনা অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে করল—কিন্তু তার মুখ সে বন্ধ করবে এবং কি করে বন্ধ করবে? বাধা দিলে হবে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। আর প্রদ্যুম্নটাও এমন বোকা; মুখের মধ্যে যেন বুকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। রঘুবংশ পড়তে পড়তে যদি দেখল সে জানালার উপর দিয়ে মেঘ যেতে যেতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ওর মুখ দেখেই মনে হবে যেন ও বলছে—হায়, আজ আর আমার লিপি অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে পৌঁছাল না। কীট্‌স্ পড়া যখন হয়—মনে হয় বেচারার হৃদয়ে শত কীট দংশন করছে। আচ্ছা এমন সরলহৃদয় বন্ধুর প্রণয় পথ এত অসরল কেন? একই শতাব্দীর দুই যুগের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের এত প্রভেদ কেন?

তাই সে ঠিক করল যে প্রদ্যুম্নকে যুদ্ধাভিমুখী করতে হবে, আর তারই প্রয়োজনায় সুরধুনীকেও জাগাতে হবে। তার ফলে মোক্ষদা যদি ভাজব বনে যান তা বলতে যাও; তার নিজের মতে নিরহিত সংসারে বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে বলে যদি মনে করেন ত করতে যাও। বিপ্লব? হাঁ, ওই কথাটাই ঠিক। অতীত যখন বর্ত্তমানের কণ্ঠরোধ করে ভবিষ্যতের সঙ্গীত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে তখন বিপ্লবই চাই। বিপ্লব।

ওর মতে রবি ঠাকুরী নিইয়ে-পড়া হাল ছেড়ে দেওয়া বিলাপের সুরে আর চলবে না। সেদিন বন্ধু বহুক্ষণ তার ঘরে বসেছিল। বেশী কথা হয় নি। কোন ভাব বিনিময়ও হয় নি। শুধু সে জানতে পেরেছিল যে বাড়ীর সবাই সিনেমাতে গেছে। তারও আহ্বান ছিল কিন্তু নীচের স্টলে (স্টলস অর্থাৎ আস্তাবল নয়, মনমার। ওটাকে স্টল বলে, কারণ সেখানে সেঁটে বসতে হয়) তাকে একা বসতে হত আর সবাইকে—অর্থাৎ যে নিজেই তার কাছে সব, তাকে—বসতে হত আর সবার সঙ্গে উপরে চিকের আড়ালে, পুরুষদের সঙ্গে আড়ি করে। কাজেই প্রদ্যুম্ন বন্ধুর বাড়ীতে বিশেষ নিমন্ত্রণের অনুরোধে অভিনয়ের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছিল। থিয়েটারে যাবার সময় অল্পক্ষণের জন্য সুরধুনীর সঙ্গে একা দেখা হয়েছিল শোবার ঘরে; সে তখন অভিমানে ঘর ছেড়ে রওনা হয়ে যাচ্ছে। দুজনে বেশী কথা হয় নি, বাইরে যে সবাই সোরগোল করে অপেক্ষা করছে। কাজেই সে জানায় নি অভিমান, আর সুরোও বলতে পারে নি নিজে কি চায়। প্রদ্যুম্ন চুপচাপ এসে বসেছিল নীহারিকার ঘরে। বাক্যালাপ হয় নি, হয় নি অভিযোগ বর্ণনা বা অভিমান ব্যঞ্জনা। শুধু নীরবতা সরব হয়ে ঘরটী ভরে ছিল।

সেদিন রাত্রে প্রদ্যুম্ন চলে যাবার পর নীহারিকা অশান্ত উত্তেজনায় সারা ঘর পায়চারী করে কতক্ষণ কাটিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। রাত্রি গভীর হয়ে গেল, চাঁদ আকাশে হেলে গেল। সহরের শেষ 'বাসে'র শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, আর সে একটী সনেট রচনা করে তার পরে ধীরে ধীরে শান্তি পেল।

বিদায় আরতি শেষে নিশীথের বাঁশ
যদি ভারী হয়ে আসে শরিয়া তোমার,
যদি কভু বিরহার্ত্ত হৃদয়ের ভার
ভুলে যেতে চায় তব বসন্ত সন্ধ্যার
সীমন্ত সিন্দুর রাগ—সে হৃদয়খানি
দূরান্তরে বাড়াইব সাধনার বাণী
শুকরিয়া। যতটুকু তব স্পর্শভাণা
তোমারেও না জানায়ে এ দূর নিরালা
জীবন ভরাতে পারে, শুধু সে টুকুরে
যদি পাই—তার বেশী বাসনাত্ত সুরে
চাহিব না, প্রিয়ে। যাহা দিলে তৃপ্তি পাও,
যা ধরিয়া নিলে মোর মৌন বেদনাও

জ্বলিবে অনল হবে, তুমি দিয়ো তাই ;
সে আগুন ছানি' আলো লভিব সদাই।

কিন্তু আর এই উদাস বিধুর আত্মবিলোপে চলবে না। এখন চাই বিক্রম, চাই আক্রমণ। চাই বিপ্লব, চাই বিপ্লাবন। মোক্ষদার মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। যৌবন যে যায়। তার প্রত্যেকটী দিন, ঘণ্টা, প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যে চায় বিকাশ ও বিস্তার ; তাদের দাবীকে ঠেকিয়ে নিজেদের বুভুক্ষু দুষ্কার্ত্ত করে রাখা চলবে না আর। প্রদ্যুম্নকে প্রবাস করতে হবে যাতে সুরধুনীর মনে জাগে সুরঞ্জন আর নিজের মনে আসে সাহস নিজেকে স্বীকার করবার। ভ্রূক্ষেপে উপেক্ষা করো বাড়ীর চিরাচরিত দারাকে। শাশুড়ীর কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনো নববধূকে। নববিবাহিত দম্পতী কি মিলবে শুধু রাত্রির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে প্রেমাবিষ্ট মোহের মধ্যেই। প্রতিটী ক্ষণের প্রতি চিন্তা কর্ম্ম আমার সংভাগিনী যে—তাকে কি পাওয়া যাবে না সব সময় ইচ্ছা মাত্রই—এই বয়সে—যখন মনে নিত্য দোলা লাগছে, জীবনে জাগছে উচ্ছ্বাস ? তা ত হতে পারে না। অতএব ব্রাউনিং পড়াও সুরধুনীকে।

ইংরেজ কবি ব্রাউনিংকে প্রাচীনপন্থী পরিবারের কিশোরী বধূকে উদ্ধার করবার জন্য কেন ডাকা হল তা জানলে ইংরেজরা এদেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে নিশ্চয়ই। তার একটী কবিতাতে এক ইটালিয়ান ডিউক ফার্ডিনাণ্ড রিকার্ডি নামে আর একজন ডিউকের স্ত্রীকে ভালবাসতেন ; তাকে কামনা করে প্রত্যহ রিকার্ডি প্রাসাদের পাশ দিয়ে যান—আর বধূও তাকে ভালবেসে জানালা থেকে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারা পলায়নের বন্দোবস্ত করেও পালাতে পারলেন না। জীবনে পেলেন শুধু দৃষ্টি বিনিময়। ক্ষণস্থায়ী যৌবন স্বপ্ন মলিন হয়ে আসতে লাগল ; তাই বধূ তার আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপন করলেন বাতায়নে, আর নাচের উদ্যানে ডিউক প্রতিষ্ঠা করলেন তার নিজের প্রতিমূর্ত্তি। অনন্ত প্রেমের এই ক্ষুদ্র পরিণতিকে কবি বলেন পাপ। পূর্ণ মিলন হল না, প্রদীপ জ্বলল না মণিকোঠায় ; জীবনে ছড়িয়ে রইল অতিশাপ। সে কথা বুঝতে হবে প্রদ্যুম্নকে, আর বুঝাতে হবে সুরধুনীকে।

বলা ত সহজ, কিন্তু করার পথ কই ? বাগবাজারের উপর ব্রাউনিংএর বোমা ফাটালেও কোন ফল হবার আশা নেই। রক্ষণশীলতা হচ্ছে সবচেয়ে কার্য্যকর বিষ্ফল দেওয়াল, ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যাফল ওয়াল। আধুনিকতার কত বোমা কত গোলাগুলি এসে তাতে ঠেকে হতে গেল, এমন কি গেপে গেল। সে দেওয়ালে কাঁটাল ধরল, গাধুনী ফেলে পর্য্যন্ত গেল। তবু পড়বার নামটী নেই। অতএব দূর থেকে প্রতিবেগ নিতে হবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাকে বলে মোমেন্টাম।

তাই সে প্রদ্যুম্নকে পরামর্শ দিল সুরধুনীর পিত্রালয় থেকে আরম্ভ করতে। শূন্য ঘণ্টা অর্থাৎ জিরো আওয়ার ঠিক হল রবিবার বিকেল বেলা, সে সময় বাপের বাড়ী থেকে সে ফিরে আসবে স্বামীর সঙ্গে ; মোক্ষদার কবলে পড়বার আগেই একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে প্রচণ্ড ভাবে।

বাপের বাড়ীর কন্যা ও শ্বশুর বাড়ীর বধূ একই প্রাণী হলেও একই মন নয়। তারা দুজন সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথিবীর বাসিন্দা। একজন প্রভাত পদ্ম, আর একজন সন্ধ্যার সূর্য্যমুখী। একজন জেগে থাকে সারাদিনের আলো হাসি আনন্দের মধ্যে, অন্যজন নুয়ে আসে বিষণ্ণ সন্ধ্যার যৌনতায়। কাজেই সুরধুনীর জীবন প্রবাহের গতিমুখ ফেরাবার এই বন্দোবস্ত করা হল তার অজ্ঞাতে।

(১২)

কোন্ কবি বলেছিল ক্লান্ত দ্বিপ্রহর ? সে নিশ্চয়ই আসলে কবি নয়। দ্বিপ্রহরের মত সতেজ সক্রিয় মন প্রত্যুষেও পাওয়া যায় না। মধ্যাহ্ন সঙ্গীতের মত উদাত্ত গভীর সুর সন্ধ্যার পূরবীতে কোথায় ? দুটী প্রাণ আজ যেন জীবনের সঙ্গে খুলন খেলায় মেতেছে—অবিরাম, আত্মহারা, আনন্দোজ্জ্বল।

সুরধুনী। আজ তোমার কি হয়েছে বল ত ?

প্রদ্যুম্ন। কই, রোজ যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছুই নয়।

সু। উঁহুঃ, মনে হচ্ছে হয়েছে অনেক কিছু।

প্র। যদি হয়ে থাকে ত হতে দাও। অনেক কিছু ও কোন কিছুই না এ দুইয়ে মিলে থাক—যেমন করে আমরা মিলে আছি।

সু। না কই ? আমরা ত মিলি নি। তুমিই ত বল

যে আমাদের ঠিক মিলন হচ্ছে না। তোমার সেই ফার্গিণ 'হায় হায়' কবি কি বলে এ সম্বন্ধে ?

প্র। ও, সেই 'হাইনের' কথা বলছ ? প্রেমের প্রত্যেক পর্ব্ব সম্বন্ধেই তার কবিতা তৈরী আছে। সখি তবে অবধান কর।

তোমার নয়ন পানে চাহিয়াছি আমি
ব্যথা অবসান হয়ে ঘুম গেছে দূরে,
মধুর সরম মাখা অধরেতে চুমি
পূর্ণ হয়েছি আমি সব সুখ পুরে ;
তোমার বুকের মাঝে বক্ষ তার রাখি
আমরা বিরাম সুখ অলকায় পাই,
বলো সবে আমি শুধু তোমা ভালবাসি
আমি যে আঁখির জলে কাঁদিয়া তাসাই।

সু। থাক্ থাক্ কবিত্বোয়ানি, ওকথা শুনে আর কাউকে কাঁদতে হয় না।

প্র। কেন ? অতি আনন্দে মানুষ কাঁদে না ? তুমি বলবে যে তুমি আমায় ভালবাস, আর আমি কান্না সামলাতে পারব ?

সু। নাঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। কলেজে পড়েও মানুষের কাণ্ডজ্ঞান হয় না। না হলে বেটা অবশ্যই পাবে তা পাচ্ছ জেনে কেউ কাঁদতে চায় ?

প্র। কে বলে অবশ্যই পাব ? ওই তোমাদের সেকেলে পাওয়া—বিয়ে করে সিন্দুকে চাবী দিয়ে গদীয়ান হয়ে সংসারে বসাটাকে আমি পাওয়া মনে করি না।

সু। ও, তুমি বুঝি একেলে পাওয়া চাও ? প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে ফেসে বেড়ান। কম্যুনিষ্ট পাওয়া না কি একটা নাম হয়েছে আজকাল লোকে বলে। আচ্ছা কম্যুনিষ্ট কি ?

প্র। সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ কমন ইষ্টে সবার কম অনিষ্ট হবে বলে যারা মনে করে তারা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট। আমাদের কলেজে কয়েকটী লম্বা পায়রা আছে, লাল কাওতরালা সব পাওা কম্যুনিষ্ট। কারণ প্রাণটা তাদের নিশ্চিন্ত আছে পৈতৃক সম্পত্তির পাকা ভিত্তিতে। যাক ওদের কথা। চল আজ তোমায় কান্না সাগর দেখিয়ে আনব গঙ্গার বুকে।

"আমার রোদন ভুবন ব্যাপিয়া
দুলিছে যেন।"

সু। কোথায় সেটা ? আর কান্না সাগরই বা কেন ? তার চেয়ে চল না, হাসি সাগর যদি কোথাও থেকে থাকে।

প্র। দুই তোমায় দেখাব। সে কোন্ জায়গায় এখন তোমায় জানাব না। আমাদের গাড়ীটা নূতন এক ড্রাইভার চালিয়ে এনেছে। সে সব জানে। চল আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। মাকে বুঝিয়ে রাজী কর।

সু। বোঝাবারই বা দরকার কী ? ও বাড়ীতে বিকেলে কুটুমরা আসছে বললেই হবে। কেহ ত আর খবর নিয়ে দেখছে না। তুমি কিন্তু কাউকে বলতে পাবে না বলে দিচ্ছি। আর শোন, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা নেই। রাত্রে ফিরেও বাড়ীতে বলতে হবে যে এখানে অনেক লোক এসেছিল—তাই বের হতে দেরী হয়ে গেল।

প্রদ্যুম্ন ভাবছে এ কী পরিবর্ত্তন হল আজ সুরধুনীর। এ যে নূতন লোক, নব বিস্ময়ের আনন্দ ছড়াচ্ছে নিজের চারদিকে। নিজে থেকে সহজে ধরা দিচ্ছে। সাবলীল-ভাবে কথা বলছে, স্বাধীন বাতাসে প্রজাপতির মত রঙীণ পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে তার মন। আজ তার মায়ের পুত্রবধূ নয়, তার নিজের বঁধু—ইটালিয়ানে যাকে বলে 'কারা মিয়া'।

'কারা মিয়া'। প্রিয়া মোর। কথাটী মধুমালতীর মত কেবল মিষ্টই নয়, এতে ন্যাভেণ্ডারের গন্ধবৈচিত্র্যও আছে। এ যেন শুধু স্বদেশী সন্দেশ নয়, ভেনিসের নেগ্রো কেক। সনাতনী বাঙ্গালিনী চিরন্তনা অভিসারিকারূপে ধরা দিয়েছে আজ, কাছে আসতে চাইছে—খুব কাছে—সজীব সাজে—বুকের মাঝে। এ শুধু মন্ত্রের গ্রন্থিতে গৃহকোণে আবদ্ধ বিবাহিতা স্ত্রী নয়। এর মন জাগাতে হয়েছে, একে জয় করতে হয়েছে, একে পাবার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছে। সংখ্য জনের মধ্যে তুমি মাত্র সেই একজন—যে মান অভিমান লোকলজ্জা সব কিছুর পরীক্ষা পার হয়ে ওর মনের কাছে এগিয়ে এসেছে। তাই প্রাপ্তির পূর্ণতাও হয়েছে গভীর। বুকে ফুলের মালার

ব্যবধানটুকুও আজ সইছে না। দেহ সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে কিন্তু আত্মা অসীমে এসে মিলাবে। বধূ আজ হবে বঁধু।

গঙ্গার উদার উন্মুক্ত তীরভূমিতে মোটর হাওয়ার মত উড়ে চলল। সঙ্গে পাল্লা দিল দুটী উচ্ছল উন্মুখ প্রাণ—বাসনাব্যাকুল, মিলনমুখর, অনুরাগরঞ্জিত, পরস্পরসমাহিত। দেহের তটভূমিকে হৃদয়স্রোত এসে ছল ছল রবে স্পর্শ করে যেতে লাগল। আজ কাছে কেহ নেই, নেই কোন সংসারের বাধা বা সমরের বন্ধন। জনমানব বুঝি নেই পথে, জেটী থেকে ফিরছে না খালাসী কুলীর দল। সামনের ড্রাইভারটীও লোপ পেয়ে গেছে। তার মাথার ক্যাপ সামনের দিকে নীচু করে টানা, একমনে সে গাড়ী চালিয়ে চলেছে। সামনের সীট দুটীও পিছনের মাঝখানে কাঁচের পর্দ্দা টানা আছে। গঙ্গাবক্ষে শুভ্র ষ্টীমারগুলির শাদা ফানেল বাহির বিশ্বের অনন্তে ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের কোন একটার ভিতর থেকে কেতাবে নাচের বাজনা ভেসে আসছে—যেন মৃদু সমীরণ স্নিগ্ধ সলিলস্রোত স্পর্শ করে ওদের এসে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন কাল-বৈশাখীর মেঘ ঘন হয়ে নত হয়ে নেমে এসেছে নদীর উপর। ছিন্ন একটু মেঘের ফাঁক দিয়ে কনে দেখা আলো এসে পড়ছে সুরধুনীর লীলাচঞ্চল আনন্দোচ্ছল মুখে। শুধু প্রদ্যুম্ন আর সুরধুনী। ত্রিভুবনে আর কেহ নেই।

সু। শুনছ সেদিন থিয়েটারটা মোটেই ভাল লাগল না।

প্র। কেন? খুব ভাল পালাই ত ছিল। শুনলাম মা নাকি ঠিক করেছেন আমার যাবেন সেটা দেখতে।

সু। তা করুন। আমার ভাল লাগে নি। তবে থিয়েটারের আর এমন কি দোষ ছিল। ওরা ত ভালই করেছিল।

প্র। কি? কি বললে? ওরা ভালই করেছিল? তবু তোমার ভাল লাগল না? পরিহাসে তরল হয়ে সে আবার বলে উঠল—কেন? চিকের পিছনে এতগুলি চোখ—সবাই জমাট হয়ে বসে দেখছিলে, তবু ভাল লাগল না?

কিন্তু সুরধুনী আজ অন্যলোকে বিচরণ করছে। পরিহাসকে সে হাসিমুখে সরিয়ে দিল। সহানুভূতিতে কোমল দুটী আঁখি মেলে বলল—তুমি ত জান না ওই চিকের ঢাকনা আমার মনকে পাথরের মত চেপে রেখেছে। তুমি চাওনা এরকম, তা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি সাহস করে বেঁকে দাঁড়াতে পার না কেন? পার না কেন আমায় ওই শত বাধা লোকাচার আর সারাদিনের বিরহের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে? ওদের সামনে নিজেকে মনে হয় আমি নই, আর তোমাকেও দেখি এত অসহায়। কেন, কেন তুমি পার না?

ওর কণ্ঠে একটু উত্তেজনার আভাস এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে বিহ্বল হৃদয়াবেগে প্রদ্যুম্নর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। কি নিশ্চিন্ত নির্ভর, কি পরম পরিতৃপ্তি।

ক্ষণপরে সুরধুনী বলল—চল, আজ আবার আমরা থিয়েটারেই যাই। আর সেই থিয়েটারেই যাব।

প্র। কেন, সেটা ত একবার দেখলে? চল, বরং অন্য কোনটাতে যাওয়া যাক।

সু। না, সেটাতেই যাব। আমাদের বিয়ের পর প্রথম অভিনয়-দেখা এমন ভাবে অসমাপ্ত হয়ে থাকতে দেব না। সেদিন যা দেখেছি তা অভিনয় নয়, নিজের মনের অত্যাচার। আজ সেখানে গিয়ে দুজনে একসঙ্গে নীচের হলে সবার মাঝে বসে সেদিনটার উপর প্রতিশোধ নিব।

প্র। ঠিক, ঠিক বলেছ। চল, ওখানেই যেতে হবে। ড্রাইভার, চলো শ্যামবাজার।

ক্রমে ভীড়ের পথে মোটর চলতে লাগল। চার পাশে উৎসুক প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি, মোটরের কাঁচের জানালার খুব কাছে দাঁড়াচ্ছে ট্রামের যাত্রীর দল। একবার পথে পুলিশ গাড়ী থামালে—মনে হল সবাই গাড়ীর ভিতরের দিকে তাকাচ্ছে। আপনার অজ্ঞাতসারে সুরধুনীর মাথার ঘোমটা একটু নেমে এল।

প্রদ্যুম্ন লক্ষ্য করল। ভয় হল, এবার বুঝি তার ক্ষণস্থায়ী নবলব্ধ জীবনের উচ্ছ্বাস ও স্বাধীনতার উপর যবনিকা নেমে আসছে। সারা বিপ্রহরের অশিক্ষিতপটু প্রেমকূজনের পর গঙ্গাতীরের উদার প্রশস্ত বিস্তার সুরধুনীর মনে যে প্রবাহ জাগিয়েছিল পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত স্পর্শ লেগে তার গতিপথ ক্ষুণ্ণ হয়ে আসছে; জনতার ভীতিতে স্রোতস্বিনী

শুরু হয়ে যাচ্ছে : সংস্কার সংস্কার করতে সুরু করেছে সদ্য অর্জ্জিত স্বাধীনতাকে।

লঘু পরিহাসে গুরু আবহাওয়াকে সহজ করে তুলবার জন্য সে বলল—এই দেখ, এই রাস্তাতে কতগুলি সিনেমা নূতন গজিয়ে উঠেছে। এগুলিতে মেয়েদেরই এত ভীড় হয় কেন জান ?

ক্লান্ত, অনেকটা নিস্পৃহ সুরে সুরধুনী বলল—না, তুমি বল, কেন ?

প্র। দেশী ছবি দেখে ভবিষ্যৎ আর অনন্ত যৌবন সম্বন্ধে সবারই আশা হয়। মনে হয় যে যাক্, বয়স আর বাড়বে না। যতই মোটা হয়ে যাই, মুখে বয়সের রেখা পড়ুক, তবু তরুণী নায়িকা সাজা আমার আটকাবে কে ? কারুর চিকিৎসারও দরকার নেই। ওগো তুমি চিরপঞ্চদশী ?

সু। বা রে, বেশ ত। আর তোমরা বুঝি হতে চাও না চিরপঞ্চবিংশতি ?

প্র। চাই বই কি। কিন্তু দেয় কে ? নায়িকার যে প্রেম খোলে না নায়কের বয়স বেড়ে গেলে। দর্শিকারা দেয় না হাততালি, আর দর্শকরা দেয় গালাগালি। নায়িকাদের অবশ্য সাতখুন মাপ। সিনেমার পর্দ্দায় পাবে খাঁটী শিল্পীমনের পরিচয়। তাই ত দেশী ছবিগুলি অত কাঁপে।

সু। আর থিয়েটারে কি হয় ?

প্র। থিয়েটারে গেলে মনে হয় সারাটা জীবন শুধু অভিনয় করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। নাচো কাঁদো কথা কও সবেতেই বীর রস। ভীরু বাঙ্গালী জীবনে বীরত্ব আমরা পুষিয়ে নিয়েছি ওইখানে। ভাবের অভাবকে ভরে দিয়েছি কথার ভারে। এই যে এসে গেল দেখতে দেখতে। চলো আমরা অভিনয়ের মুখোমুখী হয়ে বসি আজ।

মোটরের ভিতর থেকে চারদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে অবগুণ্ঠন একটু নামিয়ে নিল সুরধুনী। হাত ধরাধরি করে দ্রুত সাবলীল গতিতে প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। নারী জেগে উঠেছে আজ অর্দ্ধেক মানবীতে ; অর্দ্ধেক কল্পনা এসে মিশে গেছে তার সঙ্গে। আজকের অভিনয় যেন না ভাঙ্গে ওদের জীবনে।

ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এসে ক্যাপটী খুলে চুলের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে নীহাররঞ্জন তখন স্মিত প্রসন্ন মুখে থিয়েটারের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

সমাপ্ত

* ভানিয়া

শ্রীউমাশশী দেবী বি-এ, বি-টি, সরস্বতী

সোফার কুশনের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মিলোচ্‌কা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সুন্দর গোলাপ ফুলের মত মুখখানি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে দিনটীর জন্য সে এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দিনটী আজ তাহার দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেছে ; কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

প্রথানুযায়ী ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তাহাদের খৃষ্টমাস উৎসবের নাচের মজলিসে যাইতে হয়। মিলোচ্‌কা তাহার যৌবনের প্রথম প্রভাত হইতেই এই দিনটীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আজ সকালে তাহার মা তাহাকে জানাইয়াছে যে, এ বছর টাকার টানাটানির জন্য নূতন পোষাক কেহই পাইবে না এবং সেইজন্য নাচের আসরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাই নয়, সেখানে যাওয়ার জন্য খরচ জোগাড় করা স্বপ্নের অতীত। এ নিষ্ঠুর আঘাতের জন্য মিলোচ্‌কা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

* একটী রাশিয়ান গল্প হইতে।

বাল্যকাল হইতে সে ভোগবিলাসের ভিতর দিয়া লালিত হইয়াছে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে তখনি। তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই সমস্ত সংসারটা যেন প্রবল ঝটিকায় ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মিলোচ্‌কারও সুখের জীবন শেষ হইয়াছে। তিনি যে সামান্য কয়েক হাজার রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা শেষ হইলে তাহাদের এখন নূতনভাবে সাধারণ জীবনযাপন করিতে হইতেছে।

খ্রীষ্টমাসের ছুটীতে মিলোচ্‌কা প্রচুর আনন্দ, প্রচুর আশা লইয়া বোর্ডিং হইতে ফিরিয়াছিল। সামাজিক নাচে সে তাহার মায়ের সহিত যাইবে বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল, আশা আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্তে মায়ের আদেশে ভাংগিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। খ্রীষ্টমাস উৎসবের জন্য বাড়ীতে সামান্য কিছু আয়োজন হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের দুঃখ লইয়াই বিব্রত হইয়াছিল। এমন সময় ঘরে ঢুকিল তাহার উনিশ বছরের ভাই ভানিয়া।

মিলোচ্‌কা তাহার সুন্দর মুখখানি ভানিয়ার দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"টানিয়াকে তোমার মনে আছে? সেই লাল চুল দুষ্টুমীভরা মুখ।"—ভানিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানায়, মনে আছে। মিলোচ্‌কা আবার বলিতে সুরু করে, "টানিয়া আর আমি কতদিন ধ'রে এই দিনটীর জন্যে প্রতীক্ষা করছিলুম। আমরা ঠিক করেছিলুম যে, সে পরবে তার গোলাপী রংয়ের ফ্রক, আর আমি পরব আমার সাদা মস্‌লিনের ফ্রক, কিন্তু মা আজ সকালে বল্লে, মস্‌লিনের ফ্রক হয়ত আসতে পারে কিন্তু নাচে যাওয়া চলতেই পারে না, মা নাকি তার ভাল কাপড়-চোপড় সব বেচে ফেলেছে"। মিলোচ্‌কা কুশনে মুখ লুকাইয়া আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভানিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বোনটীকে কাঁদিতে দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে দালানে আসিল। দালান হইতে সে সৎমা এন্ফার কুদ্ধকণ্ঠ শুনিতে পাইল—"আমাকে জ্বালাতন কোর না, বারবার বলছি না যে এবার খ্রীষ্টমাস ট্রী হবে না। যদি কান্না বন্ধ না কর, তাহলে ঘর থেকে বের ক'রে দেব।" একটু চুপচাপ কাটিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার এন্ফার স্বর শোনা গেলো, "কের কাঁদছো! শুনবে না আমার কথা! ওঠ, ওঠ, যাও নার্সারীতে।" এন্ফা রোক্তমুখী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে দরজা খুলিয়া দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল ভানিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে।

এন্ফা কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বেরুনো হচ্ছে শুনি।" ভানিয়া থতমত খাইয়া বলিল, "আমি এম্নি ফিরছি।"

এন্ফা কঠোর স্বরে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি চাই না যে তুমি সব সময় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও। আমি বুঝতে পারি না, তুমি বাইরে সব সময় কোথায় থাক। আজ দু'মাস ধ'রে দেখছি, শুধু খাবার সময় বাড়ী আস। কোথায় থাক, কি করো কিছুই বলো না, কিন্তু জানো ত যে তোমাদের সকল দায়িত্ব আমার ওপর। আর লোকেই বা বলবে কী? বলবে, সৎমা কিনা, তাই ছেলেটা কি ক'রে না ক'রে কোন খোঁজই রাখে না।"

ভানিয়া বলিল, "আমি তো অন্য কোথাও যাই না মা। আমি যাই আমার পড়া তৈরি করতে।"

এন্ফা বলিল, "আজ তোমার না গেলেই ভাল হত, বাড়ীতে অনেক কাজ, তুমি থাকলে তবু কিছু সাহায্য পাওয়া যেত। হ্যাঃ, আজকাল তোমার ঘরে সব সময় তালা বন্ধ থাকে কেন?"

ভানিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "সোনিয়া আর মিটিয়া পাছে আমার বই খাতাপত্তর ছিঁড়ে দেয়, সেইজন্যে তালা দিই।"

এন্ফা স্নেহের সুরে কহিল, "তবু ভাল এত সাবধানী হয়েছ।" বলিয়া সে কন্যাকে লইয়া নার্সারীতে ঢুকিল।

খাবার ঘরে বসিয়া মিলোচ্‌কা তখনও কাঁদিতেছিল। নার্সারিতে সোনিয়া আর মিটিয়া চোখের জলে ভানিয়া নার্সকে বলিতেছিল, আগে তাহাদের কত সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রী হইত। ভগবান তাহাদের বাবাকে তাহাদের কাছ হইতে নিজের কাছে লওয়ার দরুণ এবার আর তাহাদের খ্রীষ্টমাস ট্রী হইল না। বুড়ী নার্স ইহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। শত শত বৎসর আগে একটী দেবশিশু কেমন করিয়া আস্তাবলের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই গল্প বুড়ী ইহাদের

শুনাইতেছিল। ছেলেরা নিজেদের দুঃখ ভুলিয়া, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া সেই অদ্ভুত শিশুটীর কথা শুনিতে লাগিল।

এস্তা বিছানার উপর বসিয়া তাহার জীবনের সুখ, শান্তিপূর্ণ দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছিল। মনে পড়িতেছিল বাল্যের সেই আনন্দের দিনগুলির কথা—এতদিন সে মনের আনন্দে সঙ্গিনীদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত। কলেজের উচ্ছ্বসিত লীলাচঞ্চল দিনগুলি। সহপাঠিনীদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইত। অবশেষে সে ষোল বছরে পড়িল এবং সকলের মত লম্বা ফ্রক পরিতে পাইল। তাহারই মাত্র এক বছর বাদে অর্থাৎ সতের বছর বয়সে ভানিয়ার বাপের সহিত তাহার বিবাহ হইল। ভানিয়া তখন মাত্র এক বছরের শিশু। স্বামীকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং তাহাদের বিবাহিত জীবন সুখেরই হইয়াছিল।

মাঝে মাঝে যে খুঁটীনাটী বাধিত, তাহা ভানিয়াকে উপলক্ষ করিয়া। এস্তা কিছুতেই ভুলিতে পারিত না যে, অল্প কিছুদিন পূর্বেই তাহার স্বামী আর একজন রমণীকে তাহারই মত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সেই ভালবাসার চিহ্ন, ভানিয়া আজো বর্ত্তমান। আর এদিকে ভানিয়াও ছিল একরোখা—এস্তাকে সে কিছুতেই মা বলিয়া ডাকিত না, তাহার কাছেও আসিত না। সে তাহার যত অভিযোগ, অভিমান, আব্দার আবার কাছেই প্রকাশ করিত। এই মাতৃহারা পুত্রটীকে পিতা—পত্নীর চক্ষের আড়াল করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন।

এস্তা ভানিয়াকে কোনদিন ভালবাসে নাই, ভালবাসিবার চেষ্টাও করেন নাই এবং তাহার জন্য কোনদিন তাহার মনে কোন অনুতাপই আসে নাই। আজও তাহার চিন্তা ভানিয়াকে লইয়া নহে, তাহার নিজের পুত্র-সন্তানদের লইয়া। যে দারিদ্র্য রাক্ষসী হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে, সে তাহার করাল গ্রাস হইতে কেমন করিয়া তাহাদের বাঁচাইবে। কয়েক বছর আগেও সে তাহার পরিচিত মহলে রূপবতী বলিয়া গর্বিত ছিল। তাহার বিলাসিতার প্রাচুর্য্য ছিল। বিরাট বাড়ীতে ঝি চাকর পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীর মত থাকিত। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার লইয়া কত তর্ক করিয়াছে। কত জোরের সহিত বলিয়াছে, আজিকার যুগে পুরুষের নারীকে দাবাইয়া রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার।

কিন্তু আজ! এস্তা অশ্রু-সজল চোখে ঠোঁট কামড়াইয়া ভাবে, স্বাধীনতা আর সমান অধিকারটুকুই আছে, আর সব কবরে গিয়াছে। আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বাহিরে যত সৌন্দর্য্যই থাক না কেন, ভিতরটা একেবারে পুড়াইয়া গিয়াছে। আজ সে তাহার স্বামীর ভালবাসার দান-গুলিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া বাঁচাইবার চিন্তাই করিতেছে। এস্তার মনে পড়িল, তাহার স্বামীর বাঁচিয়া থাকিবার দিনগুলি। মনে পড়িল সেই মানুষটীর স্বহস্তনির্মিত সেই বিরাট ক্রীষ্টমাস ট্রী। কত লোক আসিত উৎসবে যোগ দিতে, ঘটা করিয়া চলিত আহার পানের পর্ব।

হঠাৎ এস্তার মনে পড়িয়া গেল খাবার সময় হইয়াছে। খাবার ঘরে আসিয়া এস্তা দেখিল ভানিয়া তখনও আসে নাই। সোনিয়া আর মিটিয়া পুরাণো তোলা পোষাকগুলি পরিয়াছে। মিশোচ্‌কার মুখ তখনও গম্ভীর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটী লাল হইয়া রহিয়াছে।

এস্তা ছেলেদের সুপ্ পরিবেশন করিতে করিতে অসন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভানিয়ার মন কেবল বাইরে বাইরেই থাকে।" ছেলেরা মায়ের মেজাজের উষ্ণতা বুঝিয়া চুপচাপ খাইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কেবল ছুরি কাঁটার টুং টাং শব্দই নীরবতা ভংগ করিতে লাগিল। হঠাৎ মিটিয়া তাহার গোলাপী গালদুটীকে ফোলাইয়া এবং ফোলাইয়া ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজিতে লাগিল এবং ঘরে কাহাকেও না পাইয়া চেয়ারের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, "নিয়ানিয়া, ভগবান কি তাঁর এঞ্জেলদের এতক্ষণে পাঠিয়েছেন?" নার্স বলিল, "হ্যাঁ, পাঠিয়েছেন বৈকি। তুমি চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও, নইলে আবার তারা উড়ে পালিয়ে যাবে।" হঠাৎ এঞ্জেলের নাম শুনিয়া এস্তার সঞ্চিত ক্রোধ আবার জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—"নিয়ানিয়া, খাবার টেবিলে আমি পরীর গল্প-টল্প ভালবাসি না।"

নার্স বলিল, "না, না—আমিতো পরীর গল্প বলছি না। আমি বলছিলুম ওরা যদি কান্নাকাটি না ক'রে, বেশ ভাল ছেলের মত থাকে তাহলে ওরা বেশ ভাল ক্রীষ্টমাস্‌ট্রী পাবে।"

এল্গা রাগিয়া বলিল—"ক্রীষ্টমাস টী পায় আর না পায়, তার সংগে এরেলদের সংগে কি সম্বন্ধ আছে?"

বৃদ্ধা নার্সের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিল, সে বলিল, "সে কি কথা মা, আপনি ওকথা বলছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে ক্রীষ্টমাস উৎসবের আগের দিন ভগবানের দূতেরা ধার্মিক লোকদের উপহার দিতে আসেন।"

এল্গা কিছু বলিবার আগেই সোনিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"মা—মা, ভানিয়া এসেছে।" মা রাগিয়াই ছিলেন, সোনিয়ার চীৎকারে আরো রাগিয়া কহিলেন, "এসেছে তো এসেছে, তোমার অমন ক'রে চেঁচানোর কি আছে।" ইতিমধ্যে ভানিয়া ঘরে আসিয়া তাহার চেয়ারে বসিয়াছে। এল্গা ভানিয়ার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" ভানিয়ার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিল,—"আজকে বছরকার দিনে তোমার অন্ততঃ একটু পরিষ্কার ভদ্রভাবের কাপড় পরা উচিৎ ছিল। আজকের ডিনারে কোন অতিথি নেই বলে কি তোমার একটু ভদ্রলোকের মত থাকতে নেই? কি অদ্ভুত তোমার দেখাচ্ছে দেখ ত।" এল্গা তাহার ছেঁড়া, ছোট কোট্‌টার দিকে আঙ্গুল দেখাইতেই ভানিয়া লজ্জায় লাল হইয়া গেল। নিজের প্লেটের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"আমার যে আর পরার কিছু নেই, সবই ছোট হয়ে গ্যাছে আর ছিঁড়ে গ্যাছে।"

এল্গা বলিল, "পাচ্চ তো কুড়ি রুবলেরও বেশী। বলি পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?" ভানিয়া আহত হইয়া এল্গার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কিন্তু আমি যা পাই তার সবই তো তোমায় এনে দিই।" এল্গা ইহার কোন জবাবই দিল না, ছেলেদের খাওয়ানোর দিকে মন দিল। সোনিয়া আবার নিস্তব্ধতা ভংগ করিল, বলিল—"মা, ভানিয়ার ঘরে আমি একটা সুন্দর ছবি দেখেছি। ভানিয়া সেটা মেঝেতে ফেলে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে কি সব আঁকছিল। ভানিয়া যদিও তার ঘরে আমায় ঢুকতে দেয় না—তবুও আমি সব জানি।"

এল্গা বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "ভানিয়া কি আজকাল ছবি আঁকা ধ'রেছ নাকি? সিক্সথ ফরমের ছেলে, যার পরীক্ষা আসন্ন, তার পক্ষে পড়াশোনা ছেড়ে ছবি আঁকাই উপযুক্ত বটে। অবিশ্যি সেজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

ভানিয়া কোন কথা বলিল না, প্লেটের উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িল। মায়ের বাক্য যন্ত্রণা তাহার কাছে নূতন নয়। জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সে ইহা সহ্য করিয়া আসিয়াছে। ভানিয়া যে আশা লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল তাহা ভাংগিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। একটী দিনের তরেও সে মায়ের স্নেহ পায় নাই, বাপের বাড়ীতে তাঁহাকে চির-অপরিচিতের মত কাটাইতে হইয়াছে। বাবা তাহাকে ভাল খুবই বাসিতেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এঞ্জিনীয়ার হওয়ার জন্য বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইত। কাজে কাজেই বাপের সংগ পাওয়া ভানিয়ার দুষ্কর ছিল। ভানিয়ার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা থাকিলেও বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যখন তিনি দেখিতেন ভানিয়া বিনাদোষে অন্যায় ব্যবহার পাইতেছে তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট কথা দ্বারা আদর করিতেন, বুঝাইতেন। বড় হইয়া ভানিয়া বুঝিল, পিতার সংসারে তাহার স্থান কোথায়? সংসার সহিত সম্পর্কের যদিও কোন উন্নতি হয় নাই তথাপি সে সংঘর্ষের আভাষকেও বাঁচাইয়া চলিত। প্রাণপণে চেষ্টা করিত তাঁহাকে খুশী করিবার। ইতিমধ্যে বাবা চিরদিনের মত তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া পৃথিবী ছাড়িলেন।

সমস্ত পরিবারের ভিতরেই একটা বিরাট পরিবর্তন আসিল। সেই বিলাসবহুল জীবন, ধনী বন্ধুবান্ধব, দাসদাসী সবই যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হইল। বাবার বহু টাকা রোজগার থাকিতেও মৃত্যুকালে পেনসনের অর্থ ছাড়া কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আজ তাহাদের বড় বাড়ী ছাড়িয়া একটী ছোট ফ্ল্যাটে বাস করিতে হইতেছে। ভানিয়া সংসারের এই দুঃখ কষ্ট দেখিয়া অবসর সময় কিছু কিছু রোজগার করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে তাহার স্কুলের বেতন ও তাহার ঘরের ভাড়াটা পোষাইয়া যায়। এল্গা অবশ্য প্রথমে ভানিয়ার রোজগারের কিছু লইতে চায় নাই, কিন্তু তাহার একান্ত অনুরোধে সে লইতে বাধ্য হইয়াছে। ছোট ভাই বোনগুলিকে সে নিজের চাইতেও বেশী ভাল বাসিত। স্কুলের পড়া শেষ করার জন্য সে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। ভানিয়া ঠিক করিয়াছিল, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া সে কোন টেক্‌নিকাল স্কুলে শিক্ষা লইয়া বাপের চাকুরী গ্রহণ

করিবে, বাপের মত অর্থ রোজগার করিয়া তাহাদের পরিবারকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ছিল তাহার স্বপ্ন, এই ছিল তাহার জীবনের আশা।

মায়ের কাছে অন্তায়ভাবে তিরস্কৃত হইয়া মনে সে অত্যন্ত ব্যথা পাইল কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, যাইবার সময় ভক্তিভরে মায়ের হাতে চুমা খাইয়া চলিয়া গেল। ভানিয়ার চুপচাপ স্বভাব দেখিয়া এস্তা ভাবিতেছিল পিতার সহিত পুত্রের কোথাও মিল নাই। ছেলেটা বোধ হয় তাহার মায়ের স্বভাব পাইয়াছে। হঠাৎ ভানিয়ার মায়ের কথা মনে পড়িতেই এস্তার বুকে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ইহাই এতদিন তাহার মনের অগোচরে তুষের আগুনের মত তাহাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করিতেছিল। এস্তা সকল কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে যাইবার জন্ত খাবার ঘরের দরজায় আসিতেই ভানিয়ার গলা শোনা গেল—"মা, মিলোচকা—শীগ্‌গির আমার ঘরে এসো। দেখ তোমাদের জন্তে একটা ভারী মজার জিনিষ করেছি। সোনিয়া আর মিটিয়াকে ডাক, তাদের জন্তে আমি খ্রীষ্টমাস ট্রী তৈরী করেছি, বাতিগুলো এখুনি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।" এস্তা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যেন সে কিছু ভুল শুনিয়াছে, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খ্রীষ্টমাস ট্রী করেছ?"

মায়ের কণ্ঠস্বরে লক্ষিত হইয়া ভানিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মা। তোমাদের আশ্চর্য করব ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলুম, বলিনি।" বলিয়া সে নিজেই নার্সারি হইতে সোনিয়া আর মিটিয়াকে আনিতে গেল। এস্তা তখনও বিস্ময়ের ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। যে ছেলের দিকে সে এতদিন ফিরিয়াও চাহে নাই, যাহাকে সে সংসারের প্রতি উদাসীন বলিয়া ভাবিয়াছে, সে ছেলে তাহাদের আনন্দের জন্ত গোপনে এমন একটী আয়োজন করিয়াছে।

ভানিয়া ইতিমধ্যে নার্সারিতে চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে "সোনিয়া, মিটিয়া শীগ্‌গির এসো, দেখে যাও ভগবান আমাদের খ্রীষ্টমাস ট্রী পাঠিয়েছেন।" ঘরের ভিতর সকলে ঢুকিয়া দেখিল, আলোয় আলোকিত হইয়া একটী সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রী সাজান রহিয়াছে। সোনিয়া ও মিটিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। মিলোচকা নিজের দুঃখ ভুলিয়া ভাইয়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ভানুয়া, দুষ্টু ছেলে, তুমি কি ক'রে এ সব জোগাড় করলে?"

"আরো কিছু আছে" বলিয়া, ভানিয়া একটী প্যাকেট খুলিয়া একটী খুব সুন্দর পোষাক-পরা বড় পুতুল সোনিয়ার হাতে দিয়া বলিল—"সোনিয়া এটা তোমার। আর মিটিয়া এটা তোমার চড়বার ঘোঁড়া" বলিতে না বলিতেই মিটিয়া চাকা-লাগানো কাঠের ঘোঁড়ায় চড়িয়া বসিল এবং চাবুক মারিয়া চাকার সাহায্যে চালাইতে লাগিল। ভানিয়া কৃত্রিম ভয়ে বলিল, "সোনিয়া সাবধান, ঘোড়ার কাছে দাঁড়িও না—এখুনি চাপা দেবে," বলিয়া সে নিজেই ভীতভাবে জড়সড় হইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। সারা ঘরে যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়া গেল।

এস্তার মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার প্রতি তাহার চিরাভ্যস্ত কঠোর দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এ কি! এতদিন তো সে ইহা দেখে নাই। আনন্দের উত্তেজনায় ভানিয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঘন আঁখি পল্লবের ভিতর দিয়া চক্ষুর দীপ্তি আনন্দে উত্তেজনায় উছলাইয়া পড়িতেছে; ইহা যে তাহারই মৃত স্বামীর হুবহু প্রতিমূর্তি। চোখ থাকিতেও এস্তা ইহা দেখে নাই বলিয়া মনে মনে নিজে বারবার ধিক্কার দিতে লাগিল। যে হিংসার বরফ জমা হইয়া তাহার মনকে শীতল কঠোর করিয়া তুলিতেছিল,—আজ বসন্তের উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাহা গলিয়া মাতৃস্নেহের রসে মনকে ভরিয়া দিল। সে অধীরভাবে ভানিয়ার কাছে আগাইয়া গেল। ভানিয়া বলিল, "মাগো, তোমার জন্তে এইটা" বলিয়া এস্তার হাতে সে একটী ছোট ভেলভেটের কেস দিল। কৌতূহলী এস্তা সেটি খুলিয়া দেখিল, লাল রংয়ের ভেলভেটের ভিতর একটী সোনার ব্রোচ, তাহার মাঝখানে স্বামীর মূর্তি অংকিত করা।

সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে এস্তা এই প্রথম মাতৃস্নেহে ভানিয়াকে চুমা খাইলেন। ভানিয়া আনন্দে মায়ের দুইহাত ঠোঁটে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে একটী প্যাকেট লইয়া মিলোচ্‌কার হাতে দিয়া বলিল, "আর কাঁদবে না তো? এইবার তুমি 'বল্' নাচের মজলিসে যেতে পারবে। আর মায়ের জন্তে

সাটিনও এনেছি।" মিলোচ্‌কা ততক্ষণে প্যাকেট খুলিয়া তাহার অতি সাধের অতি সূক্ষ্ম সাদা মস্‌লিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। মিলোচ্‌কা এইবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভানিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভাইয়া, কত লক্ষ্মী ভাই।" ভাইয়ের গলা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল সে, তাহার অত সাধের মস্‌লিন মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। এল্গা হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি একলাই তোমার ভাইকে আদর করবে, আর আমি বুঝি আমার ছেলেকে আদর করতে পাব না?"

এল্গা জীবনে এই প্রথম বলিল, আমার ছেলে। তাহার চোখ দুইটীতে মাতৃস্নেহ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার মাথাটী বুকের ভিতর রাখিয়া বলিল, "ভানিয়া বাবা আমার।" তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া ভানিয়াকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে তাহার বাল্যের আনন্দহীন দিনগুলির কথা ভুলিয়া গেল। যে মাতৃস্নেহের জন্য সে তৃষিতের মত ঘুরিতেছিল, তাহা পাইয়া আজ সে আনন্দ, প্রীতির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। মা ও ছেলে নির্বাক আনন্দে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহ ও প্রীতি দিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধা নার্স নিরানিয়া এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে পরিবারের এই আনন্দ মিলন দেখিতেছিল। সে চোখ বুজিয়া হাত দুইটি বুকের উপর রাখিয়া ভগবানের উদ্দেশে তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

এল্গা ভানিয়াকে কাছে বসাইয়া বলিল, "তুমি এসব জোগাড় করলে কি ক'রে বাবা?" ভানিয়া বলিল, "মা, তোমার দুঃখ দেখে ভাবতুম কি ক'রে আমি তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার করব। বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি কিছু কিছু প্ল্যান আঁকার কাজ জোগাড় করেই আমি এসব করেছি।" এল্গা প্রশ্ন করিল, "সোনিয়া যাকে ছবি আঁকা বলছিল সেকি তোমার প্ল্যান?"

"হ্যাঃ মা।" এল্গার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িল, অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "তুমি আর এতো খেটো না, এতে যে তোমার শরীর ভাল থাকবে না" ভানিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি ভাবছ কেন মা। এতে আমার কিছু হবে না। দেখ না আমি বাবার মত শক্ত হয়েছি, আমি বাবার মতন কাজ শিখছি। আর বাবার মত টাকা রোজগার ক'রে তোমাদের সবাইকে সুখে রাখবো।" মিলোচ্‌কার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক কিনা বল মিলোচ্‌কা?"

একটী সুন্দর সুমিষ্ট অনুভূতি এল্গার মনকে আবিষ্ট করিয়া দিল! ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে দুঃখ, ভয়, নিরানন্দ তাহাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহা যেন হঠাৎ কোন্ যাদুকরের মন্ত্রে দূর হইয়া আনন্দ আলোয় তাহাকে ভরিয়া তুলিল। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভানিয়াকে দেখিতেছিল, ঠিক তাহার বাপের মত শক্তিশালী পুরুষোচিত চেহারা, তেমনি পদবিক্ষেপে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ় বাহু তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিতেছে, "তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? আমি বাবার মতই শক্তিশালী হয়েছি।"—

মৃত্যুর পারে

রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(২)

আত্মা যে অবিনশ্বর এ বিশ্বাস বর্তমানে প্রত্যেক ধর্মের অনুগতের মধ্যেই বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু মানব ইতিহাসে এই বিশ্বাসের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। আদিতে সকল ধর্মে এই বিশ্বাস ছিল না। হিন্দুর প্রথম ধর্মগ্রন্থ বেদে অবশ্য পরলোকের কথা আছে। প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়ার ধর্মেও ছিল। কিন্তু ইহুদীদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মপুস্তকে পরলোকের কথা পাওয়া যায় না। মুসা পরলোক সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। মুসার পরবর্তী পয়গম্বরদিগের উপদেশের মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ থাকিলেও বন্দীদশা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ইহুদীদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পার্থিবজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাইরাস কর্তৃক বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে ইহুদীদিগের মধ্যে সাদুকি ও ফারিসি নামে দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মুসার উপদেশের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে কোনও কথা নাই বলিয়া সাদুকিগণ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতনা। কিন্তু ফারিসিগণ উক্ত মত গ্রহণ করে এবং সেই অবধি উহা ইহুদী ধর্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও তাঁহার শিষ্যগণ কেবল যে মানবাত্মার অমরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন তাহা নয়, জন্ম-পূর্ব অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সে বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। রোমে সিসিরো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাধারণ মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য অনেক যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন—বলিয়াছেন মৃত্যু মানবকে সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি দেয়, কিন্তু স্বর্গে সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এমন কথা কেহ বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন মৃত্যুতে সমস্ত বিনাশ হয়, যাহাদের সত্তা নাই তাহাদের দুঃখভোগও নাই। সিসরো বলেন, সিসিরো এবং প্রথম কয়েকজন সম্রাটের রাজত্বকালে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণে কখনও পরলোকে বিশ্বাস এমন ভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই।

কিরূপে পরলোকে বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বপ্নে মৃত মানুষের দর্শন হইতে এই ধারণার উৎপত্তি। মানুষ যখন স্বপ্নে মৃত আত্মীয়কে দর্শন করে, তখন মৃত্যুতে যে আত্মীয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই, তাহার এক অংশ এখনও বর্তমান আছে, এই কথাই তাহার মনে উদিত হয়। তাহারা মনে করে মানুষের একই আকৃতিবিশিষ্ট দুইটী দেহ, মৃত্যুতে মাত্র একটীর বিনাশ হয়, স্বপ্নে দ্বিতীয়টীর দর্শন পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় অংশটীই কালক্রমে "আত্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর (Herbert Spencer) এই মতাবলম্বী। আচার্য হাক্সলি প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বপ্নে তো কেবল মৃত মানুষই আমরা দেখি না, নগর অরণ্য প্রভৃতিও তো দেখিয়া থাকি। শীতের সময় বিন্দার বৃক্ষসঙ্কলিত উদ্যানকে যখন স্বপ্নে পত্রপুষ্পশোভিত অবস্থায় দেখি, তখন তো কল্পনা করি না, পত্র ও পুষ্পের দ্বিতীয় দেহ আছে। বাস্তবিক জীবাত্মার উৎপত্তি হয় আমাদের স্বকীয়-অনুভূতি হইতে। আমাদের মধ্যে যে এক অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব আছে, প্রতি মুহূর্তে আমরা তাহা অনুভব করি। আমরা দেখিতে পাই, সেই অপরিবর্তনীয় সত্তা আমাদের সমগ্র জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের অনুভব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছা সমস্তই সেই অপরিবর্তনীয় সত্তাতে আরোপ করি। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত আমাদের দেহে ও মনে প্রভূত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের personal identity অটুটই থাকিয়া যায়। এই অপরিবর্তনীয় সত্তাকে আমরা দেহ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে অভ্যস্ত এবং ক্রমে বুঝিতে পারি—আমাদের দেহ "আমি" নয়, যিনি আমাদের মধ্যে "আমি" পদবাচ্য সেই তাঁহারই। দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া যখন "আমি"কে দেখিতে আরম্ভ করি, তখনই আত্মার ধারণা হয় এবং তখনি প্রশ্ন উঠে—"মৃত্যুর পরে 'আমি'র কি হয়? দেহের সঙ্গে চিতার আগুনেই কি তাহার লয় হয়, অথবা তাহার পরিণাম ভিন্ন?"

জড়বাদিগণ বলেন, প্রত্যেক মানুষই অতি ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণ দৃশ্য প্রোটোপ্লাজম কণা (Protoplasm) হইতে উৎপন্ন হয়। প্রোটোপ্লাজম কণা ও জীবিতসত্তার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এক কোষবিশিষ্ট জীবের শারীরিক গঠনে কোনও পার্থক্য নাই। সেই ক্ষুদ্র প্রোটোপ্লাজম্ কণা মাতৃগর্ভে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া মানব-শরীরে পরিণত হয়। এই পরিণতি কালের মধ্যে ঠিক কোন সময়ে অমিশ্রর আত্মা আসিয়া শরীরে অধিষ্ঠান করেন? তবে কি ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে আত্মা আসিয়া শিশুর দেহ অধিকার করে? অথবা পরবর্তীকালে শিশু যখন বিমূর্ত্ত ভাবের (abstract thought) চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, তখনই আত্মার আবির্ভাব হয়? আত্মা কি বাহির হইতে আসিয়া দেহে প্রবেশ করে, না ভ্রূণ অথবা শিশুর মধ্যে অবস্থিত কোন কিছু ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া আত্মার পরিণত হয়? ইহা প্রত্যেক মানব শরীরে আত্মার আবির্ভাবের কথা। প্রোটোপ্লাজম্এর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না। আত্মা কি প্রাণের সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিল, না প্রোটোজোয়া হইতে মানবে পরিণতি লাভ করিতে যে বিপুল সময় লাগিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনও এক সময়ে আত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল? যদি মানবেই আত্মার প্রথম আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মা কি সম্পূর্ণ নূতন কোনও পদার্থ অথবা জীবশরীরে বর্তমান কোনও পদার্থের পরিণতি?"

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নানা ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় মতবাদে প্রভাবিত পাশ্চাত্য জগতে মানবাত্মার জন্ম-পূর্ব অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না। ইহার জীবের আত্মা আছে, ইহা স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তি-গুলি সহজেই উত্থাপিত হইতে পারে। তাঁহাদের পক্ষ হইতে ঐ সমস্ত আপত্তির উত্তর আছে, আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহারা বলেন, ইহার জীবে যে চৈতন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মানবাত্মা তাহারই পরিণতি, ইহার জীবনের চৈতন্য তাহাদের প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণশক্তি রাসায়নিক (Chemical) ও ভৌতিক (physical) শক্তির অভিব্যক্তি। ভৌতিকশক্তি যুগযুগ অতিক্রম করিয়া যখন মানবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তখনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি ছিল না। পৃথিবীর উত্তাপ তখন এত বেশী ছিল, যে রাসায়নিক শক্তির প্রকাশিত হইবার অবকাশ ছিল না। তাপ বিকীরণ দ্বারা যখন পৃথিবী শীতলত্ব প্রাপ্ত হইল, তখনি রাসায়নিকরূপে নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। ইহার পর যুগের পরে যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, অবশেষে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অবস্থা প্রস্তুত হইলে প্রাণশক্তিরূপ আর এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। আবার যুগের পরে যুগ অতিক্রান্ত হয়, প্রাণ উদ্ভিদ হইতে উদ্ভিতরূপে পরিগ্রহ করে। অবশেষে যখন সময় পূর্ণ হইল, তখন প্রজ্ঞা, অহংজ্ঞান ও নৈতিকজ্ঞান সহ মানবাত্মা আবির্ভূত হইল। কিন্তু এই মতের সহিত অমরত্বের সামঞ্জস্য কোথায়, বুঝিতে হইলে "আকস্মিক অথবা অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তিবাদ" নামক নূতন দার্শনিক মতটী বুঝিতে হইবে।

গ্যালিলিওর সময় হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুবাদ দ্বারা জগতের

সমস্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মতে বর্ণ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি গৌণ গুণ সকল (Secondary qualities) পরমাণু সমূহের অনুরূপ কম্পনের ফল। জড় পদার্থ অণু পরমাণুর (molecules, atoms, protons, electrons প্রভৃতি) সমষ্টি, এবং অনুবিশ্বের কম্পনের সঙ্কেত। জড়ের গৌণ গুণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (Perception) সম্বন্ধ যে আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে অণুর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কম্পন দ্বারা নির্দ্দিষ্টবর্ণ বা শব্দে, অথবা তাপের প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অণ্ডাকার (elliptical) কক্ষ কেন ভ্রমণ করে, গণিতের সাহায্যে তাহা বোঝান যায়। Binomial Theorem এর সত্যতা অঙ্কটী যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু বায়ু বা কম্পন দ্বারা শব্দের জ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, ইথারের কম্পনে কেন আলোর প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে, তাহা এরূপ কোনও যুক্তির দ্বারা বোঝা যায় না, কেননা বায়ু ও ইথারের কম্পন ও উত্তাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। তারপর জৈবিক বিজ্ঞানের বিষয়দ্বারা রাসায়নিক (Chemical) বিষয়ের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। রসায়ন শাস্ত্রের বলে দুই আয়তনের জলজান (Hydrogen) এবং এক আয়তনের অম্লজান (oxygen) মিলিত হইলে জলের উৎপত্তি হয়। ইহার ব্যাখ্যার জন্য বলা হয় একটী অম্লজান পরমাণুর সহিত দুইটী জলজান পরমাণুর (affinity) আছে ; এইজন্য অম্লজানকে বলা হয় দ্বাণু সংসক্ত এবং জলজানকে বলা হয় একাণু সংসক্ত। কিন্তু জৈবিক বিজ্ঞান অম্লজান ও জলজান পরমাণুর বৈদ্যুতিক গঠন সম্বন্ধে এমন কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যাহা দ্বারা জলজান একাণু সংসক্ত হইবে এবং অম্লজান, দ্বাণু সংসক্ত হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

জৈবিক নিয়ম দ্বারা যেমন রাসায়নিক কার্য্য বোঝা যায় না তেমনি জৈবিক ও রাসায়নিক নিয়ম দ্বারা প্রাণ ও চৈতন্যের ব্যাপার সকল ব্যাখ্যা করা যায় না। জৈবিক বিজ্ঞানে ও রসায়নে 'উদ্দেশ্যের' কোনও স্থান নাই। কোনও জৈবিক কার্য্য বা রাসায়নিক কার্য্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত হয় না। কিন্তু প্রাণের যাবতীয় কার্য্যই উদ্দেশ্যমূলক, প্রত্যেক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কৃত হয়। জীবজগতের যে জীবন সংগ্রাম Darwin জীবন-অতিব্যক্তি ব্যাখ্যার প্রথম সূত্রে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই জীবন যে উদ্দেশ্য-মূলক তাহা প্রমাণিত হয়। জৈবিক ও রাসায়নিক বিজ্ঞান হইতে এই ব্যাপারের যে আলোচনা হয় তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা হইতে যুক্তি দ্বারা এই জীবন-সংগ্রামের অস্তিত্ব উৎপাদন করা যায়, যাহাকে জীবন-সংগ্রামের কারণরূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। মস্তিষ্কের জৈবিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের মানসিক ব্যাপারের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অবশ্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আগে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু কেন এ সম্বন্ধ—কেন বহির্জগতের সহিত আমাদের সে অনুরূপ সম্বন্ধকে আমরা "জ্ঞান" বলি, মস্তিষ্কের পরমাণুর গতি দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয়—এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে Samuel Alexander প্রমুখ চিন্তাশীল দার্শনিকেরা জড় ও জড় পরমাণুর স্পন্দন দ্বারা সমস্ত বিশ্বের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে যদিও চৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য মেরুদণ্ড ও প্রাণের প্রয়োজন, প্রাণের আবির্ভাবের জন্য রাসায়নিক সংযোগের প্রয়োজন, রাসায়নিক সংযোগের জন্য পরমাণুর প্রয়োজন, তথাপি এই সকলের মধ্যে কোন একটির আবির্ভাবেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না। নূতনের এই আবির্ভাবকে তাঁহারা Emergent Evolution নাম দিয়াছেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বোঝা যাইবে চৈতন্য ও জ্ঞান জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জড় কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় না। অভিব্যক্তির ইতিহাস ব্যক্তিগঠনের ইতিহাস। অসীম শূন্য মধ্যে অসংখ্যপ্রটোন ও ইলেক্ট্রন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্ট্রনের সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের (element) যখন সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন হইতে ব্যক্তিগঠন আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে নূতন দ্রব্য সৃষ্টি ব্যক্তিগঠনের দ্বিতীয় স্তর। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সমবায়ে উদ্ভিদ ও জীবদেহ সৃষ্টি তৃতীয় স্তর; সর্ব্বশেষ স্তর অহংকারিক একত্ব ও নৈতিক জ্ঞান সমন্বিত মানবের আবির্ভাব। ইহার জন্য যুগযুগান্তর ব্যাপী অতিব্যক্তি ধারা প্রবাহিত। যুগযুগান্তর ধরিয়া মাতৃগর্ভে মানবভ্রূণ শায়িত ছিল। পিতৃ শোণিত কণা মাতৃগর্ভে যেমন ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, মানব ভ্রূণ ও তেমনি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির গর্ভে পরিপুষ্ট হইতেছিল। রাসায়নিক শক্তি ও প্রাণশক্তির আবির্ভাবে ভ্রূণের আবির্ভাবের ক্রম। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভস্থ শিশু যেমন মাতৃশরীরের অংশ মাত্র থাকে, নাড়ি নাড়িদ্বারা মাতার শরীর হইতে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়, মানব ভ্রূণও তেমনি প্রকৃতি-গর্ভে প্রকৃতির অংশ রূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। অকস্মাৎ তাহার নাড়ি নাড়ি ছিন্ন হইয়া গেল, প্রকৃতির সহিত যোগসূত্র কাটিয়া গেল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া সে প্রজ্ঞা ও নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানবরূপে দাঁড়াইয়া উঠিল। ব্যক্তির গঠন তখন সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেহ ও মস্তিষ্ক যখন প্রজ্ঞা ও অহংকারকে প্রকাশিত করিবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই প্রজ্ঞা ও অহংকার অবধি পূর্ণ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিল; স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করিয়া অধিমনের অমর জীবন দান করিয়াছিল। প্রজ্ঞা ও অহংকারের আবির্ভাবের পর হইতে দেহ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন হইল। গর্ভস্থ শিশুর শরীরের গঠনের সহিত সমাক পুষ্ট ভ্রূণের শারীরিক গঠনের বিশেষ পার্থক্য নাই; প্রসবের অব্যবহিত পরেই শিশু গর্ভার সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেখানে সে মাতৃ শরীরের অংশ নয়, স্ব-প্রতিষ্ঠ।

CU

এই পরিবর্তন তাহার প্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে মানবের প্রথম আবির্ভাবের সময়েও শারীরিক গঠনের পরিবর্তন তেমন বেশী কিছু ছিল না, অভিব্যক্তি ধারায় যে জীবদেহ প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) ও আকস্মিক পরিবর্তন সূত্রে মানব দেহে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সহিত নূতন দেহের হয়তো বেশী ভেদ ছিল না, মানসিক গঠনেও ভেদ হয়তো সামান্যই ছিল, কিন্তু মানসিক জগতের যে স্তরে এই নূতন জীব প্রাথম লাভ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রগতির বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ ছিল। বর্তমানে শিশুর জন্মকালেও অতীতে মানবের প্রথম উদ্ভবকালে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই নূতন শক্তিবিশিষ্ট নূতন জীবের আবির্ভাব, পুরাতন জগৎ হইতে নূতন জগতে প্রবেশ, উচ্চতর জগতে জাগরণ। একমাত্র মানবই প্রকৃতি হইতে পৃথক জীবন যাপনে সমর্থ। পৃথক হইলেও প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নয়, প্রকৃতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতা না হইলেও ধাত্রী বটে। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে প্রকৃতির স্তন্য পান করিতে হয়, মৃত্যুর পরে হয়তো পূর্ণ স্বতন্ত্রতা।

অহংকার অথবা আত্মজ্ঞানের মূল ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ যখনি ছিন্ন হয়, তখনই অহংকারের উদ্ভব হয়। অহংকার হইতেই স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক দায়িত্ব বোধের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের সহিত স্বকীয় সম্বন্ধের অনুভূতি এবং সীমাহীন উন্নতি লাভের সামর্থ্য জন্মে। ব্যক্তিত্বের অর্থ স্বতন্ত্র আত্মিক জীবন ও অমরতা। কোনও জীবজন্তুর মধ্যে শিক্ষা দ্বারা যদি আত্মিক জ্ঞান উৎপন্ন করা সম্ভব হইত তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে নৈতিক দায়িত্ব-বিশিষ্ট জীবে পরিণত হইত এবং অমরতা লাভ করিত।

উপরি উক্ত আলোচনায় জড়বাদীদিগের প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গেল তাহা এই :—

(১) ইতর জীবে আত্মা নাই, অমরত্বের দাবীও তাহাদের নাই। তাহাদের চৈতন্য আছে সত্য কিন্তু আমিত্ব নাই, আমিত্বই অমরতা দান করে।

(২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যখন আমিত্বের জ্ঞান প্রকৃতি হইতে স্বাতন্ত্র্যভাবে লাভ করে তখনি তাহাকে আত্মা বলা যায়।

(৩) অভিব্যক্তি ধারাতেও যখন আমিত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখনই আত্মার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে নয়।

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সহিত এসিয়া মহাদেশকে সমপর্য্যায়-ভুক্ত করিতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ নাই। সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের নৈকট্য প্রমাণ করিতেও আমাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। মূল মহাভারত পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতকামী বহু ব্যক্তি বহুবার রাজাকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ করিবার অজস্র চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছিলেন। সাবধানী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার দিগ্বিজয়ী সহোদরদের ভীমার্জ্জুনের আগ্রহাধিক্যকেও প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই। দ্বারকায় তাঁহার একজন হিতৈষী বান্ধব বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই এই সংবাদ প্রকাশ পাইবামাত্র দ্বারকায় দূত প্রেরিত হইল ; দ্বারকাবাসী বন্ধুও অবিলম্বে পাণ্ডবপ্রস্থের নবীন রাজধানীতে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, ভাই, সকলে আমাকে বলিতেছেন রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ; কিন্তু আমি যজ্ঞাধিকারী হইয়াছি কিনা তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই জন্যই আমি তোমার পরামর্শ যাচ্ঞা করি। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

বস্তুতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন একচ্ছত্রাকার রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহার, যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একচ্ছত্র সম্রাট। যুধিষ্ঠির 'দ্বারকাবাসীন্' বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই জানিতে চাহিলেন, আমি কি সম্রাট ?

শ্রীকৃষ্ণকে এ প্রশ্ন করার কারণ ছিল। তদানীন্তন সমাজে তিনি ছিলেন সমাজপতি, রাজারও উপরে, সম্রাটেরও উর্দ্ধে ; অধিকন্তু তিনি নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও সত্যদর্শী। সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠিরের তাঁহার উপর অন্ধ নির্ভর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ, মগধসম্রাট জরাসন্ধ থাকিতে আপনার বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ত দেখি না। আপনার রাজসূয় যজ্ঞের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না এবং আমার আশঙ্কা হয়, সম্রাট জরাসন্ধও তাহাতে বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারেন।

আমাদের এই ভারতবর্ষ একদা এসিয়ার অধিনায়কত্ব করিতেন। বহু বিদ্যার কোতি করিলেও ইতিহাস ইহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। তারপর, একদিন ভারতের মত এবং ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশাল এসিয়ার উপরও দুঃখনিশার ঘনান্ধকার নামিয়াছিল। তথাপি, এসিয়া পরিব্যাপ্ত দুঃখ, দুর্দ্দশা ও পরাধীনতার মধ্যেও অল্পদেশে এসিয়া সম্মিলনের প্রস্তাব মাঝে মাঝে নানাভাবে উঠিয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদালি, চিত্তরঞ্জন দাশ, এমন কি পণ্ডিত জওহরলালও এসিয়া ফেডারেশনের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু 'দ্বারকাবাসীর' সম্মতির অভাবে

প্রস্তাব 'উথায় হুবিলীয়ে'। সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের সর্বপ্রধান স্বপ্ন ছিল, একত্রিত এসিয়া। 'হারকাবাণী'র অলিগার্কি-দরবারে তিনিও হাজিরা করিয়াছিলেন; কিন্তু গান্ধীজীর মুখ দিয়া ক্ষুদ্র একটি একাক্ষরের 'হাঁ' বাহির করা সম্ভব হয় নাই। তা যা হৌক, সুভাষ তাঁহার সাধনার বলকে ক্ষেত্রান্তরে ও জগতান্তরে সার্থকতা দান করিয়া যাওয়ার যে কীর্তি স্থাপিত করিয়া অনন্ত কালসমীপে যে যাত্রা প্রেরণ করিয়াছেন, অনন্ত জগত অনন্ত কাল তাহা স্মরণ করিয়া ধন্য হইবে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে হারকাবাণী'র সম্মতি মিলিয়াছে; এরাদফ "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। ১৯৪৭ সালের ২১এ মার্চ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ সংলগ্ন ক্ষেত্রে দিল্লীর পুরাণ কেল্লায় এসিয়ার রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল।

জওহরলাল রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও এই রাজসূয়-জওহরকে রাজচক্রবর্তী সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করিবার জন্য আসিতে হয় নাই। ইহাকে এসিয়ার রাজসূয় বলাই সঙ্গত। এসিয়া এসিয়ার রাজচক্রবর্তী; এসিয়া এসিয়ার সম্রাট; এসিয়ার এসিয়ার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং এসিয়ারই এই যৌবন অভিষেক। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আজ রবীন্দ্রনাথ নাই, যৌবনে রাজটীকা কে আর তেমন করিয়া দিতে পারিবে? এসিয়াকে দুর্বল, অসহায় ও নাবালক বোধে পাশ্চাত্যের মুষ্টিমেয় অথচ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কখনও একক, কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এসিয়ার উপর শাসন ও শোষণের কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কালপ্রবাহে, সাগরে জলোচ্ছ্বাসের মত, বর্ষাকালে নদীর বালির বাঁধের মত, যৌবনাগমে যুবতী নারীর লজ্জা সঙ্কোচের আচ্ছাদনের মত একটির পর একটি সাগ পাশ ছিন্ন করিয়া এসিয়া তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়াছে। কেহ সম্মুখ যুদ্ধ, কেহ গেরিলা যুদ্ধ, কেহ কূটনৈতিক যুদ্ধ করিয়াছে, হয় ত বা এখনও করিতেছে; আর কেহ বা অভিনব ও অপূর্ব অহিংস যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছে। লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য অভিন্ন; স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। বিশাল মহাদেশ এসিয়ার আজ বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অস্ত্র শস্ত্র অক্ষয় ও অকর্মণ্য। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা বিরহবাসরে এসিয়া আজ বিজয়া সম্মিলনীতে মিলিত হইয়াছে। বিজয়া সম্মিলনের সর্বপ্রধান অঙ্গ, পাকিবারি সিকন। পুরোহিত ভাষতে; 'তাই এসিয়ার সমাবেশ, ভারতবর্ষে।

এ যেন সেই—

"ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?"

প্রবাস-শেষে, এসিয়ার সন্তান-সন্ততির উৎসব-মূলে এই শুভ-সমাগম! এসিয়ার ইতিহাসে এই ঘটনা অভিনব ও অবিস্মরণীয়। এসিয়া এক ও অখণ্ড, এ তারই শুভ সূচনা।

এসিয়া মহাসম্মিলনের ক্ষেত্র ভারত ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে?

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান

অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, বর্তমানেও বিশাল হিন্দু ভারত যে প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করিয়াছে তাহারই বা তুলনা কোথায়? তখু আজ ভারত পুরাপুরি স্বাধীন হয় নাই, তথাপি [illegible] হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের আত্মপ্রাকুলতা কে [illegible]? আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ভারতের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে যে তৎপরতা দেখাইয়াছে, পৃথিবী কি অন্ধ, তাহা দেখে নাই? ভারতের আত্মিক ও নৈতিক বল যে শত সূর্যের কিরণচ্ছটার বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছে; সমগ্র বিশ্বে যাহার কল্পনা স্তম্ভিত হইল, ভারতের নিকটতম প্রতিবাদী এসিয়ার দেশসমূহের নিকট কখনই তাহা অজ্ঞাত, অদৃশ্য ও অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। পৃথিবীর সহিত এসিয়াও প্রেম, সত্য ও অহিংসারচিত যে মহা-সঙ্গীত শুনিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতল তল হইতে পূর্বস্মৃতি সোনার আখরে জাগিয়া উঠিয়াছে; ভারতের নেতৃত্ব তাহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত এসিয়াকে দেখাইয়াছে, বিনা অস্ত্রে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, শুদ্ধমাত্র নৈতিক বলে প্রবলের প্রহরণ-সমূহ অভিযানও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ভারতই পৃথিবীকে দেখাইয়াছে যে অর্দ্ধবিবিজয়ী সম্রাটের সাম্রাজ্য-প্রাসাদও নিঃসহায় নিরস্ত্রের বাসনাবাষ্পের তপ্ত সহিতে পারে না, ভূমিকম্পে অট্টালিকার মত ভূমিসাৎ হয়। যে যুগে এটম্ বমের প্রস্তুতির জন্য অর্দ্ধবিশ্ব সন্ত্রস্ত এবং অপরার্দ্ধ অপহরণোদ্যোগে উদ্ভ্রান্ত অধীর, সেই যুগে সেই পৃথিবীতে এমন এক কটীবাসপরিধান দীর্ণকায় জীর্ণ-করনিখে মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে—যে লোক একত্রিত এসিয়াকে বিদ্বিজয়ের বর দান করিয়েছে, অথচ কাহারও হাতে একখানি অস্ত্র দেয় নাই, মুখে হিংস্র বা ধ্বংসাত্মক একটি শব্দ দেয় নাই! এসিয়া সেই বার্ত্তা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছে; ইয়োরোপ আমেরিকাও শুনিয়াছে। কর্ণ যদিও বেতারা আজও থাকিয়া থাকেন তাঁহারাও শুনিয়াছেন। যে কালে প্রবল অহমিকা দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজকীয় বিশুদ্ধ পালভরা অভিযান প্রয়োগে অপকর্ম্মগুলিকে রাষ্ট্রিক আভরণে আবরিত করিতেছে, যে

প্রবেশ তোরণ—পুরাণো কিল্লা

ফটো—হরেন্দ্রকুমার ঘোষের সৌজন্যে

কালে নরপশুতে নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, ধর্ম্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বর্ব্বরোচিত পাশবিক অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যহ পরোক্ষে রাজনৈতিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত হয় না, হয়! সেই কালেও এবং সেই মনুষ্যত্বেও অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষকে প্রেম ও অহিংসার শান্ত স্নিগ্ধ ও অভয় মন্ত্রে নির্ভয় করিবার মানুষ যে কেবলমাত্র ভারতেই বিদ্যমান, সেই ভারতে, মহামানবের সেই লীলাক্ষেত্রে এসিয়ার দুর্যোগপাপ হইবে না ত কোথায় হইবে? সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তথাগত বুদ্ধ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে বীজ আজ বপন করিলেন, তাহাই একদিন মহামহীরুহের আকার ধারণ করিয়া বর্ত্তমান লোকক্ষান্ত পৃথিবীকে অভয় ও আশ্রয় দান করিবে, এসিয়া মহাসম্মিলনের বসন্ত-সন্ধ্যায় ইহার কল্যাণে তাহারই পূর্ব্বরাগ সঙ্গীত গীত হইতে শুনিলাম।

বিজয়া সম্মিলনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে জওহরলাল বলিয়াছিলেন, "এখানে আমরা রাজনীতি চর্চ্চা করিব না।" এত বড় কথা বলিতে ইতিহাসে যেদিন পারেন না, ক্রাঁসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পারেন না, মার্কিন ষ্টার্সপ্রিংগ পারেন না, সোভিয়েটের হাতোড়ও পারে না; কিন্তু ভারতের জওহর নিঃসঙ্কোচ। ভারত ত্রিলোকে, নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার; ভারতের ধর্ম্ম নিষ্কাম। সিংহাসন অধিরোহণ ও বনবাস ভারতের নিকট তুল্যমূল্য ও অভিন্ন। ভারতের জওহরলাল তাইকোচেট ষাউইথ্যাটেনের টেবিলে বসিয়া খানা খাইয়া তাজী বস্তিতে আসিয়া ত্রিপ্ল চ্যাটাইয়ে বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতে দ্বিধা করে না। বিরাট ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালন ভার (বর্ষিত আংশিক) যখন গ্রহণ করিয়া এই জওহরলালই অনুরাধিজির ধরিত্রীকে অভয় বাণী শুনাইয়াছিল, ভারতের অপ্রেমের ধনবল, জনবল, ভারতের মনে অফুরন্ত ধনবল, মৃত্তিকাভ্যন্তরে অপরিমিত খনিজ সম্পদ। অদূর ভবিষ্যতে যেদিন আসিবে যেদিন ভারত, শুদ্ধমাত্র এসিয়ারই নয়, সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বাধিকারও পাইতে পারে; কিন্তু নেতৃত্বের যে মূর্ত্তি আজ বিশ্বে প্রকট, ভারত কোন দিন সে নেতৃত্ব কামনা করে না। শক্তিমান ভারত অপরকে গ্রাস করিবে না, রক্ষা করিবে; বিশাল ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া আয়োদর স্ফীত করিবে না, প্রতিবাসীকে সৌহার্দ্য বন্ধনে বদ্ধ করিবে; শক্তিমত্তার দাবা-খেলায় মরুর চাল চালিবে না; আর্ত্ত দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা মোচনেই আত্মোৎসর্গ করিবে।

বিপুলা চ পৃথ্বী মানুষের আজ ও আর এ সত্য আসৌ অবিদিত নাই যে ভারতের আশা-আকাঙ্খা কামনা বাসনা এই একটি মানুষের আননে ও নয়নে প্রতিবিম্বিত; ভারতের আত্মার ভাষা এই একটিমাত্র মানুষের ভাষণেই প্রতিধ্বনিত! মহা-সম্মিলনে সম্মিলিত এসিয়া যে এই মানুষটির সান্নিধ্য কামনায় উৎসুক হইয়া চাহিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। গান্ধীজীর অবর্শনে এসিয়া মুহ্যমান হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সান্ত্বনা ছিল যে গান্ধীর শাশ্বত আদর্শে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রভাসিত হইতে তাহারা দেখিয়াছে। বুদ্ধকে কয়জন লোক দেখিয়াছে? তথাপি বুদ্ধ চিরন্তনীত। প্রথম দিনের সভাধিবেশনের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল যখন আশ্বাসিত করিলেন যে হয়ত মহাত্মাজী একদিন আসিতেও পারেন, তখন সেই বিশাল সভাস্থল যেন আশাতীত কল্পনাতীত হর্ষোল্লাসে হতবাক্ হইয়া গেল। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কথা কেতাবেই পড়িয়াছি, বিদ্যুৎ প্রবাহে বাক্যের বীরের কি দশা হয় সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। অকস্মাৎ এক সময়ে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে সেই যে লক্ষ করতালি ধ্বনি ধ্বনিত হইল, তাহার আর বিরাম নাই। যেন বর্ষার ধারি বন্ধ, ঘর ঘর কাঁপে, চল চল নাচে, ঘর ভেঙ্গে যায়—সে দৃশ্য দেখিবার, অনুভব করিবার।

কিন্তু গান্ধী তখন কোথায়? জওহরলালই জানাইলেন, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতের পথে প্রান্তরে সেই লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার মানসে নরোত্তম মানুষটি নগ্ন দেহে নগ্ন পদে ভারতের পল্লী পরিক্রমা ব্রত উদযাপন করিতেছেন। 'ক্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।' পৃথিবীর শক্তিমানগণ এ্যাটম-বোমিয়ম খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আর গান্ধী মানুষের শুধু মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। কে জানে, কবে

কোথায় ও কেমন করিয়া দ্রাবাধন পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিবে ; অথবা আদৌ ঘটিবে কি-না !

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভাধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কন্যা পদ্মজার সঙ্গে তাহার শয়ন কক্ষে উপনীত হইয়া দেখিলাম, প্রবল ঝঞ্ঝাক্রান্ত। তখন জানিতাম না যে দুঃসহ ঝঞ্ঝাবেদনার কাতর এই বরিষণী নারী পরদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম সমুদ্রোপকূলবাসিনী নরনারীকে মেঘমন্দ্ররবে ভারতের স্বপ্নসঞ্চারোদ্বোধিত ত্রিপথগা ভাগীরথীর পূতপবিত্র বারিসম নির্ম্মল আত্মার তীর্থ সলিলে অবগাহনে আহ্বান জানাইতে সমর্থ হইবেন। আমাদেরই ভুল। ভারতের নারী, দ্রৌপদীর অংশে উদ্ভূত,

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

তপস্বিনী উমার রূপে উদ্ভাসিত, এত অল্পে কাতরতা সহেনা। পুরাণের দ্রৌপদী ও দুর্গাকে আমার বড় ভাল লাগে। একজন পাণ্ডব জয়শ্রম-কলনী, অপরজন মহিষমর্দ্দিনী। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলী, তাহাকে আমি পূজা করিতে পারি ; কিন্তু দুর্গা ও দ্রৌপদীকে আমাদের আজ বিশেষ প্রয়োজন ! দুঃখ এই যে সরোজিনী দেবী ও বিজয়লক্ষ্মী মাত্র দুটি। তবে দুঃখই বা করি কেন ? এক সূর্য্য ও এক চন্দ্র কি পৃথিবীর তমিস্রা দূর করে না ?

দুই শতবর্ষকাল দুর্দ্দীন অধীন যন্ত্র ও অমন্থ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশ হতে রামায়ণ মহাভারত রচনা ও প্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়াছে যে সভ্যতাভিমানবর্জ্জিত ভারতে নারীতে ও গৃহপালিত পশুতে কোনই পার্থক্য নাই। এসিয়া মহাসম্মিলন দুর্দ্দিনের সত্যাধিষ্ঠাত্রী যোগ্য উত্তর দিয়াছে কি ? শ্রীমতী সরোজিনী সভানেত্রীর অভিভাষণে সেই অপপ্রচারের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেই বোধ করি বলিলেন, আমি নারী ; ভারতে নারীর আসন মহোচ্চ ; কারণ, ভারতে নারীই গৃহকর্ত্রী। অতিথিকে আমন্ত্রণ দিবার, অতিথি সৎকার করিবার অধিকার একান্তরূপেই আমার। অন্য দেশে যাহাই হোক, ভারতবর্ষে এ অধিকার চিরদিন নারীর। সেই জন্যই এত বিদ্যান, এত জ্ঞানবান লোকবিখ্যাত পুরুষ বর্ত্তমানেও এই আসনে নারী উপবিষ্টা।" ইহার পরেও কি ফ্যালিফক্সের জাতি গোষ্ঠী ভারত নারীকে বেদুঈনবাহ্য করিয়া বেদু বানাইবে ? তবে আর বোধ করি তাহার প্রয়োজন হইবে না। ১৯৩৮ সালেই অষ্টাবক্র পর্য্যবসান।

"আমার শাশ্বত ও সনাতন অধিকার বলে আমি এসিয়াকে আহ্বান দিয়েছি। আমার দেশে যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর অতিথিকে তাহা দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার আবেদন আমিই জানাইতেছি। ভারত চিরদিন দান করিয়াছে, মুক্তহস্তে দেছে, কৃপণতাকেও দেছে, অকাতরে অফুরন্তের সাগ্রহে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হয় নাই। একদিন বাবলোও ভারতের দ্বারে এসিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল, আজ আবার সেইদিন আসিতেছে, ভারত তাহার বুকের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেছে। কে আছ আর্য্য, এসো অমৃতময় এই ভারতে ; কে আছ জ্ঞানপিপাসু, দেখো জ্ঞানবন্যাকিনী প্রবাহিত এই ভারতে। আর কে আছ সত্যান্বেষণাপ্রিয়, তিতিক্ষাসুরাপী, এসো এই ভারতে, দেখিবে, কৌশিনে সাম্রাজ্যের ষড়ৈশ্বর্য্য ! সর্ব্বহারা সর্ব্বত্যাগী বিশ্বে মহৈশ্বর্য্য বিলাইয়া ভারত তোমার দেশে শ্মশানে মশানে গাহিয়া বিহার।" এই উদ্বোধন সন্ধ্যার কথা কেহ কোনদিন ভুলিবে না। ভারতের নারী যে সত্যই ভারতের গৃহকর্ত্রী, তাহার কর্ত্তৃত্বের উপরে কর্ত্তৃত্বাধিকার যে কাহারও নাই, সরোজিনীতে সেই মহিমময়ী সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিই ফুটিয়াছিল। ভাব ও ভাষার কমনীয় মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যের সহিত ভারতের অক্ষয় অব্যয় আত্মবাতন্ত্র্যের সঙ্গে অজস্র আত্মসোহাগের কি সে ত্রিবেণী সঙ্গম। হায় রাজনীতি ! রাজনীতি কি হিমালয়ের উচ্চতা, হিমালয়ের অপরিম্লান পবিত্রতা, হিমালয়ের মধুর শৈত্য দিতে পারে ! সার্থক নাম সরোজিনী ! আর সার্থক এসিয়া মহাসম্মিলন।

এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা হাসির কথা বলি। সরোজিনীর স্নেহসম্ভোগের সুযোগ আমার দীর্ঘকালের। সম্মিলন শেষে একদিন বলিলাম, দিদিভাই, এই সভামঞ্চে তোমায় বাঙ্গালী বলিয়া বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন, খবর্দ্দার, ও কাজ করিও না, এখানে হায়দ্রাবাদের অনেক লোক আছে, তুমি কৃপকায় ব্যক্তি তোমাকে অতিথির উত্তম মধ্যম দিয়া ফেলিবে। যাদের কথা থাক্, "মরের বধূ কথা কয় মধু," আমি জানি অন্তরটী বঙ্গনারীর মতই মধুময়।

সরোজিনীর কণ্ঠস্বরে মেঘগর্জন করে, আবার সজলস্নেহে স্নিগ্ধ হইয়া আসে। শেষকালে যখন বলিলেন, "এসো এসিয়া, আমি আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার, মনের ভাণ্ডার, শুভের ভাণ্ডার খুলিয়া দিই, অবাধে অকুণ্ঠচিত্তে পূর্ণানন্দে তোমার উপযুক্ত রত্নরাজি আহরণ করো, আমি তোমায় সে অধিকার দিলাম" তখন বিশাল সভাঙ্গন সত্যই চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এসিয়া প্রত্যাবর্তনের মহান নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া ধন্য মানিল।

দুর্বিষহের রাজত্বে রক্তের আখ্যান দিয়া আমি এই আখ্যায়িকার অবতরণিকা করিয়াছিলাম, অন্যায় করি নাই; কথাটা আর একবার আসিয়া পড়িয়াছে। ইন্দিরার দুর্বিষহের রক্তশালে শিশুপাল স্বভাবদুর্লভ দুর্বুদ্ধিবশে কিছু উৎপাত করিয়াছিল, আধুনিক ইন্দিরার দ্বারাও উপদ্রব

বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের ভারতও যে তাহার ব্যতিক্রম এমন কথা খুব জোর করিয়া বলা যায় না। তবু যে আজ ভারতের একটি বিশাল ও বিশিষ্ট অংশ যাতকের ছুরির সামেই বিস্তার মেলে, নিঃসন্দেহে ইহা গান্ধী-প্রভাবের অব্যবহিত ফল। গান্ধীবাদের অসাম্প্রদায়িক শান্ত ও স্নিগ্ধ প্রভাব সত্ত্বেও আজিকার হিন্দু-ভারতের ক্ষুব্ধাংশ সাম্প্রদায়িকভাবেও ছুরিকার চাকচিক্যে আকৃষ্ট যদি হইয়াও থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক নির্যাতন ও নিষ্পীড়ন ভোগ করিয়াই সেই শ-দ্বিধ্যুক্ত পথে তাহারা পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাহাতে সে সুখী নহে। সাময়িক প্রয়োজনে ও আবেগবশে শস্ত্রযুক্ত হইলেও পরমুহূর্তেই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মধিক্কারে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে আত্মশুদ্ধির

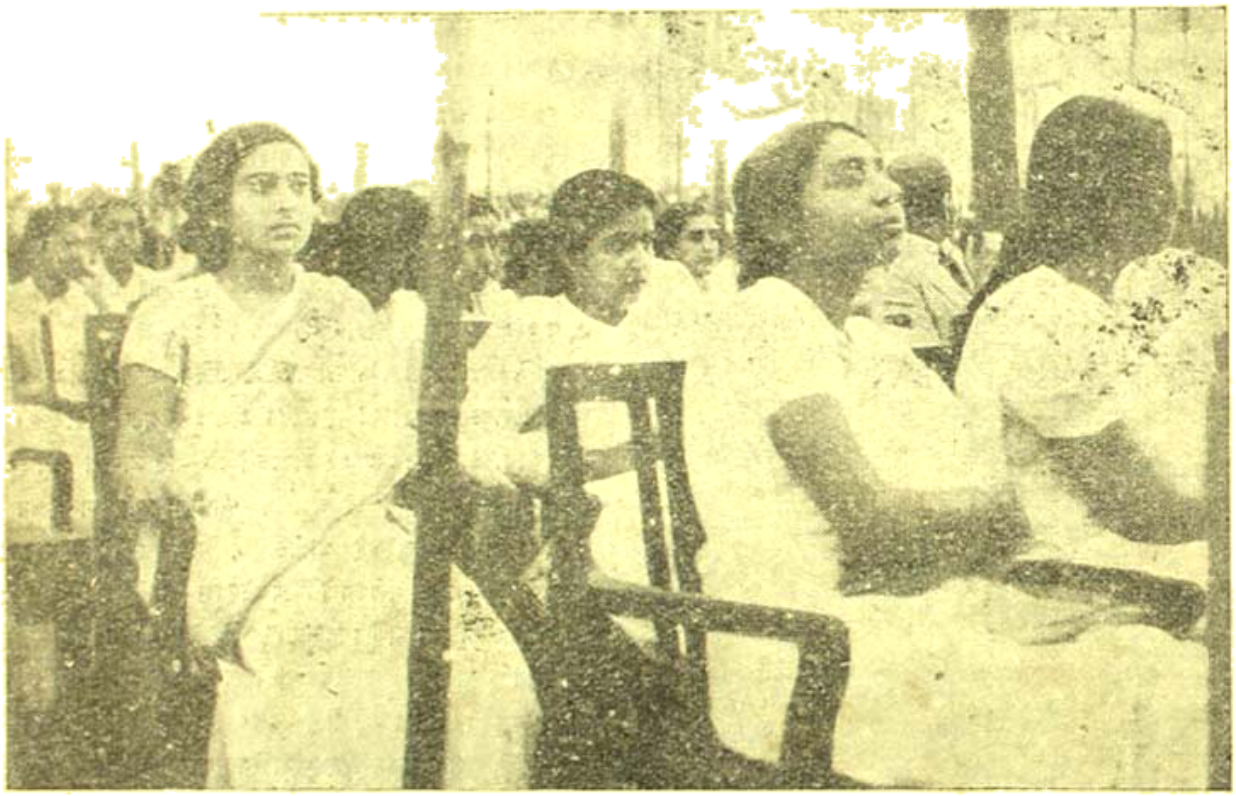

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতি

করিল তাহারা শিশুপালের বংশধর কি-না বলিতে পারিব না বটে, তবে আকার প্রকারে অদ্ভুত সাদৃশ্য। বিজয়া সম্মিলনে রাজনীতির স্থান নাই জানিয়াও যন্ত্রতন্ত্রের পশুত্বকে শ্রান্তি দেখিলাম না। শেষ পর্যন্ত বিকলবাহু হইয়া বৈতালিনা হস্তে ছুরি দিয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিল। দিন কয়েক ধরিয়া রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে গুপ্ত যাতকের কর্মকুশলতা প্রখর হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য জল্লাদদলের সঙ্ঘ সংগঠন! যেন টেলিগ্রামের তারের টরে টক্কা ধ্বনি। দিল্লীর তারঘরে খটাখট করিলে কলিকাতা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, আসাম, বীমাস্ত, মোরাদাবাদ ও কানপুর একই সঙ্গে ছুরিকা বসাবে।

রাষ্ট্রতন্ত্রে ও রণপাত্রে যাতক ও ছুরির স্থান চিরদিন আছে। শ্রীকৃষ্ণ,

অস্ত্র শানায়িত হইয়াছে। ইহাও কথার কথা নহে, অন্তরেরই সত্য অভিব্যক্তি। ভারতের রাষ্ট্রনীতি যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই যাতকের ছুরিকাস্ত্রে আবর্তিত হইবে ভারতের রাষ্ট্রনায়ক কি দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন? ইহা ছিল, তাঁহার উপলব্ধিরও অতীত।

শিবহীন যজ্ঞের কথা, গান্ধীবিহীন এসিয়া মহাসম্মিলনের দুঃখ আগেই নিবেদন করিয়াছি। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পুরুষোত্তমের অমর্ষণে মনস্তাপের অন্ত থাকে না। আশার ক্ষীণ সূত্র ধরিয়াই আলাপ আলোচনা চলিতেছিল এবং দিনান্তে একটি করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়া সন্ধ্যাবসুতে লীন হইতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আরও একটি মানুষের অভাব মহাসম্মিলনকে পীড়িত করিতেছিল। সদ্যঃ-স্বাধীন

ভারতেনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুলতান শারিয়রকে সাহিত্যে প্রাপ্তির আশা এক সময়ে এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বয়ং ভারত-রাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্টকেই একদিন হাওড়াই জাহাজের আফিসগুলির সামনে হাওড়াই জাহাজের সন্ধানে ঘুরাঘুরি করিতে দেখিলাম। বর্তমান পৃথিবীর দিগন্তে দুইজন সার্থক সাধকের নাম ঘোষিত হইয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতা-সাধনার সার্থকতা তাঁহাদের স্ব স্ব জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। ভারতে গান্ধীজী ও ভারতেনেশিয়ার সুলতানে শারিয়র সাহেব। সম্মিলনের সৌভাগ্য, সার্থক সাধকদ্বয় একই দিনে একই সভায় একই মঞ্চে উপস্থিত হইয়া এসিয়ার সুধী-সমাজকে সাদর সম্ভাষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেদিনের সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, এ জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না; আমি ত জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। বলিতে লজ্জা নাই যে, আমি পৌত্তলিক হিন্দু, পৌত্তলিকের কল্পের কর্ণ সেদিনের পরিচয় আমি লিখিতে পারি। যে গৃহ-বিগ্রহের আমি চিরদিন পূজা করি, আমার ভাগ্যক্রমে যদি কোনদিন আমার পাকঘরের দেবতা প্রাণবন্ত হইয়া আমার বিগ্রহ মন্দির ধ্বস্ত করেন দেখি, তাহা হইলে আমার কি দশা হয় জানি-না বটে; তবে একটা কিছু যে হয় তাহা নিশ্চিত জানি। সেদিন প্রত্যেকটি মানুষের যদি শত চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে গান্ধীজীকে দেখা সম্পূর্ণ হইত; যদি সহস্র কর্ণ থাকিত, তবেই গান্ধীর অমৃত-বাণী শ্রবণ সার্থক হইত। সহস্র সহস্রের পরিতৃপ্ত সংবেদ্রিয় নিঃশব্দে যেন এক বাক্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, এই সেই গান্ধী!

যাক্। বিজয়া সম্মিলন আশা যখন দিয়াছি তখন মিষ্টমুখ অথবা খানা-খাবার কথা না বলা অশোভন হয়। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি রূপালনীর উদ্যান সভার কথা বলি। আচার্য-পত্নীর 'কুটীরে' সুশোভন, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যানে এসিয়া জলপানে আমন্ত্রিত হইলেন। গৃহ-সচিবের উদ্যান হইলে কি হয়, বলাবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে জলের অভাব হইবার নহে, অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ, ছিতল, উহ কোনটাই দুর্লভ নহে। সত্যান্বেষীর অতিথিসৎকারে অতিথিপরায়ণা নারী সাধে কি আর কপালে করাঘাত করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, হায়, আমার সে ভারত কি আজ আছে! অন্নপূর্ণার অন্নসত্র আজ নিঃস্বের শূন্য হইয়া গিয়াছে! সাগরেও আজ বারি নাই! পণ্ডিত জওহরলালও জলসত্র খুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য থাকলা, তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে জল বলিতে সেই জল বুঝিতে হইবে, যে "নির্মল জলের কোন বর্ণ নাই, গন্ধও নাই।" এইখানেই 'ইকুএরায়িও' হরেন্দ্র ঘোষ নয়নাভিরাম হুই নৃত্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। জওহর-আবাসে, জওহর-বিরচিত, ভারতবিধাতার সুস্বাস্থ্যকল্পে লীলায়িত নৃত্য শুধার মধ্যেকার ভারতের মহিমময়ী মূর্তিটিরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সারাজীবন যেসখাটা জওহরের সহিত ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও প্রকৃতির কি অপরিচিত সংযোগ! শ্রীমান হরেন্দ্র ঘোষের সাধনাও সার্থক। জওহরলাল আবিষ্কারের ইতিবৃত্তই লিখিয়াছিলেন—ইতিহাসকে নৃত্যছন্দে রূপায়িত করিতে হরেন্দ্রই পারেন।

বড়লাটপত্নী সুন্দরী লেডী মাউন্টব্যাটেন ও তাঁহাদের কন্যা সুন্দরী প্যামেলা পণ্ডিতজীর ভবনে সান্ধ্য-সভায় শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় মূর্খ লোক আশা করিতেছিলাম যে ভারতের শেষ ভাইসরয় ও হয়ত বা শেষকার্তিজাত্য-সংস্কারের শ্রীমুখ হুড়ো জ্বালিয়া বিয়া 'ভারতবিধাতার' মৃত্যু বাসরে হাজির দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু, বৃথা আশা। যদিচ মাউন্টব্যাটেন অযোধ্যার দুইশত বৎসরের পুরাতন আতিজাত্য-গর্বের গগনস্পর্শী বিকল প্রাচীরের ইষ্টক ভাঙিতেই আসিয়াছেন, তবুও, প্রবাদের হিসাব অনুযায়ী লঙ্কা ছাড়িলেও 'ভাল' ছাড়া সম্ভব হয় না। আমাদের আশা করিবার কারণটি লর্ড মাউন্টব্যাটেনই যোগান্ বিয়াছিলেন। যে চন্দ্রপ্রকাশিনী মধুরহাসিনী শুভ্রা যামিনীতে জওহরাবাসে অতীতের যুদ্ধরাজের সুসংস্কৃত মেলা বসিয়াছিল, সেইদিন অপরাহ্নেই বড়লাট এসিয়ার সুধী-সমাজকে সমাদরে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন। শুধু কি তাহাই? অনুষ্ঠানপর্ব না হোক্ অভ্যর্থনীপর্ব সমগ্র রাজ-প্রাসাদটির অন্ধ রন্ধ্র পর্যন্ত বর্ণবের ব্যবস্থাও তাঁহার ইঙ্গিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় যে আশা

সুধীসঙ্ঘের একাংশ ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

আমরা করিয়াছিলাম তাহা কি খুবই আশাব্যঞ্জক হয়নি? লাট-ভবন প্রাঙ্গণে রজনীগন্ধালোকিত যামিনী-সন্ধ্যায় সন্ধ্যাসনুস্নাত পূর্ণচন্দ্রের দিব্য বিভায় যিনি সর্বসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এসিয়ার সেই বিজ্ঞতম সুধী জওহরলালের আতিথ্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহা মনে করা আর যাহাই হোক, মূঢ়তা নিশ্চয়ই নহে। এসিয়া মহাসম্মিলনকে লর্ড মহোদয় যদি আলো সভাং করিতেন, তাহাতেই বা কাহার কি বলিবার থাকিত? তাঁহার 'পূর্বপুরুষ' লর্ড ওয়াভেল 'ডিলীয়রো বা জগদীশ্বরো বা' থাকিলে তাহাই যে করিতেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুদীর্ঘ নীরব বর্জিত সম্মিলনকে পাঠ দিবেন, লর্ড ওয়াভেল এমন কঠোরহৃদয় শাসক ছিলেন না ইহা সকলেই জানে। প্যারিটি রাখিতে ভদ্রলোক কি প্রাণপাতই না করিতেন, আহা। কিন্তু নূতন লাটের ত "বিষমঙ্গল নাটকের" 'কোথা চিন্তামণি' দশাপ্রাপ্তির খবর আজও পাওয়া যায় নাই!

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রগ্রন্থে শেষ দৃশ্য আলোকোজ্জ্বল ও মিলনান্ত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধতা না হওয়াই স্বাভাবিক; এবং শেষদিনে গান্ধীজী শাস্ত্রাচারের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই "ভারত মাতা" উচ্চারণ করিয়াছিলেন. সিরীর স্মৃতি ভুলো না. ভুলো না।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে. সিরীর স্মৃতি কি? গান্ধীজীই তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। ভারতবর্ষ এসিয়াকে প্রেমের আমন্ত্রণ দিয়াছে. এসিয়া প্রেমের আহ্বানেই ভারতে আসিয়াছেন। প্রেমের আহ্বান প্রদানের জন্যই এই মহাসম্মিলন আহূত হইয়াছিল; আবার প্রেমালিঙ্গনের ভিতর দিয়াই বিদায় সম্ভাষণ। ভারত এসিয়াকে প্রেম বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে. বিনিময়ে চাহিয়াছে. প্রেম। তাই গান্ধীজীর শেষ কথা, এই প্রেমবার্তা স্মৃতিটুকু ভুলিয়ো না। আমার দুঃখ হইয়াছিল, এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

"প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়,
আঘাতে প্রেম হয় না কো ঈর্ষা, দানে প্রেমের ক্ষয় না কয়।
স্বর্গ নরক আসে যেবা নরক স্বর্গে উঠে প্রেমে;
প্রেমের স্থান গগন তলা প্রেমের কিরণ ভুবনময়।"

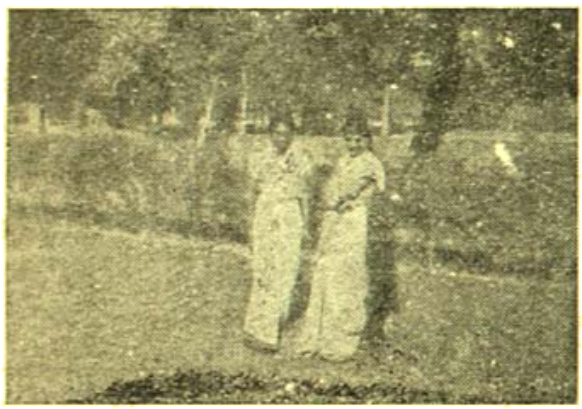

শান্তিপাত্রবিহস্তিনী—মাতা

ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

গানটী কেহ গাহিল না! আমি অনেক দুঃখ সহিতে পারি কিন্তু আমার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষার অনাদর (আমার দেশে) দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। এসিয়া সম্মিলনে গাহিবার পক্ষে বাঙ্গলা গানের কুবেরের ভাণ্ডারে যে মণিমুক্তা সঞ্চিত আছে, শুধু ভারতে কেন, সমগ্র এসিয়াও তাহা কল্পনা করিতে পারে কি? কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির কত কথাই ত শুনি, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য যে কোহিনুর সম্ভারে সমুজ্জ্বল, এ কথাটা ত কেহ বলিল না। দুঃখ হয়. "সোনা বাইরে কাজলে গেরো।" এসিয়াকে যদপি স্বরসাহিত্যের অমৃত প্রস্রবণের সন্ধানই ভারত না দেয়, তাহা হইলে দান পূর্ণ হইবে কি? এসিয়া যদি বঙ্গ- সাহিত্যের সুধাস্বাদই না পাইল, তাহার প্রাপ্তিও মিটিল কি?

আশা করি আমার কথাগুলির কদর্থ কেহ করিবেন না। সেই ভরসাতেই সভ্রদ্ধ নিবেদনে প্রশ্ন করিতেছি ভারতের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভাবধারী কোণারকী-প্রবাহ বঙ্গসাহিত্যে যেমন পূর্ণ, যেমন সমৃদ্ধ, তেমন কি আরও কোথাও আছে? "অন্নমাতরম্" যার কি আর কেহ দিতে পারিয়াছে? রবীন্দ্রনাথের মত ভারতের আত্মার নিগূঢ় মহিমার ঠিকানা কি আর কোথাও সন্ধান হইয়াছে? যে বিবেকানন্দের সাধনার সিদ্ধফল দুর্ভাবচন্দ্র, বাঙ্গলার সাহিত্য ইতিহাস নাটক উপন্যাস সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যে ভারতের উত্তর সাধনা সার্থক হইয়াছিল, তাগাদোবে আফ্রিকায় ভারতে তাহার কোন স্থানই নাই! এসিয়া সেই 'মণি কোঠা'রই সন্ধান পাইল না; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি এই দীন সাহিত্যসেবক অকুণ্ঠোত্তরে এই অবিচারণীই আজ করিতেছে যে বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্ম সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে এসিয়ার ভারত পরিচিতি অসম্পূর্ণই রহিয়া যাইবে। ইহা অত্যুক্তি নহে, সত্য দর্শন!

লক্ষবিদ্যুৎ বর্ত্তিকার আলোকসমুজ্জ্বল সভাবণ্ডপে লক্ষ যাত্রী যখন ঔৎসুক্যে তপঃক্লিষ্ট প্রেম সাধকের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া. ধীরে—অতি ধীরে সেই যোগাবিষ্ট মানব-সমাজ যে মুহূর্ত্তে আনতশিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের উদ্দেশে প্রণামতি জ্ঞাপন করিল—ধীরে—অতি ধীরে রঙ্গমঞ্চের রেশমী যবনিকা আনমিত হইল, রাজসূয় যজ্ঞাবসান ঘোষিত হইল। হয়ত স্বপ্ন—দিবাস্বপ্নও হইতে পারে, আশ্চর্য্য নহে। তা হৌক, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি আমার মানসনেত্রে সমস্ত মুদ্রিত যে মহা-ভারতের নগনহিমময় চিত্র অবলোকন করিলাম, সে নয়নাভিরাম মনোময় দৃশ্য কি জীবনান্তকালেও ভুলিতে পারিব? এতদিন আমরা বোম্বাই হইতে ব্রহ্মপুত্রতটে আসাম, হিমাচল হইতে নীলাচল, পাইবার গিরিবর্ত্ম হইতে কন্যাকুমারিকার কল্পনাতেই বিভোর ছিলাম. আজ রাজসূয় যজ্ঞাবসানের মিলনোজ্জ্বলদীপালোকে আরব সাগর হইতে ককেশাস পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহা-ভারতের মহাসঙ্গীত শ্রবণ হইতে দেখিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল। সেই মহা-ভারতের ভিত্তি প্রস্তর মহাভারতের হস্তিনাতেই আজ প্রোথিত হইল।

এই মহা-ভারত রচনায় এসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির আগ্রহ উৎসাহই সমধিক। এসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রের সংখ্যা সত্যই অধিক। স্বাধীন ভারতকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া এসিয়া মহারাষ্ট্রের অপরূপ রূপ-পরিকল্পনায় তারস্তনেশিয়া, তাতারচীন, তুরস্ক, পারস্য, আরব, আফগানিস্থান, কুর্দ্দিস্থান, ইরাণ, ইরাক, উজবেকীস্থানকে অবিচলিত দৃঢ় সমন্বয়ে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও, ভারতের কি অপরিসীম দুর্ভাগ্য যে ভারতের মুসলমান সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ উদাসীন—বিরূপ। রাবাণের বিভীষণ, মহাভারতের শকুনি মামা হইতে সুরু করিয়া একালের পরিচিত বন্ধুগণ পর্য্যন্ত অভাগিনী ভারতের আত্মা কি যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে, ক্ষণে ক্ষণে একই পঙ্কিল আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে? বীরমাতৃকা-অনুশাসন কি ভারতের সুফলের সাথী? এই পাপ চক্রের অবসান নাই কি?

মাসখানেক পূর্ব্বে আমি আর একবার দিল্লী আসিয়াছিলাম। তখন আর এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। স্বাধীন ভারতের

শাসনতন্ত্র রচনার প্রথম পর্বে, রাজধানীতে নবগঠিত গণতন্ত্র পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন চলিতেছিল। আশার আনন্দে উৎসাহে উল্লাসে দিল্লী সুন্দরী যেন বিবাহের বধূর বেশ ধারণ করিয়াছিল। তরা নবীতে বান আসিলে যেমন হয়, যমুনের সুরভিসুরভিতা উপবনে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিলে যে শোভা হয়, শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার মাঝে যে পুলকের প্লাবন প্রবাহিত হয়, তারা ভারতবর্ষের নরনারীর জনমনে তাহাই প্রতিবিম্বিত। আর তারা [illegible] মুখে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী বিধের করুণার দ্বারে কৃপাপ্রার্থী। রবীন্দ্রনাথের সেই "শতাব্দীর সূর্য" কবিতাটি যেন দীন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে সে যে কি মর্মন্তুদ ব্যথা ও বেদনার পাষাণ স্তূপ সৃষ্টি করিতেছিল, বাঙ্গালী ভিন্ন কে তাহা বুঝিতে পারে?

বারবার কেবল এই কথাই মনে হয়, কোথাকার কোন্ বৈতরণীর বালুকীর্ণ পেষণে ও পীড়নে মৃতকল্প ও মুমূর্ষু বঙ্গদেশ আজ জীবিতে মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করিতেছে? বাঙ্গালীর স্বদেশ-সাধনার সমুদ্যমনে এই দুর্যোগই কি তাহার ভাগ্যফল? আবল মনের সে স্নিগ্ধ শ্যামলতা নাই; মৃত্তিকায় সে সুরভিত সরসতা নাই; প্রাচুর্যশালী বঙ্গদেশে আজ বিদ্যা হাহাকার; বাঙ্গলার কুঞ্জবনে আজ শিখি কূজন নাই; পীতি-বৃন্দাবন-তরু আজ পীতিরস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার পুরুষের প্রাণে আজ প্রাণের স্পন্দন শুনি না; মধুর আধার নারীর হৃদয়ের মধু আজ লবণাক্ত হইয়াছে; বাঙ্গলার শিশু আজ মাতৃক্রোড়ে শুইয়াও আজ আহ্লাদে হাসে না, জড়েও কাঁদে না, স্বপ্নেও বেহালা করে না। যতদূর দৃষ্টির সিন্ধু পীঠ বাঙ্গলার পানে তাকাও আজ কলঙ্কিত মেঘে ছাইয়া থাকে! অমৃতের এমন বিষুব পরিহাস কি ইতিহাস অন্বেষণ করিলেও মিলিবে?

আজ এই মহা-ভারতের দুর্দিনেও সেই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল, আমাদের কোন্ মহাপাপে বাঙ্গলা আজ বিশ্বের উপহাসের সামগ্রী হইল? ইহার শেষ কোথায় এবং কবে?

বেচারা

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে সকালের কাগজখানা নিয়ে বসেছিলাম। সকালে কাগজ পড়ার সময় হয় না—একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া চলে মাত্র। রাস্তার দিকবার ঘরের আমার খোলা জোর দিয়ে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে খগেন ও ভোলানাথ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—বাঁচা গেল—বাড়ী আছ তুমি!

আমিও বাঁচলাম তোমরা আসায়। কারণ কাগজ নাড়াচাড়া করে আর চলছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, ঘরের কাগজে কোন খবর নেই—যত রাজ্যের বাজে কথা বোঝাই।

মেঝের পাতা মাদুরে বসতে বসতে ভোলানাথ বলল—আমরা কিন্তু খবর এনেচি একটা।

বাঁচিয়েচ ভাই। বল এখন কি খবর আনলে, শুনি। বলে কাগজ রেখে উৎসুকভাবে আমি ভোলানাথের দিকে ফিরে বসলাম।

সে আরম্ভ করল—শচীন একটা গল্প লিখেচে এবং ছাপায় বেরিয়েচে তার সে গল্পটা।

বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়েই আমি বলে উঠলাম—বল কি? শচীন গল্প লিখেচে? মিউমিউ করা ঐ লোকটির মধ্যে যে একজন কবি অজ্ঞাতবাসে আছেন—কে মনে করেছিল তা?

কিছু না; আমি ওকে কবি বলব না—কিছুতেই না। বলে' ভোলানাথ জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

কেন কবি বলবে না ওকে? কি অপরাধ ওর? কারণ বল, কেন বলবে না।

চোখে দেখে লেখা ওর গল্প—যত জানা কথা লিখেচে ও।

না—সব জানা কথা নয় ভাই। খগেন সংশোধন করে দিল ভোলানাথকে।

কিন্তু কি জানা কথাটা নিয়ে গল্পটা ও লিখল সেটা জানতে দাও আগে—শুনি আগে সে গোড়াকার কথাটা।

মাধিকের বিয়ের কথা নিয়ে গল্প লিখেচে ও। জানা কথা নয়?

হাঁ, কিছুটা ওর জানি বটে, তবে হয়ত অনেকটা জানিনে। বিশেষ শেষের দিকের প্রায় কিছুই জানিনে।

জানইত আমার সঙ্গে ও তেমনভাবে মিশত না কোনদিন—বেশ একটু আলগোচে থাকত যেন। যাক্ এখন বল কি হল শেষটা।

একবারে গোড়ায় গলদ করে বসেচে—

অর্থাৎ?

যা করবার তা না করে, মাণিক করেছে যা করবার নয় তাই।

ও যা হয় করুক—শচীন কি করেচে তাই বল?

সেই কথাই ত বলতে এসেচি—একবারে বিচ্ছে চটকেচে—যা হবেচে তা লেখেনি—যা লিখেচে তা হয়নি।

তাতে দোষ হয়েচে কি? গল্প ত ঐ করেই হয়। কতক যায় থাকে ঘটনায়—বাকিটা, অর্থাৎ বেশির ভাগটাই যায় থাকে লেখকের কল্পনায়।

কিন্তু তাই বলে যে ঘটনাটা নিয়ে গল্প আরম্ভ করল—যেমন যেমন ঘটল সেটা—তা লিখবে না?

আরে—ঘটবার যা তা ত ঘটেই গেল—তার আর লিখবে কি? কিন্তু ঐ যা ঘটল তা ঠিকমত ঘটল না—ঘটনার সংশোধন করে দিলেন কবি তাঁর গল্পে। এই হল গল্প—এ কবির নূতন সৃষ্টি। এই করেই গল্প লেখা হয়। নইলে লেখার মানেই হয় না কোন! ঘটনায় যা হয় তা দিয়ে গল্প হয় না। চোখের সামনে যা ঘটে, মন আমাদের ঠিক খুশি হয় না তাতে এবং মনকে খুশি করবার জন্যই সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের মসলা দিতে হয়।

কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে ত সবটা? খাপ খাইয়ে দিতে হবে ত এটার সঙ্গে ওটার?

নিশ্চয়। তা না হলে ত গল্পই হবে না। শচীন কি তা পারেনি নাকি? কিন্তু গল্প যখন ওর মাসিকে ছাপা হয়েচে, তখন অতটা গলদ হয়েচে বলে মনে হয় না।

হাঁ—গল্পটা ওর ছাপা হয়েচে বটে কিন্তু নিতান্ত বাজে একখানা কাগজে।

তাতে দোষ হয়নি। কারণ অজ্ঞাতকুলশীলদের লেখা নামকরা কাগজ প্রায়ই ছাপে না। তারা বরং জানা লোকের রাবিশ ছাপবে, কিন্তু অজানা লোকের ভাল লেখা ছাপবে না।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ঠিকই হয়েচে শচীন যা লিখেচে।

তা কেমন করে বলব? আগে শুনি ব্যাপারটা কি হয়েচে আর ঐ যা কি লিখেচে, তারপরে না মতামত বলব আমার? বল—ঘটনাটা বল—শুনি কি হয়েচে?

জানো তার অনেক কথাই। কিন্তু তবু সংক্ষেপে বলে যাই ব্যাপারটা। শোন—যে বছর মাণিক বি-এ দেয় সেই বছরের গোড়ার দিকে—সম্ভবত জানুয়ারি মাসে—কি একটা খবর নিতে একদিন সকালে ওকে কলেজ আপিসে যেতে হয়েছিল। বাইক চড়ে গিয়েছিল ও এবং রাস্তা থেকেই ও দেখল যে কয়েকটি মেয়ে আপিসের দিকে যাবার পথটায় দাঁড়িয়ে জটলা করচে। গেটের বাইরে থেকেই কিড়িং কিড়িং করে মাণিক তার বাইকের বেল বাজিয়ে দিল—মতলব এই যে মেয়েরা সরে যাবে তাকে পথ দেবার জন্য। কিন্তু মেয়েরা তা বুঝল না—কে যেন বাজাচ্ছে—কেন বাজাচ্ছে—কোন খেয়ালই করল না তারা এবং জটলা যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। এদিকে জানই ত, মাণিক কি রকম ব্যস্তবাগীশ। তার ওপরে সকালের পড়া ছেড়ে আসতে হয়েচে তাকে। একটু দাঁড়িয়েই অধীর হয়ে উঠল ও একবারে এবং বার-বার বেল বাজাতে লেগে গেল। কিন্তু যারা ওর পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ঠিক বুঝতে পারল না যে তাদের পথ ছেড়ে দিতে বলচে মাণিক—তর্ক করতেই মশগুল ছিল তারা, অন্য কোন কথা তাদের মাথাতেই আসে নি। দেখতে দেখতে মাণিকের মেজাজ চেতে উঠল এবং বাইক চড়েই যেন ওদের ফুঁড়ে চলে যাবে এইভাবে গেটের ভেতরে ঢুকে একবারে ঐ মেয়েদের ওপরে চড়াও হয়ে উঠবার উপক্রম করল। তর্ক ওদের থেমে গেল, কিন্তু পথ ওরা ছেড়ে দিল না—বরং বুদ্ধি স্থির ভাবে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ওরা সকলে মিলে সংহত হয়ে। জোর কথা কাটাকাটি চলতে লাগল—মাণিক ইংরিজিতে—ওরা বাংলায়।

মাণিক ইংরেজিতে তর্ক করল ওদের সঙ্গে?

করবেই ত—বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ ছাড়বার পাত্র ও নয়, জান না তুমি?

আচ্ছা তারপরে কি হল? এসব খবর আমি জানতাম না। কি হল শেষ পর্যন্ত—

শেষ পর্যন্ত আর গড়াল না কারণ ঠিক ঐ সময়ে

একজন প্রফেসার ওপর থেকে নীচে আসছিলেন। তাঁকে দেখে মেয়েদের দল নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

তা না হয় গেল—কিন্তু এর মধ্যে গল্প এল কোথা দিয়ে?

বলছি হে বলছি। ঐ যে মিনিট দু'তিনের জন্ত ওদের দুপক্ষের তফাতফি হল তার মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে কড়া কথা ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল—মাণিক করল কি—এক ঘটক লাগিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে নিজের বিয়ের ঠিক করে ফেলল।

বল কি? একবারে রোম্যান্টিক ব্যাপার যে।

তা না হলে আর গল্প হল?

কিন্তু এই সব কথা লিখেছে শচীন?

সব লেখেনি, তবে কিছু কিছু লিখেছে—খগেন বলল।

এইবার ভাবলে তুমিই বল ভাই খগেন—আমি একটু মিশিয়ে নিই।

আমি বলতে পারি, কিন্তু চা না হলে একটি কথাও বেরোবে না আমার মুখ দিয়ে—সাফ বলে দিচ্ছি ভাই। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই আমার কাছে।

নিমেষের মধ্যে উঠে পড়লাম আমি এবং নিজের কৈফিয়তে বললাম—একবারে ভুলে গিয়েছিলাম ভাই কথাটা। একটু বোস, আমি এক্ষুণি আসছি—বলে বরাবর রান্নাঘরে গিয়ে রাধাকে বললাম—চা করে দাও ত শিগ্‌গির তিন কাপ।

কিন্তু চা যে ফুরিয়ে গিয়েছে একবারে।

ফুরিয়ে গিয়েছে? আগে বলতে হয় কথাটা।

কি করে জানব যে এই রাত দুপুরে তিন কাপ চা চেয়ে বসবে তুমি?

কাল সকালে দরকার হবে—তা ত জানতে।

সকালের এক কাপ হয়ে যাবে—এমন একটু আছে।

এক কাপের যায়গায় দু'কাপ হলেও চলত উপস্থিতের মত।

মুখ বিকৃত করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে রাধা বলল—এক কাপ কোন রকমে হবে। দু'কাপ হবার মত নেই চা—এই দেখ বলে কৌটো থেকে হাতের তোলায় ফেলে দেখালেন—চা যা আছে।

কিন্তু উপায় কি? চা-যে চাই।

কিনে নিয়ে এস—আর কি উপায় আছে?

ভাববার সময় ছিল না। রাধাকে বললাম—সব ঠিক করে রাখ তুমি—চা নিয়ে আসছি—বলে বাক্স থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পেছনের দোর দিয়ে।

গলির মোড়েই চায়ের দোকান। যে চাটা আমি কিনি শুনলাম সেটা ফুরিয়ে গিয়েছে। তার চেয়ে বেশি দামের চা'টাই তাই কিনতে হল—তবে অবশ্য কোয়ার্টার পাউণ্ড ঐ ভাল চা কিনতেও খরচ আমার তেমন বেশি হল না। ভাবলাম, ভাল চা যে কিনলাম ভালই হল বরং সেটা। নাকের কাছে ঠোঙাটা তুলে শুঁকলাম গন্ধটা ভালই বোধ হল।

চা নিয়ে ফিরছিলাম, দেখলাম সামনের খাবারের দোকানে সিঙাড়া ভাজছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—ভাবলাম শুধু চা খেতে দেব—না দুখানা করে সিঙাড়া দেব তার সঙ্গে? কিছু কচুরি ও সিঙাড়া কিনে ফেললাম।

বাড়ী ফিরে দেখি কেটলিতে জল নিয়ে রাধা বসে আছেন—চামচে, ছাঁকনি, দুধ, চিনি, কাপ, ডিস সব হাতের কাছে নিয়ে। খাবারের ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, আগে দুখানা রেকাবে কচুরি সিঙাড়াগুলো সাজিয়ে দাও। রসগোল্লা দুটো দিও না কিন্তু—ও এনেচি কাল সকালে খোকা খাবে বলে। দাও, শীগগীর করে দাও সাজিয়ে—রেকাব দুখানা ত দিয়ে আসি ওদের—ওরা খেতে থাক—ততক্ষণ তুমি চা করে ফেল দু-কাপ।

তবে বলছিলে তিন কাপ চা চাই?

আমি একটু খাব ভেবেছিলাম।

নাঃ, তোমার আর চা খেয়ে কাজ নেই এই এত রাত্রে।

না আমি খাব না আর। খেলে ত তিন কাপই করতে বলতাম। আর দুটোর বেশি ত কাপ নেই—আমি খেতে চাইলেই কি দিতে পারবে?

ক্ষিপ্রহস্তে রেকাবে খাবার সাজিয়ে দিলেন উনি। তাই নিয়ে বাইরের ঘরে ওদের দুজনের সামনে ধরে দিলাম।

এ কি? আমরা ভাবলাম, চা আনবে তুমি?

চা আনচি। কথাটা যে ভুলে গিয়েছিলাম এ তারই কৈফিয়ৎ।

অধিকন্তু তাহলে? বেশ।

কিন্তু চায়ের সঙ্গে এই সিঙাড়া কচুরি দেবার আইডিয়াটা কার? তোমার নয়—বোধ হয়?

ভোলানাথ জোর করে বলে উঠল—নিশ্চয় নয়। আমি হলপ করে বলতে পারি সে কথা। তেষ্টায় জল চাইলে এক গেলাস জল তুমি এনে দিতে পার, কিন্তু রোগীর পক্ষে তৃষ্ণার্তকে শুধু জল দিতে নেই—জল ভাল লাগবে বলে কিছু মিষ্টি অভাবে গুড়ও দিতে হয় সেই সঙ্গে। চা চেয়েছি বলেই সিঙাড়া এসেছে—জল চাইলে আসত সন্দেশ।

মাথের দোরের শিকল ঠন ঠন করে উঠল। আমি উঠে গিয়ে দু'হাতে দু-কাপ চা নিয়ে রাখলাম দুজনের ওদের সামনে।

খাওয়া বন্ধ করে ভোলানাথ বলে উঠল—বাঃ দিব্যি গন্ধ বেরিয়েছে ত তোমার চায়ের।

কাপটা মুখের কাছে তুলে তাতে এক চুমুক দিয়ে খগেন বলল—শুধু গন্ধটি ভাল নয়, স্বাদে বর্ণে গন্ধে যেন প্রতিযোগিতা চলছে এই চায়ের মধ্যে—কোনটা যে বেশি ভাল—তা বলা শক্ত।

অতটা বলতে চাইনে কিন্তু চা'টা যে বেশ ভাল হয়েছে তা বলি।

কিন্তু তুমি মনে করো না ভাই যে একটু বেশি দাম দিয়ে চা কিনেছ বলেই ভাল হয়েছে তোমার এই চা। এ ভাল হয়েছে তৈরির গুণে।

যেমন গল্প ভাল হয় বলবার কায়দায়—খগেন বুঝিয়ে দিল ঐ সঙ্গে।

ঠিক মনে করে দিয়েছ ভাই। গল্পের কথা ও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বল কি হল তার পরে।

তার পরে শচীন লিখেছে যে সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করেছে মাণিক। আসলে কিন্তু মাণিক বিয়ে করেছে আর একটি মেয়েকে এবং যতদূর বোঝা যায়, টাকার লোভেই সে করেছে ঐ বিয়ে। আমরা বারণ করেছিলাম তাকে ও বিয়ে করতে এবং তার বিয়েতে কেউ আমরা যাইনি।

বটে!

এখন কথা হচ্ছে এই যে এ অবস্থায় তুমি বল—শচীনের কি উচিত ছিল না, বেশ করে দুটো কড়া কথা মাণিককে শুনিয়ে দেওয়া?

তা'তে অবশ্য একটা আঘাত করা হয় মাণিককে, কিন্তু গল্প খেলো হয়ে যেত ভাই।

কিন্তু অন্যায় যে করল তাকে আঘাত করব না?

আঘাত ত তোমরা করেছ। ওর বিয়েতে যে তোমরা যাওনি—ও কি বুঝতে পারেনি তার কারণটা?

বুঝতে পেরেছে, কিন্তু গ্রাহ্য করেনি সে আঘাত। গল্পের মধ্যে নিখরে অবহেলা করতে পারত না তার আঘাত।

কে বলল? কে জানত যে কাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে? সে পক্ষের কোন লাভই হত না—মাঝে থেকে গল্পটা বাজে হয়ে যেত।

অর্থাৎ তোমার মত এই যে শচীন ঠিকই করেছে—মাণিককে যে ও আঘাত করেনি—ভালই করেছে তা না করে। কেমন?

ঠিক তাই। আঘাত যে শচীন করেনি তাতে শুধু গল্পের নয়, মাণিকের পর্যন্ত মর্য্যাদা বাঁচিয়ে গিয়েছে শচীন। আমার আরো মনে হয় তোমাদের কথায় যা হয়নি হয়ত শচীনের কথায়—কিছু না বলার ফল তার চেয়ে ভাল হবে। কিন্তু সে আলাদা কথা—গল্পের ভাল মন্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

তাইতে তুমি বলতে চাও যে ঠিক করেছে শচীন? নূতন করে খগেন জিজ্ঞাসা করল।

আমার ত তাই মনে হচ্ছে ভাই তোমাদের মুখে শুনে। কিন্তু লেখা গল্প শুনে সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না—পড়ার দরকার। খাওনা পড়ে দেখি কি লিখেছে শচীন—বলে হাত বাড়ালাম আমি ভোলানাথের দিকে।

মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব করল—না আমার কাছে নেই কাগজখানা। ওরই হাতে ছিল। নিয়ে আসছিল ও তোমাকে দেখাবে বলে। গলির মোড়ের ঐ দোকানটায় সিগারেট কিনতে দাঁড়িয়ে গেল ও—আমরা আগিয়ে এলাম। খানিকদূর এসে পেছনে চেয়ে দেখি ও আসছে না। আগিয়ে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর দিকে চলছে ও। ডাকলাম চেঁচিয়ে—শুনতে পেল না বোধ হয়—অন্তত ফিরত না সে ডাক শুনে।

কিন্তু এলে ভাল করত হয়ত—

নিশ্চয়—এমন ভাল চা'টা খেতে পেত। ভাগ্যে নেই—

ও এক রকমের মানুষ—নিন্দা সইতে পারে কিন্তু সুখ্যাতি সইতে পারে না।

ঠিক বলেছ—দুঃখ হচ্ছে বেচারার জন্য—বলতে বলতে খগেন উঠে পড়ল—বলল—আর না এইবার যাওয়া যাক, বলে কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল—দশটা বাজে।

দুজনে ওরা রাস্তায় নেমে পড়ল।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব

সোমবার বেলা দুটোর মধ্যেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার এসে গেল। তিনদিনের জন্য তিনি আমাদের মাউন্ট আবুতে মোটর নিয়ে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা তারী খুশী। এইবার আরামে সব দেখে বেড়ানো যাবে। কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ যে তখনও মুখটিপে হাসছিলেন এ কথা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। মনের আনন্দে ছুটে গেলুম আবু মোটর সার্ভিসের ম্যানেজারের কাছে। বললুম—এই। মন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চালা হুকুম! তিনদিনই গাড়ী চাই আমরা। আজ এখনি বেরুবো 'দিলবারা মন্দির' আর 'অচলগড়' দেখে আসতে।

পণ্ডিতজী বললেন—গাড়ী আমি এখনি দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু আমার গাড়ী নিয়ে তো আপনারা অচলগড় যেতে পারবেন না!

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম কেন? ও দুটো তো একই পথে পড়বে! আমরা 'দিলবারা' দেখে তারপর 'অচলগড়' যাবো!

পণ্ডিতজী বললেন—আমার সমস্ত গাড়ীর লাইসেন্স মাত্র আবু মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা পর্য্যন্ত। দিলবারা মন্দির মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে। সে পর্য্যন্ত আমাদের গাড়ী যাবে। 'অচলগড়' সিরোহী রাজের এলাকায়। ওখানে "সিরোহী বাস এণ্ড মোটর সার্ভিস কোম্পানী" বলে পৃথক একটি কোম্পানী আছে। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন অচলগড়ে যাবার গাড়ীর জন্য। ওদের গাড়ীর অচলগড় যাবার লাইসেন্স্ আছে।

কী ফ্যাসাদ!! যদিবা তিনদিন পরে কর্ত্তাদের কাছে আবেদন নিবেদনের ফলে মোটর চড়ে মাউন্ট আবু ঘুরে বেড়াবার আদেশ-নামা পাওয়া গেল, মোটর কোম্পানী বলে কিনা কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যেই আমাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখতে হবে!

অথচ, সুবাই বলেছে, অধিকাংশ দ্রষ্টব্য স্থান এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাইরে। সুতরাং: মোটর গাড়ী পাওয়াও যা, আর না-পাওয়াও তাই! একেই বলে ভবিতব্য!

তবে কিনা, আমরা কিছুতেই হাল ছেড়ে ব'সে পড়তে রাজী নই বলে শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই করে ফেলা গেল! আবু মোটর সার্ভিসের গাড়ী আমাদের 'দিলবারা' মন্দির পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে সিরোহী মোটর সার্ভিসের গাড়ী নিয়ে আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাবো।

বেরিয়ে পড়লুম আমরা সদলবলে বেলা তিনটে না বাজতেই!

পথে যেতে যেতে মোটর চালক বামভাগের একটি মন্দিরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে—ঐটি নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মেয়েরা শুনেই শিব-সন্দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গাড়ী থেকে উঁকি মেরে দেখলুম অতি সাধারণ একটি মন্দির। স্থাপত্যকলার কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। বললুম—৬টা বাজলেই দিলবারা মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। আগে চলো দিলবারা দেখে আসি। ফেরার পথে নীলকণ্ঠ মহাদেবের সন্ধ্যারতি দেখে ফেরা যাবে। প্রস্তাবটা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হল। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো।

আবু মোটর সার্ভিসের রিটায়ারিং রুম্ থেকে দিলবারা মন্দিরের দূরত্ব দেড় মাইলের বেশী নয়। অধিকাংশ যাত্রীই পদব্রজে যাতায়াত করে। আমরা গাড়ীতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলুম।

মন্দিরের প্রবেশ পথের মুখেই 'টেম্পেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস'। এইখানে মাথাপিছু পাঁচসিকা দক্ষিণা দিয়ে যাত্রীদের মন্দির দর্শনের অনুমতি পত্র নিতে হয়। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত মন্দির দেখবার সময় নির্দ্দিষ্ট। যে কোনও ভারতীয় যাত্রীকে মন্দিরে প্রবেশ

করতে দেওয়া হয়। জাতি ধর্মের কোনো বাধা নেই। কেবল অস্ত্রধারীর দর্শকদের আগুর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ পত্র না আনলে মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি জিনিস নিয়ে যাওয়া নিষেধ—যেমন তোয়ালে, পাগড়ী, অস্ত্র-শস্ত্র, লাঠি ছড়ি ছাতা, জুতা, চামড়ার কোনও জিনিস, যেমন ক্যামেরা, ম্যাগনোকুলার, দূরবীণ, চশমার খাপ, রিষ্টওয়াচ ব্যাণ্ড, ইত্যাদি। মন্দিরের মধ্যে ধূমপান শুধু নিষেধ নয়—অপরাধ বলেও গণ্য।

ছুতোর জিনিস আমাদের সঙ্গে সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুগুলিই ছিল। মন্দিরের দ্বারপালের কাছে আমরা একটি একটি করে সবাই সব কিছু জমা রাখতে তবে আমাদের অগ্রসর হতে দিলে। কেবল চর্মগুলি নিয়ে যাবার অনুমতি পেলুম। দ্বারপালের খাপটি ছিল চামড়ার, কিন্তু বেল্টটি ছিল রৌপ্যের স্থান উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত। দ্বার-পালের সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার কাছে জমা রেখে ক্যামেরাটি নিয়ে

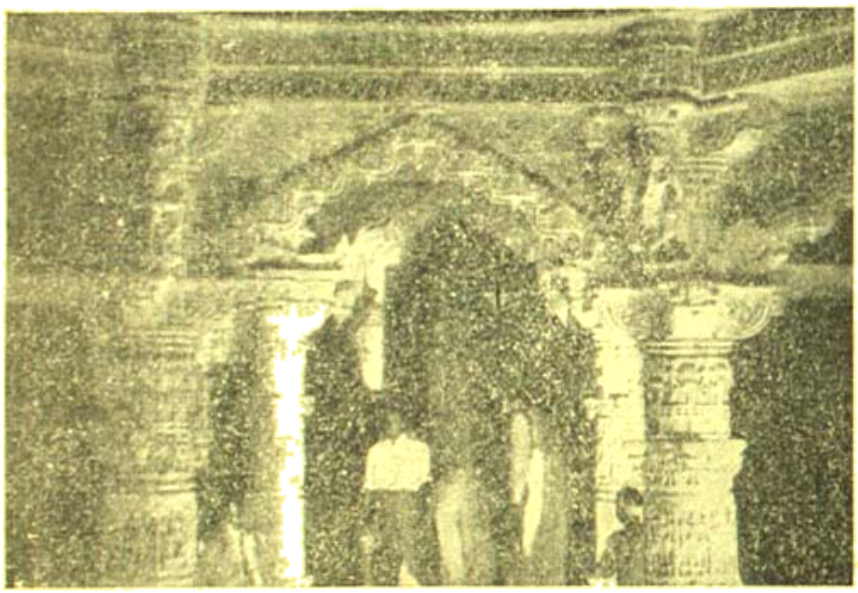

দিলবারা মন্দিরের মণ্ডপ বা নাটমন্দির

করে সঙ্গে নেওয়া হ'ল। ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেবার আগে তিনি সেটি নিয়ে বেশ করে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করে দেখলেন তার মধ্যে কোথাও চামড়ার কোনওপ্রকার কিছু সংস্রব আছে কিনা; কারণ কোনও জিনিসের সঙ্গে এতটুকু চর্ম সম্পর্ক থাকলেও তা নিয়ে যাওয়া নিষেধ। বুঝতে পারলুম—এদের প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসটাই বর্তমানে এই নিয়মে পরিণত হয়েছে।

যেখানে আমাদের কাছে দক্ষিণা নিয়ে প্রবেশপত্র দেওয়া হ'ল, ঠিক তার সামনেই একটি প্রাচীন মন্দির চত্বরের দেখে আমরা ভেবে-ছিলুম এইটিই বুঝি দিলবারা মন্দির। বিশাল দেউল। এলাও পাষাণ সোপান উঠে গেছে পথ থেকে প্রায় আধ ক্রোশ উঁচু পর্যন্ত। মন্দিরটির আকৃতি দেখে খুব পুরাতন বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সেটি প্রকৃতপক্ষে মর্মর শিলায় নির্মিত নয় এবং তার স্থাপত্য কলা ও কারু কার্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করতে পারে। কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে এ মন্দির কখনই সেই জগদ্বিখ্যাত দিলবারা মন্দির নয়।

আমাদের অনুমান যে ভুল নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল একজন পথপ্রদর্শকের কাছে। অত্যন্ত পরিচিতের মতো কাছে এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার হিন্দীভাষায় বললে—আসুন, মন্দির দেখতে যাবেন তো আপনারা? চলুন এই পথ দিয়ে। আমি সব মন্দিরগুলি আপনাদের ভাল করে দেখিয়ে দেব।

'সব মন্দির?' এবার জানতে চাইলুম 'এখানে দিলবারা মন্দির ছাড়া আরও অন্য মন্দির আছে নাকি?'

পথপ্রদর্শক ছেলে বললে—আজ্ঞে হাঁ, 'দিলবারা' বললে তো কোনও একটি বিশেষ মন্দিরকে বোঝায় না। 'দিলবারা' শব্দটির অর্থ হল 'মন্দির ভূমি' বা তীর্থস্থান। এখানে পাশাপাশি পাঁচটি মন্দির আছে, তাই এস্থানের নাম 'দিলবারা' বা 'মন্দির-তীর্থ'। অবশ্য পাঁচটি মন্দিরই সমান নয়। ওর মধ্যে প্রধান হ'ল দুটি—'বিমলশাহী মন্দির' আর 'বস্তুপাল-তেজপাল মন্দির'

বুঝলুম দিলবারা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনি। লোকটিকে সঙ্গে নিতে হ'ল।

মন্দিরের সামনে গিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। ও হরি! এর নাম 'দিলবারা'? অতি সাধারণ চুনকাম করা ইঁটু পাথরের সাদাসিধা প্রাচীর। মধ্যে একটি মাঝারি রকম প্রবেশ দ্বার। কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, শিল্পকলার চিহ্ন মাত্র চোখে পড়ে না কোথাও। আমাদের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। যাব কি যাব না ভাবছি। মোটর খানা ছেড়ে না দিলেই ভাল হ'ত। আমাদের মালিক দিয়ে সে চলে গেছে। ৩টার পর আবার নিতে আসবে বলে গেছে!

পথপ্রদর্শক ডাক দিলে—ভিতরে আসুন।

বললুম—ভিতরে এর চেয়ে ভাল কিছু দেখবার আছে কি?

লোকটি হেসে বললে—এর ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বহিরঙ্গন পার হয়ে তবে আসল মন্দিরে ঢোকবার প্রবেশ দ্বার পাবেন। এটাও কিছুই নয়। মন্দিরটিকে বিধর্মী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্য বাইরে দিকে এ একটা ছলনার আবরণ মাত্র! এটি না থাকলে কি আপনারা কেউ আজ 'দিলবারা' এমন অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেতেন? আহম্মদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা অনেকদিন ওঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। বার বার বিদেশী আক্রমণ করেছে তারা। দিলবারার সন্ধান পেলে কি রক্ষা ছিল!

কথাগুলো যেহাৎ যাদের যা যুক্তিহীন মনে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রবেশ করলুম তার সিংহ সিংহ। বহিরঙ্গন উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যখন মূল মন্দিরের মর্মর তোরণ দ্বারে এসে দাঁড়ালুম—আমরা একেবারে নিস্পন্দ! বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা যাকে বলে।

প্রবেশ দ্বার খুব বড় বা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু যেই পাথরে গড়া সেই মন্দির তোরণের প্রতি ইঞ্চিটি এমন নিখুঁত ও সূক্ষ্ম শিল্প কাজের দ্বারা নিবর্শনে সমাচ্ছন্ন যে তা দেখে নির্বাক না হ'য়ে উপায় নেই! একটুও বোঝা যায় না যে এসব পাথর। মনে হয় যেন শাদা মোমের ছাঁচে গড়া সেই ফুল লতা পাতা ও মূর্তিগুলির কমনীয় সুষমা এখন রৌদ্রতাপে এখনি গলে যাবে বুঝি বা!—এমনিই পেলব কোমল তার আবেদন!

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বিমল শাহের নামে এই মন্দিরটির নাম হয়েছে 'বিমলশাহী মন্দির'। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ প্রথম ভীমদেবের প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত বিমলশাহ যাত্রা কোটী টাকা ব্যয় করে পৃথিবীর এই পরম বিস্ময়কর মর্মর মেউল নির্মাণ করিয়েছিলেন। কথিত আছে যে ওদানীন্তন আবু পর্বতের অধীশ্বর প্রামারা রাজের কাছে তিনি যখন মন্দির নির্মাণ উপযোগী ভূমি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন প্রামারারাজ উপেক্ষাভরে হাসি হেসে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—"ভীমদেবের উদ্ভট খেয়ালকে মেটানো যে প্রামারা রাজ অধীনে কোন ব্যবসা করে না। কতটাকা আছে তোমাদের বিমল শাহের? সমস্ত জমীটা সে যদি রজত মুদ্রায় ঢেকে দিতে পারে তাহ'লে আমি দিতে পারি এ জমী তাকে।"

মন্দির নির্মাণে মূল সংকল্প বিমলশাহ সেই খুলা দিয়েই জমী সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু কারা সেই যাদুকর শিল্পী—কঠিন পাষাণকে নিয়ে যারা এমন কোমল মানবের প্রাণ মধুরা রূপান্তরিত করে তাকে অপরূপ রূপ দিয়েছিলেন! মহাকালের অতল বিস্মৃতির গর্ভে তাঁরা আজ বিলিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অনামান্ত সৃষ্টি আজও অক্ষয় হয়ে আছে। মন্দির দ্বার উত্তীর্ণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমরা দিয়ে পৌঁছলুম একটি মাথা ঢাকা চকমিলানো চতুষ্কোণ অলিন্দ বা চত্বরে। সমস্ত মন্দিরটির চারিপাশ ঘিরে আছে এই প্রশস্ত চত্বর। চত্বরের কোণেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি গম্বুজাকৃতি মণ্ডপ এবং এই মণ্ডপের সম্মুখেই প্রধান মন্দিরটি স্থাপিত।

মন্দির প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ হ'লেও আয়ত ক্ষেত্রের (Oblong) আকার। চারপাশের অলিন্দটি অঙ্গন থেকে আন্দাজ একফুট উঁচু। মণ্ডপের সমতল ভূমিও অঙ্গন থেকে অন্ততঃ একধাপ অর্থাৎ প্রায় ৭ ইঞ্চি উঁচু। আর প্রধান মন্দিরের চত্বর প্রায় দু ফিট উঁচু। তিনটি ধাপ বেয়ে তবে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। অঙ্গনটি দৈর্ঘ্যে ১৪০ ফিট এবং প্রস্থে ৮০ ফিট। চারপাশের অলিন্দ আন্দাজ ৮ফিট চওড়া। এই অলিন্দের ছাদটিকে ধরে আছে ৫৮টি স্তম্ভ।

পূর্বেই বলেছি অলিন্দের কোলেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ, কিন্তু অলিন্দের পিছনেই মন্দিরের উচ্চপ্রাকার বেষ্টনী। বাইরে থেকে দেখলে অন্য প্রাকার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না, কিন্তু মন্দিরে ঢুকে এই প্রাকারের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উল্টো পিঠে পূর্বোক্ত চতুষ্পার্শ্ব পরিবৃত অলিন্দের পিছনে সারি সারি পরের পর ৫২টি ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠগাত্রে

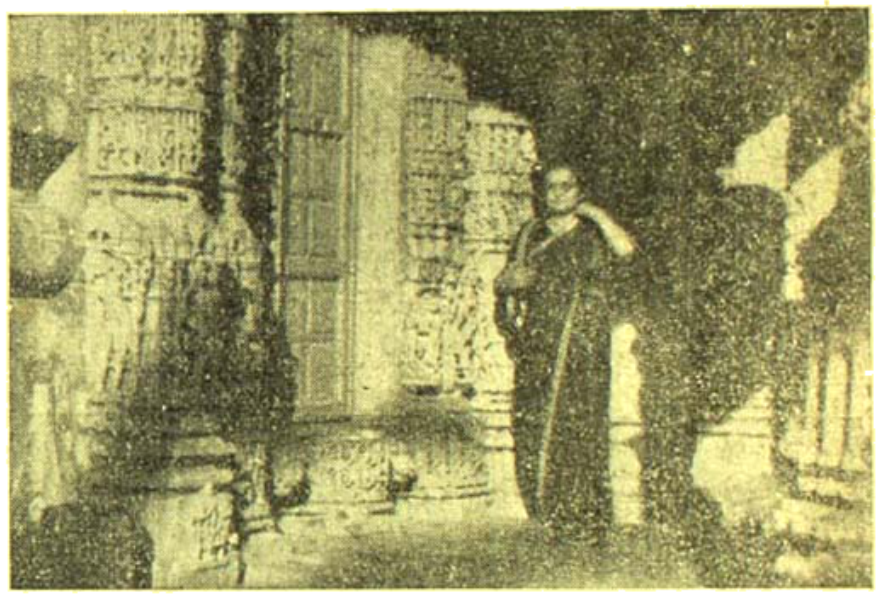

মণ্ডপের মধ্যে

অন্তঃপ্রবিষ্ট মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের দরজার দুপাশে জোড়া জোড়া অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের থাম। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি জৈন তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে।

আমরা প্রথমেই এই দীর্ঘ অলিন্দ প্রদক্ষিণ করে চারপাশের প্রত্যেক ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে ঢুকে ঢুকে সেই ৫২টি তীর্থঙ্করের মূর্তি দর্শন করলুম। অলিন্দের ছাদের নিম্নভাগ (ceiling) এক একটি ছোট ছোট চতুষ্কোণ চন্দ্রাতপে বিভক্ত। ছাদের এই অভ্যন্তর ভাগের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণগাত্রপতাকারগুলি, প্রত্যেক ছোট বড় শিল্প সমৃদ্ধকীর্ণ স্তম্ভটি এবং একস্তম্ভ থেকে অপরস্তম্ভের শীর্ষদেশে যে বিচিত্র কারুখচিত পুষ্পবল্লু আকারের তোরণ-মালা সংযুক্ত-সে সব দেখতে দেখতে বিস্ময়বিমূঢ় ও মোহাভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়।

স্মৃতিপথে ভাসর হয়ে উঠছিল বহুকাল আগে পড়া Abbe Dubois

এর Memoirs of Travels in India. তিনি এই মন্দির দেখে লিখে রেখে গেছেন—"The sight alone of these enchanting beauties is sufficient to intoxicate the senses of the blessed and to plunge them into a perpetual ecstacy that is far superior to all mere earthly pleasures.

এই অমরালোকের ভাবুক সাধক, ধর্মপ্রাণ বিদেশী সন্ন্যাসী—তবু একবার চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়ে যায়, সে ভাগ্যবানের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি অপরূপ বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং তার সমস্ত চিত্ত এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে তন্ময় হয়ে পড়বে, কোনও পার্থিব সুখের সঙ্গেই সে অনুভূতির তুলনা করা চলে না। পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় ভরা সে যেন এক লোকোত্তর পরমানন্দ!

মন্দিরের ছাদের একটি চন্দ্রাতপ

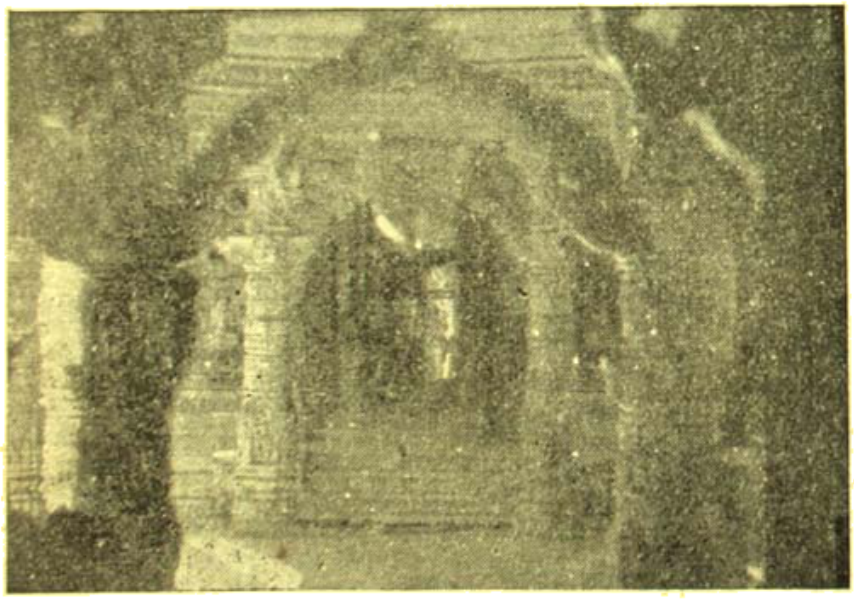

প্রধান মন্দির

আলোক চিত্রে এ অলোকসামান্য মন্দিরের সমগ্র সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না। মুক্তাধবল তুষারশুভ্র মিনার সাড়া [illegible] ঝলমল ঝেটলাট, এই। মর্ম্মর-স্বর্গ তাজমহলের অনুপম কারুকার্য্যও এর পাশে যেন ম্লান হয়ে যায়। দিলবারার শিল্পীরা যেন সিদ্ধ কারুমন্ত্রে জড় পাষাণকে জীবিত করে তুলেছেন! কঠিন পাথর যেন তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া লেগে সদ্যবিকশিত পুষ্পগুচ্ছের মতো ওরে ওরে অপরূপ সৌন্দর্য্য ঝিরে ফুটে উঠেছে! নবনীত কোমল যেন তার সুকুমার পরশ, শেলব কঠিনী যেন তার লাবণ্যের সুষমা। মনে হয় বুঝিবা—'সহেনা ভ্রমর চরণ ভার!'

প্রত্যেকটি পাষাণ স্তম্ভের মূলপ্রান্ত থেকে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত এত রকমের বিচিত্র কারুকার্য্যে মণ্ডিত যে অবাক হয়ে ভাবতে হয়—না জানি শিল্পীর কত যুগযুগান্ত কেটে গেছে এই এক একটি স্তম্ভ উৎকীর্ণ করতে। প্রত্যেকটি মর্ম্মর-তোরণ-মালিকা এবং ছাদের বিরহাগের প্রত্যেক ছত্রী বা চন্দ্রাতপতল (ceiling) এমন বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত যে সেই শিল্প শোভার দিকে মাথাটি পিছনে হেলিয়া ঊর্দ্ধনেত্র অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যায়, তবু যেন চোখে আশ মেটে না! সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর হল এই, যে—প্রত্যেকটির পরিকল্পনাই নূতন ও স্বতন্ত্র। কোনোটিই কোনোটির অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়!

শতাব্দী আগে যা লিখে রেখে গেছেন তার একবর্ণও অতিরঞ্জিত মনে হয় না। যথার্থই এই মন্দিরের মোহিনীরূপ ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য

ক্রমশঃ

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—ছয়—

নাজীপুর থানা থেকে রঞ্জুর বাবা বদলি হলেন।

চাকরীতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। মফঃস্বলের একটি ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার ইন্-চার্জ হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই মুরু হয়ে গেল বাঁধাছাদার পালা। লীলাবতী আত্রাই, ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, রুক্ষকাটার হাইতোলা মজে-আসা আলেয়াদীঘি, রবিশস্যে ভরা ইস্কুলে যাওয়ার মাঠটা, মশানীর মন্দির, কবিরাজের বড় আমবাগানটা আর অবিনাশবাবুর ভাঙা আশ্রম; বাদল, অশ্বিনী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, উষা, নিশিকান্ত আর অবিনাশবাবুর ওপর দিয়ে চিরদিনের মতো যবনিকা নেমে এল।

ছেড়ে আসতে খুব কি দুঃখ হয়েছিল রঞ্জুর? না। এই ছোট গ্রাম, এই থানা, এই গঞ্জ। এর বাইরে আর একটা বিশাল এত বিশাল, যে রঞ্জু কল্পনাও করতে পারে না—একটা দেশ আছে। তার উত্তর-পূর্বে কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, হিমালয় আর খাসিয়া জয়ন্তীয়ার অলঙ্ঘ্য বিস্তার, তার দক্ষিণে গাঢ় নীল ঢেউ নিয়ে নেচে নেচে খেলা করছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। কলকাতা, কাশী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। সে এক আশ্চর্য দেশ, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। মানচিত্রের ওপরে নানা রঙের ছাপ আর নানা বিচিত্র নামের ভেতরে রঞ্জু তাদের নাজীপুরের নাম কোথাও খুঁজে পায়নি। এই বিপুল দেশের কাছে তাদের নাজীপুর কত ছোটো, কত নগণ্য!

মনে আছে রঞ্জু এই ভারতবর্ষের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ডাক শুনেছিল হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরামের, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগরের। পৃথিবীর পথে যাত্রা মুরু হল তার। ধুলো-ভরা যে মেটে পথটা উঁচু উঁচু তালগাছের হাতছানিতে তার মনটাকে বারে বারে নিয়ে গেছে পাশাবতীর পুরীতে, শঙ্খমালার দেশে, একদিন সন্ধ্যাবেলা গোরুর গাড়ীতে করে সেই পথ দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়ল মানচিত্রে আঁকা আশ্চর্য দেশটার সন্ধানে।

গোরুর গাড়ির পেছনে ছইয়ের ভেতরকার ছোট কাটা জানলাটা দিয়ে ঘুম-ঘুম বিহ্বল চোখ মেলে সে দেখছিল একটু একটু করে কেমনভাবে নাজীপুরের দুটো-চারটে মিটমিটে আলো ক্রমশ পেছনে সরে যাচ্ছে। শুধু অন্ধকারে কবিরাজের আমবাগানটাকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে এখনো, যেন শেষবারের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কারা যেন কী একটা কথা বলতে চাইছে রঞ্জুকে। রঞ্জুর গা ছম ছম করে উঠল, ভয় করতে লাগল। মুহূর্তে সে ছইয়ের ভেতরে মাথাটা টেনে নিলে, তার পর মার কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। আর অনুভব করতে লাগল অসমতল এলোমেলো রাস্তায় গাড়িটা কেমন মাতালের মতো টলতে টলতে অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবী। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের তুষার তীর্থের পথে।

• • • •

শহর। যেখানে ঘোড়ার গাড়ী আছে, মোটর আছে, রেলের ইস্টিশন আছে। যেখানে দোতলা-তেতলা মস্ত মস্ত দালান, যেখানে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধানো, যেখানে রাস্তার পাশে পাশে রাত্তিরে আলো জেলে দিয়ে যায়। যেখানে সাবধানে চোখ চেয়ে পথ না চললে তুমি গাড়ি চাপা পড়তে পারো, অন্য মানুষের সঙ্গে তোমার গায়ে ধাক্কা লাগতে পারে। রঞ্জুর জীবনে সেই প্রথম শহর। নাম—ধরা কি মুকুন্দপুর।

নিতান্তই মফঃস্বল শহর। শ্রী নেই, রূপ নেই, স্বাস্থ্য নেই। বর্তমানের চাইতে অতীতের জীর্ণ একটা সোঁদা গন্ধই যেন চারদিকে পাক খেয়ে বেড়ায়। ধুলো আর

অপরিচ্ছন্নতা। কাঁচা ড্রেনে দুর্গন্ধ সবুজ কাদা। পচা পুকুর আর জংলা আমের বাগান। পাড়াগুলো অনাবশ্যক ভাবে দূরবিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট—যেন একটা দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে খামখেয়ালের বশে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রঙ্গুর কাছে সেই প্রথম শহর। এর জীর্ণ নিরানন্দ রূপ প্রথম দৃষ্টিতেই যেন তাকে জয় করে নিলে। নাগীপুরের তুলনায় কত বিরাট, কত বিচিত্র! তার কুন্দপুরের চাইতে বহু দূরের শহর কলকাতা অনেক বড়, অনেক আশ্চর্য—এ কথা তার বিশ্বাস হত না, এ কথা ভাবতে তার কষ্ট হত।

শহরের সঙ্গে পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। একটা বিপ্লব দেখা দিলে সংসারে। এতদিনের নিশ্চিন্ত সহজ জীবনে জটিলতার গ্রন্থি-বন্ধন অনুভব করলে রঙ্গু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় থানা থেকে বাবা যখন কোয়ার্টারে ফিরলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ থম থম করছে। শুভ্র বিস্তীর্ণ ললাটে কতগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠেছে, একদিনের মধ্যে যেন কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে বাবার। সেদিন বাড়ির ছোট বোনগুলো পর্যন্ত চেঁচিয়ে কাঁদতে সাহস পেল না, আস্তাবল থেকে ঘোড়ার সহিসটার সিন্ধি খাওয়া গলার রামায়ণের সুর শোনা গেল না, বড়দার ঘরে সন্ধ্যাবেলার নিয়মিত গানের মজলিশ বসল না, ঠাকুরমা গলা খুলে একবারও চেঁচিয়ে উঠলেন না। একটা অশুভ আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত বাড়িটা ডুবে রইল স্তব্ধতার মধ্যে।

কয়েক মাসের ভেতরেই যেন অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে পাক খেয়ে গেল পৃথিবীটা। সেই সব দিনগুলো ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো (রঙ্গু তখনো সিনেমা দেখেনি) পর পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অপসারিত হয়ে গেছে, একটার পর আর একটা জড়ানো—সবগুলো মিলে এইটে মনে পড়ে—বাবার চাকরী গেল।

আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ করে তাঁর চাকরী গেল। যতদূর মনে আছে এস্-পির সঙ্গে কী একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। বাঙালী পুলিশ সাহেবের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল এবং তার ফলে ঘা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

লজ্জায়, অপমানে এবং অবিচারের ক্ষোভে বাড়িতে মৃত্যুশোকের ছায়া নেমে এল। কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল, বন্দুক রিভলবার রইল না, ঘোড়াটা বিক্রী করে দিতে হল। তারপর আশ্রয় নিতে হল শহরের প্রান্তে একটা ভাঙা বাড়িতে।

মা বললেন, এখানে থেকে আর কী হবে? চলো, দেশে চলে যাই।

বাবা কঠিনভাবে বললেন, না।

—কিন্তু এখানে থাকা কত বড় অপমান সে কি বুঝতে পারছ না?

বাবা বললেন, না। অপমান এতদিন ছিল, এবার সে অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

সেইদিন রাত্রে রঙ্গুর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল একটা।

সন্ধ্যার পরেই বাড়ির যত বিলাতী কাপড়, পুলিশী ইউনিফর্মের অবশেষ, একগাদা টুপি, দু-তিনখানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট স্তূপাকার করে উঠোনে জড়ো করা হল।

ঠাকুর মা আর্তনাদ করে উঠলেন: খোকা, এ তুই করছিস কী। এত দামি দামি সব কাপড় জামা—

বাবার গলার স্বর পাথরের মত শক্ত শোনাল: তুমি চুপ করো মা।

কিন্তু দু তিনশো টাকার জিনিস-পত্তোর—

—অপমানের শেষ চিহ্নটুকুও রাখব না। অনেক আবর্জনা জমেছিল, আজ পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেব।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন ঠাকুরমা। তারপর জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে উঠে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর আবার হাঁপানির টান উঠেছে। তবু সে অবস্থাতেও ঘরের ভেতর থেকে তাঁর একটা অব্যক্ত আর অস্পষ্ট কান্না-ভরা বিলাপ শোনা যেতে লাগল।

বাবা কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজের হাতে আধ টিন কেরোসিন এনে ঢেলে দিলেন কাপড়ের স্তূপের ওপর, জেলে দিলেন দেশলাইয়ের কাঠি। আগুন নেচে উঠল।

অন্ধকার উঠোনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অতি তীব্র খানিকটা আলোর দীপ্তিতে। উঠোনের বেটে পেয়ারা

গাছটার মাথা ছাপিয়ে শিখাগুলোর সরীসৃপ রেখা আকাশের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। কাপড়, আলপাকা, পট্টু, তুলো আর পোড়া কেরোসিনের দুর্গন্ধে বিস্বাদ হয়ে হয়ে উঠল বাতাস। অনেক অপমান, অনেক পাপ—এক সঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাবা নিশ্চল একটা মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইলেন। আগুনের একটা লাল আভা এক একবার তাঁর মুখের ওপরে পড়ে সরে সরে যেতে লাগল, কেমন আশ্চর্য আর ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল তাঁকে। আর মাঝে মাঝে তাঁর চোখ সম্মুখের ওই আগুনটার চাইতেও দীপ্তিত হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। সেই চোখ, ঠিক সেই চোখ—যে চোখ সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—সেই তিরিশ সালের বন্যার সময়। রঙ্কুর কেমন ভয় ধরেছিল, কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন অকারণে মনে হয়েছিল বাবা যেন আজ প্রকৃতিস্থ নেই। তাঁকে যেন আজ ভূতে ধরেছে, একটা প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। সেকি অবিনাশবাবুর প্রেতাত্মা?

যতক্ষণ আগুনটা জ্বলল ততক্ষণ বাবা তেমনি নিশ্চল হয়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তারপর একটা উত্তপ্ত অন্ধকারে উঠোনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল, একটা রক্তাক্ত ক্ষতের মতো কিছুক্ষণ ধরে ধপ ধপ করতে লাগল বিস্তীর্ণ একটা অগ্নিশয্যা, বাতাসে পোড়া ছাইগুলো এলো-মেলোভাবে উড়তে লাগল।

সেই রাত্রেই বাবা ওদের তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

লণ্ঠনের আলোয় বাবার আর এক মূর্তি সেই যেন প্রথম চোখে পড়ল রঙ্কুর। মেজেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসন পেতে তিনি বসেছেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গ দেহে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধপ ধপ করছে, একটা অপূর্ব শুচিতার প্রশস্ত কপাল জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর। আঠারো বছরের জমাট গ্লানি থেকে সত্যিই আজ মুক্তিস্নান হয়েছে যেন। আঠারো বছর ধরে বাবার এইরূপ, এই ব্রাহ্মণোত্তম মূর্তি কোথায় লুকিয়েছিল?

সামনে বসে মা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব পড়ছিলেন। ছেলেদের পায়ের শব্দে তিনি বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকালেন। তারপর মহাভারত বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাবা বললেন, বোসো তোমরা।

তিন ভাই সভয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালো। কেমন অভিভূত হয়ে গেছে তারা। ঘরে ধূপ জ্বলছে, কোথা থেকে চন্দনের সুগন্ধ আসছে। যেন ঠাকুর ঘরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে একটা। তিন ভাই কুণ্ঠাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্যদিন হলে হয়তো বাবা একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। কিন্তু ওই হরিণের চামড়ার আসন, গলায় ওই ধবধবে পৈতেটা, চন্দন আর ধূপের গন্ধ—সব মিলিয়ে যেন সব কিছুর একটা আশ্চর্য রূপান্তর হয়ে গেছে। প্রশান্ত স্বরে বাবা আবার বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো সব ওখানে।

সসঙ্কোচে তিনজনে বসল। বসল মাটিতে চোখ নামিয়েই। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো শিক্ষা অথবা সৎসাহস ওরা এ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে নি।

—তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি।

তিন জোড়া কাণ উৎকর্ণ হয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বাবা বললেন, আজ তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

তিন জোড়া চোখ একবারের জন্যে একটুখানি উঠেই আবার মাটির দিকে নেমে গেল। বিস্ময়ে ওদের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, একটা বিশ্রী অস্বস্তি ওদের পীড়ন করছে।

—প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী করবে না। আর মনে রাখতে হবে যাঁদের কাছে ন্যায় নেই, বিচার নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

যন্ত্রচালিতের মতো তিন ভাই উচ্চারণ করলে, প্রতিজ্ঞা করলাম।

প্রতিজ্ঞা! রঙ্কু জানে সবচেয়ে সার্থক প্রতিজ্ঞা, সব চাইতে বড় সংকল্প সেদিন সে উচ্চারণ করেছিল। এর গুরুত্ব সেদিন সে বুঝতে পারে নি, সেদিন এর বিন্দুমাত্রও তার পক্ষে অনুমান করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা ভুলতে পারে নি। ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মিথ্যা বলতে পারা যায় না, তেমনি

ধূপ-চন্দনের গন্ধে ভরা শুচিতার আবিষ্ট সেই ঘরটিতে, হরিণের চামড়ার আসনে বসে থাকা সেই উজ্জ্বল দীপ্ত মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে সংকল্প সে নিয়েছিল, তার অনিবার্য নির্দেশের লৌহ-তর্জনী প্রদায়িত হয়ে রইল তার আগামী ভবিষ্যতের দিকে।

শিলালিপিতে আর একটি আঁচড় পড়ল।

এইবারে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা দিল রঘু।

এতদিন একটা গণ্ডি ছিল তার—নিষেধের একটা বেড়া টানা ছিল চারদিকে। এইবার খোলা পৃথিবী থেকে দমকা বাতাসের ঝাপ্টা এল একটা, যে বেড়ার আর চিহ্নমাত্র রইল না। প্রকাণ্ড জগৎটাকে দেখতে চেয়েছিল রঘু, তাই সে প্রকাণ্ড জগতের মানুষগুলো তার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

স্রোতের মতো চলে গেছে সময়, দু বছর বয়েস বেড়েছে রঘুর। নতুন পরিবেষ্টনীর সঙ্গে অভ্যস্ততা পুরোপো হতে হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা একটা জমিদারী কাছারীতে ম্যানেজার হয়ে বসেছেন—মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রাচুর্য এখন আর কষ্ট দেয় না। ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি না হলেও এখন রঘুর খাওয়া হয়, ক্ষীরের মতো দুধ না হলে এখন আর কান্না পায় না, মাসে মাসে নতুন জামা জুতো এল কিনা সে সম্পর্কে এখন আর সজাগ থাকবার দরকার আছে মনে হয় না। ছেঁড়া প্যাণ্ট্, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—পাড়ার মধ্যবিত্ত ছেলেদের সঙ্গে সে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

পাড়ার নাম মনসাতলা। নামটা হওয়ার একটা কারণ আছে। এই পাড়ার চৌমাথার তিনকোণা একটা দ্বীপের মতো এককালি জমি ছিল। কতদিন আগে কে জানে—কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে বট অশ্বত্থের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দুটি গাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে বড় হয়েছে, রচনা করেছে বিস্তীর্ণ একটা বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। এই জোড় গাছের তলায় প্রতি বছর ঘটা করে মনসা পুজো করা হয়, বিষহরির গান হয়। তাই পাড়ার নাম হয়েছে মনসাতলা।

এই মনসাতলায় শান্ত ছায়ার নীচে কী মনে করে মিউনিসিপ্যালিটি লম্বা একটা সিমেন্টের বেঞ্চি তৈরী করে দিয়েছে। ফলে এটা হয়েছে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় পাড়ার সকলের একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই জায়গাটা ছেলেদের দখলে থাকে। বেঞ্চিটা যখন প্রথম তৈরী করা হয়, তখন কাঁচা সিমেন্টের ওপর কোনো এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা (ছেলেরা তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ) ষোলো ঘুটি বাঘবন্দীর গোটা কয়েক ছক তৈরী করে রেখেছিলেন। ছেলেরা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা থেকে খোয়া কুড়িয়ে এনে সেখানে বসে বসে খেলতে বসে যায়, ছাগলের চক্রব্যূহে বাঘকে বন্দী করে ফেলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে। বেঞ্চিটার নীচে মাটিতে সারি সারি ছোট ছোট গর্ত—বেশ যত্নসহকারে গর্তগুলোকে নিখুঁত গোলাকার করবার চেষ্টা হয়েছে। সকালে বিকালে এবং রবিবারের সমস্তটা দিন ধরে সেখানে মার্বেল খেলা চলে।

মার্বেল খেলার সে সব সাংকেতিক বাক্যগুলো আজও দুটো চারটে মনে পড়ে। ইংরেজি ভাষার অমন অপূর্ব সদ্ব্যবহার বোধ হয় আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'সিংগিল্ মেলালিং' মেলালিং এও না।

"উড্ড্ কিপ্"—(মার্বেল মাটি উঁচু করে বসিয়ে দাও।)

"হাত ইস্টেট"—(হাত উঁচু করে ইচ্ছেমতো মারো।)

"ঠ্যাকাউন্স্ বাই ফস্টি ফিপ্টি ছাও"—(আটকে দিলেই মার্বেল চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।) এই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠত মার্বেলের ঠকাঠক শব্দ। কে কতটা মার্বেল কাটাতে পারত এই ছিল কৃতিত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পরে যখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাঘবন্দীর 'কোট' আর মার্বেলের গর্ত ছেড়ে ছেলেদের বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হত, তখন এই মনসাতলায় এসে বসতেন পাড়ার অভিভাবকেরা। সাধারণ মফঃস্বল শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তদের মতোই তাঁরা আদালত আর কাছারী নিয়ে আলোচনা করতেন, রাজনীতির শ্রাদ্ধ করতেন, সুযোগমতো কিস্‌ফাস করে পরের হাঁড়ির খবরাখবর নিয়ে গবেষণা করতেন, মিউনিসিপ্যাল্ কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা পর্যালোচনা করে আগামী নির্বাচনে সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবার পরিকল্পনা দিতেন। আর মাঝে মাঝে মার্বেল

খেলার গর্তে গা পড়ে কেউ কেউ যখন হোঁচট খেতেন তখন তাঁদের উত্তেজনা আরো বেশি বেড়ে উঠত। জাতির এই সব অপোগণ্ড বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁরা ভৈষবাণী করতেন এবং স্থির করতেন, পরের দিন মার্বেল খেলতে এলেই হতভাগাগুলোকে ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেবেন।

কিন্তু আগের রাত্রির কথা পরের দিন তাঁদের মনে থাকত না। আর বেলা সাড়ে আটটা না বাজতেই হৈ হৈ করে মার্বেল নিয়ে ছেলের দল এসে পড়ত।

এই দলের যে পাণ্ডা ছিল তার নাম ভোনা।

বেঁটে চেহারার ছেলে, শরীরের ওপরের দিকটার চাইতে নীচের দিকটা বেশি মোটা। পায়ের পাতা দুটো এত বেশি বড় যে সেই বারো তেরো বছর বয়েসেই ভোনা তার বাবার একটা পুরোণো ছেঁড়া চটি পরে আসত। খেলার সময় যখন দৌড়োত, তখন হাতীর চলার মতো শব্দ উঠত থপ থপ করে। গালের ডানদিক দিয়ে সব সময়ে বেরিয়ে থাকত জিভের ডগাটা—মনে হত সারাক্ষণ যেন কাউকে ভেংচে চলেছে সে।

আর মুখখানা। ওরকম পাকামিভরা মুখ হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। নীচের ঠোঁটে কয়েকটা কালো কালো দাগ পড়েছিল তার—ছেলেরা বলত ভোনা লুকিয়ে বিড়ি টানে। আর হিন্দুস্থানীরা খৈনি খেয়ে যেমন করে থুথু ফেলে, তেমনি করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলত সে। অভ্যেসটা কোত্থেকে আয়ত্ত করেছিল সেই জানে।

মার্বেল খেলায় ভোনার হাত ছিল পরিষ্কার। দৈনিক অন্তত দুগণ্ডা করে সে মার্বেল জিতত, বোলো ঘুঁটি বাঘবন্দী খেলায় তাকে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। তা ছাড়া অনর্গল কথাবার্তা বলতে পারত চোখেমুখে, আর কোমর দুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নেচে নেচে আলিবাবার গান গাইত :

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল
এত্তা বড়া উঠানমে এত্তা জঞ্জাল—"

বলা বাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে নেতা হওয়ার পক্ষে এই গুণগুলোই যথেষ্ট। বাপের ছুতো জোড়া পায়ে দিয়ে বাপের মতোই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভোনা। কিন্তু সে গুণাবলী ক্রমশ প্রকাশ্য।

রঙ্কুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা সেভাবে হওয়া উচিত সেই ভাবেই হল। একটা প্রকাণ্ড মার্বেল নিয়ে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছিল ভোনা, আর মাঝে মাঝে সেটাকে হাতের তেলোতে তুলে নিয়ে সকলকে ওপরুদ্ধ করে তুলছিল। তারপর হঠাৎ রঙ্কুর দিকে চোখ পড়তেই প্রশ্ন এল : এই গঙ্গাফড়িং, তোর নাম কিরে?

অপমানে কান লাল করে রঙ্কু ফিরে যাচ্ছিল, ভোনা এসে তার কাঁধে হাত দিলে।

—আরে চটছিস কেন? তোকে গঙ্গাফড়িং বললাম, তুই না হয় আমাকে ভোঁদড় বলবি। চটাচটির কী আছে তাই? এই নে—কামরাঙা খাবি?

এরকম লোকের ওপরে রাগ করা শক্ত। রঙ্কু হেসে ফেলল।

—হাসি ফুটেছে? আঃ—বাঁচালি। কারো গোমড়া মুখ দেখলে বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। নে—খা এই কামরাঙাটা। ভয় নেই, টক নয়। পিটার সাহেবের বাগান থেকে চুরি করা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি।

ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যেন বাধে রঙ্কুর। মনস্তাত্ত্বিক অন্যান্য ছেলেদের মতো—ভোনাকে তার ভালো লাগে, একধরণের শ্রদ্ধাও আছে তার সর্বাঙ্গীণ দক্ষতার ওপরে। তবু কোথায় যেন মনের দিক থেকে মস্ত একটা বাধা আছে, ভোনাকে সে ঠিক গ্রহণ করতে পারে না।

বৈশাখের দুপুর। ইস্কুলে গরমের ছুটি—বাড়ি থেকে পালাবার সুযোগ এবং অবকাশের অভাব হয় না। আম-বাগানে ছেলেদের আড্ডা জমেছিল।

একরাশ কাঁচা আম জড়ো করা হয়েছে। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লঙ্কার গুঁড়ো আর নুনের সাহায্যে সেগুলোর সদ্গতি করা চলেছে। টকে আর ঝালে একধরণের মুখভঙ্গি করে ভোনা বললে, এই খাদু, রায় বাড়ির বিমলি কী করেছে জানিস?

খাদু ভোনার প্রধান সহচর। আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী করেছে রে?

তারপর তেম্‌নি চোখ আর মুখের ভঙ্গি করে, জিভটাকে বিচিত্র ধরণে বের করে কতগুলো কথা বলে গেল ভোনা। সে কথাগুলো রঙ্কুর কাছে অপরিচিত—

সে সব কথা মনে করতে গেলে আজও সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে আর শিউরে আসতে চায়। তাদের অর্থ সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু অস্পষ্ট আপ্‌সা ভাবে কী একটা ইঙ্গিত তার চেতনার ভেতরে নাড়া দিয়েছিল সেদিন। রঙ্কুর কান গরম হয়ে উঠেছিল, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, হৃৎপিণ্ডটা যেন আচম্‌কা ভয় পেয়ে ধক্ ধক্ করে উঠেছিল বার কয়েক। তারপর বহু আর সেখানে বসতে পারে নি, সোজা এক ছুটে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে। বহুদিন পরে মনে হয়েছিল, আজ যেন আবার পেছনে পেছনে সেই হাড়গিলা পাখিটা কক্ কক্ করে তেড়ে আসছে।

পেছন থেকে তোনা, খাঁদু এবং অন্যান্য ছেলেদের অট্টহাসি ভেসে আসছিল। ওরা কৌতুক বোধ করেছে। বিদ্রূপ করে বলছে: কাপুরুষ!

কাপুরুষ! তা হোক। ও কথাটায় তখন লজ্জা হয়নি।

বাড়ি ফিরে এল রঙ্কু। খিড়কি দরজার পেছনে যেখানে ছাইয়ের মতো একটা গাদা জমেছে; রান্না ঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে চাল থেকে ঝরা বৃষ্টির রেখায় সবুজ ছাতলা ধরা জমিতে যেখানে গজিয়েছে ছোট বড় কতগুলো ব্যাঙের ছাতা; এলোমেলো কচু গাছের সঙ্গে ডোবা কাটা সাপের মতো লম্বা লম্বা বুনো ওলের ডাঁটা উঠেছে আর সবটা মিলে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নতুন ফুলে ভরা বড় বাতাবী লেবুর গাছটা—সেখানে, সেই নির্জনতা ঘেরা আবর্জনার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল রঙ্কু।

কান দুটো তখনো তার ঝাঁ ঝাঁ করছে, তখনো কপাল বেয়ে তার টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে সেই প্রথম একরাশ কাদা ছিটকে লাগল মানকধালা, কঙ্কাবতী আর পাশাবতীর সাত রঙে আঁকা কল্পনার অপরূপ ছবিতে। নরনারীর ভেতরে সব চাইতে গুপ্ত, জৈবিক সম্বন্ধের কুশ্রী চিত্রটা কদর্য রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে একটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো ভাসতে লাগল।

রঙ্কুর মনে হল আজ সে পাপ করেছে। মিথ্যে কথা বলা নয়, পড়ার বইয়ের আড়ালে গল্পের বই লুকিয়ে মা-কে ফাঁকি দেওয়াও নয়। তার চাইতে এ অনেক বড় অন্যায়, ঢের বেশি অপরাধ। এ অপরাধের জন্যে তার ক্ষমা নেই—কারো চোখের দিকে সে আর চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। রঙ্কুর কান্না পেতে লাগল, হাতজোড় করে বলতে ইচ্ছে করল, ঠাকুর, আমায় মাপ করো, আর কোনোদিন আমি তোনার সঙ্গে মিশব না।

নিজের অপরাধের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে অনেকক্ষণ সেই ছাই গাদার ওপরে বসে রইল রঙ্কু। তারপরে যখন খেয়াল হল তখন বাতাবী লেবু গাছটার হাল্‌কা ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, ফুলের গন্ধে বাতাস যেন থেমে দাঁড়িয়েছে, তিন চারটে শালিক পাখি নেচে নেচে ঘাসের ছাতার তলায় তলায় কেঁচো খুঁজছে, আর একটু দূরের রেল লাইন দিয়ে বিকেল পাঁচটার প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ঝরাং ঝরাং করে চলেছে কাটিহারের দিকে।

উঠোনে ঢুকতেই প্রথমে মায়ের নজর পড়ল।

এগিয়ে এসে মা কপালে হাত দিলেন: কি রে, তোর হয়েছে কি? চোখ ছল ছল করছে কেন? জ্বর আসছে নাকি?

—না।

মার তবু সংশয় যায় না।—না বললেই শুনব? যা বাঁদর ছেলে হয়েছে, সারা দুপুর খালি টো টো করে বেড়ানো, আর যত ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে কাঁচা আম খাওয়া। আজ রাত্রে আর ভাত পাবে না।

রঙ্কু আস্তে আস্তে বললে, না মা, আর আমি দুপুরে বেরুব না, ওদের সঙ্গেও মিশব না।

মা হেসে ফেললেন: খুব সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ভাত বন্ধ করার নামেই বুঝি? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, এখন হাত পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-বিভাগ ও পশ্চিম বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জন যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালাকে পৃথক করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশ সেই ঘোষণার প্রতিবাদে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর ১৬ই অক্টোবর যখন সত্য সত্যই বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল, সেদিন সারা বাঙ্গালায় কিছুক নরনারীর মুখে অন্ন উঠিল না। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আশ্বিনের সেই অরন্ধনের এবং বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মিলিত অভিযানের প্রতীক রাখীবন্ধন উৎসবের কথা বঙ্গবাসী আজও ভুলিতে পারে নাই। জাতীয় জীবন উষার প্রথম অরুণোদয়ের রক্তাক্ত স্মৃতি আজও প্রাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর মনে সোনার অক্ষরে লিখিত আছে।

সেই বাঙ্গালীই যে আবার বাঙ্গালাকে ভাগ করিবার জন্য সংগ্রাম সুরু করিবে, ইহা সত্যই ভাবা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থার সহিত যাঁহাদের একটুকু পরিচয় আছে, তাঁহারা বুঝিবেন যে কতখানি বেদনা এবং হতাশা লইয়া বাঙ্গালার হিন্দুরা আজ স্বাতন্ত্র্যসঙ্ঘের দাবী জানাইতেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বিদেশী শাসকসম্প্রদায়, বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে সেদিন কোন ভেদাভেদ ছিল না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সেদিন হিন্দুনেতা সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন মুসলিম নেতা লিয়াকৎ হোসেন ও আবদুল রসুল। আজ হিন্দুরা এই প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠতার লাঞ্ছনায় সকল দিক হইতে নিপীড়িত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে বাঙ্গালার মোট জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪·৭ জন এবং অমুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪৫·৩ জন (ইহার মধ্যে ৪১·৮ ভাগ হিন্দু)। এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে মুসলমান জনসাধারণের প্রতিভূ সাজিয়া লীগদল বাঙ্গালার গদীতে গত ১০ বৎসর ধরিয়া কায়েমী হইয়া বসিয়াছেন এবং মুসলিম জনগণের হৃদয় জয় করিবার জন্য হিসাবে হিন্দু-বিদ্বেষ বুলুবন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুস্বার্থ পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মুসলমান নাই এমন নয়, এখনও এই প্রদেশে বহু মুসলমান আছেন যাঁহারা মনেপ্রাণে কংগ্রেসভক্ত এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করিয়া যাঁহারা ভারতবাসী হিসাবে হিন্দুকে ভাই বলিয়া স্বীকার করেন ও অকৃত্রিম ভালবাসেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ এই শ্রেণীর মুসলমানের বাঙ্গালার শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কোনই ক্ষমতা নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম বৎসর হইতেই বলিতে গেলে বাঙ্গালাদেশ লীগ মন্ত্রীসভার অধীনে রহিয়াছে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১·৮ ভাগ হইয়াও গণতন্ত্রের মাহাত্ম্যে এদেশে হিন্দুদের সত্যকার অধিকার বলিয়া গত দশ বৎসর কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে অবস্থা তবু একটু ভাল ছিল, মাঝে মাঝে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জুলুম সাময়িকভাবে একটু কমাইয়াছিল, গত বৎসর হইতে কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে বাঙ্গালার পরিস্থিতি একান্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হইতেছে, পরিবর্ত্তনের এই সুযোগে ক্ষমতা লাভের লোভে আত্মহারা হইয়া লীগদল যেখানেই নিজেদের কিছু প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানেই গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে। লীগ মন্ত্রিসঙ্ঘের আমলে সর্ব্বত্রভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য বাঙ্গালার হিন্দুরা সর্ব্বত্রই নিগৃহীত হইতেছে। লীগ মন্ত্রিসঙ্ঘের মুখপত্র ইত্তেহাদের পৃষ্ঠাতেই দেখা যায়, লীগ মন্ত্রীসভা বাঙ্গালার বেওয়ানী বিভাগে মুসলমানের জন্য শতকরা ৮০টি চাকুরী রিজার্ভ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৮০ জন মুসলমান হাকিম পাঠাইয়াছেন, পুলিস বিভাগে দলে দলে পাঞ্জাবী মুসলমান আমদানী করিয়াছেন, কোটি কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট বিতরণ ও দোকান বন্টনের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি অযথা সুবিচার করিয়াছেন, কলিকাতার অধিকাংশ থানায় মুসলমান অফিসার বসাইয়াছেন, 'ইসলামিয়া বাজেট' পাশ করাইয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি বিহারের মুসলমানদের জন্য বাঙ্গালার সরকারী তহবিল হইতে অজস্র টাকা খরচ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বাজেটে গত ৭ বৎসর যাবৎ ঘাটতি চলিতেছে এবং যুদ্ধের দরুণ হইলেও ১৯৪১-৪২ এবং ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই ঘাটতির পরিমাণ ১৯ কোটি টাকার বেশী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পে-কমিশন রিপোর্ট এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষতিতে রাজস্ব হ্রাস বিবেচনা করিলে মনে হয় ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘাটতি বাজেটের অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে এবং ডেফিসিট দুই বৎসরের মোট ঘাটতির পরিমাণ ২২ কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাদেশিক অর্থনীতির হিসাবে এই অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, লীগ মন্ত্রীসভা যে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণ ও হিন্দুদের পীড়নমূলক ব্যবস্থায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন, ইহার অধিকাংশই যোগাইতেছে বাঙ্গালার হিন্দু, অর্থাৎ শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম বাঙ্গলা হইতে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা মুসলমানপ্রধান, কিন্তু ইহা কৃষিপ্রধান এলাকা। এই এলাকায় সরকারের এমন কিছু আয় হইতে পারে না যাহাতে মন্ত্রিসঙ্ঘ খেয়ালখুশীমত যত টাকা উড়াইতে পারেন। পূর্ব্ববঙ্গে যেটুকু আয় হয়, তাহারও একটি বড় অংশ হিন্দু জমিদার, ব্যবসাদার এবং আড়তদারগণ যোগাইয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও এখানকার হিন্দুরা মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত এত গভগোলের মধ্যেও একরূপ সদ্ভাবে বাস করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে, যেখানে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য, সেখানে মুসলমানেরা রাষ্ট্রকীয় মেজাজে

হিন্দুদের উপর চড়াও হইয়া যে সব অত্যাচার করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সেই ব্যাপক অনাচারের তুলনা হয় না। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, চাকা ও ত্রিপুরা জেলায় মোট জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ৮১·৪, ৭৭·১ ও ৮৭·৩ জন। এই সব জায়গায় মুসলমানেরা হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ আজ আর লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিসভা সমগ্র প্রদেশবাসীর অভিভাবক, কিন্তু এই সব জেলার দুঃস্থ হিন্দুদের রক্ষায় তাঁহারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। কাজেকাজেই সবদিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু এখন এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছে যে, হিন্দুর কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা সামাজিক ও আর্থিক জীবনের সংহতি রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে নিজস্ব একটি বাসভূমি সংগ্রহ করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যাগুরু হইয়াও শুধু দুষ্প্রযোজ্য-জনিত দৌর্বল্যের জন্যই আর অন্যত্র বাঙ্গলায় বাস করিয়া চিরকাল নিষ্পীড়িত ও নিগৃহীত হইতে তাহারা নারাজ। তা ছাড়া বাঙ্গালার হিন্দু জাতীয়তাবাদী, দেশের মুক্তিসংগ্রামে তাহারা চিরকাল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের বাসভূমির সম্পর্ক দৃঢ় ও নিবিড় হোক, ইহাই তাহারা চায়। মুসলীম লীগ যে এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে, সেই এলাকার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হইবারই সম্ভাবনা। সে হিসাবেও বাঙ্গালী হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে একটি নিজস্ব পৃথক প্রদেশের প্রয়োজন।

অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি পূর্ববঙ্গের তুলনায় অনেক আশাপ্রদ। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতার আশে পাশে বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গ পৃথক রাষ্ট্র হইলে আশা করা যায় শিল্পাদির স্থানীকরণ সহজ হইবে বলিয়া এখানে আরও বহুসংখ্যক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ববঙ্গ কৃষির দিক হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান নদনদীর অভাবে চাষ-বাসের এখন কিছুটা অসুবিধা হইলেও এই অঞ্চলের নদীগুলি সংস্কার করিয়া চাষের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। একমাত্র দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলেই পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ নদনদীসংস্কার হইলে কারখানা চালাইবার উপযোগী প্রচুর পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা অনেক কলকারখানা চলিতে পারিবে। তাহাড়া কৃষির দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ ঘনিষ্ঠিবা ঘাটতি অঞ্চল হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে তাহার সেই ঘাটতি প্রতিবেশী উদ্বৃত্ত প্রদেশ অবশ্যই পূরণ করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাঙ্গালার শিল্পবৃদ্ধির জন্য এখানে সার্বজনীন কর্মসংস্থান যেমন সম্ভব হইবে, সেইরূপ প্রচুর কাজকারবারের মধ্যে অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে। ব্রিটেন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ দেশ, কিন্তু ব্রিটেনও কৃষির দিক হইতে স্বাবলম্বী নয়। পূর্ববঙ্গ কৃষিসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে এই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের পক্ষে রাষ্ট্রপরিচালনার সর্ববিধ ব্যয়সঙ্কুলান করা অবশ্যই কঠিন হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ রাষ্ট্রগঠন—আসানসোল অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি। এই খনিগুলির কয়লার উপর শুধু বাঙ্গলার নয়, বোম্বাইয়ের কলকারখানাসমূহ পর্যন্ত বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। ব্রিটেনের কয়লা সম্পদই যে বরাবর তাহার শিল্পসমৃদ্ধির অনুপূরক হিসাবে কাজ করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিল্পসম্ভারে লৌহ প্রভৃতি যেসব ধাতুর প্রয়োজন সেগুলি বাঙ্গালায় বিশেষ পাওয়া না গেলেও (লৌহাদি যাহা পাওয়া যায় সবই প্রায় সঞ্চিত আছে পশ্চিম বাঙ্গালার বরাকর অঞ্চলে) খনিজসম্পদ সংগ্রহের দিক হইতে পূর্ববাঙ্গলার তুলনায় পশ্চিম বাঙ্গালারই সুবিধা বেশী। পূর্ববাঙ্গলা আসামের সহিত সন্ধীতি রক্ষা করিলে (এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে) তবেই কিছু কিছু খনিজসম্পদ পাইতে পারে; পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্তী ছোটনাগপুরের ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট, কোডারমা, হাজারিবাগ ও গিরিডির অভ্র, ময়ূরভঞ্জের লৌহনাফিক, হাজারীবাগ অঞ্চলের টিন, সিংহভূমের তামা প্রভৃতি অনায়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা পশ্চিম বাঙ্গালার পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। পূর্ববাঙ্গালায় পাট জন্মায়, কিন্তু বাঙ্গলায় যে ৯৯টি চটকল আছে তাহাদের সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার আশপাশে অবস্থিত। নূতন করিয়া পূর্ববঙ্গে চটকল বসাইয়া সমস্ত উৎপন্ন পাট কাঁচা চালানো শীঘ্র সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। চটকল প্রতিষ্ঠার যন্ত্রপাতির সমস্যা ছাড়া চটকল চালাইবার মত কয়লারও পূর্ববঙ্গে একান্ত অভাব। তাছাড়া কাঁচা পাটের জন্য পশ্চিম বাঙ্গালার চটকলগুলির ক্ষতি হইতে হইতে পারে, কিন্তু এই শিল্প এখনও এত অধিক পরিমাণে বিদেশীদের করায়ত্ত যে চটকলগুলি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের তেমন কিছু আসিয়া যাইবে না।

কাপড়ের দিক হইতেও পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক সমৃদ্ধ। কাপড়ের হিসাবে শুধু পূর্ববঙ্গ নয়, প্রস্তাবিত সমগ্র পাকীস্থানী এলাকাই অত্যন্ত অবহেলিত। বাঙ্গলায় এখন যে ৩৯টি কাপড়ের কল আছে তন্মধ্যে ৩৭টি পশ্চিমবঙ্গে। ইহা সত্ত্বেও কাপড়ের অভাব পড়িলে পশ্চিমবাঙ্গালার পক্ষে অল্পকালের মধ্যে বোম্বাই আমেদাবাদ হইতে কাপড় আমদানী করা যাইতে পারিবে। পশ্চিম বাঙ্গালায় লবণের উৎপাদন কারখানা হিসাবে লবণাক্তি হইয়াছে, তাহাতে এই শিল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় রাষ্ট্রের নয় সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইদাপুর ও কাশীপুরের কামান এবং

সোনাবাহুদের কারখানা পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকতর নিরাপত্তার বিধান করিবেই। পূর্ববঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা যখন মাত্র ১৩ টি, তখন পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ ২০৩ টি কারখানা আছে। এছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার টাটা কোম্পানী হইতে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা পাইবে। এক কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের এলাকাভুক্ত হওয়ায় ব্যাঙ্ক, বীমা হইতে ছোট বড় নানা কাজকারবারের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট যৌলিক সুবিধা লাভ করিবে। রেলপথ ও বিমান পথের দিক হইতেও একই কথা বলা চলে। কাঁচড়াপাড়ার রেলওয়ে কারখানাও পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

ঘোটের উপর, মিঃ জিন্না হইতে শুরু করিয়া লীগের ছোটবড় নানা নেতা যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিভক্ত হইলে পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দুরাও আর্থিক বিপন্ন হইয়া পড়িবে,—একথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি বিলাতের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকাও পাকিস্থানী এলাকাগুলির কৃষিসমৃদ্ধির উপর জোর দিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের অধিবাসীদের সুবিধা অসুবিধা প্রায় সমান সমান হইবে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্প-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যেমন ভাল হইবার সম্ভাবনা, সেই বাঙ্গালোর জন্য এবং কলিকাতা বন্দর হাতে থাকায় রাজস্ব শুল্ক ও আয়কর খাতে প্রচুর অর্থাগম হইবে বলিয়া এই রাষ্ট্রের রাজস্ব তহবিলও কিসের আশাপ্রদ হইবে! অবশ্য ঘটনাচক্রে পশ্চিম বাঙ্গলা সাময়িকভাবে অর্থাভাবগ্রস্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়া তাহাকে বিপদ-মুক্ত করিবেন। এদিক হইতে পূর্ববঙ্গের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয়। পূর্ববাঙ্গালার রাজস্ব তহবিলে উপস্থিত দীর্ঘকাল ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা এবং পাকীস্থানী এলাকাসমূহের প্রায় সবগুলির অবস্থা একইরূপ হইবে বলিয়া পাকীস্থানী কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গত পূর্ববাঙ্গালাকে কিছুই সাহায্য করিতে সক্ষম হইবেন না। দীর্ঘকালের জন্য এই তীব্র অনটনের সম্মুখীন হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আক্রাম খাঁ, ফজলুল হক হইতে সুরাবর্দ্দি সাহেব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার লীগের সমস্ত বিরোধী নেতৃবৃন্দ সকলেই বঙ্গবিভাগের প্রশ্নে সমস্বেতভাবে বাধা দিতে আগ্রহশীল।

আগেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার হিন্দু কংগ্রেসভাবাপন্ন, উপায় থাকিলে অখণ্ড ভারতে অখণ্ড বাঙ্গালাই তাহাদের একান্ত কাম্য। কিন্তু অবস্থাগতিকে ভারত বিভাগ যদি অনিবার্য্য হয় এবং সাম্প্রদায়ী লীগ নেতৃবৃন্দের হাত হইতে বহুসংস্কৃতিপীড়িত বাঙ্গালার শাসনদণ্ড সরাইয়া লইবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দুর বিশাল সংস্কৃতি, সংহতি ও বাক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের বৃহৎ মর্য্যাদা বাঁচাইতে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত না করিয়া উপায় নাই। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, পশ্চিম বাঙ্গলার নবগঠিত প্রদেশের বা সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আর্থিক অবচ্ছলতা বা নিরাপত্তার অভাবজনিত কোনপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হইবে না। বরং এইরূপ পশ্চিমবঙ্গে কর্ম্মসংস্থানের এত বেশী সুযোগ থাকিবে যে পূর্ববাঙ্গালা হইতে যে সব শিক্ষা-সংস্কৃতি-অভিমানী ও কৃষ্টিবান ব্যক্তি নিজস্ব বাসভূমি জ্ঞানে পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিবেন, এখানে অন্নসংস্থান করা তাঁহাদের পক্ষেও কঠিন হইবে না।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমরেন্দ্রর বাড়ীর বাহিরের দালান। বিক্রম ও অবনী।

বিক্রম। আজ্ঞে না, আর ছুটি পাবার আশা নেই। প্রয়োজনও নেই। আপনারা রইলেন, আমি নিশ্চিন্ত।

অবনী। এখানকার চিন্তা অবশ্য আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। তবে নিশ্চিন্ত আপনি থাকতে পারবেন না। আপনার চেয়ে বড় আত্মীয় এদের আর কে আছে।

বিক্রম। যাবার আগে অমরবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না। আশ্চর্য্য তো কিছুলেন না।

অবনী। অমর—আমরের ফেরবার কথা আর বলবেন না।

বিক্রম। সে কী? কেন, ফিরবেন না?

অবনী। মানে, ফিরতে দেবে না ওকে। থাক্ সে কথা।

মধুর প্রবেশ

মধু। বাড়ীওলাবাবু এসেছেন।

অবনী। এসেছেন? চল, যাচ্ছি।

মধুর প্রস্থান

আপনাকে বলিনি বোধ হয় এ বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে এদের আমার ওখানেই নিয়ে যাব আজ। অবনীর প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে রাধার প্রবেশ

রাধা। ট্রেণ আপনার কখন বীরুবাবু?

বিক্রম। ঠিক কটায় তা জানিনে, তবে আর বেশি দেরি করবার সময় নেই এটা জানি।

রাধা। দেরি করতে বলছি না আমি। কিন্তু না খেয়ে যাবার মত তাড়া নেই নিশ্চয়।

বিক্রম। না, না, ওসব করবেন না। তার জন্যে ব্যস্ত হবেন না—

রাধা। ব্যস্ত হই নি। আর যদি হই, একটু তা হলেই বা। আর তো কখনও এ সুযোগ পাব না। আপনি আমাদের জন্যে এতদিন ব্যস্ত হলেন, আমি না হয় একদিন—

বিক্রম। ও কথা তুলো না হে!—মাপ করবেন, মিসেস সেন।

রাধা। মাপ করব কেন? আপনি আমার চেয়ে বড়ো, তুমি বলবারই তো কথা। মাপ করেই তো ডাকবেন। এবার থেকে ঐ সম্বোধন রইল। আমি আপনার ছোট বোন হইতো বড়।

বিক্রম নিরুত্তর

রাধা। কিন্তু জেঠামশাই আজও এলেন না, কী হবে?

বিক্রম। শেখরবাবু! নিশ্চয় আসবেন। আপনার খাবার চিঠি পেয়ে কি না এসে থাকতে পারেন?

রাধা। তাঁর বড়ো সাধ ছিল যাবার, আমাদের সবাইকে নিয়ে যান তাঁর কাশীর বাড়ীতে। তবুও এলেন। যাবারও এত ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে গিয়ে শান্তিতে কাটাবেন কটা দিন।

বিক্রম। অবনীবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা আছে, শেষ করে নি এইবেলা।

বিক্রমের প্রস্থান। রাধা অন্যমনস্কভাবে বিক্রমের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিছন হইতে প্রবেশ করিল সুমিত্রা ও তৎপশ্চাতে অনুরাধা।

সুমিত্রা। একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন মা? কী ভাবছ?

রাধা। জেঠামশাই এখনও এলেন না, কী জানি তিনি যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন—তাই ভাবছি।

সুমিত্রা। তাতে ভাবনার কী আছে মা? নাই বা এলেন তোমার জেঠামশাই। আমি তো চলেছি, আর গিয়ে যাচ্ছি যেখানে সেটা কি তোমাদের বাড়ী নয়?

রাধা। সেই তো ভাবনা মাসীমা? আমি হতভাগী যে ভাল আশ্রয় করি সেই ভালই কাটা পড়ে। এবারই কপালের ধার। আবার আপনার বাড়ী গিয়ে কী বিপদ টেনে আনব কে জানে।

সুমিত্রা। ছি রাধা! মায়ের সামনে অমন কথা মুখে আনতে নেই। তোমার দ্বারা কখনও কারও ক্ষতি হতে পারে না। আসুন তোমার জেঠামশাই, দুদিন বিশ্রাম করুন আমাদের বাড়ীতে। তারপর ঘরে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করে রেখে (এই কথা বলিতে বলিতে একহাতে অনুরাধাকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিল) খোকার আর আমার লক্ষ্মীমার হাতে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিয়ে যাবে-দিয়ে ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

অবনীর প্রবেশ

অবনী। বাড়ীওলার লোকজন এসেছিলেন। জাহাজের ভিনুর। আর বলে গিয়েছে ঘিরওয়ালাকে পাঠিয়ে দিতে বাড়ীটা চাবি দিয়ে যাবে।

রাধা। (সসঙ্কোচে) জয়ন্তবাবুর কোনও খবর এলো না জেঠামশাই?

অবনী। খবর? হাঁ, না, জয়ন্তর কাছ থেকে কোনও খবর আসে নি।

অনুরাধা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা। তুমি বল না। খোকার কাছ থেকে না আসুক, কী খবর এসেছে বল। আমার শোনবার সাহস আছে।

অবনী। তাতে আমি সন্দেহ করি নি। সাহস আমারও আছে বলবার। এই যে ক'টা দিন তোমার খোকা বাড়ী ছাড়া, এই ক'দিনে আমার বয়স কতখানি বেড়ে গেছে জানো? গবর্ণমেণ্টের লোকগুলো চোখ আমার সদর জোরে ধরণা দিয়ে পড়ে আছে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ।

রাধা। পুলিশ? কেন, পুলিশ কেন?

সুমিত্রা। তাই আমার মন অমন ছটফট্ করতো। খোকা পুলিশের ভয়ে নিরুদ্দেশ হল?

অবনী। সেই জন্যে রোসের বাপ আমি। কত বড় গর্বের কথা বল তো? জয়ন্ত বোসের বাপ!

(সুমিত্রা নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে, সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া)

ভয় কিসে আসবে গো, আসবে। তবে দেরি হবে। কতদিন তা জানি না, দেরি হবে। ভয় নেই।

সুমিত্রা। ভয় কী? কিসে আসবে খোকা, সে কি তুমি আমাকে বলে যেতে তবে জানব? আর তুমি যা মনে করছ তা হবে না, দেরি হবে না। গিগ্‌গিরই ফিরে আসবে খোকা, দেখো।

বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

রাধা। আপনি সব কথা ওঁকে বললেন কেন জেঠামশাই? যদি সত্যিই ধরা পড়েন জয়ন্তবাবু? সে কি মাসীমা সহ্য করতে পারবেন? এত কথা ওঁকে না বললেই হোতো।

অবনী। তুমি তো ওঁকে চেনো না মা। সত্যি খবর সহ্য করতে বরং পারবে, কিন্তু সহ্য করতে পারবে না মিথ্যে। মিথ্যে দিয়ে ওকে ভোলাবার্ চেষ্টা করো না।

রাধার প্রস্থান

সুমিত্রা পুনঃ প্রবেশ করিল

সুমিত্রা। দেখ, মনে কোরো না আমি অহঙ্কার করে বলছি। আমার নিজের জোরে এ অহঙ্কার নয়। আমার জয়ন্তর জন্যে যে উমার মতো তপস্যা করছে ঐ মেয়েটা। তোমরা জানো না, আমি তো জানি। ঘুমুচ্ছে কিনছে, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে মাথা কুটছে। মা মা করে আমার পায়ে পায়ে ফেরে, আমার কাঁদাতে শোয়। ঘুমোয় না সারারাত। থাকে থাকে বিছানায় ওপর উঠে বসে যাত জোড় করে। সেদি আর সাহস পাচ্ছে আমার।

অবনী। কিন্তু ও প্রণাম প্রার্থনা কেন কার জন্তে, তা জানলে কী করে?

ঘুমিয়া। জানা যায়। আমি যে গোকার মা, আমার খোকার জন্তে কার প্রাণ কাঁদছে তা পাশে থেকেও আমি বুঝতে পারবো না?

বিক্রমের প্রবেশ।

বিক্রম। একটা কথা বলবার ছিল। আপনার যখন সময় হবে—

অবনী। সময় তো আমার এখনও কিছু কম নেই বীরুবাবু। আপনি বসুন।

ঘুমিয়া প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া বিক্রম বলিল—

বিক্রম। তা বলে এমন কোনও কথা নয় মা, যা আপনার সামনে বলা যায় না।

ঘুমিয়া। তার জন্তে নয় বাবা, আমি খাবার আয়োজন করি গে।

প্রস্থান

বিক্রম। যেমুন মিলেন সেনকে বলি নি, মানে বলতে পারি নি, অভিলাষের কিছু টাকা আমার কাছে পড়ে রয়েছে, টাকাটা আপনার হাতে দিয়ে যাব। আপনি সময় মতো দিয়ে দেবেন।

অবনী। তা বেশ। কিন্তু আপনি রাধাকেই দিয়ে যান না।

বিক্রম। না, না। সে উনি নিতে চাইবেন না।

অবনী। কেন? নিতে চাইবে না কেন? আপত্তি কিসের?

বিক্রম। (একটু ইতস্তত: করিয়া) সে উনি, মানে মেন্টেনেন্স আপত্তি আর কি। অর্থাৎ টাকাটা—অভিলাষের লাইফ্ ইন্সিওরের টাকা, স্ত্রীর বিশেষ অমত সত্ত্বেও সে পলিসি নিয়েছিল।

অবনী। ও। তা বটে! স্বামীর জীবন বিনিময়ের টাকা।

বিক্রম। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে শেখরনাথ প্রবেশ করিল। তাহার দক্ষিণ হাতের লাঠি স্কন্ধের উপর তুলিয়া প্রান্তভাগে একটি পুটলিকা রক্ষা করিতেছে। বাম হাতে খাবারের ঝুড়ি একটি। আজানু-ধূলি-ধূসর দুইটি পা।

শেখর। কই হে মাহিন্দর, কোথায় গেলে? এখনও ঘুমুচ্ছ নাকি?

বিক্রমের প্রবেশ।

বিক্রম। (সাগ্রহে) এই যে আপনি এসেছেন! (নমস্কার করিল)

শেখর। এসেছি তো বটেই। কিন্তু নমস্কার ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই, হাত জোড়া।

বিক্রম। এত দেরি হল—চিঠি পেয়েছিলেন তো?

শেখর। চিঠি পেয়েছি বই কি। কিন্তু দশ দিন পরে। ছিলুম মা কাশীতে কিনা। তাইতেই তো এত দেরি হল। সে যাক, আমার মায়েরা কোথা? ঝিয়ের পেটের বাড়ী হয়ত হয়ে যাবার যোগাড় যে।

বিক্রম। আপনি বসুন। আমি অনুরাধাকে বলে আসি আপনার খাবারের জন্তে।

শেখর। শুধু খাবারে তো আমার—

বিক্রম। সে জানি। আপনার গোরাকেও আনতে বলছি।

শেখর। না, সে কথা নয়। তবে বলি শোনো। সেবারে পালিয়ে আসা অবধি মনটা অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। শেষে মহিন্দরের চিঠি পেলুম, ভাল আছে, আমার সঙ্গে কাশী আসতে চায়। তবে নিশ্চিন্ত হই। তা ভাবলুম, কাশীর বাড়িটা বিক্রি করে দিই। একসঙ্গে অনেক পাওয়া যাবে যখন। মহিন্দরটা ঘুমুচ্ছে বোধহয়? ততক্ষণ বরং এক কল্কে—

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে অনুরাধার ও পিছনে গড়গড়া ও গাড়ু, গামছা লইয়া মধুর প্রবেশ।

এই যে! ভাগ্যবানের বোঝা শুধু ভগবান নয়, ভগবতীরাও বয়ে থাকেন। এসো মা এসো।

মধু গাড়ু, ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। অনুরাধা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে নতমস্তকে চোখ মুছিতেছে দেখিয়া শেখর বলিল—

শেখর। আঃ, কেন তোরা কল্কের ফুঁ দিতে গেলি বল তো? ওসব কী তোদের কাজ? চোখে কয়লা পড়েছে তো?

অনুরাধা। নীরবে মাথা নাড়িল।

শেখর। না তো কী। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তবু স্বীকার করবে না। বুড়ো জলে টকাতে চাস বোটমা, এখনও অত বুড়ো হই নি। (হাসিতে লাগিল)

অনুরাধা। হাত পা ধুয়ে নিন, জেঠামশাই। ওঃ, কী ধুলো লাগিয়েছেন গায়ে।

শেখর। তা রাস্তার যা ধুলো তোদের।

বিক্রম। আপনি কি হেঁটে এসেছেন বাকি?

শেখর। হুঁ।

অনুরাধা। হাওড়া থেকে হেঁটে এসেছেন জেঠামশাই? একটা গাড়ী নিলেও তো হতো।

শেখর। নিয়েছিলুম একটা রিকশা। এক টাকা ভাড়া নিলে। তাতেই পুঁটলিটা বুড়িটা চাপিয়ে দিলুম। নইলে বোঝা ঘাড়ে করে আর কি চলতে পারি এ বয়সে।

অনুরাধা ও বিক্রম মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল শেখরের মুখের পানে।

শেখর। হাঁরে, বড় মা খুব রাগ করেছে, না? সেবারে না বেরে পালিয়েছিলুম বলে এবারে খেতেও বেবে না, যেতাও বেবে না বুঝি?

অনুরাধা। আপনি আগে কিছু না খেলে দিদি আসবে না বলেছে।

বিক্রম। তুমি এইখানেই কিছু খাবার এনে দাও মধু।

শেখর। না, খাবার আর আনতে হবে না। দুখানা বেকাবে নিয়ে আয় মোট মা। আর ডাক সেই ছোকরাকে। দুটো ছেলে মেয়ে খাই আর দুটো মারে পরিবেশন, কর। তিনটে বেলাই খাবি, তুইও বসে যাও বাবা।

অশ্রু গোপন করিতে অনুরাধা প্রস্থান করিল। শেখর খাবারের পুঁটুলির বাঁধন খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে পাইল না, বীর নিঃশব্দ পদে রাধা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বিক্রম সরিয়া গেল।

শেখর। (গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে) কই হে, চটেছ ?

রাধা। ও সব রাখুন জেঠামশাই, বাবা নেই।

শেখর। (মুখ তুলিবার পূর্বেই) নেই ? কোথা গেছে ?

(বলিতে বলিতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল। চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া শেখর দেখিল বিবর্ণ বেদনাক্লিষ্ট রাধাকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শেখর ভাষা খুঁজিয়া পাইল। এই রূপ দেখাবার জন্যে আসতে চিঠি লিখেছিলি না ? আর এই কথা শোনাবার জন্যে ?

রাধা। যখন চিঠি লিখেছিলুম তখন ভাল ছিলেন—(আর সে বলিতে পারিল না)

শেখর। হঠাৎ পালিয়ে গেল ? নিখিল তুমি এস, একসঙ্গে যাব। সব মিথ্যে কথা। পালিয়ে গেল আগেই।

রাধা। ভেতরে আসুন জেঠামশাই। হাত পা ধুয়ে—

শেখর। না মা, আর নয়। আর আমাকে বলিসনি—

একপাশে অর্ধ অবগুণ্ঠিতা সুমিত্রার প্রবেশ, সঙ্গে অনুরাধা

সুমিত্রা। রাধা, তোমার জেঠামশাইকে আমার প্রণাম দিয়ে বল ভেতরে না এলে তো চলবে না, বাড়ীর অপরাধ কী ?

শেখর বিস্মিত ও নীরব।

সুমিত্রা। রাধু, আমাকে তোমার জেঠামশাই চিনতে পারছেন না। বল, আমি অনুরাধার মা। এখন এ আমার সংসার। যদি বাড়ীর ওপর অধিকার করে এখানে বসবাস না করেন তা হলে আমাকেও উপবাসী থাকতে হবে।

শেখর উঠিল।

শেখর। চল মা।

সুমিত্রা, অনুরাধা ও শেখর ভিতরে গেল। রাধাও যাইতেছিল, এমন সময় বিক্রমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইল।

রাধা। বীরুবাবু, বাবার দিনে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যেতে চান ? না, চুপ করে থাকলে চলবে না। চলুন, ঝগড়া করতে চান ?

বিক্রম। না।

রাধা। নিশ্চয় চান। আর আপনি না চাইলেও আমি চাই। এ কী কাণ্ড আপনার বলুন তো ? উনি কখখনো ইন্‌সিওর করেন নি। আপনি মিথ্যে কথা বলে আমার জন্য জেঠামশাইয়ের কাছে অতগুলো টাকা দিয়েছেন, কেন ?

বিক্রম। বাঃ, করে দি কী রকম ? আমি সাক্ষী ছিলুম কাগজ পত্তরে। আপনি কী করে জানবেন ? এসব খবর কি আপনাকে বলতে গেছে ?

রাধা। বললে নিশ্চয়ই বলতেন। আর তাছাড়া আমার পাওনা টাকা যদি হঠাৎ মারা যাবার সই ছাড়া টাকা দিলে কী করে ?

বিক্রম। সে কোম্পানীর ডাইরেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু। ও রকম হয়। আপনি বুঝবেন না।

রাধা। আমিই বুঝেছি। আর মিথ্যে কথা বলে আমার পাপের বোঝা বাড়াবেন না বীরুবাবু। আমি জানি তার ইন্‌সিওর ছিল না। ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, ও আমি নিতে পারবো না।

বিক্রম। না নিতে পারেন, রাস্তায় ফেলে দিন, ভিখিরি কাঙ্গাল ডেকে দিয়ে দিন, আমি নেব কেন ?

রাধা। জেবেন, কারণ আপনার টাকা।

বিক্রম। আমার টাকা ? পাগল হয়েছেন আপনি ? অত টাকা আমি পাব কোথায় ? বিশ্বাস করুন, ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখুন, সাঁইত্রিশ টাকা ক আনা পড়ে আছে আজ কত দিন। তার ফরও নেই, মুক্তিও নেই। অত টাকা আমার আসবে কোত্থেকে ?

রাধা। সে আপনিই জানেন। এই সেদিন দেশে ফিরেছিলেন। হয়তো আপনার জিটের অংশটুকুও বেচে এসেছেন। আপনার অসাধ্য কিছু নেই।

বিক্রম। না, না—

(তাহার প্রতিবাদের সুর ফুটিল না, ভাষাও খুঁজিয়া পাইল না।)

রাধা। নিশ্চয় তাই করেছেন। বলুন, সত্যি কি না ?

বিক্রম। আপনার চোখে এত্তরে আছে। মানুষের বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পান।

রাধা। সকলের পারে কেমন করে। যারা বুকের কপাট খুলে দেয় তাদেরই বুকের ভেতর দেখতে পাই। কিন্তু কেন একাজ করতে গেলেন আপনি ? আমার তো কিছু প্রয়োজন নেই। জেঠামশাইয়ের আশ্রয়ে থাকব। কিসের অভাব আমার ? দেখছেন তো, বাবার চেয়ে উনি আমাকে কম ভালবাসেন না। তবে কেন ?

বিক্রম। ওঁর ফরেন হয়েছে।

রাধা। সে অবস্থা যদি আসে, তখন আপনার কাছে চাইব। ততদিন—

বিক্রম। ততদিন আপনার কাছেই থাক না। (রাধা নিরুত্তর) না, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। অভিশাপ থাকলে আমার টাকা তার কাছে রাখতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করত না ? কিন্তু সে তো নেই। আপনার মনে যদি গ্লানি বোধ হয়, তবে দরকার নেই রেখে। ফেলে দেবেন আমাকে।

রাধা। (একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, ফেলে দেব না। ও টাকা আমি নিলুম।

বিক্রম। এ দয়া আমি ভুলব না কোনদিন।

রাধা। দয়া বলবেন না। আমি আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নিলুম।

বিক্রম। আমি চলি।

রাধা। সে কী ? এখনই চলেন ? অনুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না ?

বিক্রম। না, ও বিদায়-টিদায় নেওয়া আমার আসে না। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। আর বলবেন, তার বিয়ের সময় আমি নিশ্চয় আসব।

রাধা। একটু দাঁড়ান।

বলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

বিজয়। (ত্রস্ত হইয়া পিছাইয়া) না, না, ও করবেন না—

রাধা। কেন করব না? আপনি আমার দাদা হন। দাদাকে প্রণাম—

বিজয়। আগে দাদা হই, তার পরে প্রণামের যোগ্য হব।

বলিতে বলিতে বেরিয়ে পড়িয়া পলাইল। রাধা তাহার পলায়ন গ্রাহ্য করিল না, সুন্দর ভূমিতলে উপুড় হইয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। দিদি, জেঠামশাই প্রস্তুত হয়ে নিতে বলেন। এই দুপুরের গাড়ীতেই উনি চলে যাবেন। আমি এত বলুম, এত কষ্ট করে রাত জেগে এসেছেন, একটা দিন বিশ্রাম করুন।

রাধা। মাসীমা কী বললেন?

অনুরাধা। মাসীমাও—

রাধা। মাসীমা আমার, তোর নয়। তোকে যা বলে ডাকতে বলেছেন তাই বলবি।

অনুরাধা। উনিও অনেক করে বললেন, জেঠামশাই শুনবেন না।

রাধা। বলা বৃথা। বাবা পালিয়ে গেছেন, সেই অভিমানে উনি এবাড়ীতে একটা বেলা টিকতে পারছেন না। চ, প্রস্তুত তো আমরা হয়েই আছি।

অনুরাধা। দিদি।

রাধা। কী?

অনুরাধা কথা কহিল না। লজ্জানত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধা। (স্নেহে) কী বলবি বল? কী হয়েছে অনু?

অনুরাধা। দিদি, আমাকে তোমরা রেখে যাও এখানে।

রাধা। (সবিস্ময়ে) এখানে? এখানে কোথা থাকবি?

অনুরাধা। এ বাড়ীতে নয়।

রাধা। মাসীমার কাছে? এখন কেন তাই? ওই তো তোর বাড়ী। কিন্তু এসব কিরে অনুরু—

অনুরাধা। (নতমুখে) আমি এখানে থাকলে যদি ভীষণ খেপে যেতেন। আমার ওপর রাগ করেই ওপথে পা দিয়েছেন। তোমরা জানো না, আমিও তখন বুঝি নি—

রাধা। আর বলতে হবে না বোন। আচ্ছা জেঠামশাইকে বলি।

অনুরাধা। সকলে চলে গেলে মা বড় একলা হবেন দিদি।

রাধা। বুঝতে পেরেছি ভাই। তাই হবে।

অনুরাধা। বীরদা কোথায় গেলেন দিদি?

রাধা। চলে গেছেন। না, চলে যান নি, পালিয়ে গেছেন।

অনুরাধা। পালিয়ে গেছেন? কেন?

রাধা। আমার পেত্নাদের ভয়ে।

অনুরাধা। একটা কথা বলব দিদি? বীরদা তোমাকে ভালবাসেন। তুমি বোধ হি ওঁর চোখ—

রাধা। (বাধা দিয়া) না, না, ও আমি দেখি নি। দেখতে নেই। ওকথা মুখে আনতে নেই। তুই যা।

রাধার দ্রুত প্রস্থান। অনুরাধা দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণপরে দেখা কণ্ঠ শুনিয়া অনুরাধা ভিতরে চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল অবনী ও মধুসূদন।

অবনী। ইম্পসিব্‌ল্। কেন তুমি একাজ করতে গেলে? এ আমি হতে দেব না, আমি আসল কথা প্রকাশ করে দেব।

মধুসূদন। ইট্ উইল্ বি নাথিং অফ্ দি সর্ট। এ তোমার প্রতিজ্ঞা নয় অবনী, এখনে তুমি বাধা দিলেও না বলে দিচ্ছি।

অবনী। কিন্তু এ আমি চুপ করে এলাউ করব কেমন করে? আমার ছেলের মুক্তির জন্যে তুমি জেলে যাবে, মিথ্যে করে, বিনা দোষে—

মধুসূদন। ডোনট্ বি সো সেলফিশ্ অবনী। স্বার্থে অন্ধ না হলে দেখতে পেতে যে এ আমি তোমার ছেলের জন্যে করছি না। করছি আমার ছেলের জন্যে, আমার মেয়ের জন্যে। আর সত্যি মিথ্যের প্রশ্নে, দোষী নির্দোষের বিচার করতে লজ্জা করে না? ওসব সুপারস্টিশন তোমার দিকের তুলে রাখো। এই বয়া শুকনো বুড়োটা কটকের এপারে বসে যবে দিন গুণবে, আর ঐ জ্যান্ত তাজা ছেলেটা কটকের ওপারে দিন দিন শুকিয়ে নিবে আসবে—সেইটেই কি সত্যি কাজ হবে? ও কুসংস্কার আমার নেই।

অবনী। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবেই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

মধুসূদন। সে ব্যবস্থা আমার। ওদের আপীল পেলেই হ'ল। বাবাল পেলেই হ'ল। তাহলেই জজের ওপর ওয়ারেণ্ট নাকচ হবে। বাবালসমেত সে আপীলকে আজ ওরা পেয়ে গেছে। ভাগ্যের রেকর্ড আমাকে সাহায্য করেছে। আরে বুঝছ না, ওদের একটা আপীল নিয়ে কথা। আমারও ও পার্ট করা আছে, ঐদিকে বেগমান হব না। (হাস্য)

অবনী নীরবে তাহার সুন্দর পানে তাকাইয়া রহিল।

মধুসূদন সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল—

মধুসূদন। তুমি ভেবে দেখ অবনী, একজন তোমার ছেলে, আর একজন তার মেয়ে। এরা আমারই ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া আর কী উপায় আছে বলতে পার? আই কাণ্ট এলাউ হিস্টরী টু রিপিট্ ইট্‌সেল্ফ,—দি ক্রুয়েল হিস্টরী অফ্ বারট্ হ্যারেস্ এগেন। সেই দুর্ঘটনা আবার আমার ছেলেমেয়ের জীবনে ঘটবে, আমি বাধা দেব না?

অবনী তথাপি নীরব

মধুসূদন। যাঃ, এই সব সেন্টিমেণ্টাল মূলদের নিয়ে আর পারা গেল না। হাঁ, ভাল কথা। (হাত হইতে আংটি খুলিয়া) এটা রাখ তো। যাও ঘর। (অবনী আংটি লইল। মধুসূদন পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে উলটাইতে বলিল) তোমার

কাছে আমার বেনা—বেনা হল—(পাতা উলটাইতেছে এবং আঙুলে গণিয়া হিসাব করিতেছে) দূর করে ছাই। ঠিক ভুল হয়ে যায় কেবল। ও অনেক আছে। তুমি এইটে বেচে লোব করে নিও।

অবনী। এই নীনা—

মধুসূদন। (মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল) আঃ, থাম। (হাত তুলিয়া থামাইয়া দিল)

অবনী। না, তোমার মাংই আমি বেচতে পারবো না। কিছুতেই না। ড্যাম্ সার্ড।

মধুসূদন। পারবে না? কিন্তু আর তো কিছু নেই এখন। তাহলে তোমার বেনা—যাই হোক্! হাউ ইউ সিড্, অব্ মি! বেচতে হবে না তোমাকে। ওটা আমার ছেলেবউকে দিও। আমার মেয়ে জামাইকে দিও। আর তোমার বেনা? ও আমি শোধবার চেষ্টা করব না? আমি এখনি চেকই দেব।

অবনী। ইউ আর গ্রেট, মধুসূদন!

মধুসূদন। (দুই হাত দিয়া অবনীর দুই হাত ধরিয়া) থাঙ্ক্ ইউ আর এ সিলি ওল্ড্ গুজ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ—(চক্ষে জল গড়িয়া পড়িল, তথাপি হাসিতে লাগিল)

যবনিকা

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

মস্কো সম্মেলনে ব্যর্থতা

মস্কো-সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিণ-রুশ-করাসী পররাষ্ট্র সচিব জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই; সুদীর্ঘ দেড় মাসব্যাপী আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে।

দুই বৎসর পূর্বে পোট্সড্যাম্ সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, জার্মানীর সমর শিল্প কলাইয়া দিয়া তাহার আক্রমণ-শক্তি নষ্ট করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনে উৎসাহ দিয়া তাহাকে আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করা হইবে। নাৎসী দলের আক্রমণাত্মক নীতি সমর্থন করিয়া জার্মান জাতি জগতের যে ক্ষতি করিয়াছে, সেজন্য তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে জার্মানী সাধ্যানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিবে। পোট্সড্যামে নির্দ্ধারিত এই মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই মস্কোয় পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন।

মস্কোয় জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মার্কিণ প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন—এই আক্রমণাত্মক দেশটিকে আর অখণ্ড রাখা হইবে না; ইহাকে বহু বিভাগে বিভক্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। বিভিন্ন স্বতন্ত্র অংশের (ষ্টেটের) প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ষ্টেট্ পরিষদ, অবশিষ্টাংশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পাইবে; পক্ষান্তরে, স্বতন্ত্র ষ্টেটগুলির সর্ব্বাধিক ক্ষমতা থাকিবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির খাঁদের কুটনৈ এখন সর্ব্ব ব্যাপারে আমেরিকার অনুষ্ঠ সমর্থক। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ বেভিন চোখ বুজিয়া মিঃ মার্শালের কথায় সায় দিয়াছিলেন।

সোভিয়েট প্রতিনিধি অখণ্ড জার্মানী ভাঙিয়া দিবার বিরোধিতা করেন; তাঁহার যুক্তি—জার্মানীকে হিট্লারবাদের প্রভাবমুক্ত করাই মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য; জার্মাণ জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মঃ মলোটভ্ জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ৮টি সর্ত্ত সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রধান কথা—জার্মানী অখণ্ড, শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে; সমগ্র জার্মানীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত দুইটি পরিষদ হইবে জার্মানীর পার্লামেণ্ট। এই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন এবং গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। জার্মানীর বিভিন্ন ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হইবে। জার্মানীর পার্লামেণ্ট সমগ্র জার্মানীর জন্য এবং প্রদেশগুলি তাহাদের নিজেদের জন্য গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করিবে।

জার্মানীর জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও হইয়াছিল। এই পরিষদ ক্রমে জার্মানীর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইবার কথা। সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, কেবল বিভিন্ন ষ্টেটের ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধি লইয়াই নহে—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, ট্রেড্ ইউনিয়নের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া এই পরামর্শ পরিষদ গঠিত হইবে।

মিঃ মার্শাল ও বেভিন্ জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধির মূল প্রস্তাব এবং সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব, দুইয়েরই প্রবল বিরোধিতা করেন।

জার্মানীকে খণ্ডিত করিবার পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধির যুক্তি—ইহাতে জার্মানীর সমর-শক্তি নষ্ট হইবে; সে আর জগতের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না। ইহার বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রতিনিধির যুক্তি—একমাত্র বহু জাতি অধ্যুষিত রাজ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থা প্রয়োজন। জার্মানীতে বহু জাতি নাই—জার্মানরা একটি অবিভাজ্য রাজনৈতিক জাতি; এই জাতিকে খণ্ডিত করা অন্যায়। মঃ মলোটভ্ বলেন যে, এই অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে জার্মানীতে পুনরায় একমাত্রের উদ্ভব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে; "ঐক্যবদ্ধ জার্মানী চাই"—এই সহজ দাবী তুলিলে নূতন "হিটলার" অনায়াসে অসন্তুষ্ট জার্মান জাতির সমর্থন পাইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ভার্সাইয়ের অন্যায়ই ছিল হিটলারের রাজনৈতিক শক্তির নৈতিক উৎস। জার্মান রাজ্য খণ্ডিত করিলে প্রকৃতপক্ষে আর এক "ভার্সাই"-ই সৃষ্টি হইবে। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানীকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। এবার মলোটভ্ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, কতকটা এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াই তখন বৃটেন ও আমেরিকা ফরাসী প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল।

প্রকৃত কথা এই—প্রথম মহাযুদ্ধের পর রুশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ঘটে। পূর্ব দিক হইতে বলশেভিক প্রাবনের পশ্চিমমুখী গতি রোধ করিবার জন্য তখন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জার্মানীর প্রয়োজন ছিল। আর, এবার সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব জার্মানীতে ইতিমধ্যে জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে; সেখানে জনগণের হাতে সকল ক্ষমতা গিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রভাব হইতে জার্মানীর অবশিষ্টাংশকে এখন বাঁচান প্রয়োজন। বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম অঞ্চলে হিটলারী আমলের জমিদার শ্রেণী, ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিদিগকে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। এই অঞ্চলে ইঙ্গমার্কিণের প্রগতি-বিরোধী ঘাঁটী সমূহ রচিত হইতেছে; ইহাকে পূর্ব জার্মানীর ছোঁয়াচ হইতে সর্বপ্রকারে বাঁচাইবার আগ্রহ স্বাভাবিক।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য চায় না। কিন্তু জার্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্যের জন্য তাহারা কূটনীতিক চাপ করিয়া থাকে। অথচ গত ডিসেম্বর মাসে তাহারা পূর্ব জার্মানীকে বাদ দিয়া বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীকে অর্থনৈতিক দিক্ষে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ এজেন্টরা ব্যবসায়ীদিগকে জার্মানীর অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দিবার জন্য এবং জার্মান অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হয়। মঃ মলোটভ্ দাবী করিয়াছিলেন—সমগ্র জার্মানীর অর্থনৈতিক মিলন ঘটাইবার জন্য অবিলম্বে ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলের মিলন বাতিল করিতে হইবে। বলা বাহুল্য—মিঃ বেভিন্ ও মিঃ বার্নস তাহাতে সম্মত হন নাই।

বৃটেন ও মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জার্মানীর জন্য যুদ্ধে বিপর্যস্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, রুশিয়া অসঙ্গতভাবে জার্মানীর চলতি উৎপাদন হইতে ক্ষতি পূরণ লইতেছে; এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিবার শক্তি তাহার নাই। রুশিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তাঁহারা প্রশ্ন করেন নাই। রুশিয়ার ১২ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ক্ষতির জন্য জার্মানী দায়ী। রুশিয়া মাত্র ১ হাজার কোটী ডলার অর্থাৎ তাহার ক্ষতির শতকরা মাত্র ১০ ভাগের জন্য ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছে। এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি চলে না; তাই বেভিন্-বার্নস বাঁকা পথ ধরিয়াছেন।

এই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকা মোটেই অসহায় নহে। বিশেষে অবস্থিত জার্মানীর বিপুল সম্পত্তি তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছে। লুইজিয়ানাও, সুইডেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জার্মানীর ৩ শত ৩০ কোটী ডলারের সম্পত্তি তাহাদের কুক্ষীগত হইয়াছে। জার্মানীর ২ শত ২০ কোটী ডলার মূল্যের মালবাহী জাহাজ এখন ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির হাতে। জার্মানীর পেটেণ্ট, বিভিন্ন আবিষ্কার ব্যবহার এবং অর্থের মূল্য বাবদ ৫ শত কোটী ডলার ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি পাইয়াছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে জার্মান জাতির এই বরদীরা তাহাদের ১ হাজার ৫ শত কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। যুদ্ধে ইহাদের ক্ষতি সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি অপেক্ষা অনেক কম; অথচ ক্ষতিপূরণ বাবদ রুশিয়ার মোট দাবী অপেক্ষা ৫ শত কোটী ডলার বেশী ইহারা লইয়াছে।

জার্মানীর চলতি উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে আপত্তির প্রধান কারণ—এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে জার্মানীর সমর-শিল্প বন্ধ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার, শ্রমশিল্পক্ষেত্রে হইতে ধনিকদের প্রভাব ও ধনিকদের জোটের (Cartel) উচ্ছেদ আবশ্যক। সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব জার্মানীতে এই সব ব্যবস্থা সম্পাদিত হওয়ায় এখন সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগ পণ্য উৎপন্ন হইতেছে। মিঃ মলোটভ্ বলেন যে, সমগ্র জার্মানীতে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে এবং রপ্তানী-বাণিজ্যে উৎসাহ দিলে জার্মানী অনায়াসে চলতি উৎপাদন হইতে ক্ষতি পূরণ দিতে সমর্থ হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলে অধিকাংশ সমরশিল্প অটুট রহিয়াছে, ধনিকদের জোট ভাঙ্গা হয় নাই, রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না। কাজেই, সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ উৎপন্ন হইতেছে।

রুহর শিল্পাঞ্চল সম্পর্কেও মতভেদ ঘটে। রুশিয়া রুহর চক্ষুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাহিয়াছিল। বৃটেন্ ও আমেরিকার তাহাতে আপত্তি। এই অঞ্চলে জার্মানীর লৌহ, ইস্পাত ও কয়লা শিল্পের দুই-তৃতীয়াংশ অবস্থিত। এই অঞ্চলে চক্ষুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা না হইলে সমগ্র জার্মানীর অর্থনীতিকে সংহত করা অসম্ভব।

চীনের সঙ্গীন অবস্থা

গত ২৭শে মে চীনের ডিমোক্রেটিক লীগের মুখপাত্র ডাঃ লো মন্তব্য করিয়াছেন, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি অবিলম্বে চীনকে আরও সাহায্য না করে, তাহা হইলে চিয়াং-কাই-শেকের মাটীর গভর্নমেণ্টের পতন ঘটিবে।" তিনি বলেন যে, আমেরিকা যদি আরও সমরোপকরণ সরবরাহ না করে, চীনের সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কাজ চালাইয়া না যায় এবং আরও অন্যভাবে সাহায্য না করে, তাহা হইলে আমেরিকার পক্ষে সহযোদ্ধার বৈষয়িক গভর্নমেণ্টকে টিকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না।

কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী রেলপথ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর ফাঁকা মাঠে সৈন্য পরিচালনা করিয়া চিয়াং-কাই-শেকের সেনাপতিরা

কম্যুনিষ্টদের রাজধানী অধিকার করিয়াছেন বলিয়া বড় বেশী আস্ফালন করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কম্যুনিষ্ট বাহিনী এতও আক্রমণ চালাইয়া উত্তর চীনে সান্‌সি হইতে চাহার পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে পর পর অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চ্যাঙ্-চুন্ এখন বিপন্ন। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর চাপে অতিষ্ঠ হইয়া মার্কিণ নৌ-সেনাদল উত্তর চীনের চিন্‌ওয়াংটাও ত্যাগ করিয়াছে।

সামরিক অবস্থা যখন এইভাবে সরকার পক্ষের অত্যন্ত প্রতিকূল, সেই সময় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থারও দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে। গত ৪ মাসে সাংহাইর বাজার হইতে ৮ হাজার মিত্রাক্ষর শিশুর মৃতদেহ কুড়াইয়া লওয়া হইয়াছে; কেবল এপ্রিল মাসেই পাওয়া গিয়াছিল ৩ হাজার শিশুর মৃতদেহ। দুর্ভিক্ষ এত ব্যাপক যে, অনেক জায়গায় অন্নসংস্থান অসাধারণ কিছু হইয়া খাদ্য শস্যের দোকান লুণ্ঠন করিয়াছে। প্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ। আমেরিকা আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে চীনকে সাহায্য করিয়াছে ৪ শত কোটি ডলার। ইহাতে চীনের অর্থ-নৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। মার্কিণ সাহায্যের একটা মোটা অংশ মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও চীনের দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের পকেটে।

চিয়াং-কাই-শেক গভর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা, দুর্নীতিপরায়ণতা এবং নির্দ্দয় গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত ১৫ই মে সর্ব্বপ্রথম সাংহাইয়ে ৫ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে; তাহারা ধ্বনি তোলে—"গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ কর।" ক্রমে নান্‌কিং-এ এবং পিপিংএ ছাত্র আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। শিক্ষাযাত্রা জারি করিয়া, কম্যুনিষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ছাত্রদিগকে শান্ত করা সম্ভব হয় নাই। গত ২০শে মে নান্‌কিংএ ৬ হাজার ছাত্রের এক শোভাযাত্রার সহিত সশস্ত্র পুলিস দলের সংঘর্ষ ঘটে। তাহার পর হইতে ছাত্র-আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার, খাদ্যাভাব এবং গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আগামী ২রা জুন চীনের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ সংবাদ (২৮শে মে)—চীনের পিপ্‌ল্‌স্ পলিটিক্যাল্ কাউন্সিলের ১ শত সদস্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তির আলোচনা চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্ট সদস্যদিগকে অনুরোধ জানান হইবে। এই কাউন্সিলের ২৫০ শত সদস্যের মধ্যে ৭জন কম্যুনিষ্ট; তাহারা গত ২ বৎসর এই কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দান করেন নাই।

মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ আজ অসুবিধায় পড়িয়া সময় লাভের জন্য যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করিয়াছেন কিনা বলা যায় না। সামরিক অবস্থা প্রতিকূল হইয়া উঠিলে তিনি অনেক সময় শান্তির কপট ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তবে, এ কথা সত্য, তিনি যদি কম্যুনিষ্টদিগকে সামরিক বলে দমন করিবার দুরাশা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চীনা জাতির দুঃখ ও দুর্দ্দশাই বাড়িবে; তাহার নিশ্চিত পতন তাহাতে বন্ধ হইবে না।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া গেল। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৭টি শক্তির প্রতিনিধি লইয়া একটি তথ্য-সংগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ দল প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিয়া সেখানে পরাক্ষ ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চায়। তাহারা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে তিনটি চাল চালিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা হঠাৎ আরবদের অন্ত দরদী হইয়া উঠেন এবং ইহুদীদের বক্তব্য শুনিতে আপত্তি করেন। কোন রকমে একটি কমিটী খাড়া করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট লওয়া এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ সুসম্পন্ন করা ইঙ্গ-মার্কিণ দলের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আসফ্ আলি এবং সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো এই চাল ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়পক্ষের পরিপূর্ণ বক্তব্য শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের বাধাতে ইঙ্গ-মার্কিণ দলের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তথ্য-সংগ্রহ কমিটীর আলোচ্য বিষয়ে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাদ দিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ দল জিদ করেন। মিঃ আসফ্ আলি ও মঃ গ্রোমিকোর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ভোটের জোরে ইঙ্গ-মার্কিণ দলের এই চাল সফল হইয়াছে। মিঃ আসফ্ আলি এই সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারত আজ কেবল যুদ্ধতার খাতিরই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীর নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। প্যালেষ্টাইনবাসীরও প্রবল যুদ্ধতা আছে। কাজেই, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকারে বঞ্চিত করিবার শক্তি কাহারও নাই।" সর্ব্বশেষে, ইঙ্গ-মার্কিণ দল প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে দূরে রাখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়। এই জন্যই তাহাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল—তথ্য-সংগ্রহ কমিটিতে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির কোনও প্রতিনিধি থাকবে না। রুশিয়াকে বাদ দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সাতটি রাষ্ট্র লইয়া কমিটী গঠন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধি কমিটিতে না থাকিলেও এই তাঁবেদারেরা যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করিবে, ইহা জানা কথা। মিঃ আসফ্ আলি এই ব্যাপারে বাস্তব রাজনীতিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাবপ্রবণ গণতন্ত্রপ্রিয়তারই পরিচয় বেশী দিয়াছেন। তিনি বৃহৎ ৫টি শক্তিকে বাদ দিয়া কমিটী গঠনের প্রস্তাবেই সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ দলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ৭টি ছোট রাষ্ট্র লইয়াই কমিটী গঠিত হইয়াছে।

২৮।৫।৪৭

বনফুল

৮

অভ্যাচ্ছুসিত সদারঙ্গ বিহারীলালের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে সুশোভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল? নামটা শোনা-শোনা ঠেকছে। অনীতারই সম্পর্কে কোথায় যেন শুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

"আপনার বিয়েতে যেতে পারি নি। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আমার 'তার'টা পেয়েছিলেন তো?"

সুশোভনের আবছাভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় অনীতাদের বাড়িতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে যেন বলেছিল সদারঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না।

"হ্যাঁ, আপনার 'তার' পেয়েছিলাম বই কি"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম" সায় দিতে হল সুশোভনকেও। সুশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল সুরু করলেন তখন।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি"

"আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি"

"হ্যাঁ আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তো বটেই, আরও অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি লুকিয়ে থাকতে পারে কখনও—হেঁ হেঁ হেঁ—"

এ কথা শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল সুশোভন। একটু ইতস্তত করে' চুপ করে' রইল, আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইলে একবার।

"আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাইট স্কুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?"

প্রশ্নের ভঙ্গীতে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে হুক নাচালেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও,নাইটস্কুলে"—ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনি করলে সুশোভন।

"হ্যাঁ, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা ব্যাপারের জন্যে আপনার আসা হয় নি। সম্ভবত কোনও জরুরি মিটিংএ আটকে পড়েছিলেন"

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন সুশোভনের দিকে, যেন কোন দেবদুর্লভ ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি।

বিদ্যুৎ-চমক-বৎ সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ল এঁদের চক্রে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী হয়ে উঠেছেন)—অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, হয়েছে সান্ত্বনার সঙ্গে! অপ্রত্যাশিত নেপথ্যালোকে সহসা পরকীয়া লাভ করে' সুশোভনের অবচেতন মানসে বেশ একটু পুলক সঞ্চার হল। মন্দ কি! উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবার সখ নেই তার, কিন্তু সান্ত্বনার স্বামী হওয়াটা—অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও—লোভনীয়। বেশ, অভিনয় যদি করতেই হয় ভালভাবেই করতে হবে। বিব্রতভাবটা ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সুশোভন।

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশী ছিলেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিটেই তিনি ঘটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। গোসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে, কথাবার্ত্তা থেকে ঐও বুঝলেন যে ইনি একজন কংগ্রেস-কর্মী। অনেকদিন থেকে সদারঙ্গ-বিহারীলালের একটি বদ্ধ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধীর পাল্লায় পড়ে যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী অহিংসাকেই

স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁসি তুলতে প্রস্তুত অর্থাৎ মনে মনে সবাই সহিংস। তাই যদিও রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁর মোটর বাইকে 'মোবিল' ছিল না তবু এমন একটা সুযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন নাম-জাদা কংগ্রেসকর্মীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে' কি ছাড়া যায়? প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রশ্নের ধরণ থেকেই কি উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। বিশেষ বেগ পেতে হল না সুশোভনকে।

"আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করেন না কি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বলছি। কাগজে অবশ্য আপনাদের পোষাকী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাজ হাসিল করবার জন্যে বক্তৃতায় অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়—অ্যাঁ, কি বলেন—কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাতেই আমাদের দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?"

"মোটেই না"—একটু হেসে সুশোভন উত্তর দিল—"কিন্তু ও কথা বলা ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর কি আছে বলুন"

"থ্যাট্স্ ইট্! আপনাদের অহিংস মুখোসের তলায় তাহলে—কিছু মনে করবেন না উপমাটায়—মানে—"

"না, না মনে করবার কি আছে"

"আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনোভাব তাহলে ওই"

"আমার তো তাই বিশ্বাস"

"সত্যি? বাঃ! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে এসেছি। প্রকাশ্যে আপনারা অবশ্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—"

"তা পারি কি"

"চমৎকার, চমৎকার। যাক সন্দেহটা মিটে গেল। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে ওপ্তামিই বলতে হবে—রীয়ল একস্ট্রিউম মি—ঠিক মুৎসই কথাটা মনে আসছে না। মানে, বুঝতে পেরেছেন আশাকরি আমার মনের ভাবটা"

সুশোভন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর তার ছিল না।

সদাশিববিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সুভাষবাবুর সম্বন্ধে আপনাদের আসল মনোভাবটা কি বলুন তো"

"আমি—আমি ঠিক জানি না"

"আপনি জানেন না? বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে না কি"

"তা আছে একটু। মাপ করবেন আমাকে"

"না, না, তাহলে জোর করতে চাই না। সাম্বটেন্লি—"

সদাশিববিহারীলাল উদ্ভাসিত মুখে সান্ধনার দিকে চাইলেন—চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন।

"সত্যি ভারী আনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে'। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এমন সরলভাবে যে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। বাঃ—বাঃ—ভারী আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থাই তাহলে মনে মনে বামপন্থী—বাঃ চমৎকার। রাগ করলেন না কি?"

"না রাগ করবার কি আছে এতে—ঠিকই তো বলেছেন"

"বাঃ বাঃ, ভারী খুশি হলাম। আচ্ছা এবার চলা যাক। গোসাইবি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু হলেই হবে"

"সর্ষের তেল হলে হবে?"

"সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? সুব্রিকেটিং অয়েল চাই"

"আজ্ঞে না, আমরা গোরো লোক, ওসব রাখি না"

সান্ধনার দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে সদাশিববিহারীলাল বললেন, "বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু বিপদ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবি নি। একটু মোবিল না পেলে মারা যাব যে একেবারে। মাইল খানেক হেঁটে আসছি। বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা। দুর্গতি থাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়—শেষকালে কি—এইখানেই রাতটা—"

"আপনার হাজার অসুবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে জায়গা দিতে পারব না আপনাকে"—একটু গলা-খাঁকারি

দিয়ে গোঁসাইজি বললেন—"আপনার সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি ব্রজেশ্বরবাবুরা নিয়েছেন"

সুশোভন অস্বস্তিবোধ করল একটু।

"আপনি যাবেন কোথা"—সান্ত্বনা জিগ্যেস করলে।

"ছিপ-ছররামারি। ছিপছররামারিতেই থাকি আমি। ওই যে বললাম না, ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ চৌবে লোকটা সুভাষ বোসের খুব প্রশংসা করত তাই ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস করেছিলাম প্রথমে। তারপর জনার্দনবাবু আমার চোখ খুলে দিলেন—এখন দেখছি যদিও একটু ঘুঁতঘুঁতে ধরণের তবু বৈদ্যপ্রসাদ লোকটাই ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট। ভুল সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল। তা হোক। ব্রজেশ্বরবাবু আপনারও এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখা উচিত—ঐতিহাসিক মানুষ আপনি—এদিকের ইস্টিরিয়রে চমৎকার চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, কতকগুলি মূর্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? আসা মুস্কিল অবশ্য। কাছে-পিঠে কোনও স্টেশন নেই কি না। আপনারা বাই রোড এসেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক মাইল দূরে। আমরা হেঁটে এসেছি এখানে রাতটা কাটাবার জন্যে"

"আমাকেও আপনাদের সঙ্গী না হতে হয়, কি বিপদ দেখুন তো"

"না আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন" আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"আমিও আপনার সৎকার করতে অক্ষম আপাতত" গোঁসাইজি বললেন।

"তা-ও বটে, ঘর খালি নেই আপনার। যদি থাকতেই হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয় তো—কিম্বা বাইরে—হা-হা-হা-হা"

"হা-হা-হা-হা"—জোর করে' হেসে উঠল সুশোভন। লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়!

গোঁসাইজি ভ্রূকুটি করলেন।

"পাঁচ মাইল তো মোটে"—সান্ত্বনা বললে।

কণ্ঠ-স্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতায় সুর ফুটিয়ে উৎসাহ দিল সুশোভন—"হ্যাঁ, ঠিক পৌঁছে যাবেন আপনি"

সদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আশ্বাসজনক। "হ্যাঁ, মোটে পাঁচ মাইল পৌঁছে যাওয়া উচিত তো। তাছাড়া গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাণ্ডাও হয়েছে খানিকটা, গর্মে ছিল ভয়ানক। বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে, কি বলেন"

"হ্যাঁ, রাত হয়েছে, আর দেরি করা উচিত নয়"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী। অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্তু ঘাবড়ে দিয়েছিল বেশ। মনে হচ্ছিল ইন্‌লেট্ ভালভের স্প্রিংই গেছে বুঝি একটা। এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড্ হয়েছিলাম। মিকশ্চারটা আর একটু রেগুলেট করে' নিতে হবে তার মানে। একটু 'রিচ্' হয়ে গেছি সম্ভবত। আচ্ছা, নমস্কার তাহলে, নমস্কার—"

ঝুল-কালি-মাখা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বড় আনন্দ পেলাম। আবার আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগগির। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রং-ই বদলে যায়। চমৎকার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী"

"নারায়ণের কৃপায় পৌঁছে যান ভালয় ভালয়। আমার এখানে স্থান নেই মোটে"

গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন আবার গোঁসাইজি।

"খানিকটা গিয়ে যাইক যদি কেস করে তাহলেও নেবেন না"

"আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও নেব না, মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোড়া থেকেই বলছি আপনার সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত।"

"তাহলে যা থাকে কপালে বলে' বেরিয়ে পড়া যাক এইবার। কি বলেন! গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর বেগ দেবে না বোধ হয় আশা করি"

সদারঙ্গবিহারীলাল মরীয়া হয়ে অগ্রসর হলেন যাবের দিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার সান্ত্বনা দেবী, নমস্কার ব্রজেশ্বরবাবু। বা বা চমৎকার কুকুরটি তো—খাসা। কি সুন্দর লোম। আপনার কুকুর বুঝি সান্ত্বনা দেবী—বাঃ"

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে জানালে যে কুকুর তারই কুকুর।

"বাঃ—"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু ঝুঁকে কুকুরকে আদর করলেন। কুকুর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে নিজের মনিবের দিকে তাকালে একবার। তারপর হাঁচলে।

"বাঃ, সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার। কুকু, চলি বুঝলে, নমস্কার"

গোসাইজি গলা-খাঁকারি দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন তাল করে'।

"এতক্ষণে গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া উচিত অন্তত, আচ্ছা চলি এবার, নমস্কার তাহলে"

গোসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। একটি কথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অনুগমন করলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসলে একটু। তোলকাজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর বাড়ির গিন্নির যে রকম মুখভাব হয় সান্ত্বনার মুখভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল। দড়াম করে' সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। গোসাইজি ফিরে এলেন। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে গভীর দুটি রেখা ফুটে উঠেছে দেখা গেল।

"আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন"

সুশোভন রুমালটা বার করে' নাক ঝাড়তে লাগল। সান্ত্বনাই জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্মী"

"ও, আমি ধরতে পারি নি ঠিক। আপনি কোন দিকে?"

"কিসের কোন দিকে—মানে আপনি যে দিকে—মানে"

"আপনি অফিস অ্যাক্সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে না বিপক্ষে"

"অফিস অ্যাক্সেপ্‌টান্সের?

সুশোভন ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোসাইজির দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলে একবার। তার মনে হল গোসাইজির মতো লোকের অফিস অ্যাক্সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি স্বপক্ষে"

"ও, স্বপক্ষে। বটে—"

ওষ্ঠ দ্বারা অধরকে নিষ্পিষ্ট করে' গুম হয়ে গেলেন গোসাইজি। তাঁর চক্ষুর দৃষ্টি থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অস্বস্তিজনক সমন্বয়।

"সিংহাসনে সবাই বসতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক" এইটুকু বলে' একটু থেমে "হ্যাঃ" বলে' গোসাইজি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তার পর কি মনে হল হঠাৎ ঘুরে বললেন—"সিংহাসনে বসছেন বসুন, কিন্তু ঘুষ নেওয়াটি বন্ধ করতে পারবেন? এই যে আপাদমস্তক সবাই চোর, দিনদুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি তাহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ঢুকতে চাই"

"ভাল। আমার অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যখন নাম লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে যেবেন দয়া করে'। একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী আমার হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন এ নজির পাঁচজনকে দেখাবার মতো"

পুনরায় অধর দিয়ে ওষ্ঠকে চাপলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না ঠিক।

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে গোসাইজি বললেন, "আপনারা শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল শোওয়াই নিয়ম"

"বেশ তো, বলেন তো এখনি যেতে পারি"

সান্ত্বনা ঝুঁকে কুকুরকে কোলে তুলে নিলে। গোসাইজি শিউরে উঠলেন।

"ও কি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা"

"শুতে"

"ও আপনার সঙ্গে শোবে।"

"হ্যাঁ, কেন"

"এক বিছানায়?"

গোসাইজির কণ্ঠস্বরের গ্রাম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

"তাই তো শোয় বরাবর"

"আপনি ব্রজেশ্বরবাবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় শোয় বরাবর?"

"নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আপনার আপত্তি আছে না কি"

"আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন!"

তার পর সুশোভনের দিকে ফিরে প্রায় চীৎকার করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কুকুরটার সঙ্গে শোন আপনি!"

"আমি—মানে হ্যা, তা শুই বই কি। বাচ্চা বেলা থেকে পুষেছি কি না—"

গোঁসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। অষ্টধাতু-অঙ্গুরীশোভিত তর্জ্জনী তুলে বললেন—"এখানে শোবার ঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। এ ঘটান হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিল আমার—

সুশোভনের ধৈর্য্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠছিল, এ কথা শুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল।

বলে উঠল—"আপনার ধারণার সীমা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই আমাদের। আমাদের কুকুর নিয়ে শোয়াই অভ্যাস"

"অভ্যাস? এই ম্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোরগলায় বলছেন আবার! আপনি একজন কংগ্রেসকর্ম্মী না? এ কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার"

"কেন, কংগ্রেসকর্ম্মীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি"

"এই কি স্বদেশী আচরণ? যাই হোক আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না সোজা কথা"

"অদ্ভুত হোটেল আপনার!"

"এটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস—দয়া করে' মনে রাখবেন সেটা"

(ক্রমশঃ)

সীমান্তে লীগ আন্দোলন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন, এইরূপ প্রচার করিয়া তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলবিরোধী আন্দোলন সুরু করে। লীগ সমর্থকরা সর্ব্বত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করিতে গিয়া সীমান্ত পরিষদের বিরোধী দলের নেতা খান আবদুল কোয়ায়ুম খান, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খান সাহিব জান খান ও অপর চার জন লীগ নেতা প্রথম দিনেই গ্রেপ্তার হন।

পেশোয়ারের লীগপন্থীরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া পরদিন আগ্নেয়াস্ত্র, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর বাংলোর নিকটে গিয়া উপস্থিত হয়। প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বাংলোর জানালা ও শার্সির ক্ষতি করে এবং বাংলোর অলিন্দে দণ্ডায়মান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ও শিক্ষা মন্ত্রী মহম্মদ ইয়াহিয়া জানের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে। লীগপন্থীদের এই বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পুলিশ ঐদিন সীমান্ত প্রাদেশিক লীগের প্রাক্তন সভাপতি খান বাহাদুর আজাদ খান ও পেশোয়ার সিটি লীগের সম্পাদকসহ অপর ১৪ জন লীগনেতাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

ক্রমে এই আন্দোলন ডেরাইসমাইলখান, বান্নু, টক প্রভৃতি সহরে ছড়াইয়া পড়ে ও সহর ছাড়াইয়া গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং লীগের মন্ত্রীমণ্ডল বিরোধী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনেও পরিণত হয়। সীমান্তের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইহাদের হাতে নিহত হইতে লাগিল, তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল, ধর্ম্মস্থান কলুষিত হইল এবং তাহাদিগকে জোরপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইল।

মার্চ মাসে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড দেখা দিলে সীমান্তের এই উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। লীগপন্থীরা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাত্রা আরও চড়াইয়া দিল। ১৪ই মার্চ পেশোয়ারের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া এবং মূলপথেরও যোগাযোগে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া কয়েক দিনের জন্য পেশোয়ারকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। ইহার পর হইতে বিক্ষোভকারীরা সরকারী আদালত ও অফিস সমূহের সম্মুখে পিকেটিং, সরকারী ভবনে লীগ পতাকা উত্তোলন, অফিসের দলিলপত্র বিনষ্ট করা, রেল লাইন তুলিয়া ফেলা, ট্রেনের গতিরোধ করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হত্যা করা, ষ্টেশনে জোরপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া পাকিস্থানী টিকিট বিক্রয় করা, গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি বে-আইনী কার্য করিতে থাকিল। মাঝে মাঝে বোর্খা পরিহিত মহিলারাও শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং কোথাও কোথাও পিকেটিং আরম্ভ করিল।

২১শে মার্চ নমাজের পর এক জনতা হাজারা জেলার মনসেরায় একটি

বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। তাহাতে একশত দোকান ভস্মীভূত হয় এবং কয়েক রাত্রি হত্যাহত হয়।

১৪ই এপ্রিল এক অগ্নিসংযোগের ফলে ডেরাইসমাইলখান বাজারে প্রায় চারশত দোকান ও গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া একটি সিনেমা হল, টাউন হল, দুইটি ধর্মস্থান, একটি কলেজ, একটি বিদ্যালয় ও একটি সরাই ভস্মীভূত হয়। ডেরাইসমাইলখান জেলায় ১৪ই হইতে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে ১১৮ জন নিহত ও ৮১ জন আহত হয়। ডেরাইসমাইলখান সিটি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত ভগবান দত্তওয়ার্ক বলেন যে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত ডেরাইসমাইলখান সহরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা এবং বাসগৃহসহ ভস্মীভূত দোকানের সংখ্যা এক হাজার।

ডেরাইসমাইলখান জেলার কোল সাহাম, দেরা কোট, বুস্ক, পাক্কুখেল, টাকওয়ারা, হাথালা, পোরী প্রভৃতি গ্রামে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্মান্তরিতকরণ চলিতে থাকে। আন্দোলনকারীরা কয়েকজন মন্ত্রীর প্রাণবিনাশেরও চেষ্টা করে।

সীমান্তের অবস্থা এইভাবে চরমে উঠিলে ২৮শে এপ্রিল বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন একদিনের জন্য সীমান্ত সফরে বাহির হইলেন। তিনি সীমান্তের আন্দোলন সম্পর্কে গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং স্থানীয় লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিলেন। এমন কি কয়েকজন বন্দী লীগ-নেতাকে বিমানযোগে নয়াদিল্লী নিয়া জিন্নার সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সহিত পরামর্শ করিবারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মিঃ জিন্নার সহিত লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সত্ত্বেও কিছুই হইল না। মে মাসের প্রথম দিকে সীমান্তের লীগ নেতারা আন্দোলন প্রত্যাহার না করিবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মিঃ জিন্নাও নয়াদিল্লী হইতে এক বিবৃতিতে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাইলেন।

লীগের আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা স্থানীয় লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। উপদ্রুত স্থানে যথেষ্টসংখ্যক পুলিস ও সৈন্য মোতায়েন করিয়া এবং খোদাইখিদমদ্‌গার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আনাইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীমান্তের এই ধ্বংসাত্মক গৃহ-আইনী কার্যকলাপ অতি সহজেই দমন করা যাইত, যদি না সীমান্ত গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো মন্ত্রীমণ্ডলীকে ডিঙাইয়া নিজের প্রস্তাব বিস্তার করিতে যাইতেন। তিনি মন্ত্রীদের কাজে বরাবর বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। এমন কি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে থাকেন এবং লীগের সন্তুষ্টিসাধনের জন্য প্রদেশে পুনরায় নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন, বড়লাটের সহিতও এসম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন। সরকারী কর্মচারীরা এক দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর, অপর দিকে গবর্ণরের এই দ্বৈত আনুগত্য প্রদর্শন করিতে থাকায় দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের কাজে আরও সুবিধা পাইল। ইহা ছাড়া আন্দোলনকারীদের অনেকে উপজাতি এলাকায় আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে সীমান্তে আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং নিজেদের প্রচারের দ্বারা অনেক উপজাতিকেও বিভ্রান্ত করিয়া দলে ভিড়াইল। এই উপজাতি অঞ্চলে সীমান্ত গবর্ণরের এক বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে, এখানে মন্ত্রীসভার কোনও হাত নাই। পলিটিক্যাল এজেন্টরা এই সকল উপজাতি এলাকায় খোদাইখিদমদ্‌গার বাহিনীকে ঘোটেই প্রবেশ করিতে দেয় না, অথচ লীগপন্থীদের প্রচারের সুযোগ দিয়া থাকে।

সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্গিয়া ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এসম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন এবং সমগ্র দেশব্যাপী ইহা লইয়া আন্দোলন করিবারও আভাস দিলেন। কারণ মাত্র একবৎসর পূর্বে যাহারা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছে, সেখানে পুনরায় নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া সীমান্তের ব্যবস্থা পরিষদে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন কংগ্রেসী সদস্য, ২জন শিখ, ১জন আকালী শিখ ও মাত্র ১৭ জন লীগপন্থী। এখানে কংগ্রেস অত্যন্ত নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারোর নূতন নির্বাচনের আগ্রহ সম্পর্কে খান আবদুল গফুর খান বলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি সত্যই আগামী বৎসরে ভারত ত্যাগ করে তাই গবর্ণর লীগের খান ও নবাবদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ খোদাই খিদমদ্‌গার আন্দোলনের সময় উহারাই বৃটিশকে সর্বোপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। লীগবন্ধু স্যার ক্যারো, বড়লাট লেসোয়ারে যাইলে লীগপন্থীদের দ্বারা সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খান আবদুল গফুর খান আরও বলেন যে ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে 'কিস্‌খানি' হত্যাকাণ্ডের সময়ে এই ক্যারোই তখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী ও দেওয়ান চমনলাল সীমান্তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাঁহারা সীমান্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহারা বলেন, সীমান্তে লীগের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে শত শত লোক খুন হইয়াছে, শত শত দোকান ও গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্থানে বহুলোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে। তাঁহারা বিবৃতিতে আরও বলেন যে, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য করিতে পারেন, স্যার ওলাফ ক্যারোর পরিবর্তে সীমান্তে এখনই এরূপ একজন গবর্ণর নিয়োগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে লীগের আন্দোলন চলিতে থাকিলেও প্রবীণ মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব সীমান্তের লীগ পন্থীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন, আমরা যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন উহারাই বৃটিশের সহায়ক হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ছিল। তাহা সত্ত্বেও আমি এখন বলিতেছি যে উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নাই। আমরা সকলেই পাঠান সন্তান, আমাদের লক্ষ্য বৃটিশকে ভারত হইতে তাড়ান, তখন সেই স্বাধীন ভারতে প্রত্যেকেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে।

এই সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের জন্য বড়লাটের উদ্যোগে গান্ধী-জিন্না আবেদন প্রচারিত হইলে সীমান্ত প্রদেশের সকল লোককেই এই আবেদনে পূর্ণ সহানুভূতি প্রদানের কথা বলেন এবং জানান যে, যে সকল রাজনৈতিক বন্দীর বিরুদ্ধে কোন হিংস কার্যকলাপের অভিযোগ নাই, অথবা একটু শান্ত হওয়া মাত্রই তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইবে। এরূপ রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। কিন্তু সীমান্তের লীগ আন্দোলনে গান্ধী-জিন্না আবেদন কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না এবং বাঙ্গাও একটুও শান্ত হইল না। সমগ্র প্রদেশ জুড়িয়াই একপ্রকার হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি লাগিয়া রহিল।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বরাবরই অহিংসায় বিশ্বাসী। ইহা দেখিয়া সীমান্তের জনসাধারণ লীগের সংগঠক কার্যকলাপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে এবং উহার নাম দেয় "জালেমি পাখতুন" (তরুণ আফগান)। ইহার লক্ষ্য হইল শুধু আত্মরক্ষা, আক্রমণ নহে। ইহা অহিংসায় বিশ্বাসী খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জালেমি পাখতুনের পাল্টা জবাব হিসাবে লীগও এক সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিল এবং তাহার নাম দিল গাজী পাখতুন।

মিঃ জিন্না সীমান্তের লীগ নেতাদের আন্দোলন প্রত্যাহার না করার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা হিন্দু বা শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছি না, আমরা সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত গ্রহণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি। কিন্তু মিঃ জিন্না ভুলিয়া যান যে মাত্র একবৎসর পূর্বেই সীমান্তের অধিবাসীরা তাঁহাদের প্রকৃত অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন। নির্বাচনে লীগকে অধিকাংশ স্থলেই পরাজিত করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন তাহারা কংগ্রেসেরই সমর্থক। আর মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুচরেরা সীমান্তের লীগ আন্দোলনকে শুধু মন্ত্রিসভা বিরোধী আন্দোলন বলিয়া প্রচার করিলেও ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ইহা সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনও বটে। তাহা না হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু ও শিখরা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অল্প ও মুসলমানরাই সর্বাধিক সংখ্যায় পরিষ্ঠ সেখানে এত হিন্দু ও শিখকে হত্যা করা হইল কেন। লীগ সীমান্তের হিন্দু ও শিখদের হত্যা করিয়া বিহারের প্রতিশোধ বলিয়া হয়ত কিছুটা আত্মপ্রসাদলাভ করিতে পারে কিন্তু ঘৃণা ও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তাহারা সহজে বীর পাঠানদের উপরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

৩রা জুনের বৃটিশ পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে, লীগ সভাপতি মিঃ জিন্না ঐ দিন দিল্লী হইতে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় সীমান্ত প্রদেশিক মুসলিম লীগকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী ৮ই জুন সীমান্ত লীগ সবয়—পরিষদ আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই ভাবে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সাড়ে তিনমাস কাল সীমান্তে লীগের আইন অমান্য আন্দোলন চলিবার পর তাহা বন্ধ হইল। লীগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার দিনই ৪০০ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে আরও বন্দীদের মুক্তি দান করা হয়।

৩রা জুনের বৃটিশ প্রস্তাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যদিও উক্ত প্রদেশের নির্বাচিত ৩ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যেই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন; তথাপি পালামেন্টের অধিকাংশ সদস্য বর্তমান গণপরিষদে যোগদান না করায় এই প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া, সীমান্তের জনসাধারণ বর্তমান গণ-পরিষদ না পাকিস্থান গণ-পরিষদ কোনটিতে যোগদান করিবে তাহা জানিবার জন্য গণ-ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।

লীগ ইতি মধ্যেই সীমান্তের গণ-ভোটে যাহাতে জয় লাভ করিতে পারে তাহার তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। লীগ নির্বাচনে জিতিবার জন্য হিংসা পথ অবলম্বন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। তাই এই লইয়া সীমান্তে আবার না একটা হাঙ্গামা হয়, ইহাই আশঙ্কা হইতেছে।

দেউলিয়া

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

মনের আড়ালে
যাহা কিছু মোর
সঞ্চিত হ'য়েছিল,
এক এক করি
আজি এ প্রভাতে
সব সাজে দেখা দিল।

বিচারক হ'য়ে
বসিয়াছি আজ
সঞ্চিত পুঁজি মাঝে।
পরখ করিতে
পাথের বলিয়া
কোন্ পুঁজিটুকু আছে।

সঞ্চিত যাহা
ছিল এতদিন
সারা জীবনের সাথে।
কিছুই তাহার
লাগিল না কাজে
ওপারে যাবার রাতে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৫

আমরা সেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম যে, ধ্বংস স্তূপের মধ্য দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ নিম্নদিকে ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়াছে। পথটি এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার, কিন্তু এত সঙ্কীর্ণ যে কেবল একজন ব্যক্তিমাত্র সঙ্গে এই পথ দিয়া গমন করিতে পারে। দুই পার্শ্বে প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড, বালুকা ও ধূলারাশি উচ্চ প্রাকার রচনা করিয়াছে। আমরা একেক শ্রেণীবিন্যস্ত হইয়া এই পথ বাহিয়া ভগ্ন দুর্গের মধ্যে আমাদিগের অস্ত্রাগারাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বাগ্রে ছিল নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ, তাহার পশ্চাতে ছিলেন আর্য্য অর্হতপাদ মহাস্থবির, তৎপরে ছিলাম আমি এবং আমার পশ্চাতে প্রজ্ঞা-শেখর-প্রমুখ নায়কগণ। আমরা সকলে এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা একটি নাতি-ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। এই অঙ্গনের তিন দিক অত্যুন্নত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পরিবৃত।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে সাতটি প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া অস্ত্রাগারে পরিণত করা হইয়াছে। কক্ষগুলি দীপালোকে উদ্ভাসিত। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিকের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততম কক্ষে আমরা সকলে প্রবেশ করিলাম। সমগ্র কক্ষতল পশুলোম নির্ম্মিত পেলব সুকোমল আস্তরণ বিমণ্ডিত। আমরা সকলে কক্ষ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। আমাদের সম্মুখে কীর্ত্তিবর্ম্মণ বসিল। তাহার পার্শ্বে পড়িয়াছিল কুণ্ডলীকৃত দুইটা মনুষ্য নামধেয় জীব। তাহাদের হস্তপদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ এবং তাহাদের চক্ষু বস্ত্রদ্বারা অতি সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণরূপে আবৃত—অনুমান হয় বাহিরের আলোকের ক্ষীণ রেখাও তাহাদের নয়ন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আমি কীর্ত্তিবর্ম্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

যে কক্ষে আমরা বসিয়াছিলাম তাহার দ্বারদেশে বাহিনীর দুইজন সদস্ত কোষমুক্ত অসি হস্তে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং আরও নয়জন সদস্ত সশস্ত্র হইয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছিল। তাহারাও প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত এবং বাহিরের অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের অনধিকার আগমন প্রতিরোধে সম্যক্ প্রস্তুত ও সম্পূর্ণ সজাগ।

আমার প্রশ্নের উত্তরে কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল, "আমি মন্ত্রণা সভায় যথা সময়ে যাইতেছিলাম, পথে এই দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রথমে একজনকে বনের মধ্য দিয়া আমাকে অনুসরণ করিতে দেখিতে পাই। আমাদের বাহিনীর মন্ত্রংক্ষামণ্ডলী সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ এই অরণ্যের মধ্যে এবং সর্ব্ব সময়ে, কয়েকজনকে যে কোনও প্রকার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখিয়া থাকে। আমি দাঁড়াইলাম এবং পিছনে চাহিয়া দেখিলাম কে—যেন একটা বৃক্ষের উপর হইতে একটা শুষ্ক শাখা নাড়িয়া আমাকে সঙ্কেত করিল যে, এই গুপ্তচর আমাদিগের মণ্ডলী নিযুক্ত প্রহরীর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। আমি একটা সুদীর্ঘ বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া আস্ফোলন পূর্ব্বক আমাদের মণ্ডলী-নিযুক্ত সঙ্কেতকারী প্রহরীকে আমার নিকট ডাকিলাম। সে নিঃশব্দে আমার নিকটে আসিয়া অনুচ্চস্বরে আমাকে জানাইল যে, দূরে আরও একজন চর বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে; তাহাকেও একজন প্রহরী লক্ষ্য করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বন পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিতে ও চরদিগকে বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলাম। আমাদের রক্ষামণ্ডলীর সদস্তগণ বন ঘিরিয়া ফেলিল এবং

এই দুই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিল। ইহাদের বন্দী করিয়া আনিতে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা ব্যতীত আর কেহ ইহাদের যে সহকর্মী কোথাও লুকাইত ছিল না বা নাই, তাহার নিশ্চয়তা আছে কি?"

—আমাদের মন্ত্রণাসভাগণী সমগ্র অরণ্য পরিক্ষেপ পূর্ব্বক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া আর কাহারও সন্ধান পায় নাই।

—ইহাদের বন্দী করিবার সমস্ত ব্যাপারটা আমরা শুনিতে চাই। কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ইহাদের বিচার কার্য আরম্ভ হইবে।

—ইহারা সশস্ত্র ছিল এবং ধৃত হইবার পূর্ব্বে অস্ত্র বাহির করিয়া আমাদের সভাগীর সদস্যগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা স্বল্পায়াসেই ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া ও হস্ত-পদ রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছি। ইহারা আমাকে অনুসরণ করিবার সময়ে গমন পথে ও বনের মধ্যে যে সকল নিদর্শন নিজেদের সপক্ষ কর্তৃক ইহাদের অনুসন্ধান সুগম করিবার জন্য, অথবা ইহাদের আপনার পথ চিনিয়া বন হইতে বাহির হইবার জন্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তাহাও আমরা সযত্নে ও সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এই ব্যাপারের জন্য আমাকে অনেকক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল এবং এই কারণেই আমি অদ্যকার সন্ধ্যার মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষম হইয়াছিলাম।

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "প্রথমে নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণের মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতির বিচার হউক। আমার মতে বর্ত্তমান চর প্রতিরোধ কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনায় কীর্ত্তিবর্ম্মণের অদ্যকার মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতি মার্জ্জনীয়।"

সকলের ঐক্যমতে কীর্ত্তিবর্ম্মণের মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতি অপরাধ বলিয়া গণনা করা সমীচীন হইল না। সকলেই বলিল যে, কীর্ত্তিবর্ম্মণ গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের জন্য মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যেহেতু সে কোনও অপরাধই করে নাই, তখন তাহাকে মার্জ্জনা করারও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এই প্রস্তাব সর্ব্বানুমোদিত হইলে শেখর বলিল, "কীর্ত্তিবর্ম্মণের সতর্কতার দ্বারা এবং সে তাহার কর্ত্তব্যের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়ায় সংঘ একটা ঘোর বিপদ হইতে আজ মুক্তিলাভ করিল। এই ঘোর আকস্মিক বিপদ হইতে সংঘকে মুক্ত করিবার জন্য সংঘ কীর্ত্তিবর্ম্মণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রহিল এবং অতঃপর কীর্ত্তিবর্ম্মণ মন্ত্রণাসভার সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে বৃত হউক।"

সংঘকর্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল এবং মহাস্থবিরের অনুজ্ঞা ও উপদেশ মত, সর্ব্বানুমতিক্রমে আমি নায়কের কপালে শ্বেতচন্দনের টীকা রচনা করিয়া দিলাম।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরকে বলিলাম "এখন চরদিগের বিচারকার্য্য আরম্ভ হউক।"

মহাস্থবির বলিলেন "হাঁ, তাহাই হউক!" নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ, ইহাদিগকে সংঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া দাও এবং ইহাদের স্বপ্রথানুযায়ী সংঘকে অভিবাদন করিতে আদেশ কর!

একজন সংঘসৈন্য কীর্ত্তিবর্ম্মণের ইঙ্গিতে বন্দীদিগের পদ রজ্জুমুক্ত করিল এবং দুইজনের এক একটা পদে এক একটা লৌহবলয় দৃঢ়রূপে পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ঐ বলয় দুইটি একটি সার্দ্ধ একহস্ত দীর্ঘ শৃঙ্খল দ্বারা যুক্ত করিয়া ঐ শৃঙ্খলের মধ্যভাগে আর একটা দীর্ঘ শৃঙ্খল সংযুক্ত করিয়া উহার অপরপ্রান্ত গৃহপ্রাচীরে প্রোথিত একটা দৃঢ় লৌহশলাকার সংলগ্ন করা হইল।

ইহাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলে ইহারা তাহা পালন করিতে অস্বীকার করিল। তখন কীর্ত্তিবর্ম্মণ সংঘের অনুমতিক্রমে লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ইহাদের দেহে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে অতি অল্পক্ষণ পরেই বীরদ্বয় উঠিতে বাধ্য হইল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাবনিকপ্রথায় সংঘকে অভিবাদন করিল। আমরা হাসিলাম।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরকে অনুরোধ করিলাম বন্দীগণের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য। দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকার ব্যক্তি আমার পরিচিত এবং আমার প্রাক্তন

গৃহশিক্ষক। সে পুরুষপুর নগরে ডেমিট্রিঅস নামে খ্যাত। তাহার সমগ্র ইতিহাস সভায় জ্ঞাপন করিলাম।

মহাস্থবির প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, বন্দীগণ, এখন তোমরা কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রভাবে তোমাদের পরিচয় সংঘের নিকট জ্ঞাপন করিবে? না, তাহার জন্য আবার কীর্ত্তিবর্ম্মণকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে?"

বন্দী ডেমিট্রিঅস্ বলিল, "আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন তাহা করিতে পারেন, আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত রহিলাম।"

মহাস্থবির বলিলেন, "বেশ! তোমাদের সুমতি হইয়াছে দেখিতেছি! আচ্ছা, তোমার ভাই তোমাদের নাম কি।"

ডেমিট্রিঅস্ বলিল, "আপনি কি আমাদের সকলকে একত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিতেছেন? আমরা কয়জন এই অবস্থায় আছি তাহা ত আমি জানি না। আমার চক্ষু খুলিয়া দিলে আমি বুঝিতে পারিব আপনি কাহার উদ্দেশ্যে আপনার প্রশ্ন করিতেছেন।"

মহাস্থবির বলিলেন, "চক্ষুর বন্ধনী এখন খুলা হইবে না। আমি তোমাকেই প্রশ্ন করিতেছি। তোমার নাম বল।"

—আমার নাম "জেনোফিলস্ পলিক্রিষ্টস্।"

—মিথ্যা বলিতেছ।

—না, মিথ্যা বলি নাই।

—আমরা তোমার যথার্থ নাম জানি। তুমি তাহা বলিবে কি? না, তোমাকে তোমার যথার্থ নাম আমরা বলাইব? কিন্তু, তাহা তোমার পক্ষে, অন্ততঃ তোমার শরীরের পক্ষে বড় শুভ বা স্বস্তিপ্রদ হইবে না।

—আমি আমার নাম গোপন করি নাই।

—আমরা তোমার পরিচয় জানি।

—আমার যে পরিচয় আপনারা জানেন তাহাই যে আমার যথার্থ পরিচয়, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

—তাহা পরে জানিবে। এখন সহজে তোমার যথার্থ নাম সম্বন্ধে জানাইবে কি? না, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে?

—আমি আমার যথার্থ নামই বলিয়াছি।

—তুমি যে ডেমিট্রিঅস্ নামে পুরুষপুরে অনেকের নিকট পরিচিত আছ তাহা কি তোমার যথার্থ নাম নহে?

—আমি নগরে কাহারও নিকট ডেমিট্রিঅস্ নামে পরিচিত নহি এবং ছিলাম না।

—তুমি কি এই নগরে কোনও বৌদ্ধ গৃহপতির বাটীতে তাঁহার পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষকরূপে কখনও নিযুক্ত ছিলে না?

—না, ছিলাম না।

—মনে করিয়া দেখ দেখি—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাহার পর সেই গৃহপতিই তোমাকে আবার ক্ষত্রপের শাসন-বিভাগে এক মণ্ডলেশ্বরের অধীনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও অবধি সেই কার্য্যেই তুমি নিযুক্ত আছ।

—না, সেরূপ কোনও কথা আমার স্মরণ হয় না।

—এই চারের কর্ম্ম তোমার অন্নসংস্থানের জন্য সর্ব্বজন-বিদিত কার্য্য নহে; তুমি চারের কার্য্য তোমার অবকাশ মত করিয়া থাক এবং তাহার জন্য তুমি স্বতন্ত্র বেতন ও পুরস্কার পাইয়া থাক। কেমন? ঠিক না? অস্বীকার করিবে কি?

—না, ঠিক নহে; ইহা ভ্রান্ত অনুমান মাত্র।

—বনের মধ্যে ঢুকিয়াছিলে কেন?

—উদ্দেশ্য ছিল মৃগয়া এবং এই বনভূমি মৃগয়ার উপযোগী কিনা তাহাই আমরা পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলাম।

—তোমরা সশস্ত্র ছিলে, কেমন?

—ছিলাম।

—কি কি অস্ত্র তোমাদের ছিল?

—শরপূর্ণ তূণ, ধনু, ভল্ল, শূল, পরশু ও তরবারি।

—এই সকল অস্ত্র কি মৃগয়াভূমি পর্য্যবেক্ষণ বা মৃগয়ার জন্য আবশ্যক হয়?

—না হইতে পারে, কিন্তু অপরিচিত বনভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে একটু সতর্ক হইতে হয়, তজ্জন্য আমরা অজ্ঞাত ও আকস্মিক কোনও বিপদের আশঙ্কায় বিশেষভাবে সাবধান হইয়া আসিয়াছিলাম। বনভূমিতে দস্যু ত থাকিতে পারে; আমাদের এরূপ সম্পূর্ণরূপে সশস্ত্র হইয়া আসার উদ্দেশ্য বন্যপশু, দস্যু ও অপর কোনও অজ্ঞাত শত্রুতায়ীর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে [illegible]।

ক্রমশঃ

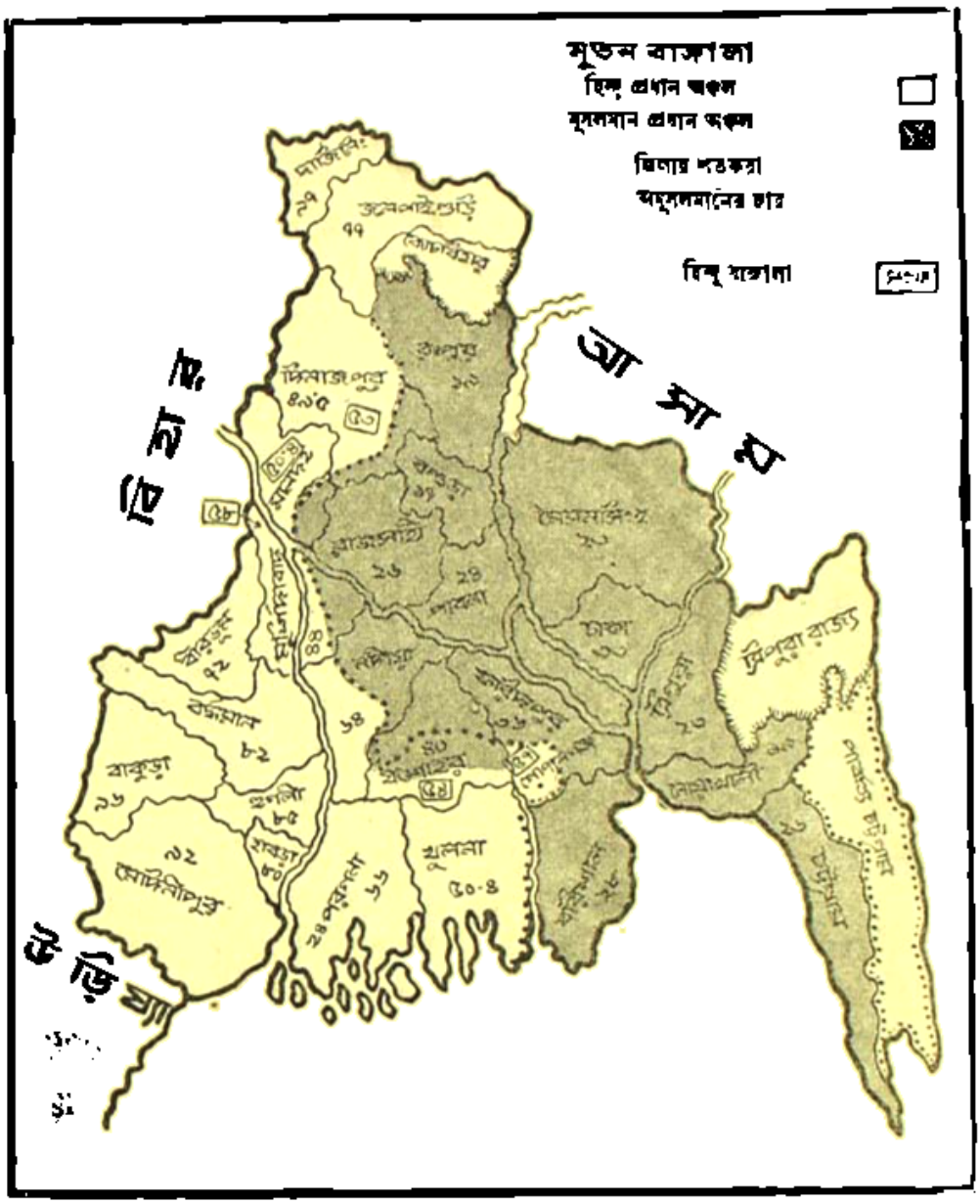

এই সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের—'নূতন বাঙ্গালা প্রবেশের পরিকল্পনা' নামক প্রবন্ধের ম্যাপ

টুক্‌রো কবিতা

(মিনতি)

শ্রীলীলাময় দে

অধরের সনে অধর মিলনে
আঁকিল যে প্রেমচিহ্ন
সেই ত আমার পূজার কুসুম
করো না তাহারে ভিন্ন।
অবসর ক্ষণে মুকুরের মুখে
তুলিয়া অধরখানি
ওষ্ঠের রেখা সাঁদরে সোহাগে
অন্তরে নিও টানি।
সে যে সাধনের শক্তিত শিখা
জ্বেলে রাখিয়া রয়
আমার স্নেহের চিহ্ন যেন গো
তোমারেই করে ময়।

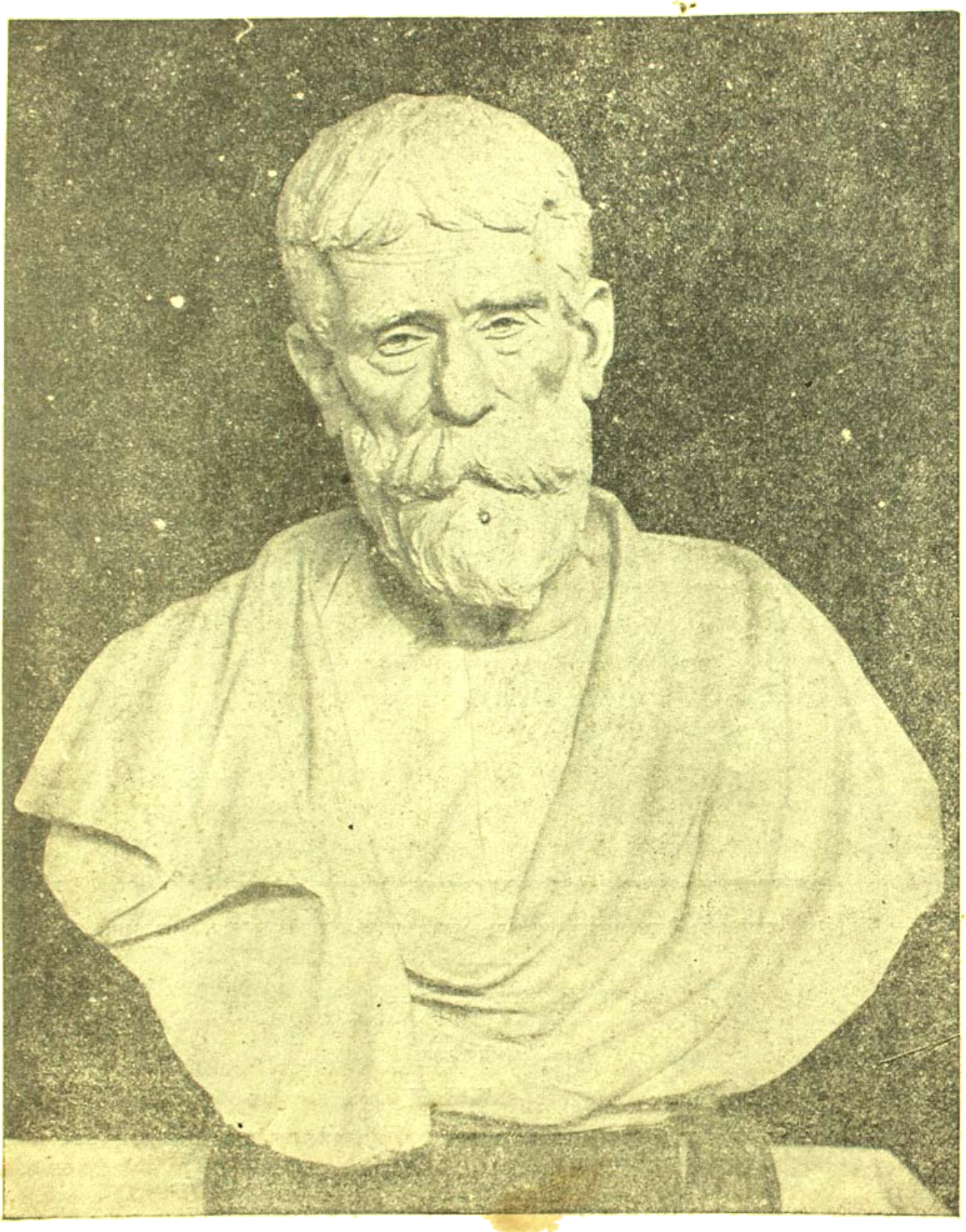

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি

(বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের জন্য প্রস্তুত) শিল্পী—শ্রীঃদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—মডেল

বড়লাটের ঘোষণা—

বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন কয়দিন বিলাতে থাকিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভার সহযোগের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ভারতে ফিরিয়া যাওয়া মাত্র ভারতের ৭ জন নেতার সহিত পরামর্শের পর গত ৩রা জুন নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন—

"গত মার্চ্চ মাসের শেষে এদেশে আসিয়া পৌঁছিবার পর আমি প্রায় প্রত্যহই নানা সম্প্রদায় ও দলের বহুসংখ্যক প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে যে সকল তথ্য এবং পরামর্শাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে সদ্ভাব সহকারে বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি একটি অবিভক্ত ভারতীয়রাষ্ট্র বজায় রাখিতেন তবে তাহাই হইত সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধান—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত কয় সপ্তাহে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। গত একশত বৎসরের উপরে আপনারা ৩০ কোটি লোক এক সঙ্গে বসবাস করিতেছেন এবং ভারতবর্ষ একটি মোটা রেল হিসাবেই শাসিত হইতেছে। ইহার ফলে এই দেশের জন্য একই চলাচল ব্যবস্থা, একই দেশরক্ষা, ডাক ও মুদ্রানীতির ব্যবস্থার কাজ চলিতেছে। ইহার ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক ও বাণিজ্যঘটিত কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই; ইহার জন্যই একটি অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে এই সবই নষ্ট হইয়া যাইবে না—আমার মনে এই প্রত্যাশা প্রবল ছিল। সেইজন্যই আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি পুরাপুরিরূপে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মানিয়া লইয়াছেন এবং আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সমুদয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী মিশনের কিংবা ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার অনুকূলে অন্য কোনও পরিকল্পনা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কিন্তু কোন একটি বৃহৎ অঞ্চল—যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যবিশিষ্ট গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিতে বাধ্য করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বলপ্রয়োগে বাধ্য করার পরিবর্ত্তে যে উপায় আছে তাহা হইল অঞ্চল বিভক্তকরণ। কিন্তু মুসলীম লীগ যখন ভারত বিভাগের দাবী তুলিল তখন কংগ্রেসের তরফ হইতে ঠিক একই যুক্তির দ্বারা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশ বিভাগের জন্য দাবী উঠিল। আমার মতে এই যুক্তি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ কোন পক্ষই নিজেদের সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা বৃহৎ অঞ্চলকে অন্য সম্প্রদায়ের গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাখিতে সম্মত হন নাই। অবশ্য আমি নিজে ভারত বিভাগেরও যেমন পক্ষপাতী নই, প্রদেশ বিভাগও তেমনি সমর্থন করি না। উভয় ক্ষেত্রেই না করিবার কারণ এক এবং মৌলিক। সাম্প্রদায়িক মতবিরোধের উদ্ভব, যেমন ভারতীয় মনোভাব আছে বলিয়া আমার ধারণা, তেমনি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী মানসিকতা বলিয়া একটা মনোভাব আছে যাহা প্রদেশের প্রতি মনপ্রাণের আনুগত্য বোধ জাগাইয়াছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয়, ভারতবাসীদের নিজেদেরই তাড়াতাড়ি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসন-

বড়লাট ভবনে নিযুক্ত সশস্ত্র পরিষদের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

ক্ষমতা এক বা একাধিক গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহাতে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন তাহার উপায় এক বিবৃতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা পরে দেওয়া হইল। কিন্তু সে সম্পর্কে দুই একটি বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

শান্তির, বাংলা ও আংশিকভাবে আসামের লোকের মনোভাব জানিয়া লইবার জন্য ঐ সকল প্রদেশের মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও বাকী অংশের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাই যে, সীমানির্দ্ধারণ কমিশনই উক্ত এলাকার জন্য চূড়ান্তভাবে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সামরিকভাবে

নির্দ্ধারিত এই সাম্প্রতিক সীমারেখা এবং চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত সীমারেখা একই হইবে না ইহা প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। শিখদের অবস্থা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই বীরজাতির জনসংখ্যা সমগ্র পাঞ্জাবের জনসংখ্যার প্রায় এক অষ্টমাংশ। কিন্তু তাহারা এমন ছড়াইয়া আছে যে, পাঞ্জাবকে যেমনভাবেই ভাগ করা হউক না কেন, সকল অংশেই কিছু না কিছু শিখ থাকিয়া যাইবেই। আমরা যাহারা অন্তরের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মঙ্গলই কামনা করি, তাহারা ইহা ভাবিয়া দুঃখিত যে শিখসম্প্রদায়ের নিজেদেরই অভীপ্সিত পাঞ্জাব বিভাগের ফলে তাঁহারা নিজেরাই অত্যধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা কত কম বা কত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন সীমানির্দ্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে। অবশ্য এই প্রতিনিধি কমিশনে শিখদের প্রতিনিধি থাকিবে। আলোচ্য পরিকল্পনার সবটাই একেবারে নিখুঁত নাও হইতে পারে, অন্যান্য সকল পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনার সাফল্যও ইহার পরিচালনার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে তাহা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত, ইহাই আমার মত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যদি সমগ্র ভারতের জন্য সর্ব্বসম্মত শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ যদি প্রদেশ বিভাগেরও সিদ্ধান্ত হয়। পক্ষান্তরে গণপরিষদগুলি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বেই যদি শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই নাই। এই সঙ্কটপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য আমি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি যে, আবশ্যক ব্যবস্থাদি করা হইয়া গেলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখনই এক বা একাধিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনশীল গবর্ণমেণ্টের হাতে বৃটিশ ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করিবেন। আশা করা যায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে। সুখের বিষয়,

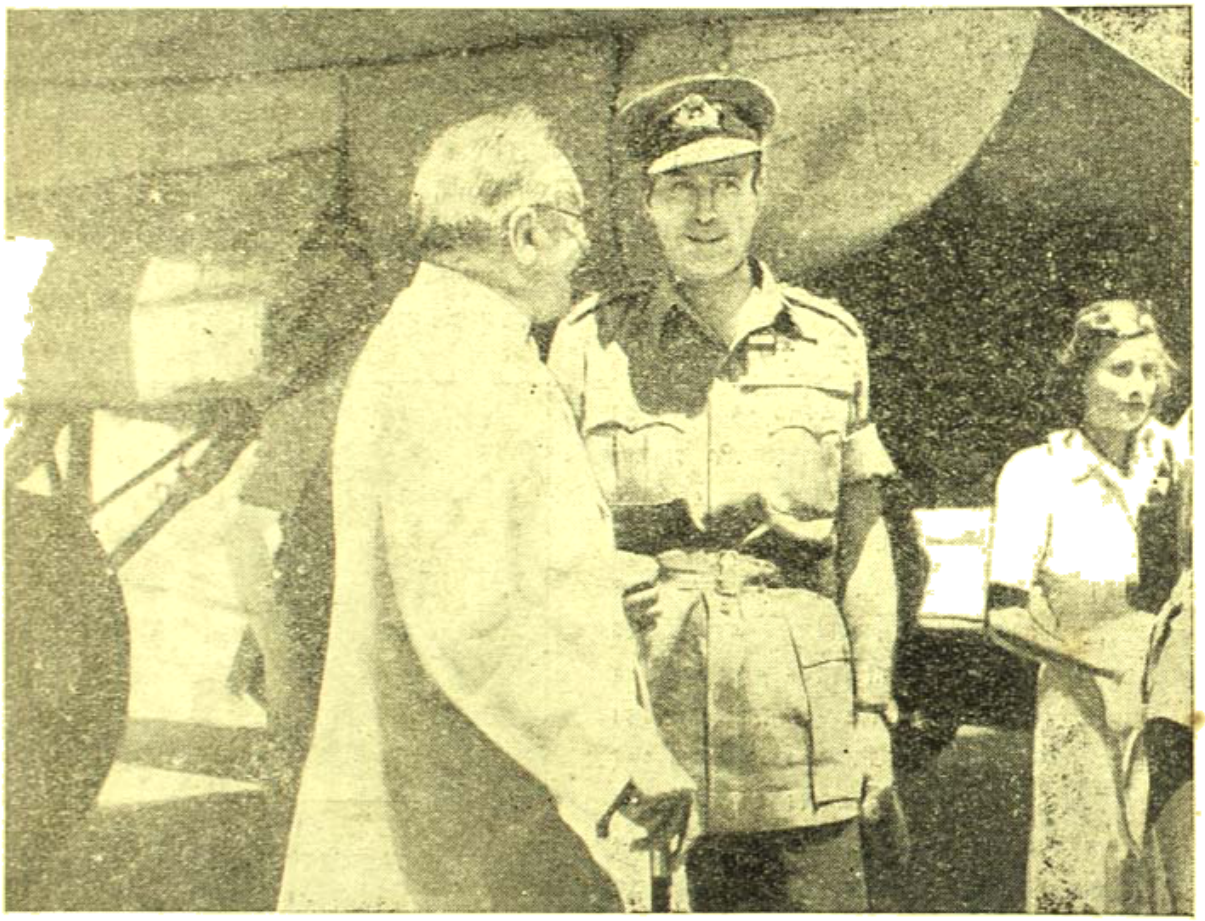

দেশোদ্ধারে ব্রতনাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন—পার্শ্বে তাঁর খান সাহেব

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করিবার জন্য এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইণ্ডিয়া অফিসের আর বিশেষ কিছু কাজ থাকিবে না। ভবিষ্যতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত কাজকর্ম্মের ভার কোন নূতন দপ্তরের উপর দেওয়া হইবে। সমগ্র ভারতের কিম্বা বিভক্ত হইলে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রস্তাবিত আইনে কোনপ্রকার বাধা বিঘ্নের

আরোপ করা হইবে না ইহা আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে চাই। আমাদের মধ্যে চরম আশাবাদীদের প্রত্যাশার চাইতেও অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবার পথ এখন পরিষ্কার হইয়াছে; অন্ত ভারতবাসীগণের উপরেই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার রহিল। ইহাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত বৃটিশ ভারতেই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বলিয়া আমি দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে কোন কিছু বলি নাই।

শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ শেষ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। গত কয়েকমাস যাবৎ যেভাবে বিশৃংখলা ও বে-আইনী ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে তাহা আর চলিতে দেওয়া ও দূরের কথা, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বা মনোযোগিতার প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হইবে না। আমরা কিরূপ বাক্-সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাওয়া কাহারও উচিত নয়। হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া ও চলিতে পারে না। এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত। ভারতবাসীদের সিদ্ধান্ত যে প্রকারই হউক না কেন, আমার স্থির বিশ্বাস, বৃটিশ অফিসারবিগকে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে বলিলে তাঁহারা এদেশে থাকিয়া ভারতবাসীদের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে তাঁহাদের যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। মহামান্য সম্রাট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমাকে ভারতীয়দের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইতে বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে। বর্তমান ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমি ভারতীয়দের মধ্যে আছি বলিয়া আমি গর্ব বোধ করি। ভারতবাসিগণ বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে এবং মিঃ গান্ধী ও জিন্নার মিলিত আবেদনের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় কার্যকরী করিয়া তুলুন—আমি এই কামনা করি।

পরিকল্পনা

(১। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ-ভারতের শাসনভার তুলিয়া দিবেন। ১৯৪৬ সনের ১৬ই মে মন্ত্রী (কেবিনেট) মিশন যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, ভারতীয় প্রধান

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিংএর আগমনে হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনতা ফটো—প্রীপান্না সেন

রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতায় তাহা কার্যকরী করা যাইবে এবং ভারতবর্ষের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র গঠন করা সম্ভবপর হইবে এরূপ আশা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। (২) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং দিল্লী, আজমীঢ়-মারুবার ও কুর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ ইতিমধ্যেই একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কার্যে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। অপরপক্ষে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং বৃটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধিসহ মুসলিম লীগ দল গণপরিষদে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৩। ভারতীয় জনসমষ্টির অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। ভারতীয় রাজনৈতিকদলসমূহ একমত হইতে পারিলে এই কাজ অনেক সহজ হইতে পারিত। ঐরূপ ঐক্যের অভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা যাহাতে জানা যাইতে পারে যে উপায় নির্দ্ধারণের ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপরেই পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। একথা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া রাখিতেছেন যে, ভারতবর্ষের চরম শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই; ভারতীয়েরা নিজেরাই তাহা করিবেন। এই পরিকল্পনায় এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা

আমেরিকায় ভারতীয়গণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত মিঃ আসফ আলি

ভারতকে অবিভক্ত রাখিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা দ্বারা ঐক্য স্থাপন এবং ভারতবর্ষকে অবিভক্ত রাখার পথও এই পরিকল্পনাতে খোলাই রাখা হইল। ৪। বর্ত্তমান গণপরিষদের কাজে-বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি প্রদেশ সম্পর্কে যখন বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে, তখন এই ঘোষণার পরে যে সকল প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি বর্ত্তমান গণ-পরিষদে ইতিমধ্যেই যোগদান করিয়াছেন সেই সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ-প্রতিনিধিরাও তাহাতে যোগ দিয়া উহার কাজে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিবেন। সেই সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত কোন শাসনতন্ত্র যেসব অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ঐ সকল অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের শাসনতন্ত্র (ক) বর্ত্তমান গণ-পরিষদ কর্তৃক রচনা করিবার পক্ষপাতী কিম্বা (খ) বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নূতন ও পৃথক একটি গণ-পরিষদের মারফতে তাঁহাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে চাহেন, তাহা নির্দ্ধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায় হইল নিম্নে বর্ণিত পন্থাটি,—এবিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। এই বিষয়টি স্থির হইয়া গেলে পরে কোন্ এক কিম্বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে তাহা স্থির করা সম্ভব হইবে। ৫। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনপরিষদকে (ইউরোপীয় সদস্যদের বাদ দিয়া) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিবেশন

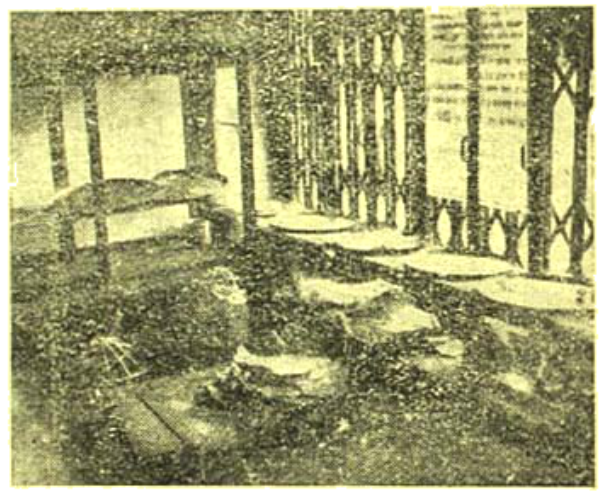

চিনির অভাবে কলিকাতার একটি বিশিষ্ট খাবারের দোকানের অবস্থা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

করিতে বলা হইবে;—এক অংশে থাকিবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিগণ, অন্য অংশে থাকিবে প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধিবৃন্দ। জেলার লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৪১ সনের আদমসুমারিকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইবে। (এই ঘোষণার পরিশিষ্টে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে)। ৬। প্রদেশ বিভক্ত হইবে কি না সে সম্বন্ধে, মতামত দিবার ক্ষমতা উক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের পৃথকভাবে মিলিত প্রতিনিধিদের দেওয়া হইবে। বিভক্ত ব্যবস্থা পরিষদের কোন একটি অংশ সাধারণ ভোটাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেই প্রদেশ বিভক্ত হইবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হইবে। ৭। পরিণামে যদি প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়, তবে ঐ অবিভক্ত প্রদেশ কোন্ গণ-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাদেশিক আইন-সভার মুসলমান-প্রধান ও অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের জানা দরকার।

সুতরাং উভয় আইন পরিষদের কোনও প্রতিনিধি যদি দাবী করেন, তাহা হইলে, ইয়োরোপীয় সদস্যগণ বাদে আইন সভার সমুদয় সদস্যকে লইয়া এক যুগ্ম অধিবেশন বসিবে এবং সেখানে ভোটের দ্বারা স্থির হইবে—প্রস্তাব অধিকতর গ্রাহ্যর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সমগ্র প্রদেশটি কোন্ গণ-পরিষদে যোগদান করিবে। ৮। প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে প্রদেশের নিম্ন নিম্ন অংশের প্রতিনিধিগণ স্থির করিবেন, উপরে লিখিত ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) ও (খ) এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। ৯। প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে, সিদ্ধান্ত করার সুবিধার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন সভার সদস্যগণ মুসলমান-প্রধান (পরিশিষ্টে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে) ও অবশিষ্ট গায়ে গায়ে সংযুক্ত অঞ্চলগুলি অন্য অংশে পড়ে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে, বিবেচনা করিতেও কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইবে। বাংলার সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কেও সীমানির্দ্ধারক কমিশনকে অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে। কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যে প্রযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্প্রতি যে রূপ (পরিশিষ্টে উল্লিখিত) সৈন্যদলিক সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই মানিয়া চলা হইবে। ১০। বিভক্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ (ইয়োরোপীয় সদস্যগণ বাদে) এক বিশেষ বৈঠক করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের (ক) ও (খ) বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ১১। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র ধরণের। এই প্রদেশের নির্ব্বাচিত

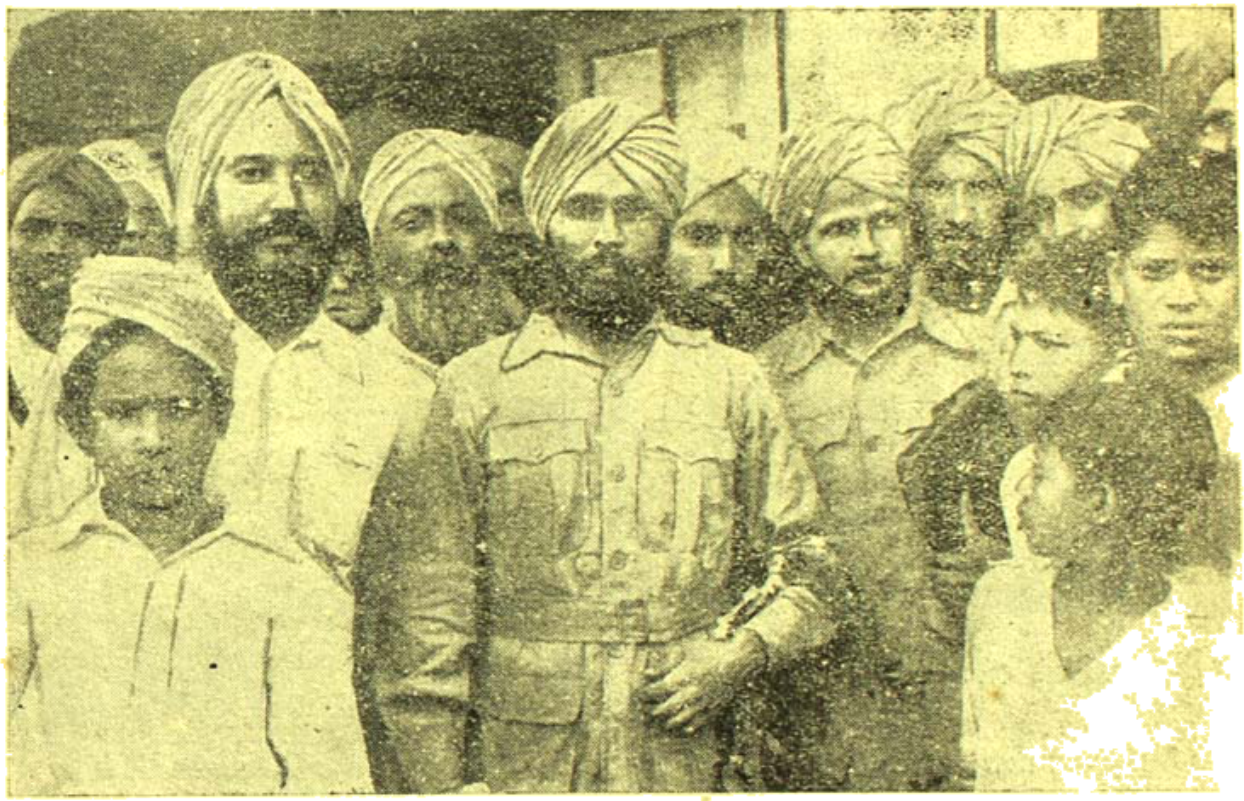

কলিকাতায় জেনারেল মোহন সিং—'আই এন এ'র প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ফটো—ইণ্ডিয়া নেস

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে আইন সভায় বসিবেন। ইহা প্রাদেশিক ব্যবস্থা এবং নিছক সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। উভয় প্রদেশকে পাকাপাকি বিভাগ করিতে গেলে সৈন্যদলিক সীমা নির্দ্ধারণের কালে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রয়োজন হইবে। প্রদেশ দুইটির যে কোন একটি বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই যাননীয় বড়লাট একটি সীমা নির্দ্ধারক কমিশন বসাইবেন। এই কমিশনের বিচার্য্য বিষয়গুলি এবং সমস্ত নির্ব্বাচন প্রবৃত্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে। এই কমিশনকে পাঞ্জাবের দুইটি অংশের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে যে সকল অঞ্চল জনসংখ্যায় মুসলমানপ্রধান ও গায়ে গায়ে আছে সেগুলি এক অংশে এবং অমুসলমান প্রধান ও তিন জন প্রতিনিধির মধ্যে দুই জনই বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, সমগ্র পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের কোনও অংশ যদি বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে আর একবার পুনর্ব্বিবেচনার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী অর্থাৎ পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের অংশ বিশেষ বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগ না দিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্ত্তমান আইন সভার নির্ব্বাচনে ভোটদাতাদের মতামত জানিবার ব্যবস্থা করা

হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে এই গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। ১২। বর্ত্তমান গণ-পরিষদে বৃটীশ বেলুচিস্থানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি একজন থাকিলেও তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশকেও তাহার অবস্থা পুনর্ব্বিবেচনার এবং পূর্ব্বোল্লিখিত এক অনুচ্ছেদের বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইবে। কী উপায়ে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বড়লাট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ১৩। আসাম বহুলরূপে অমুসলমানপ্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার অন্তর্গত বাংলাদেশের সংলগ্ন শ্রীহট্ট জেলাটিতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে শ্রীহট্টকে বাংলার মুসলিম অংশের সহিত যুক্ত করিতে হইবে বলিয়া দাবী উঠিয়াছে। সুতরাং বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে শ্রীহট্ট জেলাটি আসামের সহিতই থাকিয়া যাইবে অথবা নব-গঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশের সহিতসংযুক্ত হইবে

উত্তর কলিকাতায় একটি অঞ্চলে প্রতিশোধে থানাতল্লাসীরত সৈন্যদল

ফটো—শ্রীপান্না সেন

এ বিষয়ে শ্রীহট্টের জনসাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে ইহা করা হইবে। জনমত যদি শ্রীহট্টকে পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশের সহিত যুক্ত করার অনুকূল দেখা যায় তাহা হইলে পাঞ্জাব ও বাংলার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত কমিশনের ন্যায় শ্রীহট্ট জেলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও উহার সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য অঞ্চলগুলির সীমা নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তাহার পরে ঐ অঞ্চলগুলিকে আসামপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইবে। সকল অবস্থাতেই আসামের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমানে গণ-পরিষদের কাজে যেরূপ যোগ দিতেছেন সেরূপই যোগ দিতে থাকিবেন। ১৪। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থাই যদি সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমিশনের ১৬ই মে (১৯৪৬) পরিকল্পনার নীতি অনুযায়ী বিভক্ত অংশের জনসংখ্যার প্রতি দশ লক্ষের জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি পুনরায় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সেখানেও অনুরূপভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এলাকা হিসাবে নিম্নলিখিত হারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে :—

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
শ্রীহট্ট জেলা	১	২	—	৩
পশ্চিম বঙ্গ	১৫	৫	—	২০
পূর্ব্ব-বঙ্গ	১২	২৯	—	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	৩	৪	২	১২

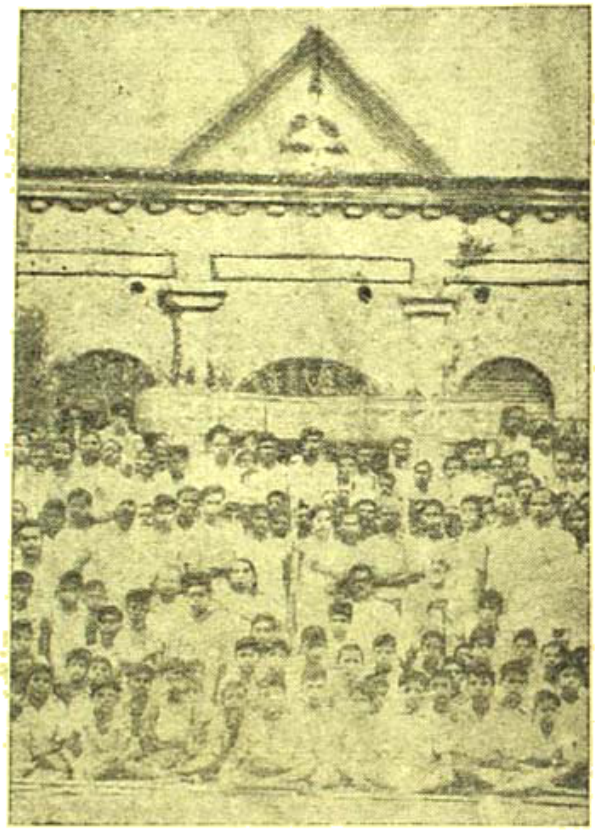

বাঁশরা হিন্দু-মিলন-মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো—পি-বালাস

১৫। বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিগণ প্রাপ্ত নির্দ্দেশ অনুসারে হয় বর্ত্তমানের গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন অথবা পৃথকভাবে নূতন গণ-পরিষদ গঠন করিবেন। ১৬। বিভক্তকরণ স্থির হইলে যথাসম্ভব সত্বর বিভক্ত অংশগুলির শাসন পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু করা দরকার হইবে :—(ক) দেশরক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত অন্যান্য বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ; (খ) ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষ ও বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের

মধ্যে ; (খ) যে প্রদেশগুলি বিভক্ত হইবে সেগুলির বেলায় প্রাদেশিক কর্তৃত্বাধীন বিষয়গুলি যথা বেনা-পাওনার অংশ বিভাগ, পুলিশ, হাইকোর্ট, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৭। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পর্কে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী যথাযোগ্য শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৮। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছেন যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি শুধু বৃটিশ ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে ১৯৪৬ সনের ১২ই মে তারিখের মন্ত্রীমিশনের স্মারক-লিপিতে যে রীতি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। ১৯। যাহাতে পরবর্তী শাসন কর্তৃপক্ষেরা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আগামী ১৯৪৮ সনের জুন মাসে অথবা সম্ভব হইলে তাহার আরও পূর্বেই ভারতবর্ষে এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া দিতে ইচ্ছুক আছেন। তদনুযায়ী যথাসম্ভব সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্বাপেক্ষা দ্রুত এবং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কার্যকরী উপায় হিসাবে তাঁহারা এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে (এই ঘোষণার পর ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ স্থির করিবেন) উপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চলতি বৎসরেই আইন রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের কোন অংশ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রহিবে কিনা তাহা স্থির করিবার যে অধিকার সেই অংশের গণ-পরিষদের আছে এই আইনের দ্বারা তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না। ২১। উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্য অন্যান্য

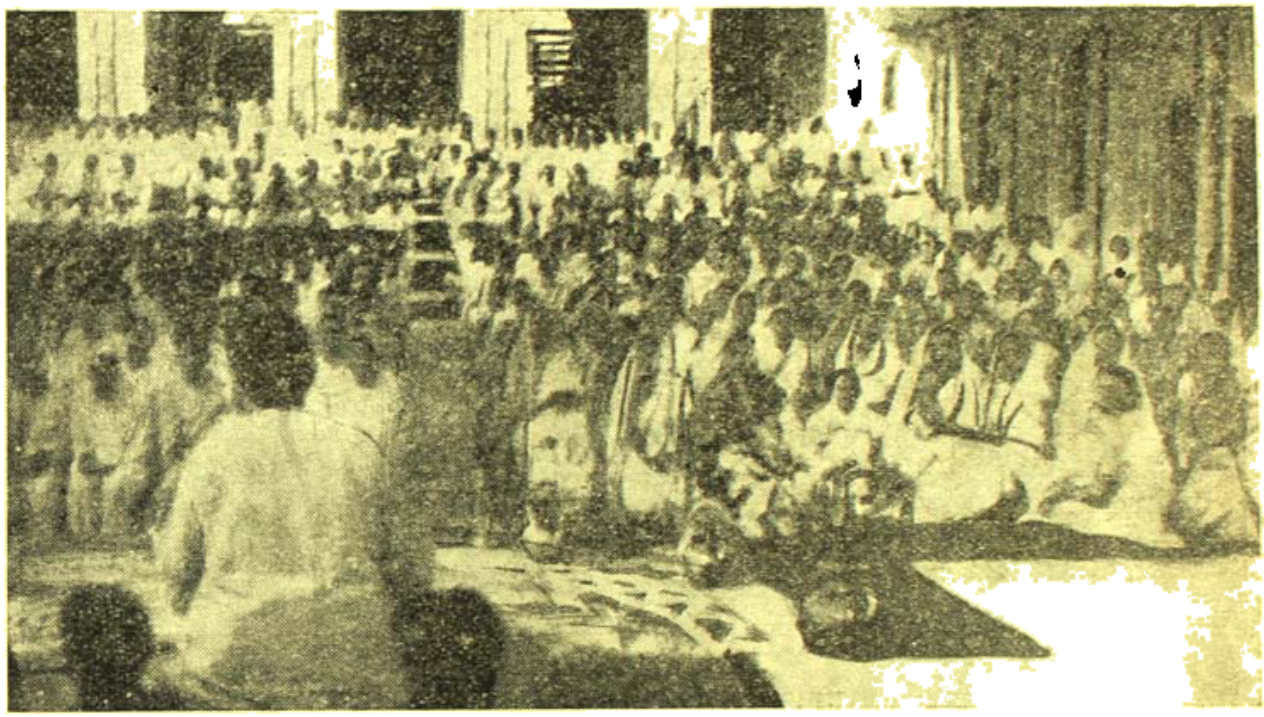

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কলিকাতাবাসীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফটো—শ্রীপান্না সেন

যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন, সেজন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাসম্ভব সত্বর কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এই পরিকল্পনার মূলসূত্রের ব্যত্যয় না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ বা উহাদের বিভক্ত অংশগুলি যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে এই পরিকল্পনার কাজ সুরু করিতে পারিবে। বর্তমান গণ-পরিষদ এবং নূতন গণ-পরিষদ (যদি গঠিত হয়) ও নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন। নিজেদের জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়নের অধিকারও তাঁহাদের থাকিবে। ২০। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অবিলম্বে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানাইয়াছেন। এই দাবীর প্রতি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহারা বিষয় সম্পর্কে বড়লাট প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিবেন।

পরিশিষ্ট

১৯৪১ সনের আদমসুমারী অনুসারে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির নাম :—

পাঞ্জাব—লাহোর বিভাগ :—গুজরাণওয়ালা, গুরদাসপুর, লাহোর, শেখপুরা ও শিয়ালকোট।

রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ—এটক, গুজরাট ও জেলাম, মিয়ানওয়ালি, রাওয়ালপিণ্ডি, ও সাহপুর।

- মুলতান বিভাগ—ডেরাগাজিখান, ঝাং, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, মুলতান ও মজঃফরগড়।

বাংলা—চট্টগ্রাম বিভাগ :—চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

- ঢাকা বিভাগ—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ।
- প্রেসিডেন্সি বিভাগ—যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া।
- রাজসাহী বিভাগ—বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী ও রংপুর।

পরিবর্ত্তে আমাদের পাথর দেওয়া হইয়াছে। আমরা যে পাকিস্থান চাহিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই।" এখন বড়লাট প্রদত্ত এই 'সোনার পাথরবাটী' লইয়া দেশবাসী ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।'

বাঙ্গালা বিভাগ সুনিশ্চিত—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদকে বড়লাটের ঘোষণা মত দুই

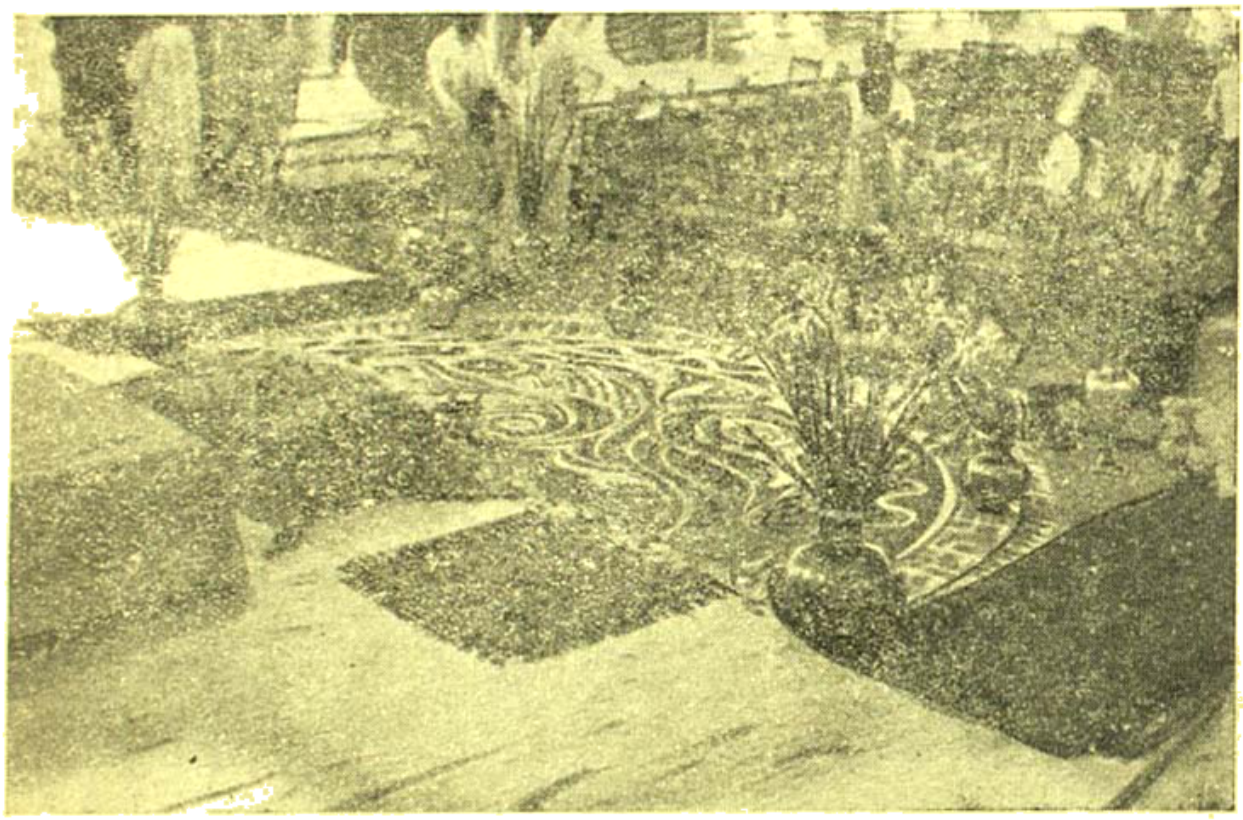

রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বকবির জন্মস্থানের বিশেষ সজ্জা ফটো—শ্রীপরাণবেন

বড়লাটের ঘোষণা ও নেতৃবৃন্দ—

নূতন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বড়লাটের ঘোষণায় দেশবাসী কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তবে সকলেই 'যন্ত্রের তাল' হিসাবে এই ঘোষণা মানিয়া লইয়া কাজ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত কে-এন-যোগলেকার বলিয়াছেন—"নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসীকে আরও বহুদিন সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত হইয়া থাকিতে হইবে।" আর বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন বলিয়াছেন—"আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার ভাগে বিভক্ত করিলে পশ্চিম বাঙ্গালার যে অংশ হইবে তাহার সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। কাজেই বাঙ্গালা বিভাগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবে।

হিন্দু সদস্য—সাধারণ—	৪২
জমীদার (প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ)—	২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—	১
শ্রমিক (মাজ্জিলিং চা-বাগান ও রেল শ্রমিক প্রতিনিধি (কম্যুনিষ্ট)	
ব্যতীত—	৬
বণিক—	৪
মহিলা—	১
মোট—	৫৬

ভারতীয় খৃষ্টান—	১
এংলো-ইণ্ডিয়ান—	৪
মুসলমান সমস্ত—সাধারণ—	১৮
শ্রমিক—	২
(নৌ-শ্রমিক ও হুগলী-শ্রমিক)	
ব্যবসায়ী—	১
মহিলা—	১
মোট—	২২

শ্রীযুক্ত ভি-ভি-গিরি—

শ্রীযুত এম-এস-আনে সিংহলে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত ভি-ভি-গিরি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত গিরি খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও বহু বৎসর শ্রমিক আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন।

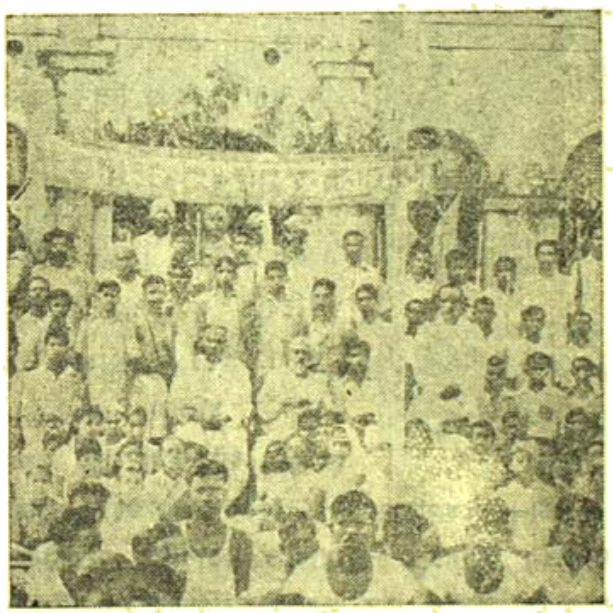

ভারত সেবাশ্রম-সংঘ-পরিচালিত ধাকুড়া হিন্দু মিলন মন্দিরে রক্ষিদল পরিবৃত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফটো—পি-বাসাদ

বর্দ্ধমান জেলা সম্মিলন—

গত ১৭ই ও ১৮ই মে বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যপুরে গণ-পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান জেলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ নন্দী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুত বাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা জেলা ভাণ্ডারের জন্য ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের জন্য সম্মেলনে আবেদন করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার দুরবস্থা—

ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে কোথাও কাপড় পাওয়া যায় না। চাউলের দাম ভীষণ রকম বাড়িয়া গিয়াছে—অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও দুর্লভ হইয়াছে। তাহার ফলে গত ৬ মাসে ঢাকার গ্রামাঞ্চল হইতে অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক বাঙ্গালার অন্যান্য জেলায় বা বাঙ্গালার বাহিরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে শুধু বাসগৃহগুলি জনশূন্য হয় নাই—চাষের কাজও কমিয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ ও সদরের গ্রামে চাউলের মণ কমপক্ষে ২৫ টাকা। কোথাও বা ৩০ টাকা। চিনি ও আটা ৬ মাস যাবৎ কোথাও পাওয়া যায় না।

ঢাকা "সোনার বাংলার" সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

ফটো—কে-ভদ্র

চোরাবাজারের সন্ধান—

গত ৩রা জুন মঙ্গলবার নয়া দিল্লীতে প্রার্থনাস্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতে চোরাবাজারের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"ভারতের কয়েকজন ব্যবসায়ী শুধু চোরাবাজারের কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, আসল চোরাকারবারীদের সন্ধান আজ সরকারী অফিসেও

পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট সভাই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা আজ দুর্নীতিপরায়ণ, তাহারা ইউরোপীয় অথবা ভারতীয়, হিন্দু অথবা মুসলমান হউক না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যদি সরকারী অফিসে এরূপ দুর্নীতি ও ঘুষের কারবার চলিতে থাকে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ সত্যই সন্দেহজনক। দেশবাসী যদি এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য না করে, তবে রাজাজী বা রাজেন্দ্রবাবুর পক্ষে এই দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে না।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলের প্রাঙ্গণে নববর্ষ উৎসবে বালিকাদের পারেড ফটো—জে-কে-সান্যাল

সে জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে সকলের সকল শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছে।" চোরাবাজারে কারবার করিয়া ও তাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য দান করিয়া ভারত আজ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গান্ধীজির কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে কি না, কে জানে?

শরৎচন্দ্র স্মৃতি ব্যবস্থা—

স্বর্গত অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষা কমিটী' হইতে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর বাঙ্গালা বক্তৃতা এবং পুরস্কার ও পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যিনি বক্তা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে অন্তত ৩টি বক্তৃতা দিতে হইবে ও তজ্জন্য ৫ শত টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে এক হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হইবে। এত দিন পরে যে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হইল, ইহাই আনন্দের কথা।

ডাক্তার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৩শে মে শ্রীযুত মাখনলাল সেনকে সঙ্গে লইয়া সকালে বিমানযোগে ঢাকায় গমন করেন। তিনি সারাদিন তথায় নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণের সহিত বঙ্গ-ভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনার পর সন্ধ্যায় বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। জগন্নাথ হলে এক জনসভাতেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

খুলনা সম্মেলন—

বাঙ্গালার বিভাগ দাবী করিবার জন্য গত ২৭শে মে খুলনা সহরে নীলা হলে এক জেলা সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় জেনারেল মোহন সিং—

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিং গত ২২শে মে প্রথম কলিকাতায় আগমন করায় তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনিই বিদেশে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং মুক্তিলাভের পর এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

কলিকাতায় মহিলা সম্মেলন—

গত ১১ই মে রবিবার উত্তর কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে এক মহিলা সম্মিলনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত

কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আশ্রোপনের মহিলা সভায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার

ফটো—কে-কে-সান্যাল

হইয়াছে। মহিলাকর্মী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থ যুবকমিগকে বদ্ধ পরিকর হইতে আহ্বান করিয়া তথায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির কাশ্মীর ভ্রমণ—

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী কাশ্মীর রাজ্যে ভ্রমণের পর ২৭শে মে তারিখে লাহোরে ফিরিয়া জানাইয়াছেন—শীঘ্রই রাজনীতিক বন্দীরা (কাশ্মীরে) মুক্তি লাভ করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের সহিত জাতীয় দলের আপোষ হইবে। রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরে মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া সকল রাজনীতিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ১০ দিন কাশ্মীর রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া, বাকুলিয়ার সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন তোরণ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য বাড়ায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হিমাদ্রি সেনের ভাষণের পর শ্রীযুক্ত রামপদ চৌধুরী সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাপদ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী বক্সী প্রমুখ অনেকে আলোচনা করেন। মানভূম, মধুতটীতে আগামী বৎসর সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। টাটানগর, আসানসোল, ধানবাদ, পুরুলিয়া, রাঁচি, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁশপুর, কুলটি, ঝরিয়া, হাজারিবাগ, রাণীগঞ্জ, সীতারামপুর, গিরিডি, মধুপুর ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

আটার সহিত তেঁতুল বীচির গুঁড়া—

গত ২৮শে মে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাশ প্রকাশ করেন যে,

শ্রীভবেশ দাশ

সহরে আটা কম সরবরাহের ফলে আটার সহিত তেঁতুল বীচির গুঁড়া মিশাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। তিনি একটি কারখানায় তেঁতুল বীচি গুঁড়াইতে দেখিয়া আসিয়াছেন।

যে সকল কারখানা ঐ কাজ করে বা যে দোকান উহা বিক্রয় করে, তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য দেশে কি শাসক নাই। দেশ কি আজ অরাজক হইয়াছে?

নূতন মেয়রের কার্য্যদক্ষতা—

কলিকাতা সহরকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত আলোচনায়

শ্রীসুধীরকুমার রায়চৌধুরী

পর অবিলম্বে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট পরে কর্পোরেশনকে আরও ৩ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। কর্পোরেশনকে এইভাবে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দাঙ্গার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে ১০০ সশস্ত্র প্রহরীও দিয়াছেন। নূতন মেয়র সুধীরবাবু এই কর্ম্মতৎপরতার জন্য সহরবাসীর ধন্যবাদভাজন হইবেন।

কলিকাতায় পাইকারী জরিমানা—

গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতায় যে দাঙ্গা চলিতেছে, সে জন্য গত ২০শে মে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সরকার বড়বাজার, বড়তলা, জোড়াসাঁকো ও আমহার্ট ষ্ট্রীট থানার অধিবাসীদের উপর মোট ৬১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এই জরিমানা ও ক্ষতিগ্রস্ত সাব্যস্ত আইন জারি করিয়াও দাঙ্গা বন্ধ করা যায় নাই। উপরের ৪টি থানার লোক ছাড়া অন্য কোন থানার লোক কি দাঙ্গায় যোগদান করেন নাই?

সাহিত্য বাসরে সম্বর্দ্ধনা—

সম্প্রতি কলিকাতা চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এ হলে সাহিত্য বাসরের এক সভায় বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদক

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন ও নবদ্বীপনিবাসী সাহিত্যিক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত অনরঞ্জন রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অনরঞ্জন রায়

দুর্গামোহনবাবু প্রায় ৫০ বৎসর কাল বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অমরঘনবাবু সাহিত্য সাধনা ছাড়াও ৩০ বৎসরের অধিক কাল নবদ্বীপের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দের অভিমত—

বড়লাট দিল্লীতে ফিরিয়া নিম্নলিখিত ৭ জন নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা স্থির করিতেছেন—কংগ্রেসের পক্ষে—রাষ্ট্রপতি কৃপালনী, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার পেটেল। লীগের পক্ষে—মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ ও মিঃ আবদুর রব নিস্তার। শিখ পক্ষে সর্দ্দার বলদেব সিং। ৩রা জুন বড়লাটের ঘোষণার পরই রেডিও সাহায্যে মিঃ জিন্না, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার বলদেব সিংকে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী বড়লাটের ঘোষণায় সম্মতি প্রকাশ করেন। মিঃ জিন্না মুসলেম লীগ কাউন্সিলের নির্দ্দেশ সাপেক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

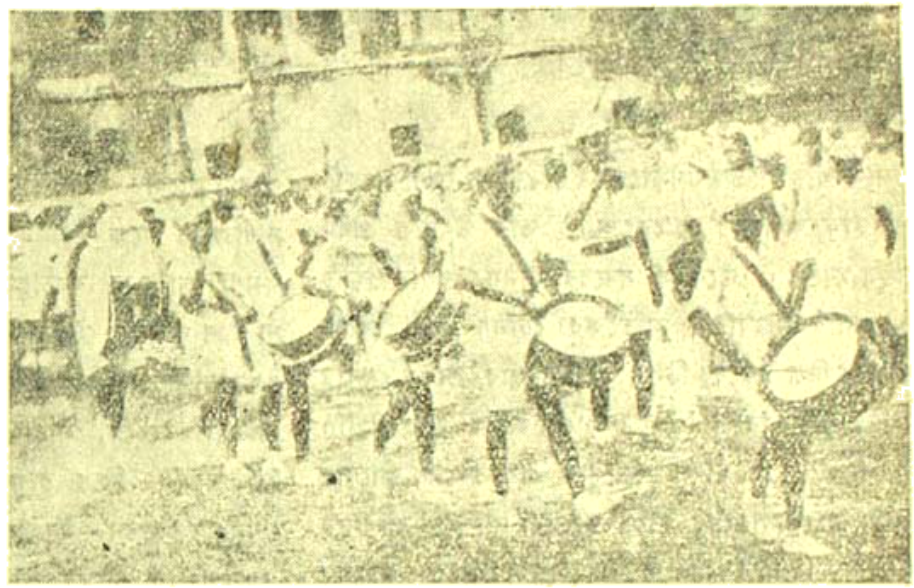

নববর্ষ উৎসবে ওরিয়েনট্যাল সেমিনারী স্কুল প্রাঙ্গণে যাত্রা পার্টি বালকবালিকাদের প্যারেড ও ড্রিল

ফটো—কে-কে-দাস্যাল

কলিকাতার হাঙ্গামা—

গত ২১শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতা সহরে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও গোপনভাবে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজিও একেবারে শান্ত হয় নাই। গত ৩১শে মে শনিবার উহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সহরে একদিনে কয়েকশত লোক হতাহত হয়। তাহার পর ২রা জুন হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় সর্ব্বত্র বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হাঙ্গামার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। হাঙ্গামার ফলে সহরের ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ, ফলে সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। রেশনের দোকানে প্রায়ই আটা ও চিনি পাওয়া যায় না—বাজারে তরকারী বা মাছ আসে না—যাহা আসে তাহারও মূল্য অত্যন্ত অধিক। দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ। ইহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

কাশ্মীরে হতাহতের সংখ্যা—

গত ২১শে মে ভারতসচিব লর্ড লিটোয়েল বিলাতে ভারতের হাঙ্গামায় হতাহতের নিম্নরূপ হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ১৮ই নভেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে পর্য্যন্ত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রদেশ	হত	আহত
মাদ্রাজ	৩	১৩
বোম্বাই	৩২১	১১১১
বাঙ্গালা	১৮৬	৯৬৫
যুক্তপ্রদেশ	১৭	৪৩
পাঞ্জাব	৩০২৪	১২০০
বিহার	৭	৩৫
মধ্যপ্রদেশ	২	১২
আসাম	১৪	৩
সীমান্ত প্রদেশ	৪১৪	১৫০
দিল্লী	২৯	৬৯
মোট	৪০১৪	৩৬১৬

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺হুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেনিস ঃ

আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে যে টেনিস খেলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে তার উৎপত্তি প্রথম হয়েছিল ফ্রান্সে। তবে সে সময়ের টেনিস খেলার পদ্ধতি এবং খেলার নিয়মাবলী আজকের টেনিস খেলা থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের ছিল। সে সময়ের টেনিস খেলার নাম ছিল 'লে পাম' (Le Paume) অর্থাৎ the Palm (the hand)। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের উৎসাহী খেলোয়াড়দের হাতে দাস্তানা লাগিয়ে বল নিয়ে এই 'the Palm' খেলতে প্রথম দেখা যায়। তারপর দাস্তানা বাদ দিয়ে খুন্তির আকারে কাঠের ব্যাট এবং পরবর্তীকালে টেনিস র‍্যাকেটের প্রচলন হয়েছে। ঘরের দেওয়াল ব্যবহার করা হ'ত বলে এই 'লে পাম' খেলা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই খেলাকে ঘরের বাইরে চালানোর চেষ্টা চলে। উন্মুক্ত জায়গায় দেওয়াল তুলে প্রথম প্রথম খেলা চলতে থাকে ; কিন্তু এই ভাবে দেওয়াল তুলে যখন খেলা সম্ভবপর হ'ল না তখন নেটের প্রচলন হ'ল। ১৩ শতাব্দীতে টেনিস খেলাকে পুরোপুরি 'indoor game' হিসাবেই গ্রহণ করা হ'ল। ফলে ফাঁকা জায়গায় টেনিস খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল। ফ্রান্সের রাজা ঘরের মধ্যে 'কোর্ট' তৈরী ক'রে টেনিসকে 'ঘরোয়া খেলা' হিসাবে মর্য্যাদা দিলেন। পরবর্তীকালে ঐ খেলাই বর্ত্তমানের 'কোর্ট টেনিসে' রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্সে তখন এই খেলাকে বলা হ'ত 'Royal Tenez'। ইংরেজরা ১৩৬৫ সালে ফ্রান্সের এই 'Royal Tenez' খেলা ইংলণ্ডে প্রচলন করে এবং এই টেনিস নাম ইংরেজদেরই দেওয়া। ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত এই 'কোর্ট টেনিস' ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। ১৪ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে বহুদিন পর্য্যন্ত টেনিস খেলা ফ্রান্সের রাজন্যবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, জনসাধারণের পক্ষে টেনিস খেলা তখন আইনবিরুদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ আইনের কঠোরতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ খুশিমত টেনিস খেলতে পায়। ফলে দেখা গেল, ১৬ শতাব্দীতে এক প্যারিসেই ২০০০ 'ইন-ডোর টেনিসক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সারা ফ্রান্সের ক্লাব সংখ্যা তখন ২,৫০০ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রাজপরিবার যেমন জাঁকজমক দেখিয়ে টেনিস খেলতেন—জনসাধারণের খেলায় তা সম্ভব ছিল না এবং দর্শকেরা তাদের খেলায় সেই পরিমাণ উৎসাহ পেত না। পনের এবং ষোল শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহু খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়ের জন্ম হ'ল, যার ফলে ইংলণ্ডে একাধিক আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। কেবলমাত্র 'সখের' টেনিস খেলোয়াড়দেরই ঐ সব প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া হ'ত। সতের শতাব্দীতে দেখতে দেখতে অনেক সখের খেলোয়াড় 'পেশাদার' খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হ'লেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের যুবশক্তি টেনিস খেলায় ঝুঁকে পড়ল। জনসাধারণ শারীরিক দক্ষতা এবং আমোদ-প্রমোদ হিসাবে ব্যাপক ভাবে টেনিস খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে। এদিকে টেনিসের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে একদল জুয়াড়ী টেনিস খেলাকে লাভজনক ব্যবসায়ে খাটাতে আরম্ভ ক'রে দেয়। ভাল ভাল টেনিস খেলোয়াড়রা মোটা দামে বিক্রী হ'য়ে হাত পাল্টে যেতে থাকেন। দেশে অসৎ ব্যবসায়ীর দল ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে শেষে দেখা গেল, টেনিস খেলা তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের টেনিস খেলাকে জনসাধারণের নির্দ্দোষ আমোদের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব হ'ল। দেশের

রাজপরিবার, সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় টেনিস খেলা একেবারে বর্জ্জন করলেন। খেলায় তাঁদের আগ্রহ আর রইল না। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল ইংলণ্ডে জনসাধারণের আর কোন টেনিস কোর্ট নেই, প্যারিসের দু'চারটিতে তখন টেনিস খেলা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বড় বড় রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ টেনিস কোর্টগুলি ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে টেনিস খেলা যে একদিন জনসাধারণের জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার সমস্ত নিদর্শনই যেন নিশ্চিহ্ন হ'তে লাগলো।

এরপর ১৮৭৩ সালের কথা। বৃটিশ সৈন্যবিভাগীয় কর্ত্তা মেজর ওয়াল্টার সি উইংফিল্ড একদিন বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করলেন, গ্রীস থেকে তিনি Sphairistike নামে এক অভিনব আমোদ-উদ্দীপক খেলা শিখে এসেছেন এবং এই খেলা তিনি 'পেটেণ্টের' জন্য আবেদন করতে মনস্থ করেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর বন্ধুরা ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বাড়িতে সমবেত হ'ন এবং তাঁদের মেজর ওয়াল্টার গ্রীসের Sphairistike অর্থাৎ বল খেলার ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখিয়ে প্রশংসা লাভ করেন। এই খেলাই শীঘ্র tenis-on-the laon নামে দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হ'ল এবং পরবর্ত্তীকালে 'Lawn Tennis' নামে আখ্যা লাভ করেছে। ১৮৭৩ সালে টেনিসের মূল কোর্ট লম্বায় ৬০ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে 'Base line পর্য্যন্ত ৩০ ফিট ছিল। মাঝখানের জায়গার মাপ ছিল ২১ ফিট। নেট লম্বায় ৭ ফিট, নেটের মাঝখান ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি। নেট থেকে কোর্টের মাঝখানের একটি চিহ্নিত স্থান থেকে খেলোয়াড় বল সার্ভ করতো।

১৮৭৪ সালে মেজর উইংফিল্ড কোর্টের মাপ পরিবর্ত্তন করলেন—দৈর্ঘ্য হ'ল ৮৪ ফিট, প্রস্থ ৩৫ ফিট। নেটের মাঝখানের উচ্চতা কমে গিয়ে ৪ ফিট দাঁড়ালো। কয়েক বছর পর কোর্টের দৈর্ঘ্য ৩৯ ফিট করা হ'ল।

১৮৭৫ সালে মেরী লিবোন ক্রিকেট ক্লাব টেনিস খেলার নতুন নিয়মাবলী প্রস্তুত করে। এই নিয়মানুসারে কোর্টের দৈর্ঘ্য ৭৮ ফিট (আজও এই মাপে কোর্ট তৈরী হচ্ছে) এবং প্রস্থ ৩০ ফিট দাঁড়াল। পোষ্টের কাছে নেট ৪ ফিট এবং মাঝখানে ৪ ফিট করা হ'ল।

১৮৭৪ সালে টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে অগ্রবর্ত্তী হ'ল All-England Croquet Club. এই প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি টেনিস খেলার মাঠ তৈরী ক'রে রীতিমত টেনিস খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে দেয়।

১৮৭৭ সালে প্রথম টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিযোগিতার মাঠের প্রস্থ কমিয়ে ২৮ ফিট করা হয়, নেটের মাঝখানের উচ্চতা কমিয়ে ৩ ফিট ৩ ইঞ্চি রাখার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮২ সালে অল্-ইংলণ্ড ক্লাব দেশের টেনিস খেলা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং সর্ব্বত্র টেনিস খেলার মাঠের সীমানা ৭৮ × ২৮ ফিট, নেট পোষ্টের কাছে ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় এবং মাঠের মাঝখানে উচ্চতায় ৩ ফিটের জন্য সুপারিস করে। সেই থেকে আজও ঐ মাপে টেনিস খেলার সীমানা তৈরী হচ্ছে।

১৮৮৮ সাল লন্ টেনিস খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ বছর ইংলিস লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়।

এদিকে বেরমুদার জনৈক বৃটিশ অফিসার ছুটি উপলক্ষে যখন দেশে অবস্থান করছিলেন, ১৮৭৩ সালে মেজর উইংফিল্ড কর্ত্তৃক আহূত এক প্রীতিভোজ সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হ'ন। উক্ত অফিসার মেজর উইংফিল্ড কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'Sphairistike' খেলা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন এবং চাকরীতে পুনরায় যোগদানের সময় ১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে তিনি ঐ খেলার সরঞ্জাম বেরমুদায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে তার প্রচার করেন। ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আমেরিকান মহিলা মিস মেরী ইউইং আউটারব্রিজ বেরমুদায় (Bermuda) বেড়াতে গিয়ে ঐখানের অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁদের একান্ত আগ্রহে টেনিস খেলা শিক্ষার চেষ্টা করেন। মিস আউটারব্রিজ টেনিস খেলায় বিশেষ উৎসাহিত হয়ে পড়েন; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি একসেট টেনিস খেলার সরঞ্জাম অফিসারদের কাছ থেকে উপহার পান। আমেরিকার কাষ্টমস বিভাগ খেলার এই সরঞ্জামগুলি হস্তগত ক'রে এক সপ্তাহ আটক রাখে। কারণ আমেরিকায় তারা এই প্রথম টেনিস খেলার সরঞ্জাম হাতে পাবার সুযোগ পায়। দেরে বিনা দাশুলেই

আউটারব্রিজকে টেনিস খেলার সরঞ্জামগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়। মিস আউটারব্রিজের পরিবারবর্গ, ষ্টেটেন আইল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাবের সভ্যবৃন্দ যেসকল ক্লাব ক্রিকেট মাঠে একটি টেনিস খেলার মাঠ তৈরীর অনুমোদন লাভ করেন। মিস আউটারব্রিজ তাঁর এক বান্ধবীকে টেনিস খেলার নিয়মাবলী শিখিয়ে দিলেন। আউটারব্রিজের বাবা, তাঁর ভ্রাতা, আউটারব্রিজ এবং তাঁর বান্ধবী আমেরিকার মাটিতে প্রথম টেনিস খেলে আমেরিকায় টেনিস খেলার প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৭৪ সালে তাঁরা ২নং টেনিস কোর্ট তৈরী করলেন। ১৮৮০ সালের বহু পূর্ব্বেই চিকাগো এবং ফিলাডেলফিয়াতে টেনিস খেলার প্রচলন হয়েছিল। দেখতে দেখতে আমেরিকার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে টেনিস খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলো। ১৮৮১ সালে মিস আউটারব্রিজের ভাই মিঃ ই এইচ আউটারব্রিজ সমস্ত টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিউ ইয়র্কে সমবেত করেন। ১৮৮১ সালে ৩৩টি বিভিন্ন টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে খেলায় এক ধরণের আইন অনুসরণের সুপারিশ করেন এবং ঐ বছরেই একটি টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ঐ বছরেই ইউনাইটেড ষ্টেটস লন টেনিস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং সেই থেকেই আমেরিকার সখের টেনিস খেলা এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে।

টেনিস খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ যোগ্য যে, রোমের Lusio Pularis খেলার সঙ্গে প্রাচীন টেনিসের অনেক সাদৃশ্য ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক দাবী করেন। ৪৯০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারস্যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লম্বা ছড়ি মুখে জালের থলি নিয়ে এক রকম বল খেলা হ'ত বলে জানা গেছে। 'পোলো' খেলার প্রধান ঘাঁটি ছিল এই পারস্য এবং ঐ সময়ে প্রায় বার রকমের পোলো খেলা হ'ত। তার মধ্যে পূর্ব্বের বর্ণিত খেলা 'Salvajan' নামে পরিচিত ছিল। কড় বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে আর 'Salvajan' খেলা হ'ত না, তখন ঘোড়া বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে কোর্ট তৈরী করে খেলা হ'ত। এ খেলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'Chigan'। অনেকের মতে এ খেলাও অনেকটা টেনিসের মতনই ছিল, তবে অপরিণত অবস্থায়। তবে যে ফ্রান্স বর্ত্তমান টেনিসের জন্মভূমি সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ করার নেই।

টেনিস খেলায় রেকর্ড :

১৯৩৯ সালের ৭ই জানুয়ারী সানফ্রান্সিস্কোতে মিসেস হেলেন উইলস মুডী এবং ভূতপূর্ব্ব ডেভিস কাপ খেলোয়াড় হাওয়ার্ড কিনসে (বর্ত্তমানে পেশাদার খেলোয়াড়) টেনিস খেলায় একটি রেকর্ড ক'রেছিলেন। তাঁরা উভয়ে ৭৮ মিনিটকাল একটানা বল খেলেছিলেন—কোন রকম বলটি না 'ফল্ট'। ঐ সময়ে তাঁরা সর্ব্বসমেত ২,০০১ 'শট' মেরেছিলেন। তাঁরা এ রেকর্ড জানতেই পারেন নি; রেফারী তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই রেকর্ডের কথা উল্লেখ করলে উভয়কেই বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সমরেশ"—২৷৹

অধ্যাপক সরৎ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গণপরিষদ ও কংগ্রেস"—৹৲

শ্রীতরু বর্দ্ধন প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "বুলবুল্ বাবা"—২৷৹

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রণীত "আপদ আন্দোলন ও আমাদের শিক্ষা"—৵৹

"পঞ্চায়েত কি ও কেন ?"—৵৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

সুরের মোহ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রাবণ—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

এরই লাগি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

এরই লাগি এ তপস্যা করেছি কি যুগ যুগ ধরি ?
ফাঁসীমঞ্চে ঝুলিয়াছি, আন্দামানে রহি দ্বীপান্তরে
রাজদণ্ড হাসিমুখে অকাতরে লইয়াছি বরি'
হে জননী বঙ্গমাতা, দ্বিখণ্ডিতা দেখিতে কি তোরে ?…

ঘরেছে মায়ের অশ্রু, পিতারে করেছি সুখহারা,
স্নেহহীন গৃহহীন ঘুরিয়াছি ভয়রের বেশে,
বন্দিয়া জননী তোরে হাসিমুখে বরিয়াছি কারা
শুকায়নি রাজরক্তে তাজা খুন অহিংস এ দেশে।…

এরই লাগি চিরদিন কল্পনায় আঁকিয়াছি ছবি,
হাস্যময়ী শস্যভরা প্রীতিভরা দেশজননীর।
মলিন অবসাদতলে ছায়াঘন আম্রবনচ্ছায়ে
কাটাইতে যে বাসনা সে কি শুধু কল্পনা কবির ?…

ভালবাসি বঙ্গভাষা, ভালবাসি বঙ্গভাষাভাষী
ভালবাসি বাঙ্গালীরে সুখেদুঃখে উত্থানে পতনে।
ভালবাসি পল্লীছায়া হেমন্তের শস্যপূর্ণ ধরা,
বাঙ্গালী হয়েছি বলে শত গর্ব্ব আমি রাখি মনে।…

হে জননী বঙ্গমাতা, আপন আয়ত্তাধীনে আসি,
লভিবে যে স্বাধীনতা এই তার যথার্থ স্বরূপ ?
একি তার প্রতিকৃতি অথবা এ কঙ্কালের ছায়া
আমি যারে ভালবাসি শতছিন্ন এই তার রূপ।…

সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ ভালমন্দ যাহা হয় হবে,
তোমারে বিমাতা জানি কাটাইব বাকী দিনগুলি,
সে যেন না সত্য হয়, জ্যোতির্ম্ময়ী আপন গৌরবে
হও রাজ-রাজেশ্বরী। সত্য হোক্ কল্পনার তুলি।…

তুমি হও পরিপূর্ণা তোমার সন্তানদের মাঝে,
হোক্ তারা বহুধর্ম্মী, তবু তারা বাঙ্গালী বলিয়া—
যেন যেন পরিচয় সগৌরবে মনুষ্য সমাজে,
বাঙ্গালার পরিচয়ে ওঠে যেন হৃদয় দুলিয়া।

বাঙ্গালার ভূমি ব্যবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার জমি

একদিন ছিল যখন বাঙ্গালীর ধান গুড় মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান, নিজের জমি গরু পুকুরিণী ও বাগান হইতে সংগ্রহ হইত। আর গ্রামের শিল্পীরা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। মাঝে মাঝে মুসলমান বাদশাহ নবাবদিগের আনুকূল্যে এবং সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দেশ, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিত এবং সাধারণ লোককে বিব্রত করিয়া ফেলিত। এইরূপ বাঙ্গালী জীবনের পক্ষের ও বিপক্ষের অবস্থাগুলি আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকরা তৎকালীন বাঙ্গালী সংসারের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সুবিধার দিকে বেশী অঙ্গ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

ভূমি ও শিল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সমাজ চলিতেছিল, তাহা ইংরাজ আমলে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজ মুসলমান বাদশাহ নবাবদিগের মত কেবল দেশ শাসন করিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিবাসীদের ভূমিব্যবস্থার রাজশক্তির সহায়তায় অতি কদর্যরূপে প্রকাশ করিল। প্রথমে বাঙ্গালার মাল রপ্তানি করিয়া চালাইল, পরে বাঙ্গালায়, তথা ভারতবর্ষে, জমি লইয়া আবাদ করিয়া মূল উৎপাদন হইতে বিদেশী বাণিজ্যের সমস্ত ভার ও লাভ একচেটিয়া করিয়া রাখিল। তাহাদের সস্তা না হইয়া তাহারা যে সকল মাল ভারতবর্ষে আমদানি করিতে পারিত, এখানে উৎপন্ন মাল যাহাতে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিল। যেখানে তাহার শিল্পদ্রব্য স্থানীয় দ্রব্যাদির সহিত শুল্ক ও দরে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, সেখানে নির্যাতনে সেই দিক বন্ধ করিতে ইংরাজ দ্বিধা বা লজ্জিত কিছুই হয় নাই। ফলে লোকে জমির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করিতে বাধ্য হয় এবং জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িতে থাকে। যাহার দ্বারা রাজস্বদান, সংসার প্রতিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাকেই বাঙ্গালী মাত্রই, সেই জমিকে "মা" বলিয়া মনে করে এবং মায়ের কোল হইতে কাহাকেও কাড়িয়া রাখিতে চায়। পিতৃপিতামহের আমল হইতে সেই জিনিষ চাষ আরও বৃদ্ধি পায় এবং আবাদের এত টুকরা হইয়া পড়িতে, খাজনা ও মামলার যে অর্থ ব্যয় করে, তাহা দ্বারা নিজ গ্রামে সমান আবাদের পরিমাণ বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জমি ক্রয় করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে সে জিনিষ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। জমি আঁকড়াইয়া অনশনে থাকিবে, তথাপি আবাদ যাইতে দেয়ত হইবে না।

বাঙ্গালার ভূমি স্বত্ব

জমির উপর অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকিবার পক্ষে বাঙ্গালীর অন্য কারণ আছে। বাঙ্গালী, এমন কি সাধারণ প্রজা যে জমিতে বসবাস করিয়া জোতজমীকারত্বে একই জমিতে নিবদ্ধ থাকিয়াছে। সাধারণতঃ প্রজা বদল করা বা জমি হইতে উচ্ছেদ করা রীতি বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলন ছিল না। ইংরাজও স্থায়ীভাবে অধিবাসীদিগের জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী জমি ব্যবস্থার সময় যতদূর সম্ভব সে নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

পুরাতন কথা

পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই ইংরাজ বাঙ্গালা দেশের অংশ বিশেষে নবাব সরকারে জমিদার অথবা প্রজা হিসাবে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত গঠন করিয়াছে। ১৬৯৮ সালে মুসলমান অধিকৃত আইনে নির্দিষ্ট পাঁচসনা তদানীন্তন নবাব আজিম-উস্-সান-এর নিকট কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর তিনটী গ্রামের জমিদারী স্বত্ব গ্রহণ করে। তৎপূর্বে তাহারা সুতানুটীর নিকটবর্তী কয়েকটী গ্রামের অংশ প্রজা হিসাবে জমি পাইবার আশায় স্থানীয় জমিদারের নিকট আবেদন করে। কিন্তু "because they were a powerful people" ইংরাজরা শক্তিমান এবং পরে তাহাদের দেশীয় প্রজার স্থায় উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় বলিয়া জমিদার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইংরাজ নবাব সরকারে দরখাস্ত করিয়া সফল মনোরথ হয়। পাজসনার হার,—তিনি কলিকাতার জন্য ৬৬৮৵৯ পাই, সুতানুটীর ৫০১৸৩ পাই, পাইকান পরগণার গোবিন্দপুর ১২৩৸৩ পাই এবং কলিকাতা গোবিন্দপুর অংশ বাবদ ১০০।৵১১ পাই, একুনে বাৎসরিক ১১৯৪৸৩ পাই, ধার্য্য হয়।

বাঙ্গালার জমি স্বত্ব আইনের একটী বিষয় এই ব্যাপারেই সৃষ্টি হইয়া উঠে। মুসলমান বাদশাহদিগের আমল হইতেই বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি বিলি হইত এবং ইংরাজ সেই ব্যবস্থার সমর্থন হইয়া জমিদারী ইজারা দেয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাহারা নিজ প্রজাদের নিকট খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা—

"Received a peremptory Perwannah from the soubah (Governor) forbidding them; to which the Soubah told them that they were presuming to do a thing which they had no power to do; and if they persisted they would by the laws of the Empire forfeit their lands."

অর্থাৎ তাহারা নবাবের নিকট হইতে যে জরুরি পরোয়ানা পায় তাহাতে বুঝিতে পারে যে, তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের আইন বিরুদ্ধ কাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাহারা কর্তৃপক্ষ হইতে বেদখল হইবার ভীতি হইয়া পড়িতেছে।

তাহার পর ১৭৬৫ সালে ইংরাজ চব্বিশ পরগণার মধ্যে আরও

আটত্রিশটী গ্রামের ইজারা লইবার চেষ্টা করে। সম্রাট ফারোক্‌সিয়ার সম্মত হইলেও বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলি খাঁ দূরস্থ ইংরাজের আরও শক্তি বৃদ্ধি করিতে অসম্মত হন। পরে ১৭১৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট এই সম্মতি লাভ করে। রাজনৈতিক গোলমালের মধ্যে তাহারা নিজের স্বার্থ একটু ভুলে নাই। পাছে পরে আপত্তি হয়, সেই কারণে ১৭৪৭ সালের ৩রা জুন তাহারা সিরাজদ্দৌলার নিকট আবার সেই দলিল পাকা করিয়া লয়। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজ কায়েম করে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই জমিদারীর জন্য বাৎসরিক ২,৪২,৯৪৮৲ খাজনা নির্দ্ধারিত হয়। ১৭৯৯ সালে ১৩ই জুলাই চব্বিশ পরগণার জমিদারী ক্লাইভকে জায়গীর হিসাবে দান করা হয়। তাহার পর ১৭৬৫ সালের ২৭শে জুন আরও দশ বৎসরের জন্য এই জায়গীরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং আরও স্থির হয়, এই মেয়াদ অন্তে সমস্ত সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসিবে এবং মোগল রাজসরকারে আর কোনও খাজনা দিতে হইবে না।

বাঙ্গালার মসনদ লইয়া যে গোলমাল চলিতে থাকে, ইংরাজ তাহার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে। মীর কাসিমকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে তাহারা ১৭৬০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিনা খাজনায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করে এবং মিরজাফর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৭৬৩ সালের ৬ই জুলাই ইংরাজ তাঁহার নিকট ঐ পরগণা কায়েম করিয়া লয়। তাহাতেও নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট দ্বিতীয় বাদশাহের সম্মতি সংগ্রহ করে।

১৭৬৫ সালে বাদশাহ সাহ আলমের নিকট লর্ড ক্লাইভ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ইংরাজের নিকট নিয়মিত টাকা পাইবার আশায় বাদশাহ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনও বাঙ্গালার শাসন বিভাগে দুইটী স্বতন্ত্র প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজস্ব সম্পর্কে দেওয়ান ও রাজ্যশাসন বিভাগে নাজিম ছিলেন। ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাদশাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয় এবং এই অঞ্চলের নাজিমের নিজের খরচ বাবদে ১৭,৭৮,৩৫৪৲ এবং নবাব ঐশ্বর্য্যের খরচ চালাইবার জন্য ৩১,০৭,২১৭৲ দিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। তখন বাঙ্গালার নায়েব নাজিম মিরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাজদ্দৌলা; আর রেজা খাঁ—নায়েব ও দেওয়ান। নাজিমের শক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ তাহার গৃহস্থালী ও অপরাপর খরচ কমাইয়াছে।

বলা বাহুল্য কলিকাতার জমিদারী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পর্য্যন্ত সমস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ইংরাজ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে।

পরিবর্ত্তনের চেষ্টা

খাজনার নিয়মিত বৃদ্ধি লইয়া ইংরাজ একবার নবাব সরকার হইতে বাধা পাইয়া অনেকদিন নিশ্চেষ্ট ছিল। দেওয়ানী অনুমতি লইয়া এবং সামরিক শক্তিতে আত্মবান হইয়া ইংরাজ নূতনভাবে জমি বিলি ও খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরাজ প্রভুর যে কয়েকটী নায়েব বা দেওয়ান নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রজার উপর অত্যাচার করার জন্য আজও নিন্দিত হইয়া আছেন। প্রথম রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে ও রাজা সীতাব রায় ১৭৭০ সালে পাটনার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। প্রজা বিলি করিবার নানা পরীক্ষা চলিয়াছে। তখনও ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের তত্ত্বাবধানে খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইয়াছে। কখনও বাৎসরিক, কখনও ত্রৈবার্ষিক বিলি করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই জমিদার ও প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছে। পূর্ব্ব মর্য্যাদাক্ষুণ্ণ যে সকল জমিদার ইংরাজের নিকট পত্নী লইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা আদায়ের জন্য ইংরাজ নিজেদের মনোনীত ইজারাদার নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের অন্যতম বিষ্ণুপুর জমিদারীতে দেবী সিংহ, রাজসাহীতে দুলাল রায় এবং বর্দ্ধমানের ব্রজকিশোর যে অমানুষিক অত্যাচার এবং জমিদারদিগের অসম্মানজনক আচরণ করে, তাহা ইংরাজ রাজত্ব বিজাপেক্ষ ইতিহাসের এক অত্যন্ত মসীলিপ্ত অধ্যায়। এই সময় ইংরাজের (বোর্ড অফ রেভিনিউর) মূল দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ বর্দ্ধমান জমিদারদিগের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এমন শুর কর চাপাইয়া যান, যাহার তুলনা অন্য কোনও জমিদারীতে আজ পর্য্যন্ত নাই।

জমিদার যাঁহারা নবাব বাদশাহ আমলে রাজ সম্মান লাভ করিয়াছেন, একের পর একটী করিয়া লোপ পাইতে লাগিলেন। এত অত্যাচারেও নিয়মিত এবং আশানুরূপ খাজনা আদায় হইল না। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা ভুল পথে চলিয়াছেন। জমিদার প্রজা কাহারও পাপ নাই; বাঙ্গালার প্রতি চাষীই কোনও না কোনও শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের শিল্প নষ্ট হওয়ায় আয় কমিল; তাহারা নিয়মিত খাজনা দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইলেই নূতন "জমিদার" দেখা দিতে লাগিল; প্রাণপণে তাহারা ইংরাজ সরকারের খাজনা মিটাইতে এবং আপনাদের লাভের অঙ্ক জারি করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের দুর্দ্দশা চরমে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন বৃটীশ পার্লামেণ্টের টনক পড়িল এবং আইন দ্বারা অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল। ১৭৮৪ সালে মন্ত্রী পিট এই আইন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহণ করাইলেন। সম্রাট ভারত শাসনের ভার লইলেন। সাধারণতঃ অন্যায় খাজনা বৃদ্ধি করিবার উপায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; অথচ নীলামের ডাকে খাজনা বৃদ্ধি করিয়া জমিদারি পত্তনের ব্যবস্থায় অনিশ্চিত এবং অসম্বর্দ্ধিত হারে খাজনা চলিতে থাকায় অধিকারকুল লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাব

তখন জমিদারদিগের সহিত নিষ্পত্তি সমান বিলি করিবার জন্য কলিকাতা এবং পরে ডিষ্টেরে বিতর্ক চলিতে থাকে। কলিকাতার মিঃ

ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরে সেই মতই পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ১৭৮৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর (Court of Directors) ১৭৮৬ সালের ১২ এপ্রিলের এক নির্দ্দেশ লইয়া আসেন। সেই অনুশাসনে জমিদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের পরামর্শ দিয়া দেশের অনুপযোগী নূতন উপায় অবলম্বন করার জন্য কলিকাতার কর্ম্মকর্ত্তাদের তিরস্কার করেন। এই নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া ১৭৯০ সালে প্রথমে দশ বৎসরের মেয়াদে জমিদারদিগের সহিত জমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। তিন বৎসর যাইবার পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং আজ দেড়শত বৎসরেরও অধিক সেই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

রাজস্বের পরিমাণ

জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইবার সময় বাঙ্গালা বিহার ও ও উড়িষ্যার (মেদিনীপুর) আয়ব্যয়ী রাজস্বের পরিমাণ লইয়া বড়ই অসুবিধা হয়। মীর কাসিমের সময় (১১৬২-৬৩) এক বৎসর ৩১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, পরের দুই বৎসর মিরজাফরের আমলে ২১ লক্ষ ১৮ ও ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আদায় হয়। অত্যাচারী রেজা খাঁ (১৭৭৪-৭৯) ইংরাজের তরফে যে খাজনা আদায় করিয়াছিল, তাহা ও ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার অঙ্ক অতিক্রম করে নাই। তাহার পর ১৭৭৮ সালের দুর্ভিক্ষ গেল, তাহাতেও ইংরাজের রাজস্ব কম পড়িতে পারে নাই। অত্যাচারের সাহায্যে তাহা বাড়িয়া গিয়াছে। যখন জমিদারদিগের সহিত খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইল, ইংরাজ কোনও হিসাবেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে বেলায় ১৭৯০-৯১ সালে মোট ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। কত দেবী সিং, দুলাল রায়, ব্রজকিশোর এবং তাহাদের "গুরুজী" গঙ্গাগোবিন্দ সিং মিলিয়া রাজস্বের পরিমাণ সকল হিসাব অতিক্রম করিয়া বাড় বাড়াইয়াছে তাহা দেখা হইল না। অন্য কোনও যুক্তির প্রতি কোনও লক্ষ্য না রাখিয়াই জমিদারদিগের সহিত ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা খাজনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেল। রাজসম্মানের অধিকারী বহু জমিদার প্রতি সন পরিবর্দ্ধিত রাজস্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই বন্দোবস্তে সম্মত হইয়া গেলেন; প্রকৃতপক্ষে এইরূপ খাজনা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সে কথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। অধিকাংশ জমিদারদিগের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক না হইলেও বাঙ্গালা দেশের অসংখ্য প্রজা ও জমিদার তখনকার মত রক্ষা পাইয়া গেলেন।

প্রয়োজন

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এ

সকাল হইতে বিহারী মণ্ডল সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া শেষটায় নিরাশ হইয়া বাড়ির পথ ধরিল। পরিশ্রমের বেদনা বিহারীকে পীড়া দিতেছিল প্রচুর, ততোধিক পীড়া দিতেছিল তাহাকে তাহার এই বিফলতার লজ্জার গ্লানিতে। তাহাদের গ্রামে কোন স্কুল নাই, নিজে সে তাহাদের গ্রামে একটা স্কুল স্থাপনের জন্য প্রস্তাব দিয়া আসিয়াছে জমিদারবাবুর কাছে। আজ স্কুল আরম্ভ হওয়ার কথা, কিন্তু সারাটি গ্রামের কোন বাড়ি হইতেই একটী ছেলেকেও পাওয়া গেল না। নোতুন পাড়ার বাঁশবনের এধার হইতে সে শুনিতে পাইল, ওধারে ঘোল ভিটার সারে কদম গাছের ছায়ায় একপাল ছেলে কলরব করিয়া খেলা করিতেছে। এতগুলি ছেলেকে এক জায়গায় হাজির পাওয়া যাইবে এবং চেষ্টা করিলে দলের ভিতর হইতে দুই একটিকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে, এই কথা মনে হইতে বিহারী উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বাঁশবনের আড়াল ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেই তাহার সমস্ত আশা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। বেহারীকে দেখা মাত্রই ছেলের দল যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইল। এক নিশ্বাসে নাম ধরিয়া বিহারী—মনু, বাদশ, কেষ্ট, সুধাময়—ছয় সাত জনকে ডাকিয়া ফেলিল, কিন্তু ওপক্ষ হইতে কোন সাড়াই মিলিল না। মধ্যাহ্নের নীরবতার মাঝে বায়ুকম্পিত বেণুকুঞ্জ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর স্নেহের পরশ বুলাইয়া গেল। উদাস দৃষ্টিতে বিহারী মায়ের শস্যহীন মাঠের দিকে তাকাইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিহারী কদমগাছে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। —ইস্কুল খুললে কি হবে খুড়ো, ছাত্র হবে না—বলিতে-বলিতে নোতুন পাড়ার নোতুন শ্রাতুস্বর বনমালী বালা আসিয়া গাছের উপর গামছাখানি পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

বিহারী চমকাইয়া উঠিল। সহসা কাটিয়া-পড়া বেলুনের মত চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল—হবে না কেন শুনি!

—গ্রামের কেউ ইস্কুলে ছেলে পাঠাবে না।

—আলবৎ পাঠাতে হবে। পাঠাবে না—তবে কাল এক গাঁয়ের লোক সভা ক'রে মত দিলে কেন? আমাকে আজ এমনি ক'রে জব্দ করার জন্ত?

—কিন্তু গ্রামের লোক ভয় পাচ্ছে—তারা মূর্খ, তারা ত সব বোঝে না—

—বুঝুক আর না বুঝুক—জমিদারের হুকুম, এ হুকুম তাদের মান্‌তেই হবে। ইস্কুলটা কি বাপু আমার ইচ্ছের হচ্ছে, যে তোমরা ছেলে পাঠাবে না বলেই খালাস?

—তাদের ভয়টাই ত সেইখানে। জমিদার আর তুমি দুজনে পরামর্শ করে ইস্কুল ক'রছ। ছেলেপেলেদের ইংরেজী পড়াবে, তারা সব পর হয়ে যাবে—

বনমালীর এই অজ্ঞতায় বড় দুঃখেই বিহারীর হাসি পাইল। সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ বনমালী শুধু তাকাইয়া থাকিল বিহারীর মুখের দিকে।

পরদিন বড়তলার বাবুদের কাচারী ঘরে জমিদার রামনারায়ণ লাহিড়ী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। অপরাধীর মত মাথা নিচু করিয়া সামে দাঁড়াইয়াছিল বিহারী। রামনারায়ণবাবু বলিতেছিলেন—তোমাদের নিয়ে আমাকে চ'লতে হবে। তোমাদের মানুষ ক'রে তুল্‌তে না পারলে আমার শান্তি নেই। ইস্কুল আমাকে একটা করতেই হবে, আর তোমারই যখন বেশি ইচ্ছে তখন তোমার গ্রামেই সেটা আগে হবে বিহারী!

জমিদারবাবুর এই উক্তি ব্যর্থ হইল না। রামনারায়ণবাবু নিজে গিয়া হাজির হইলেন চতুরিয়া গ্রামে। বিহারী মণ্ডলের কাচারী ঘরেই চতুরিয়া স্কুলের প্রথম উদ্বোধন হইল। বলা বাহুল্য জমিদারবাবুর ভয়ে সকলেই ছেলে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

দশ বছর পরের কথা। চতুরিয়ার সেই স্কুলের চেহারা আজ সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের অমায়ুষিক পরিশ্রম আর জমিদারবাবুর অযাচিত অর্থব্যয়ের ফল ফলিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের কাচারী ঘরের সেই পাঠশালা আজ আর নাই, তাহার পরিবর্তে বারোয়ারী তলার কোল ঘেঁষিয়া একখানি দোতালা টিনের ঘরে আজ বসিয়াছে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। আজ আর ছাত্র সংগ্রহের জন্ত বিহারী মণ্ডলকে প্রচার কার্য্যের ভার লইতেও হয় না—বা জমিদারবাবুকেও শক্তির ভয় দেখাইতে হয় না। আজ শতাধিক ছাত্র বুকে লইয়া গর্ব্বোন্নতশিরে চতুরিয়ার স্কুল দাঁড়াইয়া আছে, নোতুন যুগের নোতুন দিনের জয় পতাকার প্রতীক।

জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে, এই স্কুল হইতেই বনমালীর ছেলে সুধাময়। আনন্দ সংবাদ বাতাসের আগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। জমিদারবাবু চতুরিয়ায় আসিয়া হাজির হইলেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কীর্ত্তনের আসর পড়িল। ঘটা করিয়া হরির লুট হইল। গানের শেষে বিহারী মণ্ডল সভায় দাঁড়াইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় বক্তৃতা করিল। এক কথাই বার বার সে বহু কথার মধ্য দিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সমাজের এই যে গৌরব, আজিকার এই যে আনন্দ উৎসব, এ সকলের মূলে গ্রামের পিতৃতুল্য জমিদার রামনারায়ণবাবু। ঘন ঘন হাততালি আর হরিধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইয়া গেল।

বনমালী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া জমিদারবাবুকে আভূমি প্রণাম করিল। সুধাময়ের মাথায় হাত রাখিয়া রামনারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—

—তুমি আরও পড়বে সুধাময়—

সুধাময় মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কিন্তু হতাশ ভাবে বনমালী বলিল—সহরের ইস্কুলে কী ক'রে ওকে পাঠাই? জানেন ত বাবু আমার অবস্থা।

—যতদূর ইচ্ছে, তুমি পড়তে থাক, আমি তোমার সব খরচ জোগাব।

জমিদারবাবু ঘোড়ায় চাপিলেন। বনমালী ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া শুধু ভাবিতেছিল।—রামনারায়ণবাবুই তার পুত্রের সত্যিকারের পিতা। সুধাময়কে শুধু সংসারে আনিবার ভারই বনমালী লইয়াছিল, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শিশুকে বড়ো করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, জমিদারবাবু নিজে।

সুধাময় তাহার চলার পথে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়কে পিছনে রাখিয়া বছরের পর বছর আগাইয়া চলিয়াছে। সম্মুখে বহুদূরে তাহার দৃষ্টি।

আট বছর পরে। বি-এ পরীক্ষার পর সুধাময় তিনমাস বাড়ীতেই আসিয়া বসিয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। সকালবেলা সেদিন যেন বনমালীর কাছে তাহার বাড়িখানা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল। সে আস্তে আস্তে বিহারীর বাড়ীর দিকে চলিল।

বেগুনের চারাগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে। গাছগুলি ঘিরিবার জন্য বিহারী বাঁশ চাঁচিয়া চটা বানাইতেছিল। কাচারীর বারান্দা হইতে তামাক সাজিয়া লইয়া বনমালী আসিয়া তাহার পাশে বসিল। বিহারী গুন গুন করিয়া গান ধরিল। সে গানের দিকে বনমালীর মন ছিল না। সে বলিতে লাগিল—

—ছেলেকে কাছে পেয়েও, খুড়ো কেমন যেন ভয় ভয় করে; তার সাথে কথা কই কিন্তু সব সময়ই মনে হয়, আমার ছেলে আমার যেন কেউই নয়। সুধাময় যেন পর হয়ে গেছে। এই বাড়ি, এই ঘর, এই গ্রামের সে যেন কেউ নয়।

বিহারী বনমালীর কথার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল। অর্থহীন সে হাসি।

কাচারীর প্রাঙ্গণে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। দুজনেই ছুটিয়া সেদিকে আসিল। দেখিল, ঘোড়ার উপর বসিয়া জমিদার রামনারায়ণবাবু নিজে। বিহারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। জমিদারবাবু বলিলেন—

—সুধাময় বি-এ পাশ করেছে বনমালী, এইমাত্র আমি টেলিগ্রাম পেলাম। বিহারীর বুকখানা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বনমালী তবুও এ সংবাদে খুসী হইতে পারিল না। তাহার বুকখানা বার বারেই শুধু খালি হইয়া আসিতে লাগিল।

বারোয়ারীতলার বহু পুরাতন কদম গাছের শীতল ছায়ায় স্কুল ঘরটি। সম্মুখে দক্ষিণে দিগন্ত-জোড়া নল মরধানের মাঠ। শ্যামল স্নেহে পরিপূর্ণ এই মাঠখানির বুক। আষাঢ়ের প্রথম। আউস ধানে পাক ধরিয়াছে। ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাটের জমিগুলি মাথা দুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিস্তীর্ণ মাঠখানির একটি পাশ ঘিরিয়া দক্ষিণ সীমান্তে ক্ষীণ সরলরেখার মত বড়তলা গ্রামখানি। বিহারী আর বনমালীকে সাথে লইয়া রামনারায়ণবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন কদম গাছের ছায়ায়। রামনারায়ণবাবুর দৃষ্টি দূরে ঐ দিক্ চক্রবালের দিকে নিবদ্ধ। ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়াই যেন তিনি বলিতেছিলেন—

—বলতে পার বনমালী, ক'দিন আর বাঁচব?

বনমালী বলিল—ওসব অলক্ষুণে কথা কেন মুখে আনেন কর্ত্তা?

—কিন্তু তার আগে যে একটা কাজ করে যেতে হবে। আমার চতুরিয়ার এই মাইনর ইস্কুলকে আমি হাই ইস্কুল ক'রব। আর আমার সেই ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার হবে সুধাময়। তা হ'লেই আমি হতে পারব নিশ্চিন্ত।

সেবারও সুধাময়ের পাশের সংবাদ লইয়া গ্রামের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সেবারও সভা, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন আর হরির লুটে বারোয়ারী তলা হয়ে উঠ্‌ল মুখরিত।

এই ঘটনার পরে আবার দশটি বছর কাটিয়া গেল। সুখে দুঃখে কাটিয়া গেছে সুদীর্ঘ এই দিনগুলি। বড়তলার জমিদার রামনারায়ণবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। চতুরিয়ার বিহারী মণ্ডল, বনমালী বালাও বুড়া হইয়া গিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে রামনারায়ণবাবুরও যৌবনে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। কত স্বপ্ন তাঁহার সফল হইয়াছে। বিফলতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে আরও কত। নিজের অর্থ, নিজের শক্তি, নিজের রক্ত নিঃশেষে অঞ্জলি পুরিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, রামনারায়ণবাবু চতুরিয়ার স্কুলের বেদীমূলে। তাই চতুরিয়ার সেই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় একদিন সত্য সত্যই পরিণত হইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সুধাময় কিন্তু হেড্ মাষ্টার হইয়া গ্রামে আসিল না। কোন এক সরকারী অফিসে চাকুরী লইয়া সে কলিকাতাতেই থাকিয়া গেল। এই সুসংবাদে বিহারীরও উৎসাহের অবধি ছিল না। কেবল শান্তি ছিল না বনমালীর—উৎসাহ ছিল না তাহার। তাহার একমাত্র পুত্র বিদেশসুখা হইয়া গেল। তাই তাহার শুধু মনে হয়—এই ইস্কুল, এ শুধু পর করিয়া দিতেছে গ্রামের সব ছেলে-গুলোকে। তবু তাহাকে উৎসাহ দেখাইতেই হইবে।

উপায় কিছু ছিল না তাহার। জমিদারবাবু নিজে গ্রামে আসিয়া বিহারীর সাথে তাহাকেও এই স্কুল কমিটির সভ্যরূপে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। বাইরের আস্ফালন দিয়া তাই তাহাকে নিয়ত গোপন করিতে হইতেছে তাহার অন্তরের আর্ত্তনাদকে।

সেবারকার শীতান্তে চতুরিয়া গ্রামে নোতুন করিয়া নোতুন বসন্তের সাড়া পড়িয়া গেল। মুকুলিত আম্রমঞ্জরী, প্রস্ফুটিত ভাঁটী ফুলের গন্ধ, বহন করিয়া আনিতেছিল যেন কত যুগ আগেকার কত পুরাতন গন্ধ। তিন মাসের ছুটি লইয়া সুধাময় বাড়িতে আসিয়াছে। তাহার উপস্থিতিতে গ্রামে যেন নোতুন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল। রোজ সন্ধ্যায় স্কুলে, কাচারীতে, খেলার মাঠে সভা বসিতে লাগিল। বিহারী, বনমালীকে কিন্তু কেউ ডাকে না সে সভায়। নোতুন যুগের নবীন ছেলেদের উৎসাহদীপ্ত জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় সভা প্রাঙ্গণ। বনমালী উদাসকণ্ঠে তাই সেদিন বলিতেছিল—

শুনেছ খুড়ো, সুধাময় কী সব বলে বেড়াচ্ছে আজকাল?

বিহারী সবই জানিত, বলিবার মত কিছু না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। পুরনো দিনের কথা মনে পড়িতেই তাহার বুক চিরিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

বনমালী বলিতে লাগিল—সুধাময় ব'লে বেড়াচ্ছে, এই ইস্কুল আমাদের, আমাদের ছেলেদের দেওয়া মাইনে নিয়েই এই ইস্কুল চল্‌ছে। অন্য গ্রামের অন্য লোক কেন এসে এ ইস্কুলে মাতব্বরী ক'রবে? দক্ষিণ পাড়ার নবীন রায় রামনারায়ণবাবুর সমান টাকার লোক। রামনারায়ণবাবুকে বাদ দিয়ে তাকে করা হবে এবার ইস্কুলের সেক্রেটারী।

বিহারী শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

স্কুলের মাঠে প্রকাণ্ড সভা বসিয়াছে। সভাপতির আসনে বসিয়াছিলেন মাননীয় মহকুমাপতি। তাঁহার একদিকে এক চেয়ারে সুধাময়। অপর দিকের চেয়ারে রামনারায়ণবাবু। রামনারায়ণবাবুর পাশে বিহারী আর বনমালী পাশাপাশি বসিয়াছিল। সুধাময় বক্তৃতা দিতে উঠিল—

—বাইরের জগৎ আজ জেগে উঠেছে। ধার ধার নিজের পথ, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে নেওয়ার দিন আজ এসেছে। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না আজ। বন্ধুর ঘুণোস পরে উপকার যারা ক'রে আস্‌ছে এতদিন, পরোক্ষে তারা তোমাদের প্রাণশক্তিকে চুষে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের এ সর্ব্বনাশের দিকে আজ চোখ দিতে হবে—

ঘন ঘন হাততালির মধ্যে সুধাময় তাহার বক্তব্য শেষ করিল। রামনারায়ণবাবু বিহারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সুধাময় কিন্তু বেশ দু'কথা বল্‌তে শিখেছে।

বিহারী আর বনমালী দু'জনেই তখনও যন্ত্র-চালিতের মত হাততালি দিতেছিল। রামনারায়ণবাবুর কথায় এতক্ষণে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল।

সভ্যপদপ্রার্থীদের ভোট গ্রহণের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিহারী আর বনমালী সবিস্ময়ে দেখিল—রামনারায়ণ বাবুর নাম সভ্য পদ হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

সভা শেষ হইল। রামনারায়ণবাবু গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। বনমালী আসিয়া প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। রামনারায়ণবাবু সুধাময়ের পিঠে হাত রাখিয়া ক্ষণিক পরে একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—তুমি ভাবছ সুধাময়, আমি হেরে গেছি, না? কিন্তু আমি যে আজ কত বড় বিজয়গর্ব্বে ফিরে যাচ্ছি, সেটা তুমি বুঝবে কিছুদিন পরে। বিহারীর উদ্দেশ্যে বলিলেন—আমি তা হ'লে যাই বিহারী।

বিহারী নির্নিমেষ-নেত্রে অপসৃয়মান পাল্কীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মনে মনে ভাবিল—চতুরিয়ায় আসিবার প্রয়োজন রামনারায়ণবাবুর ফুরাইয়া গিয়াছে।

বিকালের প্রাঙ্গণ জনশূন্য। দিনান্তের আবছা অন্ধকারে সেই কদম গাছের তলায় বসিয়াছিল শুধু বিহারী আর বনমালী। বিহারী আর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বনমালীর হাত ধরিয়া কহিল—চল বনমালী আমরাও যাই, আমাদের কাজও ত শেষ হয়ে গেছে।

দুজনে চলিতে লাগিল। তাহাদের কাণে ভাসিয়া আসিল বহুদূরের শুষ্ক প্রান্তরের মধ্য হইতে রামনারায়ণবাবুর পাল্কীর বেহারাদের চলারপথের একটানা গান।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভয়-বাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সাহসের বাণী মুক্তির বাণী। মুক্তিপথের যাত্রী, চিত্ত শঙ্কায় দ্বিধাবিকল পুরে অগ্রসর হতে পারে না। স্বাধীনতা-কামীর অন্তঃকরণ নির্ভীক হওয়া চাই। তাই ভীত, ত্রস্ত এবং নিষ্পেষিত স্বদেশবাসীর পক্ষ হ'তে কবি প্রার্থনা করেছিলেন—

এ দুর্ভাগা দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোক-ভয়, রাজ-ভয়, মৃত্যু-ভয় আর।

কারণ চির-অবমানিত অন্তরে বাহিরে দাসত্বের রজ্জুতে বাঁধা, সহস্রের পদপ্রান্তদেশে লুণ্ঠিত, চিরদিন মনুষ্য-মর্যাদা-গর্ব বর্জিত সকল মানুষ মুক্ত হ'তে পারে না। তাই কবির প্রার্থনা—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

রাজ-ভয়, লোক-ভয় বা মৃত্যু-ভয় পরিহারের উপদেশ সাধারণ। কোনো শুভকর কার্য যেন, লজ্জা, ভয়, চির থাকতে লম্বান্বিত হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব মাত্র পঞ্চকারে বা ভাষার ঝোকদার নয়। তিনি এ তিন ভয় বিসর্জনের সপক্ষে আধ্যাত্মিক ভেতর যুক্তি দেখিয়েছেন। লোক-ভয় কোন্ লোকের ভয়? যাঁর সঙ্গে চির-বিকাশের পরিচয় তিনি যে সনাতন সর্বাত্মক লোক-পাল। তাঁর পরিচয়ে বহু-জগতের লোকের ভয় চিত্তি-হীন কুহেলিকা। রাজ-ভয়ও অলীক। কারণ—

জগতের যত রাজা মহারাজ কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ
সকালে ফুটিছে সুখদুঃখ লাজ, টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
আসল কথা, রাজ-রাজেশ্বর ভগবান
যার বিরাজে অন্তরে
লভে সে কাহার বাসে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়—স্বাধীন সে বন্দীশালে।

মৃত্যুর আবার কি? তিনি যে অমৃত। এ দুদিনের প্রাণ তাঁরি দান।

দু'দিনের প্রাণ—
লুপ্ত হ'লে তবুনি কি ফুরাইবে দান?
এত প্রাণ-ধৈর্য প্রভু ছাওয়েছে তব!
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রবো?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি। বিশ্ব-প্রাণের সনাচার যুগ-যুগান্তর তাঁর মন-ভূমির সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করেছে। সেখায় তার নির্ভীকতার উৎস-মুখ। সাহস অধিকেরকের আশার দুঃসাহস মাত্র নয়। এ সাহসের বিশ্ব হেতু পাওয়া যায় অন্য পাথায়। নির্ভীকতা, আত্ম-মর্যাদা, পৃথিবীর তুচ্ছ দান বা সম্পদের প্রান্ত-গর্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ—

যোর মনুষ্যত্বে যে তোমারি প্রতিষ্ঠা
আমার মাঝে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

সুতরাং প্রভুর প্রভুত্ব আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করলে, অবমাননা হয় আত্মার মহিমার। অত্যাচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ নিজের তুচ্ছ ব্যক্তিত্বের অহমিকা বা দম্ভ নয়। আত্মার মহিমা শাশ্বত। অতএব—

যেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান যদি আসে অবজ্ঞার ভরে,
হোক না সে মহারাজ বিশ্ব মহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেব-দ্রোহী ব'লে
সর্বশক্তি লয়ে মোর।

পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা-যজ্ঞের মহাপ্রাণ হোতাদের সাথে একমত সুখলাবদ্ধ ভারতের ঋত্বিক কবি। মানুষ মানুষের উদ্ধত দম্ভের নিষ্পেষণ কেন সহ্য করবে? কেন করবে না তার কারণ বিবৃত করেছেন উক্ত যুগযজ্ঞের সবের হিতকামীরা বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। সে কারণের উৎস-মুখের সন্ধান পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে।

অবমানিত জন-গণ-মনের মুক্তির সাধক যেমন, তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মানুষের আদিম অধিকারের ভিত্তিতে। মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মেছে, তার মুক্তির 'বাণী সহজ'। তাঁর প্রাণে ও লাঞ্ছিত, পদানত, দীন-প্রাণ-দুর্বলের চির-শোষণ-ক্লান্ত অন্তরে মর্মবেদনা সৃষ্টি করেছিল। মুক্তি অভিলাষী জর্জ ওয়াশিংটন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের রাজনৈতিক শাসন অবলুপ্তির মানসে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁরও মুক্তির মূলে ছিল মানুষের অধিকার, নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক মুক্তি। কার্ল মার্ক্স মানুষের প্রাণশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতির হিসাব বিকাশের ফলে সাম্যের দাবীর অবাধ মুক্তি দেখিয়েছেন। মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার ক'রে লেনিন রুশিয়ার মুক্তি সাধন করেছেন। এঁদের চিন্তার কৃপা এবং সমরনিপুণতা প্রশংসনীয়। এঁরা স্মরণীয়, এঁরা স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সাম্যের নির্দেশে লেনিনবাদী বা মানবের কোনো দ্বিতীয়ী মলিনতা লক্ষ্য করবার অবকাশ পাবে না।

যাদুকে সে বাঁধা, মনুকে বাঁধা, বাহুকের তরে তুলাও অবনী—
কে বড় কে ছোট, কে দীন কে ধনী, কেবা আগে কেবা পিছে।
কার দু'লু জল, কা'র পরাজয়, কাহার যুদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়, কেবা আগে কেবা পিছে।

অবশ্য রাজনীতির প্রসঙ্গে একথা বলা হয় নি। এ সত্যবতীর স্বপ্ন না। বিশ্বের আদর্শ যদি এই শুভ চিত্তবৃত্তি হয় তা'হলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। সেই তো উদার অন্তর বাণী, মুক্তির বাণী। কবির আদর্শ—

গাঁথা হয়ে থাক্ এক প্রীতিডোরে, ছোট মস্তকে ছোট বড় সবে
সুখে পড়ে থাক্ পদপল্লবে যেন মালা একখানি।

বলছিলাম, পাশ্চাত্য দেশ-হিতৈষী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই সাম্যবাদী, নরের মুক্তির দাবীদার, কিন্তু পাশ্চাত্যের দাবী নরের পক্ষ হ'তে,তার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সেই অধিকার—প্রয়াস মানব-আত্মার মুক্তির কামনায়। নরনারায়ণ। পুণ্য-তীর্থ ভারতবর্ষে প্রথমে তিনি দু'বাহু বাড়ায়ে নর-দেবতায় নমস্কার করেছেন!

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর পুণ্য মাতৃ-ভূমির সংস্কৃতিতে।

যে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, তুমি।

পৃথিবীর সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। অত্যাচারীর প্রতাপ হাস্যাস্পদ বাতুলতা। ভারত শিখায়েছে, নরদেহ আত্মার মন্দির। নরের অবমাননায় দেবতার অবমাননা। আত্মা দুর্বলের লভ্য নয়। বায়ুদ্বারা বলহীনেন লভ্যো। তাই কবির অন্তর বাণীর সুর উদাত্ত। তাই নিজের প্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন স্বদেশবাসীকে উপনিষদের বাণীতে। মুক্তকণ্ঠে তিনি দেশবাসীকে নির্ভয়ে বলতে উপদেশ দিয়াছেন—

ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো।

যারা অমৃতের সন্তান, মানুষের মনের বিলাসে তাদের কী ভয়? অতএব মানবের অবমাননায় কবি মহতী বিনষ্টির বিভীষিকার করাল ছায়ায় শিহরেছেন। যাদের রজ্জুতে বাঁধা যায় অন্তর বাহির, তার পক্ষে মুক্তির সাধনা অসম্ভব। বাঁধন খুলতে সাহস চাই। কারণ এ বাঁধন যেমন, মাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকার লাভ নয়—তার পটভূমিতে আছে আত্মার চরম মুক্তির সঙ্কেত। তাই রাজাধিরাজ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলেছেন—

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ করে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
পদে পদে ম্লান হয়। দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে ধৃত মিথ্যা ভরে।

কবি বহু গানে, নানা ছন্দে, অশেষ মনোরমে ভঙ্গিতে, আত্মার মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। মুক্তি কেবল সাম্রাজ্যবাদের কবল-শালা হ'তে নয়। আত্মা মুক্তি চায় সকল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হ'তে। তাই সমান অধিকার না থাকিলে দুর্বল মনুষ্যত্বহীন হয় বৃথা। দুঃখের মূর্তি—কবি শালা হ'তে উদ্ধারে তিনি উল্লসিত। স্বপ্ন-ভাঙা নিদ্রা যখন মুক্তির কামনায় প্রাণকে ডাক দিলো, তারও মুখে ফুটলো অন্তর বাণী—

ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর।

যে কবি জড় নির্জীবকে অন্তর বাণী শুনিয়েছেন, তিনি গ্রেহার্ড জনবী বসুভূমিকে বড় অভিমানে বলেছেন—

লক্ষকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি
রেখেছ বাঙালী করি মানুষ করনি।

কবির মাতৃ-ভক্তি সু-গভীর, তাই মায়ের সন্তানের সদা সহায়তার আবেগে কবির প্রাণ তরপুর। তিনি বাঙলার বিগত-প্রসার ক্ষেত্রের উদার শান্তি ভালবাসতেন। তাই বলেছেন—

করো আশীর্বাদ
যখনি তোমার সুত আসিবে সংসার
তখনি তোমার কাছে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি দিতে পারি দুঃখে ও মরণে।

কেবল পরাধীনতার কাঁসই ভারতবাসীর অগ্রগমনে প্রতিরোধক নয়। বহু নিরর্থক শাসন অনুশাসন সমাজকে পঙ্গু করেছে। কর্মের অন্তরাত্মা বিদায় নিয়েছে, অবশিষ্ট আছে বাঁধনের দড়ি। বেশ, যান, খাদ্যের উপযোগিতা আজ সমাজ বিস্মৃত। বলেছি রবীন্দ্রনাথের মুক্তির সঙ্কেত, আত্মার মুক্তির প্রয়াসে। যেমন আত্মা বলহীনের লভ্য নয়, তেমনি

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

স্বরাজ সাধনা স্বাধীন চিত্তের অনুপ্রেরণী শক্তি সাপেক্ষ। ভক্তি মার্গেরও সেই কথা। কবিরাজ গোস্বামী মনোরম ভাষায় শুষ্ক ভক্তির পরিপন্থী আচারের বাঁধন নির্দেশ করেছেন। একান্ত আন্তরিক পরিশ্রমে ভক্তিলতার পরিপুষ্টি। উপশাখার কবল হ'তে তাকে সংরক্ষণ না করলে, আশ্রিত-লতার মূল-শাখা শুষ্ক হয়।

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা
ভুক্তি মুক্তি পাঞ্চা যত অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটি জীব-হিংসন
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ
যে সকল পাঞ্চা উপশাখা বাড়ি যায়
শুষ্ক হইয়া মূল-শাখা বাড়িতে না পায়
প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন
তবে মূল-শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।

আমাদের বহু দেশাচার প্রাচীন। সে কালে তারা প্রবর্তিত হ'য়েছিল, তাদের উপযোগিতা ছিল সে যুগে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না ক'রে মাত্র বাহ্যিক বিধান মানা জ্ঞান বা কর্মের প্রসারের পরিপন্থী। ধানের শাঁস ফেলে তুঁষ খেলে দেহ পরিপুষ্ট হয় না। তেমনি নিরর্থক বিধানের নিগড় উন্নতির অন্তরায়। তাই বলেছিলেন—

তুলসীদাস বলেছিলেন—

পাথর পুজ্‌লে হরি মিলে তো মৈঁ পুজে পাহাড়।

সতাই

বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ-লালা।

কবি রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন যে নিরর্থক দেশাচারের বাঁধন অনর্থকর। তাদের অত্যাচারও পেষণ-যন্ত্রণা বাড়ায়।

দুই হস্ত করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা গতি-পথে বাধা
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উধার উচ্চ।

কবি সতাই বলেছেন—

কর্ম্মেরে করেছ পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছ হত পাষ কারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছ সঙ্কীর্ণ, কবি যায় যাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে।

আত্ম-দর্শনই তো আর্য্যকবির বাণী। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য এইখানে। সামাজিক অনুশাসন সবাই মানে। কিন্তু মনের উন্নতি বা জ্ঞানের প্রসার হয় মুক্ত চিন্তা ধারায়। তাই অধিকারী ভেদের ব্যবস্থা, ধর্ম্মরাজ্য সিদ্ধির আয়োজন। কবিতে বলেছেন—

সবশেষে পাওয়ার তের বাজাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ
তবু তরুণ কী নবীন ছোটে যব আপ ক'রে পরাবেশ।

চণ্ডীদাস আদি বলেছেন—

মনু আরাকা নহ্‌সে কহু আরাকা হরে।

যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই প্রাণে সুরের আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন।

উন্নতির পথ-প্রদর্শক ধর্ম্ম। কিন্তু সাধনা প্রত্যেক মানুষের নিজের ধর্ম্ম। কর্ম্মের অবহেলায় মানুষ কৃষ্ণ-সম হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের নিজের প্রাধান্যের বাণী প্রচার করেছেন

তোমার দ্বারের ধন প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসন-ভার, হে রাজাধিরাজ।

তাই তিনি অভয় বাণী শুনিয়েছেন

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য পদ্যে গদ্যে, গল্পে কথায়, উপন্যাস, সঙ্কেতে ও ইঙ্গিতে স্বাধীনতার অভয়-বাণীতে পরিপূর্ণ। স্বাধীনতা চাই মনের। বিলাস-বাসনা স্বাধীনতার উপাধি নয়। ভারতের জীবন সরল, ভাববার পথ উদার। তার ভাষা মিষ্টি, অন্তরে শোনে সে উদাত্ত স্বর। মাতৃঃ তার ইষ্ট মন্ত্র। কবির কথায় যদি—

কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তি মদমত্ত এই যবনিক বিলাসী
ঘনবৃত্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' সাজ সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা-মথিত নকল রঙ্গকে কবি হুঙ্কারে ঘুষেছিলেন। তাই তাঁর উক্তি—

আমি সুরের ঘরে কিনব না আর, ভূষণ ব'লে গলায় ফাঁসি।

আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে নটরাজের বাঁধন খোলা, বাঁধন পরার দিন আগত ঐ। আজ চাই দুর্দ্দমনীয় সাহস। আজ আত্ম-অবিশ্বাস কঠিন ঘাতে নাশিতে হবে, পুঞ্জিত অবসাদ তার অশনি পাতে হানতে হবে। আজ বলতে হবে—

ওরে তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগবো আমি দাও মোরে সেই তান।

বলতে হবে—

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।

আজ যদি অগ্রগতির ডাকে কেহ না সাড়া দেয়, রক্ত-মাখা চরণতলে পথের কাঁটা দলতে হ'বে।

যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর্য্য মহাম্ববির একটু অধীরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ও কিঞ্চিৎ কঠোরতা দেখাইয়া বলিলেন, "ভীরু কাপুরুষ! মিথ্যা কথায় কি তোমরা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়াছ?"

—আমি সত্যই বলিতেছি!

—ঘটনার সমাবেশে তোমার সকল কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি তোমাকে প্রশ্ন করিলে বৃথা সময় নষ্ট হইবে। কীর্ত্তিবর্ম্মণ, ইহারা যে সকল নিদর্শন ইহাদের অভিযানের পথনির্দ্দেশক সঙ্কেতরূপে বা ইহাদিগের অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধান কার্য্যের নিষ্ফল উদ্দেশ্যে অভিযান পথে ও বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল সে সকল সংগৃহীত নিদর্শনাদি কোথায় রক্ষিত আছে?

কীর্ত্তিবর্ম্মণ, গৃহকোণে রক্ষিত একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত পোট্টলিকা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "সংগৃহীত নিদর্শন সকল ঐ বস্ত্রাবৃত পোট্টলিকায় রক্ষিত আছে।"

আর্য্য মহাম্ববির বলিলেন, "ইহারা ত স্বেচ্ছায় আপনাদিগের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছি। ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু অবগত হইয়া ভবিষ্যতের কোনও রূপ অনাগত বিপদের পথরোধের প্রচেষ্টায় অবহিত হওয়া আবশ্যক।"

কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল, "আমি সংগৃহীত নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাদের আবাসস্থলের নির্দ্দেশ পাইয়াছি। জানিয়াছি যে, ইহারা এক বাটীতেই বাস করে এবং আমি মন্ত্ররক্ষা-বাহিনীর পঞ্চদশ কর্ম্মীকে, একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে ইহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়াছি। ইহাদের আবাসস্থলে গিয়া যাহা কিছু ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতির সম্বন্ধে নিদর্শনাদি পাওয়া যায় এবং ইহাদের তৈজসপত্রও লুণ্ঠন করিয়া আনিতে বলিয়া দিয়াছি। তাহারা সকলেই মুখচ্ছদ ধারণ করিয়া গিয়াছে। তাহারা অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ অনুমান হয়।"

এমন সময়ে প্রেরিত মন্ত্ররক্ষামণ্ডলীর কর্ম্মীগণ অধ্যক্ষের সহিত বন্দীদিগের বাসস্থানের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা যে কক্ষে বসিয়াছিলাম তাহারা সে কক্ষের দ্বার সম্মুখের প্রাঙ্গণে আসিয়া সামরিক রীতিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং আমাদিগকে সামরিক রীতিতে অভিবাদন পূর্ব্বক একে একে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখচ্ছদ-গুলি খুলিয়া গৃহকোণে অবস্থিত একটা দারুনির্ম্মিত আধারে রক্ষা করিল, অতঃপর একে একে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহারা বাহিরের প্রাঙ্গণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং কীর্ত্তিবর্ম্মণের তূর্য্যধ্বনির সহিত তাহারা, একে একে সবলে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। রহিল কেবল মন্ত্ররক্ষামণ্ডলীর নেতা চণ্ড সেন। সে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সমূহ কক্ষতলে রক্ষা করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মণের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কীর্ত্তিবর্ম্মণ তাহাকে বলিল, "তুমি এখন এইখানেই থাক!"

কীর্ত্তিবর্ম্মণ চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "চণ্ডসেন, কোনওরূপে কেহ তোমাদের চিনিতে পারে নাই ত?"

চণ্ডসেন উত্তর দিল, "না, কেহই আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই—এইরূপ ত আমার অনুমান হয়।"

—কেহ কি তোমাদের বাধা দিয়াছিল?

—হাঁ, দুইজন আমাদের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের যখন বলিয়াই মনে হয়। আমরা তাহাদের মুখ, হাত, পা ও চক্ষু বাঁধিয়া জড়পিণ্ডের মত ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদেরই বস্ত্রে তাহাদের বাঁধিয়াছি।

এই দুইজন বন্দী একই স্থানে এবং একই গৃহে বাস করে?

—হাঁ, ইহারা একই স্থানে এবং একই গৃহে স্বতন্ত্র কক্ষে বাস করে।

—ইহাদের কাহারও কি কোনও আত্মীয়-স্বজন সেখানে আছে?

—গৃহে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল—তাহাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের সহিত আমাদের কোনও কথা হয় নাই। আমরা পরস্পরের মধ্যে আমাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম; কেহ তাহা শুনিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারে নাই।

আমি চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের—এই বন্দীদের—পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ কি?"

চণ্ডসেন বলিল, "হাঁ, ইহাদিগের গৃহে বা আবাসস্থলে সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যেই ইহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে।"

—ইহাদের কি নাম বল ত!

—ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ডেমিট্রিঅস্, অপরের নাম থিওফিলস্—তবে কে ডেমিট্রিঅস এবং কে থিওফিলস্ তাহা আমি বলিতে পারি না।

আর্য্য মহাস্থবিরকে আমি বলিলাম, "ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বোধ হয় আর কিছু আবশ্যক করে না। ইহারা যে গুপ্তচর ও যবন এবং ইহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও মন্ত্রভেদ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

বিচার সভার সকলেই আমার সহিত একমত হওয়াতে আমি পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিলাম, "গুপ্তচরের যে চরম শাস্তি, ইহাদিগকে তাহাই দেওয়া হউক। ইহাই আমার প্রস্তাব।"

আমি আর্য্য মহাস্থবিরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি মত?"

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সংঘ যেরূপ যুক্তিযুক্ত ও যথাবিধি বিবেচনা করিবেন আমার তাহাতে অন্যমত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।"

আমাদের মধ্যে শেখর অর্থশাস্ত্রবিদ্ রাজনীতিবিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি সম্বন্ধে পারদর্শী সুপণ্ডিত। সে তাহার পিতার নিকট এখনও এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত এবং এই আলোচনায় তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। আমি বিচার সংঘের অনুমোদনক্রমে শেখরকে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ দিলাম।

শেখর ইহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল বিবৃতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিল, "ইহাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা ইহাদের সপক্ষে কোনও প্রকার দোষ খালনের যুক্তি বা বিবৃতি নাই। ইহাদের গৃহ হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী ও পত্রাদি হইতে ইহাদের অপরাধ ও ইহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ সপ্রমাণ করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "তবে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের চরমদণ্ড সম্বন্ধে বিচার সংঘের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব কর। আরও এই সকল সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী যাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাদেরই বা কি ব্যবস্থা করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও একটা প্রস্তাব বিচার সংঘের নিকট আলোচনার জন্যও উপস্থাপিত করা আবশ্যক। তাহাও তুমি কর।"

শেখর কিছুক্ষণ মৌন ছিল—বোধ হয় বিচার্য্য বিষয়গুলি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে শেখর বলিল, "শত্রুদ্বারা মন্ত্রভেদ উদ্দেশ্যে নিযুক্তকারের শাস্তি প্রাণদণ্ড—ইহাই দণ্ডনীতির ব্যবস্থা এবং তদনুসারে আমি বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিতেছি এবং আরও প্রস্তাব করি যে, সংগৃহীত দ্রব্যাদিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া নিশ্চিহ্ন করা হউক। তাহা না করিলে আমাদের ত্রাণ সংঘের বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

বিচার সংঘের সকল সদস্যই এই দুই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন। আরও স্থির হইল যে বন্দীদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড বিধান করা হইবে এবং সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ অগ্নিদাহ করিয়া তাহাদিগের ভস্মরাশি ইহাদের দেহাবশেষের সহিত এই বিধ্বস্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত একটা গভীর জলহীন কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি দ্বারা এই পুরাতন কূপটাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে।

বন্দীগণের হস্তপদ পুনরায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ধ্বংসস্তূপের প্রান্তে পুরাতন একটা শুষ্ক কূপের নিকট পশুর ন্যায় টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদের জন্য

প্রস্তুত করা হইল। অস্ত্রাগার হইতে দুইটি শাণিত কুঠার আনীত হইল এবং ত্রাণসংঘের দুইজন সদস্যকে এই প্রাণদণ্ড বিধানের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইল। চল্লিশজন অপর সদস্য শবদেহ গ্রহণ করিয়া, বন্দীদিগের মৃতদেহ কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, মৃত্তিকারাশি ও প্রস্তরখণ্ডসমূহদ্বারা ঐ কূপ পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল। সংগৃহীত দ্রব্যসমূহে অগ্নি প্রদত্ত হইল এবং উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করিবার জন্য বাহিনীর একজন সৈন্য নিযুক্ত হইল।

স্বল্পকাল মধ্যে সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। বন্দীদিগের শাস্তি বিধানের সময় তাহাদের মুখের ও চক্ষুর বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সতয় কাতর চীৎকারে সেই ভগ্নাবশেষ প্রাচীন দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাও নিতান্ত অল্পক্ষণের জন্য। শাণিত কুঠারের আঘাতে তাহাদের জীবনের সহিত সেই করুণ ক্রন্দনও শেষ হইয়া গেল।

বন্দীদিগের মৃতদেহ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যসমূহের ভস্মরাশির সহিত মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ডসমূহ দ্বারা কূপ পূর্ণ করা হইল। চল্লিশজন সদস্যের দ্বারা এই কূপ পূর্ণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আমরা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলাম যে, অদ্য রজনীতে বাহিনী পরীক্ষণ স্থগিত থাকুক। চারিদিগের অনুসন্ধানে অদ্য কতক কর্ম্মচারিদিগের এই বন মধ্যে আগমন অসম্ভব নহে।

এখানকার কার্য্য শেষ হইলে শেখর তূর্য্যধ্বনি করিল। একজন নায়ক আসিয়া তাহাকে বলিল যে, বিশেষ কারণবশতঃ অদ্য বাহিনী পরীক্ষণ হইবে না। সে বাহিরে গিয়া তিনবার বংশীধ্বনি করিল। পরীক্ষণ প্রাঙ্গণে সমবেত প্রায় পঞ্চশত বাহিনীসদস্য নিঃশব্দ ছায়ার মত কৃষ্ণপক্ষের তিমিত জ্যোৎস্নালোকে বিলীন হইয়া গেল। আমরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তখন যামিনী দ্বিপ্রহরের প্রথম পাদে উপনীত হইয়াছে।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে মন্ত্ররক্ষা
নামক পঞ্চদশ বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

বাংলার মাছ ও মাছধরা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম্-এস্‌সি

"মাছ ত কেবল জলেই ভরে না বেলা
বেলে বাঙ্গলীর স্মৃতিঘরে দাগা বেলা।"—মাটির মায়া।

বাংলাদেশে নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর, কোল, নদীমুখ প্রভৃতির প্রাচুর্য্যবশতঃ এখানে যত বিভিন্ন প্রকারের অপর্য্যাপ্ত মাছ দেখা যায় ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাহা লক্ষিত হয় না।

চিংড়িকে সচরাচর মাছ বলিলেও উহা যে প্রকৃত মৎস্যশ্রেণীভুক্ত নয় তাহা অনেকেই জানেন। এই চিংড়ির মধ্যেও যে অনেক শ্রেণী আছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মাছের মধ্যে সাধারণতঃ দুই ভাগ করা যাইতে পারে—আঁইশযুক্ত এবং আঁইশহীন মৎস্য।

কই, রুই, কাতলা, ইলিশ প্রভৃতি অধিকাংশ মৎস্যই আঁইশযুক্ত; পক্ষান্তরে সিঙ্গি, মাগুর, আড় প্রভৃতি মৎস্য আঁইশহীন।

আমাদের পরিচিত মাছগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

ডামকানা, পুঁটি, মৌরালা, সরলপুঁটি, তিনকাঁটা, খলসে, কই, টেংরা, রামটেংরা, আড়, চেলা, ছেয়া বা মেনি, বাটা, ফাঁপা, কাজলি বা বাঁশপাতা, খয়রা, বরমোলা, মেছে, গলার, চাঁকি, শিঙ্গি, মাগুর, পাবদে, তপসে, ভেটকি বড় কোরাল, ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, মহাশোল, ভোল, তিল্লা, চাঁই, পাঙাস, বাগাড়, বোয়াল, ওরশালি, পাবদা, ফলি, চিতল, গাংদাড়া বা সুবর্ণ খিড়কি, কালবোস, বাতা, জাজন, কুঁচো, বাইন, চাদা ও পিয়েলি জেলে প্রভৃতি। অবশ্য স্থানভেদে উল্লিখিত অনেকগুলি মাছের স্বতন্ত্র নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে এই প্রবন্ধ দেখিয়া মনে করিতে পারেন লেখক কি লিখিতব্য বিষয় খুঁজিয়া পাইলেন না যে এই অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে চাই বর্ত্তমানে দেশে দুধ ঘি যেরূপ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রাণে বাঁচিতে হইলে মাছের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দুধের অভাব মাছের দ্বারা কতটা পূরণ হইতে পারে অন্য কোন সহজপ্রাপ্য খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে তাহা সম্ভবপর নয়। শিঙ্গি, পাবদে, বাটা, মাগুর প্রভৃতি মাছের আমিষ পদার্থ দুধের আমিষ পদার্থের মতই সহজপাচ্য ও উপকারী বলিয়া খাদ্যবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস বসু মহাশয় এবিষয়ে বহু পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমিষ পদার্থের প্রধান কাজ আমাদের শরীরের আমিষ অংশ অর্থাৎ মাংস পেশী রক্ত প্রভৃতির অধিকাংশ গঠন ও পুরাতন পেশী প্রভৃতির

ক্ষতিপূরণ করা। যে সব আমিষ খাদ্য এই কাজে বেশী উপযোগী সেগুলিকে উচ্চস্তরের আমিষ খাদ্য বলা হইয়া থাকে। এই গুণকে পুষ্টিমান (Biological Value) বলে। আদর্শ আমিষ পদার্থ হইবে যাহার শতকরা একশত ভাগই আমাদের শরীরের কাজে লাগে। বলা বাহুল্য, এরূপ পদার্থের সন্ধান জানা নাই। কতকগুলি পরিচিত আমিষ খাদ্যের পুষ্টিমান হইতে মাছের উপযোগিতা ভাল ভাবে বুঝা যাইবে :—

খাদ্যদ্রব্য	পুষ্টিমান	খাদ্যদ্রব্য	পুষ্টিমান
গোটা ডিম	৯৬	শিমিমাছ	৮৮
টাটকা গো-দুগ্ধ	৯০	ডাই	৮৩
ছানা	৬৯	সয়াবীন	৮২
ছানার জলের আমিষ	৮৪	রুই	৭৯
মাংস	৭৬-৮০	কাতলা	৭৮
ডাল	৪০-৫০	ইলিশ	৭০

এখানে জানিয়া রাখা ভাল যে মাছের প্রায় বার আনাই জল—আমিষ পদার্থ শতকরা প্রায় ২০ অংশ মাত্র। মানুষের শরীরের ওজন যত সের প্রায় তত গ্রাম (১১ গ্রামে ১ তোলা) আমিষ পদার্থের প্রয়োজন। যাঁহার ওজন ১ মণ ২০ সের তাঁহার ৬ তোলা নির্জলা আমিষ পদার্থ আবশ্যক। অর্থাৎ ভাল ডিম দুধ মাংস না খাইয়া শুধু মাছ খাইতে হইলে তাঁহাকে ৩ সের মাছ খাইতে হইবে। অবশ্য তরিতরকারী এমন কি ভাত রুটি হইতেও আমরা খানিকটা আমিষ পদার্থ পাইয়া থাকি। বলা বাহুল্য, শরীরের পক্ষে দৈনন্দিন আবশ্যক আমিষ পদার্থের অতিরিক্ত যদি পাওয়া যায় ও তাহা হজম করিতে পারা যায় তবে তাহাতে ভাত রুটির মত শরীরের শক্তি সরবরাহের কাজ হইয়া থাকে। সুতরাং চাউল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ অভাবের সময় যাঁহাদের মাছ পাইবার সুযোগ আছে তাঁহারা উহা বেশী পরিমাণে খাইতে যেন দ্বিধা না করেন। অনেকে বলিতে পারেন মাছ না খাইলে কি চলে না? খুব চলে, যদি উপযুক্ত পরিমাণে দুধ প্রত্যহ পাওয়া যায়। তাহা যখন অসম্ভব তখন মাছ খাইতেই হইবে। কেহ বা তৃণলতাপুষ্ট গবাদি পশুর কথা তুলিতে পারেন। শাস্ত্রবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন—ঐ সব প্রাণীর পাকস্থলী এত বৃহৎ যে সেগুলি যেন কারখানা বিশেষ। সেখানে অনেক প্রকার ভিটামিন, আমিষ পদার্থ প্রভৃতি ঘাস পাতা হইতে গৃহীত নিজস্বের আমিষ ও অন্নপদার্থ-সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ যখন গরু নয় তখন সে কথা না তুলাই ভাল। উপমা কাব্যেই শোভা পায়, রূঢ় বাস্তবতার নিকট তাহার স্থান নাই। শুধু শাক ভাত ডাল খাইয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে তবে সেরূপ ভাবে বাঁচা মরে বেঁচে কিবা ফল ভাই যাকাটির দ্বারাই ভালরূপে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ আমরা অনেকেই এইরূপভাবেই কষ্টেসৃষ্টে, অনাহারে অর্ধাহারে বাঁচিয়াছি, তবে যাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাঁহারা নিছক গোঁয়ারতুমি বা দর্শাহতার প্রশ্রয় দিতে গিয়া শরীরকে ব্যাধিমন্দির ও পরিবারের অশান্তির কেন্দ্র করিয়া না তোলেন, ইহাই আমার সবিনয় বক্তব্য।

মাছের তেলও অতিশয় উপকারী। বর্তমান তেলের দুর্ভিক্ষের দিনে মাছ খাইলে অনেকটা ভাল তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় তারপর মাছের তেল, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ছোট বড় সকল মাছের যকৃত তৈলই ভিটামিন এ বি১, নিকোটিনিক অ্যাসিড, রিবোফ্লাভিন এবং ভিন্ন প্রধান উৎস বলিয়া আমাদের ও অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং নিয়মিতভাবে মাছ খাইলে এইসব ভিটামিনের অভাবজনিত ব্যাধির হস্ত—কড্‌লিভার অয়েল বা হালিবাটলিভার অয়েল কিনিয়া পয়সা খরচের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মায়েদের এবং বাড়তি বয়সে ছেলেমেয়েদের এই সব ভিটামিনের চাহিদা খুব বেশী, ডিম এবং দুধে এসব ভিটামিন থাকে, কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা যখন ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে তখন মাছের শরণ লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ছোট মাছের যকৃত তেল পৃথক করা যায় না তবে সাধারণতঃ রান্নার সময় সে তেল মাছের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে থাকিয়া যায়। যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা বড় মাছের তেল বাজার হইতে পৃথক কিনিয়া আনিয়া বড়া করিয়া অথবা পালং বা অন্যবিধ শাকের সঙ্গে ঘন্ট করিয়া খাইতে পারেন। ইহাতে মাছের তেলের ভিটামিন এ ব্যতীত শাকের ক্যারোটিনগুলিও তেলের সঙ্গে মিশিয়া শরীরে গ্রহণযোগ্য হয় এবং ঐ ক্যারোটিন শরীরের মধ্যে ভিটামিন 'এ'তে পরিণত হইয়া শরীরের সৌকর্য্য সাধন করে। ভিটামিন এ-র অভাবে রাতকানা রোগ এবং ডি-র অভাবে বাড়তি বয়সে ও প্রসূতীদের রিকেটস রোগ জন্মে। ভিটামিন এ এবং রিবোফ্লাভিন চোখের পক্ষে অতিশয় উপকারী। নিকোটীনিক অ্যাসিড-এর অভাবে মারাত্মক চর্মরোগ জন্মে এবং ভিটামিন বি, স্নায়ু সমূহ ও কোষ পরিষ্কার রাখে এবং কার্বোহাইড্রেট খাদ্য অর্থাৎ ভাত রুটি প্রভৃতিকে শরীরের কাজে লাগাইতে সাহায্য করে। যদিও শাক পাতার ক্যারোটিন স্নেহ পদার্থের সহিত উদরস্থ হইলে মানুষের লিভারে গিয়া উহা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়—তবে যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যারামে এবং অনেক প্রকার শারীরিক অবস্থায় উহা সম্যক হইতে পারে না। Vitamins in Medicine—পুস্তকে ইহা লিখিত আছে। সুতরাং প্রাণীজ খাদ্য হইতে ভিটামিন এ পাওয়া দরকার। দুধের পরিবর্তে মাছ খাওয়া এই হেতু অপরিহার্য্য।

মাছের তৃতীয় উপকারী পদার্থ উহার কাঁটা। অনেকেই জানেন আমাদের হাড়, দাঁত প্রভৃতি পদার্থ চূণজাতীয় উপাদান বা ক্যালসিয়মের লবণপদার্থে গঠিত। দুধ ক্যালসিয়মের একটি বড় উৎস। অনেক-প্রকার শাকেও ক্যালসিয়ম লবণ থাকে তবে কোনও কোনও শাকে অক্সালিক অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঐ ক্যালসিয়ম শরীরে ভাল গৃহীত হইতে পারে না। আমরা পানের সঙ্গে যে চূণ খাই উহাতে অনেকটা ক্যালসিয়ম পাওয়া যায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মায়েদের এবং বাড়তি বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্যালসিয়মের চাহিদা খুব বেশী। এঁদের পক্ষে ক্ষুদ্র মৎস্য খুবই উপকারী। অনেকেই হয় তো জানেন বাংলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ছোটমাছকে চুণোমাছ বলা হইয়া

থাকে। আমরা খাতবিজ্ঞানে পড়িয়া যাহা শিখিতেছি আমাদের দেশের লোকেরা সেকালে সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলেই তাহা জানিতেন। সুতরাং পুঁটি, টাংরা, বাঁশপাতা, খলসে, পিয়োলি, পাবদা, কাঁদা, পয়রা প্রভৃতি মাছ যে খাদ্য নয় তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই সব মাছের অনেকগুলিই ভাজিয়া খাইতে বেশ উপাদেয় ও মুখরোচক এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চিবাইয়া খাইলে উহাদের কাঁটা অক্লেশেই পরিপাক করিয়া উপকার পাওয়া যাইতে পারে। বিবেচনা মত এই সব চুনোমাছ প্রভৃতি যা ছেলেমেয়েদের খাওয়ান হইলে অযথা সাধ্য ক্যালসিয়ম ইনজেকশন বা ক্যালসিয়ম ঘটিত ঔষধের ধার ধারিতে হয় না। আশা করি বিজ্ঞানসম্মত এই আলোচনা অনেকেই মনে রাখিবেন এবং তাহা দৈনন্দিন জীবনে পালন করিয়া এই দারুণ দুর্দিনে কথঞ্চিৎ শান্তিময় জীবন যাপনের চেষ্টা করিবেন।

এক্ষণে মাছধরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। জালের ব্যবহার না করিয়া মোটামুটি যে সকল উপায়ে মাছধরা হইয়া থাকে এখানে তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিনা জালে মাছধরার মধ্যে বড়শিতে মাছধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুইল বা ছোটছিপের সাহায্যে সুতায় সঙ্গে কাতরা সংযুক্ত বড়শি ফেলিয়া মাছধরার কথা সকলেই জানেন। মাছধরা থেকে বাংলা ভাষায় অনেক কথা আসিয়াছে 'টোপ গেলা' কথাটি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পদ্মা বা বড় নদীর তাজনোর মুখে জলের আবর্তের মধ্যে বড় লম্বা এবং মোটা সুতায় সঙ্গে সাধারণতঃ কৈচোর টোপযুক্ত একগোছা বড় বড়শি ফেলিয়া বোয়াল, আড়, মুগেল, চিতল প্রভৃতি ধরা হইয়া থাকে। এই বড়শিতে কোনও ফাৎনা থাকে না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুতা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, যখন হাতে টান বোধ তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেঁচকা টান দিয়া মাছ গাঁথিয়া কিছুক্ষণ খেলাইয়া ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় তুলিয়া থাকে। এই প্রকার বড়শিকে 'তাপি' বলে। বহুক্ষণ অবলম্বনে একঘুষ্টে সুতায় পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে একাগ্র মনে কোন বিষয়ের সাধনাকে চলতি ভাষায় 'তাপি ফেলে' বলা বলা হইয়া থাকে। পদ্মার অনতিপ্রশস্ত স্রোতযুক্ত স্থানে পশ্চিম বঙ্গের এক শ্রেণীর লোকে ছোট নৌকাযোগে বড়শির সাহায্যে মাছ ধরিয়া থাকে। তাহারা একস্থানে বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া তৎসংলগ্ন মোটা দড়ি প্রায় একশাইল দূরবর্তী অপর খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দেয় এবং সেই দড়ি হইতে অসংখ্য বড়শি ৩৪ হাত লম্বা দড়ির সাহায্যে মোটা দড়ির ১০।১২০ হাত অন্তরালে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেয়। এই সব বড়শিতে এঁচেল মাছি, (পচা গোবর) পচা তৈল প্রভৃতি একত্র মাখিয়া বড়শিতে গাঁথিয়া টোপরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়েকঘণ্টা পর পর ছোট নৌকযোগে বড় দড়ি অনুসরণ করিয়া বড়শিগুলি তুলিয়া দেখা হয়। টোপ না থাকিলে নূতন টোপ লাগাইয়া দেওয়া ও কোনও বড়শিতে মাছ গাঁথিলে তাহা খুলিয়া নৌকায় রাখা হয়। রিঠা, আড়, বোয়াল, পাঙাস প্রভৃতি মাছ এইভাবে ধরা হইয়া থাকে।

এতক্ষণ নির্জীব টোপ সাহায্যে বড়শিতে মাছ ধরার কথা বলা হইল। সজীব টোপ সাহায্যে বড়শিতে মাছ ধরার বিষয় বলা যাইতেছে। বড় নদী নালায় কোল, ডাঙ্গা, খাল বা বড় বিলে যখন ডাঙ্গনের জল প্রবেশ করে তখন শক্ত বাঁশের ডগায় শক্ত দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্তে মোটা বড়শিতে ব্যাং, টাকিমাছ, টাংরা বা অন্য ছোট জীবিত মাছ গাঁথিয়া ছিপটি এমন ভাবে জলের কিনারে বা ঝাঁটু জলে পুঁতিয়া রাখা হয় যাহাতে ছিপের অপর প্রান্তের দড়ি সংলগ্ন বড়শিবিদ্ধ মাছটি অপেক্ষাকৃত গভীর জলে ঠিক জল ঘুরে থাকে এবং মাঝে মাঝে হুল্ হুল্ করিয়া নড়িতে থাকে। বোয়াল, আড় প্রভৃতি বড় মাছ শিকার ধরিতে আসিয়া যেই হাবল দেয় অমনি উহা বড়শিতে আটকাইয়া যায় এবং তীরস্থ বড়শির মালিক আসিয়া ঐ মাছ তাড়াতাড়ি খুলিয়া লয়। স্রোতস্বতী নদীর তীরে প্রখর স্রোতের মুখে অনেক সময় ঐরূপভাবে জীবিত মৎস্য সংযুক্ত বড়শি স্থাপন করিয়া নিকটে পাড়ের উপরে ছুতি হাতে করিয়া লোক বসিয়া থাকে। ঐ মাছের লোভে কোন বৃহৎ মৎস্য বড়শির মাছ ধর ধর করিতেছে দেখিলেই ছুতি নিক্ষেপ করিয়া ঐ বৃহৎ মৎস্য ধরা হইয়া থাকে। এইরূপ বড়শিকে বর্ষা বাংলার স্থান বিশেষে 'জিয়ালা' দিয়া মাছ ধরা বলা হইয়া থাকে। 'পুঁটি মাছ দিয়া রুই মাছ ধরা'—নামে যে প্রবাদটি প্রচলিত আছে তাহা এই জিয়ালা দিয়া বা জীবিত ছোট মাছের সাহায্যে বড় মাছ ধরা ব্যাপার হইতেই আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, পুঁটি মাছ অতিশয় ভীরুস্বভাবী বলিয়া উহা কখনও জিয়ালারূপে ব্যবহৃত হয় না।

ছিপের টোপের সাহায্যে বিনা বড়শি ও সুতায় মাছ ধরার খবর বোধ করি অনেকেই জানেন না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই ব্যাপারটি বিবৃত করিতেছি। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে শরৎ ও হেমন্তকালে হাটে এক রকমের শেওলা বিক্রিতে পাওয়া যায়—শুকনো লম্বা লতার স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ সূক্ষ্ম সুতার মোড়ের মত কালো কালো শেওলা। বিল বা ঠিক তোয়ার ডাঙ্গার তীরে গর্ত খুঁড়িয়া একটি হাঁড়ি জলের দিকে ঈষৎ কাৎ করিয়া বসান হয়; হাঁড়ীর মধ্যে জল না ঢুকিতে পারে তজ্জন্য হাঁড়ীর মুখ ও জলের ধারে কাদার ছোট বাঁধ দেওয়া হয়। সেই বাঁধের নিকট হইতে জলের মধ্যে পাঁচ ছয় হাত বা তার বেশী দূর পর্য্যন্ত পাটকাঠি আড়াআড়িভাবে অক্ষর গুণ চিহ্নের মত বসান হয়। দুই দুটি পাটকাঠি খাড়ে খাড়ে এমনভাবে জলের উপরে থাকে যে তাহার উপর দিয়া লম্বালম্বিভাবে ঐ শেওলা বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং শেওলার অগ্রভাগ জল ছুঁয়া ছোঁয়া হইয়া থাকে। ঐ শেওলার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া—টাকি প্রভৃতি মাছ ক্রমশঃ তীরের দিকে অগ্রসর হয় এবং শেওলার শেষপ্রান্তে অর্থাৎ হাঁড়ির মুখের বাঁধের নিকট আসিয়া লম্ফ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে পড়িতে থাকে। সকালে গিয়া হাঁড়ি ভর্ত্তি মাছ ও শেওলার গোছাটি বাড়ি আনা হয়। গ্রামের লোকেরা ইহাকে 'হাঁড়া শেওড়' মাছ ধরা বলে। একটি শেওলা অনেকদিন এইরূপ ব্যবহার করা চলে। বিনা জালে মাছধরার অবশিষ্ট প্রচলিত প্রণালী এবং বিভিন্ন জালের বিষয় পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শিল্পীর শিল্প

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নাঃ—রঘু সত্যিই আর ওদের দলে নয়। ওরা সত্যই বদ ছেলে, খারাপ ছেলে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মনসাতলার মার্বেল খেলা চলছে। শব্দ উঠছে ঠকাস্ ঠকাস্। তেমনি উল্লসিত চীৎকার কানে আসে : উড্ডু কিপ্, হাত ইস্টেট —অন্—কিপ্ টিন—টুয়েন্টি—

তোনা ডাকে, রঘু—রঘু—উ—উ—

মন ছল ছল করে ওঠে—প্রতিজ্ঞা বুঝি আর টেঁকে না। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নেয় রঘু। তারপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে বাড়ির ভেতরে, খিড়কি দুয়োর পেরিয়ে এসে বসে নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। নিজের নিঃসঙ্গতাটাকে কেমন ভালো লাগতে সুরু করেছে আজকাল। বাতাবী গাছের ছায়ায় বসে হলদে পাখির ডাক শোনে, নিজের মনে ব্যাঙের ছাতাগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে, একটুকরো বাঁকারি কুড়িয়ে নিয়ে ওগুলোর তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে দেখে রাজহুঁদের নীচে সত্যি সত্যিই কোনো ব্যাঙ্ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে কিনা।

তারপর আস্তে আস্তে এই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে নিজের একটা নতুন রূপ আবিষ্কার করল রঘু। দুপুরের রৌদ্রে আমবাগানের আড্ডাটা তাকে ডাকল না, ওই রৌদ্রটাই তাকে ডাক দিলে। ঝরাং ঝরাং শব্দ করে যেদিকে কাটিহারের গাড়িগুলো চলে যায়, সন্ধ্যেবেলায় গাঁয়ের লোক শহরের কাজকর্ম শেষ করে জুতো হাতে করে যেদিকে জঙ্গলে ঘেরা মেঠো পথটা দিয়ে অদৃশ্য হয়, আশ্চর্য স্বরে ডাক দিয়ে যেদিকে হলদে পাখি উড়ে যায়—শহর ছাড়িয়ে সেই বুনো বিস্তৃত অজানা রাস্তাটা রঘুর নাড়ীতে নাড়ীতে একটা দুর্বার আকর্ষণ জাগিয়ে তুলল।

রঘু শুনেছে, ওই পথের শেষে, অনেক দূরে আছে কাঞ্চন নদী। বৃষ্টি ধোয়া ভিজে আকাশের মতো ছলছলে নীল তার জলের রঙ, তার পাঁচ হাত নীচে নুড়িগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার দুধারে অনেক দূর অবধি সাদা বালি ঝক ঝক করছে,সেই মিহি মখমলের মতো নরম বালির ওপরে বক আর কাদা খোঁচার পায়ের ছাপে যেন আল্পনা আঁকা। অজস্র বইচির বন সেখানে যেন ফলে ফলে একেবারে ভেঙে পড়তে চায়। তার ওপর দিয়ে রেলের মস্ত বড় পুল—কেউ বলে এক মাইল, কেউ বলে আধ মাইল লম্বা।

ছোট নদী কাঞ্চন—নামটির মতোই মিষ্টি। তবু ওই নদীটাকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত ভয়ের সংস্কার আছে লোকের মনে। তার আশেপাশে বহুদূর জুড়ে একটা নির্জনতা থম থম করে। লোকে বলে কালী বাস করেন নদীর জলে। লোহার পুলটার ঠিক মাঝখানে—যেখানে বড় বড় থামগুলোকে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ী নদীর জল গর্জন জাগিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানে নদীর মস্ত একটা দহ আছে। আর সময়ে অসময়ে সেই দহ থেকে নাকি বিশালকায় একখানা কালীমূর্তি ভেসে ওঠে জলের ওপরে। লক লক করছে তার রক্তাক্ত দীর্ঘ জিহ্বা, তার হাতের খড়্গ থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অমন শান্ত নিরীহ নদী তাই প্রতি বছর দুটি একটি করে নরবলি নেয় দেবীর তৃপ্তির জন্যে, অতি সতর্ক সাঁতারুও কেমন করে যে নদীর জলে ডুবে মরে এ একটা আশ্চর্য রহস্য।

লোকে আরো বলে, এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস পুরোণো—যখন এদিকে প্রথম রেলের লাইন হয় সেই তখনকার কাহিনী। তখন কাঞ্চন নদী এমন করে মরে যায়নি। তার স্রোত ছিল প্রচণ্ড, তার গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মণ পাথর ঢেলেও

কোম্পানি নদীকে কাবু করতে পারল না। স্রোতের মুখে কুটো পড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই রাশি রাশি পাথর কোথায় যে ভেসে যেতে লাগল তার আর ঠিক ঠিকানাই নেই।

তখনকার দিনে ইংরেজ এমন ধর্মান্ধ ছিলনা, তাদের দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল বলে শোনা যায়। তাই সাহেব এঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন দেখলেন, রাত্রির কালো জলের ওপর অষ্টধাতুর একটা কালীমূর্তি শোভা পাচ্ছে। সে মূর্তি সাহেবকে ডাক দিয়ে বললে, আমার পুজো দাও, তাহলে পুল বাঁধতে পারবে। সাহেব প্রণাম করে বললে, আচ্ছা মা তাই হবে, তোমার পুজো দেব।

পুজোর আয়োজন হল। পুরুত এলেন, পাঁটা বলি হল। কিন্তু অমন জাগ্রত দেবতা, তিনি মেটে আর মেঠো-কালীর মতো শুধু পাঁটার মুড়ো চিবিয়েই খুশি থাকলেন না। নিজের প্রাপ্যটা নিজের হাতেই তিনি যথাসময়ে আদায় করে নিলেন।

ঘটনাটা ঘটল এরই দিনকয়েক পরে। জলের ভেতরে কুলিরা মস্ত বড় একটা লোহার কাঁপা চোঙ্ বসাচ্ছিল, ওই চোঙ্টার ভেতর দিয়ে তারা পিলারের গাঁথনি তুলবে। সব ঠিক আছে, দিব্যি সাফসুরুৎ কাজ চলছে—এমন সময় কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, অতবড় চোঙটা দেখতে দেখতে ঠিক দুমিনিটের মধ্যে যেন চোরাবালির টানে নিশ্চিহ্ন হয়ে অতলে মিলিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পনেরো ষোলোজন কুলিরও কেউ সন্ধান পেলনা। সার্থক হল রক্তলোলুপা দেবীর পুজো।

তার পরে বিনা বাধায় পুল গড়ে উঠল। মস্ত বড় লোহার পুল। কেউ বলে আধমাইল, কেউ বলে তার বেশি, আবার কেউ বলে পুরো এক মাইলের কম নয়। ঝম ঝম করে ওর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায়, যাত্রীরা নিশ্চিন্তে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে, কেউ ঘুমোয়, কেউ তাস-পাশা খেলে। এ পুলের ইতিহাস তারা জানেনা।

কিন্তু সেই যে শুরু—সেই থেকেই ধারাটা চলে আসছে। প্রতি বছর কালী তাঁর নিয়মিত বলি আদায় করে নেন। জলবল না থাকলে লোকে নদীতে স্নান করতে নামেনা, একা একা দুপুরে সন্ধ্যায় নদীর কাছে যেতে তারা ভয় পায়। নির্জন বালির চর আর বৈচিত্রহীন নিয়ে রহস্যময়ী কাঞ্চন কলকল্লা ধারায় বয়ে যায়।

ছেলেবেলায় আত্রাইকে দেখেছে রঞ্জু, দেখেছে তিরিশ সালে ক্ষ্যাপা নদীর সেই বানের দৃশ্য। তার রক্তের ভেতরে আমের জামের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীর সুর আছে, সেই জলের গান বাঁধে উল্লসিত ছন্দে। রঞ্জু জলকে ভালোবাসে, নদীকে ভালোবাসে। তাই জলের জাল দিয়ে ঘেরা এই বিচিত্রস্রোতা কাঞ্চনও তাকে ডাক দিলে।

একদিন দুপুরে যখন আবার তেমনি করে ডাক দিয়ে একটা হলদে পাখি পশ্চিমের দিকে উড়ে গেল, তখন রঞ্জু আর থাকতে পারলনা। অবিনাশবাবুর সেই নিশির ডাকের মতো কেমন বিহ্বল হয়ে গেল সে—ছায়ায় ঘেরা বাতাবী লেবু গাছের নীচেকার আসনটি ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

ঘুলোয় ভরা পথটা দিয়ে খানিকটা যখন এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল শাঁতুর ডাক।

—রঞ্জু, এই রঞ্জু!

রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো।

—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

রঞ্জু আর জবাব দিলেনা, নীরবে এগিয়ে চলল।

পেছন থেকে ঠাট্টা করে উঠল শাঁতু: ইস্, বড্ড ভালো ছেলে হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আর কথাই কইবেন না!

রঞ্জু চলতে লাগল। এ ধরণের পথ তার অচেনা নয়, এর সঙ্গে তার শৈশবের নাগীপুর একাকার হয়ে গেছে। এ শহর দুকুন্দপুর নয়, এখানে দোতলা-তেতলা বাড়ি নেই, এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, এখানে পথের পাশে পাশে সরকারী আলো জ্বলেনা। এখানে বন-জঙ্গল, আমের বাগান, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি। রঞ্জুর মনে হারানো দিনগুলোর নেশা লাগল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া মাটির ছোঁয়া লেগে সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

রেল লাইন পাশে রেখে রঞ্জু চলল। বেশ লাগে অজানা পথ দিয়ে চলতে, অদ্ভুত মোহ জাগে একটা। মনের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার কেমন একটা নেশা আছে লুকিয়ে। যা চেনা সে তো চিরদিনই চেনা। তার

ভেতরে বিস্ময় নেই, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে দেখে তুমি বলতে পারো এ আমার—এ একান্তই আমার। এই শহর, এই বাড়ি ঘর, ওই ল্যাম্পপোস্টগুলো, আমের বাগান, ভূপাল রায়ের প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ির পেছনে মজা পুকুর আর আফ্রিকানের সেই অতিকায় জাম গাছটা—এদের ওপরে নিজস্ব কোনো দাবী নেই রঞ্জুর। এ তোমার, এ ঠাকুর—এ আর সকলের। কিন্তু এই পথটা—যা শহরের সীমা ছাড়িয়ে জংলা বাগান, বিলাতী পাকুড়ের বন আর উঁচু নীচু অসমতলের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে, এ পথে আফ্রিকার দুর্গমের ভেতর দিয়ে অভিযানের মতো বিচিত্র আস্বাদন আছে একটা। হয়তো কোনো নতুন ফুল চোখে পড়বে, যা পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি; কোনো নতুন পাখি—যে পাখি দূর মেঘলোকের ওপারে মেঘমালার পুতীর রূপোর দাঁড় থেকে সোনার শেকল কেটে বেরিয়ে এসেছে। এখানে যা দেখবে সব একান্তভাবে তোমার—যা পাবে সব তোমার নিজস্ব। এ পথচলা নয়, এ আবিষ্কার।

চলতে চলতে—বাঃ, এই কি কাকন! এই কি সেই ভবে ঘুম্ ঘুম্ করা আশ্চর্য নদী!

কিন্তু রঞ্জুর ভয় করল না, ছম ছম করে উঠল না শরীর। রঞ্জু আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুপুরের রোদে অনেকটা জুড়ে ধবধবে মিহি বালি রূপোর মতো ঝিকমিক করছে, তার ওপরে দেখা যায় এক ফালি নীল জল। এত শান্ত, এত নিরু যে স্রোত বইছে কিনা সন্দেহ। একটু দূরে রেলের পুলটা টানা রয়েছে, তার বারো আনিই শুকনো ডাঙা বালির ওপর দিয়ে। সব স্বাভাবিক, সব সহজ। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, ঘুটি চারটি করে বালি উড়ছে, ছোট-খাটো দু একটা বালির ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে। ডেকে ডেকে জলের ওপরে ঘুরছে মাছরাঙা। এ নদী ভয় জানায় না, নেশা ধরায়।

গরম বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে চলল রঞ্জু। পায়ের নীচে যেন ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে এমনি মনে হয়। কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না। এগিয়ে এসে জলের কাছে বসল। বসল ঘিঁষে ঘিঁষে নরম বালির ওপরে, জলের ভেতরে পা ডুবিয়ে। পায়ের ওপর দিয়ে তির্ তির্ করে স্রোত বয়ে যেতে লাগল, শির শির করতে লাগল শরীর। কী চমৎকার ঠাণ্ডা জলটা। বসে বসে রঞ্জু দেখতে লাগল কেমন করে এক একটা ছোটো ছোটো রুপোলি মাছ জলের ওপরে অকারণ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠছে, আর কেমন করে মাছরাঙারা মাথা নীচু করে তাদের ওপরে তীরের মতো পড়ছে ছোঁ দিয়ে।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমক লাগল একটা। পেছন থেকে মৃদু গলায় কে ডেকেছে, রঞ্জু।

রঞ্জুর মুখ দিয়ে ভয়-বিহ্বল একটা স্বর বেরুল আপনা থেকেই: মা কালী! কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে তার সাহস হল না—ভয়ে হাত পা পাথর হয়ে আসতে চাইছে।

যে পেছন থেকে ডেকেছিল সে এবার মিষ্টি গলায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

—মা কালী কি রে! এখানে বসে তুই কালী-সাধনা করছিস নাকি?

স্বরটা চেনা। লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল তাদের পাড়ারই একটা ছেলে। পরিমল।

—পরিমল—তুই!

—হ্যাঁ আমি। ভয় নেই—ভূত নই।

—তুই এখানে কেন?

—সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার আগে তোকেই ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

—আমি—রঞ্জু ঢোঁক গিলল একবার: আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

পরিমল আবার হেসে উঠল। তার পর রঞ্জুর পাশেই বালির ওপরে বসে পড়ে বললে, তাই বলে এই দুপুর রোদে! বেড়াবার আর সময় পেলি না নাকি।

রঞ্জু জবাব দিলে না।

তরল গলায় পরিমল বলে চলল, এখানে ভয় আছে, তুই জানিস?

—জানি।

—তবু আসতে ভয় করল না?

—না।

—না কেন?

—এখানে তো ভূত নেই, মা কালী আছে। দেবতাকে কেন ভয় করব?

পরিমল আরো জোরে হেসে উঠল। স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি—এত সহজে ছেলেটা এমন করে হাসতে পারে—আশ্চর্য! বললে, সব গাঁজা, ও-সব বিশ্বাস করিস কেন?

—বা:, দেবতা বিশ্বাস করব না?

—কচু! দেবতা থাকলে তো?

—কী যা তা বলছ সব। এই নদীতে মা কালী আছেন।

—তোর মুণ্ডু আছেন!—পরিমল একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে: আমি তো সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসি এখানে। কোনোদিন কোনো কালী-কালীর টিকির ডগাটিও দেখতে পাইনি। কালী যদি কোথাও থাকে তবে মন্দিরে আছে, এখানে নদীতে ডুবে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে?

কী ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে আছে নাকি! অবাক বিস্ময়ে রঙ্কু তাকিয়ে রইল পরিমলের দিকে! পরিমল হাসছে, কিন্তু জোরে নয়। মৃদু কি মৃদু দুষ্টুমির হাসি।

—তুই তো সাংঘাতিক ছেলে পরিমল।

—সেই জন্যেই তো তোদের ভোনা অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে আমার বনি-বনা হয় না।

কথাটা ঠিক। মনশাতলার ছেলে হয়েও পাড়ার কারো সঙ্গে খুব সদ্ভাব নেই পরিমলের। মাঝে মাঝে আগে মার্বেল খেলতে আসত, কিন্তু এত খারাপ খেলত যে পাঁচ মিনিট পরে ভোনা তার সব মার্বেলগুলো পকেটস্থ করে ফেলত। সেজন্যে কোনোদিন ক্ষোভ করেনি, মুখ কালো করেনি একটুও। তা ছাড়া পাড়ার দলবলের সঙ্গে মেশামেশি তার একেবারেই নেই। তার বাবা শহরের বড় উকিল। মস্ত বাড়ী তাদের। সে বাগানে হরিণ আছে, ময়ূর চরে। বিকেলে দেখা যায় পরিমল আর তার বোন সেই বাগানে হরিণের পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

ভোনা মুখ ভেংচে তার অত্যন্ত রীতিতে বলেছে, ওরা বড়লোক, অহঙ্কারে একেবারে চারখানা হয়ে ফেটে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে ওরা মিশবে কেন?

রঙ্কুরও তাই ধারণা ছিল। সত্যিই কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে পরিমলের, আছে স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমা রেখা—সে রেখা ওরা যেন অতিক্রম করতে পারে না। বয়সের তুলনায় পরিমল একটু বেশি লম্বা—সুন্দর সুগঠিত শরীর, ভোনার একেবারে বিপরীত। টকটকে ফর্সা রঙ, আর রঙটা অত ফর্সা বলেই মাথার চুলগুলো কেমন লালচে, চোখের তারা দুটোয় কপিল বর্ণ। কথা বলার চাইতে হাসে বেশি, আর যখন হাসেনা তখনও চোখ দুটো যেন হাসিতে জল জল করতে থাকে তার। সে বড়লোক—এই অপরাধে ভোনা অবশ্য সুযোগ পেলেই তাকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু পরিমল ভ্রূক্ষেপ করে না—যেন এই সব ক্ষুদ্রতাকে অবহেলা করবার মতো মহত্ত্বের কবচ-কুণ্ডল নিয়েই সে জন্মেছে। তাই পরিমল পাড়ার ছেলে হয়েও পাড়ার সকলের থেকে আলাদা।

এই সময়টুকুর ভেতরে এক সঙ্গে এতগুলো কথা ভেবে নিলে রঙ্কু।

—কিন্তু তুই এখন এখানে কেন পরিমল?

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সে কথা আজ বলব না।

—কেন?

—সময় হয়নি।

—কিসের সময়?

—সব কথা বলবার।

—কী এমন কথা?—রঙ্কুর যেমন বিস্ময় তেমনি কৌতূহল বোধ হল।

পরিমল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল। বললে, আর এখানে বসে রোদে চাঁদি পুড়িয়ে লাভ নেই রঙ্কু। বাড়ির দিকে যাবি তো চল।

নীরবে রঙ্কুও উঠে দাঁড়ালো। পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল না। শুধু তখন যেন মনে হল, পরিমল এমন একটা জগতে বাস করছে যা তার পরিচিত পরিবেশের চাইতে বহুদূরে—যে জগতের দরজা আজও তার কাছে অবরুদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাহিরে শিক্ষকলা প্রচারের জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীর মধ্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় একজন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ইনি নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া মাদ্রাজে যান শিক্ষকতা করিতে। তাঁহাদিগের বহু যাবা

"পল্লীবধূ"

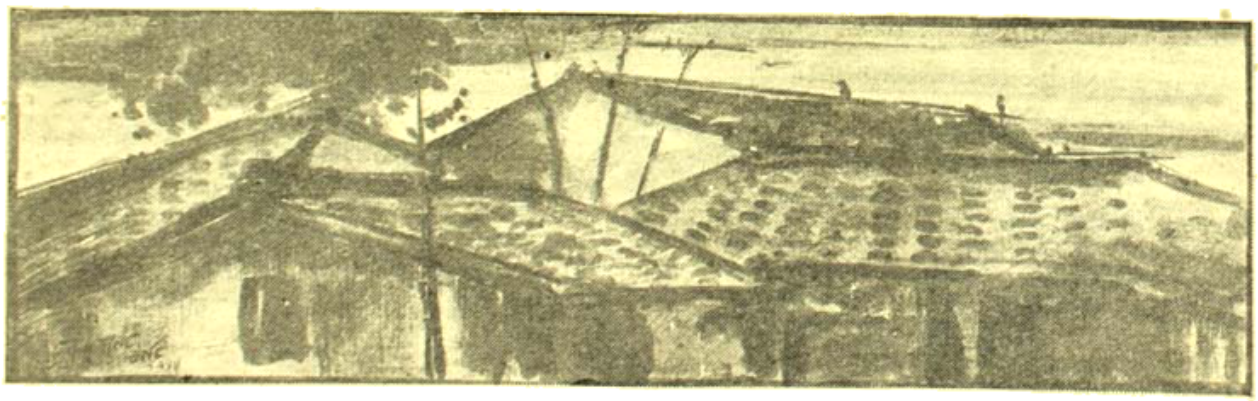

"ধরণী"

বিলাত এবং অন্যান্য আর্টিক অনাইস লণ্ডনের তিনি সসম্মানে আর্টস্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আজ সুশীলকুমারের শিল্প আমাদের দেশের শিল্পী এবং শিল্পরসিক সমাজে সুপরিচিত। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেও ইহার শিল্প দৃষ্টি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

"বোধিসত্ত্বানুম্"—(শিল্পীবন্ধু আবোটের ইঙ্গিত)

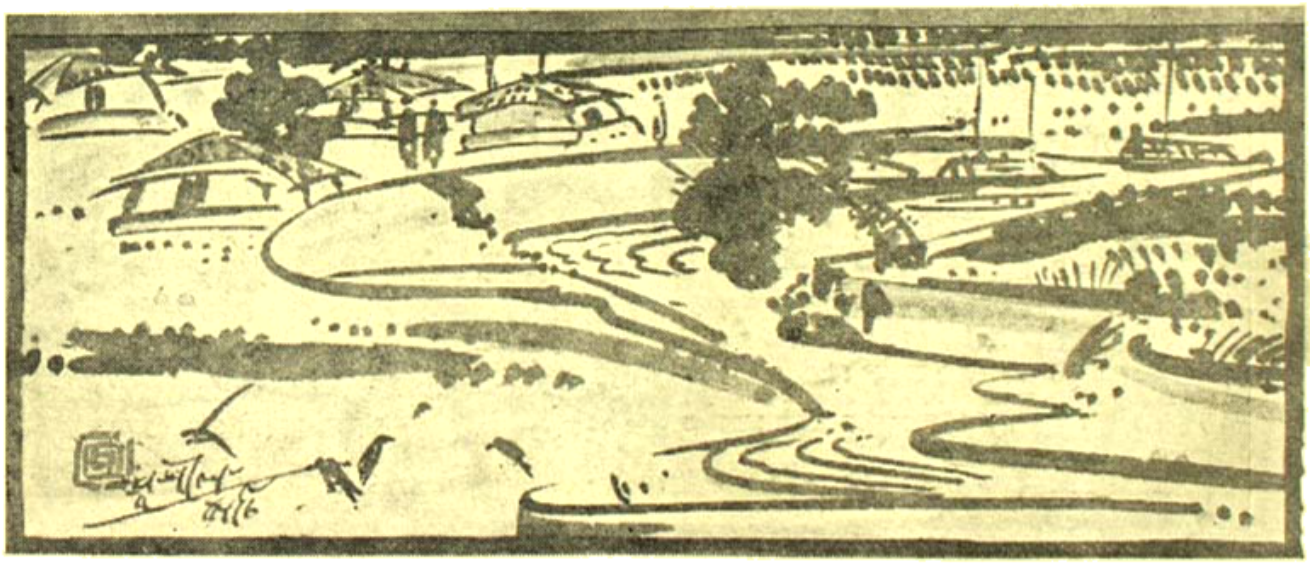

'গ্রাম'

গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সরকার, প্যারিস নগরে ইউনেস্কো (U. N. E. S. C. O) আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য সমসাময়িক বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীদের অঙ্কিত পঞ্চাশটি চিত্র সংগ্রহ করেন। সুধীরকুমারের একখানি চিত্র এই বিশিষ্ট সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি এই চিত্র সংগ্রহ লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিক্ষাবিদের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মন তৈয়ারী করিতে শিল্প শিক্ষা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় সুধীরবাবু কার্যকরী পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ সম্প্রতি মাদ্রাজ শিক্ষা বিভাগ সে bifurcated course in art সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে তাহার অধিকাংশ গৌরব সুধীরকুমার দাবী করিতে পারেন। এই ব্যাপারে মাদ্রাজ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ প্রাদেশিকতার ঝাপসা পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকুশলতার অন্ধবিচার না করিয়া বাঙ্গালী শিল্পী সুধীর-কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতামত এবং সাহায্য গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। প্রবাসে মাদ্রাজের বাধা বিপত্তি এবং বিরুদ্ধ ভাব ও মতের মধ্যে থাকিয়াও সুধীরবাবু মাদ্রাজের শিল্পী, শিল্পরসিক—শিক্ষিত এবং রঞ্জিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান গঠন করিয়াছেন, তাহা ইঁহার কর্মকুশলতা ও নিভীক চরিত্রের পরিচায়ক।

পাশ্চিম সাফল্য এবং লোকখ্যাতি কেহ উহাদের শিল্পীর কর্মজীবনে অন্তরায় ঘটাইয়াছে। সুধীরকুমার এবিষয়ে সচেতন। তাঁহার মত "জন সমাজে পরিচিত হওয়া একটা বিরাট কিছু নয়। সত্যকার শিল্পী শুধু বিজ্ঞাপন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার অবিমিশ্র আনন্দ,

শিল্পী শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

—বিশেষ সাফল্য হ'ল সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে। মনের মতকাজই যদি করতে না পারলাম, ত হাজার লোকের সভা বাহবাতে কি মন ভরে?"

এই সঙ্গে আমরা সুধীরবাবুর যে সকল কালোদাগায় অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রকাশ করিলাম তাহা তাঁহার একেবারে আধুনিক কালে না হইলেও—বৈচিত্র্য ও ঘনিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ।

"আলো আঁধার"

সেনবংশের প্রাচীন রাজধানী

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম-এ

বাংলার ইতিহাসে সেন নৃপতিগণের রাজ্যকাল একটী গৌরবময় অধ্যায়। পাল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেন প্রভুত্ব বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয় সেন সেন-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা কর্ণাট দেশ হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়া রাঢ় অঞ্চলে বসতি করেন এবং পাল রাজগণের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হন।

রাঢ় দেশে ইঁহাদের রাজধানী কোথায় ছিল? সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিতে পালনৃপতিগণের সামন্ত স্বরূপে বিক্রমপুরের অধিপতি বিজয় রাজের নামোল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, বিক্রমপুরপতি বিজয়রাজ ও বিজয় সেন অভিন্ন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের শিলালিপির ১৯ সংখ্যক শ্লোকও এই মতের সমর্থন করে।

এক্ষণে বিজয় বিক্রমপুর রাঢ়-দেশের কোন অংশে অবস্থিত ছিল।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে কাটোয়ার নিকটে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সীতাহাটী-নৈহাটী গ্রামে যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় তাহাতে লিখিত আছে যে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজত্বের একাদশবর্ষে বিজয়পত্নী ও বল্লালজননী পূরবংশোদ্ভবা রাজ্ঞী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্ব-মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী বালহিট গ্রাম শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করেন। বালহিট গ্রামের বর্ত্তমান নাম বাসুটিয়া; ইহা সীতাহাটী হইতে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন হইতেই ইহাই অনুমিত হয় যে, রাজমাতা বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াই উক্ত দানকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে যে তিনি বিক্রমপুর হইতেই স্নান করিতে আসিয়াছিলেন—কেন না রাঢ় দেশের অনেক স্থানের লোকই গঙ্গাস্নান করিতে আজিও সীতাহাটী আসিয়া থাকেন। এই অনুমান হইতেই ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বিক্রমপুর এমন কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল যেখান হইতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে সীতাহাটী আসিতে হইত। আরও উক্ত বিক্রমপুর যখন রাঢ় দেশের অন্তঃপাতী তখন উহা সীতাহাটীর পশ্চিমেই হইবে এবং সীতাহাটী হইতে অধিকতর পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়ারই সম্ভাবনা; কেননা তখনকার দিনে রাজধানী সাধারণতঃ নদীতীর হইতে অধিকদূরে স্থাপিত হইত না—হইলে যাতায়াতাদির বড়ই অসুবিধা হইত।

সীতাহাটী হইতে সাত-আট মাইল পশ্চিমদিকে নিরোল বা নিড়োল নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি সমৃদ্ধ ও তরুকলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে আহম্মদপুর কাটোয়া রেল পথের একটী ষ্টেশনও আছে। অনুমান হয় নিড়োলই প্রাচীন বিক্রমপুর। বিক্রমপুর হইতে হইয়াছে নিমুল—তাহা হইতে নিরোল এবং তাহা হইতে নিড়োল।

আমি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়কে এ বিষয় জানাইয়াছিলাম—তিনি তদুত্তরে আমায় লিখিয়াছেন যে, "বিক্রমপুর অতি স্বাভাবিক ভাবেই "নিড়োল"-এ পরিণত হইতে পারে।

নিড়োল ব্যতীত এতদঞ্চলভুক্ত আরও কয়েকটী স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে যে নৈহাটী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছি ইহাতে কোনও এক নৃপতির রাজধানী ছিল তাহার কিছু ধ্বংসাবশেষ আজিও পাওয়া যায়। ইহাকে গোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ রাজা রঘুনন্দনের দেব কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া নৈহাটী গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও চৈতন্য-চরিতামৃতে স্বীয় জন্মভূমি ঝামটপুরের পরিচয় প্রসঙ্গে নৈহাটীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নৈহাটীর রাজপ্রাসাদ সেন নৃপতিগণের ছিল অথবা রঘুনন্দনের রাজের ছিল ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হওয়া উচিত।

ল'ড়েই লহ ইন্দ্রপ্রস্থ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

স্বর্ণ লঙ্কা খাকিয়ে রাবণ চালিয়েছিল বেশ
যতদিন না হরণ ক'রে ঘরলো সীতার কেশ;
"অতিদর্পে হত লঙ্কা" সাক্ষ্য রামায়ণ—
মহাভারত ঐকতানে "দামাল! দামাল দুঃশাসন!"
যাজ্ঞসেনী মুক্ত বেণী—কোথায় গো ভীমসেন?
শ্রীভগবান্ সারথি কই? "আসবো" বলেছেন।
আগো দেশের জড় ভরত, তোলো লঙ্কা জয়
'জাতিস্মর' না হয়ে, হও বিজাতীয় বিষয়
রাজ্য তরে ঘুনোঘুনি এ কবে নূতন
কিন্তু এ যে বুদ্ধিক বৃত্তি—কাড়ুক, পলায়ন!
তেজস্বী যে, ধর্ম্মাত্মা সে হোক্ না, নাহি ভয়
বীরের মত লড়াই করে করুক বিধ্বস্ত!
কাঁদাও কেন না ধরিত্রীকে, বাজাও শিঙ্গাকেই;
শান্তি প্রিয় নিরীহ যে—দুঃখে এবিভেই?
সাজাও চমূ, বাজাও ভেঁপু, নাচাও সৈন্যদল,
দুষ্পুস্থ যে মিটাও তাহার বুকের বাবানল—
কাজ নেই শান্তি প্রিয়ে, নারী, শিশু, বুড়ায়,—
ল'ড়েই লহ' ইন্দ্রপ্রস্থ, উড়ুক রাখো চূড়ায়।

বিচারের ঘণ্টা

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

মুঘল সম্রাট জহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) 'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী' সংজ্ঞক স্বরচিত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, সিংহাসনলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি একটি ঘণ্টাসংযুক্ত শৃঙ্খল ঝুলাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। শৃঙ্খলটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত এবং ত্রিশ গজ দীর্ঘ ছিল; উহার সহিত বাটটি ঘণ্টা সংলগ্ন ছিল। উহার ওজন ছিল তাহারই মাপের চারি মণ এবং ইরাক দেশের মাপের বিয়াল্লিশ মণ। শৃঙ্খলের একদিক আগ্রাদুর্গের শাহীবুরুজের প্রাকারে আবদ্ধ করা হয় এবং অপরদিক যমুনাতীরবর্তী একটি শিলাস্তম্ভে সংবদ্ধ থাকে। বাদশাহের উদ্দেশ্য ছিল যে, বিচার-বিভাগের কর্মচারীরা যদি সুবিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের অভিযোগ সম্পর্কে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে অথবা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়, তবে সেই প্রার্থীরা শৃঙ্খলটি আন্দোলিত করিয়া সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। ফুলাম হুসেন রচিত 'সিয়র্-উল্-মুতাখেরিন্' হইতে জানা যায়, ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট মুহম্মদশাহ্ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) জহাঙ্গীরের অনুকরণে অনুরূপ একটি সুবিচারের শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সহিত একটি ঘণ্টা সংবদ্ধ করা হয়। শৃঙ্খলটি অষ্টকোণ বুরুজের বহির্ভাগের নবীতীরবর্তী অংশে ঝুলান হইয়াছিল। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা পাইত, তবে সে ঐ শৃঙ্খল টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতে পারিত। ঘণ্টাধ্বনিতে বাদশাহের মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। তিনি বিচারার্থীকে ডাকাইয়া তাহার অভিযোগের শুনানীর ব্যবস্থা করিতেন।

কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, সুবিচারের প্রলোভনে ঘণ্টাসংযুক্ত শৃঙ্খল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্রাট জহাঙ্গীরের স্বকপোলকল্পিত। আবার অনেকে মনে করেন যে, তিনি পারস্য বা ইরাক দেশের অনেক প্রাচীন নরপতির অনুকরণে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুইটি সিদ্ধান্তের কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জহাঙ্গীরের পূর্ববর্তী জনৈক ভারতীয় মুসলমান নরপতি কর্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি বাদশাহীর সুলতান ইল্‌তুৎমিশ (১২১১-৩৬ খ্রীঃ)। সুলতান মুয়িজ-বিন্-কুলুকের (১২৪৫-৫১ খ্রীঃ) শাসনকালে ইব্‌ন্-বতূতা নামক একজন মরোক্কো দেশীয় পর্যটক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সুলতান ইল্‌তুৎমিশ কর্তৃক বিচারের ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইল্‌তুৎমিশ প্রথমে আদেশ দেন যে, অবিচারপীড়িত ব্যক্তি স্বর্ণ পরিমাণ পরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রাসাদে সাধারণতঃ শ্বেতপরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত বলিয়াই ঐরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কার্যকারিতায় সুলতান সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি প্রাসাদের দ্বারদেশে দুইটি শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সিংহস্থাপন করেন। সিংহদ্বয়ের গলদেশে একটি লৌহশৃঙ্খল সংবদ্ধ হয় এবং উহাতে একটি বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত হয়। অবিচারপীড়িত ব্যক্তিগণ রাত্রে প্রাসাদের সিংহদ্বারে আসিয়া ঐ ঘণ্টা বাজাইত। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র সুলতান বিচারার্থীর সন্ধান লইতেন এবং তাহাকে সুবিচারে সন্তুষ্ট করিতেন।

সুবিচারের কাহিনীগুলি হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের মুসলমান রাজগণ অনেকে সুবিচার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই। অবশ্য তাঁহাদের বিচার-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মীদিগের প্রতি পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, সুবিচার আয়াসলভ্য করিবার উদ্দেশ্যে ঘণ্টাস্থাপনের ব্যবস্থা আধুনিক মানবকে ক্রটিবিমুক্ত বলিয়া বোধহয় না। কারণ প্রবলকর্তৃক অত্যাচারপীড়িত দুর্বলের পক্ষে বিচারের ঘণ্টা বা তৎসংলগ্ন শৃঙ্খলের নিকটবর্তী হওয়ার বাধা সৃষ্টি করা সর্বক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল, এরূপ মনে করা কঠিন। যাহা হউক, অদ্যতনের মানবকে বিচারের ঘণ্টা স্থাপনকে উৎকৃষ্ট বিচার ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যায়। সুতরাং যে সকল মুসলমান নরপতি উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রশংসার্হ। যদি তাঁহাদিগকে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভাবয়িতা প্রমাণ করা যায়, তবে তাঁহারা অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বিচারের ঘণ্টা স্থাপন মুসলমান বিচারব্যবস্থার উপর ভারতীয় প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভারতে এবং ভারতীয় সভ্যতায় সমৃদ্ধ প্রাচ্যদেশসমূহে যে বিচারের ঘণ্টা স্থাপন বহু পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। সুতরাং বিচারের ঘণ্টা উদ্ভাবনের প্রশংসা প্রাচীন ভারতীয় রাজগণের প্রাপ্য।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ ন্যায়বিচারকে প্রজাপালক নরপতির সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলিয়াছেন, "উপস্থানগতঃ কার্য্যার্থিনামর্থান্ পশ্যেৎ। দুর্দর্শো হি রাজা কার্য্যাকার্যবিপর্য্যাসম্ আপ্নোতি কার্যতে। তেন প্রকৃতি কোপম্ অরিপরবশং বা গচ্ছেৎ।" অর্থাৎ, "সভাসীন রাজা বিচারার্থী ব্যক্তিগণকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন না। রাজদর্শন যদি প্রজাবিগের পক্ষে দুর্লভ হয় এবং রাজকার্যের ভার সহকারী কর্মচারিবর্গের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তবে বিচারাদি কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ফলে রাজাকে প্রজার বিরাগভাজন এবং শত্রুর বশবর্তী হইতে হয়।" এই উচ্চ আদর্শ কার্যে পরিণত করার জন্য অনেক প্রাচীন ভারতীয় নরপতি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী' সংজ্ঞক কাশ্মীরদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংকলিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কাশ্মীরপতি ধর্ম (১০৮৯-১১০১ খ্রীঃ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—

সিংহদ্বারে মহাঘণ্টাশতুর্দ্দিগবস্থতং।
জাতুঃ বিচারিকামান্ স প্রাপ্তাংস্তান্তনংজ্ঞয়া।
আর্ত্তাঃ চ যাচবাকর্ণ্য তেষাং দুঃখানিবারণম্।
প্রাবৃষেণ্যঃ পয়োবহ্নেস্তোকানাবিষাকরোৎ।

অর্থাৎ, "রাজা দুর্বের প্রাসাদের সিংহদ্বারে বিশাল ঘণ্টাসমূহ লম্বিত ছিল। বিচারার্থী প্রজাগণ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা রাজদর্শন কামনা বিজ্ঞাপন করিত। গ্রীষ্মকালীন মেঘ যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের পিপাসা নিবারণ করে, সেইরূপ প্রজাগণের আর্ত্তরাব শ্রবণমাত্র রাজা হর্ষও তৎক্ষণাৎ তাহাদের অভাবনিধান করিতেন।" কাশ্মীরপতি হর্ষ প্রজাপালকের ভারতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, 'রাজ-তরঙ্গিণী'র বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় নরপতিকেও তাঁহারই ন্যায় বিচারের ঘণ্টাবন্ধন করিতে দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলের প্রচলিত বৌদ্ধকাহিনীসমূহ সঙ্কলিত করিয়া 'মহাবংশ' নামক পালি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে এড়ার নামক জনৈক সিংহলপতির বিবরণ লিখিত আছে। এড়ার চোলদেশ অর্থাৎ আধুনিক তাঞ্জোর-ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চলের অধিবাসী এবং তামিল অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতীয় ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৪৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন এবং আনুমানিক ১৩১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ধার্ম্মিক রাজা এড়ারের সভার দ্বারদেশে একটি ঘণ্টা সংবদ্ধ ছিল; ঐ ঘণ্টাসংলগ্ন একগাছি সুদীর্ঘ রজ্জু প্রাসাদের বহির্ভাগে লম্বিত ছিল। যে কেহ সুবিচারের প্রার্থী হইয়া রজ্জু আকর্ষণপূর্ব্বক ঘণ্টাটি বাজাইতে পারিত। রাজা এড়ারের ন্যায়বিচার এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। একদা রাজা এড়ারের একমাত্র পুত্র রথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথে বৎসসহ একটি গাভী বিশ্রাম করিতেছিল। সৈরন্ধ্রে রাজপুত্রের রথচক্র বৎসটির গ্রীবার উপর দিয়া চলিয়া যায়। ফলে উহার মৃত্যু ঘটে। পুত্রশোকে অধীর হইয়া গাভীটি রাজার ঘণ্টাবিলম্বিত রজ্জু আকর্ষণ করিল। রাজা এড়ার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপরাধী পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রাজপুত্রকে রথচক্রের নীচে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। একবার এক সর্প তালবৃক্ষে উঠিয়া একটি পক্ষিশাবক ভক্ষণ করিয়াছিল। শোকাতুরা পক্ষিমাতা রজ্জু টানিয়া ঘণ্টা বাজাইল। রাজা সর্পটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উহার উদর হইতে শাবকটিকে বাহির করিলেন। আর একদিন এক বৃদ্ধা বিচারের ঘণ্টা বাজাইল। রাজা এড়ার বৃদ্ধার অভিযোগ শুনিয়া জানিলেন যে, বৃদ্ধা কিছু তণ্ডুল রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিল; কিন্তু অকালবৃষ্টিতে অকস্মাৎ উহা ভিজিয়া যায়। রাজা স্থির করিলেন, তাঁহারই কোন পাপের ফলে অকালে বৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি উপবাসের দ্বারা পাপক্ষালন করিলেন। অতঃপর শক্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন যে, রাজা এড়ারের রাজ্যে সপ্তাহে মাত্র একবার রাত্রিকালে বৃষ্টি হইবে। উল্লিখিত কাহিনীগুলি সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক না হইতে পারে; কিন্তু উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'মহাবংশ' রচিত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলদেশে বিচারের ঘণ্টা কখন অজ্ঞাত ছিল না।

দক্ষিণ বিকৃষ্ণিত সিংহলের ন্যায় পূর্ব্বদিকের হিন্দুচীন ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহেও প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে যেমন সুবিচারক নরপতি কর্ত্তৃক ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী দেখিতে পাই, হিন্দুচীনের অন্তর্গত চাম্প ও ব্রহ্ম দেশের ইতিহাসেও তদ্রূপ উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চাম্পদেশের সুপৌধে অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয় নরপতি রামরায় বা রাম কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিচারের ঘণ্টা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মদেশের তুংগুরাজবংশে অনব্রপেৎসুন্ (১৩০৪-২৮ খ্রীঃ) নামক জনৈক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি মুঘল সম্রাট্ জহাঙ্গীরের সমসাময়িক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, জহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বিচারের ঘণ্টা সংযুক্ত স্তম্ভ স্থাপনের প্রায় ১৭ বৎসর পরে, ব্রহ্মরাজ অনব্রপেৎসুন তদীয় রাজধানী পেগুনগরস্থিত রাজপ্রাসাদে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বন্ধন করেন। উহার গাত্রে ব্রহ্ম ও ইংরাজ ভাষায় লিখিত ছিল যে, যে কোন বিচারপ্রার্থী ঐ ঘণ্টা বাজাইয়া রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদিও হিন্দুচীনের রাজগণ পূর্ব্ব হইতেই বিচারের ঘণ্টা স্থাপনের প্রথা অবগত ছিলেন, তবুও জহাঙ্গীরের ঘণ্টা বন্ধন বার্ত্তা ব্রহ্মরাজ অনব্রপেৎসুনকে আংশিক ভাবেও প্ররোচিত করে নাই, একথা জোর করিয়া বলা সম্ভব নহে। কারণ এই সময় ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বণিক্‌দের দূতগণ অম্বেপুরনিবাসী আগাধে মুঘল সম্রাট্ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। যাহা হউক, অনব্রপেৎসুন কর্ত্তৃক স্থাপিত বিচারের ঘণ্টাটির প্রতি অদৃষ্ট বিরূপ ছিল। অনধিক কাল পরে আরাকানের অধিপতি থিরিধুম্ম অর্থাৎ শ্রীসুধর্ম্ম (১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) পেগু অধিকার করেন। বিচারের ঘণ্টাটি তৎকর্ত্তৃক আনীত হইয়া তদীয় রাজধানী মোহংএর একটি মন্দিরে স্থাপিত হয়। কথিত আছে, প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রিটিশপক্ষীয় অযোধ্যাবাসী সেনাদলের জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী ঐ ঘণ্টাটি মোহং হইতে ভারতবর্ষের আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলিগড় শহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

ডাক্তারের মুখে যুধিষ্ঠিরের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কথা শুনে মাণিক স্তম্ভিত। বলবার কিছু না পেয়ে কেবল বললে—"বলেন কি? wonderful lampকেও নিবিয়ে দিলে যে!—তারপর?"

বিনোদ হেসে বললে—"এখনো তারপর? তারপর আর শুনে কাজ কি—সে আরো wonderful—এখন কম্বলখানা মেঝেয় পেতে যাও—একটু গড়াই। জেলে তো আর খাট বিছানা কেউ দেবে না!"

মাণিক ভেবড়ে গেলো। শেষে বললে—সে চিন্তা করছি না Sir, ভগবানের দয়ায় যে বাসা খুঁজে বার করতে পেরেছিলুম, সে জেলের ওপর বার। কোথাও আমাদের আর কষ্টের কারণ হবে না। যাক্—তারপর যুধিষ্ঠির কি বললে, সেইটাই বলুন।"

"বলেছি তো—সে আরো wonderful। বিপদে ভদ্রলোকে যেমন অভয় দেয়, উৎসাহ দেয়—যুধিষ্ঠির ভদ্র না হলেও, ভদ্রতা জানে, রাখেও। সে বললে—'কোন' চিন্তা রাখবেন না, ভাববেন না। আমি আছি, ওসব ঠিক্ হয়ে যাবে।—শুনলে? পাপীও রামনাম করে!"

মাণিক সোৎসাহে বললে—"তবে আপনি এতো ভাবছেন কেনো?"

তার কথা শুনে বিনোদ এবার সত্যই বিরক্ত হয়ে বললেন—"তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি? তুমি আমাকে ওই খুনে দুরাত্মাদের বিশ্বস্ত এজেন্টের কথা বিশ্বাস করতে বলো নাকি?—যে লোক আমাকে চোর প্রমাণ করবার ভার স্বীকার করে এখানে এসে রয়েছে ও আমার পশ্চাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলের মতো টাকা ছড়াচ্ছে—আবশ্যক নরহত্যা পর্য্যন্ত যাদের সংজ্ঞাসাধ্য, তোমার যুধিষ্ঠির তাদেরি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। যাদের ওই সব কার্য্যসিদ্ধির ওপর মান মর্য্যাদা, মাইনে বাড়ে—উন্নতি নির্ভর করে, তাদেরই একজন আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে, অভয় দিয়েছে। তা জেনেশুনেও তুমি বলছো—"তবে এত ভাবছেন কেনো?" বেশ, তাহলে আমাকে মেনে নিতে হয়—নির্ভাবনায় থাকাই আমার উচিত। এই না?"

মাণিক করজোড়ে সবিনয়ে বললে—"আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তা হ'লে আমি এখনো তাই বলবো Sir—না হয় চুপ করেই থাকবো। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আপনি যেমন একটা অনুমানসিদ্ধ কথা শুনিয়েছেন—"ও অপয়া হার যদি কোনো বেগমের হয়—ও তা চুরি গিয়ে থাকে এবং তিনি ওটাকে তাঁর হার বলে নিজে সাক্ষ্য দেন, তার পর আর প্রমাণের প্রশ্ন থাকে কি" ইত্যাদি। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমিও বলি—"বেগম যদি বলেন"—কিছুদিন পূর্ব্বে আমার যখন কঠিন ব্রংকাইটিস হয়, আমি ডাক্তার বিনোদবাবুকেই call দিয়েছিলুম (ডেকে ছিলুম); তিনি বিশেষ যত্নে আমাকে রোগমুক্ত করেন। তখন আমার গলায় ওই হারছড়াটি থাকতো। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে—আমি খুশি হয়ে, তখনকার মতো তাঁকে সেই হার present করি—উপহার দি, ও অনেক করে' তাঁর পত্নীর ব্যবহারের জন্যে তা নিতে রাজি করি'। অমন নিঃস্বার্থ অমায়িক মানুষ আমি দেখিনি;" ইত্যাদি। তাতেও প্রমাণের প্রশ্ন আর থাকে কি? সে কথা আপনিও বোঝেন, সাহেবও বুঝবেন।—যাক্, এ সব বাজে কথা—অনুমানের বৃথা কথা আর বাড়াবেন না। মায়ের কৃপায় সব মিটে যাবে, ওসব কিছুই হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"অর্থাৎ—যুধিষ্ঠিরের অভয়বাণী স্বীকার করে' শুয়ে পড়ি।"

"ক্ষমা করবেন, আমি এখনো তাই বলব Sir—"

ডাক্তার সত্যই একটু চিন্তিত হলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করলেন—"কারণ?"

মাণিক ইতস্ততঃ না করেই বললে—"সেটা কিন্তু এ মুখের মুখে শোভা পায় না। আপনার অনুমতি পেয়ে বলছি। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নয়।"

"বেশ—তাই বলো—আমি উৎকর্ণ।"

মাণিক আরম্ভ করলে—"শুনেছি যারা অতি বড় পাষণ্ড নরপিশাচ, যাদের কোনো অমানুষিক কাজই আটকায় না, হত্যাকাণ্ড যাদের কাছে খেলার মতো, তারা নিজেকে বীর ভেবেই থাকে, সেই গর্বই তাদের সবার বড় সম্পত্তি। প্রাণকেও তুচ্ছ করে—তা রক্ষা করে। হঠাৎ কোনো বিপদের বাধা প্রাণে আঘাত দিলে, আকস্মিক মুহূর্তে সাময়িক মোঁকের বশে তাকে অভয় দিয়ে ফেললে জীবনপণে তা রক্ষা করে। সে যে কথা দিয়ে ফেলেছে—বীরের কাছে কথা দিয়ে ফ্যালা মানেই কথা রাখা—এই বীরমনই পোষণ করে ও পালন করে। নইলে সে কিসের বীর? ভবিষ্যতের চিন্তা তারা রাখে না—ততো হিসিবি বুদ্ধি তারা ধরে না। দিয়ে ফেলা কথা তাকে রাখতেই হয়—সোজাসুজি এই—"

—"তার পর লীলাময় আছেন, তখন তাঁর রহস্য আরম্ভ হয়। সেই খুটো বীরকে 'সত্য' পেয়ে বসে! বিপন্নকে শান্তি দিতে গিয়ে বা দিয়ে, সে তখন এমন একটা শান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে থাকে, যার সুখাস্বাদ তার ভাগ্যে পূর্বে কোনোদিন ঘটেনি। সে ভাবে—এ কি! এতদিন অ্যাতো বড় বড় ভীষণ ভীষণ কাজ করেও এমন আনন্দ তো কোনো দিন সে পায়নি! এর মানে কি? একজনকে বিপদ মুক্ত করা—এই সামান্য কাজে এমন আরাম কোথা থেকে এলো!" এই ভাবে তার প্রথম পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই নাকি স্বাভাবিক।

—মনে হয় যুধিষ্ঠির আপনাকে বাঁচাবে, নিজেও বাঁচবে, তাই আপনাকে বার বার বলেছে—নিশ্চিন্ত থাকুন। এই আমার ধারণা Sir—যে হত্যাকারী বা মহাপাপী, মূর্খতা-বশতঃ নিজেকে বীর ভেবেছে সে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে মিথ্যাকথা কয়ে বাঁচতে চায় না, ছোট হয় না, বীরের গুমোর বজায় রাখে। আপনি "নিশ্চিন্তই" থাকুন।

ডাক্তার মাণিকের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বললেন—"কবে কার কাছে এত শিখলে? শুনে আমি সত্যই বড় খুশী হয়েছি। গুরুটা কে?"

"আমার সবই আপনি। নিজের বেলা এত ভুলে যান কেনো, এই তো সেদিনের কথা। সিভিল সার্জনের কথা শুনে এসে—"

"থাক হয়েছে। সময় মতো কত কি বলতে হয়। যাক্ তুমি তো এতক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে বীর বানালে, কিন্তু তারা কথা দেয় কারুক? কেনো? যাকে তাকে নাকি?"

"তা কি সম্ভব হুজুর? যাকে তার ভালো লেগেছে, মনে ধরেছে। সেখানে ও প্রশ্ন থাকে না, বিচারও থাকে না। ওসব লোক যে স্বাধীনপ্রকৃতি রাখে—"

বিনোদ বললেন—"হয়েছে, এখন কম্পটা তুলে যাটেই পাতো। তিনটে বাজলে আমাকে তুলে দিও। সাহেবের কাছে একবার Finalটা শুনে আসতে চাই, তারপর আমারও Final."

বেলা তিনটের পর মাকে স্মরণ করে ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন।—"তবে হয়ে আসি মাণিক?"

"যাবেন বইকি, ভালো খবরই পাবেন।"

"আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। মোঁকা দিতেও অমন আর দুটি নেই।" বলে' হাসতে হাসতে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

মাণিক আপন মনে—"এমন মানুষের এ কি দুর্ভোগ?" মাণিক চোখ মুছলে।

পথে বেরিয়ে ডাক্তারের মনেও—সেই মাণিক।—"তাকে কি এই জন্যই এনেছিলুম? তার তরে যে কত কি ভেবেছিলুম! তার পরিণাম কি এই! আমার জন্যে সে যেন না বিপন্ন হয় মা। তুমি কি তার মুখ দিয়ে, যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে কথাগুলো আমাকে শোনালে?

পথে কে দু'জন লোক কথা কইতে কইতে ষ্টেশনের দিকে চলেছিলেন। একজন কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। অপরটি কত পা বাড়াতেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন—"ভুলনা, ওর একটি কথাও মিথ্যা নয় জেনো।"

শুনে বিনোদ চমকে গেলো—ও কি আমাকেই শোনালে?" বিনোদ বিভ্রান্তের মতো এগুলেন।

হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে কানে এলো—এই যে, নমস্কার। কবে এলেন ডাক্তারবাবু?

"একি—কিশোরী? কেমন আছ ভাই? শুনলুম সাহেব এসে গেছেন, আমার দেরী হল' নাকি?"

"না, ঠিকই এসেছেন। সাহেব নামেমাত্র গিয়েছিলেন। প্রায় দু'ঘণ্টা হবে—মেমসাহেবকে নিয়ে ফিরেছেন। তাঁরে

কলকেতার হাঁসপাতালে রেখে এসেছেন। তাঁর নিদ্রা নাকি একেবারেই নেই! সাহেব সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন। ঘোরাঘুরিও তেমনি বেড়েছে, একদণ্ড স্থির নন্। চাকরীও বেড়েছে।"

"আমাকে খুঁজেছিলেন কি?"

সেলসাহেবকে আনবার পরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ডাক্তারবাবু এসেছেন কি?"

ডাক্তার চিন্তিতভাবে বললেন—"এতো কি কাজ পড়লো কিছু জানো?"

"তা ঠিক জানি না। মাতালের অসুখই প্রধান বলে' মনে হয়। বলেন কি—বৎসরাধিক তাঁর নিদ্রা নেই, কত বড়ো চিন্তার কথা। তবে হ্যাঁ—এর মধ্যে দু'দিন আপনাদের বোর্ডের সেই চেয়ারম্যান এসেছিলেন বটে, তাঁকে নিয়েও বেরিয়েছিলেন। সাহেবকে খবর দেবো কি? দেখা করবেন তো?"

"অমনভাবে জিজ্ঞাসা করলে সে?—সেলাম দিতেই তো এসেছি।"

কিশোরী তাড়াতাড়ি বললে—"দেবেন বই কি, নিশ্চয়ই দেবেন। এসময় তাঁর প্রাইভেট কানবার একজন আছেন কি না, প্রায়ই থাকেন—তাই। ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর তিনি যান। তাঁর যাবার সময়ও হয়েছে। আপনি এসেছেন শুনলে—"

ডাক্তার চিন্তিতভাবে—"নিত্য আসেন? কে বলো দিকি? কোনো অফিসার নাকি? কোন' সাহেব?"

কিশোরীর মুখে এতক্ষণে হাসি এলো, বললে—তাঁর কাছে আমরাই সাহেব। এমন কালো লোক দেখেনি!

জুতোর শব্দ শুনে—"সাহেব আসছেন বোধ হয়। জানেন তো আগন্তুকদের এগিয়ে দেওয়া সাহেবের অভ্যাস। আপনি থাকুন—আমি একটু সরে যাই।"

যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি অন্যমনস্ক। ডাক্তার থাকতে না পেরে দ্রুত এগিয়ে—"একি, আপনি এখানে?" বলেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

বললেন—"আমাকে খুঁজতে নাকি? আমি এখানে তাই বা আপনি জানলেন কি করে?"

তিনি বললেন—"আমি না জানি, ভাগ্য তো সঙ্গে রয়েছে, তার ত অভাব নেই। জানতুম রিটায়ার করা মানে কাজকর্ম্মের শেষ, অর্থাৎ খতম্। তারপর বেশীদিন বেঁচে থাকাটাই দুষ্কৃতি। পাপ বলতেও পারো। এটা আমার তারি সাজা ভোগ হে। ছেলেপুলে নেই তাই রক্ষে, নইলে তাদের কোলে কাঁখেই দিন কাটতো—"মিনসে বসে বসে খাবে কেনো" সে মধুর কাকুলি ত শুনতেও হোত—

—কিন্তু এ কি করলে বলো দিকি—তোমাদের ওই কিশোরীটি?—শান্তিপুরে থাকতে কিছুদিন আমার কাছে পড়া বলে দিতে আসতো, "Moral class book" পড়তো। তখন ওই বইখানির চলন বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই ছিল—ইংরেজদের বিষ্ণুশর্ম্মার বুলি বা হিতোপদেশ। সেই শান্তিপুরের কিশোরী কিনা এতদিন পরে তারি শোধ তুললে, এই অশান্তিকর immoral কাজ করলে। তোমাদের সাহেবের নামের হরে, আমার মাষ্টার বলে এই আখেরটি করলে। আমাকে তাঁর একটা বেয়াড়া কাজে জুটিয়ে দিলে।

—"আমি আর ও কাজ করব না, এখানেও থাকব না, বলায়—ভর দেখিয়ে আমার হিতার্থীর মতো, নথা সদুপদেশ আরম্ভ করে দিলে! তার মর্ম্মটাই আমার সহজ ভাষায় তোমাকে বলি। তার সে জোষ্ঠতাতামির ভাষা আমার আসবে না, তুমিও বুঝবে না। বললে—"খবরদার অমন ছেলেমানুষী করবেন না। সাহেব অতি চমৎকার লোক, কিন্তু রেজিমেণ্টের O/C, 'ওসি' বোঝেন তো! কিছুদিন চুপচাপ কাজ করুন। তারপর হঠাৎ একদিন—ময়লা কাপড়, আমার একটা হাতের আধখানা নেই—কাঁদতে কাঁদতে এসে—স্ত্রীবতী সম্বন্ধে তাঁর বিপন্ন অবস্থা জানালেই আপনাকে ছেড়ে দেবেন। বেশ করে শুনে রাখুন—মেয়েদের কথা কিনা—এই যেমন—Her son coming। very আসন্ন Sir—Belly badly heavy—No one to un-son her, বলে কেঁদে ফেলবেন। বাপ মার কথা sin like ত্যাগ করবেন, মুখে আনবেন না। wipএর কথাই কি হাত থাকবে, আর ওই কান্নাটা। সেটা সুর বদলে যেন 'ভ্যাক, পর্য্যন্ত যায়।" সংক্ষেপে তার মর্ম্মটা এই ছিল। আমার প্রতি কিশোরীর কৃতজ্ঞতার বহরটা শুনলে? সে বিলিতি হিতোপদেশের moral ঝাড়তে বাকি রাখেনি!

তাকে বললুম—"ষ্টুপিড্ বলছিস্ কি? আমার বয়েসটা

যে Black market রেটকে ছাড়িয়ে দিয়েছে যে পাঁঠি। এ বয়সে না কারো বাপ মা থাকে, না মরিবার বিত্তর। একি ওদের সঙ্গে জন্ম নেলি নাকি ?"

কথা আর বাড়লো না। সাহেব একটু আড়াল থেকেই আমাদের আনন্দ উপভোগ করছিলেন, বেরিয়ে এলেন—"Hallo doctor কবে এলে ? খবর ভালো তো ?"

"আজ সকালে এসেছি Sir—খবরটা আপনার কাছেই শুনবো।"

সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন—"তুমি এঁকে চেনো নাকি ?" ডাক্তার বললেন—He is my uncle Kalachand—

My খুড়ো Sir—

সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—"You too have a খুড়ো, তোমারও খুড়ো আছে ? খুড়ো তোমাদের দেশে বড় সস্তা দেখছি—very cheap।

"Yes Sir—ওঁদের দয়াতেই তো আমরা সাবধান হয়ে চলতে শিখি। সর্ব্বদা আমাদের সতর্ক থাকতে ওঁরাই তো শিক্ষা দেন। আপনাদের বিসমার্কের চেয়ে বেশী "মার্কের" লোক।"

হো হো কোরে হেসে খুড়োর দিকে চেয়ে সাহেব বললেন—"তোমার Doctor সম্বন্ধে তোমার opinion জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

খুড়ো বললেন—"By all means—in a word. He is my pride—এক কথায় ডাক্তার আমার গর্ব্বের বস্তু—But tdo good, for this world, which is awfully civilized—I mean-amounts to 'good for nothing'—am therefore always afraid—He may someday invite trouble and suffer for nothing—may God help him—

অত ভালমানুষ এত চতুর জগতে চলে না, কোনদিন বিপদে পড়ে যাবে। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।

সাহেব হেসে বললেন—আচ্ছা, এখন তোমাদের কথা সত্বর সেরে নাও। ডাক্তারকে আমি চাই। Good day বলে ভেতরে চলে গেলেন। (ক্রমশঃ)

মেদিনীপুরের তমলুক

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

বহুদিনের আকাঙ্খিত মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহর পরিদর্শনের সৌভাগ্য এবার ঘটিয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের যে এই সুযোগকে লাভ করিয়া নিজকে ধন্যই ধন্য মনে করি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে গত মার্চ্চ মাসে মহিষাদল থানার লক্ষ্মা গ্রামে একটি জেলা হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল—সেই সম্মেলনের প্রচার কার্য্যের দায়িত্বই আমার তমলুক পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটাইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রচার কার্য্যের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ মেদিনীপুর সহরে কিছু প্রচার কার্য্য করিলাম। তারপর তমলুক সহরে আসিলাম। সহরটী রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঘাট, বাজার, দোকান-পাট সবই গ্রাম-ধরণে সজ্জিত। সহরটী পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে—বাসে যাইতে হয়। যাওয়ার পথে বাস হইতেই বহু প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরগুলির কোন কোনটী তিনশত বা চারিশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। অধিকাংশ মন্দিরই সংস্কার করা হয় নাই—জীর্ণ। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে বাস তমলুকে পৌঁছিল। পূর্ব্ব হইতেই আমার তমলুকে যাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা ছিল—তাই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই উঠিলাম।

তমলুক খুবই প্রাচীন শহর। এই শহরটীই প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বলিয়া পরিচিত। সমুদ্রতটে সহরটী আধুনিক কলিকাতার ন্যায় বন্দর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। দেশ বিদেশ হইতে আগত বাণিজ্য-তরণীতে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ বন্দর ভরিয়া থাকিত। বিভিন্ন দেশের বিচিত্র বিলাস বাসুকেগে আন্দোলিত হইয়া এক অভিনব শ্রী ধারণ করিত, এ-বর্ণনা আমরা প্রাচীন ইতিহাসে পাই। পদ্ম-পুরাণে বেহুলার উপাখ্যানে এই তাম্রলিপ্ত সহরের সহিত প্রাকৃতিক সাদৃশ্যসম্পন্ন একটি সহরের উল্লেখ আছে। উপাখ্যানে আমরা পাই—সর্পাঘাতে মৃত স্বামী লখিন্দরের শব বেহুলা রক্ষা করিয়া সতী সাধ্বী বেহুলা ভাসিয়া চলিয়াছেন গাঙ্গোদয়ের বক্ষ বাহিয়া। ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে বেহুলা একটি বন্দরে পৌঁছিল—সেখানে সেতী ধোপানী কাপড় কাচিতেছিল। এই বন্দরের বর্ণনার সহিত তমলুকের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য

আছে। সুতরাং এই তাম্রলিপ্তি শুধু ঐতিহাসিক যুগেও নয়, পৌরাণিক যুগেও যে অস্তিত্ব লইয়া জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যে পুষ্করিণীর ঘাটে বেহুলার তরণী লাগিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ সেই পুষ্করিণীটিও আমি দেখিয়াছি।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখি—বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন যখন ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারত ত্যাগকালীন তাঁহার বর্ণনায় পাই যে, তিনি ৪১০ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন এবং এই সহরের বিত্ত, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যখন তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন—তখনও তিনি এই বন্দরেই জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি এই স্থান হইতে সিংহলে

তমলুকে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তি

গমন করেন এবং তাঁহার সময় লাগিয়াছিল ১৪ দিন। তারপরও প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ চীন, শ্রাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ হইতে বহুশত বণিক, শিক্ষার্থী, ধর্ম-যাজক, তাম্রলিপ্তিতে অবতরণ করিয়া নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির বিদ্যাগার ও সঙ্ঘারামে আসিত। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং খ্রীষ্টিয় ৬৭১ হইতে নারকদরম্ হইয়া আরও সনের দিনে তাম্রলিপ্তি বন্দরে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থান, বিদ্যাগার, সঙ্ঘারামগুলি পরিদর্শনের পূর্ব্বে এক বৎসর এই তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা পাই—যে তখন হইতেই সমুদ্র হটিয়া যাইতে আরম্ভ করে, ফলে তাম্রলিপ্তি সহরের অবনতি ঘটিতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে এই তাম্রলিপ্তির অনুরবর্তী গ্রামে যে তাম্রশাসনটী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই পাই। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

বৈকালে আমি বিখ্যাত শ্রীশ্রীবর্গভীমা মাতার মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটী সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। মন্দিরের গঠন পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। অভ্যন্তর ভাগের গঠন পদ্ধতি আরও বিচিত্র রকমের। তমলুকে আরও একটি প্রাচীন মন্দির আছে সেটী শ্রীশ্রীবিষ্ণুহরির মন্দির। শ্রীশ্রী-বিষ্ণুহরির বিগ্রহ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসখা অর্জ্জুনের মূর্ত্তি সমন্বিত। প্রবাদ, যখন তমলুকের মহাপরাক্রমশালী রাজা তাম্রধ্বজ রাজত্ব করিতেন তখন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং অর্জ্জুন এই সহর জয় করেন।

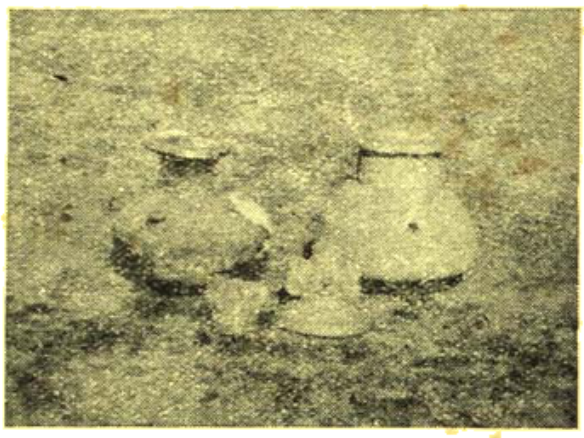

কূপ হইতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র—তমলুক

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজা তাম্রধ্বজ এই মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করান। শ্রীশ্রীবর্গভীমা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুহরির মন্দিরের গঠনপদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের, তাহাতে মনে হয় দুইটী মন্দির সমসাময়িক।

পরদিন প্রাতে আমি তমলুকের রাজা শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের আলোচনায় প্রায় ২ ঘণ্টা কাটিল। রাজবাড়ীর সম্মুখে একটি বৃহদাকারের দীঘি আছে। সেই দীঘির মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ মন্দির আছে। এক বৎসর এই দীঘিটীর জল প্রায় শুকাইয়া যায়। সেই বৎসর দীঘির সংস্কারোদ্দেশ্যে খনন কার্য্য করা হয় এবং অল্প কিছু খুঁড়িতেই একটি বৃহৎ কূপ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন সহরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা, মৃৎপাত্রাদি পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি সিংহল ও অন্যান্য প্রদেশের এবং এই গুলির অনেকগুলিই খৃঃ পূর্ব ৪০০ শতের আমলের। এইরূপ মুদ্রা বা অন্যান্য নিদর্শনও বর্ত্তমানে গ্রামসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি রাজবাড়ীর অদূরে একটি পুষ্করিণী খনন করিবার সময় একটি প্রস্তর মূর্ত্তি

পাওয়া গিয়াছে। যে স্থলে এই সকল মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দূরত্ব হিসাব করিলে মনে হয় যে সহরটী পূর্ব্বে প্রায় ৪।০ মাইল বিস্তৃত ছিল।

বৈকালে আমি সিঁয়ের অন্ধকার গ্রাম ও গ্রামস্থল পরিদর্শন করিলাম। সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ বেশ, ঘনবসতিপূর্ণ; আমি মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য সহর বা জনপদসমূহ ঘুরিয়াছি কিন্তু এইরূপ ঘনবসতি অন্য কোথাও দেখি নাই। এই ঘনবসতিই প্রাচীন সহরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

তারপর স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে স্কুলে সংরক্ষিত মুদ্রা, প্রস্তর-মূর্ত্তি, একটী শুম্ভ, একটী ফলিস এবং আরও কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন দর্শন করাইলেন।

প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষী হিসাবে বাংলার বক্ষ হইতে যে সমস্ত নিদর্শন মিলিয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও তমলুকের ভূগর্ভ হইতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বৈদেশিক মুদ্রা তাম্রলিপ্তি বন্দরে পাওয়া যায়। আড়াই হাজার বৎসর, সুমাত্রা, যাভা হইতে যে সমস্ত বণিক বাণিজ্য করিতে আসিত তাহাদের আনীত মুদ্রা সকলই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। সে যাহা হউক, এই তমলুকই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৭ই মার্চ্চ প্রাতে অধ্যাপক ব্রজেনচন্দ্র মজুমদার, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মোদক, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মোহন রায় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তমলুকে যাই এবং তাঁহাদের সকলকেই তমলুকের প্রাচীন দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাই; রূপ-নারায়ণ নদ ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে সহর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার নদী পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে এবং সহরটী বর্ত্তমানে একেবারে নদীর উপকূলে। নদী যে ভাবে তাহার ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে, ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই তমলুক সহরের কিয়দংশ নদীর বক্ষে বিলীন হইবে। স্থানীয় মহকুমাহাকিমের সেরেস্তাদার হইয়া কর্ণেল গুরুসদয় দত্ত যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি কতকগুলি বহুমূল্য স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় যাদুঘরে তাহা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তারপর সরকার পক্ষ হইতে খননবিভাগের সহায়তায় তমলুক সহরের নিকটবর্ত্তী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—যে স্থান হইতে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে।

তমলুকে আবিষ্কৃত কয়েকটি মুদ্রা—মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ ৪০০ শতের বলিয়া প্রমাণিত

কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার। তাই আজ পর্য্যন্ত তাহার খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। নদী যে ভাবে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় খনন কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহর নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। তাই আমাতে অবিলম্বে উক্ত খননকার্য্য আরম্ভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ভূতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অনুরাধা—জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে—এ বিষয়ে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে মতভেদ নাই। ব্রিটিশ সরকার এই জমিদারি প্রথার প্রবর্ত্তক। ভাগ্যে জমিদারি প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—তাই বাংলা কথাসাহিত্যের একটা প্রধান উপজীব্য পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে তারাশঙ্কর পর্য্যন্ত অধিকাংশ কথা-সাহিত্যিকেরই প্রধান অবলম্বন জমিদার বুরুক। যে শরৎচন্দ্র রাজাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের লইয়া কথাসাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহার রচনাবলীতে জমিদার মাজেরই সংখ্যাই বেশি। ইহার একটা কারণ, প্রেমলীলা দেখাইতে হইলে প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবসরের সত্তা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন। অবসরের সত্তা যেখানে প্রবল, জীবনের দাবি যেখানে প্রবলতর, সেখানে হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলে না। আর একটি প্রয়োজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে সন্তান-সন্ততির দায় হইতে নিষ্কৃতি দান। সন্তান-সন্ততি প্রেমের প্রজাপতি জীবনের অন্তরায়। অনুরাধা গল্পটির নায়ক বিনয় একাধারে জমিদার ও ব্যবসায়ীর। বিনয়কে ধনী এবং জমিদার বানাইবার সার্থকতা ছিল, মেহাৎ অবসরের রূপ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এখানে বিনয়ের

সন্তানটি প্রেমলীলার অজ্ঞাতে মা হইয়া প্রেমলীলার সংঘটক হইয়াছে। অনুরাধা সঙ্গে ইহাতেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে। বিলাতফেরতা উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভবিষ্যৎ যুবক প্রাণে আসিয়াছিল একটি কুমারী যুবতীকে বাড়ী হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। সঙ্গে আসিয়াছিল নিজের মাতৃহীন শিশুপুত্রটিকে। এই মাতৃহীন শিশুই ঐ যুবতীর মধ্যে নিজের জননীর অনুভব লাভ করিল—সে তাহার মধ্যে নিজের মাতাকে আবিষ্কার করিল। অনুরাধা শিক্ষিতা নয়, রূপসীও নয়, প্রেমের ছলাকলাও জানে না, প্রেম নিবেদনও করে নাই, নিজের দারিদ্র্য ও অসহায়তা লইয়া সে মরিয়া থাকিতেই চাহিয়াছিল। আর বিমল বিলাতফেরতা নব্যযুবক, একজন সুন্দরী এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মহিলার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াই ছিল। তবু অনুরাধা বিমলের হৃদয় জয় করিল। শরৎচন্দ্র অনুরাধার প্রতি বিমলের প্রেম সঞ্চারের দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথম, শিশুপুত্র কুমার অনুরাধার স্নেহাতিশয্যে তাহার বশীভূত হইয়া অনুরাধার মধ্যে তাহার মৃতা জননীকে খুঁজিয়া পাইল। যে শিশু হৃদয়ের মাতৃস্নেহ পায় নাই—তাহার আকর্ষণ হইল দুর্দম। সে স্নেহের আকর্ষণে অনুরাধাকে বিমলের হৃদয়ের কাছে আনিয়া দিল। বিমলও নারীহৃদয়ের পরিচর্য্যা বহুকাল পায় নাই, তাহার তৃষিত হৃদয় অনুরাধার আন্তরিক সেবা পরিচর্য্যা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। শরৎচন্দ্র ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন—বিমলকে আর রোগে শয্যাগত করিয়া অনুরাধাকে শয্যাপার্শ্বে আনিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

এই গল্পটির বৈশিষ্ট্য এই—যুবক-যুবতীর প্রেমলীলার মামুলী উপকরণ এই গল্পে পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ অভিনব ভঙ্গীতে পরস্পর-বিরোধী বহুদূরবর্ত্তী দুইটি হৃদয়কে এই গল্পে মিলাইয়াছেন। ঘটনার ঘনঘটা কোথাও ঘুরে হয় নাই। গল্পটি যেভাবে উপসংহৃত হইয়াছে তাহাও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরই উপযুক্ত। অলিখিত পরিচ্ছেদটি যে ত্রিলোচন মামুলীর কবল হইতে অনুরাধার উদ্ধার এবং নবলব্ধ স্নেহের বশে অনুরাধাকে কুমারের সহিত বুকে আসন—তাহা যদি কেহ না-বুঝিয়া থাকেন—তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া তিনি যেন বারবার বৃথা দুঃখ না পান।

মন্দির—মন্দির গল্পটিতে যেন একটি গীতিকবিতার সুর আছে। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যেন সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র শক্তিনাথের জীবনে একটি আর্টিষ্টের মানস সঞ্চারিত করিয়াছেন। শক্তিনাথ কুমারবাড়ীতে পুতুল তৈয়ারী কাজে সহায়তা করিয়া আনন্দ পাইত কিন্তু তাহার বড়ই ক্ষোভ—পুতুলের গায়ে কুমারদাদা বড় অন্ধ করিয়া রঙ দিত—কোনটার ঝুঁকোটা, কোনটার আবখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। কুমারের কৈফিয়ৎ—ভাল ক'রে এঁকে কল কি, এক পয়সার পুতুল ও আর কেউ চায় পয়সায় কিনবে না। সত্যই ত! পুতুল কিনিবে বালকে, তাহারা তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, খাওয়াইবে, কোলে করিবে, তারপর ভাঙিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত? আর্টিষ্টের মন কোনদিন তাহা বুঝে নাই। তাই শক্তিনাথ যখন পুতুলে রঙ দিবার অধিকার পাইল—তখন সে একখানা দরিয়া একটি পুতুলকে চিত্রিত করিল।

"পিতার মৃত্যুর পর শক্তিনাথকে ঠাকুর গড়া বাড়ীর ঠাকুর পূজা করিতে হইল। এ যেন আর্টিষ্টকে মুদ্রাদোষের মুখে বিরোধ করা। "পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন দাম, কান, চোখ হইবে, কোন রঙ বেশি মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়—কি দিয়া তাহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে রূপ করিতে হয় এসব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না।"

শরৎচন্দ্র এই শক্তিনাথের জীবনের দ্বারা দেখাইতে পারিতেন মূর্ত্তি-গঠনার আনন্দময় সাধনা হইতে মূর্ত্তিপূজার জীবন আবেষ্টনীতে নীত হইয়া শক্তিনাথের শিল্পিজীবনের কিরূপ Tragedy ঘটিল—শরৎচন্দ্র এই প্রত্যাশা নিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার কল্পনায় অপর্ণাই প্রাধান্যলাভ করিল—শক্তিনাথ একটা উপকরণে পর্য্যবসিত হইল। শক্তিনাথের জীবনকে আর ঘনাইতে দেওয়া হইল না। জীবন মানুষের প্রতি বিরাগিণী জড় দেবমূর্ত্তির অনুরাগিণী অপর্ণার উদাসীন চিত্তকে আঘাত দেওয়ার জন্য শক্তিনাথের মৃত্যু ঘটাইলেন।

মন্দিরের মধ্যেও নূতন শিল্প সাধনার অবকাশ ছিল—শক্তিনাথের শিল্পিমানসের সার্থকতাও তিনি মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে দেখাইতে পারিতেন।

শরৎচন্দ্র কাশীনাথের জ্ঞানসঞ্জ প্রকৃতিকে অপর্ণার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন—কেবল জ্ঞানের ফুলে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জ্ঞান-চর্চ্চা ঐশ্বরিক আকর্ষণের পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির আবেষ্টন ত তাহা নয়। যাহাই হউক, অপর্ণা নিজের প্রেমে অমরনাথকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে নাই। অপর্ণার দাম্পত্যজীবনে একটা বিপ্লব ঘটিল—কিন্তু শরৎচন্দ্র সে বিপ্লব লইয়াও অগ্রসর হইলেন না। অমরনাথ চিত্তে ক্ষোভ লইয়াই মারা গেল। ইহাকে ঠিক দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার পরিণাম বলা যায় না। দেবমন্দিরের প্রতি অপর্ণার অনুরাগ এতই অধিক যে অতিসহজেই সে বিধবা হইয়া দেবমন্দিরেই ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যজীবনকে ভুলিয়া গেল। অমর-নাথ জানিয়াছিলেন—অপর্ণা পাষাণী। পাষাণ মন্দির যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছিল—সে ভাবিল দেবতার আহ্বানে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে ভাবিল ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। জীবন্ত মানুষের প্রতি যাহার হৃদয় যায় নাই, পাষাণ মূর্ত্তিই যাহার সব, শরৎচন্দ্র তাহার চিত্তে শেষ আঘাত দিবার জন্য মন্দির হইতে বিতাড়িত পূজারিণীর মত মুক্তি ও শুচি শক্তিনাথের জীবনাবসান ঘটাইলেন। দীনবেশের লিপি দুটি লইয়া অপর্ণা দেবতার পায়ে রাখিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমি যাহা লইতে পারি নাই—তাহা তুমি লও। নিজের জন্যে আমি কখন পূজা করি নাই আজ করিতেছি। তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

ফেলারামবাবুর চিঠি-সমস্যা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল

আচ্ছা মশায়, আপনারা রোজ কে ক'খানা করে চিঠি পান বলুন ত? আর লেখেন ক'খানা করে?

আপনারা হয়ত আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যাবেন। বলবেন: ভদ্রলোক বলে কি? আমরা কে ক'খানা করে চিঠি পাচ্ছি, আর লিখছি—সে খবরে তোমার দরকার কি বাপু? চিঠিপত্রের আদান প্রদানটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, অথবা আপিস সংক্রান্ত হলে সেটা আরো বেশি গোপনীয়। বাইরের লোকের সেখানে মাথা গলাতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা মাত্র।

কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন? আমি নজির খুঁজছি। মানে, পত্রজগতে আমার মনের ভাব এক এবং অদ্বিতীয়, না তার কোনো দোসোর আছে? অর্থাৎ আমার সম-মনোভাবাপন্ন আর কেউ আছেন কিনা, তাই আমার জ্ঞাতব্য।

নববিবাহিত দম্পতিকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি না। কারণ আমার বিবাহিত জীবনের নবীনতা অনেক-দিন কেটে গেছে। সে যুগের ভাবের বাহনগুলোকে (উভয় পক্ষের) গৃহিণী তাড়া-বন্দী করে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। ভয়, পাছে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল দৃষ্টি গিয়ে তাদের উপর পড়ে। মজা দেখুন ত! একদিন যে চিঠির জন্য উভয় পক্ষ তীর্থের কাকের মত দিনের পথ চেয়ে বসে থাকা যেত, চিঠি এলে আনন্দের সীমা থাকত না, একই জিনিস বার বার পড়েও সাধ মিটত না, না পেলে জগতকে অন্ধকার মনে হত, পরস্পরের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত, মান-অভিমানের অন্ত থাকত না—প্রথম যৌবনের সেই রঙিণ চিঠিগুলোর আজ এই দুর্দশা। একেই বলে 'কালের কুটিল গতি'—আর কি।

আমার মত হয়েও যাঁদের থেকেও নাই, অর্থাৎ প্রথম যৌবনকে পিছনে ফেলে রেখে এসেও যাঁদের সপরিবারে সব সময় একত্র বাস করবার দুর্ভাগ্য হয় নাই, তাঁদেরও আমার কোনো জিজ্ঞাস্য নাই। বিরহী যক্ষের মত তাঁরা শুধু বর্ষা কেন, যে কোনো ঋতুতেই ষোড়শ প্রকারে বিরহের আনন্দে দিনের দুঃখ স্মরণ এবং উপভোগ করুন, এবং পত্রদূতের সাহায্যে অভাব ও অসুবিধার চিরন্তন কার্য্যের আদান-প্রদান করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাঁদের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হতে পারে; কিন্তু মশায়, পুরানো জুতো পরে আরাম আছে। যেখানে বরাবর পা দুটি থাকে, ঠিক সেই-খানে গিয়ে পড়বে। দু'একটা পেরেক যদি একটু আধটু খোঁচাও দেয়, তাও কড়াপড়া জায়গায় বিঁধতে পারবে না। নূতন জুতা কিনবার সামর্থ্য নাই বলার চেয়ে পুরানো জুতার আরাম অনেক বেশি, এই কথা বলাই ভাল নয় কি? তাই তাঁরা মহা আরামে বিরহের সুখে কাতর হোন, আর পত্র-দূত এলেই সশঙ্কচিত্তে দুরু দুরু বক্ষে তার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাঁদের আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

আর, আপিসের গোপনীয়তার কথা বলছেন? না মশায়, আপিসের কোনো কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না। ও যারা আপিসে কাজ করে, তাদের কাছেই ভালো। আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে কাজ নাই।

আমি তাঁদেরই একথা জিজ্ঞাসা করছি, যাঁদের আমার মত চিঠি-নাই আছে—না পেলে মন কর্‌ কর্‌ করে, পেলে অস্বস্তি বাড়ে, উত্তর দিতে গিয়ে সংসার খরচে টান পড়ে।

উত্তর দিলেই প্রত্যুত্তর পাবার আশঙ্কা থাকে এবং আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা যদি অন্ততঃ দশজনও হয়, তা'হলে চিঠির আদান-প্রদান ব্যাপারটা প্রাত্যহিক কর্মেরই সামিল হ'য়ে পড়ে। চায়ের সময় চা-টি না পাওয়া গেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, ডাকের সময় চিঠি না আসলে মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যায়। তারপর চিঠি আসুক আর না আসুক, চিঠি একখানা করে না লিখলেও মনে শান্তি আসে না। বন্ধুদের চিঠির উত্তর না দিলে তাঁরা অসামাজিক জীব ভেবে কথার চাবুক মেরে সামাজিকতার নিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন; গুরুজনদের চিঠির উত্তর না দিলে তাঁরা ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়বেন, আর স্নেহাস্পদ স্নেহাস্পদাদের ত কথাই নাই।

তারপর ধরুন, আপনার যদি একটু আধটু লেখার সখ থাকে—মানে, সাহিত্য জগতে একটুখানি আসন পাবার জন্য যদি আপনি উৎসুক হয়ে থাকেন, তাহলে ঐ দশজনা ছাড়াও আরো কয়েকজন অতিরিক্ত লিখন-বন্ধু জুটবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত লিখন-বন্ধুরা বড় নির্দয়। নববধূকে চিঠি লিখবার সময় যেমন খামের ভিতর ডাক-টিকিট পুরে দিতেন, এঁদের চিঠি লিখবার সময়ও তেমনি উত্তর পাবার প্রত্যাশায় ডাকটিকিট অথবা ঠিকানা-লেখা খাম দিতে হয়। তা সত্ত্বেও কেউ উত্তর দেন, কেউ দেন না। টিকিট দেওয়া সত্ত্বেও বহু চিঠির উত্তর না দিলে মান-অভিমান রাগরোষ করা চলত; কিন্তু এঁদের উপর তা করবারও জো নাই। এঁরা হলেন সাহিত্যিক জগতে প্রবেশ পথের দ্বাররক্ষক। এঁদের চটালে সাহিত্যিক বর-প্রার্থীর আখেরে ভালো হয় না। এ কথা তাঁরা ভালো করেই জানেন এবং আপনি আমিও ঠকে শিখেছি। তাঁরা উত্তর দেন আর না দেন, আপনাকে প্রাণের তাগিদে লিখতেই হয়, আর উত্তর পাবার প্রত্যাশায় প্রত্যহ ডাক আসবার সময় ছেলেকে ডাক ঘরে পাঠাইতেই হয়।

না, বুদ্ধের বাজারে আমার চাকর বাকর রাখবার মত আর্থিক সংস্থান নাই। ছেলেটা আট পেরিয়ে নয়ে পা দিয়ে দায়েক হয়ে উঠেছে। সেই গিন্নীর আর আমার ফাই ফরমাস খেটে থাকে। ফরমাসগুলো গিন্নীরই বেশি, আমার কেবল রোজ সকাল নটার সময় একবার করে ডাক-ঘর যাওয়া আর আসা। কিন্তু কেমন অবিচার দেখুন, গিন্নীর তাতেই রাগ। বলেন, তোমার ঐ চিঠি-চিঠি করে ছেলেটার নাওয়া খাওয়া গেল। ওকে আর পড়তে শুনতে হবে না, না?

আধ ঘণ্টার জন্য ডাকঘর যাওয়া আর আসা। তাতেই যদি ছেলেটার মাথা খাওয়া যায়, তাহ'লে তার মাথায় যে কিছু নাই, এই কথাই বলতে হবে। কিন্তু বলবার উপায় নাই। বলতে গেলেই এখনি বলে বসবেন, কাগজে লেখা ছাপা হলেই যেন এখনি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। কাগজের অভাবে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারছে না, আর উনি দিব্যি পর দিস্তা কাগজে ছাই ভস্ম লিখে চলেছেন, আর গাঁটের পয়সা খরচ করে সেগুলো খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাচ্ছেন। তাও যদি সবলেখা ছাপত, কিম্বা ছাপা হলে কাগজের দামটাও দিত—

না মশায়, মেয়েমানুষের সঙ্গে বাজে তর্ক করতে নেই। তাই আমি চুপ করেই থাকি। কাজ কি ঘাঁটিয়ে। সাহিত্যিক হতে হলে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, তা অসাহিত্যিক হয়ে উনি কি বুঝবেন!

তারপর আবার ব্যাপার দেখুন। আমার চিঠিপত্র এলে গেলেই ওঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠে, সংসার খরচে টান পড়ে। কিন্তু চিঠিপত্র বিষয়ে উনিও যে আমার কাছা-কাছি যান, সে কথা আর বলে কে? অর্ধাঙ্গিনী যখন তখন দশজনের অর্ধেক, মানে পাঁচজন পর্যন্ত আমার বরদাস্ত করাই উচিত। কিন্তু তাঁর তিন সহোদরা, দুই সহোদর, এক গঙ্গাজল, এক ব্রহ্মপুত্র, তারপর তাঁর নিজের মাতা—এইগুলি আবশ্যকীয়। অতিরিক্ত কেউ নাই, তাই রক্ষা। তাঁর সহোদরা-পতিরা এবং শ্বশুরমশায় আমার তাগে পড়েছেন। সাম্যের যুগ বলেই চুপ মেরে থাকতে হয়। চুপ মেরেই আমি থাকি, কিন্তু আমার এই একা চিঠি লেখার জন্যই সংসার খরচে টান পড়ছে, একথা যখন শুনি তখন সত্যিই অসহ্য ঠেকে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন যদি ঠিক হয়, তবে আটে দশে পার্থক্য কোথায়, অন্তে তাঁর মাথা পরিষ্কার থাকলেও এ সামান্য কথাটা কেন যে তাঁর মাথায় ঢুকে না তা ভেবে আমি অবাক হই। আমার অতিরৈক্তিক লিখনবন্ধু আছে, তাঁর নাই। তার জন্যও কি আমি দায়ী?

এই যুদ্ধের বাজার খরচপত্র নিয়ে কে বেসামাল না হয়ে পড়েছে বলুন? মসীজীবীদের ত হাড়মাস ক্ষয়ে গেল। কাগজ মিলে ত কালি মিলে না, কালি মিলে ত কাগজ মিলে না। কালি কলম কাগজ মিলল ত অভাব অনটনের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল, লিখতে বসে খেই হারিয়ে গেল। কোনো মতে লেখাটা যদি বা খাড়া করা গেল ত মাসিকে স্থানাভাব। নিজে খরচ করে ছাপতে যাবেন ত প্রেস-ওয়ালারা লোকাভাব এবং কাগজের অভাব জানিয়ে দাফ্ জবাব দিয়ে বসবে। লেখা ছেড়ে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টারীর খোঁজ করব কিনা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ বুদ্ধ গেল থেমে। এতে আর আমার অপরাধ কোথায় বলুন?

অথচ হিসাবটা খুব জটিল নয়। অংকে আমার ভালো

মাথা না থাকলেও আমি এটুকু বুঝি যে, চিঠি লেখা বাবদ দৈনিক গড়পড়তা দু'আনা করে খরচ করলেও বার্ষিক সেটা পঁয়তাল্লিশ টাকা দশ আনায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই টাকাটা যদি যুদ্ধের পূর্বে দশ বছর ধরে জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে যুদ্ধের সময় কোনো একটা ব্যবসা করা যেত, অথবা কোনো কণ্ট্রাক্টারী নেওয়া যেত—তাহলে সেই চারশ একষট্টি টাকা বার আনা কোন্ না আজ কমপক্ষে চার হাজার ছ'শ চৌদ্দ টাকায় এসে দাঁড়াত। কিন্তু সতত সোচনা নাস্তি। আগামী দশ বছরের মধ্যে যদি আবার যুদ্ধ বাধে—সেই আমার আবশ্যকীয় এবং অতিরিক্ত সব রকম চিঠির আদান প্রদান বন্ধ করে দিব কিনা; সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। সেই জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার মত অবস্থায় আপনারা কেউ পড়েছেন কিনা? পড়ে থাকলে আমি যেমন ভাবে ভাবছি ঠিক সেই রকমভাবে ভাবছেন কিনা? তাহলে আমি যে সম্ভাবনার ইঙ্গিতটা করছি, তা কাজে খাটানো চলতে পারে কিনা, তাই অনুগ্রহ করে বলবেন আমাকে। ধরুন, যুদ্ধটা যদি আর না-ই বাধে তবু আপনার জমানো টাকাটা মাঠে মারা যাবে না। আপনার অবর্তমানে ছেলেরা নিশ্চয় সে টাকাটা কোনো না কোনো কাজে লাগাবে।

"ওগো শুনছ?"

এমন মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর বহুদিন কানে প্রবেশ করে নাই। লেখা ছেড়ে অর্ধাঙ্গিনীর দিকে তাকাইতেই দেখি তাঁর হাতে একখানা চিঠি। সাগ্রহে বললাম, "ডাকঘর থেকে ফিরল ছেলেটা? মোটে একটা চিঠি এসেছে আজ?"

তিনি হাসিমুখে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমার নয়, আমার। 'চলতি জগৎ' মাসিকের অফিস থেকে এসেছে। আমার একটা গল্প মনোনীত হয়েছে, তার সংবাদ।"

খবরটা পড়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। উনিও যে আবার সাহিত্য-সাধনায় মন সংযোগ করেছেন, তা জানতাম না। আর আমার ভাববার কোনো কারণ নাই। এ এমন এক নেশা যে, একবার ধরতে আরম্ভ করলে আর ছাড়বার যো থাকে না। নাম আমার কেলা-রাম হলেও কথাটা কিন্তু ফেলনা নয়। তবু নেহাৎ কর্তব্য-বোধে সতর্ক করবার জন্য বললাম, "দেখ, তোমার নামে লেখা ছাপা হবে, এতে অবশ্য আমারও গৌরব বোধ হবে। কিন্তু লেখা ছাপিয়ে লাভ নাই কিছু। অনর্থক কতকগুলো অপব্যয় মাত্র।"

বুঝতেই পারছেন, এর উত্তরে আমি কি পেলাম। যাক, বাঁচা গেল। আর হিসাব পত্রে কোনো কাজ নাই। যুদ্ধ না বাধলে সামান্য টাকাতে বড়লোকও হওয়া যায় না। তবে আর মিছামিছি কেন চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করি। যাঁর আপত্তি ছিল তাঁর মুখও বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের টানা-টানির কথা বললে, এর পর আমিও কিছু মুখ খুলতে কসুর করব না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার বাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মহাত্মাজী আচার্য্যের তিরোভাবের সহিত উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় স্মৃতির শেষ অধ্যায় রচিত হইলেও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুঃশাসনের কলঙ্ক, অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতিতে ব্যথাহত নরনারীর নিকটে আচার্য্যের জীবনবেদ, ঘোল আনা সত্যের গবেষণার কথা, অমৃত সমান। আচার্য্যদেব ছিলেন তিনপুরুষ বাঙ্গালীর মরণী আদর্শ গুরু। বাঙ্গালীর তর্কপ্রিয় মস্তিষ্কের অপব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা তিনি চিরকাল জানাইয়াছেন, দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী যুবক কিসে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে তাহার জন্য এই শিক্ষাব্রতী "আপনি আচরি ধর্ম" অপরকে শিখাইবার জন্য পরিণত বয়সেও আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, বড়-সন্ধ্যা-বন্যার বিপন্ন নরনারীকে, গৃহহারা পরিত্রাণ দুঃস্থকে একমুষ্টি অন্ন ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলিহস্তে উদ্যোগিতের মতন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং দেশের যুবকদিগকে মনুষ্যত্বলাভ করিয়া শান্ত ও সমাহিত জীবনযাপন করিবার আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতি, জীবনসংগ্রামে বিক্ষত, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর নিকটে আজও অপূর্ব্ব বিস্ময়। আচার্য্যদেবের মন্ত্র "এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ" বাঙ্গালী শতবৎসরের সংগ্রামের পরেও "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া উপসংহরণ বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করিতেছে। আচার্য্যের অমোঘ বাণী তাই আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়, ও সকল আদর্শবাদীর আশাপ্রদীপ।

চাঙ্গাইলে, জীবন সায়াহ্নে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটুকরা লয় তাঁহার আত্মত্যাগ বিপাহারা ভাইভগিনীদের জন্য এখানে উপস্থিত করি।

বিভিন্ন রকমের পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিবদমান জাতির মধ্যে আচার্য্যের মহামানবত্বের আদর্শ, মন্দির মসজিদে এবং চেউলের বিভিন্ন চৌহদ্দীর মধ্যে বিশাল ও বৈচিত্র্যময় পৃথিবীই ব্রহ্মের মন্দির, পুরিপালয়িতং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং। আচার্য্যদেব বলিতেন মানুষের মনের নোংরামি তখনই লোপ পাওয়া সম্ভব, যখন মানুষের মনে এই শাশ্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তনী সত্যের উদয় হয়। মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে এই সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ মানবদেহই শুদ্ধ মন্দির এবং মানুষের জীবন্ত মনই এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পূজারি তখন সে কেমন করিয়া এই দেহকে পাপে মলিন ও কলঙ্কিত করিতে সক্ষম হইবে। ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন এই প্রাণময় পূজাপদ্ধতি আচার্য্যদেব মনপ্রাণ দিয়া "হৃদয়মনীষা মনসাভি জিগ্যঃ" গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব বলিতেন এই সাধনায় মানুষের মনে দুনিবার শক্তির সৃষ্টি হয়। ইহাকেই তিনি মানবজীবনের Storage battery বলিতেন। রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চার সহিত তিনি ধর্ম্মজীবনকে তুলনা করিয়া বলিতেছেন—গবেষণার মূলসূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান। গবেষণায় যেমন ফাঁকি চলে না ধর্ম্মজীবনেও ঠিক তাই। দায়সারা জীবনের কাজে উপাসনার ছল যদি ফুটিয়া না উঠে তবে সকল কিছুই বৃথা "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনম চ তদুপাসনমেব", সুতরাং জীবনে জীবন বিধাতার প্রিয়কার্য্যের সাধনাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি বলিতেন আমি মার্কামারা তিলকধারী ব্রাহ্ম নই এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমি একটি hidebound, creedbound, লোহার ছাঁচে ঢালা হাত পা বাঁধা dogmatic religion বলিয়া কোনও দিন বুঝি নাই এবং গ্রহণ করি নাই। চিরগতিশীল এবং চিরচলিষ্ণু মনুষ্য সমাজ, জলস্রোতের ন্যায় অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে ইহা ছিল তাঁহার বিশ্বাস ; তাই ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে ever wakeful ever progressive and ever expanding। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের ঘরে চুরি করিতে দেখিয়া তিনি মাঝে মাঝে হতাশ হইতেন এবং বলিতেন যুক্তির দ্বারা সত্যবিদ্যা বাহির করা অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। তিনি বলিতেন যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকটে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ বাহিরে জন সমাজে এবং সভার বাজারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই, সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তিনি বলিতেন, এদেশে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতি যেসকল—লোকাতীত মহামানবগণকে এই সত্যের উপরেই জীবনকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, ঠিক এই কারণে মহাত্মা গান্ধীকে তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং "বার সেপাহীর তের হাঁড়ি" লইয়া তিনি বহু বক্তৃতা ও বহু চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিস্মৃত হইয়া M. Sc. পাশ বরকে পালকী ঘরের উপযুক্ত যৌতুক লইয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা প্রায় বলিতেন। "রেজলতার" আত্মহত্যা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল, এই সকল সামাজিক পাপের জন্য বাংলার যুবশক্তিকে দায়ী করিয়া তিনি তীব্র কষাঘাত করিয়াছিলেন। নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ আদর্শের জনিতা করিয়া যাহারা পাশ্চাত্যের দুইখানি আবরণী করিতেছেন তাহাদের নিন্দা করিতে গিয়া Co-education, Birth control, Nudist Colony স্থাপন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের খোলাখুলি অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড চিৎকারী করিয়া গিয়াছেন। বিদেশের চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব প্রভৃতির বাহ্যিক অনুকরণকেই তিনি বারবার খোলাখুলি বলিতেন, তাঁহার মতে মানুষের সত্য পরিচয় তাঁহার অন্তরাত্মার পবিত্রতায়। উচ্চ আদর্শের নামে আপোষকে তিনি ঘৃণা করিতেন এবং উদ্দেশ্যমূলক মিতালীর তিনি বিরোধী ছিলেন। স্বার্থরক্ষার অজুহাতে হরিজন আন্দোলনের প্রতি তাঁহার তেমন প্রীতি ছিল না, "সকল মানবই এক বিধাতার সন্তান এবং এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ" এই সত্যাদর্শের উপর স্থির হইতে পারিলেই হরিজন ও বর্ণহিন্দুর ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

নরনারী সকলের সমান অধিকার

(যার) আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাতবিচার।

হিন্দুসমাজ এই আদর্শ গ্রহণ করিলে Communal Award এর প্রয়োজন হইত না ইহা তিনিই বলিয়াছেন। দুঃখ করিয়া তিনি বলিতেন, কত তিলি, তাম্বুলী, সুবর্ণবণিক ও বৈদ্য সাহা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা, শিলতা এবং সংস্কৃতিতে এমন লোক রহিয়াছেন যাঁহারা আভিজাত্যগর্ব্বিত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন। এই সম্পর্কে যেসবিখ্যাত কতিপয় পণ্ডিতদের নামও তিনি উল্লেখ করিতেন। হিন্দুসমাজকে বাঁচিতে হইলে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ বর্জ্জন করিবার উপদেশ তিনি বহুভাবে দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুসমাজের অন্যতম পাপ বিধবাদিগকে বর্জ্জন। স্ত্রীকে দস্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ পুরুষের স্ত্রীত্যাগকে তিনি নির্লজ্জ কাপুরুষোচিত কাজ বলিতেন। আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, হিন্দুসমাজ ছুতা পাইলেই বর্জ্জন করিতে জানে—কিন্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণী বিভেদের ফলে বিবাহাদির অসুবিধার জন্য সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, যাহারা থাকিতেছে তাহাদেরও নৈতিক স্বাস্থ্য নানাকারণে নষ্ট ও নৈতিক শুভবুদ্ধি হৃত। এই সকল কারণে তিনি প্রায় জাপানের সামুরাই জাতির উল্লেখ করিয়া বলিতেন, সামুরাইদের মতন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যদি তাহার সামাজিক বিশেষ অধিকার ও আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে একাধারে পুরাতন ব্রাহ্মণদের মতন ত্যাগী, ক্ষত্রিয়দের মতন বীরত্বে দীক্ষিত করিতে সমর্থ না হয় তবে এ জাতির মুক্তির আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বিড়ম্বনা মাত্র। আচার্য্যদেব দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, চাষার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠো ভাতের জন্য আমার দুয়ারে আসে তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করি না সত্য, কিন্তু পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া তাহাকে সমঝাইয়া দিই যে সে মুচি, সে

অস্পৃশ্য ; তাহাকে যদি ঐ দূরে যাত্রীদের একপাশে গিয়া বস্, সকলের খাওয়া হলে পাত কুড়ানো দব পাবি। এই সকল অশিক্ষিত মূক, নির্যাতিত নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শতকরা আশি-প্রত্যাশিত শিক্ষিত যুবকদিগকে কুক্ষের মূলাধ্রোধন করিয়া উপরে জল চালিতে দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন আর বলিতেন

হে মোর জননি
শত কোটী বাঙ্গালীরে
রেখেছ বাঙ্গালী করে
মানুষ কর নি।

যথোচিত যতন তিল তিল করিয়া আচার্যদেব আমাদের জন্যই শেষ রক্ত-বিন্দুও দান করিয়া গিয়াছেন, বিংশশতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে এই মহান গুরুর সাধনায় আমাদের অনেকটা অধিকারগত, স্বাধীনতার যাদের উপস্থিত হওয়ায় যৌবনের স্বেচ্ছোমুক্ত বলিষ্ঠ বাহুও বাঙ্গালী যুবকের করায়ত্ত। ভবিষ্যতের বাঙ্গালীকে আচার্যদেবই পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার আশীর্বাদে আমাদের চলার পথের সকল বাধাবিপত্তি বিদূরিত হউক। আচার্যদেব বলিতেছেন,

এস কে আছো হৃদয়বান, কে আছ প্রেমিক, কে আছ কর্মী, কে আছ বীর, উঠাদিগকে—সহস্র বৎসরের সামাজিক অত্যাচারে পশুত্বে যাহারা পরিণত—উঠাদিগকে উঠাও, তোল মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি নির্বাপিত করিয়া দাও, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালায়, মালীরস্তপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে বাটে, ঘাটে, বাজারে বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে সর্বস্বাধীন স্বাধীনতার মৃতসঞ্জীবনী লইয়া যাও, আর বহু মহানিদ্রার অবসান হইয়াছে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত।

সংস্কৃতিরক্ষার উপায়

পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

মোগল, পাঠান দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে টিকিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ বেশীদিন পারিল না।

রাজনীতির দিক্ হইতে ইহার একটা ব্যাখ্যা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর একটা দিক্ দিয়া আলোচনা না করিলে ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝা যাইবে না।

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি এ দেশ হইতে ইংরাজকে তল্পীতল্পা গুটাইতে বাধ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, ইংরাজ এ দেশের সঙ্গে নিজেকে খোটেই খাপ খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়াই এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

মোগল পাঠানও হিন্দুস্থানে বিদেশীর মতই আসিয়াছিল, নানা অত্যাচারের কলঙ্ক আজও তাহাদের স্মৃতিপটে অনেক অংশ কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাপি তাহারা একটা বিষয় দেখাইয়াছিল—ভারতবর্ষকেই তাহারা তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আর ভারতবাসীর প্রাচীন সমাজজীবনকে তাহারা কোনদিনও ওলোট্-পালোট্ করিতে চাহে নাই। দুই একজন সম্রাট দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আঘাত হানিতে গিয়া আহত হইয়াছিলেন। এই যে সমাজজীবন অব্যাহত ধারায় চলিতে পাইয়াছিল, ইহারই ফলে ভারতে সুদীর্ঘকাল মুসলমানের টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব হিন্দুর এই সমাজ-জীবনে আঘাত হানিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বর্বরতার চূড়ান্ত চিত্র তাই ভারতের মানচিত্র হইতে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত বৈভব মিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে যে সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া বর্বরতাকে বীরত্বের নামে অর্চনা দেওয়া হইয়াছিল, সেই সোমনাথ আজও রহিয়াছে—যাহারা ভাঙ্গিয়াছিল, আজ তাহারাও তুল্য গোলাম হইতে বাধ্য হইয়াছে। সোমনাথ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গা যায়, কিন্তু সোমনাথের যে অধিকার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের হৃদয়মন্দিরে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, সে অধিকার অক্ষুণ্ণই রহিল।

গাজনীর সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচাইয়া মুসলমান যেদিন এদেশেরই মাটিকে মা বলিয়া ডাকিল, আমরা সোমনাথের দ্বার ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু সোমনাথকে ভুলি নাই। তাই মোগল পাঠানের মৃত্যুতে আনন্দ পাই নাই। আজও সিরাজদ্দৌলা, টিপু সুলতানের জন্য স্মৃতিসভা হয় ; নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে বাহাদুর শাহ সমাধিক্ষেত্রে পুষ্পবিসর্জন করিয়াছেন। আমরা যে অজানাকে ভাবপ্রবণ, এতটুকু আত্মীয়তার গন্ধ পাইলেই যে আমরা স্নেহান্ধ না হইয়া পারি না। ইংরাজ আমাদের এইটুকুও বুঝিল না। সাংঘাতিক শোষণী-বুদ্ধি তাহাদিগকে এতকাল শুধু পর পর করিয়াই রাখিল। তাহারা চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া কাহারও তাই এতটুকুও দুঃখ হইতেছে না ; নানা ছলে পাছে না যায়, বরং এই আশঙ্কাই অনেককে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাস কবে আসিবে—ইহারই জন্য দিন গণিবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। এককোঁটা অশ্রুজলও সে আজ অনাকরের vested interest ছাড়া কাহারও চক্ষে সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই। এতবড় বুদ্ধিমান হইয়াও ইংরাজ আজ সত্যসত্যই নিতান্ত বুদ্ধিহীন সাব্যস্ত হইয়া গেল।

গুলিস্তাঁর লেখক সাদী মাকি বলিয়াছিলেন—"ইংরাজ, তুমি সত্যসত্যই ভারি বীর। তোমার বুদ্ধিও আছে, বীরত্বও

আছে। তুমি অথাদ্য ভোজনটা ত্যাগ করিয়া এদেশেই যদি স্থায়ীভাবে বাস করিতে পার, তবে তোমায় ক্ষত্রিয় বলিয়া চালাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। এদেশের সমাজে যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একবার ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হইতে পার, তবে আর তোমার ভয় নাই। তুমি এদেশেই চিরকাল টিকিতে পারিবে।" একজন ইতিধারী পণ্ডিতের কথাটার তাৎপর্য্য তাহার মাথায় ঠিকমত প্রবেশ করে নাই। বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধিই তাহাকে বড় করিতে লাগিল। শিখ, দুর্ধা, মারাঠা, রাজপুত—একের দ্বারা অপরকে দমন করিবার কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি দেখিয়া ইংরাজ তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিল। বল-বাহে নাচিয়া নাচিয়া বীরত্বের সমাধি রচনা করিল। চান্‌কার্কের কেলেঙ্কারী তাহার ঘুম খেদানো ভার করিয়া তুলিল। ভারতকে বাঁধাইয়া রাখিবার মত আর যা আছে তাহার বাঁধাবন, না আছে ধনবল, জনবল। আর সর্ব্বোপরি তাহার মনোবল পর্য্যন্ত ঘুচিয়াছে।

ধনজন কাহারই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনোবল তাহার নষ্ট হইল কেন? ইংরাজ ভারতকে জয়ী করিতে পারে নাই, বরং ভারতীয় মহত্বকে চূর্ণ করিয়াই চক্রান্ত করিয়া আসিয়াছে। মোগলের অত্যাচারের কথাগুলি ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিতে পারিয়াছে, কিন্তু আজও পাঁ আলম্ বাদ্‌শার কার্য্যকে দ্বারা অধিকার সৌধীদাস স্থাপত **ইঙ্গপৌরনিত্যানন্দের** ঐশ্বর্য্যের যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, তাহার কথা কোথায় লিখিয়াছে? দুখে দুখে এদেশের ভালো মন্দের সঙ্গে মোগল যেমন করিয়া কতকটা আপনার হইতে পারিয়াছিল, ইংরাজ কুত্রাপি তাহা পারে নাই।

ইংরাজ ভাঙিতে শিখাইয়াছে—গড়িতে চাহে নাই। ফলে ভারতের শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন ক্রত উপাদান হইয়াছে। ঠগীদের বিচারের রিপোর্ট দাখিল করিবার সময় কর্ণেল স্লীম্যান্ বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"উহাদের মধ্যে এমন অনেককে দেখিয়াছি, যাহারা সামান্য একটা মিথ্যা কথা বলিলেই হয়ত তাহাদের ধর্ম, সম্পত্তি এমন কি জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা পাইতে পারিত, কিন্তু একজনও মিথ্যা কথা বলে নাই।" ভারতের এই সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া ইংরাজ বিস্মিত হইয়াছিল—তারপর কি করিয়া কি হইল, সে দুর্ভাগ্য ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। ফল হইয়াছে এই যে, ইংরাজ যাইবার সময় দেখিতেছে—ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে অধর্ম্মের কক্ষা বহিতেছে, সত্য আত্ম-গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, মিথ্যা নানা আবরণে রাজসম্মানে বিভূষিত। এ অবস্থায় ইংরাজ যাইতেছে বলিয়া দুঃখ করিবার কিছুই থাকিল না। বরং ইংরাজের আমলে আমাদের সংস্কৃতির ধারা যে ভাবে উৎসাদিত হইতে চলিয়াছে, কেমন করিয়া এখন তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়, সেই ভাবনাতেই ভারতবাসী আকুল হইয়াছে।

এতকাল যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে; কিন্তু যাই যাই করিয়া এইবার ঠিক জাহাজ ভাসাইবার আগে ইংরাজ যেভাবে এদেশের সর্ব্বনাশ সম্পন্ন উৎপাত হইবার অবসর করিয়া দিল, যাহারা সংস্কৃতি রক্ষার এতটুকুও ধরণী, তাহারা কোনদিনই তাহা ক্ষমা করিতে পারিবে না। Eastern Express (৬, মার্চ ১৯৪৭) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—

We hear so much about the efficiency of British administration in India and the ability of British officers. But is not Calcutta where there is so little security of life and property at the present moment still administered by a British Police Commissioner? Does not the ultimate responsibility for the maintenance of law and order and the investigation of crimes lie upon him? Is not Calcutta the seat of the Chief Secretary and the Home Secretary, both of whom are British? The pretention of provincial autonomy can not absolve them of their responsibilities

প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার এবং যে তাহার ভাগ্যাকাশে এ কথাও পরবর্ত্তী ঘটনাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

If the Ministers words are so sacred, then how did the officers in the Civil Service and the Imperial Police flout the Ministers' instructions during the 1942 movements?

এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ১৯৪২ সালেও ইংরাজের আশা ছিল, আরও কিছুকাল ভারতে সাম্রাজ্য সুখভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু আজ আর তাহার সে আশা নাই। পার্লামেণ্টে চার্চ্চিলের দল হাঁকার করিতে থাকিলেও, ইংরাজজাতি আর ভারতকে ধরে রাখিতে যে অশক্ত, শ্রমিক সরকার অকুণ্ঠ কণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজকে এদেশ ছাড়িয়া যাত্রা করিতেই হইবে।

কিন্তু এই মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিরও যে মহাযাত্রার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এ দেশের যে শিক্ষাপদ্ধতি যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের সমাজ জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার বন্যা-প্লাবনে তাহার মূলোচ্ছেদ হইবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, এ দেশের টোলগুলি প্রায়ই সব উৎসাদিত হইয়াছে। প্রাচীন পৌরবের অবলম্বনস্বরূপ যাহারা বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহাদের অধিকাংশেই বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহারা মরে নাই, তাহাদের খুবই কঠিন 'জান্' সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারাও কতক না খাইয়া তিলে তিলে মরিতেছে, আর কতক 'বুদ্ধিমান্' ইংরাজীনবীশের আগুতায় আত্মরক্ষা করিয়া সাময়িক পরিত্রাণের পথ করিয়া লইয়াছে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা-পরম্পরা এখন কেমন করিয়া যে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে, তাহাই এখনকার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম সমস্যা।

দেশে এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক গুণ্ডামী চলিবেই। ১৯৪৮ সালের জুন মাস তো দূরের কথা—তাহার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার ভরসা নাই। সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী সময়টি অত্যন্ত

সঙ্কটপূর্ণ। এই সময় একদল ত্যাগী বেপরোয়া চাই, যাহারা আমাদের সংস্কৃতি রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিবে। স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনায় কারাবরণ —এসব কি ক'দিনের মধ্যে সরল স্বীকারেও এ দেশের ছেলেরা পশ্চাৎপদ হয় নাই, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া তিলে তিলে মরণ স্বীকার করিয়া লইয়াও নিজেদের সংস্কৃতির ধারা রক্ষায় উৎসাহী মন কোথায়? এই মনের অভাব হইয়াছে—সাহসের অভাব জন্য নয়, সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেমেরই অভাবজন্য।

অথচ এই সংস্কৃতি খুঁড়িয়া গেলে, আমাদের রহিল কি? যেমন পাঠানের মতো ইংরাজের রাজ্যও হইতো খুচিয়া। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি—আমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত অপরূপ সংস্কৃতির পবিত্র ধারা খুঁড়িতে দিব কেন? যাঁহারা আজ বোলশেভিট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জয়োদ্ঘোষণে পঞ্চমুখ, তাঁহারা তো জানেন, রাশিয়া আজ পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব নিদর্শনগুলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমরাই তবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিব কেন? আমাদের গর্ব্ব গৌরবের অনেক কিছু খুচিয়াছে, এখনও যাহা আছে, তাহাও কি পৃথিবীর বিস্মরের বস্তু নয়?

বাঙ্গালোর হইতে এই সেদিনও তো সংবাদ বাহির হইয়াছে—৮০ বৎসর বয়স্কা এক বিধবা ভিখারিণী তাহার সারা জীবনের ভিক্ষালব্ধ সঞ্চয় মোট ১ রাজার টাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিয়া বলিয়াছে যে, এই টাকায় উপরন্তু যেন উলসুরের ঠাকুর শ্রীসোমেশ্বর স্বামীর মন্দিরে পূজার ব্যয় করা হয়।

টাকার পরিমাণ বেশী নয়, কিন্তু প্রাণের পরিমাণ কতখানি?

এত কাণ্ডকারখানার পর আজও এই চিত্র লোপ পাইল না। শঙ্কর মুখ হাই দিয়া ভিখারিণী তাহার প্রণয়-স্বামী সোমেশ্বর স্বামীরই ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে।

ভিখারিনী যাহা করিল, ভিখারীর দলের তাহা দেখিয়া কি চৈতন্যোদয় হইবে? আমাদের পবিত্র সংস্কৃতি বাঁচাইয়া রাখিতে একদল কি অগ্রসর হইবে?

নির্লিপ্ত মৌলিকগণ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণ কমল রায়

আমাদের পৃথিবীটা বিরাটকায়ের আওতার মধ্যে আছে। ইহার যাবতীয় শরীর—বৃক্ষলতা, গাছপালা, পশুপক্ষী, পাহাড়পর্ব্বত, জল-বায়ু একান্তভাবে ঐ বিরাটকায়টী মৌলিকেরই পরিণতি। মৌলিকদের মধ্যে কোন কোনটী একা থাকিতে ভালবাসিলেও প্রয়োজনমত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, ইত্যাদি এই শ্রেণীর মৌলিক। আবার উহাদের কোন কোনটী মোটেই একা থাকিতে পারে না, যুক্তাবস্থায় থাকাই উহাদের স্বভাব। ঐ যুক্তাবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের কতকগুলি আইন্ কানুন মানিয়া চলিতে হয়। উহাদের বলে রাসায়নিক গঠন প্রণালী। মৌলিকগণ যখন উহা রাসায়নিক প্রণালী মাফিক পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয় তখন আমরা ঐ যুক্তকণকে 'যৌগিক' আখ্যা দিয়া থাকি। কাজেই এ বিশ্ব সংসার যৌগিক ও ও মৌলিকেরই রাজত্ব। মৌলিকদের মধ্যে কিছু দিন হয় একটি তৃতীয় শ্রেণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহারা কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে রাজি নয়। মৌলিকদের যুক্ত হওয়াটা আমাদের সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সামিল। মৌলিকদের মধ্যে কতকগুলি ঘোর সংসারী, কতকগুলি অর্দ্ধসংসারী, আবার কতকগুলি মোটেই সংসারী নয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুগুলি সংসারী হইলেও নির্লিপ্ত। সংসার জীবন গ্রহণ করিয়াও ইহারা মহান। পটাসিয়াম, সডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্রোমিয়ম, ব্রোমিন্, ইত্যাদি মৌলিকগণ ভীষণ সংসারী। এক মুহূর্ত্ত সংসার ধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত হইতে ইহাদের বাসনা নাই। দুনিয়াটা প্রকৃতপক্ষে রক্ষা ক'রে ইহারাই। তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকগণ জীবনে কখনও সংসার আস্বাদন করে নাই। উহারা নিত্যমুক্তের মত। ওনিয়াদি নিত্যমুক্তেরা অমর, অজর হইয়া সুদূর বিরাজ করেন। আমাদের এই নিত্যমুক্তগণও আকাশে থাকিতেই ভালবাসে।

মহারাজা লর্ড র‍্যালে (Rayleigh) এই মুক্ত মৌলিকদের আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে আকাশে বায়ুর ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন। এই যে বিভাগ ইহা যথার্থ বিভাগ নয়। তুলচেরা বিচার করিলে উহাদের ছাড়াও বায়ুতে ৩টী মৌলিকের অবস্থান দেখা যায়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেভেনডিস, এক সময় তাহার পরীক্ষাগারে ইহার প্রমাণ পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি আর বেশীদূর অগ্রসর হন নাই। কেভেনডিস্ কতকটা পরিমিত বায়ু হইতে নেত্রজান ও অক্সিজেনকে একবার অপসারণে চেষ্টিত হন্ কিন্তু দেখা যায় তাহার সমস্ত চেষ্টাতেও বায়ুর ১/১২০ ভাগ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই অবশেষ অক্সিজেনও নয়, নাইট্রো-জেন ও নয়। প্রায় ৫০ বৎসর পরে লর্ড র‍্যালে কেভেনডিসের পরীক্ষণ ব্যাপারটিতে মনসংযোগ করেন এবং প্রমাণ করেন যে ঐ অবশিষ্ট গ্যাসটুকু কিন্তুই কোন নূতন মৌলিক। পণ্ডিতপ্রবর স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে এ সময় র‍্যালের সহায়ক ছিলেন। দুইজনের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে আবিষ্কৃত মৌলিকটী ধরা পড়ে (১৮৯৪)। প্রথমতঃ পণ্ডিত-সমাজ উহাদের ঘোষণাকে অবহেলা করেন, কিন্তু ক্রমশঃ উহাদের যুক্তি তর্কের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হন্। সকলেই ইহা মানিয়া

লইয়াছেন যে, বায়ুতে আরগনের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ। ইহা বর্ণহীন, অক্সিজেন ও নেত্রজান হইতে দেড়গুণ ভারী।

পরবর্ত্তী ঐতকালে র‍্যামসে যখন আরগন অবস্থিতির নূতন সূত্র খুঁজিতেছিলেন ঠিক সেই সময় আর হেন্‌রি মায়ার্স তাঁহাকে একটি খনিজ পদার্থ পরীক্ষা করিতে দেন। র‍্যামসে ইহা নিয়া পরীক্ষা করিতে যাইয়া অপর একটি মৌলিকের সন্ধান পাইলেন। ইহার নাম "হিলিয়াম"। ইহাও একটি বর্ণহীন নিলিপ্ত মৌলিক। হাল্‌কা হিসাবে ইহার স্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পরেই। ইহা বায়ুতে ২০০,০০০ ভাগে এক ভাগ আছে।

আরগন ও হিলিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতদের বদ্ধ ধারণা জন্মে যে বায়ুতে নিশ্চয়ই আরও কয়েকটী নিলিপ্ত মৌলিক আছে। কারণ দেখা গিয়াছে—কোন পরিবারই একটী দুইটী মৌলিক দ্বারা সাধারণতঃ গঠিত নয়। এই ধারণায় উৎসাহিত হইয়া র‍্যামসে ও তাঁহার সহকর্মীগণ বায়ুতে উহাদের তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে থাকেন এবং ১৮৯৮ খৃঃ উহারা সত্য সত্যই ক্রিপটন্, জেনন্ ও নিয়নের সন্ধান পান। কিন্তু দেখোক্তকে পাওয়ার জন্য তাঁর নামক পণ্ডিতের ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ক্রিপটন্ আছে বায়ুতে ৬৬০০০ ভাগে এক ভাগ; জেনন্ আছে ২,০০০,০০০ ভাগে ১ ভাগ ও নিয়ন আছে ১১,০০০,০০০ ভাগে এক ভাগ। প্রথম দিক দিয়া উহারা সকলেই পণ্ডিতদের নিকট কৌতূহলের বস্তু ছিল, ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োগ করার কোন সুযোগ সুবিধা না পাওয়াতে তখন কেহই উহাদিগকে বেশী প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হয় নাই। তৎপর প্রায় ২০ বৎসর পরে প্রমাণিত হয় যে নিলিপ্ত হইলেও আরগন একদম অকর্ম্মণ্য নয়। আরগনের ফুটনাংক নাই-ট্রোজেনের ১০ ডিগ্রি বেশী, অক্সিজেনের ৩ ডিগ্রি কম। বায়ুকে তরল করিলে তরল বায়ু হইতে জেনন্ সর্ব্ব প্রথম উড়িয়া যায়, তৎপর ক্রিপটন্, অক্সিজেন, আরগন, নেত্রজান ও সর্ব্বশেষে নিয়ন ও হিলিয়াম একে একে বাহির হয়। ইহাদের কাজেই বাষ্পীকরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ করা যায়। নিলিপ্ত আরগনকে পাইয়া মানুষ বন্ধু হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা বিদ্যুৎ আলো গোলকের মধ্যে বিরাজ করিয়া ইহার প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে। এখন পূর্ব্বের মত গোলকের তার তত্টা নষ্ট হয় না। একমাত্র এই ব্যাপারেই প্রচুর আরগন লাগে।

আমেরিকাতে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ হইতে হিলিয়াম প্রায়শঃ উত্থিত হয়। ইহাও নিলিপ্ত, কাজেই দাহ্য নয়, অথচ বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা; এই সমস্ত গুণের সাহায্য পাইয়া বৈজ্ঞানিক ইহাকে বেলুন, বা উড়োজাহাজে ব্যবহার করেন। নিয়ন্ গ্যাসটী ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যুৎ-বাহী গোলক নিয়ন পূর্ণ থাকিলে ইহা হইতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সময় উজ্জ্বল লাল আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই উজ্জ্বল আলো দ্বারা বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীগণ রাত্রিতে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে আরগনের পরিবর্ত্তে ক্রিপটন্ ও জেনন্, বিদ্যুৎ গোলকে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে ইহাতে গোলকের জীবন ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ১২০০ টন্ তরল বায়ু হইতে ১ পাউণ্ড জেনন্ পাওয়া যায়।

বিষকন্যা

শ্রীআশা দেবী এম-এ

যে ছলনী তব উরস বুকের মাঝে,
কোটে নাকি সেথা কামনার শতদল—
অকারণে তবু বিরলা হও না সাঁঝে?
গোধূলি আঁধারে হও নাকি বিহ্বল?
তুলসীর মূলে আলো নাকি তুমি আলো,
সন্ধ্যা-শঙ্খ বাজে না তোমার ঘরে?
নিশার আঁধারে শুধু জ্বালা কালো কালো
ভুরু ভরে শুধু তব অজর পরে।
চক্ষে তোমার যে নীল-কাজল-রেখা,
সে যে মরীচিকা—সাহারার মায়া রাগ,
নীলালক্তকে কার শোণিতের লেখা,
আলুল-বেণীতে গর্জ্জায় কাল-নাগ।
হে বিষকন্যা, একি খেলা অভিনব!
ছলনা তোমার নিত্য নূতনতরো।

একি অভিসারী সজ্জা হয়েছে নব,
হে মৃত্যুরূপা—মানসী মূরতি ধরো।
হে ছলনাময়ী, হে অভিশপ্তা নারী!
তুমি চিরদিন জ্বালো মরু বুকে তৃষা,
নীড় নাকো ঘর তুমি চিরপথচারী,
তোমার আকাশে ঘন দুর্য্যোগনিশা।
তব অভিযানে অশ্রু ঝরি যে ঝরে,
ঝরা নয় সে তো তরল বহ্নি জ্বালা,
তব নিশ্বাস ওড়ে বৈশাখী ঝড়ে,
ঝঞ্ঝা-উষর তোমারি চিরমালা।
হে স্বর্গিণ, তোমার বিশ্বাস নাই,
তিল তিল ক্ষিয়ে তুমি যে তিলোত্তমা,
কত ট্রয় কত যুদ্ধকেতে তাই,
ছলে তব রূপ কৃষ্ণ-বহ্নি সমা।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

বিমলদাই মন্দির পরিবেষ্টনীবরণ অলিন্দ প্রদক্ষিণ ক'রে ও তৎসংলগ্ন ৫২টি তীর্থঙ্করের গুহামন্দিরগুলি দর্শনান্তে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে তার মধ্যস্থলে নির্মিত সেই মর্মর মণ্ডপটিতে গিয়ে উঠলুম। এটি যেন অনেকটা সেই গর্ভ মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরের মতো।

মর্মরনির্মিত বৃহৎ আটটি স্তম্ভের উপর সেই নাটমণ্ডপের বিশাল গম্বুজ। এক একটি দিন উদয় অস্ত যদি কেবল এক একটিমাত্র স্তম্ভ পাশে সেই বিপুল শিল্পীদের উৎকীর্ণ মূর্তি ও কারুকলার বৈচিত্র্য অনন্যমনে অনুধাবন করবার অবকাশ পেতুম তাহ'লে হয়ত সেগুলি আশ মিটিয়ে দেখা হ'ত। কিন্তু সময় ছিল না। ৬টায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হ'য়ে যাবে।

"একরাত্রি শুধু পরমায়ু—!
তারি মাঝে শুনে নিতে হবে—
ভ্রমর গুঞ্জন গীতি,
ধরাতের আনন্দ মর্মর!"

স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য শিল্প ভারতে যে একদিন চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল একথা দিলবারা মন্দির ও তাজমহল দেখবার পর আর অস্বীকার করবার উপায় নেই! ভারতবাসীদের বাবু, বর্বর ও অসভ্য বলে পৃথিবীর লোককে যেসব বুঝিয়ে এসেছেন, তাঁদেরও এখানে এলে আর বাক্যস্ফূরণ হবে না!

গুহাস্থ স্থাপত্যকলা ও মূলমন্দির ভাস্কর্য শিল্পের এখানে একেবারে রাজযোটক হয়েছে যেন। কাল ও কলার মহামিলনের ঐকতান যেন এই মন্দিরের দিকে দিকে। যুগে যুগে কালে কালে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে বিস্ময়াভিভূত দর্শকের বিহ্বল মনে আনন্দের তালে তালে! অন্তরে অন্তরে গুঞ্জরণ করে ওঠে এই মর্মর সঙ্গীতের বর্ণদীপ্তি। অনুরণিত হয়ে ওঠে মুগ্ধ হৃদয়ের দিক্‌দিগন্ত—

"তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী!
আমি শুনি—শুধু অবাক হয়ে শুনি!"

কারুকার্যখচিত তিনটি প্রশস্ত মর্মর সোপান ধাপে আমরা উঠলুম গিয়ে প্রধান মন্দিরের চত্বরে। প্রশস্ত চত্বর, উন্মুক্ত দ্বারপথেই দেখা যাচ্ছে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত যেন তীর্থঙ্কর আদিনাথের সমুজ্জ্বল বিরাট মূর্তি। মণিময় তাঁর নয়নে মাণিক্যপ্রভার ভ্রান্তি, বিবিধ মহামূল্য রত্নাভরণে ভূষিত তনু। কিন্তু মূর্তিটি বিবসন। পূর্বদৃষ্ট ৫২টি তীর্থঙ্করেরও প্রত্যেকটির মূর্তিই বিবসন, কিন্তু নিরাভরণ নন কেউই! প্রত্যেকেরই চক্ষে বক্ষে বাহুমূলে কণ্ঠদেশে ভুজবন্ধে ও পাদপদ্মে মূল্যবান মণিরত্ন পরিবেশিত রয়েছে।

নাটমন্দিরের গম্বুজটির অভ্যন্তরভাগে চক্রাকারে পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা আছে অপরূপ বিদ্যাধরী ও গন্ধর্বকন্যাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গীতে গঠিত প্রতিমূর্তি। অলিন্দের প্রত্যেক চক্রাকারে (coiling) কোনোটিতে উৎকীর্ণ করা আছে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কমলকলির মধ্যে কল্পলোকের পুষ্পকারি। কোনোটিতে ইন্দ্রসভায় উর্বশী মেনকাদের লীলায়িত নৃত্য। কোনোটিতে তেত্রিশ কোটী দেবতাদের সমাবেশ! রামায়ণ, মহাভারতের কত কাহিনীই না উৎকীর্ণ রয়েছে প্রত্যেক স্তম্ভ গাত্রে। স্তরে স্তরে খোদিত আছে নানা বিচিত্র শিল্প কলার সুগভীর পরিকল্পনার সঙ্গে—দেবাসুরের যুদ্ধ, সমুদ্রমন্থন, শিবতাণ্ডব, নবনাট্য, মোহিনীরূপ ইত্যাদি নানা পৌরাণিক কাহিনীর মূর্ত আলেখ্য মন্দিরটির সর্বত্র! যেদিকে চাইবে চোখে পড়বে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পার্বতী, লক্ষ্মী,

গণপতি, কার্ত্তিকেয়, বীণাপাণি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, যক্ষ, বিদ্যাধর, কমলা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, গঙ্গা প্রভৃতি বেদদেবীর মনোহারিণী বিশ্ব মূর্ত্তি। আর আছে—বিষ্ণুর বাস্তব রূপে পরিবেশ-সমুদ্ভাসিত ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, মৃগ, গরুড়, হংস, মকর, মহুর, মৎস্য, নৃগ প্রভৃতি দেবযানের ও কল্পতরু, বসন্ত, পারিজাত প্রভৃতি দেবতরু। আরও আছে—নিখুঁত ভাস্কর্য্যে পরিস্ফুট কত রথ, কত যুদ্ধরত সৈন্যিকের দল ও কিন্নর কিন্নরীর কমনীয় মূর্ত্তি।

প্রধান মন্দিরের চত্বরে

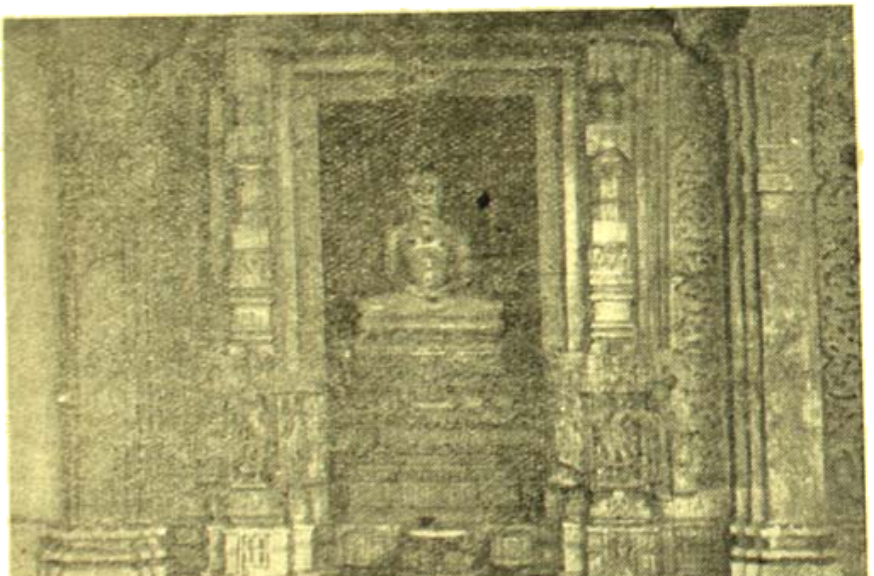

প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর—আদিনাথজীর মূর্ত্তি

বিমলশাহী মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে অম্বাদেবীর মন্দির। প্রবাদ যে এই অম্বাদেবীর মন্দিরটি অতীব প্রাচীন। বিমলশাহী মন্দির নির্ম্মিত হবার বহুপূর্ব্ব হ'তে এই মন্দিরটি এখানে ছিল। এই প্রাচীন মন্দিরটিকে অক্ষত রাখবার জন্যই বোধ বিমলশাহকে তাঁর মন্দিরের নক্সা বাধ্য হয়েই এইরূপ আয়তক্ষেত্রাকারে করতে হয়েছিল। অম্বাদেবীর মহার্ঘ বসনপারিপাট্য যে কোনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মন্দির দ্বারে এক ভৈরব মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এক হাতে অসি আর এক হাতে নরমুণ্ড। পাশেই একটি কুকুর রক্ত পানের জন্য লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিমলশাহি মন্দির থেকে আমরা বেরিয়ে এলুম পার্শ্ববর্ত্তী বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি দেখতে।

এই উভয় মন্দিরের সংযোগস্থলে আছে বিমলশাহের হস্তীশালা। এই হস্তীশালার প্রবেশ পথে স্থাপিত আছে স্বয়ং বিমলশাহের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি। হস্তীশালার মধ্যে দশটি বড় বড় মার্ব্বেল পাথরে তৈরী খেত হস্তী রয়েছে। প্রত্যেক হস্তীপৃষ্ঠে এক একজন আরোহী ছিল। তাদের অধিকাংশই আজ অদৃশ্য হয়েছে। কে বা কারা সেগুলি ভেঙে নিয়ে গেছে জানা নেই। পায়ে বাকীগুলিও অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভয়ে হস্তীশালাটি আজকাল সুরক্ষিতভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে।

বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি ১২৩১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়েছে। ষাবিংশতম জৈনতীর্থঙ্কর নেমিনাথজীর নামে ধনী শ্রেষ্ঠি বাস্তুপাল ও তেজপাল দুই ভাই মিলে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর মন্দির যেমন বিগ্রহের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাতার নামে 'বিমলশাহী মন্দির' বলে পরিচিত, এমন্দিরটিকেও তেমনি লোকে 'নেমিনাথের মন্দির' না বলে বাস্তুপাল তেজপালের মন্দির বলে।

এ মন্দিরটিরও প্রতি ইঞ্চি অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য শিল্পের পরিচয় বহন করছে। 'বিমলশাহী মন্দির' নির্ম্মাণের প্রায় দু'শো বছর পরে এই

বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি তৈরী হয়েছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় দুটি মন্দিরই যেন একই শিল্পীর হাতে গড়া! দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ব্যবধানেও ভারতের অনুসরনীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের যে এতটুকুও অবনতি ঘটেনি এটা বড় কম বিস্ময় ও গৌরবের কথা নয়! সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে, আবু পর্ব্বতের ধারে কাছে কোথাও মর্ম্মর-শিলার অস্তিত্ব মাত্র নেই! না জানি কত সুদূরান্তর থেকে হস্তের পালকের মতো ধবধবে সাদা এই মর্ম্মর প্রস্তর এত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল এবং সেগুলিকে টেনে তোলা হয়েছিল এই পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে উঠবার যে কোনও ভাল ও সুগম পথঘাট ছিলনা একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কেমন করে তাঁদের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল ভেবে বিস্ময়াহত হতে হয়। যে মন্দিরের এক একটি স্তম্ভ, এক একটি তোরণমন্ত্র, এক একটি মণ্ডপ ও ছাদের নিম্নভাগের বিভক্ত ছত্রী বা চন্দ্রাতপগুলির অপরূপ ভাস্কর্য্য শিল্প ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে একটা পুরোদিনও ফুলিয়ে ওঠেনা, না জানি এ মন্দির শেষ করতে কতগুলি শিল্পীর কতকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করতে হয়েছিল!

নেমিনাথের মূর্ত্তিও মহামূল্য মণিরত্নালঙ্কারে ভূষিত। সর্ব্বত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে এত মূল্যবান রত্নাভরণে মণ্ডিত করে রাখার তাৎপর্য্য বা সার্থকতা কিছু বুঝলুম না! জৈন ভক্তদের অস্বাভাবিক অহংপ্রীতি ছাড়া এ সুদৃশ্য রত্নাবলির আর কি অর্থ হতে পারে!

পূর্ব্বেই বলেছি পরিকল্পনার দিক থেকে বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দিরের সঙ্গে ষোল বছর আগের তৈরী প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দিরের বিশেষ কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না। তবে, এ মন্দিরটির গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ বা নাটমন্দির বিমলশাহী মন্দিরের চেয়ে বড় ও অনেকটা উঁচু, স্তম্ভগুলিও দীর্ঘতর, এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া জৈনধর্ম্ম পুরাণোক্ত কয়েকটি মূর্ত্তি ও বৃত্তাবলীও উৎকীর্ণ আছে এর মন্দিরচত্বর বা চন্দ্রাতপতলে। নানাদিক দিয়ে এ মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য্য আরও সুসমৃদ্ধ, লাবণ্যময়, সূক্ষ্ম রুচির পরিচায়ক এবং সুসম্পূর্ণ ও উন্নত ধরণের বলা চলে। সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর নিরত অনুশীলনের ফলে ভাস্কর্য্য শিল্পের ক্ষেত্রে আদিকের এ উৎকর্ষ লাভ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিকল্পনার কোনও নূতনত্ব না রেখতে পেয়ে বোঝা যেন এদের হাত এগিয়েছে, কিন্তু মাথা পিছিয়ে পড়ে আছে।

দিলবারা

বাস্তুপাল ও তেজপাল মন্দিরান্তরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য শিল্প বলা যায় মণ্ডপের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণ রসোৎসবের একটি দৃশ্য। বসন্তঋতুর আবির্ভাবে মিলনব্যাকুল তরুণতরুণী যেন সারা প্রকৃতির আনন্দ স্পন্দনের সঙ্গে তাদের যৌবনের হৃদয়কে রঙ্গহীন করে মুক্তি দিয়েছে! ধনধান্যদাত্রী লক্ষ্মী ও জ্ঞানদাত্রী বাণীকে উপেক্ষা করে তারা বসন্তরাজ বসন্তের অনুগত হয়ে মন্মথের উপাসনায় প্রবৃত্ত!

অগণিত পশুপক্ষী, ফুলফল, মাল্য, মুকুট ইত্যাদি দ্বারা প্রসাধিত বেদীমূলে বিবিধ ভঙ্গীতে অসি-চর্ম্ম-ধনুর্ব্বাণ অনেকগুলি বীর যোদ্ধার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

নেমিনাথের প্রধান মন্দিরের দু'পাশে দুটি বৃহৎ কুলুঙ্গী আকারের প্রাচীর গাত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এ দুটির স্থানীয় নাম "দুরানী-জিঠানী-কি-আলিয়া"। প্রবাদ যে বাস্তুপাল ও তেজপাল দুই ভাইয়ের পত্নীদ্বয় তাঁদের বিবাহের অর্থকোষ থেকে সতর লক্ষ টাকা এক এজমালি খরচ করে এ দুটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। চমৎকার এর পরিকল্পনা। নিখুঁত এর গঠনভঙ্গী। আমরা দেখি আর ভাবি যে মন্দিরের দেওয়ালে দুটি কুলুঙ্গী নির্ম্মাণ করতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, সে মন্দিরটি গড়তে না জানি কত কোটী টাকাই ব্যয় হয়েছে!

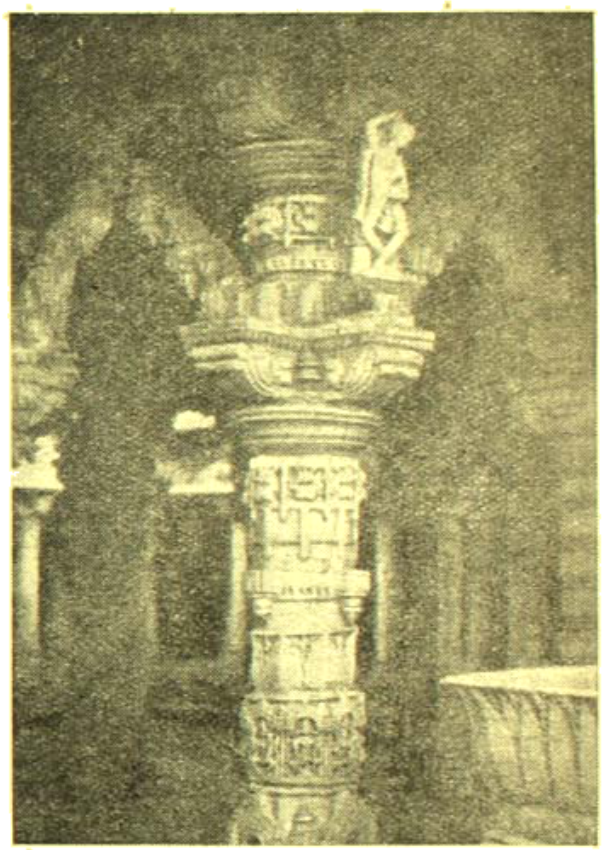

মর্ম্মর মাল্য-তোরণ

বাস্তুপাল ও তেজপাল মন্দিরের আশ্চর্য্য নিদর্শনগুলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য বস্তু হচ্ছে—পাল ও সাতশ যোড়িত মাথর-গামী-যুক্ত তরণী নিচয়! এই অর্ণবপোতগুলির অস্তিত্ব সর্ব্বকালের কাছে এই কথাই সপ্রমাণ করে যে 'একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিত ভারত সাগর-ময়!' কথাটা মিথ্যা নয়। নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধনী শ্রেষ্ঠী বাস্তুপাল ও তেজপাল দুজন, পৈতৃক বাণিজ্য আহার ভাগিয়ে বেশ বেপারে আমদানী-রপ্তানীর কারবার চালিয়েই এবন অগাধ অর্থশালী হয়েছিলেন, যে অর্থ বলে শ্রেষ্ঠী বিমলশাহের মতো তাঁরাও একদিন রাজা বীরবলের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

বিমলশাহী মন্দির ও বাস্তুপাল-তেজপাল মন্দির, দিলবারার পরম বিস্ময়কর এই দুই মন্দির দেখে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভারতীয় শিল্প-কলার একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ফার্গুসান্ সাহেব স্থাপত্য কলাও ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্যের তুলনামূলক বিচারে কোনটি অধিকতর সুন্দর বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"Were twenty persons asked which of these two temples is the more beautiful, a large majority would, I think, give their vote in favour of the more modern one, which is rich and exhuberant in ornament to an extent not easily conceived by one not familiar with the usual forms of Hindu Architecture.....I prefer infinitely the former, but I believe that nine tenths of of those that go over the building prefer the latter."

একটি স্তম্ভের কারুকার্য

সুতরাং কোনটি বেশী ভালো, এ বিচার আমাদের মতো আনাড়ীদের না করাই ভালো।

বাকী আর তিনটি মন্দিরের একটি হ'ল 'চৌমুখীজীর' ত্রিতল মন্দির। এ মন্দিরের মর্ম্মর স্তম্ভগুলির ও উৎকীর্ণ মূর্ত্তি কয়েকটি স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্য শিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়টি 'শান্তিনাথজী'র মন্দির, আর তৃতীয়টি বাঙ্কাশাহী মন্দির। এ ছাড়া সিদ্ধপুর জৈনদেরও একটি মন্দির আছে। কিন্তু, শেষোক্ত গুলির মধ্যে স্থাপত্য কলা বা ভাস্কর্য্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নিদর্শন পাইনি।

অচলগড়

দিলবারা মন্দিরগুলি দূরে দূরে রেখে যেন আমাদের আশা আর মিটছিল না। কিন্তু শিল্পীর মূর্ত্তকল্পনার সেই মর্ম্মর-স্বর্গ ছেড়ে আমাদের আবার মানব জগতে ফিরে আসতেই হল। গাইড স্মরণ করিয়ে দিলে ৪টার ঘণ্টা পড়ে গেছে। আমাদের এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না।

মন্দিরের বাইরে পা দিতেই নবনীতা বললে—তৃষ্ণা পেয়েছে। জল খাবো।

তাকে ধমক দিয়ে তৃষ্ণা ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। এই পাহাড়ের মন্দির-চত্বরে জল কোথা পাবো?

গাইড বললে—খুব ভাল জল পাওয়া যায়। একটু অপেক্ষা করুন, এখনি এনে দিচ্ছি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি বড় পিতলের ঘটে ভর্ত্তি জল নিয়ে এল সে। পার্ব্বত্য কূপের সুশীতল পানীয়। খুকুকে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান করতে দেখে আমরা সকলেই পিপাসা বোধ করলুম।

একে একে সকলকেই গাইড আমাদের জলপানে তৃপ্ত ক'রে বখ্‌শিসের মামুলী বাড়িয়ে নিলে।

আমরা দ্বার-রক্ষীর নিকট দিয়ে আমাদের পরিত্যক্ত সমস্ত চর্ব্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় বোঝার বুঝে ফেরত নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

মন্দিরের নির্গমন পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পৌঁছে দেখি, একটি চমৎকার চা'য়ের আড্ডা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের চা-প্রেমিকদের গতি সেখানে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরের প্রবেশপথে এটির অস্তিত্ব কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কারণ, মন্দিরের আগমন-নির্গমনের পথ দুটি ভিন্ন। মন্দিরের মধ্যে যেসব যাত্রীদের সঙ্গে সেই পার্শী পুরুষ ও মহিলার দল এবং কয়েকজন গুজরাটি সহযাত্রী সেখানে ইতিমধ্যে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল।

চা পানের অবসরক্ষণে তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় হল। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর এবং কলকাতার অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। নোয়াখালি ত্রিপুরা চাঁদপুরের খবর তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার ১৬ই আগষ্ট ও ২৬শে অক্টোবরের হাঙ্গামাও তাঁদের কাণে পৌঁছেছে। তাঁদের সঙ্গে অল্প আলোচনায় বুঝলাম বাংলাদেশের বুকে যে মর্ম্মন্তুদ আঘাত লেগেছে, তার শুভবেদনার রক্তাক্ত তরঙ্গ সুদূর রাজপুতানার এই প্রত্যন্ত সীমার মানুষগুলিকেও বিচলিত করে তুলেছে। অখণ্ড ভারতের এই আত্মিক যোগ, এই অন্তরের ঐক্যের আন্তরিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলুম। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠলো—

"...ইহাতে এসেছ যবে তুমি—
খণ্ড নহে এ ভারত, অখণ্ড এ মানবের মহামহাভূমি।
কিসেরই ইতিবৃত্ত নিখাদে করেছে রচনা,
মানুষ সহেক পর, পরস্পর পরম আত্মীয়।

জাতিধর্ম নয়ে তার আপনার সহা পরিচয়,
প্রাণের অন্তর্লোকে মানুষ কোথাও ভিন্ন নয়।
ভিন্ন জাতি—ভিন্ন ভাষা—ভিন্ন বর্ণ—বাহিরের রূপ ;
মানুষের যেন নয়ে মৃত্তিকার তলে যত ক্ষুদ্র মধুকের কূপ !"

আমরা বহুদিন বেলঘাড়া। বলনুম—হালের খবর সঠিক জানিনা। আপনাদের মতোই সংবাদপত্র থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি তাই আমাদের পুঁজি। তবে ১৯শে আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু আছে। তারই সঠিক বিবরণ তাঁদের কিছু কিছু শোনালুম।

সমস্ত শ্রোতার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় আরক্তিম হয়ে উঠতে দেখেছি। অসীম সহানুভূতি ও সমবেদনা ফুটে উঠেছিল তাদের বিস্মিত ও বিস্ফারিত চোখে।

আমাদের গাড়ী এসে হয়ত অপেক্ষা করছে ভেবে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ঘনঘন হর্ণ দিয়ে বাস্‌ওয়ালারা যাত্রীদের ডাক দিচ্ছিল। তারাও ছুটোছুটি করে এসে যে যার নম্বর বাসে উঠে পড়লো। ওদের বাস ছেড়ে দিলে। মেয়েরা হেসে রুমাল নেড়ে বাসের জানালা থেকে বিদায় জানালে। ছেলেরা হাত নেড়ে জানালে—চলনুম।

যাত্রী নিয়ে সেদিন দ্বিতীয়বার দুখানি বাস এসেছিল। দুখানিই বেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়ীর তখনও দেখা নেই।

যাঁরা পায়ে হেঁটে এসেছিলেন তাঁরা পদব্রজেই রওনা হলেন। পড়ে রইলুম শুধু আমরা। অর্থাৎ আমাদের দল এবং আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত, তাঁদের বৃদ্ধা জননী এবং দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশু !

সন্ধ্যা দ্রুত এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ের উপর হঠাৎ ঝপ ক'রে অন্ধকার হয়ে যায় ! এদিকের পথে আলো নেই। আবুশহরের সীমানা পর্যন্ত ইলেকট্রিক আছে, তারপর অন্ধকার ; শ্রীমতী গুপ্ত ভেবেছিলেন অন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিশু দুটির খাবার সময় হয়েছে, এখনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। রাত্রে এই খোলা পার্বত্য পথে ঠাণ্ডা লেগে যাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা হয়েছে।

তিনি বললেন—মা বুড়োমানুষ, উনি থাকুন আপনাদের সঙ্গে গাড়ীতে যাবেন। আমি আর উনি ছেলেদের নিয়ে হেঁটে চলে যাই।

বলনুম—পাহাড়ী পথ প্রায় দেড় মাইল দু'মাইল হবে। ছেলেদের কোলে নিয়ে এতটা রাস্তা হাঁটতে পারবেন কি ? কষ্ট হবে যে !

শ্রীযুক্ত গুপ্ত হেসে বললেন—"সেদিন দানসেট পয়েন্টে হেঁটে গিয়ে হেঁটে ফিরে ওঁর সাহস বেড়ে গেছে। এখন পঞ্চাশ প্রতিযোগিতায় উনি আপনাদের সকলকে হারিয়ে দিতে পারবেন।"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন—দেড়মাইল দু'মাইল অনায়াসে যেতে পারবো এ বিশ্বাস নিজের উপর আছে—বলতে বলতে ছোট বাচ্চাটিকে বর্ষাতির বেপাজাত থেকে কোলে তুলে নিলেন এবং তারই মাত্র বৎসরাধিক কালের অগ্রজ বড় শিশুটিকে স্বামীর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত অগ্রসর হলেন।

যতক্ষণ দেখা যায় আমরা সবিস্ময়ে এই দুঃসাহসী তরুণ যাত্রী দম্পতির দিকে চেয়েছিলুম।

একটা পথের বাঁকে তাঁরা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফিরে দেখি সেখানে আমরা শুধু একা। অশ্বিপথ ইতিমধ্যেই একেবারে নিস্তব্ধনির্জন হয়ে পড়েছে।

আমাদের গাড়ীর তখনও কোনও চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। বলনুম

পথ প্রদর্শিকা

—চলো, এখানে এভাবে অপেক্ষা করা আর নিরাপদ নয়। এখনি অন্ধকার নেমে আসবে। অল্পদূর গেলেই আমরা 'সিরোহী বাস সার্ভিস্ কোম্পানীর মোটর ষ্টেশন পাবো। সেখানে গিয়ে আবু মোটর সার্ভিস-ওয়ালাদের কোন্ করে নিজেদের গাড়ী পাঠাবার জন্ত।

মহা উৎসাহে আমরা সবাই অগ্রসর হলুম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সিরোহী বাস্ ষ্টেশনে এসে পড়া গেল।

যাক্ ! নিশ্চিন্ত। এইবার একটা ব্যবস্থা হবে। আমাদের গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা না ক'রে এঁদের একখানা গাড়ী নিয়েই চলে যাওয়া যাবে।

ক্রমশঃ

খয়রাগড়ের পুরাকীর্ত্তি

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

"সাহেব ভার্গব ঋষিনে কয়াথা হাম্ সরযূকা উত্তরপর চলে যাকেসে সরয় উলট যায়গা। লেকিন উসোমে যব পৌঁছা সরয় খাড়া রহে গৈ। ইধারকা 'চওাল' হাঁকেন সুরু কিয়া। তব ঋষিজীনে কহা চেলাকো ছেড়ে আশ্রম পর কুছ্ ছোড়কর আয়াহৈ। চেলা আকে দেখা লোটা পড়া হ্যায়। লোটা লেকে চেলা যব নদীপর পৌঁছা, আর সরয় উলট গৈঁয়া।" (অর্থাৎ সাহেব—ভার্গব ঋষি বলিয়াছিলেন যে তিনি সরযূর পারে পৌঁছিবার পর পাপের ভারে সরয় উল্টাইয়া যাইবে। পাষণ্ড প্রকৃতির নাগরিকরা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ভার্গব তখন তাহার চেলাকে কিছুক্ষণ সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমার মনে হয়

খয়রাগড়ের সূর্য্যমূর্ত্তি

আমি কোন বস্তু ফেলিয়া আসিয়াছি। শিষ্য আসিয়া দেখিল যে, তাহার ষষ্টি আসনে পড়িয়া আছে। ষষ্টি লইয়া শিষ্য সরযূর পরপারে পৌঁছিলে পর নগর ভূমিসাৎ হইল।) খয়রাগড় বালিয়া জেলার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম। ঋষি ভার্গবের জন্মস্থান। সম্মুখে খরস্রোতা সরযূ প্রবাহিতা। দিবসের মানের ক্ষীণ রেখা। প্রভাতের তরুণ তপন তখন চন্দ্রবালের উপর উঠেন নাই। সম্মুখে বিস্তৃত খর, গম ও অড়হর ক্ষেত। দূরে নদীবক্ষে বালুচর, তুষুর্দ্দিগের অতিকায় জীবের ন্যায় বৃক্ষমান।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর তখনও পূর্ব্বেগে চলিতেছে। সমরকালীন অতি কষ্টলব্ধ ছুটী যাপন করিবার জন্য, গ্রামের প্রবেশের একান্তে অবস্থিত, অর্দ্ধভুক্ত সরযূর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে আসিয়াছিলাম। জাতির উত্থান, প্রগতি ও পতনের সহিত, সমতলে পা ফেলিয়া জাতীয় কৃষ্টি চলে। যখন সৌর্য্যসম্পন্ন জাতি, বৈদেশিক শত্রু হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া, স্বরাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত করে, তখন দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নতির চরম সীমায় নীত হয়। সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগরী, অর্থশালী বণিক সম্প্রদায়, সুশিক্ষিত নাগরিক, জাতির বৈভবের পরিচয় প্রদান করে। ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থিতিকালে, প্রাচীন কোশল, মগধ, অযুধপন্থা, প্রয়াগ, অন্তর্বেদী, অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়া, পুণ্ড্র,

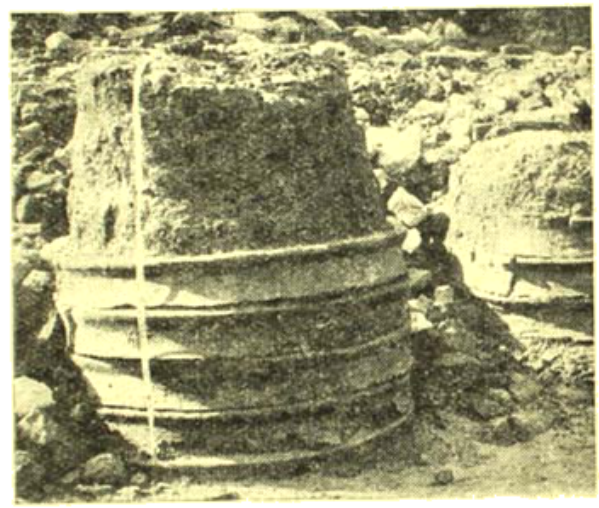

খয়রাগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গড়কপালা

ঐক্য এই কারণে সুদৃঢ় নগরীসমূহে সুশোভিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পুণ্যতোয়া সরযূর পূর্ব্বতীরে এই নগরীর অবস্থিতি ছিল। সাধারণ অনুসন্ধানে ইহার যে ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহা দিয়ে দেওয়া হইল। আত্মবিস্মৃত জাতি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় ও ধর্ম্মের আলোচনায় মত্ত হইয়া, আমার সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সুতরাং এই মহাজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা আয়াসসাধ্য হয়ে। সেইজন্য, ভারতের ইতিহাসলেখকগণ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়াছেন। কাব্য কাব্য, পুরাণ বর্ণিত অলিক উপাখ্যানসমূহের উপর বিদেশীয় জাতীয় ইতিহাসকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কল্পনার উদ্দাম বেগ ইহার পবিত্রতা

নষ্ট করে। সেইজন্য মৃণ্ময় পাত্র, পাষাণ লিপি, মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি ইতিহাসের উপকরণ।

ধরারাগড়ের যে ভাগ এখন সরযূ তীরে অবস্থিত সেই স্থল এখন নদীগর্ভ হইতে একুশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ধরস্রোতা নদীর খরস্রোত গতি ইহার তটভূমি প্রতি বৎসর গ্রাস করিতেছে। তাহার ফলে ভূগর্ভস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নদী তীরে দৃষ্ট হয়। হর্ম্ম্যরাজির ধ্বংসাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী, কূপ, পণ্যশালা, প্রভৃতি নদীর স্রোতে মানবদৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সর্ব্ব নিম্ন স্তরে, মৌর্য্য যুগের কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল পালিশযুক্ত মৃৎপাত্রের খণ্ড প্রমাণ করে যে, এই নগরের ভিত্তি প্রাক-মৌর্য্যকালে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও মৌর্য্যকালে বোধহয় বিদ্যমান ছিল। তাহার পর ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইহা বর্ত্তমান ছিল। শুঙ্গ যুগে নির্ম্মিত মৃৎপাত্রের চক্র, শুষ্কপ্রায় সরযূ গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কুষাণ যুগের শেষার্দ্ধে কিংবা গুপ্ত যুগের প্রথমাংশে নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তিখণ্ড প্রাচীন ধরারাগড়ের মৃৎশিল্পের পরিচয় দেয়। ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর সদৃশ ধরারাগড়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত, মৃৎপাত্রের খণ্ড গুপ্তযুগের বৈভবের পরিচায়ক। সরযূর তীর দিয়া অর্দ্ধ মাইল গমনের পর আমরা একস্থলে নীত হইয়াছিলাম, যেখানে পর্ব্বত প্রমাণ প্রায় ২১ ফিট উচ্চ, পণ্যের ভগ্নাবশিষ্ট মৃত্তিকোচ্চয় দৃষ্টিগোচর হইল। অনুমিত হয় নগর সহরের একান্তে অবস্থিত এই অংশ অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক 'শ্মশান' রূপে ব্যবহৃত হইত এবং বৎসরের পর বৎসর এই স্থলে মৃত জন্তুর মৃতদেহ ফেলিয়া যাইত। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইবার পর, মধ্যযুগে ক্ষীয়মান সহরের একাংশে বোধহয় ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ ১৮ ফিট মাটির উপরে দুই সারি ইটের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে ধ্বংসাবশেষের অন্য স্থলে অবস্থিত বিভক্ত হর্ম্ম্যরাজির ন্যায়, এই অংশ অধিককাল বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে অট্টালিকা শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর দৃষ্ট হইত।

সরযূ গর্ভ হইতে ধরারাগড়ের ধ্বংসাবশেষ

মুসলমান যুগের কোনও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই। অতীতের কোন সময়ে এই সহরবাসীদের ভাগ্যে প্রলয় বিষাণ একবার বাজিয়াছিল। সহরের অবস্থানকালে সরযূ নদী পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেন, হঠাৎ কোন কারণে, হয়ত প্রাকৃতের কোন অত্যধিক বারিপাতে, বিক্ষুব্ধ জলরাশি সরযূর তরঙ্গমালা নূতন পথের অনুসন্ধানে চেষ্টিত হইয়াছিল। পার্শ্বের প্রবেশে, নদী ও নদের এই গতি পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে। গঙ্গার পলি মাটিতে উৎপন্ন ভূমি বর্ষার স্ফীত ফেনিল জলরাশির উদ্দাম বেগ বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই। সেইজন্য, ইহার বক্ষে অবস্থিত বহু নগর ও নগরীর অকস্মাৎ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগরী এক রাত্রেই মরুভূমির বক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। নদ ও নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু বহু বন্দর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন নদী সমূহের মধ্যে গঙ্গার ন্যায় খরস্রোতা এবং ঘাগ্‌রার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নদী, সরযূর ন্যায় একটীও নাই। ইহার প্রধান কারণ যে, পশ্চিমবঙ্গের মাটি ও মৃত্তিকারাশি ইহার গতিকে বাধা দিয়া রাখে। সুতরাং অর্দ্ধপূর্ণ গর্ভে প্রতিহত হইয়া ইহার বারিরাশি নূতন নূতন পথ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়। ঠিক এই কারণে অতীতের কোন অজ্ঞাত দিনে ক্ষুব্ধ সরযূর তরঙ্গমালা ইহার পশ্চিমভাগের খাত পরিত্যাগ করিয়া, ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আর একটি প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে। ফলে প্রাচীন নগরটি দ্বিখণ্ডবিভক্ত হইয়া যায় এবং মধ্যভাগে প্রচণ্ড নদী প্রবাহিত হইতে থাকে; তাহারই জন্য নগরীর উত্তরাংশ এখন গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত তাপলদুর নামক গণ্ডগ্রাম হিসাবে পরিচিত। অপরার্দ্ধ বালিয়া জেলায় খরারাগড় নামে খ্যাত।[৩] সরযূর পরিত্যক্ত গর্ভে এখন কৃষক কুলের যব, গম, ডাল উৎপন্ন হয়। যে সকল অংশ বর্ষায় প্লাবিত হইয়া যায় সেই সকল অংশে ধান্য জন্মায়। তাহার অনতিদূরে গ্রামপল্লীআচ্ছাদিত ক্ষেত্রসমূহ, বোধহয় প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। খনন ব্যতীত ইহার উদ্ধার অসম্ভব। পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন তিন মাইল অবস্থিত মুর্তিপার নামক গ্রাম পর্য্যন্ত

বিস্তর। যদি সমস্ত সর্ব্বগ্রাসী ভূমার দ্বারা গ্রাসিত হইবার পূর্ব্বে ইহার যখন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে হয়ত প্রাচীন মগধের প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে তুতিপারের যাঁহারা বাসন মুঙ্গেরের একটি মহামূল্য বস্তু ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাগড়ার শিল্পগুলির ন্যায় ইহাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মুঙ্গেরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মোরাবাদ জেলায় নির্দ্মিত বাসন চলতির হইবার পূর্ব্বে তুতিপারের শিল্প দয়ার খড়্গপ্রভা সহজে সাহায্যে, নৌকা দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। যন্ত্র যুগে শুধু কেবল মানুষগুলোকে পরস্পর পরিচিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের আত্মাকেও কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার দ্বারা যন্ত্র

মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে ইষ্টকপ্রাকার—খরোপড়, বালিয়া

নির্দ্মিত বস্তু মানবীয় শ্রমে উৎপন্ন বস্তু অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রিত হয়। উনবিংশশতাব্দীর ভারতবর্ষীয়েরা যন্ত্রশিল্পের মূল্য বুঝিতেন না। তাহার ফলে তুতিপারের অন্নহীন, বস্ত্রহীন কারিগরী ফুল, দলবদ্ধভাবে হইয়া দেশোদ্ধারে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে।

খরোপড়ের সূর্য্যমূর্ত্তিটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া ধরিলে অত্যুক্তি হইবে না। সূর্য্যপূজা আর্য্যাবর্ত্তে পুরাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে সূর্য্যদেবের বহুল উল্লেখ আছে কিন্তু তখন সূর্য্যমূর্ত্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা অদ্যাপি সন্দিহান। বৈদিক আর্য্যেরা বোধহয় সূর্য্যগ্রহের উপাসনা করিতেন; হয়ত বৈদিক সভ্যতার শেষ যুগে চক্রাকার পিতল অথবা স্বর্ণখণ্ড বেদীতলে পূজিত হইত। অনুমিত হয় যে খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতাব্দীতে উত্তর দিকস্থ কোনও দেশ হইতে সম্ভবতঃ শকস্থান হইতে সূর্য্যমূর্ত্তি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণে এবং সিরপাল্লে ইহার বেশ উল্লেখ আছে। ইহার পূজা শাকদ্বীপী নামক এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্নতত্ত্ববিদ হারলক্ষেত্রের মতে শাকদ্বীপের বর্ত্তমান নাম 'সিস্তান'। সর্ব্ব প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি পুণা জেলার অন্তর্গত ভাজা নামক গিরিগুহায় খোদিত হইয়াছিল। অনন্তগুম্ফা ও লাহুলের সূর্য্যমূর্ত্তিও উল্লেখযোগ্য। ভারতে কুষাণ অধিকারের সময় ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ক্রমাবর্ত্তনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। প্রায় চারিশত বৎসর বিভিন্ন যবন জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকিবার পর উত্তরপথে এক নবযুগ সূচিত হইয়াছিল। পুরাণে আমরা যে সব মূর্ত্তির বিবরণ পাঠ করি, সে সকল তখন লিখিত হয় নাই। সুতরাং কুষাণ যুগের মূর্ত্তিতত্ত্ব পুরাণের মূর্ত্তিতত্ত্ব হইতে বিভিন্ন। এই মহাসত্যের প্রথম প্রমাণ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাগোড় রাজ্যের অন্তর্গত ভুমারার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত করেন (Siva temple at Bhumara M.A. S. I. no 16) গ্রামঘাটে প্রাপ্ত ২৮৭ গুপ্তাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর অবতার মূর্ত্তি বিশ্লেষণ করিবার সময় ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ত্তমান লেখক দেন। (Journal of the G. N. J. Research Institute, vol. iii, pp. 1-9.) খরোপড়ের মূর্ত্তিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান।

ইহা একটি দণ্ডায়মান সূর্য্যমূর্ত্তি। চুণারের বেলেপাথরে খোদিত; ভাস্করের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি অনন্যসাধারণ মনোহর দেবমূর্ত্তি; সর্ব্ব অবয়বে কৈশোরের কমনীয়তা রূপকারের দক্ষতা অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহার পরিচ্ছদ উত্তরাপথবাসীর ন্যায়। মস্তকে কণ্ঠবুকুট, কয়েকগুচ্ছ কেশ গণ্ডের দুইপার্শ্বে দিয়া স্কন্ধদেশে ক্রীড়া করিতেছে। দীর্ঘউরস্ত বাদা। গলদেশে রত্নমালা। মূর্ত্তির দুই হস্তে সনালপদ্ম। চরণ দুইটি পাদুকায় আচ্ছাদিত। দুই পার্শ্বে ষষ্টী এবং পিঙ্গল। নানা কারণে মূর্ত্তিটি গুপ্ত যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথম ইহার উষ্ণীষ রীতি। দ্বিতীয় ইহার 'কাক পক্ষের' ন্যায় কেশের ব্যবস্থা আমাদের ভারতকলাভবনে রক্ষিত কার্ত্তিকের এবং গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ এবং সারনাথে রক্ষিত অর্দ্ধভগ্ন মৈত্রের মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপূর্ব্ব লালিত্য এবং ভাবের অনবদ্য-অভিব্যক্তি গুপ্ত যুগের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিভাবের প্রভাব আমাদের দেশীয় শিল্প সমূহে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল—এইমূর্ত্তি তার অন্যতম প্রমাণ।

বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেগতিক দেখে সান্ত্বনা বললে—"বেশ তো এত আপত্তি যখন, আপনার ঘরে না হয় না-ই নিয়ে গেলাম। কিন্তু ঝুনুসোনার শোবার ব্যবস্থা করে দিন একটু"

"ঝুনুসোনা! ওই কুকুরের নাম না কি"

"হ্যাঁ। রাত্রে কোথায় রাখি একে"

"পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে পারবে স্বচ্ছন্দে"

"বেচারা!"

ঝুনুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গোঁসাইজি বললেন, "গোয়ালের কোনে খড়ও আছে কিছু। খাসা থাকবে। আপনাদের বিছানায় ঢুকে ওঁতোওঁতি করার চেয়ে আরামে থাকবে। কি আপদ"

ঝুনুর লোমে হাত বুলিয়ে একটু অবাধারের সুরে সান্ত্বনা শেষ চেষ্টা করলে আর একবার।

"একা থাকা অভ্যেস নেই, কাঁদবে হয়তো"

"কাঁদুক। গোয়াল ঘর থেকে ওর কান্না শোনা যাবে না"

"আমাদের ঘরের মেঝেতে যদি শোয়াই?"

"না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। হুদকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে ওটাকে গোয়ালঘরে রেখে আসুক গিয়ে। আর আপনি অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নাম সই করে' তবে শুতে যাবেন"

কমানো বাতিটা উসকে দিয়ে সুশোভনের দিকে চেয়ে গোঁসাইজি হুদকাকে ডাকতে গেলেন।

"দেখ-সান্ত্বনা, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার স্বামীর নাম আমি ডাল করতে পারব না। সীমা অতিক্রম করছে"

"বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্দ্ধাঙ্গিনীর আশা করি স্বামীর নামে নিজেকে চালাবার অধিকার আছে, অর্দ্ধেক অধিকার অন্তত থাকা উচিত আইনত"

"নিশ্চয়"

"খাতাটা কোথা—"

"এই যে। তবে আমি আর এক কাজ করলেও পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে' লিখে দিতে পারি যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না"

"দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি"

খাতাটা খুলে সান্ত্বনা লিখতে লাগল।

"ব্রজেশ্বর দে। তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর—বাস্"

"নামের পর উইদিন ব্র্যাকেট লেখ কংগ্রেস কর্ম্মী। না লিখলে ভয়ানক কাণ্ড করবে"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে।

"কত নম্বরের ঘরে কি লিখি? নম্বর তো জানি না"

"চেপে যাও"

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল না। কলমটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই ঝুঁকে অ্যাডমিশন রেজিষ্টারটি পর্য্যবেক্ষণ করলেন। তারপর সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "এই ঘরে লিখুন —টু। আপনাদের রুম নম্বর টু"

সুশোভন কলমটি তুলে ভালমানুষের মতো 'টু' লিখলে, তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হাসলে একটু।

"ওরে ফদকা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে গোয়ালে রেখে আয়। কামড়াবে না তো"

"না কুছ ভাগ্নী লক্ষ্মী। আহা বেচারীকে কোথায় পাঠাচ্ছেন নির্ব্বাসনে"

বলা বাহুল্য সান্ত্বনার ঈষৎ আনুনাসিক আবদারগাথা এই অনুযোগে গোসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ফদকা এসে কুকুরকে নিয়ে চলে গেল। গোসাইজি ধূমায়িত হ্যারিকেনটি সুশোভনের দিকে তুলে ধরে' বললেন, "এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা। এটা নিয়ে যান, কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশী নেই। আপনারা ওঠেন কটায় ?"

"আজ বোধহয় বেড়ি ধরে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত আছি কি না"

"শুয়ে পড়ুন তাহলে, আর দেরি করবেন না"

চরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের রুম নম্বর 'টু'টি গঠনশিল্পের একটি অদ্ভুত নিদর্শন বলে' মনে হল সুশোভনের। ঘরটি সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে দুজন লোকের পক্ষে পাশাপাশি ঢোকা অসম্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ বলাই বিশেষ। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই বৃহদাকৃতি এত আসবাবপত্র সমাবিষ্ট হয়েছে যে মেঝে বলে' কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা খাট আলমারি ড্রেসিং-টেবল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো ফাঁকগুলা। সম্ভবত আসবাবপত্রগুলি খণ্ডীকৃত অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে তারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মেঝের অধিকাংশ স্থানই দখল করে' আছে জগদ্দল একটি ছাদার খাট। মজবুত কাঁটাল কাঠের তৈরি। খাটের উপর আছে একটি গদি, গদির উপর একটি পাতেবর্ণের চাদর। গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে কি—তা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উটের পিঠের মতো উঁচু উঁচু চিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে চবি ছিল। ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে নেওয়া দেব-দেবী মূর্ত্তি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত ফ্রেমে-বাঁধানো অন্ত আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য—রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

সুশোভন এবং সান্ত্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল দু'জনেই। সুশোভন বলে উঠল—"বাপ্‌স্ শুতে এসেও নিস্তার নেই। শিয়রের কাছে ওই দুর্ব্বাসা তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি সর্ব্বনাশ"

"শুনুন" সান্ত্বনা বললে, "গোসাইজি শুয়ে পড়লেই আপনি নেমে যান আস্তে আস্তে। যে ঘরটায় আমরা খেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দিন কোনক্রমে। আশা করি আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না"

"তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ সান্ত্বনা, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদি গড়ায়, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াবে কিন্তু"

"কি যে বলেন! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসছেই বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাতা উলটে দেখতেই বা যাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু জানতে পারলে কি ভাববেন"

"কি আবার ভাববেন, আমাদের কাণ্ড শুনে বড় জোর হাসবেন একটু"

"দেখ ঠিক তো"

"এটা ঠিক যে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন"

সান্ত্বনা ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে সুশোভনের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "আশা করি অনীতা দেবীও বুঝবেন"

"অনীতা ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঃ নিশ্চয়ই সমস্ত শোনবার পর বুঝবে বই কি"

"বাস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপার গড়ালেই বা" সুশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না।

"কিন্তু ওই দুর্দ্ধর্ষনীয় ব্যক্তিটি—ওই জগঝম্প না কি নাম ভদ্রলোকের—"

"সদারজবাবু ? ওর জন্যে ভাবনা নেই। এর পর দেখা হলে সব খুলে বলব ওঁকে। খুশী হবেন, ভারী আমুদে লোক—"

"আমার কিন্তু দেখে মনে হল, উনি ঠিক সেই জাতীয়

বেকুব অথচ ধনাপুরুষ লোক যাঁরা অস্থানে অকারণে অকার্য্য করে' অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ 'অ' এর অনুপ্রাস আরও অনুসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ। তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং অনীতার বাপের বাড়ির লোকেদের চেনেন। মনে হচ্ছে···"

"অনীতার বাপের বাড়ির লোকদের ?"

সান্ত্বনার অধরে বৃদ্ধ একটা হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল।

"তা চিনলেই বা ক্ষতি কি। ওর জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সদারঙ্গবাবু সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না ? সে ভার আমার উপর রইল"

"তোমার জন্যেই আমার চিন্তা" সুশোভন বললে।

"চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে"—হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা—"আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন একটু গোসাইজি শুলেন কি না। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, একটু হাত পা ছড়াতে পারলে বাঁচি"

কেবল সুশোভন এবং সান্ত্বনাই যে সদারঙ্গবিহারী-লালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোসাইজিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাল। কি মনে হওয়াতে তালাটা খুললেন আবার। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। না, মোটরবাইকের কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়াল ঘর থেকে বুধুর করুণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে এল না। কপাট বন্ধ করে' পুনরায় তালা লাগালেন এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠক-খানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির গোছাটি নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোবার ঘরে।

৯

সুশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোসাইজি উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল দেওয়ার শব্দও পাওয়া গেল।

"ভদ্রলোক শুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে"—কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে এইটুকু জানিয়ে সুশোভন নীচে নেমে গেল। সান্ত্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। কাপড় চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় না তার। সে সুটকেসটি সুশোভন ঘরে এনেছিল সেটি ফেরত দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তার থেকে কাপড় ব্লাউজ প্রভৃতি বার করে' পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া-গুলি অর্থাৎ সেমিজের বোতাম-খোলা-আঁটার কাজগুলি সবে শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে শব্দ হল। এক লাফে সে একটা আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে সুশোভনবাবু"

"হাঁ। আসব ভেতরে ?"

"না। আসবেন মানে ?"

"অন্যান্তর নেই"

"বাসুন একটু তাহলে"

"বেশ"

"অন্যান্তর নেই মানে ? বুঝতে পারলাম না"

"যে ঘরে আমরা খেয়েছিলাম সে ঘরে শোওয়া যাবে না"

"কি যে বলেন"—সান্ত্বনার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হল যেন—"এর মধ্যেই কি করে' বুঝলেন যে শোওয়া যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয় নি এখনও। চেষ্টা করে' দেখুন ঠিক ঘুমুতে পারবেন"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করবার 'স্কোপ' নেই। গোঁসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বালিশের তলায়"

"ওমা, তাই না কি ? ঘুলকিল হল তো। কোথায় শোবেন তাহলে"

"তাই তো ভাবছি"

"করতেই হবে যা হোক একটা ব্যবস্থা। এ ঘরে তো আসা চলবে না"

"কপাটটা খুলি একটু ? একটু—"

"না"

"কথা কইবার সুবিধে হত। আর কিছু নয়"

"কথা ক'য়ে কাটাবেন না কি সারারাত"

"একটু খুলি কি বল। চোখ বুজে থাকছি না হয়। সামান্য একটু খুলতে আপত্তি কি"

"না, না যতক্ষণ না বলি খুলবেন না। দাঁড়ান না একটু। আমি কাপড় ছাড়ছি"

"উঃ কি যন্ত্রণা"

অস্ফুটকণ্ঠে বললে সুশোভন।

"সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বসুন না, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় যদি"

"কতক্ষণ"

"মিনিট পাঁচেক"

"ঠিক করব কি করে', আমার হাত ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে"

"তাহলে এক থেকে পাঁচশ' পর্য্যন্ত গুনুন বসে বসে"

"বল কি। ছেলেবেলায় উন্মাদকের গল্প শুনেছিলাম, তাই করলে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত"

"কি যে ছেলে মানুষি করছেন। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখুন"

"মাথা আমার ঠিকই আছে, তার জন্যে ভাবনা নেই"

"তাহলে অমন করছেন কেন, সিঁড়িতে বসুন গিয়ে"

"কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটা জোরে"

"সিঁড়ির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু। একটু থামুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি তারপর আসবেন"

"গোসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে' এক দুই গুণে যাচ্ছি, কি ভাববেন তিনি"

"চেউ দেখেই নৌকা ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে"

"নৌকাডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো করছি সকাল থেকে"

বিরক্ত হয়ে সুশোভন সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। সিঁড়ির উপর বসে' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বেচারা। নৈশ-সমীরণ বাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্ব্বদিকে ভেসে যেত তাহলে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো দেখা হত তার। কোলকাতায় তার বাড়ীর সিঁড়িতে বসে' অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছিল।

.....সিঁড়িতে বসে' বসে' সুশোভনের বাঁ পাটায় খাল ধরে' গেল। একটু চটেই উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণেও শোয়া হয় নি? হোক মেয়ে মানুষ.....বিছানায় শুতে ত দের হবে.....আশ্চর্য্য কাণ্ড। উঠে গিয়ে দুয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা মারতেও ভয় করছিল। গোসাইজি যদি উঠে পড়েন। সান্ত্বনার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর কপাটটা একটু ফাঁকা করতেই—

"থামুন, হয় নি এখনও। বসুন না গিয়ে আর একটু—"

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি, তোমার যখন হবে বোলো"

"অত শব্দ কিসের"—পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন করলে সে—"কি চল"

"আমি বিছানায় উঠছি। স্প্রিং দেওয়া গদি, তারই শব্দ"

"বাসন্তী শব্দ? বাবা!"

"বাসন্তী শব্দ মানে"

"বি-এ পাশ করেছ, স্প্রিং মানে বসন্ত জান না!"

"আসুন আপনি"

সান্ত্বনা বিছানার উপর বসেছিল। চুলটি আঁচড়ে শান্তিপুরে শাড়িটি পরে' বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। একটু সানুকম্প হাসি হেসে ডাগর চোখের দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে সে। সুশোভনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হল শিল্প-সমালোচকের কৌতূহল। বিছানার একপ্রান্তে অনাহুতই বসল গিয়ে সে।

"কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে"

"তা হয়তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতেই আসেন নি আশা করি"

"না, না, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই তোমায় মানিয়েছে ভালো। তোমার প্রসাধন-রুচি সরল হলেও শিল্পীজনোচিত—"

"সমস্ত দিনের এত দুর্গতির পরও আপনার রসবোধ অক্ষুণ্ণ আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"

"বেশ তো ঘুমোও না, মানা করছে কে। সাদা শাড়িটা হঠাৎ ভাল লেগে গেল তাই বললাম। অনীতা কখখনো সাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রং ছাড়া পছন্দই হয় না তার। সেদিন একখানা শাড়ি কিনেছে যেরকম রংয়ের, গোনালি জরির পাড়-বসানো। জমকালো ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে

যাবে বলে ছ'খানা শাড়ি নিয়েছে সবগুলোই রঙীণ, আর কোনটাই ফিকে রং নয়—"

সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ঘাড়টা কাত করলে একটু।

"একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। অনীতা যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তার এত মাথা ঘামিয়ে শাড়ি পছন্দ করা যে এমন ভাবে মাঠে মারা গেছে তা বোধহয় বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না"

সুশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উসখুস করে' নড়ে' চড়ে' বসল সে।

"আমাকে কি তাহলে গোয়াল ঘরে গিয়ে গরুর সঙ্গে শুতে হবে?"

"তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে—"

সুশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে অভিনিবেশ সহকারে সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুই এই ঘরের মেজেতে যদি একটু গড়িয়ে নি—

—"কি যে বলেন—"

"আচ্ছা, এ কি কুসংস্কার তোমাদের! আমি তোমাকে 'কারে' লিখ্‌তে দিলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেজেতে শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আশ্চর্য্য! তোমার খাটের উপর পা তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমানায় যাব না"

"যা হয় না—হতে পারে না—তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন"

"কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ায় তো হয় শুনেছি"

"এটা রাশিয়া নয়, বাংলা দেশ"

"ও"

সুশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। মাথার কাপড় সরে' গেছে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"আচ্ছা, চললাম তাহলে—"

"বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার—"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে—"

"কি করব বলুন উপায় নেই। সমাজে বাস করি যখন, লোকাচার মেনে চলতেই হবে"

"এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টা খানেক বড় জোর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেই আমার—"

"না মাপ করুন সুশোভনবাবু। একবার এই করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই। আপনার তো মনে থাকা উচিত"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। বুঝেছি। আচ্ছা যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ—ঠিক। কি বিপদ—আচ্ছা চলি—"

(ক্রমশঃ)

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

রূপসীর রূপ মেঘের প্রদীপে
গরবের শিখা জ্বলে,
তারি উত্তাপে প্রেমের পাপড়ি
শুকায় চিত্ত তলে।

আর রূপহীনা রহিনী অজানা
মৌন মিনতি গানে
প্রেমের পূজায় প্রাণের ঢেউলে
প্রিয়তমে টেনে আনে।

বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

যে মুখল প্রতিভার প্রোজ্জ্বল আলোকে বিশ্বমানবের সম্মুখে গত দুই শতাব্দীর অবলুপ্ত ভারতের প্রদীপ্ত মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটির কথা বিগত পৌষ মাসে "ভারতবর্ষে" লিখিয়া লেখনী ধন্য করিয়াছিলাম; আজ অপরটির বেদীমূলে শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহ ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি নিবার বাসনা করিয়াছি। আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রের শিরোদেশে যে বিজয়িনী নারীর বহুবর্ণরঞ্জিত সুশোভন প্রতিকৃতি শোভিত হইয়াছে, আমি আজ সেই মহীয়সী বিজয়লক্ষ্মীর কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি। জওহরলালজীর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, প্রয়াগতীর্থ-সন্নিকটস্থিত এই ভবনখানিতে প্রতিষ্ঠা ঠাকুরাণী অরূপণ করে সর্ব্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্রের মত নিঃস্ব-নিরন্নতে বিরাজ লইয়াছিলেন। নতুবা এক পরিবার মধ্যে, এক পিতামাতার অঙ্কে এই দিগ্বিজয়িনী প্রতিভাধিকারিণী পুত্র কন্যা, জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মী সম্ভব হইল কিরূপে?

"ভাই" জওহর ও বিজয়লক্ষ্মীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেকখানি। সেই দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ বালক জওহর একটি ভ্রাতার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল: বারো বছর পরে ভাই না আসিয়া ভগ্নীর আগমনে জওহর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। জনৈক ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছিলেন যে, এ তো ভালই হইল জওহর। তোমার ভাই হইলে তোমার পিতার ঐশ্বর্য্যের ভাগীদার হইত, তোমার ভাগ করিয়া খাইত। ভগ্নী জওহর পণ্ডিত মতিলালের ধনৈশ্বর্য্যের তুমিই একচ্ছত্রাধিপতি রহিলে। বারো বছরের বালক যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই কথাগুলির মধ্যে আজিকার বিশ্ব-চিন্তাশীল জওহরলালের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। জওহর বলিয়াছিলেন, আমি ধনৈশ্বর্য্যের লোভ রাখি না! আমি একা! ভাই হইলে আমার কেমন সঙ্গী হইত! ডাক্তার আত্মসংযোধন করিয়া বলিলেন, তোমার সুন্দর বোনটিও তোমার সঙ্গী হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। শুধু যে বাল্যে খেলায়, কৈশোরে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গিনী হইয়াছিল তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে, ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়েও "ভাই" জওহরের যোগ্য সহিসীরূপে বিজয়লক্ষ্মী আজ পৃথিবীর সুধী সমাজের শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল যখন বৃটিশের বজ্রকবলমুক্তির মধ্য হইতে শাসনরশ্মি গ্রহণের সাধনায় সমাহিত, ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী তখন আমেরিকার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিধান-ভবনে বিশ্বের বিদুষিত, চিরজীবন রক্ষিত ও লাঞ্ছিত নির্য্যাতীত মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিতপ্রাণ। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একদা এক সৌম্যদর্শন তেজঃপুঞ্জ কলেবর ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতের উদার অদ্বৈতবাদ হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া অন্য পৃথিবীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন, আর অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই সেদিন সেই আমেরিকাতেই নিষ্পীড়িত ও বিদূরীত কৃষ্ণকায় মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সুকৌশলী, সুবেশিনী, সুমধুরভাষিণী ভারতনারী বার্ধাণ্ড পৃথিবীর বুকে যে আলোড়ন উদ্বেলিত করিলেন, তাহার তুলনা বিশ্বপ্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তনের প্রলয় দৃশ্যে কিছুই মিলে না। পৃথিবী ভারতবর্ষকে বৃটিশের চশমার সাহায্যে দেখিতেই অভ্যস্ত; বৃটিশের প্রচারিত সত্যই যাইলেন, বেদ ও কোরাণ বলিয়া গৃহীত হইত; ভারত ও ভারতবাসীর হিতার্থ বৃটিশ, অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষাদানার্থ বৃটিশ, অধঃপতিত ভারতবাসীর উন্নয়নকল্পে বৃটিশ শিরে গুরুভার বহন করিয়া পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতেছে, পৃথিবী এই সংবাদই জ্ঞাত ছিল। বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর অভিভাষণ শুনে পৃথিবী যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই বৃটিশের ও আফ্রিকার বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতবর্ষকে জয়মাল্য দিয়া ধন্য অনুভব করিল।

পণ্ডিত মতিলাল পুত্র কন্যাদের বিলাতী শিক্ষা দিয়াছিলেন। গান্ধী-যুগের পূর্ব্বে ভারতের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজে ইহা কৌলীন্যের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত। বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর মুখেও শুনিয়াছি, বাল্যকালেও স্কুল ইংরাজী শিখিলে অথবা উচ্চারণে দোষ ঘটিলে পিতার নিকট পুত্র কন্যার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। ঐশ্বর্য্য-পালিত, বিলাসে লালিত মতিলালের পুত্র কন্যা যে বৃটিশের জেলের মধ্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিবে, নেয়ার-খাট্টিয়া বহন করিবে, কয়েদীর কদন্ন খাইয়া জীবনধারণ করিবে, সেকালে ইহা ছিল কল্পনারও অতীত। বিষ্ণুর চরণোত্থিত হইয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলু ভেদ করিয়া হরজটার মুক্ত করিয়া হিমালয় শিখর হইতে ভাব-জাহ্নবীর জীবপ্রবাহ ভীমগর্জ্জনে যেদিন ধরণীতল প্লাবিত করিল, সেদিন তাহাতে কেবল পুত্র-কন্যাই ভাসিয়া গেল না, মতিলালের মত পিতাও সে পুণ্য সলিলোচ্ছ্বাসে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত ভাসিয়া গেলেন।

নেহেরু বংশ কাশ্মীর হইতে সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের বনধী সম্ভ্রান্ত পরিবারও কাশ্মীরাগত; যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী মোহার পণ্ডিত বংশও ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতবংশ কুলে শীলে সম্পদে ও সমৃদ্ধিতে নেহেরু বংশেরই সমতুল্য। মতিলাল এই পণ্ডিত পরিবারের রণজিৎ সুন্দরকে জামাতৃ নির্ব্বাচন করিয়া সুন্দরী সুরূপার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রণজিৎ ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থ ও যশঃ কতখানি অর্জ্জন করিয়াছিলেন জানি না, তবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া অকালে আত্মদান করিয়া রণবৃত্তার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ত চোখের উপরেই দেখিয়াছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামে, জওহরলালের কমলা অকালে আত্মাহুতি দিয়া জওহরের গৃহ শূন্য

করিয়াছিলেন, সুশর্ম, সুরূপ রণজিৎও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া তরা যৌবনেই বিজয়লক্ষ্মীর জীবন তরণীর তরাডুবি ঘটাইলেন। তিনটি কন্যা লইয়া বিজয়লক্ষ্মী বৈধব্য বরণ করিলেন। সংসার বন্ধনটুকু ছিন্ন হইল, বিজয়লক্ষ্মীর রাজনীতিতেই আজ নিমগ্ন হইল।

১৯১৯ সাল হইতে ভারতে গান্ধীযুগ আরম্ভ। গান্ধীযুগ-প্রবর্তিত অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ত্যাগ ও ত্রেশ বরণই উদ্দেশ্য সাধনের একটি পন্থা বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে। শুধু স্বীকৃত হইয়াছে বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকে, তাই আদৃত বলিলাম। আদৃত না হইলে কি উৎসাহে উন্মাদের প্রাবল্য আনিতে পারিত? আদৃত না হইলে কি আনন্দে হাসিমুখে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অন্ধকারার দিকে অগ্রসর নরনারীর জয়ধ্বনি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত? আদৃত না হইলে কি একমাত্র সন্তান জননীকে ফেলিয়া, পতি প্রিয়তমা পত্নীকে ছাড়িয়া, পিতা পুত্রকন্যা ফেলিয়া তীর্থযাত্রা করিত? কিন্তু অবভাসের কোঁটা কপাল চড়চড় করিবেই। রণজিৎ পণ্ডিতের মত সুখী ধনী পরিবারের মূল্যবান বন্ধকারার কষ্ট মত হাসিমুখেই বরণ করিয়া লউক না কেন, দেহ ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক বিধানেই প্রতিফলিত হইল। রণজিৎ সুন্দর তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পূর্বপুরুষের মত এক কারাগারে একত্র অবস্থান করিয়াও কারাপ্রকোষ্ঠে পদতলে বিদলিত করিয়া বিজয়গর্বে আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না; স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং দেশে ফিরিবার, কারাগার হইতে যে ব্যাধি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই অকাল বিয়োগ ঘটিল। রণজিৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দেরাদুন কারাগারে বসিয়া প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণী কাব্যের ইংরাজী ও সরল হিন্দী অনুবাদ করিয়াছিলেন। সৌর্য্যের ও বীর্য্যের লীলাক্ষেত্র ভারতে রণজিতের মরণ নাই, রণজিতও মৃত্যুঞ্জয়ী।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার প্রকাশ পরিচয় ১৯৩৭ সালে ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সময়েই সাধারণের গোচরীভূত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ত্যাগী সজ্জন লইয়াই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে, অকস্মাৎ কাণাঘুষায় বিজয়লক্ষ্মীর নামও শুনা গেল। অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কংগ্রেস বরাবর যোগ্যজনোচিত কাটিছাঁটের আদর্শ রক্ষা করিয়াছে; মন্ত্রীর গ্রহণের পূর্বে অনিচ্ছুক বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে স্বাধীনতার সর্ত আদায় করিয়া লইয়া তবে গভর্নমেণ্ট গঠনে সম্মত হইয়াছে, সেই কঠিন কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় কোমলাঙ্গী নারীর স্থান হইতে পারে বলিয়া অনেকে ভাবিতেও পারেন নাই; কিন্তু যাঁহারা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নীতির মর্মার্থ জানিতেন এবং নেহেরু পরিবারের পরিচয় অবগত ছিলেন তাঁহারা অবিশ্বাসের কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বিজয়লক্ষ্মী স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব পরিচালনার যে যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর কালের প্রলয়ের পরে পুনরায় প্রদেশে যখন গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব হইল তখন পূর্বাধিকৃত আসন যাচিতে এই লক্ষ্মী প্রতিমারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল।

গান্ধীজী অবিসম্বাদী ঋষি। তাঁহার স্বাধীনতার অভিযানে তিনি গৃহিণী গৃহমুচ্যতে-প্রণকেও আহ্বান দিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। মানুষের সংসার যেমন নারী ও পুরুষের সহযোগিতায় ফলেই সুগঠিত হয়, মানুষের বৃহত্তর সংসার রাষ্ট্রকেও তিনি উভয়ের সহায়তাতেই গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাই চাহিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সরোজিনী দেবীকে পাইয়াছি, বিজয়লক্ষ্মীকে পাইয়াছি; কমলা নেহেরুকেও পাইয়াছিলাম। আমি একবার শ্রীমতী সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কবিত্বের হইতে কঠিন রাজনীতির মূর্ণ্যাবর্তে পড়িলেন কেমন করিয়া? উত্তরটি ভাষার অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্য বলিয়াই এ কথা এখানে ধ্বনিতে উদ্যত হইলাম। সরোজিনী বলিলেন, কি জানি, ঠিক বুঝিতে পারি না। তবে এইটুকু মনে আছে গান্ধীজী যখন বিশীর্ণিত মনুষ্যত্বের জন্য অঙ্ক বোধন করিলেন, আমার অন্তরের মনুষ্যত্ব বোধ হয় জাগিয়াছিল; বিদ্যাভীত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে গান্ধীজী যখন শঙ্খধ্বনি করিলেন, আমার অন্তরের লক্ষ্মীগ্রত মনুষ্যত্ব বুঝি বা দুয়ারদেশে মাথিয়া চাহিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, বৃটিশের কারাগারে শুইয়া আছি। বিজয়লক্ষ্মীর উত্তর আরও মধুর।

"বাবা তাইকে (বিজয়লক্ষ্মী জওহরলালকে দাদা বলেন কি-না জানি না, আমাদের সঙ্গে আলাপে 'ভাই' 'ভাই'-ই ও শুনি!) ও আমাদের একই রকম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম শিক্ষা মানুষ হইবার; দ্বিতীয় শিক্ষা সৌরুষ অর্জনের। কাজেই দেশের পুরুষ সব যখন কারারুদ্ধ তখন নারীর অন্তরস্থিত আহত পৌরুষ গর্জন করিয়া বলিত, দেশ ও তোমরও, তুইওত দেশের! তবে? এই 'তবে'র উত্তর কমলা-বৌদি জানাই দিয়াছেন, আমরাও দিতে চেষ্টা করিয়াছি। চমক ভাঙিতে দেখি, নইনী জেলে। নইনী বাড়ীর কাছে, চেনা মানুষ। বেশ আনন্দ। ভারতবর্ষে জেলের বাহিরে ও ভিতরে পার্থক্যই বা কতটুকু যে জেল যাইতে ভয় হইবে? সমস্ত ভারতবর্ষই ত জেলখানা। বৃটিশের বিরুদ্ধে একটি সত্য কথা বলিয়াও যখন অব্যাহতি নাই, তখন জেলের ভিতরে থাকাও যা, বাহিরে থাকাও তা ভাই।"

যুদ্ধাবসানে বিশ্ববিধান জন্যরাষ্ট্রসংঘের (UNO) পূর্বে সানফ্রান্সিস্কোতে একটা বিশ্বরাষ্ট্রসম্মিলন হইয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী তখন কন্যা রিতার শিক্ষাব্যবস্থার অন্বেষণে আমেরিকায় ছিলেন। সম্মিলনে বিদেশী-বিদ্বেষী বিজয়লক্ষ্মীর প্রবেশাধিকার ছিল না, তিনি তাঁহার বাস-ভবনে অথবা নিকটস্থ হলে বা উদ্যানে ভারতবর্ষ বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বিশ্বরাষ্ট্র সম্মিলনের যেতাঙ্গ উদ্যোক্তারা নাকি তাহাতে বড়ই মর্মপীড়া পাইয়াছিলেন। সম্মিলনে আমন্ত্রিত দেশ-নেতৃবর্গের অনেকে নাকি রাষ্ট্রসম্মিলনের গুরুগম্ভীর আলোচনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকায়া (বৃটিশের চোখে কৃষ্ণ বৈ কি! পরাধীন মানুষমাত্রই 'ব্ল্যাকি'! ভারতবাসীর চোখে, বিজয়া ভারার গোলাব) নারীর চুটকি শুনিতে ছুটিত। বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন, বৃটিশ ভারতবর্ষকে কারাগারে পরিণত করিয়াছিল। আমরা সে কারাগার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছি। "কারাগার" শব্দটি বৃটিশের মরমে বড় ঘা দিয়াছিল। একটি বিজয়-লক্ষ্মীর প্রতিপক্ষরূপে ভারত হইতে, ইংলণ্ড হইতে, মনরসমৃদ্ধ এক বিরাট

শক্তিশালী প্রচারক বাহিনী আমেরিকা পর্যটনে প্রেরণ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়লক্ষ্মীর মুখে শুনিয়াছি ঐ কারাগার পক্ষই বিরোধ করিতে নূনাধিক নব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন বাহান্ন ঐ 'সাদাস্ত' কয়টি টাকা পৌরী সেনের আবাস ভারতবর্ষই দিয়াছিল!

ইত্যবসরে ভারতবর্ষে ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। যুদ্ধকালে বিশ্ববাসীকে জাতিসংঘনির্দ্দিষ্টাচারে চতুর্বর্গ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবে যে কয় মহামতী মহাসাগরোপে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন তাহাদেরই একজন বিশ্বিজয় কুকীর্তনগত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী ভারতবাসীর নরনারীর বসবাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক অপরূপ আইন রচনা করিলেন। এক কথায় আইনটির রূপ এই: ধরুন, যেন, কলিকাতার চৌরঙ্গী, ডিরেক্টার রোড, ডিউলটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবর্ষীয় নরনারীর প্রবেশ নিষেধ করা হইল! ভারতবর্ষীয়গণ বর্ণবৈষম্যমূলক আইনটির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; ভারতবর্ষও ক্রমশঃ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল; দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নরনারী লাঞ্ছিত মর্যাদাবিক্ষুব্ধ হইয়া আইন অমান্য করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। স্মাট্‌স ও তাঁহার স্বর্ণ ও স্বজাতীয়গণ কৈফিয়ৎ দিলেন, কেন যে বাপু, জামবাজার হইয়াছে, রাজাবাজার রহিয়াছে, পানিবাগান কলাবাগান রহিয়াছে সেইখানে থাকুণে না! চৌরঙ্গী পাড়ায় আসিয়া, যে চমৎকার হোমরের খাদ্য বর্ণ—আমাদের চক্ষু পীড়া ঘটাও কেন! আইনটি এতই করুণা ও প্রাণিকর যে, স্মাটসের জাতিবর্ণ পরিচালিত তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেণ্টও এতখানি ঔদ্ধত্য যেবাক্ বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, প্রতিবাদ করিয়া এবং আরও কিছু কিছু করিয়া ভারত-বর্ষের মান রাখিয়াছিলেন। ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিধান ভবনে সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। তারপর, বিশ্বসনদ রচয়িতৃগণের মধ্যে অকৃত্রিম ভারতবন্ধু চার্চ্চিলের উচ্চাসন থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল প্রকাশ্যে বিশ্ববিধান ভবন (UNO) সম্পর্কে ভারতের আস্থা ও নিষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিলেন। চার্চ্চিলগোষ্ঠির শাঠ্য যত শঙ্কাপ্রদই হৌক, আমেরিকা, ফ্রান্স—বিশেষ করিয়া রাশিয়ার চোখে ধূলি নিক্ষেপ যে সহজ নহে তাহা ত সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারি। বোধ করি পণ্ডিতজীরও সেই কারণেই পরীক্ষার আস্থা; এবং জানিতেও আনন্দ হয় যে বিশ্ববিধান তখন এই বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে সওয়াল করিতে যাইবে কে? প্রতিবাদী স্মাটস্ ও তদ্ভক্তবৃন্দ চার্চ্চিল এণ্ড কোং আন্-লিমিটেড্। ১৯৪০ পূর্ব্বকালে হইলে "যে পুঁথি সে যাক্ তুলি দিঁচুড়ি যে পুঁছি সে যাক্" (স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষমা করিবেন) কিন্তু যে ভারত আজ বিশ্বসভায় যোগাসন গ্রহণে উদ্যত তাহার মর্য্যাদা রক্ষার ভার আজ সর্ব্বাধিক ও সর্ব্বাগ্রগণ্য। নির্ব্বাচনের ভার জওহরলালের। "ভাই" জওহর ভগিনী বিজয়লক্ষ্মীর ললাটে ভারতের জয়টীকা পরাইলেন। সহোদরা বলিয়া নহে, যোগ্যতায় এখও কমেও নহে, নবীন ভারতে বৃটিশ-বর্ণিত অবলার স্থান নির্দ্দেশ করিবার শুভক্ষণে জওহরলাল ভারতের বর্ণধারিণীরই মূর্ত্তি ধ্যান করিলেন। বিশ্বের দরবারে বিচার, বিশাল বিশ্বের বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়ন অনন্য-সাধারণ রূপগুণযুক্তা নারীর পানে নিবদ্ধ হইল। ভারতবর্ষীয় পুরাণের কাহিনী আর একবার প্রাণবন্ত হইল। শান্তশীলা মৃদুলক্ষ্মী বিজয়লক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। জয় অনিবার্য্য, বিজয়িনী বিশ্ববিজয় করিলেন।

বাগ্মীতার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন দেখি না; রাজনৈতিক জ্ঞান বুদ্ধির তারিফ করারও দরকার নাই; লিপিচাতুর্য্যের খ্যাতিও অনাবশ্যক; কিন্তু সপ্তাহে যে আচরণ পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়ক সমাজকে মোহিত ও অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, সেই ঘটনাটির উল্লেখ না করিলে এই জগন্মোহিনী নারীর পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমার স্মরণী পাঠিকার স্মরণ আছে, বিপুল লোচাকিকো ভারতবর্ষের জয় ও স্মাটসের পরাজয় ঘটে। অজস্রোচ্ছ্বাসে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেও ঘোষাবহ হইত না; চার্চ্চিল বা স্মাটস হইলে তাহাই করিতেন; কিন্তু ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জয় পরাজয়কে অতিক্রম করিয়াছে; ভারত শিক্ষা দিয়াছে, কর্ম্ম মানুষের, ফলাফল তাহার নহে—ঈশ্বরের! তাই বিজয়িনী তন্মুহূর্ত্তে কিন্তু মার্শাল স্মাটসের জয় প্রত্যাশায় জয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন, আমরা (ভারতবর্ষ) আপনার সৌহার্দ্য বাঞ্ছা করি।

যে পুণ্যভূমিতে গীতার উদ্ভব সেই পুণ্য পবিত্র ভারতবর্ষের মানুষই পরাজিত প্রতিপক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে। গল্পে পড়িয়াছি, দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাট উত্তর ভারত জয় করিয়া শতদ্রুতীরে রাজা পুরুকে বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকটে কিরূপ আচরণ আশা করেন? পুরু উত্তর দিয়াছিলেন, রাজার প্রতি রাজার আচরণ।

বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীও সেদিন বিশ্ববিধান ভবনে বীরের প্রতি বীর-নারীর যোগ্য ব্যবহারই করিয়াছিলেন।

মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞাবসানে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় সস্তরো নম্বর ইয়র্ক রোডে চা খাইতেছি, বিজয়িনী বলিলেন, আমার বড় ইচ্ছা রাশিয়ায় যাই, কিন্তু "ভাই" রাজী হইয়াছেন এবং বিশ্বাসীও জানিয়াছে নবীন ও স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-দূতের মুকুটখানি বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর শিরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। বিরাট সোভিয়েট, বিশ্বের বিস্ময় সোভিয়েট, ধনিক্রীর ত্রাস সোভিয়েট কিন্তু ভারতের সহিত তাহার নিষ্কলুষ সৌহার্দ্য! জ্ঞান-তাপিতের এই বিজয়লক্ষ্মীই সেই সুস্থ স্বর্গ রাজপাট রচনা করিয়াছিলেন, আজ সেই সুবর্ণ রাণী দিয়া ভারত সোভিয়েট-রাশিয়াকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবার ভার সেই বিজয়লক্ষ্মীর উপরই অর্পিত হইল। ভারতবর্ষ আজ আর একবার সীতাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভিনব ও প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইল।

ধন্য ভারত!

মন্বন্তরের মুখে

ভারতবর্ষে আবার দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরের পর দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন যখন তাঁহাদের রিপোর্ট রচনা করেন, তখন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে পঞ্চাশী মন্বন্তরই ভারতের শেষ দুর্ভিক্ষ এবং ইহার পর আর কখনো দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতসরকারকে কোন কমিশন বসাইতে হইবে না। বেশী দিন নয়, মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের এই আশা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের বাজারে এখন যে প্রচণ্ড অন্নাভাব দেখা দিয়াছে তাহাকে দুর্ভিক্ষেরই সামিল বলা চলে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর অন্নের দিক হইতে বোধ একদিনের জন্যও মঙ্গল হয় নাই, হইলে ৪ টাকা মণের চাউল রেশন এলাকায় অনায়াসে ১৬ টাকা মণদরে বিক্রীত হইতে পারিত না। তাছাড়া যেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ ভারতবাসীর দৈনিক ২৬০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য খাওয়া দরকার, সেখানে এতদিন ভারতবাসী মাথাপিছু ঊর্দ্ধপক্ষে ১২০০ ক্যালোরীযুক্ত ১২ আউন্স খাদ্যশস্য পাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দৈনিক এই ১২ আউন্স খাদ্যবরাদ্দ বজায় রাখাও ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না এবং ইতিমধ্যেই মাদ্রাজাদি কয়েকটি প্রদেশে দৈনিক খাদ্যবরাদ্দ ১২ আউন্সের স্থলে ১০ আউন্সে নামিয়া আসিয়াছে এবং বাঙ্গলায়ও এই ১০ আউন্স বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইতেছে। মাদ্রাজের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ সুরু হইবার কথা সরকারীসূত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে। বাঙ্গলায়, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলার খাদ্যপরিস্থিতিও অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন দুর্ভাগ্যের মুখাপেক্ষা ও বেকার সমস্যার যুগ। দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের আজ জীবিকার্জ্জনের খুব অল্প পথই খোলা আছে। এ সময় চাউলের দর প্রতি মণ ফরিদপুরে ৩১।০ আনা, সন্দ্বীপে ২৮ টাকা, বরিশালে ৩০ টাকা ও মাণিকগঞ্জে ৩০ টাকা।* ইউনাইটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে জুন মাসের শেষে প্রতি মণ চাউলের দর উত্তর বাখরগঞ্জে ৩২ টাকা, চট্টগ্রামে ৩০ টাকা (দাতকানিয়ার ন্যায় কোন কোন স্থানে ৪০ টাকা), ফরিদপুরে ৩৬ টাকা ও পাবনার মফঃস্বল অঞ্চলে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিহারের অবস্থাও শোচনীয়, বিহারে চাউলের দর মণ প্রতি ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। সুতরাং অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা চলে যে, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে অর্দ্ধমৃত ভারতবাসী এই বর্দ্ধিত অন্নমূল্যের চাপে ক্রমেই সামগ্রিক এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতে পুনরায় যে এই গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের উদ্ভব হইল, ইহার কারণ দেশের খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতির জন্য দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন ভারত সরকারকে যে সব মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছিলেন, ভারত সরকার সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। দেশে এখনও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই এবং বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া ভারত সরকার যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য হাতে মজুত করিতে পারেন নাই। ভারতসরকারের এই অকৃতকার্য্যতার কারণ অবশ্য বিদেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের অভাব এবং এদেশে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা। এ ছাড়া প্রকৃতিও যে ভারতের প্রতি সদয় নয়, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ধান ও গম গাছের গোড়ায় একপ্রকার রোগ দেখা দেওয়ায় (Rust) ফলে এ বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন ফসল নষ্ট হওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোক বাড়ে, কাজেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাওয়া দরকার। এ বৎসর সিন্ধু পাঞ্জাব ও উড়িষ্যার সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে, ভারতের বাকী সব প্রদেশে (ইহার মধ্যে স্বভাবতঃ মঙ্গল মধ্যপ্রদেশও আছে) ঘাটতির জন্য বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীরই প্রয়োজন। বোটের উপর অন্তর্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাজেটবোধে প্রদত্ত এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, ভারতে এবার ৪৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য ঘাটতি হইবে। এবৎসর (১৯৪৬-৪৭) ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা শস্য উৎপাদনের নিম্নের তালিকা হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে :—

	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৫-৪৬ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা উৎপাদন
ধান	২,৮৩,৫৯,০০০ টন	২,৭২,৮৯,০০০ টন	২,৭০,৯৩,০০০ টন
গম	৮৯,০০,০০০ টন	৮০,০০,০০০ টন	১,০০,৫৯,০০০ টন
বাজরা	৮৯,৫০,০০০ টন	৯৩,০০,০০০ টন	৯৪,৮৩,০০০ টন

আসন্ন এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভারতবর্ষকে যে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও গম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এদিক হইতে ভারতবর্ষের একমাত্র আশা সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের সাহায্য। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধের জন্য ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের বেশী খাদ্যশস্য ভারতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। মে ও জুন মাসে যদি আরও এক লক্ষ টন আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও খাদ্যবোর্ডের প্রতিশ্রুতির অর্দ্ধাংশের কিছু বেশী খাদ্যশস্য মাত্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে।

* অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩শে জুন, ১৯৪৭।

এই অবস্থা নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক মৌ-বর্ষঘটের ফলেও ভারতের আমদানী ব্যবস্থা কিছুটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল এখনও মিটে নাই এবং এই দেশ হইতে ভারতে এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী হইতে পারিতেছে না। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে বৎসরে গড়ে ১৫ লক্ষ টন চাউল যোগাইত, যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মদেশের কৃষিব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা এখনও কিয়দংশে রহিয়া গিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে তেমন বেশী খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। তাহাড়া মুদ্রাস্ফীতির জন্য ব্রহ্মে চাউলের দর এমনি বেশী, সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মসরকার চাউল বেচিয়া শতকরা ১০ টাকা হারে মুনাফা লুটিতেছেন। এইরূপ নানা কারণে ব্রহ্মদেশ হইতে এখন একমণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ১৩ টাকা খরচ পড়িতেছে; ইন্দোনেশিয়া হইতে অনুরূপ পরিমাণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ব্যয় হইতেছে ১২৸৹ আনা।

ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত, দেশের খাদ্যব্যবস্থার পুঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁহাদের আগ্রহশীল হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ এই দুই বৎসরে সরবরাহকৃত খাদ্যশস্যে সরকারী সাহায্য বাবদ তাঁহারা ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া জনসাধারণকে আশ্বাসই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যবৃন্দ ভারপ্রাপ্তরূপ ও বিচক্ষণ হইলে কি হয়, যাঁহাদের হাতে দেশে খাদ্যবণ্টনের ভার তাহাদের অযোগ্যতা (কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তি) বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুঃসময়ে খাদ্যবিভাগের এইরূপ ত্রুটিসমূহ কঠোরহস্তে সংশোধন করা অত্যাবশ্যক। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের স্মরণ অভিজ্ঞতার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের চরম খাদ্যসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সরকারী কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিপরায়ণ দেশবাসী বা সরকারী কর্মচারীদের শায়েস্তা করিতেই হইবে, অন্যথায় আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে এদেশে অগণ্য বুভুক্ষুর মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে না।

ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকীস্থানের অর্থনৈতিক বনিয়াদ

কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান মূলের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ উপস্থিত পাকীস্থান ও হিন্দুস্থানে (ভারতীয় ইউনিয়ন) বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে ভারতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে রাষ্ট্র দুইটির আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া সারা দেশে বিরাট জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অবশ্য তুলনায় হিন্দুস্থান যে সমৃদ্ধতর রাষ্ট্র হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে হিন্দুস্থানের সহিত পাকীস্থানের তুলনাই চলিতে পারে না, তবে প্রস্তাবিত পাকীস্থানে বাণিজ্য-সম্ভারের সুযোগ আছে যথেষ্ট এবং ভারতের বিখ্যাত দুইটি বন্দর চট্টগ্রাম ও করাচী এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লীগদল যেরূপ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল, তাহাতে বিলাতী মূলধনে এই রাষ্ট্রে কিছু কিছু শিল্পাদি গড়িয়া উঠাও বিচিত্র নয়। তাহাড়া পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু পাকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া খাদ্যশস্যের দিক হইতে পাকীস্থান অনেকটা স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট লইয়া তো পাকীস্থানীরা ইতিমধ্যেই বেশ চড়া সুর ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। তবে কৃষিজাত পণ্যের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইলেও খনিজ সম্পদের দিক হইতে পাকীস্থানের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি "হিন্দুস্থান ও পাকীস্থান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য" (Basic facts relating to Hindusthan and Pakisthan) শীর্ষক একখানি পুস্তিকায় উভয় রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ বিড়লার এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ না হইতে পারে, ইহাতে কিছু কিছু সংখ্যাতত্ত্বগত ভুল ও থাকা সম্ভব, তবে দায়িত্বশীল অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত এই বিবরণী উপেক্ষার বস্তু নয়। এই বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রস্তাবিত পাকীস্থান এলাকার আর্থিক বনিয়াদ মোটেই সুদৃঢ় নয় এবং এই বনিয়াদ সত্যসত্যই সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে বিপুল অর্থব্যয়, শিল্প ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে। অবশ্য লোক সংখ্যা এবং কৃষি সমৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে, রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থা ভাল হইলে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ হইবে না। কৃষি-জীবী ভারতের দুর্গতি তাহার লোক বাহুল্যের জন্য, পাকিস্থানে ভূমি হিসাবে লোকসংখ্যা হিন্দুস্থানের তুলনায় এমনি অনেক কম। তাহাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা দৃঢ়, সবল ও কর্মঠ; কৃষিশ্রমিক বা শিল্পশ্রমিক, দুই হিসাবেই তাহারা গড়পড়তা ভারতবাসীর তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। জনবিরল অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিতে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইউরোপেরই কৃষিজীবী দেশ ডেনমার্কের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা বা জীবনযাপনের মান মোটেই হীন নয়। যাহাহউক, মোটের উপর যাঁহারা এখনো অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন এবং যাঁহারা আশা করেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে পাকীস্থানী কর্তৃপক্ষ যখন আর্থিক অনটনের জন্য পাকীস্থানকে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করিয়া অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবেন, মিঃ বিড়লার নিম্নলিখিত হিসাব পড়িয়া তাঁহারা আশাহত হইবেন সন্দেহ নাই।

শিল্প অঞ্চল (১৯৩৯-৪০)

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
কাপড়ের কল	৩৮০	৯
পাটকল	১০৮	—
চিনির কল	১৪৩	১০
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা	১৮	—
সিমেন্টের কারখানা	১৩	৩
কাগজের কল	১৩	—
কাঁচ কল	৭৭	২

ব্যবসা ও পেশাগত আয় (টাকায়)

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
খনি ইত্যাদি	৯,৪১,৪৭,৩২৪	২,৩৮,৪০,৮৮০
শ্রমশিল্প	৪৪,৮৯,৮১,৮৪০	২,৭৭,১৮,২১৩
যাতু ও খাতব পণ্য	৩,৫২,৪৪,৮৩৪	১,৮৯,৩০,৯৭৪
গৃহ নির্মাণ ও বিবিধ পণ্য তৈয়ারী	৭,৮৩,৬৭,৪৩২	১,৪১,৭৩,২৭৩
বণ্টন ও যোগাযোগ	১০৪,৬০,৫৪,৪৭২	১৮,৪৭,৪৬,৭২১
অর্থ ব্যবস্থা (Finance)	২০,৬২,১১,৫১৮	৩,৮৮,০৭,৪৭২

কৃষি ও খাদ্য সম্পদ

কাঁচা পাট	৯, ৮৩, ৫১৮ একর	১৪, ০৩, ৭০০ একর
কাঁচা তুলা	১, ৩৭, ৭০, ০০০ একর	১৮, ৩০, ০০০ একর
চা	৯, ৪১, ২৪৩ একর	৪৬, ৬৫৭ একর
ধান	১, ৭২, ২৮, ০০০ টন	৪৩, ৭৮, ০০০ টন
গম	৪১, ৯৯, ৭৪০ টন	২৭, ৮৫, ২৮০ টন
চীনা বাদাম	৫২, ৭৪, ০০০ টন	নগণ্য

খনিজ সম্পদ

কয়লা	২, ৪০, ৭৮, ৮০২ টন	১, ২৮, ৪৭৮ টন
পেট্রোল	৩, ৪৯, ৬৮, ৯৪১ গ্যালন	২, ১১, ১৩, ৪২০ গ্যালন
ক্রোমাইট	৫, ১ ৯৪ টন	—
তামা	২, ৮৮, ০৭৩ টন	—
লৌহ	১৪, ২১, ৭০১ টন	—
ম্যাঙ্গানিজ	৭, ৩৩, ৩৪১ টন	—
অভ্র	১, ০৮, ৮৩৪ হন্দর	—

যোগাযোগ

(১) রেলপথ		
দৈর্ঘ্য	২৫, ৯৭০ মাইল	১৪, ৪৪২ মাইল
মূলধন	৬২৪' ৬৮ কোটি টাকা	২৩৫' ৮১ কোটি টাকা
(২) রাজপথ	২, ৪৮, ৩০৫ মাইল	৪৯, ৮৩৩ মাইল
সম্ভাব্য জলশক্তি	১৩,৪০,০০০ কিলোওয়াট	২৮,৪৭,০০০ কিলোওয়াট

রাজস্বের হিসাব

প্রাদেশিক		
আয়	১৪৩'৩৮ কোটি টাকা	৪৪'৭৪ কোটি টাকা
ব্যয়	১৪২'২৭ কোটি টাকা	৪৯'৪৭ কোটি টাকা
উদ্বৃত্ত (+), ঘাটতি (−)	+১'১১ কোটি টাকা	−৪'৯৮ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয়		
আয়	২৭৭'২১ কোটি টাকা	৮২'৯৫ কোটি টাকা
ব্যয়	৩৯৯'৩২ কোটি টাকা	১১৩'২৯ কোটি টাকা
উদ্বৃত্ত (+), ঘাটতি (−)	−১১২'১১ কোটি টাকা	−৩৩'৩৪ কোটি টাকা

গ্রামাঞ্চলের একটি সমস্যা

শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল। শিল্পবাণিজ্যের দিক হইতে প্রস্তাবিত হিন্দুবাঙ্গলা কিছুটা লাভবান হইলেও খাদ্যশস্য এবং জনবায়ের দিক হইতে মুসলিম বাঙ্গলার অবস্থা যে অধিকতর আশাপ্রদ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য সমগ্রভাবেই বাঙ্গলা খাদ্যশস্যের হিসাবে ঘাটতি প্রদেশ এবং মুসলিম বঙ্গও যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তাহাতে এই নূতন রাষ্ট্রের পক্ষে হিন্দুমুসলমান সকল অধিবাসীকে প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যশস্য যোগান সম্ভব নয়।

হিন্দুবাঙ্গলা বা পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইলে এই অঞ্চলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার এবং ভূমির উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির তথা কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধনের একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা অবলম্বনে অকারণ বিলম্ব বহু-সম্ভাবনাময় পশ্চিম বঙ্গবাসীর আশাহতাশারই সমতুল হইবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রধান অনুপূরক হইল পশ্চিমবাঙ্গলার নদনদীগুলির সংস্কার। সকলেই জানেন দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে পশ্চিমবাঙ্গলার ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং বহু কারখানা চালাইবার উপযোগী ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। এছাড়া নদীটির সংস্কার হইলে উপর্য্যুপরি বন্যা প্রতিরুদ্ধ হইবার সহিত নদীপথে অবাধ নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় দামোদরের পার্শ্ববর্তী বন্দরগুলির উন্নতি হইবে ও গ্রামবাসীদের প্রভূত সুবিধা হইবে। এইভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে লক্ষ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্যই রক্ষা পাইবে। শুধু দামোদর, অজয় ময়ূরাক্ষী বা দারুকেশ্বরের ন্যায় অপেক্ষাকৃত বড় নদী নয়, সরস্বতী, যমুনা প্রভৃতি ছোট ও মাঝারি নদীর সংস্কারের আবশ্যকতাও এখন অত্যধিক। এইসব নদী যে মজিয়া যাইয়া অসংখ্য গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়াইতেছে এবং পার্শ্ববর্তী জমিগুলির উৎপাদিকাশক্তি কমাইয়া দিতেছে, রেলওয়ে ও জেলাবোর্ডের পরিকল্পনাহীন সেতু-গুলিই তাহার প্রধান কারণ। প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করা বা সংস্কার করা যাহাদের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। এই ধরণের সেতু নির্ম্মাণে সামান্য কয়েকটি টাকা বাঁচাইবার জন্য কিরূপ মারাত্মক অবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। ২৪ পরগণায় বসিরহাট মহকুমায় পদ্মা নামে একটি মাঝারি ধরণের নদী আছে। নদীটি চারঘাটে যমুনার সঙ্গে মিলিয়াছে। চারঘাট হইতে ৩৪ মাইল দক্ষিণে চাঙরা পর্য্যন্ত নদীটি কমপক্ষে ৪২৫ ফুট চওড়া, কিন্তু জেলাবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ খাদপুর-মহম্মদপুর রাস্তায় দক্ষিণ-চাঙরায় যে সেতুটি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেটি মাত্র ৭৪ ফুট এবং এই সেতুটির মাঝে আবার তিন ফুট চওড়া দুটি বাঁশ গাঁথা হইয়াছে। এই সেতু হইতে আরও ৪ মাইল দক্ষিণে কমলপুর গ্রামের পাশে-মহম্মদপুর-খোলাপোতা রাস্তায় নদীর আর যে একটি সেতু আছে সেটি মাত্র

২০ ফুট লম্বা। বলা বাহুল্য সেতুবন্ধনের সময় খরচ বাঁচাইবার জন্য কর্তৃপক্ষ এইভাবে নদী বাঁধিবার যে পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে নদীটি একেবারে মরিয়া যাইতেছে এবং বর্ষার কয়েকটি দিন ছাড়া নদীর স্থির জল সারা বৎসর কচুরীপানায় ভর্তি হইয়া থাকে। বর্ষার দিনগুলিতেও কচুরি পানা এমন কিছু সরিয়া যায় না যাহাতে নৌকা চলাচল চলে। এই ধরণের নদীর উপর এভাবে সেতু বাঁধা না হইলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির স্বাস্থ্য ও জমির উৎপাদিকাশক্তি যে অনেক বাড়িতে পারিত, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এইসব নদীতে স্রোত থাকিলে কচুরী পানা জমিতে পাইত না, স্টীমার নৌকা চলাচলের ফলে মাল ও যাত্রী আনা যাওয়া করিতে পারিত, ম্যালেরিয়ার উৎপাত কমার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের অধিবাসীদের অনেকটা সুখসুবিধা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হইত। একটু বাহিরের জমিতে জলসেচের বা শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাতেও সেক্ষেত্রে এই নদী অনেক প্রভূত সহায়তা করিত।

১-৭-৪৭

দেশীয় রাজ্য ও গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

২৮শে এপ্রিল গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন বসিলে, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য সর্বপ্রথম গণ-পরিষদে যোগদান করে। বরোদা, কোচিন, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ১৩ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। এই ১৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১ জন নির্বাচিত ও মাত্র ২ জন মনোনীত। ইহার পরে ছোট বড় করিয়া আরও অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য একে একে গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগদান করিল না তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণার পর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অপর কয়েকটি রহস্যজনকভাবে চুপ করিয়া রহিল।

প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র অর্দ্ধেকের কম লইয়া নরেন্দ্রমণ্ডল। তাহা হইলেও নরেন্দ্রমণ্ডলের অনেকেই গণ-পরিষদে যোগদান করায় এবং অনেকে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভূপালের নবাবের পক্ষে আর নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলারী পদে থাকা সম্ভব হইল না। তিনি গণ-পরিষদে যোগদান সমর্থন করিলেন না। তিনি নিজে আশা করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিলেই ভূপালকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তাই তিনি চ্যান্সেলারের পদে ইস্তফা দিলেন।

ভূপালের যোধপুর, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিল। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এক ঘোষণায় বলিলেন—১৫ই আগষ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ১৫ই আগষ্ট হইতেই ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণ যেন ইহাতে মহারাজাকে সমর্থন করেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য মহারাজা যে কোনও অবস্থার সম্মুখীন হইতে বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

১২ই জুন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরও এক ফার্মানে ঘোষণা করিলেন যে—হায়দরাবাদ হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোনও গণ-পরিষদে যোগদান করিবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের উপর হইতে তাঁহাদের সার্বভৌমত্বের অবসান হইবে, তখন হায়দরাবাদ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই সময় দিল্লীতে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকে। যে সব দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সমালোচনা করিয়া উক্ত অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয়—কোনও দেশীয় রাজ্যের রাজা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেন না, অধিকন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিবেন। তাঁহার এইরূপ কার্যে বাধাপ্রদান করিতেই হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিলে সার্বভৌম ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপরেই আসিবে, তখন নৃপতিগণকে প্রজাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে অবস্থান করিতে হইবে।

হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্কল্প করিলে হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থ হায়দরাবাদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু নিজাম বাহাদুর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৩ই জুন হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। ইহাতে নিজাম বাহাদুর স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্কল্প করিয়া যে ফার্মান প্রকাশ করেন তাহার সমালোচনা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—নিজাম বাহাদুর জনসাধারণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া এবং জনমত গ্রহণ না করিয়াই এই ফার্মান প্রকাশ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিলে ষ্টেট কংগ্রেস সর্বপ্রকারে বাধাদান করিবে।

ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত পট্টমথানু পিলাই ও ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জানাইলেন,—ত্রিবাঙ্কুর যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তাহা হইলে প্রজা-সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে। আমরা ইহার জন্য ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইব। আমাদের এই অহিংস আন্দোলন দমন করিতে গবর্ণমেণ্ট যত কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, আমরা কিছুতেই দমিব না।

১৩ই জুন হইতে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বলা হয়—কোন দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, সেই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা আদৌ স্বীকার করা হইবে না। কোন বিদেশী শক্তি উহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে তাহা বন্ধুত্ব-বিরোধী কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

গণ-পরিষদ ও উহার বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য স্যার এন. গোপাল-স্বামী আয়েঙ্গার, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল স্যার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কোচিনের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার আর. কে. সন্মুখম্ চেট্টি, মিঃ কে. এম. মুন্সী, ডাঃ আম্বেদকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, উহাদের স্বাধীনতা ঘোষণার শাসনতান্ত্রিক বা আইন-সঙ্গত কোনও অধিকার নাই। মহাত্মা গান্ধীও কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার প্রার্থনাস্তিক ভাষণে দেশীয় রাজ্যের এই অসঙ্গত দাবীর কথা উত্থাপন করিলেন। ১৩ই জুন নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় তিনি বলিলেন—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ফলেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিকুলের ভারতকে আরও বিভক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও একটিতে যোগদান করা উচিত। ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ যে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। কোনও দেশীয় রাজ্যের পক্ষেই এরূপ মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বর্তমানে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। নৃপতিবৃন্দ যদি সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তবে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। পরদিন পুনরায় গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—ত্রিবাঙ্কুরে গণ-ভোট গ্রহণ করা হইলে জনসাধারণ সকলেই স্যার রামস্বামী আয়ারের স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুরের বিরুদ্ধেই ভোট দিবে। ১৪ই জুন তারিখে ত্রিবাঙ্কুরের এক প্রতিনিধি দল মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা তাঁহাকে জানান যে, ত্রিবাঙ্কুরে জনমতের কণ্ঠরোধের চেষ্টা ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের এক জনসভায় পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়া ৩০জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গান্ধীজী এই দিন প্রার্থনা সভায় বলেন—স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিকুলের স্বাধীনতা ঘোষণার কোনও মূল্য নাই, ইহা ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। বর্তমানে ইহা কল্পনাতীত।

দেশীয় রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের বিষয় লইয়া, দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণ ও দেশের নেতৃবৃন্দ যখন এইভাবে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন যে, মন্ত্রিমিশনের ১২ই মের স্মারকলিপিতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কোনও নির্ধারিত নীতির কথা বলা হয় নাই। পাকিস্থান কি হিন্দুস্থান একটি গণ-পরিষদে তাহাদিগকে যোগ দিতে হইবে ইহা ঠিক নহে। আমার মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে, কারণ তাহাদের সে অধিকার রহিয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্মরণ জুনের ঘোষণার ১৮নং অনুচ্ছেদে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়, ১৯৪৬ সালের ১২ই মে তারিখের স্মারকপত্রে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে নীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বলবৎ থাকিবে।

১২ই মে তারিখের উক্ত স্মারকলিপিতে নির্দেশ থাকে যে, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিবে, তাহা না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহারা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইবে।

উক্ত নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন হওয়ার কোন কথাই ইহার মধ্যে নাই। তাহাদের দ্বারা করিবার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই করিতে হইবে। মিঃ জিন্না কিন্তু ভেদ-নীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভারতকে আরও খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিলেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে সকল পাকিস্থান রাষ্ট্রের আশা তিনি পোষণ করিতেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহা না হইয়া এক "কীটদষ্ট" ক্ষুদ্র পাকিস্থান তাঁহার হস্তগত হয়। মিঃ জিন্না দেখিলেন, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইলে উহা আরও সবল হইয়া উঠিবে। তাই তিনি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীন হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে ভেদনীতির চালও চালা যাইবে।

তাই যে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করায় কংগ্রেস তাহা অস্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন, মিঃ জিন্না সেই ত্রিবাঙ্কুরকে স্বাধীন স্বীকার করিয়া তাহার সহিত চুক্তি করিতে অগ্রসর হইলেন। মিঃ জিন্না হয়ত ভাবিলেন, একটা হিন্দু দেশীয় রাজ্য ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খাড়া করান গেল। মিঃ জিন্না ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে যে আলোচনা হয়, ২১শে জুন ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম হইতে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয়—মিঃ জিন্না ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাহাতে পাকিস্থান ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র স্থাপিত হইলেই ত্রিবাঙ্কুরের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে ও পরস্পরের মধ্যে সুবিধাজনক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে মিঃ জিন্না স্বীকৃত হইয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ইনেস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশ খানবাহাদুর আব্দুল করিম সাহেবকে পাকিস্থান ডোমিনিয়নের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছে। এই চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা দ্বারা ত্রিবাঙ্কুর

পাকিস্থান হইতে চাউল এবং পাকিস্থান বন্দর করাচীর মধ্য দিয়া মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল পাইবে, আর ত্রিবাঙ্কুর পাকিস্থান রাজ্যে চা, মশলা, নারিকেল প্রভৃতির বাজার পাইবে।

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে যুক্তি দেখান যে, ত্রিবাঙ্কুর কোনও দিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিজিত হয় নাই। বৃটিশের সহিত ত্রিবাঙ্কুরের সন্ধি একটা মৈত্রীমূলক মাত্র। অথচ বাউন্সার কমিটির রিপোর্ট, যাহাকে প্রায় সকল দেশীয় রাজ্যই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন দেশীয় রাজ্যগুলির সংস্পর্শে আসে তখন উহারা কেহই স্বাধীন ছিল না। উহাদের অনেককে অপরের অধীনতা হইতে উদ্ধার করা হয়, বাকীগুলিকে সৃষ্টি করা হয়।

যাহাই হউক, ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান যিনি ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এতখানি আগ্রহান্বিত, তিনি কিন্তু আসলে বৃটিশ ভারত, মাদ্রাজের অধিবাসী। ইনি পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তা ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমানে ইনি ভারতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধাচারী মিঃ জিন্নার সহিত হাত মিলাইয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে থাকিবার জন্য যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন, রাজ্যের প্রজারা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বেচ্ছাচারী মহারাজাকে এ বিষয়ে মোটেই সমর্থন করিবেন না। তাঁহারা ইহার জন্য যে কোনও রূপ দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত, একথা জানাইয়া দিয়াছেন। আর হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণা অথবা পাকিস্থান রাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাঁহার রাজ্যের শতকরা ৮৯জন হিন্দু। ইহাদের মিলিত দাবীর বিরুদ্ধে নিজামের টিকিয়া থাকা অসম্ভব। মধ্য ভারতে অবস্থিত ভূপাল রাজ্যেও অধিকাংশ প্রজাই হিন্দু। এই জাগ্রত প্রজাসাধারণ ভূপালের নবাবের স্বেচ্ছাচারিতার সাথ না দিয়া তাহারাই তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ভারতের সংহতি ও মর্যাদার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির আশু কর্তব্য হইল—বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও একটিতে অবিলম্বে যোগদান করা। ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ, ভূপাল ছাড়া আরও কয়েকটী দেশীয় রাজ্য রহিয়াছে, তাহারা কোন গণ-পরিষদে যোগদান করিবে কিনা এখনও কোন মতামত জ্ঞাপন করে নাই। যাহা হউক, তবে এখন পর্যন্ত ইহা ঠিক হইয়াছে যে মাত্র এই কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতের প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের অধিকাংশই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিবেই।

অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ফসলবিহীন অসংখ্য মাঠে ফকের পালক ঝরে,
অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে।
বীরবতাভরা নির্জ্জন নদী নির্জ্জীব নিশ্চল
উতলা উদাস সমীরণে দোলে সবুজ শস্যদল ;
পাশবিকতার ঘূর্ণকুণ্ডলী গাঁয়ে গাঁয়ে অবিরত
কে জানে কখন জ্বলিবে বহ্নি দুরাশার প্রলোভনে
হিংসার আবাহনে !

ক্ষুব্ধ হরিণ ত্রস্তিরাছে হোথা প্রতিদিন নির্জ্জনে,
মৃগয়ী মায় জীবন সূর্য্যোদয়ে।
সে মাতা আমার স্নেহের কোলে আশ্রয় দিয়ে হায়,
ধূলি আবর্ত্তে মানব যাত্রী পদে পদে পায় ভয় ;
সংঘাত-ঘেরা রৌদ্র-জ্যোছনা মুখরিত দিনরাত,
মরু সভ্যতা তুলায় কৃপাণে পরাণ হরণ করি
নির্ম্মমরূপ ধরি।

যেথায় শুনেছি জনকলরব মিলনের মোহানায়
স্নেহের ছুটীয়ে প্রীতি আর মমতায়,
ছায়া ফেলে ফেলে মনের ভাবনা চলে চারিদিক ঘেরে,
আমার জীবন-গোধূলি বেলায় মেঘভাঙা পথ বেয়ে।
মসজিদ আর দেউলের চূড়া দেখা যায় তরু শিরে,
সরিষা ক্ষেতের পাশে গ্রামখানি তেপান্তরের পারে
পাগ্‌লা নদীর ধারে।

চিত্ত আমার সরসীর সম ছিল একদিন গাঁয়ে,
প্রথম প্রণাম পরাজেছি তার পায়ে।
কত পার্ব্বণ উৎসব ফুল সমাহিত বীথিকায়,
কোথায় গিয়েছে মানবতা ওর মানুষের রীতিকায় !
বিস্মৃত কত পলাশী যুদ্ধের প্রেতায়িত ইতিকথা
শ্যামা বনশ্রীর অঞ্চলে ঢাকা পোড়ো ভিটাদের মাঝে
মাটীর স্বপন রাজে।

আমাদের গ্রামের পাখী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোকিলের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙিত। কাক কি মোরগের ডাকে না। প্রভাত হইবার বহুপূর্বে কোকিল, পাপিয়া এবং অন্যান্য পক্ষীর সুদীর্ঘ সুমধুর কলরাট চলিতে থাকিত। আমাদের গ্রামে মুসলমান নাই, কুসুর নদীর পারে মোল্লাদের ডাক ক্বচিৎ শোনা যাইত। কাক খুব প্রাম হইতে জোর কেলাতেই আসিত বটে, কিন্তু তার পূর্বেই বিহগ-কুলের ঐকতান আরম্ভ হইত।

কাক রূপহীন এবং তাহার কণ্ঠ কর্কশ, কিন্তু তাহাদের সহিত যেমন মহয়ম মহয়ম, এমন আর কোনো পক্ষীর সঙ্গে নয়—তাহারা প্রায় গৃহ পরিজনেরই মত। যাহাদের ঘরে যুগে যুগে পিকরাজ পালিত হইতেছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা তো চলে না! আমার উহাদিগকে চিরদিনই ভাল লাগে—পরিণত বয়সেও সে প্রীতি কমে নাই। একবার বর্ষমান ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে একটী বাড়ীতে রাত্রি কাটাই, সমস্ত দেবদারু বৃক্ষগুলি সন্ধ্যায় অসংখ্য কাকের সমাগমে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। জ্যোৎস্না রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, কাকগুলি ততই ডাকিতে লাগিল—কাকের ডাক যে এত মিষ্টি হইতে পারে তাহা কখনো ভাবিতে পারি নাই।

"আজ পেয়েছি জানতে আমি সন্দেহ নাই আর,
কোকিল কেন কাকের কুলে কণ্ঠ সাধে তারে?
কোকিল নহি—কিন্তু আমার আনন্দেতে বুক,
কাকের বাসায় একটী ছোট রাত্রি যাপার সুখ।"

আমাদের বাড়ীতে এখন পাঁচটী কাক নিয়মিত আসিত, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিত—এখনো থাকে এবং দল বৃদ্ধিই হইয়াছে।

আমার শৈশবে আমাদের পরিচারিকা 'মাদরা'—'সোনার কেটও' 'কাগা' মামা ও 'বগা' মামার গল্প বলিয়া কাক ও বকের প্রতি একটা অহেতুকী ভালবাসা আনিয়া দিয়াছিল। 'বুধি' মামা ও 'চাঁদা' মামার পরই ঐ দুটী পাখীর সঙ্গে আত্মীয়তা। বকের সম্বন্ধে রসিকতা করিয়া সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন—

"দেখছি আমি হে বক তুমি
চাঁদের চেয়ে ভালই বাসা।
শুক্লপক্ষ একটা চাঁদের
দুটী পক্ষ তোমার সাদা" (অনূদিত)

বলাকা দলের একসঙ্গে মাঠে অবতরণ ও সন্ধ্যায় শুভ্র বুধিকার মালার মত একসঙ্গে ঊর্দ্ধাকাশে প্রয়াণ বড়ই সুন্দর। আমাদের গ্রামে একটী তেঁতুলগাছে অসংখ্য বক বাস করিত, গাছটী সাদা করিয়া রাখিত, কেহ বিরক্ত কি হিংসা করিত না।

আমাদের গ্রামে কোকিল ও পাপিয়ার সংখ্যা খুব বেশী, পাপিয়াও কোকিলের ন্যায় বাসা বাঁধে না—ছাতারে পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে।

"পাপিয়া কি পারিতে পারে
রচতে হলে বাসা?"

বৈশাখের শেষে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমে কাক ও ছাতারের বাসা হইতে কোকিল ও পাপিয়া সংগ্রহ করার চেষ্টা অনেকে করিত।

শালিক, বুঁইকে, টিয়া, ময়না, বুলবুলি, চড়াই, ঘুঘিয়া খাঁচা বাঁধিয়া ঘুরিত। অধিকাংশ প্রথম বৃষ্টির অপেক্ষায় আমাদের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটী শালিককে 'আহার' অন্বেষণ করিতে দেখিতাম—

"এত বাদল—তবু সাঁঝে
একটী শালিক চরে,
মিশ্কা ওর আছেই আছে
পোটেল ছেলে ঘরে।
ছোট ছেলে রাগে,
বকুতে বুকে বাজে।
জননী তার তাই এসেছে
'আহার' নেবার তরে।'

'খোলা পায়রা' প্রত্যেক বাড়ীতে আসিত এবং বাসা করিত। ডানাগুলি একটু বড় হইলেই বড় পায়রাদের সঙ্গে খুব অহঙ্কার করিয়া সোহাগে ঘাড় ওঁচু করিয়া 'বকম' 'বকম' করিবার চেষ্টা করিত, যেন বলিতে চায়—

"যেন আমার বাপ বকে না
সোহাগ করে না,
দুনিয়াতে কাউকে আমি
কেয়ার করি না?'

হলুদ পাখী 'বউ কথা কও' প্রায়ই স্থায়ী অধিবাসী ছিল না, মাঝে মাঝে আসিত। হলুদ পাখী সম্বন্ধে গ্রাম্য গল্প আছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত টিয়ার বিবাহের পাকা কথাবার্ত্তা হয়, গায়েহলুদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু বিবাহ ভাঙিয়া যায়—কন্যা মনোদুঃখে পাখী হইয়া ফেল এবং—'কুষ্ঠীর দোষ' হোক', 'গৃহস্থের দোষ হোক' বলিয়া ডাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে বালক মনে ব্যথা পাইতাম। নীলকণ্ঠের গানে আছে—

"কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়?
যা ভেবেছিনু কি সুখ আমা?
নম্ব কেঁদে অন্ধ হলো,
দেবকীর যে যাতনা
সেও কি তার পরিচয়?"

কতকগুলি পাখী অকারণে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ছিল—যেমন দাঁড়কাক, শোচিল, ঘুঘু, কালপেঁচা। ঘুঘু অতি নিরীহ পক্ষী, কিন্তু ঘুঘুকে গ্রামবাসী ভাল চক্ষে দেখে না—'ভিটায় ঘুঘু চরা' একটা গালাগালি। ঘুঘুকে বাড়ীর কাছে বাসা বাঁধিতে দেয় না, 'ঘুঘুর বাসা' মানে দুষ্ট ও অনিষ্টকারীর আড্ডা। এই অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বোধহয় কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সুদূর অতীত যুগে এই পক্ষীদের সম্বন্ধে গল্প রচনা করিয়াছিলেন: শাশুড়ী ও বৌ থাকিত, বৌএর নাম 'চিতু', চিতুকে ছাতু কুটিতে দিয়াছিল, কোটা হইলে শাশুড়ী মাপিয়া দেখিল কাঁড়া পূর্ণ হয় নাই, খালি আছে, তাই মাপিয়া তার গালে চপেটাঘাত করিল, চিতু মারা গেল। শাশুড়ী পরে দেখিল, কাঁড়া পূর্ণ হইয়াছে, ভুল ভাঙ্গিয়াছে। শোকে অনুতাপে সে ঘুঘু হইয়া উড়িয়া গেল, আর সুরে সুরে ডাকিতে লাগিল—

'ওঠো চিতু, কাঁড়া পূ পূ পূ।'

ঘুঘুর স্বরটী বিষাদমাখা বটে।

শৈশবে একটী পরাহত বন্য কপোতকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তার রাঙা আঁখি দুটীর ম্লান চাহনী আমাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, এখনো ভুলিতে পারি নাই—

"দিনু গায়ে হাত বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
শিরে মরণের কাল হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি'
তার সে চাহনী যে কথাটী হায় করে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাই না খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।"

টাকশোনা (নীলকণ্ঠ) ও শঙ্খচিল পল্লীবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করে; শোচিল বেচারীর দুর্ভাগ্য—লোকে বলে,

"শঙ্খ চিলের ষষ্টি বাটা
শোচিলকে কুড়ুলে কাটে"

লক্ষ্মী পেঁচা আমরা পাই, লক্ষ্মীর বাহন; কিন্তু কালপেঁচা ঘৃণা ও ভয়ের বস্তু। দাঁড়কাক যমের দূত।

'মাণিকজোড়' পাখী দুটীকে এক সঙ্গে ওড়ে, চরাতে এক সঙ্গে চরে, কখনো কাছ ছাড়া হয় না—এক সঙ্গে দুইজনকে সর্ব্বদা দেখিলেই তাই লোকে বলে "যেন মাণিক জোড়"। 'শামখোল' মাণিক জোড়ের মতই, তবে তাদের চেয়ে কিছু বড় এবং দেখিতে ভত সুন্দর নয়। তিতির পাখী গ্রামে অনেক। লোকে বলিত—

"তিতির পাখী বনের ভেকে
ফকির হু তুই ফকির হু"

এ অঞ্চলে ফকিরেরা এ পাখী বেশী পোষে বলিয়াই বোধ হয় এই জনশ্রুতি।

কাঠঠোকরা পাখী দেখিতে ভাল, বাগানে ও বনে থাকে, প্রখর মধ্যাহ্নে তাহাদের শব্দ বনের নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে এবং ঘুঘুকে রহস্যময় ও ভীতিময় করে—তাই ছেলেরা বলে

"টিক ঘুঘুর বেলা
ঘুতে মারে ঢেলা।"

বাবুই পাখী গ্রামের ডাল গাছের শাখায় সুন্দর বাসা বাঁধায়, কিন্তু বর্ষায় বৃষ্টি ধারায় তাহারা নীড়ের মধ্যে থাকিয়া ভিজে, বোধ হয় 'বাসাবাস' ভালবাসে। কথায় বলে "ঘর থাকতে বাবুই ভেজে"। টুনটুনি পাখী বিচিত্র রঙের বিভিন্ন জাতীয়—ছোট ছোট সুন্দর নরম বাসাগুলি ছোট গাছের শাখাতে নির্ম্মাণ করে। তাহাদের কুজনে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ।

বনটিয়া কখনো কখনো দল বাঁধিয়া আসিত। তবে সেগুলি ছোট, মধ্যে মধ্যে বড় টিয়া পাখীও দেখা যাইত তবে তাহারা আগন্তুক মাত্র। হরিয়াল পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে, আমাদের গ্রামে শিকার নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিতে আসিত না। শিকারী (শ্যেন) পাখী পায়রা এবং বাঁদ প্রায়ই মারিত। মুসলমান ফকিরা শিকারী পাখী পোষে এবং তার দ্বারা বক ও ঘুঘু প্রভৃতি ধরে।

জলচর পক্ষীর মধ্যে, ডাহুকপাখী, বুনো বাঁশ, মাছরাঙা, খঞ্জন, কাদাখোঁচা, টিটিভ দেখিতাম। 'বেনেবুড়ি' ডুবিয়া যায় ধরে, ছোট ছেলেরা "বেনেবুড়ি বেনেবুড়ী আমার হয়ে একটী ডুব দে" বলিত আর সে ডুব দিত। ছেলেদের কথায় নয়, নিজের দরকারে, কিন্তু বারংবার ধরিয়া ঐরূপ অনুরোধ করিতে থাকায় মনে হইত, এত অনুরোধ আর এড়াইতে পারিল না। টিটিভের ডাক ডাকাডাকি অপ্রযুক্ত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। জলাভূমিতে আলো দেখিলে ঐ পাখীগুলি গ্রামের দিকে ছুটিয়া আসে—তীক্ষ্ণ ডাকে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙাইয়া দেয়—সজাগ করে। গ্রামবাসী সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রাজু ঘোষ নামে এক গোপ যুবক বহুবিধ পক্ষী পুষিত—সে গ্রামের পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ছিল—পাখীদের সম্বন্ধে সে অনেক সত্যমিথ্যা বলিত এবং তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারে এই ভান করিত।

পক্ষীজাতির মধ্যে অনেকে দেবদেবীর বাহন, তাহারা মানবের হিত করে এবং ভবিষ্যদ্বক্তা এই সব লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী তাহাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়া তুলিত। তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল। গ্রামের বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি-গুলি তাহাদের সুখ ছিল, পল্লীকে তাহারা শব্দময়ী ও সঙ্গীতময়ী করিয়া রাখিত।

আমার মাতৃদেবী টিয়া পায়রা পুষিতে ভালবাসিতেন। একটী টিয়া পাখী সুন্দর বুলি বলিত। ২।৩ বৎসর পর সেটী মারা যায়, মা নিজে হাতে তুলসীতলে তার সমাধি দেন—আমি সজল নয়নে তাঁর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কত দিন হইল কিন্তু মনে হইতেছে যেন সেদিনকার ঘটনা। কাশ্মীর হইতে তিনি বহু খরচ ও ক্লেশ করিয়া ২।৩ যার টিয়া পাখী আনিয়াছিলেন, দুটী পাখীই অনেক দিন ছিল—আমি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

"তোমরা ছিলে কাশ্মীরেতে
আঙ্গুরেরি ক্ষেতে,
নিত্য রঙিণ ফুল পরাগে
ছইতো খাবার ক্ষেতে।

কমল যখন ফুটতো "মানসজলে"—বলে
নাগ্‌তো ভালো ফুলের পদ্ম জলে স্থলে,
রাঙা আপেল বাগান ভরা
ডাকতো কাছে কেতে।
বিলায় বাঘে গীয়ার চেখে
ফুটতো মধুর বোল,
আঙুর বনে অলস হয়ে
লতায় খেতে দোল।
'বিলায় নদীর দুকূল করি আলা
উড়তে নদীর মরকতের মালা
লাগতো ভাল স্নিগ্ধ উজল
নীল আকাশের কোল।"

যখন অন্তরে চল নামিত, জলচর স্থলচর পাখীর এক বিরাট বহর অহর ও ফুলুরের বুক ছাইয়া ফেলিত। চারিদিকে রাঙা জল, তাহার উপর ভাসমান শুভ্র ফেনের স্তবক, তাহাতে অসংখ্য লোকা মাকড়—জলের গভীর কলকলের সহিত বিশেষণের লক্ষিলিত ধ্বনি বাতাসকে এক অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করিত—'অস্তি ভৈরব হরষেই বর্ষার আগমন হইত।

বর্ষার এত করিত, লোকা, তৃণভক্ষ সবই যেন নবজাত পক্ষীশাবক-গণকে পুষ্ট করিবার জন্য। তপবনের দান অকুণ্ঠিত—তাহাদের আহার মুখের কাছে যেন পৌঁছাইয়া দিতেন।

প্রতি ঋতুতে কত বিচিত্র কত বিচিত্র পক্ষী গ্রামে আসিত—তাই লিখিয়াছিলাম—

'এত পাখী আসে যায় নহি এত কবি,
যদি পথ ভুলে আসে সে পরভৃৎ পক্ষী।
সে পাখার হাওয়া যে
যদি যায় পাওয়া যে,
লোকা, থাকি শুধু তার আশা পথ লক্ষি'।

নব বঙ্গ ও তাহার সীমান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

অখণ্ড বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন করা সাব্যস্ত হইয়াছে। ইহাই সীমানির্দ্ধারণ কমিটী উভয় প্রদেশের সীমান্ত পাকাপাকি বিভাগে স্থির করিয়া দিবে। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের যে সকল অংশে হিন্দু কিম্বা জাতীয়তাবাদী জনসাধারণের সংখ্যা বেশী সেই সকল ভূখণ্ড লইয়া নূতন বঙ্গ গঠিত হইবে। কিন্তু বাংলা দেশের এমন অনেক অংশ আছে যেখানে হিন্দু মুসলমানের বাস পাশাপাশি, এমন কি একই গ্রামে এপাড়া ওপাড়ায় স্মরণাতীত কাল হইতে সুখে শান্তিতে ঘরবাস করিয়া আসিতেছে। মোল্লা, মোক্তে, কর্তা-কর্তা কিম্বা মহামায়ীতে গ্রামের কৃষক যেউল কিম্বা মসজিদে একইভাবে অভয় প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের সংঘাতে মনান্তর যে না হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু এক গ্রামের লোক পাশের গ্রামে "কিমেন্ট" গণ্য হইবে এমন উদ্ভট কল্পনা কেহ করে নাই; আজ মুসলিম লীগের অপপ্রচারে এবং "যুদ্ধং দেহি" রবে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। একই জাতির মধ্যে সীমাহীন কাটল আজ দেখা দিয়াছে। চলার পথ হইয়াছে বিপরীতমুখী। জাতিগঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যুগযুগ সঞ্চিত বিরোধ ও পার্থক্য একদিন একই ভাবপ্রবাহে সম্মিলিত হইবে। সেই ভাবী শুভদিনের অপেক্ষায় প্রেমের সহিত আজ "ভাই ভাই" "ঠাঁই ঠাঁই" হইতে পারিলেই মঙ্গল।

দুই প্রদেশের সীমারেখা যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক সংস্থান, যথা নদী, পাহাড় পর্বত হওয়াই বিধেয়। সমতল ভূমির উপর আঁকা বাঁকা সীমানা হইলে পরস্পর উভয় রাষ্ট্রেই খবরদারী খুব ব্যয়বহুল ও অসুবিধাজনক হইবে। নদ নদী নালা কিম্বা পর্বত সীমানায় না থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুর আক্রমণে বাধা দেওয়া কিম্বা সামরিক সৈন্য বাহিনী পরিচালনা ও গুপ্ত খবর সংগ্রহ বন্ধ করা কষ্টসাধ্য; শান্তির সময় বাধা নিষেধ কিম্বা শুল্ক ফাঁকি দিয়া অবৈধ আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চালান সুবিধা। অনেকের ধারণা বর্ত্তমানের যান্ত্রিক যুদ্ধে নদী আর বাধা নহে। রুশপ্রবেশ যখনের সময় ক্ষুদ্র প্রোতস্বিনীর পরপার হইতে কিন্তু জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ কিম্বা জলপ্লাবিত হলাণ্ডের রণভূমি অথবা ওডার নদীর পশ্চিম তীরে পলাংবসর জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর শেষ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা স্মরণ করিলে যান্ত্রিক যুদ্ধে নদ-নদীর সুবিধা ও অসুবিধা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ভারত ও নববঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা একই হওয়ায় এই সীমান্ত নির্দ্ধারণের গুরুত্ব অনেক বেশী হইয়াছে। প্রাদেশের ও সীমান্তে সাম্প্রদায়িক শক্তির বসতি স্থাপন করিতে দেওয়া অসঙ্গত। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ থাকিলে "পঞ্চম বাহিনী" উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা; পত যুদ্ধে দেখা গিয়াছে "পঞ্চম বাহিনীর" গোপন যুদ্ধের ফলাফল সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের জয় পরাজয় অপেক্ষা কম উদ্বেগজনক নহে। লোক সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত ভূখণ্ড যাহাতে অপর পক্ষের হস্তগত না হয় তাহা ও দেখা দরকার। বর্ত্তমান ব্রিটীশ বাংলার আয়তন ৭৭০৫২ বর্গ মাইল, অমুসলমান জনসাধারণের সংখ্যা শতকরা ৫০ জন। কিন্তু জমির অমুঢ় মালিকানায় ঘর হিন্দুদের শতকরা ৭০ ভাগ অপেক্ষাও অনেক বেশী।

সৌহার্দ্য ও প্রীতির সহিত পৃথক হইলে ভবিষ্যতে পরস্পরের মানসিক বৈরুখ্য না বাড়িয়া সদ্ভাব ও সহানুভূতি আশ্রয় হইবে এই আমার হিন্দু জনসাধারণের নিকট বার বার সবিনয়ে হাজির করাই ভাল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাংলা দেশের অনেক জায়গায় হিন্দু মুসলমানের বাস এমন ভাবে মিলিত যে সীমারেখা স্থির করা দুঃসাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রেই দুই পক্ষ আপোষক্রমে লোক বিনিময় না করিলে সংঘর্ষপূর্ণ রাষ্ট্র গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। উপরন্তু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এমন উৎকট ব্যাধি হইয়া উঠিয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালির ঘটনা পুনরাবৃত্তি সর্ব্বদাই সম্ভব। মাৎস্যন্যায়ের ভয়ে বহু হিন্দু যে পৈত্রিক আসন, ঘর বাড়ী, পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রে চলিয়া আসিবে ইহা কল্পনাতীত নহে। এই সকল গৃহচ্যুত নরনারীকে পুনরায় যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় এইরূপ দৃঢ় হাতে থাকা প্রয়োজন।

বাংলা দেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে নজর করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে সীমানার চতুঃপার্শ্বে : প্রাকৃতিক বাধ, উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, পশ্চিমে রাঢ়খণ্ডের খণ্ডগিরি এবং পূর্ব্বে গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। এই সকল পাহাড় পর্ব্বতবিনির্গতা ক্ষীরস্রোতা শুভ্রা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, আত্রেয়ী, করতোয়া, অঞ্জন ও গোমতী এবং ইহাদের সহস্র শাখাপ্রশাখায় বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ। বহুশত বৎসরের অকল্পনীয় আবাদে-সমৃদ্ধ নবনবী হাজামজা হইয়া বাংলা ও বাঙ্গালীর দুঃখ ও স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ বর্ত্তমান নব নদীর দুরবস্থা দেখিয়া সঙ্কীর্ণ হওয়া সঙ্গত নহে, বরং যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক বাধকে কেন্দ্র করিয়াই যাহাতে নববঙ্গ গঠিত হয় তদ্দিকে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই কথা বলিবার সময় পূর্ব্ববঙ্গের দাবী ও আবদারের স্মরণে আছে। দুই বঙ্গেরই ভবিষ্যৎ সুখ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে নদী শাসন হওয়া দরকার হইবে। বর্ষার জলরাশি নবনদীর উৎপত্তিস্থলে উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত জলাধারে রক্ষিত হইয়া জলসেচ প্রণালীতে সমস্ত বৎসর বিতরণ সম্ভব হইলেই কৃষি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যবসা বাণিজ্যের পত্তন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপজাত লভ্য হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি আমাদের যুগোপযোগী বর্ত্তমান সভ্যতার মান উন্নয়নে সাহায্য করিবে।

সরকারী শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের কর্তৃত্ব যোটেই না থাকায় গত ১৭৫ একশত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে নবনদীর উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কার হয় নাই, শিক্ষিত দেশবাসী ও চিন্তাহীন ভাবে সহরাভিমুখী হওয়ায় নবনদীর সংস্কার সম্বন্ধে কিছুর কোনও আন্দোলন হয় নাই, ফলে অধিকাংশে নবনদী হাজামজা হইয়া খাল বিলে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা জলাভাবের প্রাবল্যে নদীর খাতই পাল্টাইয়া গিয়াছে, ভূকম্পনে নদীর খাত উচ্চ হইয়া যাওয়ায় স্রোত, উপস্রোত ও জলধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গে ত্রিস্রোতা ছোট ও বড় সকল নদীকে জল সরবরাহ করিত। জলাভাবে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়, ত্রিস্রোতার খাত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হওয়ায় নূতন নদী সৃষ্টি করিয়াছে ; ফলে ত্রিস্রোতা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্ভরশীল নবনদী মজিয়া যাওয়ায় উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের আবহাওয়াই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ধবধবে ভস্ম করেন ভূমির অবস্থা শোচনীয়, ম্যালেরিয়া ও মহামারীর তাণ্ডবে জনসাধারণ সন্ত্রস্ত। মধ্য বঙ্গের অবস্থাও তদ্রূপ। ভাগীরথী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, মধুমতী প্রভৃতি নবনদী শুষ্ক হওয়ায় মধ্য বঙ্গের স্বাস্থ্য অত্যন্ত হীন। এইরূপ অবস্থায় পশ্চিম ও পূর্ব্ব বঙ্গের স্রষ্টাদের নবনদী শাসন হইবে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার বিপুল জলরাশি বিফলে বহিয়া যাইতে না দিয়া পূর্ব্বোক্ত নবনদীর খাতের মধ্যে প্রবহমান হইলে পুনরায় উভয় বঙ্গই সুখ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই উভয় কারণেই যদ্ধ অঙ্গের সমস্ত নবনদীকে প্রাকৃতিক সীমানা ধরিয়া বিভক্ত করিতে হইবে।

সীমানা ধার্য্য করিবার সময় ভৌগলিক কারণ ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাস, গাথা, মৃতত্ত্ব অবগত হওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গের পলিয়া, রাজবংশী কৈবর্ত্ত ; মধ্যবঙ্গের পোদ, বাগ্দী, নমশূদ্র এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, ত্রিপরা প্রভৃতি জাতি অত্যন্ত অনগ্রসর। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে নমশূদ্র জাতি শিক্ষা দীক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর বলিয়া অপেক্ষাকৃত সংহত ও শক্তিশালী ; তদুপরি নোয়াখালীতে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা স্মরণ করিলে অনগ্রসর জাতির পাকিস্থানে অবস্থান ভীতিপ্রদ। হিন্দুসমাজের সত্যিকার আসল "শক্তি" এই কৃষকসম্প্রদায় পাকিস্থানী "নেকড়ে"র খপ্পরে পড়িলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বিপ্লবভীতা ও ঘুষে থাকার নীতির জন্য এবং প্রতিবেশী মুসলমান-সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংঘর্ষ, বিপরীত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মধ্যে কলবাস করিয়া এই সকল নিম্নস্থ কৃষকসম্প্রদায়ের ২।৩টী পরিবার প্রতিদিনই মুসলমান হইতে বাধ্য হইতেছে। সামান্য কারণেই একঘরে ও "হুঁকা তামাক" বন্ধ, কিম্বা সামাজিক বড় এঁদের মধ্যে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হঠাৎ পক্ষাঘাতিতা, বিপত্নীকারিণী নারী কিম্বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার "সাতঘাট" ঘুরিয়া "বৈকব" হওয়ার চেয়ে মুসলমান হইয়া গৃহ পরিবার এবং আশ্রয় পাওয়া অনেক সুবিধাজনক। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর হীন দৃষ্টির জন্য এই সকল সম্প্রদায়ের বহুল ক্ষতি হইয়াছে। এখন দৃষ্টিচক্রের আবর্ত্তন হইলে ও রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন পাকিস্থানী হিন্দুসমাজ আক্রমণশীল মৌলভীদের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কিনা বিবেচ্য বিষয়, কাজেই বঙ্গ অঙ্গের সহিত অন্যান্য লোকবিনিময় করিতেই হইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের সাম্প্রতিক নাটকীয় দুর্ঘটনাসমূহ অদূর ভবিষ্যে লোক চিনিয়া সমর্থন করে, অতএব হিন্দুকেই চলিয়া আসিতে হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা কিন্তু বিপরীত। এখানকার চাকমা, ত্রিপরা প্রভৃতি জাতীয় লোকদের অধিকাংশ নরনারীরা স্বাধীন ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চলে বসবাস করে। ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারের সৈকটা বন্ধনে আবদ্ধ, কাজেই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আসাম ও স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ অন্য কারণেও উজ্জ্বল, এই অঞ্চলের দুই স্থানেই পেট্রোলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বাস হয় এখানেও পেট্রোল আছে, তুলা ও কাঠের জন্য পাকিস্থান এই অঞ্চল

পাইতে বাধ্য হইবে। আসাম সরকার যাহাতে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের এই অঞ্চলের ভার লওয়া দরকার। পরে প্রতি বিধানের সীমানা, আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হইল।

ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীনতম উপনিবেশ হইল পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তি। আর্য্যগণের আগমনের পরে ঐতিহাসিক যুগে এতদঞ্চলের রাষ্ট্রের নাম হইয়াছিল বরেন্দ্রভূমি। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কিম্বা বরেন্দ্রভূমি পালরাজাগণের নানা কীর্ত্তি, রামপালের রামাবতী, লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতী, অশেষ স্মৃতিবিজড়িত গৌড় নগরী, বিদ্রোহী ভীম ও দিব্যকের জন্মভূমি, রাজা গণেশের জন্মস্থান, রাজা কংসনারায়ণের তাহিরপুর, রাণীভবানীর নাটোর, ধার্ম্মিক ও বৈরাচার্য্য রূপ সনাতনের জন্মস্থান রামকেলী, দামরোরুদের খেতুর, বহু যুদ্ধের রাজকেন্দ্র ও স্মৃতি-বিজড়িত বরেন্দ্রী, আত্রেয়ী ও করতোয়া প্রভৃতি মধুময়ী বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নবরঙ্গের জন্মযাত্রার সহিত বাঙ্গালী এই পুরাকীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইতে অক্ষম। এই সকল পবিত্র স্থান ও পুণ্যতোয়া নদীর কিয়দংশ যাহাতে নূতন রঙ্গের অধিকারভুক্ত হয় তাহার জন্য প্রবল আন্দোলন এখন হইতে সুরু হওয়া দরকার। উত্তর-বঙ্গের নদনদীর বেশীর ভাগ হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। কেবলমাত্র মহানন্দা গোদাগাড়ীর নিকটে পদ্মার পড়িয়াছে, নিম্ন বরেন্দ্রভূমিতে অনেকটী নদী আড়াআড়ি পদ্মা হইতে উত্থিত হইয়া পদ্মা কিম্বা যমুনায় পতিত হইয়াছে। কাজেই কোন একটী নদী অবলম্বন করিয়া সীমারেখা করার অসুবিধা আছে, উত্তর বঙ্গের যে অঞ্চলে (বরেন্দ্রীর মাঠে) একই নদীতে সীমানা টানা যায় না—সেখানকার উচ্চতা সমুদ্র গর্ভ হইতে প্রায় সর্ব্বত্রই কম বেশী সমান, কাজেই নদী দ্বারা সোজা রেখা বর্ত্তমানে পাওয়া অসুবিধা হইলেও পুরাতন খাত উদ্ধার করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করা সহজেই সম্ভব। ইহাতে একাধারে সীমানা ও জলসেচ প্রণালী দুইই সম্ভব হইবে। আত্রেয়ীর পূর্ব্বতটে বালুরঘাট নগর ও মহকুমা হিন্দু-প্রধান, কাজেই আত্রেয়ী * নদীকে সীমানা করা হইলে একটী হিন্দুপ্রধান অংশ হারাইতে হয়। সেই জন্য যদি আত্রেয়ীর সমান্তরাল পাখা নদীকে (ইহার নামও যমুনা) পূর্ব্ব সীমানা ধরা যায়, ইহাতে দিনাজপুর জেলার মুসলমান প্রধান অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই যমুনা রাজসাহী জেলার সগুগ্রাম নীচে আত্রাই ষ্টেসনের নিকটে আত্রাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। পরে আত্রাই নদীর উজান ধরিয়া মান্দা থানার নিকটে শিব নদীতে পড়িয়া নওগাঁর নিকটে যমুনাই নদীতে আসা যায়। এই নওগাঁ রাজসাহী সদরের উপকণ্ঠ। তখনকার পদ্মার উজান বহিয়া মালদহের নীচে পদ্মার আসিলে জাতীয়তাবাদী উত্তর পশ্চিম বঙ্গের সীমানা পাওয়া যায়।† এই সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত কতিপয় পুণ্যশ্লোক মনস্বী ও কয়েকটী প্রাচীন কৃষ্টির জন্মোন্মুখ তীর্থক্ষেত্র, ভাবী ভাবধারার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা। এই অঞ্চলের মধ্যে কয়েক জায়গায় মুসলমান অধ্যুষিত স্থান আছে। নিরপেক্ষতা ও নৈকট্যজনিত স্থানগুলি দরকার। এই সকল অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী যদি জাতীয় বঙ্গে থাকিতে অসম্মত হয় তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া পাকিস্থান অঞ্চলের হিন্দুদের সহিত লোক বিনিময় করা সঙ্গত। লোক বিনিময় কষ্টসাধ্য হইলেও রাষ্ট্রের সংহতি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা বিদূরিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইবেই হইবে। ১৯৪১ সালের লোক গণনা রাজনৈতিক চাতুর্য্যপূর্ণ বলিয়া সন্দেহ হয়। রাজসাহী জেলার লোকসংখ্যা ১৯৩১ সালের লোক গণনায় ৪.৬% ভাগ হ্রাস পায়, কিন্তু ১৯৪১ সালের লোক গণনায় উক্ত হ্রাস বন্ধ হইয়া ১৩·৩% বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ সাল অপেক্ষা মুসলমান বাড়্‌তির হার অনুপাতে বেশী বলিয়া, অন্য রাজসাহীর স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বলিয়া এই বাড়্‌তি রাজনৈতিক চালবাজী মনে হয়।

দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী—প্রধানতঃ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের এখানে বাস। সামাজিক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সমসমাজ প্রতিষ্ঠা ও নির্ব্বিচারে লোকশিক্ষার প্রচার হইলে এতদঞ্চল শক্তিশালী জনপদে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। হিমস্রোতা শাসিত হইলে সস্তাবিদ্যুতশক্তিতে সমস্ত অঞ্চলে ব্যবসার পত্তনে অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

রংপুর—রংপুর মুসলমানপ্রধান জেলা। হিন্দুর মধ্যেও অনগ্রসর রাজবংশী ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিই বেশী। কোচবিহারের সংলগ্ন তিনবাগ হাতীবাঁধা হিন্দুপ্রধান, ইহার সহিত প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত ডোমার ও কালীগঞ্জ থানা নবরঙ্গে আসিতে পারে। শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর অমুসলমান রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণী রক্ষার জন্য এই অংশকে হিন্দুবঙ্গে আনা দরকার। এই এলাকায় নিরপেক্ষ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বহু রাজবংশীর বাস, তাহাদের ভবিষ্যৎ আশা ও আশ্রয় হইবে এতদঞ্চল।

দিনাজপুর—মুসলমানপ্রধান ঠাকুরগাঁও, নবাবগঞ্জ, পার্ব্বতীপুর, ফুলবাড়ী ও চিরিরবন্দরের পূর্ব্বাংশ এবং খানসামা থানার পূর্ব্বাংশ যমুনা নদীর পূর্ব্বধারে থাকায় যমুনা নদী সীমান্ত হইলে অবশিষ্ট দিনাজপুর জেলায় অমুসলমান লক্ষ্মণার সংখ্যা পরিচ্ছন্ন লাভ করে। থানা হিসাবে দেখিলে এই জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে কয়েকটী থানায় মুসলমান অধিকা আছে। কিন্তু এই থানাগুলি হিন্দু অঞ্চল পরিবেষ্টিত এবং অন্যান্য হিন্দুজনপদের সান্নিধ্যজনিত নবরঙ্গে থাকা দরকার। নূতন দিনাজপুর জেলার অমুসলমানের সংখ্যা ৫৩%জন হইবে।

মালদহ ও রাজসাহী—সামান্য মুসলমানপ্রধান মালদহ জেলা মুসলমান প্রধান। মুসলিম প্রধান কয়েকটী থানা হিন্দুপ্রধান মালদহ ও বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত; বাকী কয়েকটী থানা মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মধ্যস্থলে সংযোগ সেতুরূপে থাকায় হিন্দুবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বাতিল করা সম্ভব নহে। নবরঙ্গের উত্তর দক্ষিণের যোগাযোগ এবং একমাত্র রেল লাইন সাহেবগোলা ও গোদাগাড়ী ঘাট এই সীমান্তে স্থিত বলিয়া গোটা মালদহ জেলাকেই নবরঙ্গে আনয়ন দরকার। মুসলিম অঞ্চলাধারণের জাতীয়

* আত্রেয়ীর বর্ত্তমান নাম আত্রাই।

† সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরবঙ্গের সীমানা অনুরূপ হওয়া উচিৎ বলিয়া স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

নবদ্বীপে অবস্থান আপত্তিজনক হইলে ২।৩ লক্ষ জনবিনিময় করিলেই এতদঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হয়। যাঁহারা মালদহের মহানন্দা নদীকে পূর্ব্বসীমান্ত করিতে চাহেন তাঁহারা দিনাজপুরের বালুরঘাট অঞ্চলের সহিত মালদহের সীমান্ত রক্ষা করিবেন কিরূপে? কাজেই পূর্ব্বোল্লিখিত যমুনা, আত্রেয়ী, শিবনদী, বারানই, বড়ল এবং পদ্মা উত্তর বঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা হওয়া সঙ্গত। এই সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্তির কয়েকটী ঐতিহাসিক জনপদের কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া স্বাধীন জনপদাধারণের তীর্থস্থানরূপে ভাবী কর্ম্মীদের প্রেরণা দিবে সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার নদ-নদীর কথা, ধারাতত্ত্ব ও অবক্ষয়ের ইতিহাস পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তর বঙ্গের ভিত্রোতার ন্যায় মধ্যবঙ্গের নদনদী পদ্মার জলেই পুষ্ট থাকিত, ব্রহ্মপুত্রের গতি পশ্চিমাভিমুখী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা বিগতযৌবনা, শাখা প্রশাখাও কাজেই মৃতা। অপর কারণ পদ্মার পাড় উঁচু হইয়া যাওয়ায় নদীর খাত বৃদ্ধিতায় ভরিয়া গিয়া জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দুই এক বছরে ঘটে নাই, শত শত বৎসরের মধ্যে কোন সংস্কার না হওয়ায় পলি জমিয়া কিম্বা চর পড়িয়া নদীর গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সহজেই পলিপূর্ণ হইয়া বন্ধিয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নদনদী সবই মৃতকল্প। গোবরা বলিয়া একটা পুরাতন নদী রাণাঘাট লালগোলা রেল লাইনের পূর্ব্বদিকে অনেকটা সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পুটী নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া নওয়াদা থানার সন্নীপবর্ত্তী পাটকাবাড়ীর নিকটে জলঙ্গী নদীতে পড়িয়াছে। এই গোবরা নদীর উত্তর পারে মুসলমান অধিকা অত্যন্ত বেশী। গোবরাকে সীমান্ত ধরিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার হিসাব নিম্ন তালিকায় বর্ণিত হইল। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে সাগরিদা, বৈকণ্ঠী ও নিরবচ্ছিন্নতার জন্য জঙ্গীপুর মহকুমার কয়েকটী থানা ধরা হইয়াছে।

	আয়তন	মুসলমান	অমুসলমান
কান্দী মহকুমা	৪৪৪ বর্গ মাইল	১৪৭৯০৯	২০৭৩৭০
জঙ্গীপুর মহকুমা	৪০৬ ,,	২০৮৩৮৮	১৭৩২৩৩
জিয়াগঞ্জ থানা	২০ ,,	২৩৮৫	২০৫৩২
সবগ্রাম থানা	১১৮ ,,	২২৪২৯	৩৪১৯২
বহরমপুর টাউন ও থানা	১২৩ ,,	৪২৭৭৭	৬৭১৯৭
ফেলডাঙ্গা	১৪৩ ,,	৭৭৩০০	৩৭৩০৪
নওয়াদা (দুটী নদীর নিম্নাংশ)	৪৩ ,,	১৬১৪৭	১১৪৭৮
লালবাগ থানা (গোবরার নিম্নাংশ)*	১৮ ,,	১০০০০	১০০০০
জলঙ্গী গোলা (গোবরার নিম্নাংশ)*	৩৯ ,,	২১৪৩২	৪৯৪৩
লালগোলা (গোবরার নিম্নাংশ)*	৪২ ,,	২৩৯০৮	৮৭২৩
	১৪৩৭	৩০৪৭৭৪	৩০,৪০২ ৯

নদীয়া—গোবরা নদী মুর্শিদাবাদ জেলায় জলঙ্গীতে পড়িয়াছে, ভৈরব নদ মুর্শিদাবাদের সবকয় থানার নিকটে জলঙ্গী নদীকে আড়াআড়ি ভেদ করিয়া নদীয়া জেলাকে প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। এই জেলায় ভৈরবের নিম্নাংশ হিন্দুপ্রধান এবং উত্তরাংশ মুসলমানপ্রধান। নিম্নে আয়তন ও লোকসংখ্যা দেখান হইল।

	আয়তন	মুসলমান	অমুসলমান
রাণাঘাট মহকুমা	৫৪১	১১২৯৫৩	১৪৩১৮৪
সদর মহকুমা	৪৬১	১৪৩২০৪	১৮৭৭৭৯
তেহাট্টা থানা	১৭৪	৪২৬৩৭	৩৯৯০২
সহর মেহেরপুর থানা (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৭০	২২০০০	২৪০০০
কুমিলপুর (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৮২	৩২০০০	১১০০০
কৃষ্ণগঞ্জ থানা	৪৮	১৪০৭৪	১৯৩২৪
চাঙ্গুড় ঘুষা (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৪৯	১৭০০০	১৭৪০০
	১৪৪৬	৪১৮৮৭২	৪৪৫৩৯—

যশোহর—মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ভৈরব নদকে সম্বালপি ভেদ করিয়া মাজদিয়া ষ্টেশনের নিকটে যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, যশোহর জেলায় একই নদী কপোতাক্ষ নামে পরিচিত, মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে কপোতাক্ষও বঙ্গদেশ-ধন্য। যশোহর মুসলমানপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের সহিত অন্তর-নগর, শালিখা, কালিয়া, নড়াইল এবং নবগঙ্গা নদী বিচ্ছিন্ন লোহাগড় থানার লোকসংখ্যা একত্র করিলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, ১৯৩১ সালে যশোহর জেলা ঋদ্ধিষ্ণু ছিল, লোকসংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল, যশোহরের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া ও মহামারীর তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস না পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ৯.৪ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই লোকগণনায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, এই অঞ্চল পার্শ্ববর্তী হিন্দুপ্রধান ২৪ পরগণার ও খুলনার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এবং জাতীয় অঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় রাজনৈতিক কারণেও জাতীয় অঙ্গে থাকা দরকার; মুসলমানদের আপত্তি থাকিলে লোক বিনিময় প্রথায় উত্তর যশোহরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের এতদঞ্চলে আনয়ন করিলে সংহতি বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

	আয়তন	মুসলমান	অমুসলমান
সবগ্রাম মহকুমা	৩৭৯	১৩৪৫১৪	১০৩৫৬৮
ঝিকরগাছা থানা (কপোতাক্ষ নদীর দক্ষিণাংশে)	৭৯	৩০৫৩২	১৩০১৪
কেশবপুর থানা	১০০	৪৯৩২২	২৭৭৪৪
অন্তর নগর ,,	৯৪	৩০৪০৪	৩৯৭৪৩
নড়াইল ,,	১৪৮	৪৮০১৩	৩২৫৯০
কালিয়া ,,	১১৮	৩১৫৩৪	৩১৩৩৪
শালিখা ,,	৮৮	২৩৮৪৩	২২৪১০
লোহাগড় থানা (নবগঙ্গার দক্ষিণাংশে)	সংখ্যা জানা নাই		
	১২৭৭	৩০১৩৪৪	৩৩০৭২৩

* থানার উপর হিন্দুই সংখ্যাগুরু, কাজেই থানার বহির্ভাগে বিচ্ছিন্ন অংশে উপরের সংখ্যা হইতে মুসলমান বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।

বরিশাল ও বাখরগঞ্জ—বরিশাল জেলার গোপালগঞ্জ, রাজৈর, কলকিনী ও মাদারীপুর থানার পশ্চিমাংশ (আড়িয়ল খাঁর পশ্চিমে) হিন্দুপ্রধান অঞ্চল। ইহার সহিত বাখরগঞ্জের গৌরনদী থানা, উজীরপুরথানা, বানরিপাড়া থানার অংশ বিশেষ, বরিশাল কোতোয়ালীর অংশবিশেষ, বলচিটি সহর সহ বলচিটি থানার অংশ বিশেষ, স্বরূপকাটি থানা, বানরিপাড়া থানা এবং নাজিরপুর থানা এই সকল জায়গার স্বাভাবিক পূর্ব্ব সীমানা আড়িয়াল খাঁ, পাওর, বিশখালী, কাচা, ঘলেশ্বর নদী, সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের আয়তন ও সীমানা দেওয়া হইল। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য দুই জেলার বিভিন্ন ভূখণ্ডের সহিত ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের অংশগুলি যোগ দিয়া দুইটী বিভিন্ন জেলা হইতে পারে। এই অঞ্চলের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫৭।

গোপালগঞ্জ	৬৭২ বর্গ মাইল	২৬৮২৩৩	৩৯৮৭৯
রাজৈর থানা	৮৭ "	৫৭৭৩৮	৬৫৫৯
মাদারীপুর ও কলকিনী (আড়িয়ল খাঁর নিম্নাংশ)	সংখ্যা ঠিক হিসাব আসা নেই		
হিন্দু প্রধান বাখরগঞ্জ	৭০০	৫৬৫৫৭৯	৫৭৭৫৩
	১৪৪৯	৮৮৬৫৫০	৯৮৬৮০১

সহ দেশের লোকসংখ্যা, আয়তন, জাতীয় বঙ্গ ও পাকিস্থানের হিসাব ও আলাদা তপশীলে দেখান হইল, জাতীয় বঙ্গের আয়তন দাঁড়াইতেছে ৪৪৭৪৩ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের হিসাব বাদ দিলে দাঁড়ায় ৩৯৭৩৯ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গের মাত্র ৪৪.৮৫ ভাগ ভূখণ্ড জাতীয় বঙ্গে পড়ে। ইহার ভিতর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩০০০০ বর্গ মাইলেরও কম। বর্ত্তমান হিন্দুর অধিকৃত সম্পত্তির অপেক্ষা এই পরিমাণ অনেক কম। জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, খুলনা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের লঘু বসতি ও পাহাড় পর্ব্বত আয়গাগুলি অনুর্ব্বর স্থান বিবেচনায় হিন্দুসঙ্ঘের এই পরিকল্পনা আপোষ ও শান্তির পরিচায়ক। তাই তাই বিভিন্ন হওয়ার সময় এক পক্ষের বাধা সহজ না হইলে আপোষমূলক মনোভাবের প্রকাশ হৃদয় স্পর্শ করে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গে হিন্দুর বাস হইবে ৬৮·৫% এবং মুসলমান থাকিবে ৩১·৭%। পাকিস্থানে মুসলমানের বাস হইবে ৭৩% এবং অমুসলমান থাকিবে শতকরা ২৭। বিস্তৃত তপশীলে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।*

* প্রবন্ধ প্রেসে যাওয়ার পরে কলিকাতা পৌরসভার মেয়র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় বঙ্গের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা অনেকটা অনুরূপ।

		মুসলমান	অমুসলমান	আয়তন		
অখণ্ড বাংলা		৩৩০০৪৫৩৪	২৭৩০১০৪১	৭৭৪৪২		
আবুল হুসেনের যোজনা	প্রেসিডেন্সী বিভাগ	২১০৭৩৪২	৩৩৭২১৪২	৮৪০১		
অনুযায়ী নববঙ্গ	বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪২৯৪০০	৮৮৫৭৮৯	১৪১৩৪		
	রাজসাহী বিভাগ	২৩০৪৮৫	১৪৩৮৭৪৭	৪২৪২		
	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭২৭০	২৩৯১৩১	৫০০৭		
		৩৮০৪৭০৭	১৩৯২৮৬৩৯	৩১৮৮৪		
বাউণ্ডারী কমিশনের নিকট উত্থাপিত পরিকল্পনা	নদীয়া জেলা হইতে	৪১৮৮৭২	৪৪৩৯০	১৪৪৬		
	মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে	৬৪৩৭৪	৬০৫০২৯	১৪৩৭		
	যশোহর হইতে	৩০৭৩৯৪	৩৩০৭২৩	১২৭৭		
	রাজসাহী হইতে	৩০৪২৮৩	১৭৭৩৫৪	১১৪৪		
	দিনাজপুর হইতে	৮০৪৪৪৮	৮৮৩৪৪৩	৩৪৪২		
	রংপুর হইতে	১৮২৭৪১	১৮০৫৩৩	৫০২		
	বরিশাল হইতে	৪৩০৫৭৯	৫৭৭৫৩৩	৭০৩		
	ফরিদপুর হইতে	৩২৪৯৭১	৪০৪২৩৮	৭৫৪		
	মালদহ হইতে	৪৪৯৪৫৪	৪৩২৩৭৩	২০০৪		
		৪২১১৫১১	৫১৪৪৪৮১	১২৮৩১		
প্রস্তাবিত নববঙ্গ		৮০১৮২৯৮	১৮০৭১২৭০	৪৪৭৪৬	৩১·৭%	৬৮·৩%
প্রস্তাবিত পাকিস্থান		২৪৮৮৯২১৩	৮২২৬২৭১	৩১৮৭৩	৭৩·৯%	২৭·১%

বাঙ্গালা বিভাগের সিদ্ধান্ত—

গত ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ বাঙ্গালা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের সদস্যগণ মিলিত হইয়া বাঙ্গালা বিভাগের

ছবির শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফটো—শ্রীতারক দাস

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ জন ও বিপক্ষে ২১ জন সদস্য ভোট দেন। পক্ষে ৫৮ জনের মধ্যে ৪৯ জন কংগ্রেস দলের, ৪ জন এংলো ইণ্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, ২ জন কম্যুনিষ্ট ও ১ জন পৃথক দলভুক্ত ছিলেন। বিপক্ষের ২১ জন সদস্যই মুসলেম লীগ দলভুক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের সদস্যগণ মিলিত হইয়া বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য গ্রহণ করেন—পক্ষে ১০৬ জন ও বিপক্ষে ৩৫ জন সদস্য ভোট দেন—পক্ষের ১০৬ জনের মধ্যে ১০০ মুসলেম লীগ, ৫ জন তপশীলী ও ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান। বিপক্ষের ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জন কংগ্রেস দলের ও ১ জন কম্যুনিষ্ট। পক্ষের ৫ জন তপশীলী সদস্য ছিলেন—(১) দ্বারিকানাথ বারোরী মন্ত্রী (২) নগেন্দ্রনাথ রায় মন্ত্রী (৩) ভোলানাথ বিশ্বাস পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (৪) চারুচন্দ্র বর্ম্মণ পার্লামেণ্টারী (৫) গয়ানাথ বিশ্বাস মৈমনসিংহ। উভয় দল মিলিত হইয়া সভা করিলে বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ৯০ জনও বিপক্ষে ১২৬ জন সদস্য ভোট দেন—৩ জন কম্যুনিষ্ট নিরপেক্ষ ছিলেন।

হরিদ্বারে জহরলাল ও গান্ধী—

গত ২১শে জুন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভোরে মোটরযোগে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া হরিদ্বার গিয়াছিলেন ও রাত্রি ৯টায় উভয়ে মোটরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গা ভয়ে ভীত ৩৫ হাজার লোক হরিদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজি সকলকে পশুবলের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

নূতন ভারত শাসন আইন—

বিলাতের মন্ত্রিসভা যে নূতন ভারত শাসন আইন রচনা করেন, সে বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত জানিবার জন্য উক্ত বিল ১লা জুলাই বড়লাটের নিকট প্রেরিত

হইয়াছিল। বড়লাট তাহা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দেখিতে দেন। ওরা জুলাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দার পেটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, সার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ কে-এম-মুন্সী ও সার বি-এন-রাও বড়লাটের সহিত মিলিত হইয়া আইনের সংশোধন সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁও স্বতন্ত্রভাবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিমত জানাইয়াছেন। ৪ঠা জুলাই ঐ আইনের খসড়া বিলাতের কমন্স মহাসভায় উপস্থিত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রিসভা—

গভর্ণর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে ১১জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা সংযুক্ত বাঙ্গালার পুরাতন মন্ত্রিসভার সহিত একযোগে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কাজ করিবেন। ১১জনের মধ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বর্ত্তমানে আমেরিকায় আছেন, তিনি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ডাঃ ঘোষ প্রথমে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্যতম মন্ত্রী স্থির করিয়াছিলেন—শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রী হইতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার স্থানে কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ নিযুক্ত হইয়াছেন। নিম্নে ১১জনের নাম ও কে কোন বিভাগে কাজ করিবেন, তাহা দেওয়া হইল—(১) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র ও আবগারী (২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা) অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (৩) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—শিক্ষা, সেচ ও জল সরবরাহ (৪) ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম (৫) শ্রীরাধানাথ দাস—বেসামরিক সরবরাহ (৬) শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—বিচার ও ব্যবস্থা (৭) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—কৃষি, বন ও মৎস্যের চাষ (৮) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব ও জেল (৯) শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়—সমবায়, সাহায্যকার্য্য ও পূর্ত্ত।

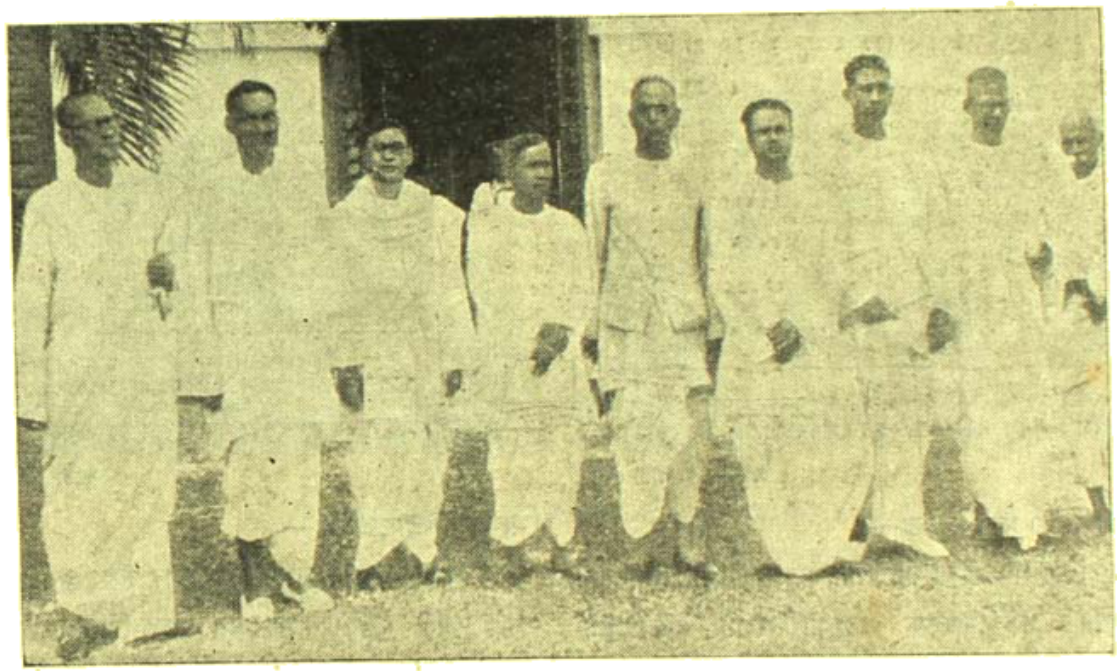

পশ্চিম-বঙ্গের নূতন মন্ত্রীগণ—কার্য্যভার গ্রহণের পর (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্ম্মণ এবং শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা　　ফটো—ষ্টুডিও দাস

সম্মেলন নিষ্ক্রিয়—

বাঙ্গালা বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের অধিবাসীরা গত ২২শে জুন রাণাঘাটে সকলে সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নসিরুদ্দীন ও রাণাঘাটের মহকুমা হাকিম মিঃ ইয়াকুব আলি খাঁ সম্মিলনের

পূর্ব্ব দিন এক আদেশ জারি করিয়া সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য—হিন্দুগণই সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়—

পূর্ব্ব কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রায় বিনা বাধায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কালীপদবাবু দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন।

বেহারীর অন্যতম শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিন্হা বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে ভোটদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

এম-এল-এ দণ্ডিত—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খাঁ বাহাদুর ফরিদ আহমদ চৌধুরী ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করার অভিযোগে আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। টাকা না দিলে আরও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার ম্যানেজার আবদুল গণিও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভারত বিভাগের কার্য্যারম্ভ—

গত ১২ই জুন হইতে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কমিটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ও সর্দ্দার আবদার রব নিস্তার উক্ত কমিটীর সদস্য হইয়াছেন।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের নেতা—

নব গঠিত হিন্দুপ্রধান পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশে ডাঃ গোপী-চাঁদ ভার্গব অমুসলমান দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি—

বিলাতের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্ ভারতের সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা উভয় স্থানেই সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীতে নেতৃত্ব করিবেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিদের সভায় বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে ভোটের ফলাফল ঘোষণা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

মিশন প্রচেষ্টা—

ভারতে নূতন রাজনীতিক অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একত্র মিলিত হইবে—উভয় প্রতিষ্ঠানই শ্রমিকদের কল্যাণ চেষ্টায় নিযুক্ত। সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারাও নিজেদের দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কংগ্রেসে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিবেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও শ্রীযুত জয়প্রকাশনারায়ণ উক্ত দলের প্রধান কর্ম্মী।

পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব-পরিষদ—

পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নলিখিত ১৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) মিঃ এম-এ-জিন্না, (২) মিঃ আবদুর রব নিস্তার (৩) রাজা গজনফর আলি (৪) নামদোতের খাঁ ইফতিকার খাঁন (৫) মালিক

ফিরোজ খা নুন (৬) মিয়া মমতাজ দৌলতানা (৭) মিয়া ইফতিকার উদ্দীন (৮) বেগম সাহ নওয়াজ (৯) সর্দ্দার শৌকত হায়াৎ খান (১০) চৌধুরী নাজির মহম্মদ খান (১১) শেখ কেরাম আলি (১২) ডাঃ ওমর হায়াৎ খাঁ—১২জনই মুসলমান। শিখদল হইতে নিম্নলিখিত ২জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার উজ্জল সিং (২) জ্ঞানী কর্ত্তার সিং।

পাকিস্থান সংখ্যালঘুদের সমস্যা—

সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানির উদ্যোগে শীঘ্রই দিল্লীতে পাকিস্থান অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক সভায় তাঁহাদের দাবী-সমূহ স্থির করা হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ এবং পাকিস্থান হইতে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ সম্মেলনে

বঙ্গ বিভাগ বিষয়ে ব্যবস্থা-পরিষদ ভবনের প্রবেশ পথে উৎসুক জনতা ফটো—প্রিয়ারঞ্জন সেন

যোগদান করিয়া নূতন ভিত্তিতে কংগ্রেসের কার্য্য করিবার জন্য নূতন নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সকল উপায়ের কথাই সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

পূর্ব্ব পাঞ্জাব গণ-পরিষদ—

পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত ১২জন সদস্য গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার বলদেব সিং (২) সর্দ্দার গুরুমুখ সিং মুসাফির (কংগ্রেস) (৩) বকসী সার টেকচাঁদ (কংগ্রেস) (৪) দেওয়ান চমনলাল (কংগ্রেস) (৫) চৌধুরী রণবীর সিং (কংগ্রেস) (৬) পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব (কংগ্রেস) (৭) অধ্যাপক যশোবন্ত রাও (কংগ্রেস) (৮) মিঃ বিক্রমলাল সোহনী (কংগ্রেস) (৯) মহবুব এলাহি (লীগ) (১০) মহম্মদ আলম (লীগ) (১১) মুফ্তী আবদুস হামি খাঁ (লীগ) (১২) মৌলনা হাউদ গজনবী (লীগ)।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ—

দিল্লীতে বড়লাটের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কাউন্সিলের সভায় সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের কথা আলোচিত হইতেছে। সভায় কংগ্রেস পক্ষে সর্দ্দার পেটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মুসলিম লীগ পক্ষে মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি ছাড়াও দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং, প্রধান সেনাপতি লর্ড অচিনলেক ও উড়িষ্যার গভর্ণর সার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী উপস্থিত থাকিতেছেন। সার

চন্দ্রলাল গত যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ভারতীয় সৈন্যদলের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। ১৫ই আগষ্ট হইতে যাহাতে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান পৃথক সৈন্যদল রাখিতে পারে, কমিটী তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

চন্দ্র মজুমদার (৮) শ্রীমতী রেণুকা রায় (৯) উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১০) দেবীপ্রসাদ খৈতান (১১) ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২) সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (১৩) মুহুম্মবিহারী মল্লিক (১৪) ঈশ্বরসিং গুরুং (১৫) মিঃ আর-ই-গ্লাটেন। লীগ হইতে নিম্নলিখিত ৪জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

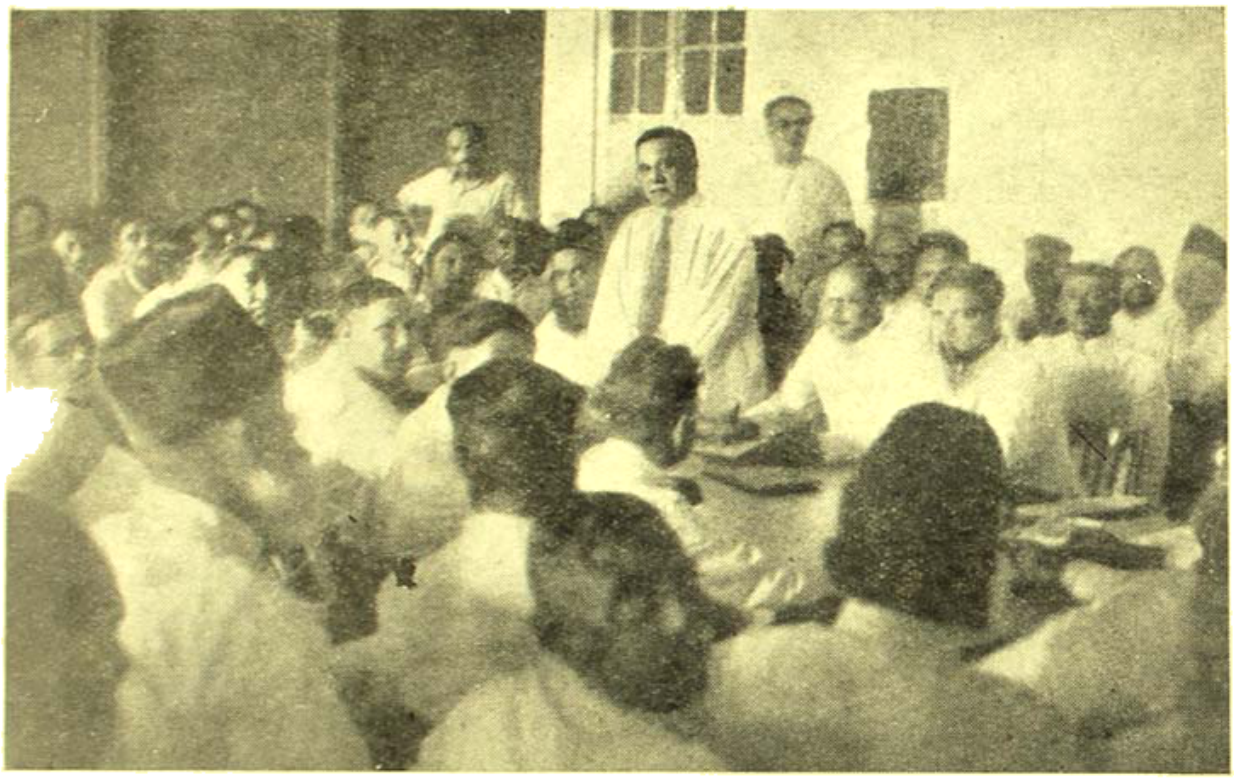

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রাক্কালে লীগ সদস্যদের মধ্যে মিঃ সুরাবর্দ্দী ফটো—ইণ্ডিয়া সেন

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বসু—

ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্র সংঘের বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা, লণ্ডন ও ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর যুদ্ধের সময় ইরাণ, ইরাক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও ইটালীতে কাজ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বাঙ্গালা ও গণ-পরিষদ—

গত ৪ঠা জুলাই পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—কাংগ্রেস হইতে ১৫জন—(১) প্রফুল্লচন্দ্র সেন (২) অরুণচন্দ্র গুহ (৩) নিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (৪) পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (৫) সতীশচন্দ্র সামন্ত (৬) বসন্তকুমার দাস (৭) সুরেশ-

(১) রাফিব আলান (২) জসিমুদ্দীন আহমদ (৩) নাজিমুদ্দীন আমেদ (৪) আবদুল হামিদ।

পশ্চিম পাঞ্জাবে নেতৃত্ব—

মুসলমান প্রধান নবগঠিত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে ৫৭জন মুসলিম লীগ সদস্যের মধ্যে ৫৩জনের সম্মতিক্রমে মালিক ফিরোজ খাঁ নুনকে লীগদলের নেতা নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। পাঞ্জাব মুসলেম লীগের সভাপতি মামদোতের খাঁ ঐ নির্ব্বাচনে বিরোধিতা করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

১৫ই জুন নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় বড়লাটের ৩রা জুনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মোট ২১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ৩২ জন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। গ্রহণের পক্ষে ১৫৭ ও বিপক্ষে ২৯ জন

সদস্য ভোট দিয়াছেন। ১৪ই জুন গান্ধীজি স্বয়ং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সাধারণ-তন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা—

১৪ই জুলাই হইতে দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে পক্ষকালব্যাপী অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে ভারতের নূতন সাধারণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হইবে। সেজন্য গণ-পরিষদের বিভিন্ন সাব কমিটীগুলির কাজ শীঘ্র শেষ করা হইতেছে। বৃটেন ১৫ই আগষ্ট উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করার পূর্ব্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের শাসন ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবেন।

দেশবন্ধু দাশ ও আচার্য্য রায়—

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উভয় মনীষীর মৃত্যুতিথি সাড়ম্বরে পালিত

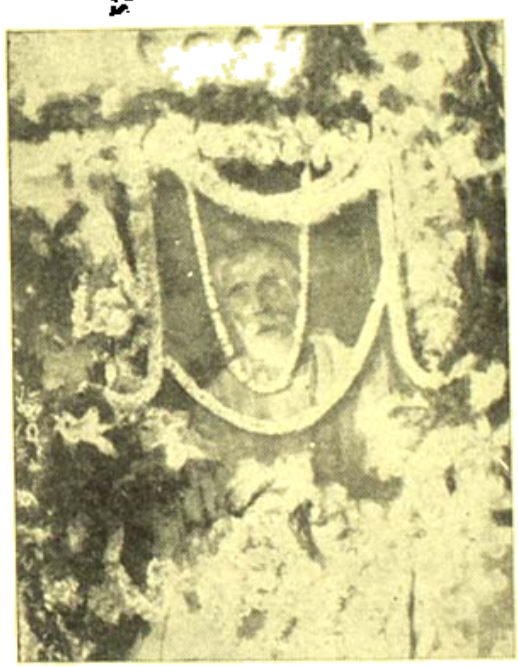

নিমতলা শ্মশান ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতিদের শ্রদ্ধা নিবেদন ফটো—জে-কে-সান্যাল

হইয়াছিল। সকালে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু দাশের ও নিমতলা শ্মশানঘাটে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রায়ের স্মৃতিসভা হয়। বিকালে স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট হলে এক সভায় আচার্য্য রায়ের এবং মহাবোধী

নিমতলা শ্মশান ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব ফটো—জে-কে-সান্যাল

সোসাইটি হলে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে একটি সভায় দেশবন্ধু দাশের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে রুসিয়ার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্রাট এই নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ আসফ আলি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ভারতবাসীর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা বিভাগ আরম্ভ—

২৬শে জুন হইতে বাঙ্গালাকে দুই ভাগে ভাগ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং লীগের পক্ষ হইতে মিঃ এচ-এস সুরাবর্দ্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্ণরকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের ৫ জনকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন 'আই-সি-এস'কেও পরামর্শদাতা হিসাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে—মিঃ এস-এন রায় সি-আই-ই ও মিঃ এন-এম খাঁ।

পণ্য-পরিচয়ক ও দেশীয় রাজ্য—

দিল্লীতে ২৬শে জুন এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে মোট ৯ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। তন্মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বর্ত্তমান গণ-পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের নূতন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

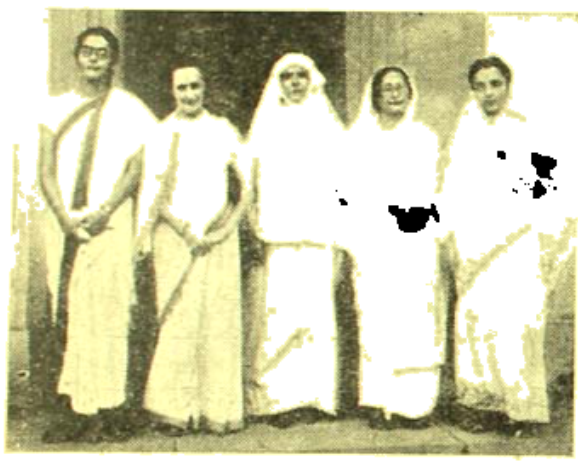

আইন সভার মহিলা সদস্যগণ—(বাম হইতে) শ্রীযুতা বীণা রায়, মিসেস্ মেনী সেনগুপ্তা, মিসেস্ হাসানারা বেগম, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন ও আনওয়ারা খাতুন ফটো—শ্রীপান্না সেন

সীমান্তপ্রদেশে নূতন গভর্ণর—

লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল সার রবার্ট লকহার্ট গত ২৬শে জুন উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নূতন গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়ী গভর্ণর সার ওলাফ কেরো ২ মাসের ছুটী লইয়া কাশ্মীরে গিয়াছেন। সীমান্তের অবস্থা এখন দুর্য্যোগপূর্ণ। সীমান্ত গান্ধী দেশবাসীকে গণভোটে যোগদান করিতে নিষেধ করায় তথায় এক দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সীমান্তবাসী জাতীয়তাবাদীরা 'হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান' সমস্যায় ভোট দান করিবে না—'পাঠানীস্থান ও পাকিস্তান' সমস্যা উপস্থিত করা হইলে ভোট দিবে। এ বিষয়ে গত ২৬শে জুন বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হইল না।

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে অবস্থা—

২৫শে জুন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগ ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক ইস্তাহার পাঠাইয়া জানাইয়াছেন—তাঁহাদের বর্ত্তমানে কেবল প্রাত্যহিক শাসনসংক্রান্ত কার্য্য চালাইতে হইবে। কোন নূতন ধরণের কার্য্য 'প্রাত্যহিক ব্যাপার' বলিয়া গণ্য হইবে না। বাঙ্গালার দুইটি ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতার পৌর সভায় সার ফ্রান্সিসকোর জেভিয়ার বেভরের ভাষণ—পার্শ্বে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ফটো—ইষ্টার্ণ ষ্টার

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি-আই-ই ১৪ই জুন শনিবার সকালে কলিকাতা গার্ডেনরীচে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৪ সালে আই-সি-এস হইয়া কলিকাতায় ১০ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া তথায় তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন।

খাদ্যবরাদ্দ হ্রাস—

৩০শে জুন যে সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে সেই সপ্তাহ হইতে গভর্ণমেণ্ট রেশন অঞ্চলে খাদ্যবরাদ্দ কমাইয়া দিয়াছেন—পূর্ব্বে সপ্তাহে সাধারণ লোক ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য পাইত—এখন সে স্থানে ২ সের ৩ ছটাক খাদ্য পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই লোকের উদর পূর্ণ হয় না—ভবিষ্যতে কি হইবে?

কলিকাতার হাঙ্গামা—

গত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও বন্ধ হয় নাই। জুন মাসের প্রথমে কয়েকদিন হাঙ্গামা কম ছিল বটে, কিন্তু গত ২১শে জুন হইতে হাঙ্গামা ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার শেষ কোথায় কে জানে?

লীগ ও গণ-পরিষদ—

লীগ কর্ত্তৃপক্ষ নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত ২৯ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—(১) আবদুল্লা আল মামুদ (২) এ-এম-এ হামিদ (৩) আবুল কাসিমখাঁ (৪) এ-কে ফজলুল হক (৫) ইব্রাহিম খাঁ (৬) ফজলুর রহমন (৭) গিয়াসুদ্দীন পাঠান (৮) এচ-এস সুরাবর্দ্দী (৯) হামিদ-উল হক চৌধুরী (১০) ডাক্তার ইন্তিয়াক হোসেন কোরেশী (১১) এম-এ-এচ ইস্পাহানি (১২) লিয়াকৎ আলি খাঁ (১৩) ডাঃ মামুদ হোসেন (১৪) মৌলানা আবদুল্লা বাকী (১৫) খাজা নাজিমুদ্দীন (১৬) সিরাজুল ইসলাম (১৭) মৌলানা সাব্বীর আমেদ ওসমানী (১৮) খাজা সাহাবুদ্দীন (১৯) বেগম এক্রামুল্লা (২০) তামিজুদ্দীন খাঁ (২১) মফিজুদ্দীন আমেদ (২২) নুরুল আমিন (২৩) মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ (২৪) হবিবুল্লা বাহার (২৫) মহম্মদ আলি (২৬) ডাঃ এ-এম মালেক (২৭) নুর আমেদ (২৮) আজিজুদ্দীন আমেদ (২৯) ফরহৎ রেজা চৌধুরী।

নূতন প্রদেশ গঠন—

যুক্তপ্রদেশের মীরাট বিভাগ, আগ্রা বিভাগের আগ্রা, মথুরা ও এটা জেলা, রোহিলখণ্ড বিভাগের বিজনৌর, মোরাদাবাদ ও বাদাউন জেলা এবং গাড়োয়াল জেলাকে উক্ত প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্ন আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগের ১২টি জেলার সহিত একত্র করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। উহাই এখন সীমান্তপ্রদেশ রূপে গণ্য হইবে।

বাঙ্গালা বিভাগে শিক্ষার অবস্থা—

এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট প্রায় ২৩০০ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও ১১৬টি কলেজ ছিল।

রাইটার্স বিল্ডিংএর ক্যাবিনেট রুমে চরম প্রস্তাবের খোদ ও মিঃ মহম্মদ আলি ফটো—ইউনাইটেড প্রেস

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে ১২০০ বিদ্যালয় পাকিস্থানে ও ৩০০ বিদ্যালয় আসাম প্রদেশে যাইবে। বাকী ৮ শত বিদ্যালয় বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকিবে। ৩৪টি কলেজ পাকিস্থানে ও ২৩টি আসামে যাইবে এবং বাকী ৫৯টি কলেজ পশ্চিম বঙ্গে থাকিবে। এ বৎসর ৬০ হাজারেরও অধিক ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে—আগামী বৎসর ৩০।৩৫ হাজারের বেশী ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্র পাওয়া যাইবে না।

কলিকাতায় পাইকারী জরিমানা—

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে সকল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার জন্য কলিকাতার

পুলিস কমিশনার নিম্নলিখিত ৭টি থানার অধিবাসীদের উপর মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৬২ হাজার, বড়বাজার ৩৮ হাজার, জোড়াসাঁকো ২৩ হাজার ৫ শত, বড়তলা ১০ হাজার, তালতলা ৮ হাজার, মুচিপাড়া ৫ হাজার ও হেয়ার ষ্ট্রীট ৫ হাজার।

সিন্ধু ও গণপরিষদ—

গত ২৩শে জুন সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ৩৩-২০ ভোটে সদস্যগণ পাকিস্থান গণপরিষদে যোগদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেসী সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন; ২ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্য নিরপেক্ষ থাকেন। ৩ জন ইউরোপীয় সদস্য ভোটে যোগদান করিতে পারেন নাই।

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন অভিমুখে লীগ সদস্যবৃন্দ ফটো—ষ্টুডিয়ো দাস

পাঞ্জাব বিভাগ—

২৩শে জুন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একযোগে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদান করিবেন না—পক্ষে ৯১ ও বিপক্ষে ৭৭ জন ভোট দেন। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সদস্যগণ স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে পাঞ্জাব প্রদেশ দুই ভাগে ভাগ করা হইবে—ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ৫০ ও বিপক্ষে ২২ জন ভোট দেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের সদস্যগণ পৃথক ভাবে মিলিত হইয়া পাঞ্জাব বিভাগের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন—পক্ষে ৬১ জন ও বিপক্ষে ২৭ জন ভোট দেন। ২ জন ভারতীয় খৃষ্টান ও ১ জন এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য লীগের পক্ষে ভোট দেন। ৮৮ জন মুসলমানের মধ্যে ৮০ জন লীগ দলভুক্ত—৮ জন ইউনিয়ন দলভুক্ত। হিন্দু, শিখ ও তপশীলী সদস্যদের সংখ্যা ছিল মোট ৭৭।

বিভাগের পদ্ধতি—

ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান—দুই ভাগে ভাগ করিবার জন্য দিল্লীতে বিভিন্ন কমিটী বসিয়াছে ও কাজ করিতেছে। সম্প্রতি বিভাগ কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া কাজ করা হইতেছে—(১) কোন্ অঞ্চল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্য্যন্ত কত টাকা পাইয়াছেন (২) দুইটি অঞ্চলের প্রত্যেকের অধিবাসীর সংখ্যা কত (৩) প্রত্যেক নূতন রাষ্ট্রের আয়তন (৪) প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারকে কত টাকা দেয় (৫) অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটির উন্নতির জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন? ভারত বিভাগের সঙ্গে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সমস্যাও রহিয়াছে।

বাঙ্গালা বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণ—

বাঙ্গালা বিভক্ত হওয়ায় উহার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য যে সরকারী কমিশন বসিবে তাহার সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী গত ২৩শে জুন বাঙ্গালার একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কমিটীর সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কমিটীর অন্যান্য সদস্য হইয়াছেন—ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মোদক,

অধ্যাপক ডক্টর এস-পি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সংখ্যাবিজ্ঞান গবেষণাগারের শ্রীযুক্ত দশর রায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর চুনিলাল রায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ ঘোষ।

পূর্ব্ববঙ্গ দলের নেতা—

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ দলের কংগ্রেস সদস্যগণ গত ২৩শে জুন কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে তাঁহাদের দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩১ জন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দুকে বাস করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দলের ডেপুটী নেতা, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু প্রধান হুইপ ও শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায় সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের নেতা—

গত ২২শে জুন রবিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস সদস্যগণ কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাদের দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ সদস্যদের সহিত আচার্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা ফটো—ইণ্ডিয়ান নিউজ

দৈনিক বসুমতীর আমলা—

গত ১০ই জানুয়ারী এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দৈনিক বসুমতী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৩ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে দৈনিক বসুমতীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হইলে বিচারপতিগণ বাজেয়াপ্তির আদেশ নাকচ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বাজেয়াপ্ত করা অর্থ ফেরত দিতে বলিয়াছেন ও বাদীকে মামলার খরচ দিবার আদেশ দিয়াছেন। বিচারপতি বিশ্বাস, আক্রাম ও রুফের আদালতে বিচার হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বঙ্গ ও গণ-পরিষদ—

গত ৪ই জুলাই পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে—কংগ্রেস মনোনীত নিম্নলিখিত ১১জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ধীরেন্দ্র দত্ত, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত, প্রেমহরি বর্ম্মা, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, শচীন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, হরেন্দ্র শূর ও জ্ঞানেন্দ্র মজুমদার। লীগ কর্ত্তৃক মনোনীত ৫জন তপশীল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন—শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বাকী ৪ জন—মন্ত্রী নগেন্দ্রনাথ রায়, হারাণচন্দ্র বর্ম্মণ, ডাঃ তোলানাথ বিশ্বাস ও মন্ত্রী দ্বারিকনাথ বারোয়ী পরাজিত হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তা—

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দুদের নিরাপত্তা রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করিয়া নববঙ্গ সমিতির পক্ষ হইতে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে।

প্রস্তাবসমূহ কলিকাতা ১৩৯ বি রাসবিহারী এভেনিউতে অধ্যাপক পি-কে-গুহ বা ২৭ বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সফর—

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখিবার জন্য নিম্নলিখিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই উত্তর অঞ্চলের জেলা-সমূহে সফরে বাহির হইবেন—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, সুরেশচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রভাতচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমহরি বর্ম্মণ, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, সুরেশ দাশগুপ্ত, সতীন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্র দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর।

নূতন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি—

ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও বরিশালের অধিবাসীরা গোপালগঞ্জ মহকুমাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী সম্পর্কে বিবেচনার জন্য গোপালগঞ্জে যে সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া গত ৫ই জুলাই গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪টি এলাকা হইতে বহু লোক পূর্ব্বেই গোপালগঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাণাঘাটেও ঐভাবে সম্মেলন বন্ধ করা হইয়াছে।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস

নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনের অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ৫ই জুলাই বেজওয়াদায় প্রকাশ করিয়াছেন—মুসলমান নাগরিকগণকে অস্ত্র সরবরাহের গুরুত্ব সম্বন্ধে এতদিন নিজাম গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা শুনা যাইতেছিল, এতদিনে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিজাম সেনাদলে দুই লক্ষ শুধু মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইতেছে।

পণ্ডিত নেহরুর ক্যাবিনেট পরিত্যাগ—

পার্লামেণ্টে ভারত শাসন সম্পর্কিত নূতন বিল উত্থাপিত হওয়ায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সদলে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর বড়লাট পাকীস্থান ও ভারতীয় রাষ্ট্র সভার জন্য দুইটি পৃথক মন্ত্রিসভা গঠন

করিবেন ও ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সেই মন্ত্রিসভাগুলি বিভক্ত ভারতের দুইটি পৃথক দেশ শাসন করিবে।

হুগলী জেলা ব্যবসায়ী সম্মিলন—

গত ১লা জুন বিকালে হুগলী জেলার সোনাটিকরী গ্রামে হুগলী জেলা ব্যবসায়ী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা লৌহ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। রঘুনাথ বাবু তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক লীগ মন্ত্রিত্ব প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ভারতের অখণ্ড একত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে—পণ্যের বাজারে নিজেদের স্বার্থ অব্যাহত করিতেছে। ব্যবসায়ীদিগকে ঐক্যবদ্ধ সংঘশক্তির সাহায্যে লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইবে।" ভবতোষবাবু উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—"লীগ মন্ত্রিসভার নীতি ও পক্ষপাতিত্ব মূলক

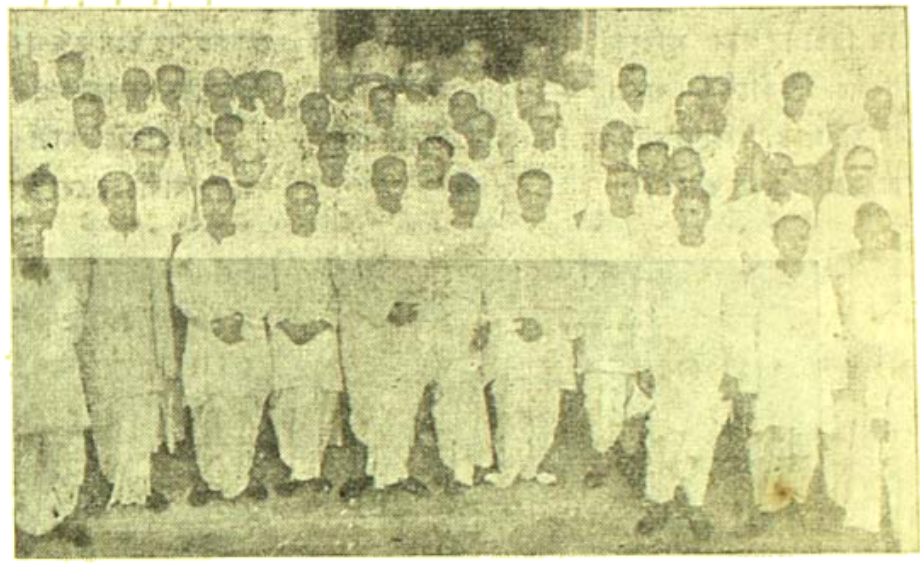

বঙ্গ বিভাগের সমর্থক ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সদস্যবৃন্দ ফটো—ইউনাইটেড প্রেস

হাওড়া ষ্টেশনে 'সিলভার এ্যারো' প্রথমবার সভ্যর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ফটো—ইউনাইটেড প্রেস

কুশাসনের ফলে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু থাকায় দেশে প্রচুর দ্রব্য মজুত থাকা সত্ত্বেও লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে অসমর্থ। এই অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য দেশের ব্যবসায়ীদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে।" বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ব্যবসায়ীদিগকে এখন সংঘবদ্ধ হইয়া দুর্নীতি দমনে অগ্রসর হইতে হইবে। "যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ের মধ্যে যে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে দেশ ও জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

নেপালে শাসন সংস্কার—

নেপালের মহারাজা এত দিনে প্রজাদের দাবী মানিয়া

লইয়া শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। গত ২২শে মে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে অবিলম্বে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি আয়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন, বালক বালিকাদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন করিবেন এবং যথাসময়ে সরকারী হিসাবপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, তখন কি আর তাঁহার পক্ষে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

বৃটীশ সৈন্যগণ আকিয়াব, সাণ্ডাওয়ে ও কাউকপিউতে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিতেছে। কৃষকগণ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে। বিদ্রোহের ফলে ঐ অঞ্চলে এবার ধান বা অন্য কোন খাদ্য-শস্যের চাষ হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া এই অবস্থা থাকায় লোকজনের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

কলিকাতায় খাবারের দোকান বন্ধ—

কলিকাতায় আটা ও চিনি সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় সহরের খাবারের দোকানগুলিতে আটা ও চিনি সরবরাহ

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী সভায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকান্তি ঘোষ ফটো—শ্রীগোরা সেন

পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন কমিটী—

পশ্চিম বাঙ্গালার জন্য একটি পৃথক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গঠনের প্রস্তাব গত ৪ই জুলাই বর্দ্ধমান মেদারীতে বর্দ্ধমান বিভাগ কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত হইয়াছে—শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মৌলবী আব্দুস সত্তর, অতুল্য ঘোষ, রজনী প্রামাণিক, সুশীল পালিত ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরাকানে বিদ্রোহ—

ব্রহ্মদেশের আরাকান বিভাগে কিছুদিন হইতে বৃটীশ-বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। বিদ্রোহীরা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া সকল কাজ চালাইতেছে।

একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার ফলে গত ১২ই এপ্রিল হইতে সকল খাবারের দোকান বন্ধ আছে। ইহাতে খাবারের দোকানের ৬ হাজার কর্ম্মচারী বেকার হইয়াছে। চায়ের দোকানেও চিনি দেওয়া হয় না—ফলে গুড় দিয়া চা প্রস্তুত হইতেছে। বিস্কুটের কারখানাগুলিও আটার অভাবে বন্ধ হইয়াছে। প্রায় ৪ মাস এই অবস্থা চলিতেছে। আরও কতদিন চলিবে কে জানে?

ছোরাভর্ত্তি পার্শ্বেল—

২৪শে মে কুমিল্লা পোষ্টাফিসে ২৪ ডজন ছোরাভর্ত্তি ২টি পার্শ্বেল ধরা পড়িয়াছে। ছোরাগুলি ওয়াজিরাবাদ হইতে এক মুসলমানের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই এইরূপ ছোরাপূর্ণ পার্শ্বেল ধরা পড়িতেছে—অথচ যাহারা পার্শ্বেল পাঠাইতেছে, তাহাদের শাস্তি দানের কোন ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না।

আসাম গভর্ণরের নীতি—

আসামের নূতন গভর্ণর সার আকবর হায়দারী আসামের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি ২৩শে মে তারিখে ধুবড়ীতে এক সভায় বলিয়াছেন—"মুসলেম লীগের পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আসাম সরকারের অনুমতি ব্যতীত সরকারী ভূমিতে বহিরাগতদের ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকারই থাকিতে পারে না।"

পরলোকে ভূপতিনাথ মিত্র—

২৪ পরগণা পাণিহাটীর ডাক্তার ভূপতিনাথ মিত্র গত ১৬ই এপ্রিল মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী, সমবায় ব্যাঙ্ক, ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি সকল জাতি গঠন মূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সারা জীবন পরোপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

ভূপতি মিত্র

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়া রবীন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ পৈতৃক বাসভবন ক্রয় করা হইয়াছে ও বিশ্বভারতীকে তাহার ঋণ শোধের জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকা দিয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইবে—ঐ টাকার সুদে প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখককে 'ঠাকুর সাহিত্য পুরস্কার' প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভবনে একটি 'জাতীয় কলা শালা' প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় এত শীঘ্র রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে এইরূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে সেজন্য তিনি দেশবাসী সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

হুগলী জেলা সম্মিলন—

গত ৩১শে মে শনিবার হুগলী জেলায় গোঘাটিকরী গ্রামে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের সভাপতিত্বে হুগলী জেলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় বলেন—"লোক সংখ্যার হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যা লঘিষ্ঠতা বিচার করা চলে না। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উৎকর্ষের উপর উহা নির্ভর করে।" কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা সম্মিলনীর সহিত অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সভায় বহু খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন।

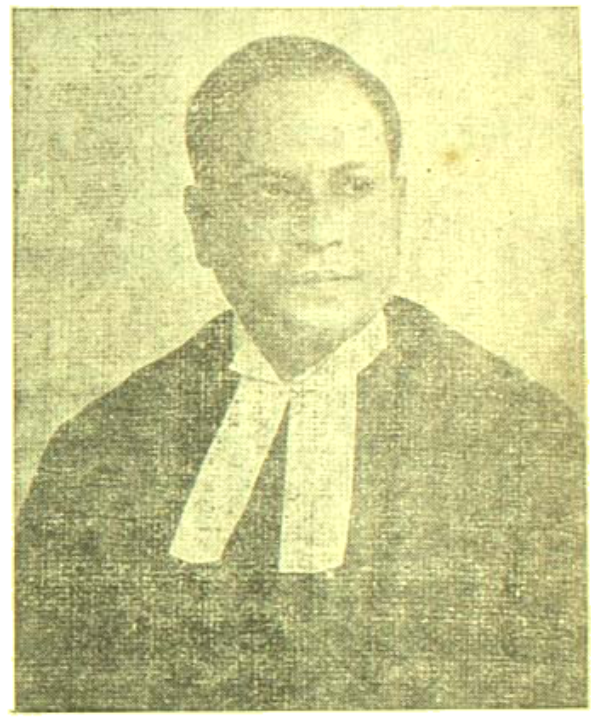

বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

ট্রাম ধর্ম্মঘটের জের—

কলিকাতার ট্রামওয়ে কর্ম্মীরা ৮৬ দিন ধর্ম্মঘটের পর কাজে যোগদান করায় তাঁহাদের অভাব অভিযোগের বিচার ভার সরকারী ট্রাইবিউনালের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে কর্ম্মীদের নিম্নতন বেতন ৩০ টাকা স্থলে সাড়ে ৩৭ টাকা করা হইয়াছে। তাঁহারা বৎসরে এক মাসের বেতন বোনাস পাইবেন ও ধর্ম্মঘটে কাজ বন্ধের সময়ের জন্য দেড় মাসের বেতন পাইবেন। কেরাণীদেরও নিম্নতন বেতন

৭০ টাকা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বেতাড় বণিক সভা কেরাণীদের নিম্নতন বেতন ৬০ টাকা ঠিক করিয়াছিল—ট্রাইবিউনাল তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ট্রাম কর্ম্মচারীদের দাবী ছিল—নিম্নতন বেতন ৪০ টাকা, বৎসরে ৩ মাসের বেতন বোনাস ও ওভারটাইমের পুরা বেতন।

সার্বজনিক সেবার জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জী (বামে)

ফটো—জে-কে-সান্যাল

ভাইস-চ্যান্সেলার সম্মানিত—

গত ২১শে মে শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক' রূপ সম্মানসূচক পদ প্রদান করা হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩০ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। দেশবাসী যোগ্য-পাত্রে সম্মান অর্পিত হইতে দেখিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

সরদারবাড়ী গোপালদাসজী—

২৫ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার জন্য ওয়াটের রাইসন রাজ্যের স্বাধীন রাজা দরবার গোপালদাসকে গদীচ্যুত করা হইয়াছিল। গত ২৪শে মে তাঁহাকে ঐ গদী পুনরায় প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার গদীপ্রাপ্তি উৎসবে বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ বহু কংগ্রেস-নেতা উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে গোপালদাস তাঁহার রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

হুগলী জেলার উকীল ও খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ১৯শে মে ৭০ বৎসর বয়সে স্বগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৩, ১৯২৯ ও ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর পদে কাজ করার সময় তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষা—

ইউরোপের সকল দেশে ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত পি-এন-কৃপান ইউরোপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে টেকনলজি শিক্ষার জন্য ৪০।৫০ জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সে তিনি ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে ঐ সকল দেশে যাইয়া কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আন্দামানের লোক হিন্দু—

শ্রীযুত চমনলাল গত ১০ বৎসর ভারতের বাহিরে থাকিয়া বিদ্যা-চর্চ্চা করিতেছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্দামানের লোকগণ হিন্দু—ভারতীয় পুরাণের সহিত আন্দামানের পুরাতন কাহিনী সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। তিনি মেকসিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর প্রকাশ করিয়াছেন—কলম্বাসের বহুপূর্ব্বে ভারতীয়গণ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুই শত রকমের উৎসব সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের। তিনি ঐ অঞ্চলে বহু ভারতীয় চিত্র দেখিয়া আসিয়াছেন।

কবি প্যারিমোহন সেনগুপ্ত—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা কবি ও বঙ্গবাণী কলেজের অধ্যাপক প্যারিমোহন সেনগুপ্ত গত ২০শে মে কলিকাতা করিয়াছেন। ২০ দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাহার ২ পুত্র ও ৬ কন্যা বর্ত্তমান। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহু

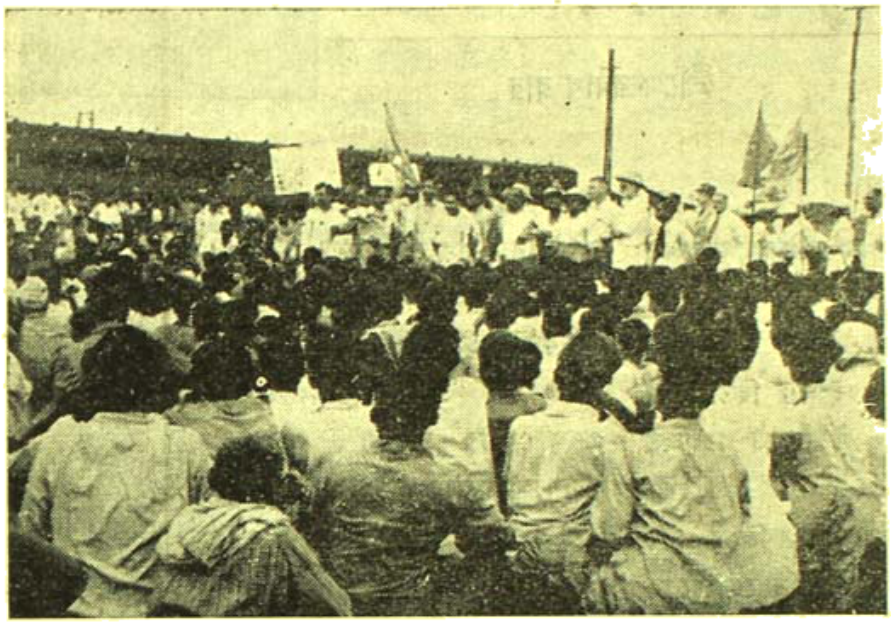

খাঁচড়াপাড়ায় রেল কর্মাদের এক সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের যান-বাহন সচিব ডাঃ জন মাথাই

রাওয়ালপিণ্ডীর বিস্তৃত অঞ্চল পরিদর্শনে বড়লাট ও বড়লাটপত্নী

লালদিঘীর ধারে ট্রামে উঠিবার সময় সহসা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পথের উপর ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন কবিতা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু সকলের পক্ষেই বেদনাদায়ক।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ৰহুবাংগুলেৰ চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা-দলের তৃতীয় টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ড ৭ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৩৯ রাণ তোলে। কে জি ভিলজোয়েণের ৯৩, বি মিচেলের ৮০ (রাণ আউট), এবং ডি ডায়ারের ৬২ রাণ উল্লেখযোগ্য। এডরিচ ৩৫·১ ওভার বলে ৯টা মেডেন নিয়ে এবং ৯৪ রাণ দিয়ে দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৪টা উইকেট পান।

ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৪১৮ রাণ করে। এডরিচ ১৯১ রাণ এবং ডি কম্পটন ১১৫ রাণ করেন। টাকেট ৫০ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ১৪৮ রাণ দিয়ে ৪টা উইকেট পান। ব্রিথসোন পান ১২৮ রাণে ৩টে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৭ রাণ উঠে। দলের সর্ব্বোচ্চ ১১৫ রাণ করলেন ডি নোর্স। এ-ছাড়া এ মেলভিলের ৫৯ রাণ উল্লেখযোগ্য। এবারও এডরিচের বোলিং মারাত্মক হ'ল। ২২·৪ ওভার বলে ৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৭৭ রাণ দিয়ে তিনি এবারও ৪টা উইকেট পেলেন। রাইট পেলেন ৩২ রাণে ৩টে।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তিন উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়।

ইংলণ্ডের এ জয়লাভের ব্যক্তিগত সম্মান এবং কৃতিত্ব এডরিচের। তিনি ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিষয়েই অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করেন।

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট খেলার পূর্ব্বাপর ফলাফল—১৮৮৮-১৯৪৫

প্রথম খেলার তারিখ	ইংলণ্ড বঃ আফ্রিকা জয়ী	জয়ী	ড্র	মোট
দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৮৮-৯	২০	১১	১২	৪৩
ইংলণ্ডে ১৯০৭	৯	১	১১	২১
মোট	২৯	১২	২৩	৬৪

ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ—ডার্বাণে ৬৫৪ (৫ উই, ১৯৩৯); দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ—৪৩০; ডার্বাণে ১৯৩৯। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা কম রাণ—১৯০৭ সালে লিডসে ৭৬। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা কমরাণ—৩০; পোর্ট এলিজাবেথে, ১৮৯৬ সালে ও ৩০ রাণ বার্মিংহামে, ১৯২৪ সালে।

ফুটবলঃ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ ক'লকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা এ বছর বন্ধ রাখা হয়েছে। পাওয়ার লীগের দু'টি বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাগান ১৭টা খেলায় ৩৩ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থানে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল। ১৬ টা খেলায় তাদের ৩১ পয়েণ্ট হয়েছে। মোহনবাগান বিপক্ষকে ৬৪টা গোল দিয়ে মাত্র ৪টা গোল খেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ৩১টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো খেয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে বেনিয়াটোলা ১৫টা খেলায় ২৭ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম আছে। দ্বিতীয়

স্থানে আছে সি এম সি—তারা ১৪টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট করেছে।

উত্তর কলকাতায় একটি ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা চলছে। দুটি ভাগে ভাগ ক'রে খেলা পরিচালনা করা হচ্ছে। 'এ' বিভাগে ৯টি দল এবং 'বি' বিভাগে ১০টি দল যোগদান করেছে। ক্যালকাটা ফুটবল লীগের কোন কোন খেলোয়াড়কে এইসব খেলায় যোগদান করতে দেখা গেছে।

অগ্রগামী ব্যায়ামাগার ঃ

মাত্র দু' বৎসর হ'ল বালীগঞ্জে "অগ্রগামী ব্যায়ামাগার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ ও যুবকগণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। রাসবিহারী এভিনিউস্থ ত্রিকোণ পার্কে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে এই সুবৃহৎ ব্যায়ামাগারটি অবস্থিত। ব্যায়ামাগারে সভ্যদের কেবলমাত্র শরীর গঠনের দিকেই নজর রাখা হয় না, আত্মরক্ষামূলক এবং কার্য্যকরী শিক্ষা—যথা, মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা-লাঠি-তরোয়াল, বৃহৎসহ প্রভৃতি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীযুক্ত বলাই চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রবীন সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃপেন গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীরগণ শিক্ষাদান করেন। গত "আগষ্ট ধাক্কার" সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য দ্বারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যায়ামাগার-সম্পাদক শ্রীশ্যামল দত্ত ব্যায়ামাগারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শ্রেণীর আদর্শ ব্যায়ামাগার স্থাপনের জন্য আমরা তরুণ যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করছি।

পেশাদারী টেনিস ঃ

পেশাদার টেনিস খেলার প্রবর্ত্তক হলেন মহিলাদের 'ওয়ার্ল্ড টেনিস চ্যাম্পিয়ান' ফরাসী মহিলা Suzanne Lenglen। ১৯২৬ সালে সি সি পাইস কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি ৫০,০০০ ডলার পারিশ্রমিকের চুক্তিতে আমেরিকায় এক

অগ্রগামী ব্যায়ামাগারের সভ্যগণ

ভ্রাম্যমাণ টেনিস খেলোয়াড়দলে যোগদান করেন। এই দলে অপর এক মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁর নাম মিস মেরী কে ব্রাউন। এই ভ্রাম্যমাণ টেনিস দলে ঐ সময়ের খ্যাতনামা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ভিনসেন্ট রিচার্ডস, হাওয়ার্ড কিনসে, হার্ডে, ষোডগ্রাস এবং পল ফিরেট যোগদান করেছিলেন। এই দলটি তিন মাস ধরে দেশের প্রধান প্রধান সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে পেশাদার টেনিস খেলার প্রচার করেন।

১৯২৭ সালে আমেরিকায় রিচার্ডস এবং কিনসের নেতৃত্বে আমেরিকান পেশাদার লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বছর পুরুষদের একটি প্রতিযোগিতা হয়, রিচার্ড প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন।

এদিকে ইউরোপের টেনিস জগতে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে অনেক খেলোয়াড়ই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন Karel Kozeluh, তাঁর জুড়ী সে সময়ে কেউ ছিলেন না। এদিকে জার্মাণীর Ramon Najuch, ফ্রান্সের Albert Thomes ও Edward Burke এবং ইংলণ্ডের Major Rendell পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় জগতের তখন এক একটি ধুরন্ধর খেলোয়াড়! চেক্ খেলোয়াড় Kozeluh ১৯২৮ সালে আমেরিকার পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে রিচার্ডসের কাছে পরাজিত হন। রিচার্ডস আমেরিকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯২৯ সালে রিচার্ডসকে পরাজিত করে Kozeluh পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

পেশাদার লন টেনিস জগতে ১৯৩১ সাল স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছর দুর্দ্ধর্ষ টেনিস খেলোয়াড় উইলিয়াম টিলডেন এবং তাঁর ডলসের সাথী ফ্রাঙ্কিদ টি হাণ্টার, আমেরিকার জে ইমেট পেরী, কালিফর্ণিয়ার রবার্ট সেলার পেশাদার শ্রেণীভুক্ত হলেন। টিলডেন তাঁর প্রথম পেশাদার খেলোয়াড় জীবনের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৯৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে ১৪০০০ হাজার দর্শক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রিচার্ডস। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে ইন-ডোর চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় টিলডেন সাতটি খেলায় রিচার্ডসের সম্মুখীন হ'ন এবং সাতটি খেলাতেই বিজয়ী হয়ে দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন। পেশাদার টেনিস খেলায় বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখালেন টিলডেন। নিউ ইয়র্কের উইলিয়াম ও' ব্রিয়েনের পরিচালনায় টিলডেন প্রতি বছর বড় বড় সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগলেন। তাঁদের এই টেনিস খেলার আয় ১৯৩১ সালে ১৮২,০০০; ১৯৩২ সালে ৮৬,০০০; ১৯৩৩ সালে ৬২,০০০; ১৯৩৪ সালে ২৪৩,০০০ এবং ১৯৩৫ সালে ১৮৮,০০০ ডলার দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৪ সালে টিলডেন জুনিয়ার এইচ এলিসওয়ার্থ ভাইসের সঙ্গে টেনিস খেলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁদের টেনিস দলে অনেক নামকরা পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় যোগদান করলেন। তাঁর দলের মিস জেনী সার্পকে খাওয়ার খরচা এবং ১৫০, মিসেস এথেল বার্কহাউটকের খাওয়া বাদ ৩০০, বার্কলে বেলকে ৫০০, ক্রস বার্ণেসকে ৯৫০ ডলার পারিশ্রমিক প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হ'ত।—ব্রিয়েন যাতায়াত এবং হোটেল খরচা নিজের পকেট থেকে দিতেন। টিলডেন এবং তাঁর মধ্যে লাভের ভাগ হ'ত আধা-আধি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনলিনাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর উপন্যাস
অগ্নিযুগের কথা—১।০

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত "আমাদের গান"—৸৵০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "নরসিংহের মুকে"—৪।০

এন্‌ওয়ারেদ আলী প্রণীত "ইরাণ তুরাণের গল্প"—১৲

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত "ছড়া-ছড়ি"—১৸০

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রেমরাগ"—২৲

শ্রীদুলালচন্দ্র সরকার প্রণীত সামাজিক নাটক "সর্ব্বহারার দাবী"—১।০

শ্রীনরীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "অগ্নিসংস্কার প্রথমিত বহ্নি"—৪৲

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বঙ্গমাতরম্"—৩।০

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন সম্পাদিত "ভেল্কার সিগ্‌ন্যাল"—১।০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "দীপ-শিখা"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ধূসর পাহাড়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নীরেন ঘোষ

উৎকণ্ঠিতা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

যে-দিনটির জন্য বাঁচিয়া থাকা সার্থক, সেই দিনটি আজ। বোমা-বর্ষণ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কন্ট্রোল, মুসলমান গুণ্ডাদের ছুরি-মোরা, পুলিসের গুলি, শাসনের ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার তাণ্ডব-লীলা—সব কিছু উপেক্ষা করিয়া এই যে আজ বাঁচিয়া আছি, এই যে আজ এই দিনটি দেখিতে পাইলাম, তাহাতেই হইলাম ধন্য। ইহার পর মরণেও আর খেদ নাই।

আমাদের পূর্ববর্তিগণ—যাঁহারা আজ ইহলোকে নাই—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আমাদের দেশের মনীষীগণ, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, আমাদের রবীন্দ্রনাথ—বারংবার আজ তাঁহাদের কথাই মনে পড়িতেছে। আমাদের দেশের বীরগণ, যাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতা-অর্জনে কারাবরণ করিয়াছেন, মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—তাঁহাদের জন্য চক্ষু আজ অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতেছে। যাঁহাদের সকলের চিন্তার দ্বারা, প্রেরণার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, তাপের দ্বারা আমিকার এই দিনটি সম্ভব হইল, তাঁহারাই আজ নাই, তাঁহারাই এ দিনটি দেখিতে পাইলেন না! আমরা যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তাঁহারাই আমাদের শিওরে আসিয়া জাগাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—আর ঘুমাইও না, জাগ্রত হও, উঠার আর দেরি নাই। উষার আগমনে পূর্ব দিগন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল—তাঁহাদের আসন আজ শূন্য। হায়, ইহার পরিবর্তে অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য আমরা যদি চলিয়া যাইতাম, তাঁহারা যদি আজ থাকিতেন! তাঁহাদের জন্য আজ সর্বাগ্রে আমাদের অন্তর অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে।

মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিতেছে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর, তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের আশা, তাঁহাদের স্বপ্ন।

"বল বল বল সবে
শত বেণু বীণা রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

হে স্বপ্নদ্রষ্টা! হে সত্যবাদী! তোমার স্বপ্ন আজ সত্য হইতে চলিয়াছে, তুমি কোথায় রহিলে!

"শস্য শ্যামলাং মাতরম্
শুভ্রজ্যোৎস্নাং পুলকিতযামিনীম্
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্—

সমস্ত দেখিল বসুধা কাঁদিতেছে।" ওগো স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা গুরু, আজ আমরা সকলে কাঁদিতেছি তোমার জন্য।

"নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"
"Into that heaven of Freedom
My Father! Let my country awake!"

হে মহাকবি, হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, হে পথপ্রদর্শক! ভারতের সম্মুখে সেই স্বর্গদ্বার ধীরে ধীরে খুলিতেছে, তোমার বীণা আজ নীরব কেন? কতবার কত বিঘ্ন-সঙ্কুল উপল-বন্ধুর পথে রজনীর অন্ধকারে তুমি পথ দেখাইয়াছ, আজ তোমার প্রভার বর্তিকা নিভাইয়া দিয়া কোন্ অজ্ঞাত-লোকে সরিয়া রহিলে?

উপবাসে, অনশনে, কারাগারে বন্দিনী জননীর প্রতি উদ্যত দণ্ড আপনার ললাটের 'পরে বরিয়া লইলে, হে জন্মভূমির মুক্তি-সেনানীগণ—তোমরা, যাহারা হাসিতে হাসিতে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ, সেই তোমাদের—

বিশ্বের ইতিবৃত্ত বসুধা যদি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে!—

তোমরা, যাহারা আজ আমাদের এই মুক্তি-বাহিনীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে, মৃত্যু তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শোক করিব না। তোমরা সবাই আছ, কেহ দূরে সরিয়া যাও নাই। তোমরা আমাদের মধ্যে আছ, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছ, আমাদের এই চিরাগত জাতির মনোরাজ্যে অমর হইয়া থাকিবে।

এসো, আজ জননীকে আনিতে যাইবার আগে আমরা তাঁহাদের প্রণাম করিয়া যাই, যাঁহারা সবাই মায়ের মুক্তির অগ্রদূত, যাঁহারা আসিয়া-ছিলেন বিঘ্নসঙ্কুল শাণিত ক্ষুরধারার পথে, যাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মা ভৈঃ! জননীর রুধির ধারা ঐ যে দিগন্তে দেখা যায়! মা আসিতেছেন।" নীরব নমস্কারে ধ্যান করি তাঁদের মূর্তি—

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে—
সঙ্কট-আবর্ত মাঝে দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লভেছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। বহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়ে ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি-জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।"

জননী আজ রাহুমুক্ত, কলঙ্ক-কালিমা-মুক্ত। প্রাচ্যের কৃষ্ণা চতুর্দশীর মেঘমুক্ত প্রভাতে মায়ের মুখ আজ স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইল। হে জননি, তোমায় বারংবার নমস্কার—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণীং
কমলা কমল-দল-বিহারিণীং
বাণী বিদ্যা-দায়িনীং
নমামি ত্বাং।

এই প্রণাম তোমাকে যে জানাইতে পারিলাম, ইহাতে আমাদের জন্ম সার্থক হইল, আমরা পাপমুক্ত হইলাম। জননীর বন্ধনদশা ঘুচাইতে না পারিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ মাতৃ-নির্যাতন দহনে অক্ষমতা-জনিত গভীর পাপের পসরা মাথায় লইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা আমাদের মধ্য দিয়া আজ এই একটি মুহূর্তে সর্বপাপ মুক্ত হইলেন।

জননি, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন যোগ্য হই। জাতির মঙ্গলকে আপন মঙ্গল, জাতির সম্মানকে আপন সম্মান, জাতির দুঃখকে আপন দুঃখ বলিয়া জানিবার জ্ঞান আমাদের দাও। আমাদের অনুভবকে তীক্ষ্ণ করো, আমাদের মিলনকে অক্ষেদ্য করো। জননী আমাদের শুভবুদ্ধা সংযুক্ত, শুভবুদ্ধিতে সংযুক্ত রাখুন। আমরা যেন ভেদবুদ্ধিকে, আত্মম্ভরিতাকে, নূন্যকে, বিগলিত শব অপেক্ষা ঘৃণ্যতর মনে করি। জননী, আমাদের শক্তি দাও, বীর্য দাও, তেজ দাও,

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ধ্বনি উঠে খর-খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে নো'রে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

যে আয়াসে আমরা যাহা অর্জন করিলাম, যে আয়াসে আমরা তাহা রক্ষা করিব। জননি, তোমায় রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রাণের মায়া হরণ করিয়া লও।

তোমার এই খণ্ডিত মূর্তি—আজ কিছুতেই যেন না ভুলি—কোন্ গভীর পাপের ফল। কিছুতেই যেন না ভুলি—বিচার-বুদ্ধি ঔদার্য স্থৈর্যেরই আর একটি নাম—কিছুতেই যেন না ভুলি, ক্লৈব্য কখনোই ক্ষমার যোগ্য নয়। স্বাধীনতার ইতিবৃত্তের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যে সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, আমাদের পক্ষদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে, আমাদেরি রক্ত শ্রমে, বুকের রক্তে অর্জিত ফলে নির্লজ্জ ইতরতার অংশগ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে এবং আমাদেরি ধনে ধনী হইয়া আমাদিগকেই অপমানিত, নির্যাতিত করিয়াছে—বন্ধুবাক্য অবহেলা করিয়া আমরা সেই সম্প্রদায়কেই ভ্রাতৃনির্বিশেষে বুকের কাছে টানিতে চাহিয়াছি, ব্যাধি-দুষ্ট অঙ্গকে দারুণ মোহে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহারি অনিবার্য ফলে আজ সর্বপল্লীর ক্ষতবিক্ষত, পরিপূর্ণ সিন্ধিলাভ

স্মৃতি-পরাহত হইয়া গেল। অস্থির অক্ষরে এ কথা যেন আমাদের হৃদয়-পটে লেখা থাকে।

দুর্ভিক্ষের দ্বারা যাহারা তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ পথ এড়াইয়া গিয়া আমাদেরি সাধনলব্ধ ফলের অংশভাগী হইয়া আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিল, তাহাদের বল মল আহারে আমরা বিশ্রান্ত হইব না। তাহাদের কর্মফল তাহাদিগকে পাইতেই হইবে। চালাকির দ্বারা অর্জিত এই বিত্ত ভোগ একদিন তাঁহাদের বিষবৎ মনে হইবে। দুর্ভিক্ষের ফাঁদ একদিন দুর্ভেদ্য কণ্ঠরোধ করিবে।

বিগত দশবৎসরের কুশাসনের বিভীষিকা, বিশেষ করিয়া বিগত বারোটি মাসের কুখ্যাত মারণ-তন্ত্র,—মানব ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—এ আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। পরমেশ্বর আমাদের চিনাইয়াছেন, প্রহারের দ্বারা চিনাইয়াছেন, চোখের জলে চিনাইয়াছেন, ঘোরাচুরিতে, বন্দুকের গুলিতে মারণ যেমা চিনাইয়া দিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ের স্বরূপটি আমরা যথার্থিকভাবে চিনিয়া লইলাম, আর কোনোদিন ভুল করিব না।

ইহার পর থেকি ঔবার্য্য এবং ব্রাতৃত্বের হেয়োজ্জ্বাস উভয় দিক হইতেই মুছিয়া, আর এ মুছিয়া কখনোই জমার ঘোগ্য অঙ্কে স্থির জানি আহত জনমতের উত্তাপে এই মুছিয়া ভস্মসাৎ করিবে। স্বাধীনতা আজ জনরূপী নারায়ণ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কেশ আজ দুর্দিনীক, তাঁহার কণ্ঠস্বর গগনভেদী, তাঁহার এই অপূর্ব, অপরূপ মূর্তি আর কোনদিন দেখি নাই। কোনোদিন যে দেখিয়া যাইব, এ আশা করি নাই। কোন্ পুণ্যফলে আজ এই জনরূপী নারায়ণের সাক্ষাৎ পাইলাম, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিলাম! তোমায় নমস্কার, হে জনরূপী নারায়ণ, হে আহত গণ-দেবতা, তোমায় নমস্কার, বারংবার নমস্কার

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্বঃ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

এসো আজ আমরা প্রস্তাঞ্জলি নিবেদন করি। কাহার উদ্দেশে প্রস্তাঞ্জলি? আজ আমাদের ঈশ্বর, আমাদের জননী, আমাদের জন্মভূমি, আমাদের আরাধ্য দেবতা, আমাদের ভাই বন্ধু,—আজ সবাই একাকার। আজ আমরা পথে পথে প্রণাম করিয়া যাই, ভূমিকাকণাকে প্রণাম করিয়া যাই, মৃত্তিকাকণাকে সযত্নে মাথায় ধরি, এ আমাদের পুণ্যপূতা জননীরই শ্রীচরণের ধূলি!

পূর্বগগনে যেন অগ্নিসারথি হইল, প্রাচ্য আজ বিস্ফোরণের ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ আজ শ্লানিমুক্ত! তরুণ রবি আজ প্রথম-নয়ন-সম্পাতে চাহিয়া দেখিল, এমন ভারতবর্ষ সে বিগত শতাব্দী-সমূহে দেখে নাই। হে সবিতৃদেব, হে অগ্নির্ণাং অগ্নি, তোমায় প্রণাম করি। তুমি প্রসন্ন হও, বরদান করো। বরদান করো, যেন মধুমক্ষিকার মতো আহরিত কর্মসম্ভার, ত্যাগে আমরা ফিরে ফিরে মধুকোষ করিয়া আমাদের জননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারি। আর সেই মধু পুনঃপ্রয়াসে যদি কেহ আসে, আশীর্বাদ করো, মধুমক্ষিকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সুতীব্র হুলের দংশনে যেন সেই তস্করের দুরাশাকে চিরদিনের মতো জর্জরিত করিয়া ফিরাইয়া দিই।

জয় মাতরম্

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর

খুড়ো-ভাইপোর কথা আরম্ভ হল।—"তাড়া রয়েছে, সবিস্তারে বলা চলবে না।" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় ছিলেন, কবে এলেন, সাহেবকে কেমন লাগছে?" উত্তরে বললেন—

"কলকাতা ছেড়ে—লক্ষ্মীছাড়ারা আর থাকে কোথায়! কবে যে এখানে এসেছি—তা কি মনে আছে? বোধ করি জোড়া শনিবার কেটেছে। তুমি এসেছ—আমার শ্রাদ্ধটা করে যাও, আমি আর এ প্রেতোপী করতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলে—সাহেব কেমন? এ প্রশ্ন করতে নেই, সাহেবদের মন্দ বলবে কে? তারা পাঁজের জাত, 'মজাতে' পারে ভালো। তবে এখন আমি চললুম।"

"কোথায়? সেইটাই তো আমার আসল জিজ্ঞাস্য।"

তাহলে আমাকে মহাভারত খুলতে হয়। সময় কই? জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের শিবিরে ঢুকে পড়েছি। কারণ আছে। আমার সাঁওতাল ছেলেটি যে সঙ্গে রয়েছে। তাকে তুমি দেখে থাকবে, মাছ না হলে তার যে একদিনও চলে না—

"পাণ্ডবেরা মাছ খেতো নাকি?"

"না—মাছের কেবল চোখ বিঁধতো? থাক্, তোমার

ইমারতও দেখে এসেছি। সেখানে আমাদের কুলুতো না। ঝঞ্ঝাট বাড়িও না, বেশ আছি।"

"আমার কথাও যে অনেক আছে।"

"তা থাকবে বইকি। বাঙালির তা ছাড়া আর কি থাকে। ওই ত আমাদের সম্পত্তি হে। সে হবে—আচ্ছা এখন—"

"একটা কথা বলে যান,—যুধিষ্ঠিরকে পেলেন কোথা?"

"সে এখন অনেক কথা—মহাভারতের খুদে-সংস্করণ নেই যে। যে দলে সে মিশেছে—সে তো আর ছোট জায়গা মাড়ায় না,—লাহা (Laha) কি মল্লিকদের বাড়ী বোধহয় ভজন গাইতে গিয়েছিল,—সাধু হয়েছে কিনা! ভজনখানেক লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়েছিল—প্রায় অজ্ঞান। তুলতে গিয়ে দেখি—পা ভেঙে দিয়েছে—দাঁড়াতে পারে না। নাড়াচাড়ায় একটু জ্ঞানের মত' হতেই বলে—দোহাই বাবু, আমি কিছু করিনি,—আমাকে পুলিশে দেবেন না। তারা উলটে আমার যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।"—

—"তখন বাদলকে ডেকে এনে, দুজনে ধরাধরি করে তাকে বাসায় নিয়ে যাই। হাতে কাজ ছিল না, ধরামর ছুটিয়ে দিলেন। তারপর—ডাক্তার আর সেবা। এগারো দিনে সে দাঁড়ালো। কথাবার্ত্তায় বুঝেছিলুম—লোকটা মন্দ নয়, কুসঙ্গে পড়ে কঠিন সাধন-ভজন নিয়ে আছে! এখন আর তার কিছু আটকায় না। সাধনোচিত ধামেই যাওয়া তার উচিত ছিল। কিশোরীর কাছে শুনলুম এখন এখানে সে মস্ত contractor, মাছের একচেটে কারবার। আকরগত পাপিষ্ঠ নয়। সুসঙ্গ পেলে এখনো বদলাতে পারে। যাক্, কোথায় আর যাবো, সেই সাধুর ডেরাতেই ঢুকে পড়েছি। বাদল—সেখানে রোজ সের দেড়েক মাছ মারছে। সে নড়বে না। তুমি কিছু মনে কোর' না। ইস্—তুমি করছো কি? সাহেবের মেজাজ এইবার বেগড়াবে, কি বিগড়ে থাকবে!"

বিনোদ চমকে গেলো,—"দিন, পায়ের ধুলো দিন। সন্ধ্যার পর দয়া করে আসবেন, আমি বড় বিপন্ন।"

"আবাগের বেটীকে স্মরণ করে যাও, কোন চিন্তা নেই। সন্ধ্যার পর দেখা হবে।"

বুড়ো চলে গেলেন।

* * *

"May I come in Sir—আসতে পারি?"

"Certainly, 'am so very glad that you have come back—নিশ্চয়ই আসবে, আমি চায়ের order দিয়েছি।"

"ওসব আর শোনাবেন না"—বলতে বলতে বিনোদের গলা ভারি হয়ে এল, আর বলতে পারলে না।

সাহেব চঞ্চল ভাবে বললেন—"ওকি, কেন, কি হয়েছে—what is the matter, speak out doctor."

"এক বেগম নাকি সাক্ষ্য দেবেন—ও হার-ছড়াটি তাঁর—ইত্যাদি সে কথার পর আমার সর্ব্বনাশের আর বাকি কি থাকে—বিশেষ আমি যখন হার তৈরী করাবার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারব না!"

সাহেব একটু হেসে বললেন—"All rubbish, who says so?"

এসব বাজে কথা কে বলে? cheer up সে সব তো মিটে গেছে, তোমাকে সেই সুখবর দেবার জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছিলুম। Don't worry doctor—বেগম সাহেব কোনো কথাই বলবেন না।"

চা এসে গেল। "চেয়ারে বোস তো। চা খেতে খেতে কথা কওয়া যাক্। ভাবনার আর কিছু নেই। অন্য কথা হোক্"—

শুনে ডাক্তার অবাক। কথা কইতে পারলেন না। শেষ বললেন—আপনাকে ও আপনার বিশ্বাসকে খোয়াবার চিন্তা সব চেয়ে অশান্তির কারণ হ'য়ে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। লোকের বিশ্বাসই যদি গেল—তাহলে আর কি রইল আমার? এ ছাড়া আমার অন্য চিন্তা আর ছিল না Sir—মেলে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলুম—সেটাকে তত বড় করেও দেখিনি।"

সাহেব বললেন—"আমার গাফিলতিতেই এত কষ্ট পেয়েছ, নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলুম। তুমি দেখছি বড় sensitive আর nervous প্রকৃতি লোক।"

—আচ্ছা, ও কথা পরে হচ্ছে, এখন আগে তোমার খুড়োর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। চা খেতে খেতে চলুক। আমি যে কাজের জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজেছিলাম—উনিই সেই লোক"—

ডাক্তার বললেন—ওঁকে পাওয়াটাই আমাকে আশ্চর্য্য করেছে। ওঁর অপেক্ষা যে কাজের উপযুক্ত লোক আছেন কি না সন্দেহ। ওঁকে পাওয়া আর বোঝা কিন্তু কঠিন।—ধরা যেন না। A true saint, সত্যকার সাধু। ওকে কথা শুনে বোঝা কিন্তু বড় কঠিন—আনন্দময় ও রহস্যপ্রিয়। অমন বিশ্বাসী ও নির্ভীক সত্য বক্তা বড় মিলবে না। লোক ঠিকই পেয়েছেন। না লোভ না চিন্তা। রহস্যের আচ্ছাদনে কথা কন্, সকলে বুঝতে পারে না। অনিষ্ট সেই লোক করে, সে স্বার্থ রাখে। উনি যদি কিছু করেন তো, উপকার আর সেবা। অর্থে ওঁকে বশে আনা সম্ভব নয়। কারো সদুদ্দেশ্য বুঝলে আপনিই সাহায্য করেন।

শুনে সাহেব হাসলেন, বললেন—"হয়েছে, আর বলতে হবে না। বুঝলুম উনি ব্যবহারিক জগতের লোক নন্,—সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ভাল লোক। কিন্তু অচল।"

"ঠিক তাই সার। আপনি এ সব কথা এনে আমাকে ম্যাডামের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোথায় কেমন আছেন, আগে বলুন।"

বলছি কিন্তু শুনে রাখো—বেশম সাক্ষী দেবেন না। তোমাদের চেয়ারম্যানও দু'দিন তাঁকে বোঝতেএসেছিলেন, সুবিধে করতে না পেরে মামলা তুলে নিয়েছেন। কোর্ট থেকেই সব মিটে গিয়েছে।" কিন্তু···

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন—"কিন্তুটা আমাকে বলতে দিলেই ভালো হয় sir—ওই একটা সামান্য হারের ছুতো নিয়ে আমাকে এত বড় বিপদে ফেলাটা কি আপনি সম্ভব বলে মনে করেন? আপনি আমাকে কি সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেই Jealousyতে কি এত বড় হাঙ্গামে কেউ যায়? আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছি না Sir, কেবল মনে হ'চ্ছে এর পশ্চাতে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে বা আছে। আমি তা বুঝতে না পেরেই বড় অশান্তি ভোগ করছি। আপনি আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাও আমি দেখিনি।"

সাহেব শুনে ডাক্তারের মুখের পানে স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন। শেষ বললেন—কেবল হার চুরির অপবাদটায় তোমার কুলুচ্ছে না দেখছি। সেটা ছোট হ'ল কিসে? আর তাতেই যদি ও-পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তো তার বেশী ওরা আর কি চায়?

"তা জানলে আমার আর অশান্তি কিসের Sir!"

সাহেব তাঁর চেয়ার ছেড়ে ওঠে এসে ডাক্তারের পিঠ চাপড়ে হাসলেন।—" Bravo, এই জন্যেই তোমাকে খুঁজি। কাজ হয়ে গেলে এদেশে আর কেউ সে সম্বন্ধে ভাবে না। তোমাদের কিন্তু intelligent জাত বলে খ্যাতি শুনতে পাই। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমাদের দেশের নামকরা বড় সহরগুলির মত তোমাদের কলকাতাতেও বড় বড় গুণ্ডার দল আছে। তারা পারে না বা আবশ্যক হ'লে করে না এমন কাজ নেই। টাকা নিয়ে বড় লোকের যার উদ্ধার বা মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধি করাও তাদের রোজগারের একটা পথ—"

বিনোদ—"কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমি তো বড়লোক নই!"

"হ্যাঁ—প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল—কিন্তু পরে ভেতরের কথা সব জানতে পারলুম। আমাদের কাজ কতটা দায়িত্বপূর্ণ জানো? তাই যেখানে থাকতে হবে সেখানকার নাড়িনক্ষত্রের সংবাদ নেবার ব্যবস্থাও সঙ্গে রাখতে হয়। সেই সূত্রে তোমার সম্বন্ধে সব খবর নেওয়া তেমন কঠিন হয়নি। কতদূর সত্যি আমি না কিন্তু এখানকার মিলের মালিকদের ধারণা তুমি তাঁদের কর্ম্মীদের বিগড়ে দেবার চেষ্টায় আছ, তোমারি সাহায্যে তারা দল বাঁধছে। এটি হ'লে তাঁদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত লাগবে। তাই কলকাতার একটি বড় দলের সাহায্যে তাঁরা তাদের বাধা অর্থাৎ তোমাকে, সরিয়ে ফেলতে চান। আরও জানা গেল যে তোমাদের চেয়ারম্যানও এঁদের সঙ্গে বিশেষ খাতির রাখেন, এক রকম হাতের লোকও বলা যায়—তাই তোমার বিরুদ্ধে কিছু করার তেমন কোনো অসুবিধে নেই।"

বিনোদ বললে—"কোনো অন্যায় কাজ জেনে-শুনে না করলেও এই রকম একটা আভাষ আমিও পেয়েছি Sir কিন্তু আমি ভাবছি, তাদের খুন করাও আটকায় না তখন শক্রতা কি—আর এতদিন করেনিই বা কেন?"

সাহেব বললে—"এঁরা অন্য উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হলে চট্ করে অতটা করতে চাননা। ওতে জানাজানি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। আর বলতুম তো—তোমাদের

আপিসের মালিক হাতে থাকায়—সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়ে গেছে।"

বিনোদ—"আমার অদৃষ্টে যা হয় হবে, মাণিকের কেনো ভয় নেইতো?"

"তা নেই, কিন্তু তোমাদের কারও এখানে থাকা আর উচিত বোধ হয় না। আর তুমি যে অদৃষ্টের কথা কইলে—হতে পারে তা ঠিক। কিন্তু যতক্ষণ সংসারে ও কাজে থাকা, ততক্ষণ সেটা অর্বাচীন কথা। মানুষের সাধ্যমত সাবধান হয়ে থাকতে চেষ্টা করাই উচিত। মানুষ বুদ্ধি পেয়েছে ব্যবহারের জন্য। রোগে লোক ডাক্তার খোঁজে কেন? তোমার ও কথা সর্ব্বত্যাগীর জন্য।"

"আপনার কথাই ঠিক। মাণিকের কথাই ভাবছিলুম—হঁস ছিল না—ক্ষমা করবেন। আর একটা কথাও আমাকে বিচলিত করে রেখেছে। ওই যুধিষ্ঠির লোকটাকে বুঝতে পারছি না। তার কাজ আর ব্যবহার দেখে তার সম্বন্ধে কিছু ঠিক করতে পারি না। ছয়ে মিল পাই না—। শুনেছি যে কারণেই হোক সে আমার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা সম্মান রাখে। অতটা কেবল তার মাছের কারবারের সুবিধের জন্যে হতে পারে না—এই আমার ধারণা। তারপর হঠাৎ একদিন তারি মুখে তার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব কথা সে আমাকে স্পষ্টাস্পষ্টি শোনায়—আমি বারবার নিষেধ করলেও থামে না, তা শুনে আমি শিউরে গেছি—ভয় পেয়েছি। তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না—মহা সন্দেহে পড়ে গেছি। সে সব তো আমাকে বলবার কথা নয়, আমাকে সে বলে কেন, উদ্দেশ্য কি? তাই তার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি।"

সাহেব বললেন—"আমি ও লোকটিকে আমার দরকারের মতই জানি। সে ওই ভয়ঙ্কর দলের একজন বিশ্বাসী এজেন্ট। তোমার সম্বন্ধে ভীষণ একটা ভারপ্রাপ্ত লোক। এমনো তো হ'তে পারে যে এ দলে থেকেও লোকটি একটু অন্য ধাতের। তোমার সংস্পর্শে এসে এত বড় গর্হিত কাজটা করতে ইতস্ততঃ করছে—অথচ দলের নিয়মের বিরুদ্ধে সে কথা বলতেও পারছে না তাই সময় নিচ্ছে। পরে কি করবে জানি না, তাই তোমাদের এখান থেকে সত্বর সরানোই আমার উদ্দেশ্য। আর যে কদিন এখানে থাকবে মিলের কারো সঙ্গে দেখা শোনা না করাই ভাল। যুধিষ্ঠির যে দলের এজেন্ট সে দলকে সবাই ভয় করে। মিলের দিকেই আর যেওনা।"

"আপনি যখন নিষেধ করছেন—আর যাব না।"

"আচ্ছা আজ তবে ওঠা যাক্। Good night doctor."

একটা ভাঙ্গা দাঁত

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

বেশ ছবাস ধরে আমার একটা পাশের দাঁত নড়ছিল, আজ সেটা পড়ে গেল। এর আগে আমার আর কোন দাঁত পড়েনি, এইটিই প্রথম, তাই মন কেমন করছে। ছত্রিশ বছরের সঙ্গীটিকে আজ আমি হারালুম!

কচি বয়সের দাঁতগুলি একটার পর একটা প্রকাশিত হয়ে যখন সবাকে কি পরিমাণ কৌতূহল ও আনন্দের হিল্লোল তুলেছিল, তার কথা আমার পরিষ্কার ভাবে মনে নেই, অবশ্য মনে রাখবার মত বয়সও সেটা নয়, তবে একথাটা মনে আছে যে কচি দাঁতগুলি একটির পর একটি অন্তর্হিত হবার সময় কিন্তু আমার অশেষ লজ্জা ও দুশ্চিন্তার হাতে ফেলে গেছে। পরিপাটী ভাবে সজ্জিত দন্তরাজির মধ্যে থেকে সামনের একটা যখন পড়ে গেল, তখন লজ্জায় যেন কথা বলতে পারি না, ফাঁকাটা যেন হাঁ করে তার অনুপস্থিতি ঘোষণা করে আমার মুখিলে

দাঁতের যত্ন অবশ্য আমি বরাবরই নিয়েছি, যদিও আমার দাঁত সম্পূর্ণ

রোগমুক্ত নয়। বাল্যকালের সামান্য অবহেলায় একবার দাঁত খারাপ হলে তাকে সম্পূর্ণভাবে সারান যথেষ্ট শক্ত, এ কথা বেশী বয়সে বেশে অনুতপ্ত হয়েছি। হয়তো সেইজন্যে আমার মাত্র এই ত্রিশ বছর বয়সে দাঁতটা পড়ে গেল, নাহলে কে বলতে পারে, চল্লিশ পর্যন্ত সেটি আমার মুখ গহ্বরকে উজ্জ্বল, উচ্চারণকে সুস্পষ্ট, হাসিকে বেশবাস, তথা পরিপাকশক্তিকে প্রখর করতে পারত।

এমন সুন্দর ও এত প্রয়োজনীয় যে দাঁত, তার সম্বন্ধে আমরা যে যথেষ্ট অনুরাগ দেখাই না, সে কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বেশী বয়স পর্যন্ত পরিষ্কার এবং শক্ত রাখলে মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধন করছে, এ সব ছেলেই অনুমত। যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের এত ব্যাকুলতা, তাদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুকে বাদ দিয়ে অপর কোনটির চেয়ে দাঁতের স্থান নীচে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রামের মত দাঁত যে মর্য্যাদা পায়নি, তার কারণ বোধ হয় ইন্দ্রিয়রা শরীরের অংশ হিসেবে জন্মলাভ করে এবং প্রচণ্ড আঘাত বা কঠিন কোন অসুখের হাতে না পড়লে শরীরের সঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, সে পঞ্চাশ বৎসরেই হোক, বা সত্তর বৎসরেই হোক; কিন্তু দাঁতের উৎপত্তি হয় জন্মলাভের পাঁচ মাস পরে এবং স্থিতিকালও সুদীর্ঘ নয়, প্রৌঢ়ত্ব আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটির পর একটি সরতে থাকে, বার্দ্ধক্যে একেবারে মুখবিবর শূন্য করে দিয়ে চলে যায়।

চলে যায় ভুলেই কি তাকে যথেষ্ট অনুরাগ দেখান হবে না, অন্যোপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হবে না? দাঁত—সে কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কারুর চেয়ে মুখমণ্ডলের কম শোভা বৃদ্ধি করে, বা কারুর চেয়ে কম প্রয়োজনীয়?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে কোন বিষয়ে সার্থকতা বা অসার্থকতা প্রকাশ করতে গেলে ইন্দ্রিয়গুলের দশন-সহযোগিতা প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ চক্ষুর কথাই ধরা যাক। যে কোন সুন্দর দৃশ্য নয়নসম্মুখে উপস্থিত হলে সহাস্য-আনন বদনরাজিকে প্রকাশিত করে প্রশংসা জানায়। যখন মৃদু আলোকিত নির্জন কক্ষে প্রণয়িনী ধীরপদে প্রণয়ের প্রথম এড়িয়ে প্রিয়তমের পাশে এসে দাঁড়ায়, সে তখনও চকিতকর দর্শনের পূর্বক দশনশ্রেণীকেই প্রকাশ করতে হয় সর্বপ্রথম; মুখে ভাষা না থাকলেও বাধা আসে না, কারণ দর্শন ও দশন একসঙ্গে মিলে অনুচ্চারিত কাব্য সৃষ্টি করে। আবার যখন বেদনাকর দৃশ্য দেখে আত্মহারা হবার উপক্রম হয়, তখন দাঁতে দাঁতে চেপে কষ্ট সহ্য করতে হয়; অবমাননাকর ব্যাপার দেখে যখন রাগে শরীর জ্বলতে থাকে, তখন দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ধৈর্য রক্ষা করতে হয়, এবং সময় সময় নিজ কামড় দিয়ে প্রত্যুত্তরে কটুভাষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

প্রবণেন্দ্রিয় নয়নের মত একই অবস্থা, ছায়ানুসারী লক্ষ্মণ ভাইটির মত দশনকে সকল সময়েই চাই। আনন্দধ্বনি এসে কানে স্পর্শ করা মাত্র শরীরের অন্য কোন অংশের আগে দন্তরাজি বিকশিত হয়ে স্বাগত জানাবে। আবার দাঁতের কোন অসুস্থতার প্রথম যে কতটা আর্তবোধ করে, তা তো সর্বজনবিদিত ব্যাপার।

জিহ্বার তো রসনামের জন্যে ব্যাকুলতার সীমা নেই, সে ব্যাকুলতার তুলনা দিতে গেলে একমাত্র মায়ের সুস্বাদের প্রতি স্নেহের কথা বলতে হয়। এত বড় নিবিড় আত্মীয়তা বড় একটা দেখা যায় না। বিরত পাশে কেউও বসে নেই, কারণে অকারণে দাঁতগুলির বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে দেখছে, ঠিক আছে কিনা, সামান্য একটু ব্যথা হলে কি অস্থিরতা। আবার দাঁত যখন কাজ করে, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য চর্বণ করে, তখনও খাদ্যগুলোকে বিভিন্ন দাঁতের কাছে কর্তব্য চর্বণের জন্যে এগিয়ে দিয়ে কাজকে সহজ করে দেবার জন্যে কি চঞ্চলতা! শিশুরা যেমন ভুল করে মাতৃস্তন কামড়ে দিলে বা কিছু মনে করেন না, তেমনি দন্তরাজ অসাবধানতায় জিহ্বাকে কামড়ে দিলেও জিহ্বা কিছু মনে করে না, পূর্বের মত সহযোগে তার কাজ করে যেতে থাকে, পরজগতের প্রায় সব কিছুই তো দাঁতের ও জিহ্বার ঠিক অধিকারে। বাক্যের সুস্পষ্ট উচ্চারণের জন্যে দাঁতের যে কি প্রয়োজন, তা বলার দরকার হয় না। যে চিত্তমোহন অনিন্দ্যসুন্দর হাসি শোভার জন্যে মন এত চঞ্চল হয়, তার এক প্রধান উৎস তো সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি। তাই বেশী বয়সে যখন মুখবিবর খালি করে দিয়ে দাঁতগুলি চলে যায়, তখন মুখমণ্ডলের হয় এক মস্ত বড় ক্ষতি এবং জিহ্বার অবস্থা হয় সবচেয়ে মর্মান্তিক। পরমাত্মীয়বিয়োগবিধুর জিহ্বা তখন মুখাভ্যন্তরে মাথা কুটে মরতে থাকে, তার উচ্চারিত কথাগুলি তখন হয়ে দাঁড়ায় বিকৃত; যার কথা শোনবার জন্যে সহস্র লোক ব্যগ্র হয়েছে একদিন, আজ তার কাছে একটি লোকও আসে না।

নাসিকা ও ত্বকের ব্যাপারও প্রায় একই রকম। আস্বাদে ও বিরাজনে, অধিকাংশ সময়েই দাঁতের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এমন যে দাঁত, তা একটির পর একটি খসিত হয়ে পড়ে কপোলদ্বয়কে করবে কুঞ্চিত, অধর ও ওষ্ঠকে করবে লোল, এ কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। কৃত্রিম বস্তু পরে যা পোকমাড়ি ঢেকে তো সে অভাবটা দূর করা যায় না, হয় তো কিছুটা ঢাকা যায়, তাছাড়া কৃত্রিম বস্তুটা অনেকটা মৃতত্ত্ব তরুণী ভার্য্যার মত, কিছুতেই ভাল করে সাপ খায় না। যতই যত্ন দিয়ে রাখা যাক না কেন, ঐকান্তিকতা পাওয়া যায় না।

তাম্বূলরসবাহিনী আজকাল না থাকলেও মুখুয্যেদের খানদানী রক্ষার জন্যে এক আধটা পান মাঝে মাঝে খেতে হয়। তাতে অধর, ওষ্ঠ এবং তার সঙ্গে দন্তরাজকে রঞ্জিত করে জিভেদের কতটা ভাল দেখায় বলা শক্ত; তবে শ্রীমতীদের, যাঁদের দাঁতগুলি ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র—তাঁদের মাঝে মাঝে পান খেলে মন্দ দেখায় না কিন্তু, মন্থকচিকৌমুদী তখন জবাকুসুমসঙ্কাশ হয়ে মনকে মাতিয়ে তোলে।

তবে তার অত্যধিকটা ভাল নয়, তাম্বূলবিলাস মাত্রাতিরিক্তে দাঁড়ালে দাঁতগুলির যে রূপ দাঁড়ায়, তা দেখে কারুরই উৎসাহ বোধ হয় না, তা

সে ধন্যবাদ ইন্দ্রজীৎ কখন মুখমণ্ডলেই বিরাজ করুক, বা ইন্দ্রাণীর মুখমণ্ডলেই অবস্থান করুক।

যে দেশে নিত্য এত কান্না, এত শিল্প, এত আর্ট, তার তো এক প্রধান পরিচয়ই হল সুন্দর মুখের। গাঁয়ে পড়তে সুরু করলেই এই জন্যে মানুষ ভয় পায়, তার কাছে বেঁষতে চায়না, মুখে মুখে আলাপ, চুম্বন, আদর—সমস্তকে বিসর্জন করে যেবে বস্তুহীনতা, তাহলে তার আসবার কথা বইকি।

তাইতো, ছোক একটা পাপের দাঁত, তাহলেও এত অসময়ে পড়ে গেল! মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কবিয়া বেখছি, দাঁতকে শুধু শুধু মুক্তার পাঁতি বলেনি।

স্ত্রী-সঙ্কট

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী এম-এ

বিবাহের সাত আট দিন পরে কথা হইতেছে।

সুব্রত কি একটা কাজে শোবার ঘরে ঢুকিয়াছিল। নববধূ গীতা খাটের ওপর বসিয়া একখানা বাংলা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতেছিল, সুব্রত আসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—শোন—

সুব্রত মুখে একটু মিষ্টি হাসি টানিয়া বলিল, কি বলছো?

—মনে কিছু করবে না ত?

—না না মনে করবার কি আছে? বলোই না—

গীতা খাটের উপর পুনরায় বসিয়া বলিল, তুমি গোঁফ রাখো কেন বলো ত?

এ প্রশ্নের জন্য সুব্রত মোটেই প্রস্তুত ছিল না—কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল।

গীতার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, তোমাকে গোঁফ মোটেই মানায় না। গোল মুখে clean shaveই ভাল।

সুব্রত অনেকটা সামলাইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিয়াছে সে। এ সব প্রশ্ন উঠিবারই কথা—বিব্রত হইবার কি আছে? তবু একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, এমনি—গোঁফ ওঠা অবধি রেখেই চলেছি—বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তার পর হাসিয়া বলিল, কেন? সকলে ত ভালোই বলে। গোল মুখে সরু গোঁফের রেখা মন্দ কি!

গীতা এবার গম্ভীর হইল, কিন্তু দমিল না। সকলকে নিয়ে ত আর সংসার করবে না? আমার যা ভাল লাগে তাই করা উচিত—তবে আর ভালোবাসা কি? গোঁফওয়ালা পুরুষকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

সুব্রতের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। স্নান করিয়া সদ্য-ভিজা চুলে গীতাকে চমৎকার মানাইয়াছে। কমলালেবু রংএর সাড়ী, তার উপর কর্সা মুখে কুঙ্কুমের টিপ। একটা মিষ্টি গন্ধ ঘরটাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। সে কাছে সরিয়া আসিয়া গীতার একখানা হাত টানিয়া লইল।

রাগ করলে গীতা? তোমার সামান্য ভালোবাসা পেলেও যে আমি ধন্য হব। গোঁফের কথা কি বলছো? আমাকে তৈরী করবার সম্পূর্ণ ভার ত তোমার।

গীতার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখা দিল।

—তবে আজ বিকেল থেকেই—

—বেশ—তথাস্তু। হাতখানা জোরে নাড়িয়া সুব্রত হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। বন্ধুরা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিয়া আছে।

বিকেল বেলা সত্যই সে গোঁফ কামাইয়া ফেলিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া ভালো লাগিল না। কেমন ছাড়া ছাড়া দেখাইতেছে। এতদিনের একটা সংস্কার—মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে গীতার হাসিভরা মুখ কল্পনা করিয়া সমস্ত দ্বিধা দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিল। দুই একদিন পরেই ঠিক হইয়া যাইবে। প্রথম প্রথম একটু অদ্ভুত লাগিবে বৈ কি! ঘর হইতে বাহির হইতেই বারান্দায় বাবার সঙ্গে দেখা। তিনিও তাহার খোঁজে এই দিকে আসিতেছিলেন। নরেশবাবু রাশভারী প্রকৃতির লোক। বেশী কথাবার্তা বলেন না।

—এই যে। তোমার খোঁজেই এলাম। তুমি এম-এ পাশ করেছো। সুবিমল কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করেছে—এই নাও। দেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছ।

সুব্রত টেলিগ্রামটা লইয়া বাবাকে প্রণাম করিল। মুখ তুলিতেই নরেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

এ কি? মুখখানাকে বাঁদরের মত করে ফেলেছ দেখছি। পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না কি? না, মডার্ণ ফ্যাশন?

সুব্রত লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কি একটা বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো। পরামর্শ আছে। বলিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

এম-এ পাশের সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইল। এই উপলক্ষে বাড়ীতে বন্ধুদের একটি ভোজের ব্যবস্থাও হইল। সুব্রতের গোঁফ কামানোর আলোচনা প্রধান বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। অনেকে বলিল, রীতিমত ট্রেণ্ড। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

সুব্রত সমস্ত বিদ্রূপ হাসিমুখেই গ্রহণ করিল, বরং ট্রেণ্ড কথাটাতে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। এই ত ভালোবাসা। সে জগৎকে দেখাইবে ভালোবাসার স্বরূপ কি? সম্রাট সাজাহানকে পরাজিত করিবে সে।

রাত্রে গীতাকে সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপের কথা শুনাইয়া গর্ব্বভরে বলিল—যে যাই বলুক—আমি কাউকে কেয়ার করি না। তুমি, আমি ব্যস! তারপর একটু থামিয়া বলিল, সকলের ঈর্ষা হয়, বুঝলে গীতা? তোমাকে যে এতটা ভালোবাসি তা যেন ওদের সহ্য হয় না। আমি একশোবার ট্রেণ্ড—কার কি?

গীতা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, ট্রেণ্ড পুরুষকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে।

আরও কয়েকদিন পরে। সুব্রত কোথায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল—গীতা ঘরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, ক'দিন থেকে একটা কথা বলবো ভাবছি—

সুব্রত জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাইল।

তুমি 'আণ্ডারওয়্যার' ব্যবহার কর না কেন বল ত?

সুব্রতের চোখের সামনে নরেশবাবুর গম্ভীর মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। তবু একটা জবাব দিতে হইবে। বিদুষী পত্নীকে এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই। বলিল, অভ্যেস নেই কোনদিন। আর তা ছাড়া বাবা এ সব বিশেষ পছন্দ করেন না। বাধ্য হইয়া এবার পিতার উল্লেখ করিতে হইল—কেন না 'আণ্ডার-ওয়ার' গোরু নয়, ইহা বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। এই সব বাবুয়ানী নরেশবাবুর দু' চক্ষের বিষ।

গীতা স্নেহের সহিত বলিল, অত পিতৃভক্ত হলে পাড়াগেঁয়ে ভূতকে বিয়ে করা উচিত ছিল তোমার। ভদ্রসমাজে মিশতে হলে তাদের আদব-কায়দা শেখা উচিত। আজকাল বোপায়াও আণ্ডার-ওয়ার পরে—

সুব্রতের নিকট যুক্তিগুলো অসঙ্গত মনে হইল না। সত্যই ত! তার বাবার অত্যন্ত অন্যায়। বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়া এই সব শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গেলে চলিবে কেন? গীতাকে বলিল, বাবা যা ইচ্ছে বলুক। আমি শীগ্‌গীরই আণ্ডার-ওয়ার করাচ্ছি।

সুব্রতর একমাত্র ভরসাস্থল মা। মাকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল।

—আজকাল সব ছেলেই পরে মা। এটা দোষের কিছুই নয়।

মা বলিলেন, বুঝি তো সব—কিন্তু ওঁর কাছে ত যুক্তি খাটবে না। জানিস ত সবই। পরে পুত্রের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কথাটা পেড়ে দেখবো।

বিকালবেলা সুযোগমত তিনি স্বামীর নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন।

শুনিয়া নরেশবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

—তখনই বলেছিলুম, এ বিয়ের ফল ভাল হবে না। বিয়ের পর থেকে এই সব সুরু হয়েছে। ওকে তুমি শিক্ষিতা মেয়ে বল? যতো সব—

সুনীতি দেবী কহিলেন, অথবা বৌমার দোষ দিচ্ছ কেন? আজকালকার ছেলে সবাইকে ওই সব পরতে দেখেছে। বন্ধুরা হয়ত এই নিয়ে ঠাট্টা করে থাকবে।

নরেশবাবুর মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। ইচ্ছে হয়, নিজে রোজগার করে ও-সব ফ্যাশন করুক।

ইহার উপর কথা চলে না। সুনীতি দেবী আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কথাটা গীতার কানে গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা! স্বামী বেকার এ দুঃখ রাখিবার তার স্থান কোথায়? লজ্জায় অভিমানে তার চোখ দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। সুব্রতকে ডাকিয়া তীব্র ভৎর্সনার সুরে কহিল, পুরুষ মানুষ বলে আর পরিচয় দিও না। এত বড় ছেলে—এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই। এ সব লোককে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে। স্বামী না ছাই……

কথাগুলি সুব্রতের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। প্রত্যুত্তরে সে একটি কথাও বলিল না।

ইন্দ্রাণী রায় গীতার সহপাঠিনী—কলিকাতায় এক সঙ্গে আই-এ পড়িত। গীতার অন্তরঙ্গ বান্ধবী সে। অনেকদিন তার খবর পায় নাই। বিবাহের সময় সেই শেষ দেখা হইয়াছিল। হঠাৎ সেদিন ইন্দ্রাণীর একখানা চিঠি পাইয়া সে রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ইন্দ্রাণী লিখিয়াছে—

গীতা! কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য আমরা কিছুদিন হ'ল সকলে কাশীতে এসেছি। এখন এখানেই থাকা হবে। এসে অবধি নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সময় করে তোর খোঁজ করে উঠতে পারিনি, কিছু মনে করিস না। একটা মজা হয়েছে। আমি প্রাইভেটে বি-এ দেবো ঠিক করেছি। একজন প্রাইভেট টিউটরের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। কালকে সুব্রতবাবু 'ইণ্টারভিউতে' এসে হাজির! দু'জনেই অবাক। তিনি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করছিলেন, তাঁর সেই অবস্থা তাই খুবই উপভোগ্য। যা হোক অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। সন্ধ্যার পর একটু করে তিনি পড়াবেন। অনেক ভাগ্যে জোটে ভাই—তুই যেন হিংসে করিস না।

ইন্দ্রাণী।

চিঠিখানা পড়িয়া গীতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সুব্রত এ কথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছে। টিউশনি অনেকেই করে ইহাতে লজ্জার কি আছে? বিশেষ তাহারই অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবরটা তাহাকে দিতে সুব্রতর এত সঙ্কোচ কিসের? পরশুদিন সুব্রত দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল—রাত্রে 'কিদে নেই' বলিয়া খায় নাই। অথচ পরশু দিনই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সে দেখা করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ওখান হইতেই আহার সমাধা করিয়া আসিয়াছে। সুব্রতের এতখানি সাহস দেখিয়া গীতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার বোঝাপড়া সে করিবে। সুব্রত যে তাহার উপর টেক্কা দিবে ইহা তাহার অসহ্য মনে হইল। সে চায় তাহার স্বামী তাহারই একান্ত অনুগত থাকিবে। শিক্ষিতা মেয়ে সে—নিজের স্বামীকে করায়ত্ত করিতে পারিবে না?

রাত্রে সুব্রতকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, বাবার কথায় রোজগারের দিকে মন দেওয়া হয়েছে দেখছি, ভাল। এ কথা আমাকে বল্লে কি খেয়ে ফেলতাম?

সুব্রত চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে বুঝিল ধরা পড়িয়াছে, আর গোপন করিয়া লাভ নাই। সহজভাবে কহিল, বলবার মত বিশেষ কিছুই নয়, তাই বলিনি।

তারপর একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।—রোজগার যে বাবার জন্য করছি না, এটা বোধ হয় সকলের জানা আছে।

গীতা ঝাঁঝের সহিত বলিল, আমার বন্ধুর কথা গোপন করাকে আমি দোষাবহই মনে করি। অন্য কোথাও হলে—বয়ে গেছে আমার জিজ্ঞেস করতে—

সুব্রত বলিল, অপরাধ স্বীকার করছি। ঘুম পেয়েছে, বিরক্ত না করলেই সুখী হব।

এতখানি তাচ্ছিল্য? গীতা জ্বলিয়া উঠিল।

ওঃ—আমি কথা বল্লেই আজকাল বিরক্ত লাগে। তা ত লাগবেই—সুব্রত মুচকি হাসিয়া নিঃশব্দে কথাগুলি হজম করিল। তার এই নীরব উপেক্ষা গীতাকে অধিকতর দহন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। স্বামীর সান্নিধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সুব্রতর তখন মৃদু নাসিকা গর্জ্জন শোনা যাইতেছে।

পরদিন সুব্রত রীতিমত গম্ভীর হইয়া উঠিল। গীতাও সুব্রতকে এড়াইয়া চলিল। সমস্তদিন স্বামী স্ত্রীতে একটিও কথা হইল না। বিকালে মায়ের অনুরোধে গীতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—রাত্রে সুব্রত ভাত খাইবে না পরোটা

খাইবে। উত্তরে সুব্রত বলিয়াছিল রাত্রে খাইবে না, বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণের কথায় গীতার নীরব থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্নেহের সহিত বলিয়া উঠিল, ইন্দ্রাণীর বাড়ীতে বুঝি? সে কথা বল্লেই হয়, অত চং কেন?

সুব্রত বলিল, অত খোঁজের ত দরকার কাজ দেখিনে—রাত্রে খাব না—ব্যস।

গীতা বলিল, দেখো—অত অহঙ্কার থাকলে হয়। একবার যখন কথা আরম্ভ হইয়াছে তখন আর নীরবতা চলে না। গীতা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, কালকে 'আওার-ওয়ার' কেনা হয়েছে দেখছি। এক কৌটা "কিউটিক্যুরাও" এনেছে। আজকাল সাজ-সজ্জার দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

সুব্রত উত্তরে কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর উপেক্ষার অজ্ঞাতে গীতার চোখে জল দেখা দিল। সুব্রতকে করায়ত্ত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প কোথায় অন্তর্হিত হইল—সে নিজেই টের পাইল না।

কয়েকদিন এইরূপ মনকষাকষি চলিল। হঠাৎ সেদিন গীতা সুব্রতকে ধরিয়া বসিল—আজ পড়াইতে যাইবার সময় সে তাহার সঙ্গে যাইবে। অনেকদিন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হয় নাই, বন্ধুর জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইত্যাদি। সুব্রত প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—না না তুমি যাবে কেন? ওঁকেই একদিন নিয়ে আসবো। তা ছাড়া ওঁরা একদিনও এলেন না, তুমি গেলে বাবা হয়ত মনে কিছু করবেন। গীতা কোনও ওজর আপত্তি শুনিল না। সে আজ যাইবেই। অগত্যা সুব্রতকে রাজী হইতে হইল।

ইন্দ্রাণী গীতাকে দেখিয়া খুব খুশী হইল। সুব্রতের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল, আজকে আমার ছুটি—বুঝলেন তো? অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়েছি সহজে ছাড়বো না।

সুব্রতও প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিল, বেশতো! যতক্ষণ ইচ্ছে বন্ধুকে আটকে রাখুন। আমি তবে একটু ঘুরে আসি।

বাঃ—বেশ লোক তো আপনি। চা না খেয়েই যাবেন? আমি আজ নিজে হাতে 'আলুর খাসিয়া কাবাব' করেছি।

বাইরের ঘরে একটু বসুন, এক্ষুণি নিয়ে আসছি—বলিয়া দেহের লীলায়িত ভঙ্গী তুলিয়া ইন্দ্রাণী গীতার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে প্রস্থান করিল।

সুব্রত গিয়া বৈঠকখানায় বসিল। কিছুক্ষণ পরে গীতা ও ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিল। ইন্দ্রাণীর হাতে খাবারের থালা ও পিছনে চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। চা' ও জলযোগের পর্ব্ব একঘণ্টা ধরিয়া চলিল। ইন্দ্রাণী যেন চোখে মুখে কথা কয়। গীতা লক্ষ্য করিল, ইন্দ্রাণী পূর্ব্বাপেক্ষা প্রগলভা হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিল, বেশীর ভাগই সুব্রতর কথা। সে কি কি খাইতে ভালোবাসে—ইংরাজীতে তার কি অসাধারণ জ্ঞান, রাত্রে প্রায়ই ইন্দ্রাণী তাকে খাওয়াইয়া ছাড়ে। যেদিন পড়িতে ভাল না লাগে দু'জনে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথার মাঝখানে সুব্রত প্রায়ই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল। ইহাও গীতার লক্ষ্য এড়াইল না।

ইন্দ্রাণীর বাড়ী হইতে গীতা যেন নতুন মানুষ হইয়া ফিরিল। সে রাত্রে হাসি-খুশীতে সে অত্যধিক উচ্ছল হইয়া উঠিল। সুব্রতের তাহা খারাপ লাগে নাই—তবু যেন কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হইল।

ইহার পর হইতে গীতার আকস্মিক পরিবর্ত্তন সুব্রতকে রীতিমত অবাক করিয়া তুলিল। নরেশবাবুর মতামত, আচার ব্যবহার পূর্ব্বে গীতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। আজকাল তাঁহার প্রশংসা গীতার মুখে লাগিয়াই আছে। শিক্ষিতা মেয়ের পটের বিবি সাজিয়া নভেল পড়াকে নরেশবাবু আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। গীতা সাবান পাউডারের ব্যবহার কমাইয়া দিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্বশুরের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। নরেশবাবু মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেন। এতদিনে বৌমার সুবুদ্ধি হইয়াছে তাহা হইলে। তিনি যা ভাবিয়াছিলেন তা নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল সুব্রত।

গীতা আজকাল তারই সাজ-সজ্জার দিকে অত্যধিক কটাক্ষ করে। দেশের যা অবস্থা—লোকে খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, তুমি কোন আক্কেলে পাউডার স্নো মাখো বলো ত?

কথাগুলি অযৌক্তিক নয়, আর গীতা যেরূপ জোরের

সঙ্গে বলিত তা উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। সুব্রত বাধ্য হইয়া পাউডার ছাড়িয়া দিল। কিছুদিন হইল সে সেলুনে চুল কাটা আরম্ভ করিয়াছিল। গীতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—যেখানে দু' আনায় ভদ্রতা রক্ষা চলে, সেখানে অনর্থক ছয় আনা খরচ করে দেশের তুমি কি উপকারটা করছো? এই দু'আনা আজকাল এক একটা ফ্যামিলির বাজার খরচ জানো?

সুব্রত লজ্জায় সে মাসে নাপিত ডাকিয়া চুল কাটিল।

কলিকাতা হইতে কি একটা কর্ম্ম উপলক্ষে সুব্রতের এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে দু'দিন থাকিবে। ছেলেটির নাম কনক—কংগ্রেসের সভ্য। দু' তিনবার জেল খাটিয়াছে। গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা—চুল ছোট করিয়া ছাটা, সর্ব্বদা খদ্দর পরিধান করে। ছেলেটির কোনরূপ বিলাসিতা নাই। তার সরলতায় নরেশবাবু খুব খুশী হইলেন। সুব্রতর সামনে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই সব ছেলেই ত দেশের রত্ন। নিজের দেশকে যারা ভালোবাসে, বিলাসিতাকে যারা পাপ বলে গ্রহণ করে—তারাই ত ভবিষ্যত জাতি গঠনের অগ্রদূত। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক!

কনক হেঁট হইয়া নরেশবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সুব্রত সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। একটা কাজের ছুতা করিয়া সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিল।

রাত্রে গীতাও কনকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। তোমার বন্ধুটি চমৎকার! খদ্দরের ড্রেসেও কি সুন্দর মানিয়েছে—না? এ রকম simple ছেলে আমার বেশ লাগে।

সুব্রত সংক্ষেপে বলিল, হুঁ।

গীতা বলিল, 'আণ্ডার-ওয়ার' পরলে যেন ডেঁপো ডেঁপো লাগে। ও সব বিলেতী ঢং আমাদের দেশে মোটেই মানায় না—না?

সুব্রত পুনরায় কহিল—হুঁ।

গীতা উৎসাহভরে বলিয়া চলিল, তা ছাড়া দেশের যা অবস্থা—ওটাও ত বাজে খরচ। ওই পয়সায় অনেক ফ্যামিলির—

কিছুদিন হইতে গীতার অত্যধিক দেশপ্রীতিতে সুব্রতের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াই ছিল, তাহার উপর আজ বন্ধুর সামনে পিতৃদেবের দেশানুরাগ তাহাকে বেশ উত্তপ্ত করিয়া দিয়াছে। অসহিষ্ণু হইয়া সে বলিয়া উঠিল, বেশ! আণ্ডার-ওয়ার পরা কাল থেকেই ছেড়ে দেবো। কিন্তু গোঁফ আজ আমি রাখবো না। তাতে বোধ হয় কোন ফ্যামিলির ক্ষতি হবে না।

অন্ধকারে গীতার চোখে মুখে চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

অস্পৃশ্যতা নাই

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

পূর্ব্বে কাহারও পয়সা হইলে সে হয় কৃপণ হইত, নয় বর্ষার্থে বা প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিধ ক্রিয়া কর্ম্ম করিত। কৃপণ নিজেকে এবং পরিজনবর্গকে এত কষ্ট দেয় যে তাহাকে কেহ ঈর্ষা করে না করুণা ও ঘৃণা করে। সেকেলে বড়লোকেরা দোল দুর্গোৎসব, বিবিধ ব্রত, পুষ্করিণী খনন, প্রভৃতি করিয়া লোকের নানা উপকার সাধন করিত। বর্ত্তমানে তাহাদের বিলাসেই সকল টাকা ব্যয় হয় সাধারণের হিতের জন্য খরচ করিবার টাকা কোথায়? আরও বেশী পয়সা থাকিলে মসুরি হটে, পাহাড়ে বা সাঁওতাল পরগণায় বাটীর প্রয়োজন। মোটরকার রেডিও গ্রামোফোন ইত্যাদির প্রয়োজন। বর্ত্তমানে উইকএণ্ডেল—নলকূপ প্রভৃতি হওয়ায় লোকে নিজের জলের জন্য পুষ্করিণী কাটে না, যাহাতে আরও পাঁচ জনের উপকার হইত। টিনের ঘর হওয়ায় বার্ষিক তৃণপূর্ণ নির্ম্মাণকারীদিগের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কলত বিবিধ ইংরাজি বিলাস দেশে আসায় ভদ্রলোকেরা পূর্ব্বে ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে উপকার করিত তাহা বন্ধ হইয়াছে। মানুষের সহিত মানুষের পূর্ব্বে যে সকল মানবীয় সংস্পর্শ ঘটিত তাহা বন্ধ হইয়াছে।

এই মানবীয় সম্পর্ক কেমন করিয়া মানার সময় লোকের রক্ষাবিধান করে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্যালকাটা কেমিক্যালের বীরেন মৈত্রের আলিপুরের বাটীর একতলামাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মানার সময় তাহারা সেখানে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। দোতালার অসমাপ্ত অংশের একটি ঘরে জন ১০ মুসলমান রাজমিস্ত্রী বাস করিয়া বাটীর কাজ করিতেছিল। মানার দিন হিন্দুরা ইহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করে। বীরেনবাবু তাহাদের কাতর ক্রন্দনে করুণার্দ্র হইয়া অনেক কষ্টে আক্রমণকারীগণকে প্রথমে ফিরাইয়া দেন। পরে যখন বেশিক্ষণ তাহাদিগকে আর রাখা নিরাপদ নয়, তখন তিনি সন্ধ্যার পর সুযোগ পাইয়া মোটরগাড়ীর গরী আনাইয়া লোকগুলিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া

যেন। দ্বিতীয় গল্পটি আমার শোনা মাত্র। পার্ক সার্কাসের অনেক বাড়ী পুড়িয়া হইলেও এক বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ী পুড়িয়া হয় নাই। ভদ্রলোকটি লোকের উপকারী ছিলেন বলিয়া সেখানকার মুসলমানরাই তাঁহার বাড়ী রক্ষার ব্যবস্থা করে। এইরূপে হিন্দু মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলমান হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্ব্বে আমি হিন্দু-সমাজে যে সকল অনাচার অবস্থিতির কথা বলিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন আমি সমাজে সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। সমাজে যে সকল দোষ ঢুকিয়াছে তদ্বিষয়ে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। গরুর খরগোস রোগের মধ্যে মুখটি মাত্র লুকাইয়া সরীসৃপ চাকিয়াছি ভাবিয়া অব্যাহতি পায় নাই। এই দুর্দ্দিনে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দুই মহাপ্রভু পূর্ব্বে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের এক্ষণে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে।

দুই মহাপ্রভু :—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী ঘোষ মহাশয়—যিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের সুলেখক, ভাগবতের শ্রদ্ধাবান পাঠক এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত—যখন আমার নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিপক্ষে কয় কথা বলিলেন, তখন সত্যই আমি বিব্রত হইয়াছিলাম, এবং কিছুকাল ধরিয়া আমিও সংশয় চলিতেছিল। বাসার পর আমার সংশয় চলিয়া গিয়াছে এবং নিত্যানন্দের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। ভিক্ষার জন্য যে সকল বৈষ্ণব গান করিয়া বেড়ায়, তারা প্রথমে চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করে। কিন্তু তাহাদের ভক্তি ও ভালবাসার প্রধানকেন্দ্র নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ বড় দয়াল, কাঙ্গালের—পতিতের বন্ধু—এই তাহাদের গানের প্রধান ধুয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দুদিগের সংকটকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংকটেও আমাদের তাঁহারই নির্দ্দিষ্টমার্গ অনুসরণ করিতে হইবে। চৈতন্য মহাপ্রভু যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দপ্রভু তাহার প্রয়োগ দেখাইয়া ছিলেন। তিনি পতিত, তৎকালীন অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন—হিন্দু রাখিয়াছিলেন। তাই দেশে নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার প্রধানত হইয়াছিল। এই জন্যে এ জন্য হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ তত বেশী হয় নাই। পতিত জাতির প্রতি নিত্যানন্দ কত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহা বৈষ্ণব কবির এই দুই ছত্র কবিতা হইতে বুঝা যায়।

"কি কব নিত্যানন্দের জাতের পরিপাটি।
উদয় করত সোনার হেলে তার ফেলে দেয় কাটি।"

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বলেন :—

কারুণ্যে ভক্তি যাকুরে চৈতন্যগুণ বর্ণনে।
আমারা বদনে নাস্তি নিত্যানন্দ সম প্রভুঃ।

চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—

"মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন।" (চৈতন্য ভাগবত)

এক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ কিরূপ বর্ত্তমান কালোপযোগী তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়টি কথা লিখিব।

(১) কলিযুগে হরিনামই (ভগবানের নাম) শ্রেষ্ঠ সাধন।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

(২) ভক্তিমান চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ :—
"শুচি সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নিদগ্ধ দুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি মুনৈ শ্লাঘ্যো বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ।"

(৩) "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুই সমান।
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ।
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

আমার কথা শেষ হইবে পণ্ডিত মদনমোহন স্বীকার করিলেন বর্ত্তমানকালে প্রকৃতই অস্পৃশ্যতা নাই। নীচ জাতিদিগকে পূর্ণভাবে গলাচরণীয় করা উচিত। কথা প্রসঙ্গে আরও বাহির হইল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু—প্রথম জীবনে পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মোচিত আচার অবলম্বন করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি তপঃসিদ্ধ হইয়া মহাপৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। অনেক উচ্চবর্ণের লোক তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উচ্চবর্ণের শিষ্য বহু। তাঁহার নমশূদ্র শিষ্য অনেক আছে। ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শিষ্য সন্তোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারও উচ্চ নীচ (নমশূদ্রও তাঁহার মধ্যে) বহু শিষ্য হইয়াছে। নীচ জাতীয় এইসকল শিষ্যগণও উচ্চজাতীয়দিগের মত গুরুভ্রাতাগণের দ্বারা ব্যবহৃত হন।

তারাকিশোর চৌধুরী মহোদয় প্রথম বয়সে ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া নিজ পিতা কর্ত্তৃক পতিত বিবেচনায় তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র হইয়াছিলেন। ইনিও পরে কাটিয়া যাবার শিষ্য হইয়া তপঃসিদ্ধ হন। পরে সত্যানন্দ বাবাজী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য।

পরমহংসদেবেরও জন্মাদি উৎসব উপলক্ষে আহারাদির সময় কোনওরূপ জাতি বিচার করা হয় না।

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বেও শ্রীপাট বাগবাজারে বৈষ্ণব উৎসব উপলক্ষে দেখিয়াছি অবশ্য এ ব্যাপারে কোনওরূপ জাতিভেদ মানা হইত না। অবশ্য খুব নিষ্ঠাবান লোক কেহ কেহ ইহাতে যোগ দিতেন না।

আমাদিগকে মহাপ্রভুর পথাবলম্বন করিয়া সকল জাতিকেই হরিনাম (ভগবানের নাম) দিতে হইবে এবং নাম যাহারা গ্রহণ করে তাহারাই পবিত্র থাকিতে হইবে। অতএব নাম অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

অসংলগ্ন

শ্রীদীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(এক)

চৈত্রের দুপুর। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, টু শব্দটী পর্য্যন্ত নেই। আমার নিরালা পর্ণকুটীরে আমি নিঃসঙ্গ একা। বসে বসে শুধু ভাবছি আর লিখছি—লিখছি আর ভাবছি। হঠাৎ খুট্ করে শব্দ হ'ল। চেয়ে দেখি দ্বারপ্রান্তে একজন অপরিচিতা তরুণী। বয়স আঠার উনিশ হবে। সদ্যস্নাতা, এলায়িত কেশ, মুখমণ্ডলে প্রসাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পরণে একখানা নীল রংয়ের শাড়ী। রক্তিম অধরে মৃদু মৃদু হাসি। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীতে চঞ্চলতার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে কোন কাব্যের নায়িকা বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চেয়ে আছি তার মুখের পানে—সেও চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব, নির্ব্বাক্। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি যখন—দেখি সম্মতির অপেক্ষা না করে সে আমার শত ছিন্ন নোংরা বিছানার একাংশ অধিকার করে বসে আছে। আমি একেবারে অবাক্ বনে গেছি। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময়—

—মাফ্ করবেন, আপনার সম্মতি না নিয়েই অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি।—হেসে উঠলো সে।

—এতে মাফ্ চাইবার কি আছে বলুন? সরকারী বড়কর্ত্তার খাসকামরা যখন এটা নয়—নিছক সহায়সম্বল-হীন দরিদ্রের পর্ণকুটীর—তখন সেখানে প্রবেশনিষেধের প্রশ্ন নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

—ভরসা তো ওইখানে। আবার সে হেসে উঠলো।

—তা যাক্ সে সব কথা। দয়া করে আপনার পরিচয়টা—

—জানবেন বৈকি, নিশ্চয়ই জানবেন। তবে আগে আপনার তরফ থেকে কিছু—

—জানতে চান বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

—বলুন কি জানতে চান আপনি?

—সারাদিন বসে বসে কি লেখেন আপনি বলতে পারেন?

—আপনি কি করে জানলেন, আমি দিনরাত বসে বসে শুধু লিখি।

—জানি বৈকি। নিশ্চয়ই জানি। রোজ দেখি সারাদিন বসে বসে কি লেখেন, আর মাঝে মাঝে চিন্তামগ্ন হয়ে ভাবেন। আপনি কি সাহিত্যিক?

—না, মোটেই আমি সাহিত্যিক নই।

—তবে?

—তবে তেমন কিছু নয়। ওটা আমার একটা বাতিক।

—বলেন কি! সারাদিন ধরে লেখা আপনার বাতিক!

—আশ্চর্য্য হচ্ছেন নাকি?

—হচ্ছি, ভীষণ রকমের আশ্চর্য্য হচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর খানিকটা আনমনাভাবেই বলে—একটা কথা কি জানেন?

—বলুন।

—আপনাকে দেখে ঠিক আমার একযুগ আগেকার সেই সব স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে। উঃ, এখন সে সব স্বপ্ন বলেই মনে হয়। সহসা বলতে বলতে সে থেমে যায়। মুহূর্ত্তে তার মুখখানি বেদনায় ম্লান, অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরও তেমনি তার হতাশাব্যঞ্জক। কোন আঘাত বোধ করি সে পেয়েছে। কেমন যেন শরম ও শঙ্কায় তার চোখের আনত দৃষ্টি নুয়ে পড়ে মাটীতে। মনে হয় সে যেন তার কোন মহাসত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমিই যেন তার সে ইপ্সিত লক্ষ্য বস্তু। আমার মনেও তখন সংশয়, বিস্ময় সব একে একে জমা হচ্ছে। বুঝতে পারছি আমি।……কিন্তু থাক্ সে সব।

(দুই)

ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। ছোট বলতে মানে আমার ষোল সতের বছর বয়সের কথা বলছি। পান্না, বেণু, সুমিত্রা—এরা সবাই তখন আমার মনের মাঝে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রার কথাই বলি আগে—শোন তোমরা। ভাষণ একরোখা মেয়ে অর্থাৎ তেজস্বিনী যাকে বলে। ওঃ! সেবার আমাকে পুলিশের হাত থেকে জবর বাঁচা

বাঁচিয়েছিল, নইলে—বুঝতেই পারছ? ১৯৩০ সালের কথা বলছি। স্বদেশী ডাকাতি আর সায়েব মারার হিড়িকে দেশ তোলপাড়। ছেলেরা সব জীবন পণ করে লেগেছে দেশ উদ্ধারের কাজে। ভারতবর্ষ থেকে যেমন করেই হোক্ ইংরেজ শক্তিকে নির্মূল করতে হবে। সে কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক ভাঙা পণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সেই কৃচ্ছ সাধনা ধ্যান-মৌন গিরিরাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গের মত যেমন স্থির অটল, তেমনি শুভ্র গম্ভীর। আর কি। আমিও ভীড়ে গেছি ঐ দলে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন জীবনদা। পাণ্ডা কথাটাকে তোমরা তাচ্ছিল্যের সাথে হেসেই উড়িয়ে দিও না যেন। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে নায়ক। যেমন রাজপুত্রের মত দেখতে, শক্তিও তেমনি অসাধারণ। সাহসের কথা আর বলতে হবে না।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। দলের নির্মল এসে খবর দিল—নীলগঞ্জের পুলিশ সুপারকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে আজকের এই সুবর্ণ সুযোগ আদৌ হাতছাড়া করা উচিত নয়। শিকারী যেমন শিকার দেখলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, জীবনদাও তেমনি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললেন—'ইয়েস্—তাই হবে। শঙ্কর, বি রেডী কর লাইফ এণ্ড ডেথ্। প্রবোধকে তারা যে পথে পাঠিয়েছে আমরাও আজ তাকে সেই পথে পাঠাব।'

প্রবোধ ছিল দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী—জীবনদা'র প্রিয় শিষ্য। ভীষণ অনুগত ছিল। অমন তামাসোনার মত ছেলেটাকে ঐ ডেভিলটাই তো সেবার হলধী-বাড়ীর ডাকাতি কেসে গুলি করেছিল। ওঃ, সে কি বীভৎস দৃশ্য। গুলিটা প্রবোধের বুকে লেগেছিল কিনা। অনর্গল রক্ত ঝরছিল ক্ষত স্থান দিয়ে। একেবারে তাজা রক্ত। জীবনদা ওকে তাঁর বলিষ্ঠ দু বাহুর ওপর নিয়ে ছুটে চলেছেন। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে কালো মেঘ—গুরু গুরু ডাকছে—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গ্রামের পথ। উঁচু নীচু ঢিপি জঙ্গল আর কাঁটার বন। বুঝতেই পারছো ব্যাপারখানা কি। জীবনদা প্রাণপণে ছুটেছেন ওকে নিয়ে। অকস্মাৎ দিঘল গাঁয়ের নদীর বাঁকের কাছে এসে জীবনদার চলা থেমে গেল। চিরজীবনের মত সে ঘুমিয়ে পড়েছে জীবনদার কোলে। শ্রাবণের ধারা সুরু হয়েছে তখন জীবনদার দু চোখ বয়ে। তবে সে ঠাণ্ডা নয়—স্নেহমিশ্রিত তপ্ত অশ্রু। আমরা জীবনদার কাছে শুনেছি, প্রবোধের যাত্রাপথের শেষ কথা কয়টী নাকি ছিল—'জীবনদা, চল্লুম। আবার ফিরে এসে আমাদের কাজের শেষ দেখতে পাব তো? হ্যাঁ, আর একটী কথা। মাকে কিন্তু এসব কথা খোন জানিয়ো না। আঘাত সইতে পারবেন না তিনি। সারাটা জীবন ধরে শুধু তাঁকে কষ্টই দিয়ে গেলাম জীবনদা। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো—প্রবোধ ভালই আছে। দীগ্‌গীরই ফিরে আসবে।'

আসবে বৈ কি। আসবে। প্রবোধ আসবে। পান্না, বেণু, সুদিত্রা, নির্মল—এরা সবাই একদিন আসবে। হঠাৎ বাতায়ন পথে ভেসে এলো—'আসবে বৈ কি। তারা সবাই আসবে। কিন্তু যে পথে তারা একদিন এসেছিল সে পথে নয়—নূতন পথে।'

ধ্যানমগ্ন ছিলুম এতক্ষণ। চেয়ে দেখি সমস্ত প্রকৃতিটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। শুধু নিশীথের মুক্ত আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বল জ্বল করছে, আর দূরে—বহু দূরে 'চোখ গেল' পাখার করুণ বিলাপ ধ্বনি।

(তিন)

১৯৩৮ সাল। কর্মীরা সব জেল থেকে বেরিয়েছে, নতুন চিন্তা ধারা নিয়ে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো তারা অগণিত কৃষক মজুরের মাঝখানে। আমিও মিশে গেছি তাদের মাঝখানটায়। এবার আমাদের কাজের সুরু। গ্রামে ফিরেছি। সভা হবে—কৃষক সভা। হাজার হাজার কৃষক দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে আসছে দল বেঁধে আমার বক্তৃতা শুনতে। হাতে তাদের সর্ব্বহারার লাল পতাকা। বজ্রকণ্ঠে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে—'দুনিয়ার কৃষক মজদুর এক হও' 'ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক' 'জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। সভা আরম্ভ হ'ল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি—'কৃষক ভাই সব! কেন আজ তোমাদের এই অসহায় অবস্থা। খেতে পাচ্ছ না, পরতে পাচ্ছ না, মরতে বসেছ। চালে খড় নেই—গোয়ালে গরু নেই—গোলায় ধান নেই। হাল লাঙ্গলে সব মরচে ধরে গেছে। স্ত্রীপুত্রের ইজ্জৎ ঢাকবার মত এক ফালি কাপড় জুটছে না তোমাদের। কি ভয়াবহ অবস্থা!

রোজ সন্ধ্যে লাগতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে—তবুও এক ফোঁটা ওষুধ পাও না। রোগে ভুগে আজ তোমরা জীর্ণ শীর্ণ অস্থিকঙ্কালসার। ছেলেমেয়েরা চোখের ওপর মরে যাচ্ছে বিনা ওষুধে। অথচ কোন প্রতীকার নেই। জমিদার মহাজনের মোটা নজরানা থেকে সুরু করে তাদের মেয়ের বিয়ের টাকা, ঘুষ আমলা গোমস্তাদের হরেক রকমের পালপার্ব্বণী যোগাড় করতে. আজ বাংলার কৃষক সর্ব্বস্বান্ত। এ ছাড়া পর্ব্বতপ্রমাণ জমির খাজনা তো আছেই। ভেবে দেখতো কি সাংঘাতিক কথা। তোমাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করে যারা বড় হয়েছে তারা কেউ রাজা, কেউ জমিদার, কেউ বা মহাজন! রক্ত দিয়ে গড়া তোমাদেরই অর্থে আজ তারা বড়লোক—ধনী। দুনিয়ার সকল সুখ সুবিধার আজ তারাই একমাত্র মালিক। আর তোমরা? তোমরা তাদের দাসানুদাস—গোলাম। তোমাদের আর মানুষ হ'বার যো নেই। আর কতকাল তোমরা এই নির্ম্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করবে? ভাই সব! মিছিল করে বেরিয়ে এসো আজ তোমরা। সমস্ত অন্তর দিয়ে ব্যক্ত কর তোমাদের পুঞ্জীভূত প্রাণের গোপন বেদনা। আজ তাদের প্রকাশ কর তোমাদের প্রাণের দাবী। মুক্ত কণ্ঠে বল—'আমরা মানুষ। মানুষের মত বাঁচতে চাই।'

দিগন্তে আওয়াজ উঠলো: 'দুনিয়ার সর্ব্বহারা কৃষক মজুর এক হও' 'ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক'। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা আমার রোমাঞ্চ দিয়ে উঠলো তীব্র উত্তেজনায়। থর থর করে আমি তখন কাঁপছি। একেবারে বেহুস্।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে।

(চার)

পারা বেণু সুমিত্রা জীবনদা প্রবোধ নির্ম্মল। সোনারপুর গ্রাম। বুধুজ্জেদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর। নিশীথ রাত্রে লিচুতলা পেরিয়ে গোপনে খিড়কি দরজায় চুপি চুপি ডাক—'সুমি—সুমি'। বাপের সাথে পারার ঝগড়া—বিয়ে কোরবো না বলে। বেচারী বরের বাপের বিরুদ্ধ মনোরথে চলে যাওয়া। বেণুর মাতৃ-বিয়োগ—একে একে সব মনে পড়ছে। কোথায় গেল সে সব দিন। দেখা হলে চিনতে পারবে কি তারা? ভয়ন্ন হয়ে ভাবছি কেবল। হঠাৎ আওয়াজ এলো কানে: শঙ্কর—শঙ্কর আছ নাকি! এ কি! কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। বাইরে এলাম।

—আরে নির্ম্মল যে! তুই কোত্থেকে?

—আবার কোত্থেকে—একেবারে সরকারী খাসমহল থেকে—বলে নির্ম্মল হাসতে হাসতে।

—আয়, আয়, ঘরে আয়, কতকাল পরে দেখা। কত কথা যে জমা হয়ে আছে রে ভাই। ফোয়ারার মত ফুটে বেরুতে চাচ্ছে।

নির্ম্মল বলে—খুব ডুব মেরেছিলে যা হোক। খুঁজেই পাওয়া যায় না।

—তা কি করে খোঁজ পেলে আমার?

—সে অনেক কথা।

—তারপর জীবনদা আজকাল কোথায়?

—কেন তিনি তো রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। চিঠি পেয়েছি ক'দিন আগে। কেমন যেন আল্‌গা ভাবে নির্ম্মল কথাটা বলে।

আবার সেই অপরিচিতা মেয়েটী এসে উপস্থিত।—'চিনতে পার শঙ্করদা?' মুখ টিপে হাসতে থাকে মেয়েটী। অবাক হয়ে আমি বলি—'না।'

নির্ম্মল হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—'চিনলে না ওকে? ও যে সুমিত্রা—আমাদের সুমি।' বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শঙ্কর চেয়ে থাকে সুমিত্রার পানে। তারপর বলে—'সুমিত্রা! আমাদের সুমি!' বিস্ময় উল্লাসে জ্বলতে থাকে শঙ্করের চোখ দুটী। বিশ্বাস হচ্ছে না এমনি যেন তার ভাব।

—'হ্যাঁ গো শঙ্করদা! এখনও চিনতে পারলে না বুঝি? সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তবে সাহস করে কিছু বলি নি।'—জিজ্ঞেস করে দেখ নির্ম্মলদাকে।

অমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শঙ্কর নির্ম্মলের পানে তাকায়। নির্ম্মল হাসতে হাসতে বলে—প্রথমে সুমির কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও নাছোড়বান্দা। বলে, শঙ্করদা ছাড়া আর কেউ নয়। অবশেষে আমি বল্‌লাম—চলো তা হলে দেখেই আসা যাক্। তারপর দেখতেই তো পেলে ভাই নাটকীয় ব্যাপার।

শঙ্কর তখন দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—সত্যি ভগবান বোধ করি আমাদের নাটকীয় উপাদানে গড়েছিলেন। নইলে এমনি ভাবে আমাদের দেখা হবে—স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি।'

—আমিও কোনদিন ভাবিনি শঙ্করদা। তুমি এই নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন করে আছ। ঘটনাচক্রে আমাকে আসতে হবে কাকাবাবুর বাড়ীতে। নির্ঝরদা এসে জুটবে এখানে। আবার আমাদের হারানো দিনের বিচ্ছিন্ন যোগসূত্র নূতন করে যোজনা হবে—সুদূর বাংলার এই নির্জ্জন পল্লীতে।.....

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসে। তবুও চলতে থাকে ওদের কথাবার্তা অবিশ্রান্ত গতিতে। যেন কত শতাব্দী ধরে মানুষের অব্যক্ত বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা এক এক করে জমা হয়েছিল ওদের মনে। স্বতঃস্ফূর্ত কথার বাণে আজ তা প্রকাশ পাচ্ছে। সুস্মিতা বলে চলে—আর কতকাল এই অত্যাচার নির্য্যাতন চলতে থাকবে। কবে এ কালরাত্রির শেষ হবে শঙ্করদা। আবার কবে আমরা নূতন প্রভাতের মুখ দেখতে পাব। যেদিন মানুষে মানুষে হানাহানি, স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝগড়া, বিসম্বাদ, রক্তাক্ত ধরিত্রীর পঙ্কিলতা পাপ—এ সব কিছুই থাকবে না। সব ধুয়ে মুছে যাবে। বলতে বলতে সুস্মিতার চোখে জল আসে।

—সেদিনের আর দেরী নেই বোন্। কালরাত্রি শেষ হয়ে এলো। ঐ নূতন প্রভাতের সামনে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর বেশী দূর নয়। ভয় পাস নে যেন বোন রক্তাক্ত পথ দেখে।.....এগিয়ে চল্।

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ (১)

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তার অধিবাসী শ্রেষ্ঠ নেতা উ-আউঙসানের নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হয়। ফ্যাসীবিরোধী গণ-স্বাধীনতালীগের সভাপতি ও ব্রহ্মের অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ভাইস চেয়ারম্যান উ-আউঙসান ও তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্য গত ১৯শে জুলাই অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এই বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের সংবাদে এশিয়ার প্রতিটী দেশ শোকে মুহ্যমান। দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীর সন্তানের অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী তার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে সহানুভূতি জানাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর স্বাধীনতালীগের সহসভাপতি থাকিন নু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আশা করি তিনি তাঁর শ্রিয় নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রহ্মকে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতার স্বপ্ন-মাখা চোখ তুলে চায় মহাকালের পানে। দিকে দিকে উঠে জয়গান। মহাকালের রথ তাদের জয়যাত্রার সহায়ক। বিশ্বের রাজনীতির সভাকে ইউরোপ চারিশত বৎসর প্রাধান্য বিস্তার করে জেকেছে এ আসনে তাদেরই শাশ্বত অধিকার। এশিয়ার নব জাগরণে তাদের এ ভুল ভাঙ্ছে। তবুও চেষ্টা করছে তারা নানা ভাবে এই প্রাধান্য বজায় রাখতে। কিন্তু হার মানতেই হবে তাদের, বিদায় নিতে হবে তাদের এশিয়া থেকে। এখনও স্বীয়মান শক্তি নিয়ে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদের সাম্রাজ্য বজায় রাখবার উদ্যমের অন্ত নেই। ইণ্ডোনেশিয়ার ওলন্দাজ, ইণ্ডোচীনে ফরাসী এবং ভারত ও ব্রহ্ম দেশে ইংরাজ কোটী কোটী লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। গণদেবতার রুদ্ররোষ যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন এক লহমায় তাদের এই খেলা ফাঁস হবে।

বহু ঘরকন্নাকরি ও কূটনৈতিক বাজাবাজীর পর কূটন ভারতকে ডোমিনিয়ান শাসন মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দুর্ব্বলতা সৃষ্টির প্রয়াসে ক্ষান্ত হয় নি। খণ্ডিত ভারতের একাংশে (পাকিস্তান) যাঁটী নির্ম্মাণের তদ্বির ইংরাজ এখনও রাখে। এই ভেদনীতিই ইংরাজের চরম অস্ত্র। তবে ভারতের বিশাল বেগার যে বিরাট সম্ভাবনার দ্যুতি আত্মপ্রকাশ করছে তার বিপুলত্বটায় একদিন সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হবে। ভারত আবার বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে।

ভারতের মত ব্রহ্ম দেশেও কূটন ডোমিনিয়ান শাসন ব্যবস্থা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ব্রহ্মের গণপরিষদ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম দেশের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ হলেই তার স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীন ব্রহ্ম বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকার কিংবা কূটনের সঙ্গে সকল সম্পর্কবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ব্রহ্মের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাসমরের রণ বাদ্যের

অন্তরালে। ১৯৪৩-৪৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ব্রহ্ম দেশের ভিতর দিয়ে ভারত সীমান্তে এসে ভারতকে উদ্ধারের জন্য অভিযান চালাচ্ছিলেন সেই সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠে ব্রহ্মের জনগণের স্বাধীনতা লীগ। ষাট বৎসরের পরাধীনতার যবনিকা ভেদ করে এই সময় তাদের চক্ষে স্বাধীনতার আলো উদ্ভাসিত হয়, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ তারা পায়। স্বল্পকালস্থায়ী স্বাধীনতা তাদের মধ্যে যুগ সঞ্চয় এনে দেয় বিদেশী শাসক বিতাড়নের কাজে। জাপানীরা ব্রহ্ম দখল করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বর্মীদের ক্ষেপিয়ে তোলে, আধুনিক রণ বিদ্যায় শিক্ষিত করে। জাপানীরা ভেবেছিল যে বর্মীরা ইংরাজ তাড়ালেও তাদের তাড়াবে না। কিন্তু স্বাধীনতার মুখ যারা দেখেছে তাদের কাছে সব বিদেশী শাসকই সমান—ইংরাজও তাদের কাছে যে বস্তু, জাপানীও তাই। বর্মীরা তাই স্বাধীনতার সঙ্কল্প নিয়ে দলে দলে যোগ দিলে ফ্যাসী-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা-লীগে। এক তরুণ এই দলের নেতা। তিনি হলেন জেনারেল আউঙ্গ সান। বাল্যকাল থেকেই আউঙ্গ সানের হৃদয়ে দেশ প্রেমের বহ্নি জ্বলে উঠে। রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ই তিনি ব্রহ্মের যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যুব আন্দোলনের প্রতিনিধি রূপে ১৯৩০ সালে তিনি হ্যাদসড় কংগ্রেসে যোগদান করেন। জাপানীদের ব্রহ্ম দখলের পূর্বেই ১৯৪১ সালে এই বিপ্লবী নেতা যান টোকিওতে। সেখানে সমর বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি অল্পকালের মধ্যেই দেশের জেনারেল পদ-লাভ করেন।

জাপান থেকে ফিরে এসে আউঙ্গ সান দেখলেন জাপানীরা ইংরেজ তাড়িয়ে ব্রহ্ম অধিকার করে বসে আছে। জাপানীরা 'এসিয়া এসিয়াবাসীদের জন্য' শ্লোগান তুলে বর্মীদের সহায়তায় ডাঃ বা-মকে প্রধান মন্ত্রী করে এক মন্ত্রিসভা গঠন করে বর্মা শাসন করতে লেগেছে। আউঙ্গ-সান এই মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে মনে আশা ছিল যে জাপানীরা ব্রহ্ম দেশকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর ভুল ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন যে ইংরেজ ও জাপানীতে প্রভেদ নেই। তখন তিনি গোপনে গোপনে দেশ্ছা-বাহিনী গঠন করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালাতে লাগলেন। বর্মার প্রায়োকলে জাপ সৈন্যেরা কোথাও কোন প্রকার অত্যাচার করলে এই স্বেচ্ছাবাহিনী নিষ্ঠুর ভাবে তার প্রতিশোধ নিতে লাগল। ক্রমে এই স্বেচ্ছা-বাহিনী জাপসেনাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল। এই থেকেই বর্মার বর্তমান শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল ফ্যাসী-বিরোধী জনগণের স্বাধীনতা-লীগ গড়ে ওঠে।

ব্রহ্মের জনগণ তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তির বিকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তাই তারা ধীরে ধীরে আউঙ্গ সানের স্বাধীনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত হ'ল। যুবার দলের সাথে সাথে প্রবীণের দলও এই তরুণ নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলে। আউঙ্গ-সান তখন মাত্র ত্রিশবর্ষীয় যুবা। এই তরুণ নেতা কি করে যে ব্রহ্মের জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অমনি দেশপ্রেমই তাঁকে এই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে। বাল্যকালেই আউঙ্গ সান ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের মহান নেতাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলালের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাধনায় যে তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েছেন সমগ্র দেশের চিত্ত জয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা লীগ ব্রহ্মে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টগণও এই দলে যোগদান করে এর শক্তিবৃদ্ধি করেন।

এদিকে ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জাপানীদের কাছ থেকে ব্রহ্ম পুনরধিকার করে। ইংরাজ আবার তার শাসন কায়েমের চেষ্টায় ব্রতী হয়। অল্পকালের মধ্যেই তারা টের পায় যে ১৯৪৫ সালের ব্রহ্মের রূপ ১৯৪২ সালের থেকে অনেকখানি বদলে গেছে। তিন বৎসর কাল ধরে ব্রহ্মকে আধুনিক যুদ্ধের সকল প্রকার ধ্বংসকর অস্ত্রের ক্ষত-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করতে হয়েছে। ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রথমে জাপানীরা দেশের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে। আবার জাপানী তাড়াবার জন্য ইংরেজও অত্যধিক ক্ষতি সাধন করেছে। দুই পররাজ্যলোভী শক্তির নির্মম মাপটে নিরীহ দেশের এই ভাবেই সর্বনাশ হয়। জাপ ও বৃটিশ অভিযানের ফলে ব্রহ্মের বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত জনগণের দুর্দশার একশেষ হয়। ধনরত্ন, খনিজ প্রভৃতি পণ্য ও কৃষিজাত সম্পদ দ্বারা যে অন্নপূর্ণা ব্রহ্মকে যা-অন্ন যা-অন্ন করতে হয়েছে।

এই দুর্দিনে ব্রহ্ম পুনরধিকার করে ইংরাজ ১৯৪৫ সালে ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিণতি বর্ণনায় যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ করলেন ব্রহ্মবাসী তাতে আলোর তুলনায় আঁধারই দেখলে বেশী। বৃটিশ গভর্নমেন্ট সেদিন একথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরাগ্নি ওদের শোষণ বুভুক্ষার দাহিকা শক্তিকে ধ্বংস করেছে। তাই ব্রহ্মে বৃটিশ শোষণ অব্যাহত রাখবার হেতুই হোয়াইট পেপারে ব্রহ্মের সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিনাশ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করবার শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি জানান হল না।

ব্রহ্মে এই সময় স্বাধীনতা লীগ ছাড়া আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে মাজোচিত, ঘোবামা ও মহাবামা দলের নাম উল্লেখযোগ্য। মাজোচিত পার্টি গড়ে উঠে ব্রহ্মের প্রবীণ নেতা উ-সা'র নেতৃত্বে, ঘোবামা (অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশ ব্রহ্মবাসীদের) পার্টি থাকিন-বা-সীনের নেতৃত্বে এবং মহাবামা (অর্থাৎ বৃহত্তর ব্রহ্ম) ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বে। এই সকল দল থাকলেও স্বাধীনতা লীগ যে ভাবে দেশের জনগণের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় এর কোনটিই তার কাছ ঘেঁষতে পারে না। ভারতের সমগ্র দেশের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যেমন কংগ্রেস, ব্রহ্মের স্বাধীনতা লীগও তদ্রূপ।

জাপ আক্রমণকালে পলাতক গভর্ণর স্যর রেজিনাল্ড ডর্ম্যান স্মিথ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের দ্বিধাবিত হোয়াইট-পেপারের শাসন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তিনি তাঁর শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করলেন কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল বৃটীশ শ্বেতাঙ্গধারী নেতা ও মাঝোচিত পার্টীর কয়েকজন মডারেট নেতাকে নিয়ে। বর্ম্মীরা এই অপরাধ গভর্ণরটিকে ক্ষমাচক্ষে দেখতে পারে নি। আর তিনি যে ভাবে শাসন পরিষদ গঠন করলেন তাতে তাঁরা মোটেই তুষ্ট হতে পারে নি। তারা দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু ক'রে দিলে। জাপানীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করেছিল। অস্ত্রের সাহায্যে সমস্ত দেশে তারা অরাজকতার সৃষ্টি করলে। আউঙ্গ সান সুযোগ বুঝে কর্ম্মক্ষেত্রে নামলেন। দিকে দিকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ব্রহ্মের শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিলে। ডর্ম্যান সাহেব তাঁর সাম্রাজ্যবাদী প্রাচীন দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে অরাজকতা দমনে প্রবৃত্ত হলেন। বৎসরাধিক কালের চেষ্টাতেও তিনি কোন সুরাহা করতে পারলেন 'না। জনগণের সহযোগিতায় বঞ্চিত হয়ে ডর্ম্যান সাহেব শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন।

লুটেনে শ্রমিক সরকার ব্রহ্মের এই অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। তাঁরা বুঝলেন যে স্বাধীনতা লীগের সহায়তা ব্যতীত ব্রহ্মে এখন আর শাসন কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তখন তাঁরা স্বাধীনতা লীগ ও লীগের নেতা জেনারেল আউঙ্গ সানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। স্যর রেজিনাল্ডকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে স্যর হিউবার্ট রান্সকে গভর্ণর করে পাঠালেন। তিনি এসে জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে শাসন পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে এই অন্তর্বর্ত্তী সরকার ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সম-সাময়িক। ব্রহ্মের শাসন কার্য্যে এই সরকারের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হল। স্বাধীনতা লীগ কিন্তু তাতে তৃপ্ত হতে পারলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্থল তারা ঘোষণা করলেন এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে হোয়াইট-পেপার প্রত্যাহারের জন্য তাঁরা এক চরমপত্র দিলেন।

এই ব্যাপারটিতে বেশ চমৎকার কাণ্ড হল। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে ব্রহ্ম দেশের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হল। বর্ম্মীরা ইচ্ছা করলে বৃটীশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে পারে অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে। ব্রহ্মবাসীরা তাদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করলেই তাদের নিকট পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই ঘোষণায় ব্রহ্মবাসীরা আশ্বস্থিত হল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে ব্রহ্ম প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চালালেন। এর ফলে এটলী-আউঙ্গ সান চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এতে ঠিক হল যে ব্রহ্মেও ভারতবর্ষের মত গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদ স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্বর্ত্তী সরকার শাসন কাজ চালাবেন। এই সরকার ডোমিনিয়ন সরকারের মর্য্যাদা পাবে। ঘোষণা ও মাঝোচিত পার্টীর নেতৃবৃন্দ থাকিন-বা-সীন ও উ-স আলোচনাকালে প্রতিকূল মনোভাব না দেখালেও শেষ মুহূর্ত্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরে অস্বীকৃত হলেন। তা সত্ত্বেও এটলী-আউঙ্গসান চুক্তিই কার্য্যকরী করা হল।

ভারতের ন্যায় এখানেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভেদনীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করে নি। আউঙ্গ-সান অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠন করবার পর বর্ম্মী কম্যুনিষ্ট দল স্বাধীনতা লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিরোধিতা করতে থাকে। মাঝোচিত ও মোসাদা পার্টিও স্বাধীনতা লীগের বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হয়। স্বাধীন দেশে তন্ত্রী বাহকের অভাব হয় না। এই সকল দল ছাড়াও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের পার্ব্বত্য জাতিগুলি সম্পর্কে হাইনরিটি সম্প্রদায়ের ধুয়া তুললেন।

বৃটীশ জাতির একটা মস্ত গুণ যে অতি সহজ সমস্যাকেও তাঁরা জটীল করে তুলতে পারেন। বর্ম্মাতেও তারা জাতীয়তার সহজ রাস্তা ছেড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মেও ভারতের মত নানা জাতির বাস। ভারতবর্ষ যেমন জাতি হিসাবে হিন্দুদেরই দেশ, ব্রহ্মদেশও তেমনি বর্ম্মীদের। তবে ভারতের নানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত শান, কাচিন, চিন প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগুলি এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সর্ব্বোপরি ভারতের মুসলমানদের মত ব্রহ্মে রয়েছে কারেন জাতি। ভারতের মুস্লিম লীগের মতই কারেন সম্প্রদায় বৃটীশ অনুগ্রহ-পুষ্ট। তাই ব্রহ্মের আইন সভায় সংখ্যানুপাতে কারেনরা মাত্র ষাট জন প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী হলেও গণপরিষদে তাদের দেওয়া হয়েছে ২৪টি আসন। শান পর্ব্বত ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি গুলির জন্য ৪৪টি হিসেব আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ব্রহ্মে বৃটীশের ভেদনীতি ততটা সফল হয় নি। যেখা সেখে যে পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধিগণও জেনারেল আউঙ্গ সানেরই সমর্থক। সীমান্তের অধিবাসিগণও স্বাধীন ব্রহ্মের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়।

ব্রহ্মের বড় সৌভাগ্য এই যে সেখানে পাকিস্থান সৃষ্টিকারী, বৃটীশের পদলেহনকারী প্রতিক্রিয়াশীল জিন্না নাই, হায়দরাবাদের মত প্রভুভক্তপ্রধানী রাজন্য নাই। ব্রহ্মের জনসাধারণের পক্ষে তাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা অর্জ্জনও তাই অনায়াসলভ্য হবে বলেই মনে হয়। গণপরিষদের নির্ব্বাচনকালেও জনগণের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। পরিষদের ২১০টি সাধারণ আসনের মধ্যে স্বাধীনতা লীগের প্রার্থিগণ দুইশতটি দখল করেছেন।

গত ১০ই জুন নব-নির্ব্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন বসে। ব্রহ্মের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৭ই জুন স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং ব্রহ্মের অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ডাইস-চেয়ারম্যান উ আউঙ্গসান ব্রহ্মে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ব্রহ্মকে ব্রহ্মদেশীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে অভিহিত

করা হয়। ব্রহ্ম গণপরিষদের এই অধিবেশন ১০ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মের স্বাধীনতা ঘোষণার দৃঢ় ইচ্ছা জ্ঞাপন করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেই ব্রহ্মবাসীদের স্বদৃঢ় দেশপ্রেম প্রকটিত হয়েছে।

সমগ্র ব্রহ্ম আজ স্বাধীনতা লাভের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। চক্ষে তাদের স্বাধীন ব্রহ্মের স্বপ্ন, বুকে তাদের অসীম সাহস, মনে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। তাদের এই সঙ্কল্পের সমক্ষে কুটনৈতিক মতি স্বীকার করতেই হবে। আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রহ্ম কমন্ওয়েল্থের সম্পর্কিত বিল কমন্স সভায় গৃহীত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ব্রহ্মবাসিগণ আজ স্বাধীনতার দ্বারে সমাগত। ভারতের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্র স্বাধীনতার নবজন্ম সার্থক হোক প্রত্যেক ভারতবাসীই তা কামনা করে।

বিশুদা

শ্রীশান্তশীল দাশ

রবিবারের বিকেল।

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলেছি রাস্তা দিয়ে। রাত পোয়ালেই আবার সুরু হবে সেই গতানুগতিক জীবনযাত্রা; তাই ছুটীর দিনের শেষ সময়টা কিছু উপভোগ করে নিচ্ছি। পকেটে পয়সার অভাব, তা' না হলে আরও ভাল ক'রে উপভোগ করা যেত এই রবিবারের বিকেলটা—সিনেমা কী থিয়েটার দেখে। কিন্তু তা' যখন সম্ভব নয়, তখন বিনা পয়সায় বেড়িয়ে বেড়ান ছাড়া গতি কী?

চলেছি রাস্তার দু'পাশের দোকানের সারি দেখ্‌তে দেখ্‌তে। কত বিচিত্র জিনিষে ভরা এই সব দোকানগুলো, আর তা'তে ভিড় করে রয়েছে কত রকমের মানুষ। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, বিচিত্র তাদের ভাবভঙ্গী। তাদের পানে তাকালে বোঝা যায় না কে কোন শ্রেণীর মানুষ।

হঠাৎ কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠ্‌লো: অনু!

পিছনে তাকিয়ে একবার ভাল ক'রে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম। কই, কাউকে তো নজরে পড়লো না। বোধ হয় ভুল শুনেছি। এমন সময় কেই-ই বা ডাক্‌বে। আবার চল্‌তে সুরু করলুম সেই বিচিত্র জনতার মধ্য দিয়ে।

কানে আবার ডাক এল। এবার একটু জোরে: অনু, এদিকে। শব্দ অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি একটা ছোট পুরাণ বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে বিশুদা'। হাতে একখানা বই নিয়ে পড়ছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম দোকানের কাছে। বিশুদা'র পাশে গিয়ে জিগ্যেস করলুম: বিশুদা' কবে ফিরলেন?

বিশুদা' খুব মনোযোগ দিয়ে বইখানার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে বল্‌লেন: দাঁড়া, সব বলছি, আর একটু বাকী আছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম তিন চার মিনিট। বিশুদা' তাঁর পড়া শেষ করে বইখানা দোকানদারকে ফেরৎ দিয়ে বল্‌লেন: চ, বেড়াতে বেড়াতে সব বলছি।

বাইরে এসে আমরা চল্‌তে সুরু করলুম। বিশুদা' বল্‌লেন: বইখানা বেশ ভাল বই রে, হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, তাই পড়ে ফেললুম। তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন: আর কেনবার মত পয়সাই বা কোথায় যে কিনে পড়বো! এই রকম করেই···কী বলিস্? পড়াতো হ'লো।

জানতুম এ রোগ বিশুদা'র অনেক দিনের। এরকম করে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত বই যে বিশুদা' শেষ করেছেন তা' হয়তো গুণে শেষ করা যায় না। তাই সেকথা চাপা দিয়ে বললুম: তাতো হ'লো, কিন্তু আপনি ছাড়া পেলেন কবে? বাড়ীর সব খবর কী?

দাঁড়া, সব আস্তে আস্তে বলছি। অত ব্যস্ত কেন? তারপর দু'চার পা এগিয়ে গিয়ে—বল্‌লেন: পকেটে পয়সা আছে? চীনেবাদাম কেন্, বেশ খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আমার পকেট তো গড়ের মাঠ। বিশুদা' হাসতে লাগলেন।

ফুটপাথের পাশে এক চীনেবাদাম'ওলার কাছ থেকে চার পয়সার বাদাম কিন্‌লুম। বিশুদা'র হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বল্‌লুম: চলুন, এক জায়গায় বসা যাক্; বসে বসে বেশ গল্প শোনা যাবে।

না, না, চল্‌তে চল্‌তেই বেশ হবে'খন। কিন্তু বাদাম

যে সব আমায় দিলি। হাত পাত, দু'জনেই খেতে খেতে গল্প করা যাবে। বিশুদা' আমার হাতে কতকগুলো বাদাম ঢেলে দিতে দিতে বল্লেন : ছাড়া তো পেলুম, কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি রে।

কী মুস্কিল? আমি একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিগ্যেস করলুম।

মুস্কিল আবার কী? পয়সার অভাব। জোগাড় করা যায় কী করে বল্‌তো? বিশুদা' একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন। রাজ-অতিথি হয়ে ছিলুম ভালো। বিশুদা' আবার আরম্ভ করলেন। ভাবনা চিন্তে বিশেষ ছিল না। কিন্তু এখন তো আর তা চল্‌বে না! ছেলে, মেয়ে, বউ; এদের সব খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো? আর নিজেও দুটো খেতে হবে।

এখন করছেন কী? আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম।

করবো আর কী; সবে তো ছাড়া পেয়েছি এই সাত দিন। তা যাই হোক্, গাঁয়ের লোক একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তাই এর মধ্যেই দুটো টুইশানি পেয়ে গেছি। গোটা পঞ্চাশ টাকার মত পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে এই কটা টাকায় কীই-বা হবে? বিশুদা'র কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌লো করুণ সুর।

একটু আশ্বাস দিয়ে বল্লুম : এই তো সবে বেরিয়েছেন; একটু চেষ্টা করলে একটা না একটা কিছু পেয়ে যাবেন নিশ্চয়ই।

যাকগে, যা হোক একটা হয়ে যাবে; ভাবলে কী আর অভাব মিটবে? কী বলিস? বিশুদা'র কণ্ঠে আবার স্বাভাবিক সুর ফিরে এলো। বিশুদা' বাদাম চিবুতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে আমরা পাশাপাশি চল্‌তে লাগলুম। বিশুদা' আবার সুরু করলেন : কী বরাত করেই এসেছিল ছেলেমেয়েগুলো। আমার কাছে এসে না পেলে একদিন ভাল করে খেতে, না পেলে একটু ভাল পরতে।

কথার মোড় ঘুরাবার জন্যে বল্লুম : বিশুদা' আপনার ছেলের বয়েস কত হ'ল? ছেলেই তো আপনার বড়, না?

না, মেয়েই এখন বড়। অবশ্য ছেলেটা বেঁচে থাকলে সেই-ই বড় হ'ত। তা', তার বয়স প্রায় চোদ্দ পনের বছর হত বৈ কী? বিশুদা'র কণ্ঠস্বরে বেশ একটু বিষাদের আভাস ফুটে উঠ্‌লো।

মেয়ের নাম আপনার দুর্গা, না? কতদিন আগে তাকে দেখেছিলুম। সেটা এখন কত বড় হ'ল বিশুদা'? আবার জিজ্ঞাসা করলুম।

তা' এই যায় পেরিয়ে তেরয় পড়েছে। শুধু রূপে নয়, মেয়ে আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী। বিশুদার স্বরে স্নেহ উপচে উঠ্‌লো। এর মধ্যেই ঘর সংসারের কত কাজ শিখে ফেলেছে। আমার স্ত্রীর যাবে অসুখ করেছিল। শুনলুম, মা আমার একাই রুগীর সেবা থেকে সুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম করেছিল।

মেয়েকে লেখা পড়া শেখালেন না কেন?

পয়সার অভাবে আর স্কুলে দিতে পারলুম কই? তার পর একটু থেমে বিশুদা বল্লেন : তা, তার মার কাছ থেকে যা শিখেছে, স্কুলে দিলে তার বেশী কিছু শিখ্‌তো বলে তো আমার মনে হয় না। বাংলা তো বেশ ভালই জানে। সংস্কৃতও কিছু কিছু শিখেছে। আমি আর তাকে কাছে পেলুম ক'দিন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তো কাটলো রাজ-অতিথি হ'য়ে। বিশুদা হাসলেন।

মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো? তার কী ব্যবস্থা করছেন? এখন থেকেই তো চেষ্টা চরিত্তির করতে হবে।

অত্যন্ত নিশ্চিন্ত সুরে বিশুদা উত্তর দিলেন : সে ভাবনা ভাবি না। ছেলে আমার ঠিক হ'য়ে আছে?

কী রকম? একটু উৎসুক হ'য়ে জিগ্যেস করলুম।

পাড়ার একটা ছেলে আছে, এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। পাশ করে যাবে। বেশ ছেলে, মা বাপ কেউ নেই। পিসীর কাছে মানুষ হয়েছে। অবস্থা বিশেষ ভাল নয়; তা হোক, ছেলেটি কিন্তু সত্যিই ভালো। এই পর্যন্ত বলে বিশুদা একটু থামলেন। দু' চারটে বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে আবার সুরু করলেন : জানিস্ অনু, ছেলেটিকে আমার ভারি ভালো লাগে। এই বয়সেই পরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শিখেছে। যখন যে অবস্থায় তার কাছে যাও, সে না বল্‌বে না। অবশ্য অর্থ সাহায্য করার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু এ ছাড়া নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও অপরের উপকার করবে। এটা কী মানুষের কম গুণ মনে করিস? আর এমন আশ্চর্য যে

এ সম্বন্ধে সে একটুও সচেতন নয়। পরের উপকার করছে বলে যে সে উপকার করে, তা নয়; না ক'রে সে থাকতে পারে না বলেই যেন সে ক'রে। কার বাড়ীতে রোগীর সেবা করার লোকের অভাব, কার বাড়ীতে মড়া-কেলার লোক জুটছে না, এ সব কাজে সে যেন পা বাড়িয়েই আছে।

কিন্তু তার হাতে মেয়ে দেবেন, আর্থিক অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখবেন না, যখন জানছেন অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, একটু দ্বিধার সংগে বল্লুম।

জানিই তো তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু ওই একটা দোষ ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই, আমি বেশ জোর করে বল্‌তে পারি। একটু জোরের সংগেই বিশুদা বললেন। তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগলেন: কিন্তু অভাব তো মানুষের সংসারে নতুন নয়, অনু। এই আমার কাছেই বা মেয়ে কী সুখে আছে। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না, এ তো তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সেই জন্যেই তো আপনার উচিত মেয়েকে এমন ঘরে দেওয়া, যেখানে খাওয়া পরার অভাব হবে না।

মানুষের খাওয়া-পরাটাই বড় কথা হ'ল। বিশুদা একটু উত্তেজিত হয়েই বল্‌লেন: তুইও এখন মুখুয্যের মত কথা বল্‌লি অনু। শুধু এই একটা দোষের জন্যে আমি এমন ছেলে হাতছাড়া করবো?

অবাক হ'য়ে বিশুদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। যে অভাবের জন্য কিছুক্ষণ আগেও বিশুদা'র মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখেছিলুম, সেই অভাবকেই বিশুদা' এমন তাচ্ছিল্য করে উঠ্‌লেন। আশ্চর্য! জেনে শুনে মেয়েকে অভাবগ্রস্ত ছেলের হাতে তুলে দিতে একটুও দুঃখ বোধ করে না। সত্যিকারের মনুষ্যত্বের কাছে এরা সব কিছু বলি দিতে পারে। অথচ বিশুদা'র সংস্পর্শে যেই এসেছে, সেই জানে কী অপরিসীম স্নেহই না লুকিয়ে আছে ওর অন্তরে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিশুদা' আমাকে বোঝাবার সুরে বল্‌লেন: তুই একবার ভেবে দেখ অনু, যে মানুষ নিজের সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করে অপরের মংগল করতে ছোটে সে কী সাধারণ মানুষ; এমন ছেলের হাতে-পড়া যে-কোন মেয়েরই ভাগ্যের কথা। তুই যাই বলিস্ অনু, এ ছেলে আমি হাতছাড়া করবো না।

মনে মনে বুঝলুম, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা উচিত হবে না। বিরুদ্ধে বললে বিশুদা'র আদর্শে আঘাত লাগবে, আর পক্ষে বললে বিশুদা উৎসাহিত হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকতে সুরু করবেন। তাই এ প্রসংগ চাপা দিয়ে বল্‌লুম: আচ্ছা বিশুদা', আপনার সেই আগেকার কাগজের অফিসের চাকরীটা চেষ্টা করে দেখুন না?

বিশুদা' সচকিত হ'য়ে বলে উঠলেন: ভাল কথা মনে করে দিয়েছিস্ অনু, আজ সেই উদ্দেশ্যেই সহরে এসেছি। দেখ্‌তো তোর ঘড়িটায় কটা বাজলো? সাতটার সময় দেখা করার কথা আছে।

পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে বল্‌লুম: এখনো ঢের সময় আছে; এই সবে সাড়ে ছটা।

তবে আমি চললুম। বিশুদা' তাঁর গন্তব্যপথের দিকে চল্‌তে সুরু করলেন।

আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম।

মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

মধ্য ভারতের গ্রামাঞ্চলে অজস্র লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই লোক-গীতিগুলি বংশ-পরম্পরা গায়কদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই লোক-সঙ্গীতগুলি ভারতবর্ষের বৃহত্তর লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনাক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান। ভারতবর্ষের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনা ক্ষেত্রেও এই লোক-গীতিগুলির একটী বিশিষ্ট মূল্যবান স্থান রহিয়াছে। এখানে উদ্ধৃত লোক-সঙ্গীতগুলি জব্বলপুর বিভাগের গ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

দেবদেবী বিষয়ক সঙ্গীত—

শিব, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর কথা বাংলার লোক-সঙ্গীতের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। তদনুরূপ মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীতে গণপতি, চণ্ডী, শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। পল্লী-গায়কেরা গণপতি, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীবিষয়ক সঙ্গীতগুলি সাধারণতঃ 'ভজন' সুরে গাহিয়া থাকে। এখানে এই বর্গের তিনটী লোক-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

(১) গণপতি

শ্রীগণেশ গিরজা সুবল মঙ্গল কে দাতার।
জো কারজ হম করত হৈ তুম্হারে আধার॥
অওত হরণ মঙ্গল করণ শ্রীগণেশজী ভগবান।
কবিতা কছু করণ চাহঁ পারবহ অনুচর জান॥
নিজ তরীস কছু নহীঁ নিজ করকে বিবাদ।
সহায় পড়ে প্রভু আপকে লায় তুম্হারে হাথ॥
জ্ঞান ধ্যান বল বুদ্ধি নহিঁ ন ধন ন ধান উপায়।
মো পাতক কী অপরাধ কো তুম্হি ক্ষমো সিধায়॥

(২) চণ্ডী

জগদম্বা অতি সুকুমার চত্ত আঠর ভুজ ধারণী।
বাঘ তুম্হারী কহী পড় পার্ব্বতী কী বাসনী॥
রহী মাত প্রসন্ন চণ্ডী মহারাণী।
করতী সদা সহায় মোহি আপনা জন জানী॥
মুরখ মতী হৃদয় কে দেব হিরদে মে জান।
মন সে জো গাইব তুম্হে পাবৈ সভা মে মান॥
পাবৈ সভা মে মান হায় কভু ন মানে।
গাবৈ আঠর বখানৈ সদা তেরী গুণ গাবৈ॥

(৩) শঙ্কর-পার্ব্বতী

সাজে সব সিঙ্গার জহাঁ শঙ্কর জী বিরাজে।
লগায় দেবতা বসী বহাঁ ইন্দ্রাদিক রাজে॥
মাথে পে চন্দ্রমা মহেশ জী বসে কৈলাশ।
আসন মারে ধ্যান লগাবে দেবতা করতে জহাঁ বাস॥
নন্দী সে অসবার সদা শিব ভোলা দানী।
সোরা করে সিঙ্গার জহাঁ কৈলাশী রাণী॥
গণেশ গোদী লয়ে পার্ব্বতী ভোলা নাথ।
গঙ্গা সঙ্গ জটো তরী ধন্য ধন্য শভুনাথ॥
ইন্দ্রমুনি সুর দেবতা ভজন করে দিন রাত।
ঝরে তপসিয়া জপেশরী ধন্য ধন্য সোরা মাত॥
উমা পার্ব্বতী সাথ জটো মে গঙ্গা রমতী।
ধন্য ধন্য ভোলানাথ সদা শিব স্বামী হে ভক্তী॥
তিন লোক মাতা হায় শঙ্কর উপড়ধানী।
সৃষ্টি পালন হায় হো শভুজী অবনাশী॥
বিষ্ণু লগাতে ধ্যান ব্রহ্মা শিব ভজতে হরীহর।
উমা পার্ব্বতী সাথ সাথ ভোলা উপকে হায় বর॥
বরষান দেতে ভক্ত কী শঙ্কর ভোলা মহান।
শরণ শঙ্করজী কহৈ আপ দেব বরষান॥
ধন্য ধন্য ভোলা হরী-সদাশঙ্কর ত্রিপুরারী।
হিতকারী রহে মহেশ ধ্যান কী করো রখবারী॥

ভক্তবাণী সঙ্গীত—

বাংলার বাউল, সাঁই গানের মত লোক-সঙ্গীত মধ্য ভারতেও প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর লোক-রীতি এ দেশে 'ভক্তমহিমা' গীত নামে সুপরিচিত। সাধু, সন্ত শ্রেণীর গায়কেরা এই গানগুলির ভিতর দিয়া গুরুর গুণ ও শক্তির কথা জনসাধারণে প্রচার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গুরুবাণী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

পাইলে নাম গুরু কী মা লৈবী ফির করিয়ে দুজো কাম।

করিয়ে দুজো কাম গুরু মুক্তি কা দাতা।
কানন শব্দ শুনায় লগাবৈ হরি সে নাতা॥
এব কী শব্দ শুনায় কে দিয়ো ভক্ত ভরপুর।
উত্তর দিশা সো অচল পদ হৈ তারা মন্দির॥
তারা মন্দির গুরু কী সেবা করিয়ে।
পাপ হোত সব ছার চরণ কমল নর লগ হিয়ে॥
মন এঁসা মল হরণ কর লগ ন লেখ কৌ আয়।
জীব চরাচর সব দিখৈ ফির হোয় মৃত্যু কী হান॥
হোয় মৃত্যু কী হান গুরু কোবৌ রমু রাই।
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গুরু সে শিক্ষা পাই॥
মাতু পিতা গুরু সে করকে নিজ বিশ্বাস।
যে দিন পর কৃপা করে সো পুজত মন কী আশ॥
পুজত মন কী আশ কভী নিন্দা মত করিয়ে।
তনক সে করো গিয়ান ধ্যান নারদ চিত ধরিয়ে॥
নারদ জী নে ভী করী গুরু সঁকা মন মায়।
চৌরাশী জোগন পরো ফির গুরুনে করো সহায়॥
গুরুনে করো সহায় সদা গুরু ভরে ভণ্ডালা।
ভরে ভবন তব পীর জগৎ সে পন্থ নিরালা॥

ভূলন সঙ্গীত—

মধ্যভারত অঞ্চলে ভূলন পরব সুবিখ্যাত। ভূলনের সময়ে এ দেশের নরনারীরা 'ভূলা'র আনন্দ উপভোগ করে। ভূলায় ভূলনের সময়ে পুরুষ ও মেয়েরা গান গাহিয়া থাকে। এই ভূলন সঙ্গীতগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। ভূলন সঙ্গীতগুলি হর্ষোৎফুল্ল। উদাহরণ স্বরূপ একটী ভূলন সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

আই ভূলন ভূলন গুরুবরী হোয়া বরসানে সে চলী রাধিকা।
অঙ্গন ভিরে সুকার সাথ সুন্দর সখিরা।
কালিন্দী তট পহঁচ নায়ক মোহন করত দুহার
কহৈ মাধুরী বতিয়া।
ত বি মৃদঙ্গ বজত ঢোল ঢপ তবল সতার
কান ভূকহি বসিয়া॥
ভূক শ্যামরী সাথ রাধিকা ভূলন করত বিহার বহিয়া।
রেশম ডরক সী ভূলা কদম কী ছহিয়া
ভূলত মোহন বসিয়া॥

বিবাহের সময়ে মেয়েরা সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। বিবাহের গানগুলি অধিকাংশ স্থলেই রামসীতা অথবা শঙ্কর পার্ব্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। দোল উৎসবে 'ফাগ' গানে পল্লীকুটীরগুলি মুখরিত হইয়া উঠে। রাম নবমী ও দশেরা উৎসব উপলক্ষে রামায়ণ সঙ্গীত কুটীরে কুটীরে গীত হয়। বাংলার ভাটিয়ালী ও সারি গানের অনুরূপ লোক-সঙ্গীত মধ্যভারতে প্রচলিত আছে কিনা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই।

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭)*

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৯৪৭ সালের ১০ই জুলাই অপরাহ্নে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা বিলের আলোচনা কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের চিন্তার আজই অবসান! ইহার পর পার্লিয়ামেণ্টে ভারত-কথার আলোচনা আর হইবে না। ১৯০ বছরের 'ফুটুবিতা' আজ শেষ। (আমি 'ফুটুবিতা' শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু কেন করিলাম, সে কৈফিয়ৎ দিব না।) ১৫ই আগষ্ট ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিবে। ১৬ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ১৬ই আগষ্ট তারিখটি ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ও কলিকাতাবাসীর মনে দুঃস্বপ্ন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; তাই ১৬ই না ভাবিয়া ১৫ই আগষ্ট চিন্তা করাই ভাল। ১৬ই আগষ্ট মুস্লিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল। সেদিনের সেই বীভৎসতা ভারতবর্ষের ইতিহাস মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। অনাগত ও অনন্ত ভবিষ্যৎকাল নাদির, তৈমুর ও চেঙ্গিস্-খানের তুলারহ স্মৃতি ১৬ই আগষ্টের তুলনায় নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ যুদ্ধে হয় জয়, না-হয় পরাজয়, অথবা সন্ধি হইয়া থাকে। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয় হইয়াছে—ভারতবর্ষের মানখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা; পরাজয়—বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগে। ভারতের স্বাধীনতার পথ বিস্তৃত করিবার পক্ষে খুন, অগ্নিসংযোগ, নরনারী হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড—বেতুলোপাখ্যানের ত্রুটি হয় নাই; তথাপি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। সার্থক সাধনা গান্ধীজীর! স্বাধীন ভারতের চিত্র তিনিই আঁকিয়াছিলেন; প্রতিমা তাঁহারই বহুস্তনির্মিত; আবার, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তিনিই করিলেন। (যাদের মুক্তি প্রাণবন্ত হইলে কাহার না আনন্দ হয়? ধর্মাত্মা, ধর্মপ্রবক্তা ভারতের মুনি ঋষিগণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে স্বর্গে মর্ত্যে ও রসাতলে আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত। অপ্সরা অপ্সরাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর নয়নে আনন্দোদ্ভাস দীপ্ত কই; তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস কই? প্রার্থনার প্রতিবার সম্মুখে দণ্ডায়মান পূজারী নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিতেছেন কেন!)

(কেন প্রশ্ন নিরর্থক, উত্তর আরও অনাবশ্যক।) ইংরাজ যখন যেদিন ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন ভারতের যে দশা, যে অবস্থা ছিল, একশত নব্বই বৎসর পরে বৃটিশ যেদিন ভারত ত্যাগ করিতেছে, সেইদিন সেই অবস্থা, সেই দশার ভিতরেই নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। ১৭৪৭ ও ১৯৪৭-এ কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! ভারতবর্ষ যেদিন পরাধীনতা বরণ করিয়াছিল সেদিনের সেই শতধা বিভক্ত ভারতে—মাত্র আধিকার বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতে পার্থক্য যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, আমাদের চর্মচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা দেখি সেদিনও ছিল অরাজকতার আরণ্য-আইনে নরনারীজীবন বিপর্যস্ত, দুর্ভিক্ষের যাদুকার, মৃত্যুর মহামহোৎসব! আজও মানুষের জীবন প্রতি পদক্ষেপে পর্যুদস্ত, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনারই শোভাযাত্রা, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু, বন্যায় মৃত্যু, গৃহযুদ্ধে মৃত্যু, অপমৃত্যুর মহাসমারোহ। ভক্ত তুলসীদাস লিখিয়াছিলেন, মানুষ জন্মের দিনে কাঁদে, মরণের কালে মানুষ হাসে। আমি দেখিতেছি, স্বাধীনতার জন্মকালেও মানুষ কাঁদিতেছে, স্বাধীনতা যেদিন মরিয়াছিল, সেদিনও মানুষের চোখের জলই সম্বল হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পুনর্জন্মের হরষিত, সুরভিত ও আলোকিত প্রভাতটির কল্পনাই করে করে শতাব্দীতে শতাব্দীতে যুগে যুগে মানুষ ধ্যান করিয়াছে। এই শুভ দিনটির সাধনায় কত ত্যাগ স্বীকার, কত দুঃখ-বরণ ও সর্বস্ব সমর্পণ! হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ। সাধকের সাধনায় সে কি মহিমময় চিত্র উদ্ঘাটিত হইত! লেখকের রচনায় আনন্দ ঝঙ্কার উদ্গীত হইয়াছিল! কবির কাব্যে "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর" এই আশ্বাসই দিত! চন্দ্রে কলঙ্ক কিছু আছে, থাক্; জোছনা সম্ভোগে কোনই বিঘ্ন নাই। হায়, ভারতের স্বাধীনতার কলঙ্কবিন্দু সম্পর্কে যদি ঐ কথা বলিতে পারিতাম। ভারত ভাগ্য বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে ঋষির কর্ণে কুইট ইণ্ডিয়া বজ্র নাদ করিয়াছিল, সেই চিরমধুর, চিরশান্তির, চির স্থির কণ্ঠই আজ ম্লান ও মলিন। আলোকের প্লাবনে স্নেহের অভিষাম। জ্যোতিঃপ্লবে নির্বাপিত দীপমালা।

তবু বলিব, "আমরা ভুলাব তোমায় কলিযা"; তবু বলিব, "মানুষ আমরা নহি ত মেষ"। তারা ঘর নূতন করিয়া গড়িব; তারা প্রাণ জোড়া দিব। স্বাধীনতার যদি মৃত্যু হইয়াছে।

"কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তাঁর পাষাণ কেন।
ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে পাষাণ"

পাষাণ খসিয়াছে, পাষাণ গলিয়াছে। আর

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে নবতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।"

আজ, যা কি ছিলেন, সে দুর্ভাবনা ভাবিয়া লাভ নাই; যা কি হইয়াছেন,

---

* ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭, বাং ২৯এ শ্রাবণ ১৩৫৪, শুক্রবার, ২৭ রমজান, চতুর্দশী। পূর্বদিনের রাশি ও নক্ষত্রের তারা শুদ্ধ। অর্থে বিপ্রকর্ষ ঘুচে যেতো নাকি।

আজ সে কথাও অবান্তর ; যা কি হইবেন, আজিকার সেই কথা। শুধু আজ নয়, কেবল কাল নয়, অনাগত বহুকাল পর্য্যন্ত, সেই কথা, মা কি হইবেন! আমরা সর্ব্বরত্নালঙ্কারপরিশোভিতা বালার্ক-কপার্দ্দা ঐশ্বর্য্যশালিনী ভুবন-মনোমোহিনী জননীর কথা অনেক শুনিয়াছি। আমরা অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী লীলতাড়িতা ছদ্মসর্ব্বস্বা কঙ্কালমালিনী জননীকেও চাক্ষুষ করিয়াছি। দশ বৎসর —দশ বৎসর ত নয়, দশ যুগ, শ্মশানবক্ষে শ্মশানবিহারিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি, কাঁদিয়া ধরিত্রী ভাসাইয়াছি। তাহাতে আর সাধ নাই। আমরা আজ সেই মা'কে দেখিতে চাই, সেই মা'র আরাধনা করিতে চাই, সেই মা'কে ছবি সিংহাসনে ধান-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত করিতে চাই—যে মা দশপুত্রে দশপ্রহরণ ধারণ করেন, যে মা শত্রুবিমর্দ্দিনী, যে মা বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, যে মা বীরেন্দ্রজননী। আজ সেই মা'র সাধনা করিব—যে মা সাহসে বল, অন্তরে সাহস, বক্ষে বরাভয় মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আজ সেই মা'র পূজা করিব—যে মা কণ্ঠে ভাষা, নয়নে দিব্য দীপ্তি, হৃদে শিঞ্জনদ্ধনীবদ্ধসিংহী ! বৎসরে কি কালের মাপ হয়? দিন গণিয়া কি দুঃখের পরিমাপ করা যায়? লীগের দুঃশাসনে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রলুপ্ত হইয়াছিল ; লীগের কুচক্রান্তে বেতসবনা স্বরোজবাসিনী বীণাপাণির 'শ্রী' অপহৃতা হইয়াছিল। বাঙ্গালী আজ আবার প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া বন্দেমাতরম্ গাহিবে ; আজ তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবর্ত্তী দেবীর বেতসবটীকে লক্ষ্মীশ্রীতে সুশোভিত করিবে। মহাভারতের দুঃশাসন ভীষণ ছিল জানি ; ভীমসেন তাহার রক্তরক্ত পান করিয়া পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়াছিল, তাহাও জানি ; বাঙ্গালী আজ লীগ দুঃশাসন কবলমুক্ত হইয়া পরিত্রাণের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি। কিন্তু আজিকার সমস্যা যে কত দুরূহ, পথ যে কি দুরারোহ, তাহা ভাবিতেও যে স্তব্ধ হইতে হয়। আজ মুষ্টিমের দিবাস্বাপ্নের অবসর নাই ; আজ আর মুষ্টিমেয় লীগের অপহরণ করিবারও সময় নাই ; গভর্ণমেণ্টের পানে করুণ কাতর নয়নে চাহিয়া কালযাপন করাও চলিবে না। কে গভর্ণমেণ্ট? স্বাধীন রাষ্ট্রে গভর্ণমেণ্ট একটা যন্ত্র শ্রেণী ও বিত্তির জাতি নহে ; স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক গভর্ণমেণ্ট। [গালি দিব কাহাকে? সুস্থ নিরীক্ষণ নিক্ষিপ্ত হইলে আত্মকলঙ্কই সার হইবে।]

দুইশত বর্ষের ব্যবধান যে, তাই ভুলিয়া গিয়াছি, তাই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। নহিলে এই বঙ্গদেশ কি আমাদেরই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না? এই বাঙ্গলা দেশেই না প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন? "নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়" সে এই আমাদের বাঙ্গলাতেই নহে কি? নবাবদ্ব ইংরাজের হাল কাটিয়া ক্লাইবকে না আমিলে নিরাজ কি আমাদের স্বাধীনবঙ্গ রাষ্ট্রেরই অধিপতি ছিলেন না? রূপেশ, সীতারাম, চাঁদ, কেদার কি বাঙ্গালীই ছিলেন না? পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানী কি এই স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রেরই অধিশ্বরী ছিলেন না? স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের ইতিহাসও কোন দুষ্টিকের কালিমায় কলঙ্কিত হইতে দেখি না। মগদস্যু, ফরুক, মহারাষ্ট্রী ও একখানি পৃষ্ঠাও কলুষিত করে নাই! অন্যের জন্য হাহাকার, অন্যের জন্য আত্মহত্যার ইতিবৃত্ত, কই, শত্রুতেও লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই! পরন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস উদারের ইতিহাস, উৎসবের রাবাদ, পালপার্ব্বণের মহাভারত, প্রাচুর্য্যের বেদ ও পুরাণ। কোথায়, কোন্ সুদূরে ছিল সেই রাক্ষসাধিপতি দশানন লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজ্য, আর কোন্ সুদূর অযোধ্যা হইতে দশরথতনয় রামচন্দ্র সেই লঙ্কায় গিয়া অকালবোধন করিল। কে সে সংবাদ রাখিয়াছিল? আমার এই বঙ্গদেশ। অকাল বোধনকে ফলে ফুলে আলোকে উল্লাসে কে মূর্ত্ত করিয়াছিল? আমার এই বাঙ্গালী মাতি! এই হিংসাবিদগ্ধ, পরশ্রীকিম্ সুখতপ্ত প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল কে? আমার বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্য। ভক্তের ভক্তির আবাহনে ভগবান তাঁহার বৃন্দাবন পরিহরি ভক্তকে 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্' বলিতেও পারেন, এ পরিকল্পনা কাহার? আমার বাঙ্গালী কবি জয়দেব ঠাকুরের। অপিচ স্বাধীনতার সাধনায় ভারতবাসীকে বীজমন্ত্র দিল কে? [দিল, বল বাঙ্গালী লক্ষ কোটী কণ্ঠে বল,] আনন্দমঠ স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র! "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রদ্রষ্টা বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র। তাই বাঙ্গালি, যে যেখানে আছ, যে অবস্থায় আছ, স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার দিনে একবার তিনশত কোটি কণ্ঠে বল, বন্দে মাতরম্।

(আজ বঙ্গরাষ্ট্র গড়িতে হইবে, বর্ব্বরাম যুধিষ্ঠিরের রাজধানী নির্ম্মাতা ময় দানব কি বাঙ্গলায় নাই? সে বিশাল অট্টালিকা, সুরম্য হর্ম্ম্য কে গড়িবে? আজ আর প্রবেশ শাসন নহে, যে কাইসল ভিত্রী ভিলমিল্ করিতেই মাত্র ঘোরের মধ্য দড় দড় গড় গড় শব্দে চলিতে থাকিবে! আর আইন পরিষদের আতপত্রাপশোভাবিরাজিত সুখাসনে বসিয়া বক্তৃতার বেগ গর্জ্জনেই শাসন যন্ত্র তৈলসিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই লাল এই থাকিবে, এই ঠাট, এই আলবার্ট পোষাক বজায় থাকিবে, অথচ দেশ হইতে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ঘুচিয়া যাইবে—এ দুরাশা যদি কাহারও মনে বাসা বাঁধিয়া থাকে তবে যত শীঘ্র সে বাসুই বাসা স্থানচ্যুত হয় ততই মঙ্গল। সাধারণ মানুষ আইন জানে না, কানুন বুঝে না, কমপ্লীটডিসনের ধার ধারে না ; স্বাধীনতা বলিতে সে জানে অভাব বিমোচন ; স্বাধীনতা বলিতে সে বুঝে, প্রচুর খাদ্য, পর্য্যাপ্ত বস্ত্র ; কমপ্লীটডিসন বুঝাইতে গেলে সে বলিবে, নীরোগ দেহ, শান্তশীতল গেহ। রামরাজ্য কি—তাহার সরিকরূপ তাহার ধারণার অতীত হইলেও এইটুকু তাহার অজানা নাই যে রামরাজ্যে মানুষ উপবাস করে না, কাপড়ের জন্য কন্ট্রোলের দোকানকে তারকনাথের মন্দিরযোগে হত্যা দিতে হয় না, রামরাজ্যে চিকিৎসার অভাবে মানুষ কীট পতঙ্গবৎ মধ্যমের খোলা-যাত্রা করে না, অর্থের অভাবে আজন্ম আভরণ অধিকার আর সংস্কারের অন্তরূপে বাস করে না। রাম রাজ্যে বর্ষীয়ান রাণী, সুশ্রীবও রাজা রামের বন্ধুত্বের গৌরব করে ; গুহক রাজরাজেশ্বরের বক্ষালিঙ্গনে ধন্য হয় ; রাজা জটায়ুর চরণ বন্দনা করেন। এই মনোরম চিত্রখানি জনমনের সরল প্রাণের কোমল মৃত্তিকায় আঁকা আছে। দুঃখে, দুর্দ্দিনে, দুর্ব্বিপাকে, দুর্যোগে নিরীক্ষিত নেত্রে যত দিন ধরিয়া এই ছবিখানিকে তাহারা মনোমুকুলবিবরণে পূজার্চ্চনা করিয়াছে, আজ অদ্রির স্বাধীনতার মহেন্দ্রক্ষণে অন্তঃস্থল হইতে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?')

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু, বিধাতা পুরুষ অন্তরালে হাসছিলেন। সিরোহী মোটর ষ্টেশনের অফিস ঘরে বড় বড় তালা ঝুলছে। সন্ধ্যাকাল। ষ্টেশন অন্ধকার।

যুথচারী—যে যুথ অভ্যাসের থেকে অনেকক্ষণ ছিটকে এসেছে। আশ্রয়ের মতো কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না। সবাই এতক্ষণ যে যার আশ্রয়ে পৌঁছে বিশ্রাম করছে।

সন্তরে এর করলুম—তুমিও হাঁটবে নাকি?

গম্ভীর ভাবে বললেন—যেমন তোমার ব্যবস্থা!

মাথা চুলকে বললুম—কিন্তু…

বাধা দিয়ে তিনি একটু উচ্চস্বরেই বললেন—কিন্তু, আর কি করা যেতে পারে বলো? অনির্দিষ্ট গাড়ীর আশায় এখানে তো আর সারারাত অপেক্ষা করা যেতে পারেনা!

জয়সলমীরের মরু

দেবী আর কোনও বাক্যব্যয় না ক'রে নবনীতার হাত ধ'রে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

গুপ্ত সাহেবের মা বললেন—হাঁ বাবা, বৌমা ঠিকই বলছেন। চলো হেঁটেই যাই—

আশ্চর্য হ'য়ে বললুম—সেকি! আপনি বৃদ্ধোমানুষ—এতটা পথ—

বৃদ্ধা সহাস্যমুখে বললে—এক সময়ে একটানা বিশ মাইল পথ হেঁটে গেছি, একটুও ক্লান্তিবোধ করিনি। আজ বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দু'চার মাইল এখনও চলে যেতে পারি।

নবনীতা সহাস্যমুখে ছুটে এসে বললে—আমিও পারি। 'বৌ-বৌ'য়ের সঙ্গে আমি পাল্লা দিয়ে হাঁটবো।

শ্রীমান আবাদের ছুটনে অপরাজের একথা জানি। চেষ্টা করলে আমিও যে মাইল বেড়েক হেঁটে যেতে পারবনা এমন নয়। কিন্তু, ভাবনা আমার শ্রীমতীর জন্যে। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে বেরিয়ে পথঘাটে ত্রিকোণ

পার্ক পর্য্যন্ত গিয়েই তিনি বলেন—রিক্‌সা ডাকো, আমি আর হাঁটতে পারছিনি, পা ব্যথা করছে। তাঁর পক্ষে…

কিন্তু, যেদী ততক্ষণ অনেকটা পথ এগিয়েছেন দেখলুম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সকলকে নিয়ে আমি তাঁর অনুসরণ করলুম।

সোধূলির সোনার আলো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য্যের আভা নিষ্প্রভ হ'য়ে এলেও তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। পার্ব্বত্য পথটি প্রদোষ আলোকে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য সেই প্রাক্‌-সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে একটা মহত্তর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথে নিঃশব্দে চলেছি আমরা ক'জনে। এত ভাল লাগছিল সেই বিদায়ী দিবার হঠাৎ আবেষ্টনে আমার সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ।

প্রায় অর্দ্ধেকটা পথ চলে এসেছি যখন আমরা, দেখি পিছন থেকে ধূলি উড়িয়ে মোটর আসছে। পাশ কাটিয়ে পথের একধারে দাঁড়ালুম। মোটর-খানি আমাদের সামনে দিয়ে গেল। একেবারে খালি গাড়ী। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। প্রাইভেট মোটর। ট্যাক্সী নয়। তবু বিপদের মতো হাত তুলে চিৎকার ক'রে থামতে বললুম।

থামলো গাড়ী। ড্রাইভারকে আমাদের 'ট্র্যাজেডি' অবশ্য বুঝিয়ে বলে আবু মোটর স্যাণ্ডিল ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য মানুষের আবেদন জানালুম এবং পাছে সে, 'নেহি হুজুর! মাফ্‌ কি জিয়ে। ইয়েত' হাম নেহি লেঁকেজে' ইত্যাদি কিছু বলে বসে, তাই সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে মোটা কিছু বখশিস্ কবুলালুম।

'আইয়ে জনাব!' ড্রাইভার নেমে এসে লম্বা সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালো।…চলিয়ে হুজুর!

নদীয়ানের প্রস্তাবনা সঙ্গীতখানি মনে পড়ে গেল—"ছপেয়া—ছপেয়া! খুলিয়ে রেখেছো কোথায় পা?"

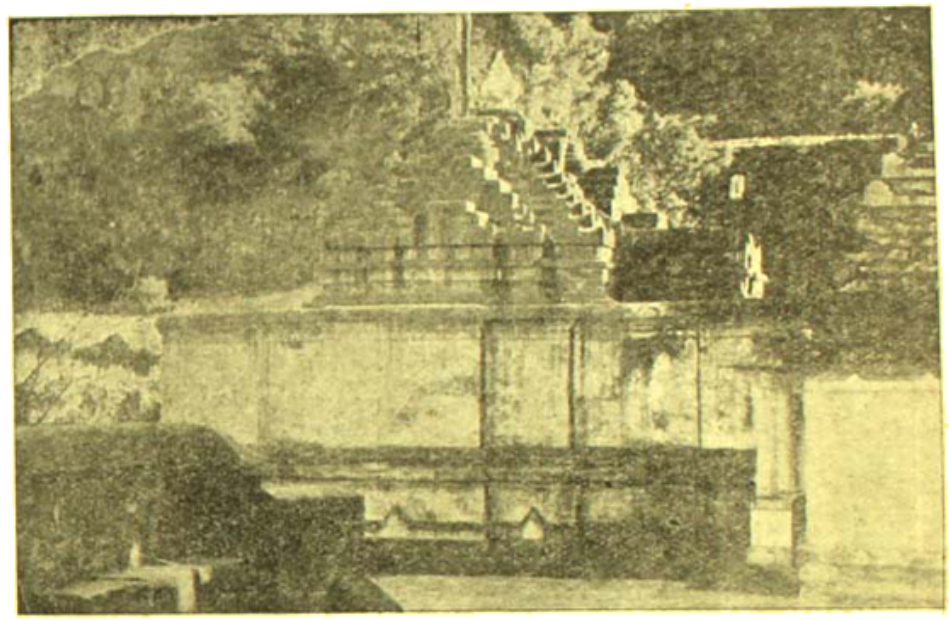

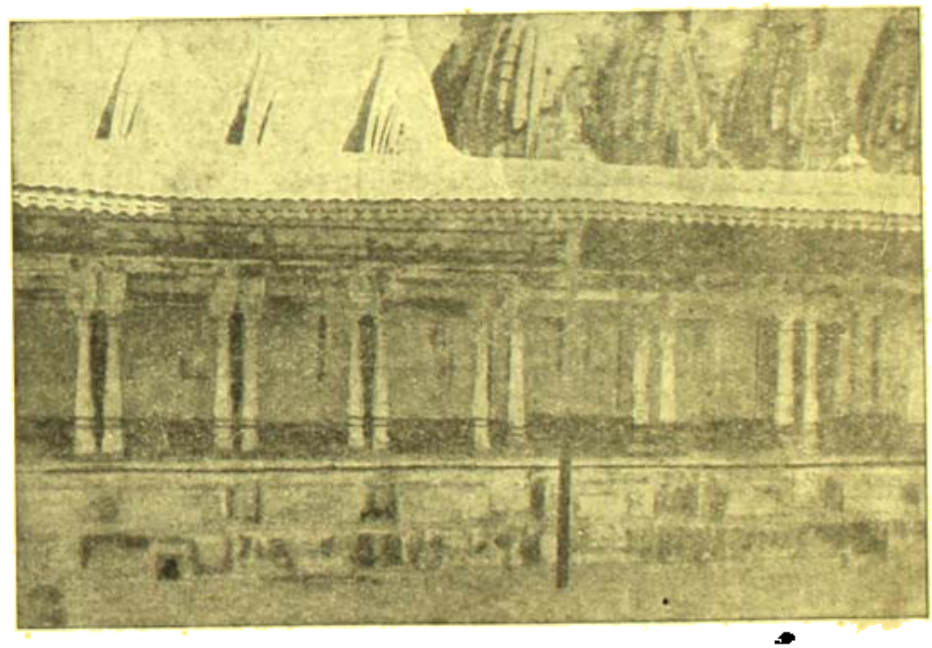

অচল গিরিশৃঙ্গের জৈনমন্দির

* * * *

আবু মোটর স্যাণ্ডিসের শক্তিসে পৌঁছেই একেবারে মারমুখো হ'য়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলুম। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই, ম্যানেজার

উঠে এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানালেন "আমার পাঁচজন ড্রাইভারই হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে শয্যা নিয়েছে। আপনাদের জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। কোথাও একটা 'ষ্টীকে' ড্রাইভারও খুঁজে পাইনি যে গাড়ী পাঠাই। শেষে বহুকষ্টে একজন বন্ধুর ড্রাইভারই গাড়ী যোগাড় ক'রে আপনাদের পাঠিয়েছি। তাই এত দেরী হয়ে গেছে! কিছু মনে করবেন না!

ম্যালেরিয়া! এই স্বাস্থ্যকর মাউন্ট আবুর এমন চমৎকার পরিবেশের মধ্যে? একেবারে পাঁচ পাঁচটা ড্রাইভার একসঙ্গে একই সময়ে আক্রান্ত! কথাটা চট করে বিশ্বাস ক'রতে পারলুম না! এতটা মিথ্যে খুব বড় রেখাঙ্কনের মনেও যেন চলে না।

মন্দির-পার্শ্বে

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীত ও চকিত হয়ে উঠলুম! সেটা কি ম্যালেরিয়া নিয়ে যাব? জিজ্ঞাসা করলুম—এখানেও ম্যালেরিয়া আছে নাকি? আপনি বলেন কি? ম্যালেরিয়াত' আমাদের বাংলা দেশেরই একচেটে!

পণ্ডিতজী একটু চোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন—আগে ছিলনা। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে হচ্ছে। তবে শহরে না। দেহাতে। আপনাদের কোনও ভয় নেই। ড্রাইভাররা সবাই শহরের বাইরে থাকে কিনা—স্নান করে লোকের এই স্রোতহীন রুদ্ধ পচা জলে, মশারি খাটিয়ে শোয়না—

আর কথা না বাড়িয়ে উপরে চলে গেলুম। স্থির হল—কাল আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাবো। সিরোহী মোটর সার্ভিসের সঙ্গে গাড়ীর ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনি শুধু ওদের অফিসে আমাদের পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। আমরা ভোর বেলায় বেরুবো। এঁদেরই পাঠানো গাড়ীর ড্রাইভারকে মোটা টাকা বখ্‌শিস্ দেওয়ার বোকামীটা তখন অনুতাপ হয়ে বুকে বিঁধছিল!

পণ্ডিতজী তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করে রাখবেন বললেন। আমরা সকলে 'এ্যান্টিম্যালেরিয়াল ট্যাবলেট' খেয়ে নিলুম! কি জানি বাবা! ম্যালেরিয়াকে বিশ্বাস নেই! যদি একবার ধ'রে তা'হলে সহজে ছাড়বে না!

পণ্ডিতজী কথা রেখেছিলেন। পরের দিন ঠিক ৬টার সময় গাড়ী এসে হাজির। গুপ্ত সাহেবের ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি সকালেই সপরিবারে মাউন্ট আবু থেকে নেমে গেছেন। যাবার সময় আমাদের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেছিলেন। 'অচলগড়' যাওয়া হ'লনা বলে মিসেস্ গুপ্ত খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম—আপনারাত' খুব কাছেই আছেন। পরবর্ত্তী যে কোন একটা ছুটিতে আবু মেলাবার থেকে এসে দেখে যাবেন।

শ্রীমতী গুপ্ত হেসে বললেন—তা'ত যাবই। কিন্তু, এমন সহজেতো আর ভাগ্যে ছুটবে না!

সিরোহী মোটর সার্ভিস ষ্টেশনে যথাসময়ে পৌঁছে শোনা গেল ওঁদের 'কার'খানি হঠাৎ বিগড়েছে। ঐ একখানি মাত্র গাড়ীই ওঁদের সম্বল। তবে দু'খানি বাস আছে বটে। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাঁরা একখানি বাসের ফাষ্ট-ক্লাশ সীটগুলি সব আমাদের জন্য রিজার্ভ করে দিতে পারেন। তাড়া মোটর গাড়ীর চেয়ে কম লাগবে—দশ টাকার পরিবর্ত্তে সাত টাকায় হবে।

'অচলগড়' দেখতে এসে ফিরে যাবো—মোটরকার পাওয়া গেল না বলে—সে পাত্র আমি নই। সকলকে নিয়ে বাসেই রওনা হওয়া গেল। বললুম, কলকাতায় অধিকাংশ সময়ই তো আমরা বাসে ট্রামেই যাতায়াত করি, সুতরাং এখানেই বা বাসে যেতে আপত্তি কি?

সিরোহী রাজ্যের অমর স্মৃতি-রঞ্জিত, আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু, ধূলা, বালি ভরা অনেকখানি নোংরা পথ অতিক্রম ক'রে আমরা ইতিহাস বিশ্রুত, রাজপুত বীরত্বগাথায় গৌরবান্বিত, সিরোহীর অমর কীর্ত্তি অচলগড়ে গিয়ে পৌঁছলুম। নবনীতা আবৃত্তি করতে সুরু করে দিলে—

"বাসনা ধরি সুরতানের বসায়ে নিল নিজ পাশ
কহিলা, বীর ভারত মাঝে কি দেশ 'পড়ে তব আশ?
কহিল রাজা—অচলগড় দেশের সেরা জগত পর,
সভার মাঝে পরস্পর নীরবে উঠে পরিহাস,
বাসনা করে অচল হ'য়ে অচলগড়ে কর বাস।"

সিরোহীপতি সুলতানের এই অচলগড় দুর্গ মাউন্ট আবুর মোটর ষ্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এখানে এখনও এমন সব অতি প্রাচীন-

কালের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চোখে পড়ে যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার পরিচয় বহন করছে।

অচলগড় দুর্গ আজ প্রায় ধ্বংসাবশেষ। সিরোহীপতিরাও কেউ সেখানে অচল হয়ে বসে নেই। ইতিহাস বলে—কোনও এক প্রামারা রাজপুত নৃপতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে এই দুর্গেশ দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অচলেশ্বর মহাদেবের ভক্ত সেবক। একথা যে সত্য ছিল তাঁর যুক্ত শক্তি ও বীর্য্যবলের বহুপীঠ. সেই অচলগড় আজ জীর্ণ ও ভগ্ন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবের মেউল অচলেশ্বর শিবমন্দির এখনও তার অস্তিত্ব অক্ষত রেখেছে। শিবলিঙ্গের পাশে শিবশক্তি "মীরা"দেবীর একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দির সম্মুখে একটি ধাতু নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বৃষ মহাদেব যানের স্মৃতির সঙ্গে অহমেদপুর সুলতান মহম্মদ বেগরার নিষ্ঠুর আক্রমণের চিহ্নও বহন করছে। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলতান মহম্মদ বেগরা আহ্‌মেদাবাদের অধীশ্বর ছিলেন। অচলগড়ের হিন্দু নৃপতিদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকতো। একবার নাকি এই দুর্দ্ধান্ত যোদ্ধা মহম্মদ বেগরা অচলগড় আক্রমণ করে তদানীন্তন হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তারপর রাজপ্রাসাদ দুর্গ ও নগর লুণ্ঠন করে বহু ঐশ্বর্য্যনিয়ে আহ্‌মেদাবাদ ফেরবার মুখে এই মন্দির তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি হিন্দু মন্দিরের ধনসম্পদের কথা জানতেন। মন্দির লুণ্ঠ করে সেই এই মূর্ত্তিকে তিনি আক্রমণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন এর পেটের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে, কিন্তু ঠিক এই সময় হর-কোপানলে (!) লক্ষ লক্ষ ভীমরুলের আক্রমণে অস্থির হয়ে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী ফেলে রেখে তাঁকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে হয়েছিল!

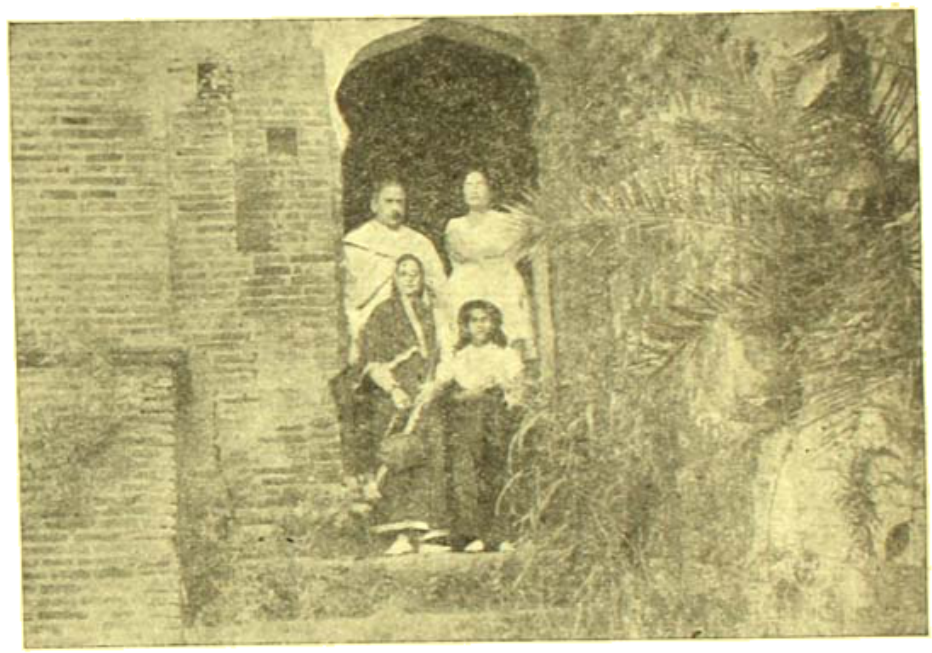

অচলগড় দুর্গ

অচলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে এখানে এক পৌরাণিক কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে যে, এক সময় দ্বারকাধিপতি বলরাম কোনও উদ্ধত রাজপুতের অসদ্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে হলাকর্ষণে অর্ব্বুদ পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে ফেলেছিলেন। বিপন্ন রাজপুত ভক্ত ভীত হ'য়ে ইষ্টদেব অচলেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াতে মহাদেব বারাণসীর বিশ্বেশ্বর মন্দির থেকে তাঁর বাম পদ প্রসারিত করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অর্ব্বুদ পর্ব্বত চেপে ধরেছিলেন। অচলেশ্বর শিবমন্দিরে এখনও মহাদেবের সেই পদাঙ্গুষ্ঠের চিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। বহু ভক্ত দূর দূরান্তর থেকে সেবাদিবের মহাদেবের এই পদচিহ্ন দেখতে আসে। ওঁরা বলেন—এই পদাঙ্গুলী পাহাড়ের বুকে এমন সজোরে চেপে বসেছিল যে সেখানে পৃথিবীর তলদেশ, অর্থাৎ একেবারে পাতাল পর্য্যন্ত একটি গভীর গর্ত্ত হয়ে গেছে। এই প্রবাদ সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্য পরবর্ত্তীকালে বারাণসী নাকি ক্রমাগত ছ'মাস ধরে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত এর মধ্যে জলঢালার ব্যবস্থা দিয়েও এ গহ্বরটি পূর্ণ করতে পারেন নি!

অচলেশ্বর শিবমন্দিরের বাটরগুপ ও গর্ভ মেউলের মধ্যস্থলে একটি বিশাল তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে প্রতি বৎসর মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের সময় এখানে একটি স্বর্ণের তুলাদণ্ড ঝোলানো হ'ত এবং সিরোহীপতিরা সেই তুলাদণ্ডে ওজন হ'তেন—অপরদিকের পাল্লায় স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তা অলঙ্কার আভরণ বসনভূষণ ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি রেখে। তারপর উৎসব শেষে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়া হ'ত রাজ্যের দীন দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত প্রজাদের মধ্যে।

মন্দির প্রাঙ্গণের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মেউল আছে। তার মধ্যে পার্ব্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ইত্যাদি নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অচলেশ্বর শিবমন্দির অচলগড়ে অচল হয়ে আছে, কিন্তু অচলগড় ভেঙে পড়েছে। সেই ধ্বংস স্তূপের উপর কিছুদিন আগে মালব প্রদেশের মাণ্ডু নগরবাসী দুই ধনকুবের শ্রেষ্ঠী একটি সুন্দর জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছেন। এই জৈন মন্দিরটি শিলাবারার মতো কারুকার্য্য-খচিত না হ'লেও, দেখবার মত বস্তু। অচলগড়ে রাণাকুম্ভ ও তাঁর পুত্র উদয়সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে পাহাড়ের বুকে শাঁওন-ভাদুয়ান (শ্রাবণ-ভাদ্র) নামে খুব জলাশয় আছে। শুনলুম এর জল নাকি

কখনো ফুরোয় না! যতই তোলো তবু পূর্ণ থাকে। জৈন মন্দিরটি তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর। দ্বিতল মন্দির। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চার কোণে চারটি তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। এ ছাড়া আরও ১৪টি মূর্তি আছে দেখলুম। গাইড বললে—এগুলি সব সোনার তৈরী, ওজন প্রায় বেড় হাজার মণ! কিন্তু, যা চক্ চক্ করে তাই সোনা নয়। পরে জেনেছি এগুলি পঞ্চ ধাতুর তৈরী। এখানে আরও একটি জৈনমন্দির আছে। সেটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

অচলগড়ের অচলশীর্ষে একটি 'ধুনি গুহা' আছে। শোনা গেল সেখানে একজন বাঙালী সাধু বাস করেন। একবার গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে 'ধুনি গুহা' পাহাড়ের এত উঁচু এক চূড়োর উপর যে সেখানে গিয়ে ওঠা এ বয়সে একেবারে অসম্ভব!

সাধু পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া গুরুশিখরের উপর একটি শিবের মন্দির আছে। আমার মনে হল মন্দী তৃপ্তী ইত্যাদি প্রথম জাতীর শিবানুচর গিরি অন্ত কারুর পক্ষে সেখানে ইচ্ছামত যাতায়াত করা বোধ করি সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার!

শোনা গেল, প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ের শোভা নিরীক্ষণের জন্য এখানেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-পিপাসু কোনো কোনো দুঃসাহসিক প্রেমিকেরা প্রায়ই আসেন। তাঁদের রাত্রিবাসের সুবিধার জন্য নিকটস্থ পার্বত্য গ্রাম 'চরিয়া'তে একটি সরকারী ডাকবাঙলা আছে। এখানে এসে যারা একবার উষাচলের পূর্ব দিগন্তে উষার সেই অপরূপ আবির্ভাব দেখে যান তাঁরা নাকি জীবনে আর সে অপূর্ব দৃশ্য কখনো ভুলতে পারেন না!

বিগত যৌবনের বিলুপ্ত সামর্থ্য স্মরণ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমরা অচলেশ্বর শিবালয় থেকে বেরিয়ে এলুম। কেবলই মনে হ'তে লাগলো—হায়, যদি পঁয়ত্রিশ আগেও যদি এখানে আসতে পারতুম! সেদিন পঁচিশ বৎসরের সেই দুর্দম যুবক মিশ্চয়ই সূর্য্যোদয় না দেখে ফিরতো না! মেবারাধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা কুম্ভ যিনি চিতোর গড়ে তাঁর বিখ্যাত "বিজয় স্তম্ভ" নির্মাণ করিয়েছিলেন, সিরোহী পতির এই অচলগড় তিনি আক্রমণ ক'রে অধিকার করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল পাই ১৪৩৩ খৃঃ অব্দ থেকে ১৪৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। টড সাহেব তাঁর রাজস্থানে বলেছেন রাণাকুম্ভ যখন অচলগড় জয় করেন তখনই এর প্রায় ভগ্নদশা। তিনি এই দুর্গের শোভা ও সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হন যে বহু অর্থব্যয়ে অচলগড়ের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন বা পুনর্নির্মাণ করেন তিনি।

রাণাকুম্ভের নির্মিত ঘোড়ার, হস্তিশালা, অস্ত্রাগার প্রভৃতিও আজ ধ্বংসোন্মুখ মাত্র! অশ্বারোহণে যে রাণীর জন্য তিনি এখানে সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন আজ তা শুধু ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ। অচলগড়ের কোনও দিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে আসছে কিনা লক্ষ্য রাখবার জন্য তিনি অচলগড়ে বিশেষ ভাবে একটি উচ্চ প্রহরীমঞ্চ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেটি এখনও সম্পূর্ণ ভূতলশায়ী হয়নি। রাণাকুম্ভের নাম উৎকীর্ণ করা আছে এই শিলামঞ্চের গায়ে। রাণীর মহলের দু-একখানি ঘর এবং উপরে উঠবার সিঁড়িটি এখনও অক্ষত আছে। আমরা এর সর্বোচ্চ ধাপের উপর উঠে সিঁড়ির একখানি ছবি তুলিয়েছি। অচলগড়ের ভিত্তিমূলে পর্ব্বতগর্ভে একটি বিপুল গুহা আছে। গাইড বললে, মন্দাকিনী তীরে পাষাণ মহিষের ও আমরা পুণ্যশ্লোক মহারাজা হরিশ্চন্দ্র এখানে বাস করতেন!...তখন মন এমনই ভারাক্রান্ত যে এই আশ্চর্য্য কথার প্রতিবাদও মুখ দিয়ে বেরুল না!

অচলগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সজল চক্ষে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। নিকটেই একটি চতুর্দ্দিক পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো প্রকাণ্ড সরোবর চোখে পড়ল। জলশুকিয়ে অর্দ্ধেকের অধিক তলা বেরিয়ে পড়েছে। অর্দ্ধেকটায় এখনও একটু জল আছে। ভাঙাগোলা নোংরা সে জল। চারপাশের বাঁধানো পাথরের সিঁড়ির একদিক একেবারে ভেঙে ধসে পড়েছে। আর একদিকও প্রায় যায় যায় অবস্থা। যেটুকু আছে তা থেকে বোঝা যায় একসময় এ কি মনোহর সরোবর ছিল। চারপাশের উঁচু পাথরের পাড়ে আগাগোড়া কারুকার্য্য করা লতাপাতা উৎকীর্ণ রয়েছে। 'গাইড' বললে এ সরোবরের নাম—'মন্দাকিনী'

হত! সুখসুপ্ত আজ এ স্বর্গের মন্দাকিনীকে ব্যঙ্গ করলেও, এর অতীত গৌরবের যুগে এ ছিল একদা সার্থকনামা নদনী। এর জল সেদিন ভাগীরথীর ন্যায় পুণ্যদায়ক বলেই গণ্য হত। এই মন্দাকিনী তীরের একদিকে পাশাপাশি তিনটি প্রকাণ্ড আকারের পাথরে গড়া মহিষ রয়েছে। মহিষ তিনের পশ্চাতে বন্দুকধর হাতে প্রথমা রাজ্ঞী আদিপালের

মন্দির দ্বার

একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি ছিল। সেটি এখন ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। গাইডের মুখে গল্প শুনলুম তিনটি অপদেবতা বা দানব নিত্য রাত্রে সরোবরে মহিষের মূর্তি ধারণ করে এসে এই সরোবরের সমস্ত জল শোষণ ক'রে সরোবরটিকে কর্দমাক্ত করে রেখে যেত। নৃপতি আদিপাল ক্রুদ্ধ হয়ে একদা রাত্রে উঠে এসে একটি বাণেই একসঙ্গে সেই তিনটি মহিষরূপী দানবকে গেঁথে ফেলে বধ করেছিলেন।

আমাদের গাইডটি একটি রাজপুত তরুণী। আভে গোয়ালিনী। দেখতে সুন্দরী, কথাগুলিও তারী মিষ্টি! তাকে এত-ভালবেসেছিল যে আমরা তার একটি ছবি তুলে নিয়েছি! অচলগড়ের গাইডরা সবাই মেয়ে। তা'লে এটাকে যেন মণিপুরী রাজকন্যার রাজ্য মনে

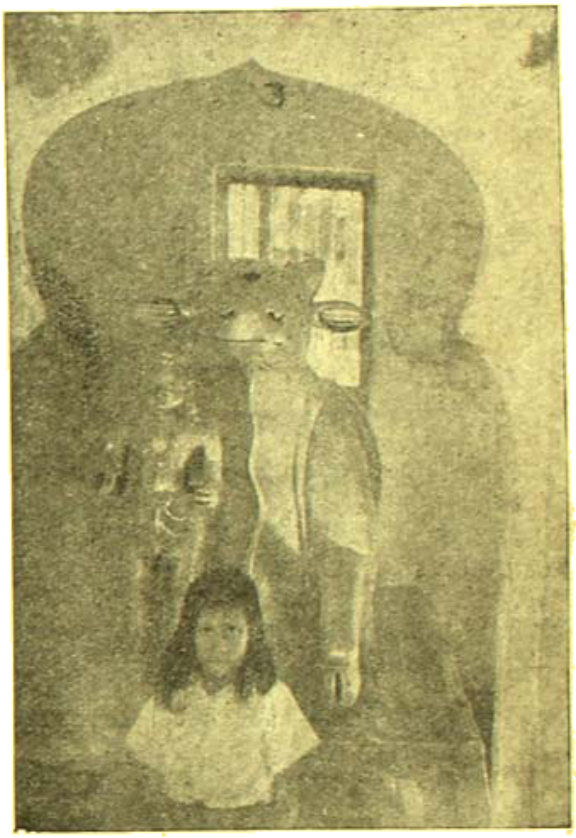

মন্দির সম্মুখের দৃশ্য

করবেন কেউ। পুরুষ আছে। কিন্তু পথপ্রদর্শকের সহজ কাজ করে তারা মিজেদের পৌরুষকে অপমান করে না।

ইতিহাস বলে অচলগড় দুর্গ ১০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রমার-রাজ নির্মাণ করিয়েছিলেন। আমরা আজ ত্রিকিয়দধিক একহাজার বছর পরে গিয়ে দেখলুম শুধু তার ভগ্ন দীর্ণ দুর্গ ও বিধ্বস্ত কঙ্কাল।

(ক্রমশঃ)

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

মৌন মুখর অন্তরেতে
কল্পলোকের কবিতা
হারিয়ে ছিল চপল হাতে
দীপ্ত আলোর কবিতা।

ধরণের স্নেহ মাটির বুকেতে
নামে নিরালায় চুপে
আকাশের তার প্রণাম আলোয়
কর্ম আরতি ধূপে।

শিক্ষানবিশি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিন্তু ভোনাকে এড়াবার ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন তাকে এড়ানো গেল না।

গোষ্ঠাষ্টমী তিথি। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোচারণে গিয়েছিলেন, তাই একে উপলক্ষ করে ইস্কুলের হেড্ মাষ্টারেরা গোচারণ বন্ধ করে দিলেন। একটার সময় চন্ চন্ করে ছুটির ঘণ্টা বাজতেই ছেলের দল হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে রঙ্কু, কোত্থেকে ভোনা এসে পাকড়াও করলে।

—কি রে, খুব মাতব্বর হয়ে গেছিস যে। আজকাল তো তোকে দেখতেই পাওয়া যায় না।

—ছাড়ো, বাড়ি যাব।

—বাড়ি যাবি! ওঃ—একেবারে গুড্ বয়—বাড়ি গিয়ে দুধ-ভাত খাবে। নেঃ—অত ভালো ছেলে হতে হবে না। চল, মেলায় চল।

—মেলায়?

—হ্যাঁ—গোষ্ঠের মেলায়। অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি রে? আমরা সবাই যাচ্ছি, চল।

রঙ্কু বিব্রত হয়ে বললে, তা হলে বাড়ি থেকে মা-কে বলে আসি।

—কথা শোনো—এর জন্যে আবার মা-কে বলতে হবে। রাখ, রাখ—অত ভালো ছেলে না হলেও চলবে। চল, দল বেঁধে যাচ্ছি, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

গোষ্ঠের মেলা! রঙ্কুর মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। গোষ্ঠের মেলার নাম শুনেছে সে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। শুনেছে, খুব বড় মেলা। নাগরদোলা আসে, টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ আসে, নানা রঙের খেলনা আসে, আর আসে বড় বড় আড়াইসেরী কদমা। গত বছর মেলা-ফিরতি মানুষ যেপেছে রঙ্কু, মনে হয়েছে খুব বড় একটা উৎসবের আনন্দ থেকে ফাঁকি পড়ল সে—বাদ পড়ে গেল।

—খুব দেরী করবি না তো?

—না, না, তুই চল্ না। ভয় নেই, হারিয়ে যাবি না। আঁচল-চাপা ছেলেকে আবার মার কোলে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেব—দেখে নিস।

কথাটা বলে গালের পাশ দিয়ে জিভ বার করে ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে অবজ্ঞার হাসি হাসলে ভোনা।

খাঁদু বাঁকা মন্তব্য করলে, কেন ওকে টানাটানি করছিস? বাড়িতে ওর দুধ-ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আর একজন বললে, আমাদের সঙ্গে গেলে বাড়িতে ও পিঠি খাবে।

হঠাৎ পৌরুষে ঘা লেগে গেল রঙ্কুর: বেশ তো, চল্ না। আমি কি কাউকে ভয় করি না কি? কণ্ঠস্বরটা এতক্ষণে বেশ তেজোদৃপ্ত শোনালো তার।

খুশি হয়ে ভোনা তার পিঠ চাপড়ে দিলে: সাবাস, এই তো চাই। এখন থেকেই মরদের মতো হয়ে উঠতে হবে—বুঝলি? অত তুতুপুতু করলে কি চলে?

পরমোৎসাহে পায়ের তালি মারা চটি জোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভোনা চলতে সুরু করে দিলে। চলার তালে তালে হাতীর পায়ের মতো শব্দ উঠতে লাগল। তারপর বিকট ভঙ্গিতে যাত্রার দলের জুড়িদের মতো কানে হাত দিয়ে তারস্বরে থিয়েটারের গান ধরলে একটা:

"কালো পাখাটা মোরে
কেন করে এত জ্বালা—আ—তন—"

ট্রী-প্যারেডির মতো সেইটেই মার্চিং সং। নেতাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে ছেলের দলও অগ্রসর হল।

গোষ্ঠের মেলা ঠিক শহরের মাঝখানে বসে না। বসে শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে—সাহানগর বলে একটা গ্রামে। ইস্কুলের ওপারে রেলের লাইন, সেই রেলের লাইন পেরুলে মাঠ সুরু। ঘাস হয় না, পোড়ো পতিত জমি। মাঠ ছাড়িয়ে একটা নদী, তার পাশে

তাগাড়—শকুন, গিধ্রা শকুন, আর টেলিগ্রামের তারে তারে সঞ্চিত। তারপরে বড় রাস্তা, বাগান, পুরোনো আমলে সাহেবদের ভাঙা-চুরো একটা জংলা কবরখানা। বেশির ভাগ কবরের জীর্ণ দশা, মার্বেল ফলকের ওপরে লেখাগুলো কালো আর কাপ্‌সা হয়ে গেছে। শুধু শ্লেট পাথরের গায়ে একটা স্মারকলিপি জ্বল জ্বল করছে : 'পিটার হপ্‌কিন্স—জন্মিলা ১৮৩২ সনে, লাভ করিলা যীশুর শান্তিময় ক্রোড় ১১ই মার্চ ১৮৮৫ সনে'। সেই সঙ্গে একটুকরা কবিতার লাইন : "পিতার অপার প্রেম সকল সংসারে।"

এই কবরখানার ওপারেই সাহানগর গ্রাম। আর এখানে এসে পৌঁছুতেই যেন বহুদূরে সমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া গেল—মেলার কলরোল। অতীত মৃত্যুর স্তব্ধ বিষণ্ণ রূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রঞ্জুর মনটা যখন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন দূর থেকে ওই মেলার কলধ্বনি যেন হঠাৎ তাকে খুশি করে তুলল।

সারাটা পথ অজস্র বকাঝকি করতে করতে এসেছে তোনা। নানা সুরে নানা রকম গান গেয়েছে, মুখভঙ্গি করেছে, আগে আগে যে সমস্ত লোক মেলায় চলেছিল তাদের ভেংচিয়েছে এবং পা থেকে চটি ঝোড়াকে সব সময়ে দশ হাত করে এগিয়ে রেখেছে। একবার তার এক পাটি আর একজনের গায়ে লেগেছিল, সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই তোনা দলবল নিয়ে একেবারে তেড়ে গেল। লোকটা বিড় বিড় করে বললে, অসভ্য বানরের দল।

তোনা জবাব দিলে, তাই তো তোমায় ডাকি দাদা হনুমান!

সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য ছেলেরা সুর ধরলে, দাদা হনুমান ওগো, দাদা হনুমান।

নিজের সম্মান রাখবার জন্যে লোকটা আর বাক্যব্যয় করলে না। বেগে পা চালিয়ে দিলে। পেছন থেকে খাঁদু ডাক দিয়ে বললে, রাগ করে চললে দাদা, নিতান্তই চললে? তা হলে বাড়ি গিয়ে চারটি বেশি করে ভাত খেয়ো—কেমন?

রঞ্জুর এতক্ষণে অনুতাপ হচ্ছিল। ভারী বিশ্রী লাগছে, অত্যন্ত আত্মগ্লানি বোধ হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় এদের সঙ্গে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে। ওদিকে খাঁদু আবার একটা বিড়ি ধরিয়েছে, পরমানন্দে মুখটাকে বিকৃত করে ধোঁয়া ছাড়ছে। রঞ্জুর ভয় করতে লাগল। যদি চেনা জানা কেউ দেখতে পায়, যদি বাড়ি গিয়ে বলে দেয়—তাহলে, তাহলে তার পরের অবস্থাটা কল্পনাও করা চলে না।

অন্যান্য পথচারীরা বাঁকা দৃষ্টিতে বারে বারে এদের দিকে তাকাচ্ছে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই দলটির ওপরে কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়। একজন তো পরিষ্কার বললে, এই বয়েসেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে, কী চমৎকার ছেলে তৈরী হচ্ছে সব!

খাঁদু করে হাবুল জবাব দিলে, খাই তো খাই, কার বাপের পয়সায় খাই?

সঙ্গে সঙ্গে তোনা সুর করে 'অজদের রায়বার' বলতে সুরু করলে : "মোর বাপ কি তোর বাপকে বেঁধেছিল ল্যাজে?"

খাঁদু আরো একটু রসান দিলে : "এতগুলি রাবণ মধ্যে কোন্‌টি তোমার পিতা?"

যে মন্তব্য করেছিল সে চুপ হয়ে গেল।

সমস্ত পথটা যেন ঘমযন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। এক একবার ভাবছিল ফিরে চলে যায়, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। এরই মধ্যে খাঁদু আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, এই, বিড়ি খাবি?

—না।

—না না। কেউ টের পাবে না।

—না ভাই।

—ওঃ—একেবারে ভালো ছেলে!

তোনা ইংরেজি করে ছড়া কাটলে :

Jim is a good dog
Every day he catches a frog—

ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু কবরখানা ছাড়াতেই যখন মেলার কোলাহলটা কানে গেল তখন রঞ্জু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সমুদ্রের ডাক—অজানা, অপরিচয়ের দূর সমুদ্র। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই সেখানে। সেখানে নাগরদোলা ঘুরছে, সেখানে টিনের বাক্সে বারোস্কোপ, সেখানে চারপেয়ে মানুষ আর দু'পেয়ে গোরু, সেখানে রঙীণ বেলুন আর আড়াই সেরী কদমা। এতটা পথ ভাঙা এতক্ষণে সার্থক হয়েছে।

দলটা মেলায় এসে ঢুকল। সত্যিই মস্ত বড় মেলা। নতুন একটা শহর দেখেছে রঙ্কু—দেখেছে অনেক মানুষ। কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষকে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে রইল রঙ্কু।

ভোনা হাঁচকা টান দিলে একটা। বললে, অমন বাঙালের মতো হাঁ করে আছিস কী? চলে আয়। মেলায় কেনাকাটা করতে হবে না?

—কেনাকাটা! কিন্তু বাড়ি থেকে তো পয়সা আনিনি।

—দূর গাধা!—ভোনা জিভ্ বের করে চোখ উল্টে ভঙ্গি করলে একটা: মেলায় জিনিস কিনতে এলে আবার পয়সা লাগে নাকি?

—পয়সা লাগে না?—এ একটা নতুন খবর শোনা গেল। রঙ্কু আশ্চর্য হয়ে বললে, পয়সা লাগে না? তা হলে বিনি-পয়সায় দেয় নাকি?

—হুঁ:—বিনি-পয়সায় দেবে? তোর শ্বশুর কিনা সব। ভোনা এবার সত্যি সত্যি ভেংচে দিলে।

—তা হলে কিনবি কী করে?

—হাতের জোরে।

—হাতের জোরে? সে আবার কী?

—আঃ—এই বাঙালকে নিয়ে তো ভারী জ্বালাতনে পড়লাম। চলে আয় না, দেখতেই পাবি সব—ভোনা রঙ্কুকে টেনে নিয়ে চলল।

বেশি দূর যেতে হল না—সামনেই একটা বড় মণিহারী দোকান। তালা চাবি, ছুরি কাঁচি থেকে সুরু করে সাবান তেল, স্নিংয়ের মোটর, চুলের রেশমি ফিতে, জাপানী পুতুল—সব কিছুর বিপুল সমারোহ। দোকানে ভয়ঙ্কর ভিড়। দু তিনজন লোক একসঙ্গে জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না।

ভোনা বললে, চল, এখানেই দেখা যাক।

দোকানের সামনে ভোনা বসল তার দলবল নিয়ে। এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর দর জিজ্ঞাসা করে।

—এই সাবানটা কত?

—তিন আনা।

—ছয় পয়সায় হবে না?

—না।

—ওই রেলগাড়ির দাম কত?

—বারো আনা।

—ছ আনায় দেবেন?

—না।

—সাড়ে ছ' আনা?

—কেন অকারণে বকাচ্ছ খোকা? নিতে হয় নাও, নইলে চলে যাও।

—খালি খালি খদ্দেরকে অপমান করলেন মশাই? চাই না আপনার দোকানে কিনতে। চল্ খাঁদু—একটা বীরত্বসূচক ভঙ্গি করে ভোনা উঠে দাঁড়ালো।

দোকানদার বললে, ধত সব বখাটে ছোকরা!

ভোনা শাসিয়ে উঠল: শাট্ আপ্! আপনি আমাদের গার্জেন নন।

দোকানদার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পর পর পাঁচ সাতখানা দোকান। একটা জিনিসও কিনল না ভোনা, খালি দরাদরি করলে, দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে। রঙ্কুর একেবারেই ভালো লাগছিল না; লজ্জায় অপমানে তার মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এরা সবাই তো তাকে ওদের মতোই বখাটে ভাবছে। তবু দলের সঙ্গে ঘুরছিল যন্ত্রের মতো। আর ভাবছিল বাড়ি গিয়ে মা-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়?

খানিক পরে ভোনাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে উঠল। বললে, আর নয় খাঁদু, কী বলিস?

খাঁদু বললে, হ্যাঁ—মন্দ হয়নি।

মেলার ভিড়টা ছাড়িয়ে দলটা এবারে চলে এল একেবারে গো-হাটার কাছে। এখানে লোক পাতলা, কয়েকটা ছোট ছোট চালার নীচে জনকয়েক লোক গোরু নিয়ে দরাদরি করছে। দাঁত পরীক্ষা করছে, শিং দেখছে; ল্যাজ তুলে তুলে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে। গোবর আর ধুলোর একটা মিশ্রিত গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

এইখানে একটা বড় বট গাছের ছায়ার নীচে ওরা এসে বসল। ভোনা বললে, নে এবার, বার কর সব।

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওদের পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরি, সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, এমন কি একরাশ খেলনা পর্যন্ত। সব একসঙ্গে জড়ো করা হল। রঙ্কু নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

চোখ টিপে জিভ বের করে হাসল ভোনা।

—কেমন পরিষ্কার হাতের কাজ দেখলি তো? কোনো ব্যাটা টের পায়নি।

রঞ্জুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল, গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গলা থেকে অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতো একটা স্বর বেরুল: তোমরা চুরি করেছ?

—আঃ দাদা, অমন করে চেঁচাস না। এ চুরি নয়, এর নাম হাতসাফাই। তুই একটা হাঁদা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়েছিলি বটে, কিন্তু তোরও ভাগ আছে। নে দাঁড়, হিসেব কর—

রঞ্জুর এবারে বাকশক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে যেন প্রাণপণ বলে কে তার জিভটাকে টেনে ধরছে গলার ভেতর, একটা অপরিসীম ভয়ে চারদিকের পৃথিবীটা তার কাছে বারে বারে একটা কাপ্‌সা কুজ্ঝটিকার আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

—পাঁচ—

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জু। ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছে না। পা কাঁপছে তার, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়বার মতো একটা অবিচ্ছিন্ন আর অস্বস্তিকর অনুভূতি। তীব্র তৃষ্ণায় তালুর শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিলতে গেলেও যেন গলার ভেতরে খচ খচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে।

জামার পকেটে খস খস করছে একখানা সাবান আর একটা সুতোর গুটি। আজকের লুটের মাল, ভোনা ঠকায়নি, ভাগ দিয়েছে। পথে আসতে আসতে অন্তত একটা চৌকীদার আর পাহারাওলার মুখ চোখে পড়েছে তার অন্তত চমকে চমকে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। চুরির অংশ নিয়েছে সে—সে চোর। আর সেই অপরাধের ছাপ্পর আঁকা রয়েছে তার মুখে, জল জল করছে, ঝক মক করছে। যে দেখবে সেই মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে—সে চোর।

বাতাসে দুটো চুল মুখে এসে উড়ে পড়তেই অকারণে শিউরে উঠল রঞ্জু। মনে পড়ল একবার একটা অদ্ভুত আর বিশ্রী পোকা দেখেছিল সে। পোকাটা বারান্দার ওপর দিয়ে কিলবিল করে চলে যাচ্ছিল, আর চলার সঙ্গে সঙ্গে এঁকে যাচ্ছিল আলোর একটা নীলাভ উজ্জ্বল রেখা। মনে হল তার কপালের ওপরে ওই রকম একটা কুৎসিৎ পোকা যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, আর ক্রমান্বয় উজ্জ্বল হয়ে সেখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে: চোর—চোর—

পকেট থেকে সাবান আর সুতোর গুটিটা সে বের করে আনল, তারপর সোজা ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাশের অন্ধকার বাগানটার ভেতরে। এইবারে সে নিশ্চিন্ত—এইবারে মনের ওপর থেকে ভারটা নেমে গেছে তার। শুধু চুরি করে আনা সাবানটার একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল তার দুটি আঙুলে, ছড়ে রইল তার জামার পকেটটাকে।

জীবনের অনেক মিষ্টি গন্ধের পেছনেই ওই চুরি আর অপরাধের ইতিহাস—এ অভিজ্ঞতার সময় তখনো তার আসেনি।

খাতার পাতায় হিসেবটা আবার গোলমাল হয়ে যায়। ছিঁড়ে যাচ্ছে ধারাবাহিকতা—পেছনের কালো পর্দার ওপরে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের মতো এলোমেলো ছবি ফুটে উঠছে। কত চেনা পথ, কত ঘর-বাড়ি, কত আশ্চর্য ঘটনা, আজকে নিশ্চিহ্নভাবে ভুলে গেছে রঞ্জু, কেউ মনে করিয়ে দিলেও মনে পড়ে না। কিন্তু কবে—কোন ছেলেবেলার নীল রঙের একটা ছোট পাখি এসে রঞ্জুর জানালার ওপরে বসেছিল; ছোট ঘাড়টি বাড়িয়ে কৌতূহলভরা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল এক মুহূর্ত, তারপর লাল ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে একটা ছোট মিষ্টি ডাক দিয়ে আবার উড়ে চলে গিয়েছিল—পরিষ্কার মনে আছে সেটা। পাখিটার স্বচ্ছন্দ বলবার ভঙ্গি, তার সবুজ চোখে দুষ্টুমি-ভরা জিজ্ঞাসা—এ ভোলবার নয়, কোনোদিন ভুলবে না রঞ্জু।

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফেরবার কতদিন পরে? তিন মাস? ছ মাস? ন সপ্তাহ? আরো কি ঘটেছিল এই সময়ের মধ্যে? এই চুরির প্রতিক্রিয়া কতদিন মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল? হিসেব মেলে না। সমস্ত

হিসেব তলিয়ে যায় বজ্রের মতো আকাশ-ফাটানো একটা উন্মত্ত গর্জনে।

—"বন্দে মাতরম্—"

—"মহাত্মা গান্ধী কী জয়—"

উনিশ শো তিরিশ সাল।

উত্তরাপথের গিরি দুর্গ আর দক্ষিণের নীল সমুদ্র উন্মথিত করে উচ্চারিত হল সংকল্প বাক্য :

"আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদক দ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী। দিকে দিকে রুদ্র ধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই একটি নাম। ভারতবর্ষের মূর্তিমান প্রাণপুরুষ যাত্রা করলেন ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের অগ্রচর হয়ে। আরউইনের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্ত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন : "মেরা এক কদমসে সারে হিন্দোস্তান উথাল্ পাথাল্ হো জায়গা—"

নিরুত্তাপ প্রশান্ত কণ্ঠ—স্পর্ধা নেই, অহমিকা নেই। কিন্তু ওই একটি কথাই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল্-পাথাল্ হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সে কি ভোলবার দিন। ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরোধ করে দাও ল্যাঙ্কাসায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও সৌখান বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানের লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর করে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয়-উষ্ণীষ পরে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠো।

রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বিলিতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। রঙ্কু একদিন বাবাকে দেখেছিল এমনি করে কাপড় পোড়াতে, কিন্তু সেদিন যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাকে একটা পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড়ো করে তাতে আগুন ধরানো হয়েছে, তার ধোঁয়াতে এক মাইল দূরে থেকেও কাশতে কাশতে দম আটকে আসছে লোকের। দেশি বিলিতী মদের বোতল চুরমার হয়ে রাস্তায় গড়াচ্ছে।

কী আশ্চর্য দিন—কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা।

আর একটা তিরিশ সালের কথা মনে আছে রঙ্কুর। তেরশো তিরিশ সাল। ফেঁপে উঠেছিল আত্রাই—ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর। আজ উনিশ শো তিরিশ সালে আর এক বন্যা দেখল রঙ্কু। প্রকৃতির কূল ভাঙা বান নয়—বাঁধভাঙা জীবন-বন্যা। সে বন্যা উত্তর বঙ্গকে ভাসিয়েছিল, এ ভাসিয়ে দিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে। মাঠ-ঘাট গ্রাম-গ্রামান্ত—কোনো কিছু বাকী রইল না।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন ঊর্ধ গগনে মাদল বেজেছে, নিচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণ দলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে "যাওা উচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল করে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ। কোন্ নির্লজ্জ এক ঘুষখোরী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল : জুতি-মার্কা খাও, খাও গে? একখানা বিলিতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল, নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। স্টেশনের সামান্য কুলি পর্যন্ত সাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণাবোধ করলে, বললে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি, রঙ্কুও পারল না।

বেশ পরিষ্কার মনে আছে। দশটা বাজতে না বাজতেই

বাঁধা নিয়মে ভাত খেয়ে রওনা হয়েছিল ইস্কুলের দিকে। কিন্তু খানিকদূর এগোতেই বাধা পড়ে গেল। দলবল নিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো ভোনা।

হ্যাঁ—সেই ভোনা। সেই সার্কেল আর বাহুবন্দী চ্যাম্পিয়ান, হাত সাফাইয়ে বিশারদ, মুখ্রী কদর্য আলোচনায় মুখ খোলা সেই ভোনা। আজ সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে তার। মাথায় বন্দরের টুপি, বুকে ব্যাজ, হাতে পতাকা। শুধু ভোনা নয়, কালী, খাঁদু, পূর্ণ—সবাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রঙ্কু?

—ইস্কুলে।

ভোনার দলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর অনুকম্পার রেখা।

—শেম্! শেম্!

—ধিক্।

—লজ্জা হয় না?

নেতার মতো উদাত্ত উদার ভঙ্গিতে ভোনা তুলে ধরল পতাকাটা: এখনো ইংরেজির মোহ? এখনো গোলাম-খানায় ঢুকতে চাস? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

লজ্জায়, অপরাধ বোধে সংকুচিত হয়ে উঠল রঙ্কু: কী করব তবে?

—আমাদের সঙ্গে চলে আয়।

—কোথায় যেতে হবে?

—ইস্কুলে পিকেটিং করতে।

ওরা রঙ্কুকে ডাকলে বটে কিন্তু রঙ্কুর জন্যে আর অপেক্ষা করলে না। মুহূর্তে ফ্লিলের ভঙ্গিতে ভোনা অ্যাবাউট টার্ণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে গেল। বেশ জোরে জোরে বার করেক পা ঠুকে ভোনা গান ধরলে:

"মোরে সোনেকি হিন্দুস্তান,
তু হামারা দিল্‌কা রোশ্‌না
তু হামারা জান—"

তার পরেই গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওরা। উৎসাহে, উল্লাসে ওদের চোখ মুখ ঝলমল করছে, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটা কঠিন সংকল্পের নির্ভুল ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওদের সর্বদেহে। উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে নুগলক্ষিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেশনের কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় থেকে সুরু করে ভোনা, পূর্ণ, কালী, খাঁদু পর্যন্ত, কিছু আর অবশিষ্ট নেই—কেউ বাদ নেই আর। বন্দেমাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমা বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে?

রঙ্কু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়িঘর—কোনো কিছুর আজ যেন আলাদা কোনো রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোনো রকমের। আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে—ধরেছে একটিমাত্র রঙ—ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ করে একটা গম্ভীর মধুর সুরের রেশ অনুরণিত হচ্ছে: বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

স্মৃতির মধ্যে চমক দিয়ে উঠল একটি নাম: অবিনাশ বাবু! আজ এতদিন পরে রঙ্কু চিনতে পারল যেন অবিনাশ বাবুকে, যেন এতদিন পরে তার কাছে এই অবারিত রৌদ্র ধারার মতো প্রত্যক্ষ আর দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যেকটি কথা। একটা আকস্মিক আত্ম-চৈতন্যের বিস্ময়ে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে উঠল রঙ্কুর:

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়—"

এই তো স্বদেশ—এতদিন পরে এই তো স্বদেশ তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই যমুনা, এই গঙ্গানদীর ওপার আজ থেকে আমাদেরই তো অধিকার, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে তাদের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ আর বইবে না। আমরা জেগেছি, আমরা জাগব। আজ এই মুহূর্তটির জন্যে বেঁচে থাকা উচিত ছিল অবিনাশবাবুর, আজ এই মুহূর্তে তাঁর দেখে যাওয়া উচিত ছিল তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

রঙ্কু দু'হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলে একবার—যেন তার ঘুম ভেঙেছে। তারপর নিজের ভেতরে কিছু একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে জোর পায়ে ইস্কুলের দিকে এগিয়ে গেল সে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার ভূমি-ব্যবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্ত্তী অবস্থা

বহু অনিশ্চয়তের পর জমিদারেরা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কতকটা সুস্থির হইয়া বুঝিতে পারিলেন, যে পরিমাণ রাজস্ব অর্থাৎ বাৎসরিক ২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা ইংরাজের হিসাবেও প্রজার নিকট যত টাকা আদায় হওয়া সম্ভব, তাহার এগারো ভাগের দশ ভাগ। তাঁহারা ইংরাজের ন্যায় জবরদস্তি করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন না, অধিকাংশ প্রজার নিকট খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন না, অথচ যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারিলে সূর্য্যাস্ত আইনে তাঁহাদের জমিদারী "লাটে উঠিয়া" যাবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়। এই দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া বহু জমিদারী হস্তান্তর হইতে থাকে। কোনও কোনও জমিদার দেয় রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছেন এবং খাজনা বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বহুবিধ উপঢৌকন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঁধিয়া লইবার পর অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর সাধারণ জমিদারদিগের দুঃসময় গিয়াছে এবং বহু নূতন জমিদার জলবুদ্বুদের মত উঠিয়া অল্পকালের মধ্যে জলমগ্ন মিলিয়াছেন। যদি হিসাব লওয়া যায় দেখা যাইবে, মাত্র কয়েকটী জমিদার বংশপরম্পরায় ইংরাজের নিকট ইজারা লওয়া জমিদারী ভোগ করিতেছেন এবং পুরাতন স্থলে অজাতকুলশীল বহু নবীন জমিদার আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভূমি স্বত্বে জমিদার ও প্রজা

ইংরাজ যখন বাদশাহ বা নবাব সরকার হইতে জমিদারী বা দেওয়ানী গ্রহণ করে তখন প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি পায় নাই। আমারী খাজনার কতকাংশ নিজেরা রাখিয়া বাকীটা নবাব সরকারে জমা দিবার ব্যবস্থা হয়। ইংরাজের সমসাময়িক অপর জমিদারদিগেরও সহিত অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে যে সকল জমি টাকা বিলি হইত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি কাটিয়া চাষের উপযোগী করা যাইত, অথবা নূতন জমিপে জমির পরিমাণ বেশী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত, সেই সকল ক্ষেত্রে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়া, ইংরাজই হউক অথবা অপর জমিদারই হউক, নিজেদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরও প্রজা ও চাষের লোকের অভাব, দেশের মধ্যে নানা অশান্তি, যে সকল উপায়ে অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার কোনটাই প্রয়োগ করার দিকে সুবিধা হয় নাই। অবস্থা কতকটা শান্ত হইলে জমিদারেরা নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জমিদারীতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

যখন সচ্ছল জমিদারেরা প্রজার স্বার্থ বা অন্যায় দাবীতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, তখন প্রজারা অলস থাকেন নাই। বিশেষতঃ যে প্রজা নিজ চেষ্টায় আর্থিক উন্নতি করিয়া নিজেরাই প্রচুর জমির মালিক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জমিদারদিগের অত্যাচার ও দাবীর কথা সবই জানা ছিল। সুতরাং প্রজার শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে এবং প্রজা ক্রমে ক্রমে কেবল যে জমিতে অধিকতর স্বত্ববান হইতে থাকেন তাহা নহে, জমিদারের পক্ষে খাজনা ছাড়া যে সকল দাবী থাকিত, তাহাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসে। ১৮৮৫ সালের ভূমি রাজস্ব আইন এ বিষয়ে একরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। তাহার পরও যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রজার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজা সঙ্ঘবদ্ধনে কৃষিকার্য্য করিয়া কতক পরিমাণে জমির উন্নতিসাধনে বত্নবান হইয়াছেন।

অবনতির পথে

জমিদার ও প্রজার মধ্যে এই সদা একটা বিরুদ্ধভাব উপস্থিত হইয়াছিল। জমিদারদিগকে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান দেখিয়া ইংরাজ তখন প্রজাকে জমিদারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে থাকে। জমিদারগণও নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আইন প্রভৃতির সাহায্যে জমি খাস করিতে বা প্রজা বদল করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু রাজশক্তি ক্রমশঃ প্রজার পক্ষে সাহায্য করায়, উপঢৌকন অথবা "আবওয়াব" প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বকরদি মৌরসী অথবা স্থিতিবান প্রজাস্বত্ব প্রভৃতি বিক্রয় করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া প্রজা ক্রমে জমি হস্তান্তর করিতে থাকে। জমিদারের খাজনা বাকী, সাংসারিক দায় প্রভৃতি মিটাইতে জমি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিক্রীত হইয়া বহু মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিতে থাকে। তাহা ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে জমির বণ্টন চলিতে থাকে। এই অবস্থায় আসিয়া বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য ভূমি সমস্যা আসিয়া দেখা দেয় এবং সেই সমস্যা এখন এত গুরুতর হইয়াছে যে নূতন পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর কৃষি তথা অন্ন সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে।

জমির বিভাগ

বাঙ্গালার জমির আয়তন ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ একর বা ৭২,৩৮১ বর্গমাইল তন্মধ্যে ২ কোটী ৮৯ লক্ষ একরে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। ১,০২,০০০ জমিদারী রাজস্ব দিয়া থাকে, আর ৫১ হাজার জমিদারী খিকর। ইহাদের অধীনে ২৭ লক্ষ জমা বা প্রজা বিলি আছে। জমিতে সাক্ষাৎ স্বত্ববান রায়তের সংখ্যা ১ কোটী ৩২ লক্ষ এবং তাহাদের প্রজা ৪৮ লক্ষ। রায়তের নিজস্ব জমার ২ কোটী ৮০ লক্ষ একর এবং তাহাদের কোর্ফা প্রজার অধীনে ৩১ লক্ষ একর জমি আছে।

ভূম্যধিকারী ও তৎস্থানীয় বড় জমার অধিকারীর অধীনে ১ কোটি ৪২ লক্ষ একর জমি আছে।

জমির অত্যধিক ভাগ হইয়া যাওয়ায় প্রতি রায়তের ঘরে ১·৯ একর এবং তৎঅধীনস্থ প্রজার অধীনে পড়ে ·৯৪ একর করিয়া জমি ভাগে পড়িয়াছে। এত অল্প টুকরা হইয়া যাওয়ায় মোট জমি ৪ কোটি ৩০ লক্ষ একরের মধ্যে ৩ কোটি ১১ লক্ষ একর রায়তের হাতে আছে অর্থাৎ বর্তমানে রায়তরাই শতকরা ৬৭ ভাগ জমির অধিকারী; বাকী ৩৩ ভাগ জমি জমিদার ও বড় ভূম্যধিকারীর হাতে রহিয়াছে।

কুফল

জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় চাষ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। অথচ জমিতে প্রজার ও জমিদারের ব্যক্তিগত যে স্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহাতে কাহাকেও উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া সাধারণ বাঙ্গালীর জমি ছাড়াও বিঘা হইতে যে আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় জমির উপর হইতে অনেকেরই সংসার খরচের কতকাংশ বন্ধুলাভ হইয়া থাকে। এক সীমানার অন্তর্গত বড় জমি বেশী পরিমাণ পাইবার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা ধনী জমিদার, মোটামুটি বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের ঘরে কাহারও ১৫·২ একরের অধিক জমি নাই। ইহার মধ্যে কতটা খাস ও কতটা প্রজাবিলি তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা হাজার বিঘার মালিক বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদেরও খাসে হয়ত খুব বেশী জমি নাই। যদিই বা কাহারও থাকে, তাহা নানাস্থানে ছড়াইয়া টুকরা টুকরা হইয়া আছে।

জমির প্রকৃত মালিক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হইবার কালে মহা বিতণ্ডা উঠিয়াছিল, জমির মালিক কে? নবাব বাদশাহ বা তৎস্থলাভিষিক্ত ইংরাজ—না, জমিদার? তখন স্থির হয়, রাজা রাজস্ব দাবী করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত জমির মালিক, জমিদার। সেই হইতে জমিদার এক হিসাবে মহা মাননীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন; অবশ্য ইহা মুসলমানদিগের আমল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন জমিদার নির্দিষ্ট খাজনায় জমি বন্দ করিয়া আছেন, প্রজার খাজনা অনেক ক্ষেত্রে নবাবী আমল হইতে নির্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রজা নানারূপ স্বত্ব স্বত্ববান হইয়া প্রকৃতপক্ষে জমির মালিক হইয়া আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে বাঙ্গালার ৭২,৩৭১ বর্গমাইল জমির মধ্যে ৩১,৫৩০ বর্গ মাইল অর্থাৎ শতকরা ৮৪·৯ ভাগ পড়ে। ইহার বাহিরে যে জমি পড়ে তাহা খাস মহল ও টিকা জমা অর্থাৎ নির্দিষ্ট কালের জন্য জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা আছে। খাস মহলে মোট জমির ৭·৯ ও অস্থায়ী ব্যবস্থার অন্তর্গত শতকরা ৭·২ ভাগ জমি পড়ে। সুতরাং জমির উন্নতি করিয়া বাঙ্গালার মঙ্গল করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যে জমি পড়ে, তাহারও উন্নতি প্রয়োজন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ

বাঙ্গালার জমির উন্নতির কথা বলিলেই জমিদারী কাড়িয়া লওয়া, চিরস্থায়ী প্রথার উচ্ছেদের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। এ বিষয়ে কয়েকটা অসুবিধা আছে, সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা অবান্তর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য জমির অধিকাংশই রায়তের অধীনে; তন্মধ্যে প্রায় সবই চাষী প্রজা। তাহার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমন কি নবাবী আমল হইতে বহু যোতজমার খাজনা হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হইলেই এই সকল প্রজার নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লওয়া খুব সহজ হইবে না এবং খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে না। তাহা ছাড়া জমি কাড়িয়া লইলেই বা কি হইবে? চাষী প্রজাকে জমি না দিলে এত চাষ করিবার ব্যবস্থা নাই; উপরন্তু প্রজার স্বত্ব কাড়িয়া লওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। মোট কথা, একবার গভর্ণমেণ্ট সমস্ত জমির মালিক না হইলে, খাজনা বৃদ্ধি করায় ঘোরতর আপত্তি ও আইনঘটিত নানা অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে।

জমিদারের স্বত্ব কাড়িয়া লইলেও প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী জমি পাওয়া যাইবে না। যিনি ভূম্যধিকারী তিনি জীবন ধারণের জন্য জমি ন্যায্য মূল্যে রাখিতে চাহিলে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বেদখল করা ন্যায়ানুমোদিত নয়। যদি কেবল জমিদারী স্বত্ব লইলে সারা বাঙ্গালায় প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হইতে পারিত।

তাহার পর মধ্যস্বত্বভোগীর কথা। গভর্ণমেণ্ট ও কৃষক-প্রজার মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগী জন্মিয়াছে। তাহাদের উচ্ছেদ করিলে প্রজার নিকট যে টাকা আদায় হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহাদের উচ্ছেদ করার পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু দেশের মধ্যে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে যে পরিকল্পনা আলোচনা করা যাইতেছে, তাহাতে এই সকল লোকের সহিত বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই। এক সময় ইঁহারা ন্যায্য মূল্যে উপরিতন মালিকের নিকট স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন; পরে নানাপ্রকার দায়ে পড়িয়া সামান্য মূল্যে স্বত্ব রাখিয়া হস্তান্তরিত করিয়াছেন। যে খাজনা হাতে রাখিয়া ইহারা স্বত্ব হস্তান্তর করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকজনের হস্তে সংসার প্রতিপালন করা চলে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা হইতে সংসার খরচের কতকাংশ নির্বাহ হইয়া থাকে। জমির উন্নতি সম্বন্ধে ব্যাপারে সমাজের চক্ষে ইঁহাদের স্থান অতি নীচে। কিন্তু কাহারও স্বত্বহানি করিতে হইলে, কাহারও জীবনযাত্রার পন্থা রোধ করিতে হইলে, তাহাকে অন্য পথ দেখাইয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের কাজ; বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট যখন কাহারও সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা করে। কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ না করিয়া সম্পত্তি দখল করিবার জন্য সমাজে চোর ডাকাত পথচারীরও অভাব নাই। কোনও সুপরিকল্পিত কার্যসূচী স্থির না করিয়া এত বিরাট পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা বুঝিয়া দেখা দরকার। এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের

লোকসংখ্যা ধরিলে প্রায় এক কোটীর নিকট দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁহাদের উপজীবিকার কোনও কথা চিন্তা না করিয়া স্বত্ব দখল করিতে গেলে ঘোরতর আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলেও বলিতে হইবে, কালক্রমে এই মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস করিতেই হইবে। কিন্তু কি ভাবে তাহা করা যায়, তাহার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

পথের সন্ধান

সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব লোপ করিতে গেলে—যদি গভর্ণমেণ্ট বিনা খেসারতে সমস্ত সম্পত্তি দখল না করে—গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বহু টাকা ঋণ করিতে হইবে। যদি ঋণ করিয়া বাঙ্গালার মঙ্গল হয়, তাহাও করা দরকার। কিন্তু তাহাতে বহু সময় লাগিবে, বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে এবং এই অনিশ্চিত পরীক্ষাকালে কৃষির গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যদি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, কোনও একটী জেলা বা জেলার অংশ লইয়া পরীক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বসিয়া কাল হরণের সময় নাই। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়ায়, বড় করিয়া চাষ করা চলে না। জমির উন্নতি করিতে, সার দিতে, উন্নত প্রণালীর চাষে বহু ব্যয় পড়িয়া যায়, সুতরাং সাধারণ প্রজার পক্ষে তাহাতে অসুবিধা হয়। এরূপ অবস্থায় অন্ততঃ এক হাজার বিঘা জমির মালিকদের স্বত্বের অংশ মানিয়া লইয়া সংহত ভাবে চাষ করিবার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। কত জমি চাষ করিতে কত ব্যয় পড়ে, তাহার ধারণা সকলেরই আছে। যাহার জমির যত অংশ, তাহার নিকট সেই ব্যয় লইয়া, ট্রাক্টর প্রভৃতির সাহায্যে চাষ করিলে, মোট ব্যয় খুব কম পড়িবে, অথচ চাষের ফলন বেশী হইবে। যে সকল প্রজা বর্ত্তমান চাষ করেন, তাহাদের মজুরির হার অনুসারে, তাহারা ফসল বা নগদ মজুরি দাবী করিবে। সমস্ত ফসলের বণ্টন জমির অংশে মালিকের স্বত্বের অনুপাতে হইবে। প্রথমে অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য পাকা দলিল করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ফল ফলাই হইলে, মালিককে তাঁহার অংশের জমির জন্য খাজনার হার অনুযায়ী নগদ টাকা দেওয়া হইবে, কিন্তু জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। এই জমির মালিকদের মধ্যে যাঁহারা মধ্যস্বত্ব ভোগী নিম্ন হইতে ক্রমে উপর দিকে ধীরে ধীরে তাহাদের স্বত্ব বিশ বা পঁচিশগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলে, কাহারও পক্ষে বিশেষ ভার বলিয়া মনে হইবে না। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই দেখা যাইবে, গভর্ণমেণ্ট যে মালিকদের খেসারত দিয়া সরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাই ত্রাসে অপসৃত হইয়াছেন।

জমি ও ফসল সম্বন্ধে পরিকল্পনা যাহাই চলিতে থাকুক, বাঙ্গালার এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সময় জমিদারী উচ্ছেদ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান প্রভৃতি কাজে লাগাইতে বহু সময় যাইবে। কিন্তু বাঙ্গালাকে বাঁচাইতে হইলে একদণ্ডে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কৃষি না করিলে বাঙ্গালার পক্ষে অন্নের জন্য পরনির্ভরতা বাড়িয়াই যাইবে। সে অবস্থা নোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বিদ্রোহী বঙ্কিম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তখনও আঁধার ছিল ; অরণ্যে বিপথগামী পথ
পথের সলিল গতি, ক্রূর ফণা সর্প অন্তর
সঙ্কীর্ণ গহ্বর হ'তে অতর্কিত-হীন দংশনের
অপেক্ষায় রহিয়াছে বিষবহ্নি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ।
তখনও আঁধার ছিল—শ্মশানের ঘুমায়িত রেখা
নির্বাক আকাশ তলে রেখে গেছে কলঙ্কের ছায়া।
জাতির কলঙ্ক নহে, শাসনের অপকীর্ত্তি গাথা
কঙ্কালে কঙ্কালে আঁকা, নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পরিহাস—
পরিহাস বাঙালীর, পরিহাস আত্মবিস্মৃতের।
তখনও আঁধার ছিল, মনে মনে অন্তরে বাহিরে
আঁধারে নিশ্চিহ্ন পথ সে পথের দিশারী কে হবে ?

সে আঁধার বিদারিয়া প্রসারিত দিব্যদৃষ্টি তলে
ঋষি বঙ্কিমের ধ্যানে জাগিয়া উঠিল সত্য পথ,
মায়ের মন্দির চূড়া উদ্ভাসিত বালার্ক কিরণে
দেখা দিল সেই দিন, জাতির সে পরম প্রভাতে
উষার মঙ্গল শঙ্খে সে আঁধার বিলাইল দূরে
আনন্দ মঠের সৃষ্টি সেই দিন নিরানন্দ দেশে।
শত সন্তানের কণ্ঠে মাতৃ-মন্ত্র জাগিল সেদিন,
স্বর্গাদপি-গরীয়সী জন্মভূমি—দেবী আসনে
মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিল, বঙ্কিমের তুলির লিখনে
বিচিত্র স্বপ্নের আশা, ধ্যানের সকল বাণী তাঁর
পথচিহ্ন গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে প্রসূর্ত বিস্ময় ;
দীর্ঘ দিন গত তবু—বিদ্রোহের সে মহতী বাণী,
বাঙালীর মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনি তোলে আবেগে গভীর ;
সে বিদ্রোহ সন্তানের, মঠ রক্ষী বৈষ্ণবী সেনার
সে নিষ্ঠা—জাগ্রত মনে সঞ্চারিত ভবনে ভবনে।

অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন দাস জীবনের
গ্লানি ও ভিক্ষাতে ভরা ক্ষুধার্ত্ত সে আত্মার বিদ্রোহ—
বঙ্কিমের মাতৃ পূজা ; 'অশেষমাতরম' মন্ত্র তার ;
সে মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্র—দীক্ষা দিতে সমগ্র জাতিরে
এক সূত্রে গাঁথিবারে ছিন্ন ভিন্ন বাঙালী সন্তানে
আনিলেন নব যুগ,—সে যুগের প্রদীপ্ত আলোকে
আমরা চিনেছি পথ, বুঝিয়াছি সমস্ত তাঁহার ;
নিষ্ফল হয়নি তাঁর মাতৃপূজা, মন্ত্র আহুতির,
গৃহে গৃহে জ্বলিতেছে আহিতাগ্নিসম বহ্নিমান।

সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ—দেশ ধর্ম্ম—মুক্তির সাধনা,
মৃত্তিকার লোভে নহে, দেশেরে দেবতা জ্ঞান করি
আনন্দ মঠের সেনা মুক্তিব্রতী সন্তানের দল
নিকাম স্বদেশ প্রেমে জাগাইল প্রথম বিদ্রোহ।
—সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের,—
অন্ধকার মোচনের তরে নব প্রভাতের উদ্বোধন ;
সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের, বন্ধন-মুক্তির মন্ত্র গুরু,
তাঁহারি উদ্দেশে কবি ছুঁয়ে ছুঁয়ে জানাবে প্রণতি।

বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জাতির বিচারকর্তা ইতিহাস এবং জাতীয় ইতিহাসের বিচার হয় সমকালের প্রেক্ষাপটে। তবু আমরা যদি বর্তমানেই ইতিহাস বিচার করিতে চাই তাহা হইলে প্রতীপের ওলন্দেশ হইতে কিছু দূরে সরিয়া আসিতে হইবে।

বাঙ্গলা মাতার ক্রোড়ে জন্ম ও প্রথম শিক্ষা লাভ করিলেও আমি শেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতবর্ষেরও বাহিরে। তাহার পর কর্মব্যপদেশে আমি চিরপ্রবাসী, প্রতীপের ওলন্দেশের কিছু দূরে—যদিও সে দূরত্ব দেশকে দুর্বোধ্য বা দুর্জ্ঞেয় করিয়া তুলিবার মত বিষম নহে। অন্তিদূর হইতে দেখা যদি ভুল হয় তাহা ব্যতিক্রম হইবে, নিয়ম নহে।

আর প্রধানীর প্রেমবিজ্ঞেয় যাথাতথ্যে নিক রিক হইয়া দেশকে আরো ভাল আরো ঠিক করিয়া বুঝিবার অবকাশ দেয়। বাল্য ও কৈশোরের সে বাংলা দেশকে কখনো এত সুন্দর অথচ অসহায়, মধুর অথচ মরণোন্মুখ, সম্ভাবনাময় অথচ সম্ভাবিত বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। বুদ্ধিহীন সে অনাবৃতা অথচ মহীয়সী মাতার আসনে প্রতিটী প্রবাসী বৎসরের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদকে অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। সে জন্যই কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর পরাজয় বা পশ্চাদপসরণ সহ্য হয় না। আজ একটী বিষয়ে বাঙ্গালীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ দুঃখেই প্রতি বাঙ্গালী দুর্বীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ইহার মধ্যে যদি নিজেদের দোষদর্শন বা সমালোচনা থাকে তাহা প্রেম-প্রসূত, অতএব আপনাদের মার্জনীয়।

প্রধানত বাঙ্গালী চাকুরীজীবী। একদা রাজশক্তির প্রসার ও প্রচার কার্যে সেই বিদ্যা তাহাকে দূর প্রদেশে ও দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে। রাজধর্মের বিস্তারই মহীরুহের ছায়াতলে বহু-বাঙ্গালী সুস্থিতল ও বংশ-পরম্পরা ক্রমিক বিশ্রান্তি আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই আশ্রয়স্থল বাঙ্গালীর পক্ষে বহুক্ষেত্রে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ইষা বাঙ্গালী চাকুরীজীবীর জীবিকার্জনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলাম,—বাংলা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশ পথেই পরীক্ষায় বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সওদাগরী অফিসে বাঙ্গালী পাইলে কেহ বাঙ্গালী চায় না, সরকারী অফিসে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্র অবশিষ্ট আছে তাহাতেও বাঙ্গালী পরীক্ষায় পরাজিত। সরকারী বহু চাকুরীর প্রবেশ পথে পরীক্ষা আছে; সেখানে বাঙ্গালী ছাত্র সুবিধা করিতে পারে না কেন? উদাহরণ স্বরূপ যেমন আই-সি-এস পরীক্ষা। ইহা সাধে বিশ্বিল ভারত প্রতিযোগিতা হইতেও ও কার্যত পরীক্ষার বেলায় প্রাদেশিক ভাবে বিভক্ত, যদিও সেক্রেটারী অব ষ্টেট চাকুরীর মালিক। বাংলাদেশের সিভিল লিষ্ট খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন যত অবাঙ্গালী বাংলাদেশে "ডমিসাইল্ড" হিসাবে পরীক্ষা দিয়া বাঙ্গালী ছাত্রকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে বাংলাদেশের পুলিশ কর্মক্ষেত্রে বরণ করিয়াছেন।

কেহ বলিতে পারে, তাসই হইয়াছে। আমরা চাকুরীজীবী হওয়ার কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া অর্থকর ক্ষেত্রে, শিল্পে বাণিজ্যে ও উৎপাদিকা-শক্তিবিশিষ্ট কার্যে আত্মনিয়োগ করিব। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। চাকুরীর চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হই নাই, সে চেষ্টায় পরাজিত হইতেছি। পরাজিতের সংখ্যা বহু, চাকুরীর বাহিরের ক্ষেত্রে সফল বাঙ্গালীর সংখ্যা কম; সফলের সংখ্যা আরও কম। ছয় কোটী লোকের দেশে অন্যান্য ক্ষেত্রে চেষ্টা করিতেছেন এমন লোক বাদ দিয়াও পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সফল কয়েকশত ছাত্র প্রতি বৎসর দেখাইতে পারা আমাদের পক্ষে উচিত ছিল। আমরা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া যেন আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। এইরূপ আত্মপ্রসাদ আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে।

অন্যপক্ষে আমরা চাকুরীজীবী বলিয়া এবং চাকুরীক্ষেত্রে অন্যপ্রদেশের লোকদিগের জয় কাড়িয়া লইয়াছি বলিয়া ঈর্ষা এবং অপবাদ অর্জন করিয়াছি। বাঙ্গালী বিদ্বেষের মূলে বহুলতঃ এই কারণ; অথচ ইহা আমাদিগকে আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান দিতেছে না। এ মুখে পুষ্প শুকাইয়া যাইতেছে, কিন্তু কণ্টকজয়ী হইয়া রহিয়াছি আমরা এখনো।

শ্রীযুক্ত ভারত সরকারের ঘোষা কন্যা আমুমতী আই-সি-এস চাকুরী দেবীর কথা ধরা যাক্। তাহার পাণিপ্রার্থী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রতি বৎসর কম হইত না এবং তাহার মধ্যে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ প্রায় সকলেই থাকিতেন। কিন্তু সফল যাহারা হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা অতি কম। আপনারা লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজনের নাম প্রতি বৎসর পরীক্ষার পর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৪২ এই তের বৎসরে মোট ৩৮ জন বাঙ্গালী—হিন্দু মুসলমান প্রবাসী ও বাঙ্গালাদেশের অধিবাসী মিলিয়া—এই তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি বৎসর প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা তিনজনেরও কম। এই তের বৎসরে মাত্র ছয়জন বাঙ্গালী আই-সি-এস পরীক্ষায় ভারতবর্ষ হইতে সফল হইয়াছেন। তাহারও অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিনজন প্রবাসী বাঙ্গালী। বিলাতের আই সি-এস পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের দুরবস্থা সাম্প্রতি একটু কম, তাহার প্রধান কারণ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নততর হওয়ায় বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষার যোগ্যতার পার্থক্যটা ঘুচিয়া যায়; দ্বিতীয়ত সেখানে পরীক্ষার্থী প্রস্তুত করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাহাতে বাঙ্গালী অন্য প্রদেশীয়ের সঙ্গে সমান শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

গত ১৯৩০ সন হইতে এই পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে শুধু যে আমরা জীবিকা অর্জ্জনের একটী বৃহৎ ক্ষেত্র হারাইয়াছি তাহা নহে; বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রধান শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা থাকিবেন অবাঙ্গালী, আমাদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সাক্ষ্য বহন করিয়া।

কেন্দ্রীয় সরকারের কেরাণী চাকুরীও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়া পাইতে হয় এবং ইহাতেও চাকুরী-সর্ব্বস্ব বলিয়া অপখ্যাত আমাদের বাঙ্গালী আই-সি-এস অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। পাঁচ বৎসরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরীক্ষার ফল হিসাব করিয়া দেখা গেল যে গড়পড়তা প্রতি বৎসরে মাত্র তিনজন করিয়া বাঙ্গালী প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন।

ফিনান্স, মিলিটারী একাউন্টস, রেলওয়ে, কাষ্টমস ও পোষ্টাল বিভাগের যে কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষা একত্রে হয় তাহাতে চার বৎসরের ফল হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বৎসরে গড়পড়তা মাত্র ছয় জন করিয়া বাঙ্গালী—প্রবাসী বাঙ্গালী ও ইহার মধ্যে আছে—প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই ছয়জনের মধ্যেও অনেকে চাকুরী প্রাপ্তিতে সফল হইবার মত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

এই যদি আমাদের অবস্থা তাহা হইলে আমাদিগকে সত্য প্রতীকার করিতে হইবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় প্রথম যৌবন; সে সময়ে এতগুলি বাঙ্গালী যদি বৎসর বৎসর পরাজয়ের লজ্জা গ্লানি ও বিফলতা ভোগ করে, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি ও কোথায়? আমাদের আশাস্থলদিগকে নৈরাশ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য আমাদেরই।

নিখিল ভারত প্রতিযোগিতাগুলিতে বাঙ্গালীর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হিসাবে অনেকে মৌখিক পরীক্ষার অজুহাত দেখান। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষই মৌখিক পরীক্ষায় বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে কম নম্বর দেয়। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য ও সহেই, বরং এই অভিযোগের দোহাই দিয়া আমাদের গুরুতর একটী ত্রুটী ঢাকিয়া রাখিতেছি। মৌখিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক প্রসার, চরিত্রের বিকাশ প্রভৃতি গুণাবলীর প্রত্যক্ষ ও সম্যক্ পরীক্ষা করা হয়। বাঙ্গালী ছাত্র বহুক্ষেত্রেই জীবনে এই সম্ভবত প্রথম সাহেবী পোষাক পরিয়া পরীক্ষকদের সামনে আসে। তাহাদের মাথা, মর্য্যাদা ও বাঙ্গালী-কর্ণে-অবজ্ঞত ইংরেজী ভাষণ মাথা ঘুরাইয়া দেয়। তাহার উপর অনভ্যাসের কোঁটা দুই চাই কলার যেন সর্ব্বাঙ্গে চড় চড় করিতে থাকে। আত্মপ্রত্যয় প্রতিটী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়। কেম্ব্রিজের পারিক সার্জিন কমিশনের ভূতপূর্ব্ব একজন সভ্য বলিয়াছিলেন যে আই-সি-এস পরীক্ষার একটী বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে চাই ঝিমাইতে বিপর দেখিয়া তাহাকে সাহসে সে অনেক সময়ান করিয়া পরে প্রশ্নোত্তর দিতে সময় দিয়াছিলেন। অন্য পরীক্ষকদিগের এই সব সাহেব বন্ধুপ্রবীণের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল এবং ইহারই বা মানসিক দুরবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোট কথা আমাদিগকে চৌকস হইতে হইবে। সুট যখন পরিতে হইবে অথবা যখন যে পোষাকে রঙ্গক্ষেত্রে যাইতে হইবে তাহাতে কোনও খুঁত থাকিবে না; ইংরেজী যখন বলিতে যাইবে তখন খাসী বেঙ্গলিস (Bengliah) না বলিয়া শুদ্ধ ইংরেজী সাবলীল ভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ ছন্দে ও সুরে বলিব। যে পরীক্ষায় যাহা চায় তাহার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইব এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কলিকাতাতেও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতার পরীক্ষার্থী তৈয়ারী করার জন্য রীতিমত কার্য্যকরী বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অর্ব্বাচীন বাঙ্গালী কিশোর যদি পাওয়ায়—তবিত নিখুঁত আদর্শ অভিভাবকের সন্ধান করে যে হইবে ধরণী বাড়ুয্যের মত ধনশালী, হিসেবী, চৌখের মত সাহসী, লিপীকা দেবীর মত লেখিকা, লোটা রায়ের মত গাইয়ে ...ইত্যাদি তবে জীবনসংগ্রামে রত বাঙ্গালী যুবকই বা কেন নিখুঁত ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিবে না—যাহাতে যাহাকে সভায় সে দেখাইতে পারে যে পোষাকে সে নিউইয়র্কের নাগরিক, বুদ্ধিতে এথেন্স গ্রীসিন, মনঃসমীক্ষায় সেলম্যান, আধুনিক জগতের জ্ঞানে এনসাই-ক্লোপিডিয়া?

আমাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী করিতে হইবে। একটী বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত পুঁথিগত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সে বিষয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরী করিয়াও বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীগণ প্রশ্নটী ভিন্ন ভাবে দেওয়া থাকিলেই হয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্ব্ব প্রস্তুত ছাঁচে ঢালিয়া দিয়া আসে, না হয় রূপান্তরের নিষ্ফল চেষ্টায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যায়। খুব সহজ একটী প্রশ্ন করুন "তোমার বয়স কত" উত্তর আসিবে "আমি ১৯২৫ সনের শেষ ভাগে জন্মিয়াছি।" Direct অর্থাৎ সোজাসুজি দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাবে আমরা বিদ্যার সারাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি না, অর্জ্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাইতে পারি না,- কোথায় যে তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও বুঝিয়া উঠি না। শুধু ভাসা ভাসা উচ্ছ্বাস, শুধু অবান্তর প্রকাশ, শুধু সময় চলিয়া গেলে হা হুতাশ ইহাই হয় পরিণতি। জীবনের বাস্তবেরায় "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে বেড়ায় পরশ পাথর।" ছাত্রাবস্থার মধ্যভাগে ভলান্টিয়ার বা সভাশোভন শ্রোতা, শেষভাগে চাকুরী পরীক্ষার্থী, পরে আইনব্যবসা এবং শেষে বেকার আইনজীবী বা ক্রমাগত ব্যর্থতা লেখক—এই অনিবার্য্য বিকারজনক ভাগ্য হইতে বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঁচাইতে হইবে। সে আমাদের নিকট অনেক কিছু দাবী ও আশা করিতে পারে; আপনাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে শুধু তাহাদিগের জন্য, সমগ্র জাতির কথা ভাবিয়া।

বর্ত্তমানে চারিদিকে "র‍্যাশনিং" এর যুগ চলিতেছে। আপনাদিগকে ও প্রথমে সকলে করিয়া লইতে হইবে—কোন্ ছাত্র কোন্ পথের উপযোগী, কোন বিদ্যায় অধিকারী। শ্রেণীবিভাগ করিয়া ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ও যোগ্য

পথের জন্য। অতএব পরীক্ষায় নম্বর উঠে বলিয়াই যে অন্ধ প্রীতি ও আত্মহীনকে অঙ্ক লইতে হইবে তাহা ঠিক নয়। যাহার দৃষ্টি মনশ্চিত্রের দিকে তাহাকে সাধারণ পথে এম. এ না অনার্স পড়াইয়া শুধু সময়, অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট। যে চাকুরীজীবী হইবে তাহার দৃষ্টি থাকুক শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার চাকুরী পরীক্ষার অতীত প্রশ্নগুলি ও বর্ত্তমান পাঠ্যের উপর। উপনিষদ্ বলেন আত্মানং বিদ্ধি; আপনারাও ছাত্রগণকে সময় থাকিতেই সে মন্ত্রে দীক্ষা দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পরিচিত পৃথিবী হইতে অজ্ঞাত অকরুণ নিখিলভারত প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে প্রস্তুত না করিয়াই আমাদিগের ছাত্রগণকে পাঠান বা যাইতে দেওয়ার ফলে সকলের প্রতিই ঘোর অবিচার হয়। যাহার ভবিষ্যৎ ইহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে, যে আত্মীয় স্বজন ইহার জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া অর্থব্যয় করিতেছেন এবং যে শিক্ষায়তনের ছাপ লইয়া ছাত্রগণ যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার হইতেছে। বাংলা গল্প উপন্যাসে সর্ব্বদাই দেখি বাঙ্গালী কন্যার পিতা কন্যাকে আই-সি-এসের বধূ হইবার জন্য শিক্ষা বাল্যকাল হইতে দিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী অভিভাবক ও বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় পুত্রকে আই-সি-এস অথবা অন্যান্য জীবিকার্জ্জনের জন্য বাল্যকাল হইতে প্রস্তুত করিবেন না কেন?

চালাকী করিয়া কোন কঠিন কার্য্যে সফল হওয়া যায় না। একথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে আমরা সম্প্রতি লঘুচিত্ত হইয়া পড়িতেছি, ভাবিতেছি যে উপর চালাকী করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর দিয়া শরের সহায়তা না লইয়া ধারেই কাজ সারিয়া লইব। কিন্তু এ ভাবে কখনও কেহ সফল হইতে পারে না। প্রতিভার মূল প্রধানত পরিশ্রম, কেবল প্রেরণা নহে। পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞের যুগ চলিতেছে; ভাল ভাসা প্রয়াসের উপর নির্ভর করিয়া আমরা লক্ষ্যস্থল তীর হইতে দূরেই ভাসিয়া যাইতেছি, যেখানে ভাগ্যের পবন টানিয়া লইয়া যায়; দাঁড়ের উপর জোর দিয়া তরী তীরের অভীষ্ট স্থানে ভিড়াইতে পারিতেছি না। এই দোষ বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ছাত্রাবস্থা হইতেই ইহাকে আমূল উৎপাটন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিলে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে সাফল্যের আশা নাই। যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার। বরমাল্য বায়ুপথে উড়িয়া আসিবে না; তাহা বীর্য্যশুল্কে অর্জ্জন করিতে হয়।

অধুনা—বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে সৈন্যদলে পদস্থ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের জন্য একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাতে পুথিগত বিদ্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্য, কর্ম্মতৎপরতা, মানসিক ও বাস্তবিক বিকাশের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়। আপনারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিবরণীতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এদেশেও কোন কোন সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের জন্য সেই পন্থারই অনুসরণ করা হইতেছে। বাঙ্গালী ছাত্রের বর্ত্তমানে এমন কোন সম্বল নাই যাহাতে এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। চাণক্য-কথিত পুস্তকগতা বিদ্যা পুস্তকেই রহিয়া যায় বর্ত্তমানে, কিন্তু বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, কর্ম্মতৎপরতা ও মিলিত দিকে মানসিক বিকাশ ও আদানের অভ্যাস হয় না।

আমি কিন্তু আশাহীন নহি। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে তরুণ বাঙ্গালী যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ভালোর কেত্রা, অলস ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সাহসী কার্য্যকরী অধ্যবসায়ী পথে সে উৎসাহ দেখাইয়াছে, যোগ্যতা ও অভ্যাস করিয়াছে। নবজীবনের আহ্বান তাহাকে আকাশপথে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পুরোভাগে আনিয়া দিয়াছে। সামরিক চিকিৎসা বিভাগে, যুদ্ধসেবায় ও সৈন্যদলে উচ্চ কর্ম্মচারী বিভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুক্তহস্তে ও কার্য্যলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতকে জানিতে, অনাস্বাদিতকে আস্বাদ করিতে, মৃত্যু ও জীবনের সহিত বীরের মত পরিচয় করিতে চাহিয়াছে। এই সাহস ও উৎসাহ, এই প্রেরণা ও প্রাণ প্রাচুর্য্যকে যদি আমরা উপযুক্ত ভাবে বিকাশ ও বিস্তারের শিক্ষা ও সুযোগ না দিই তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইব ও মাতৃভূমির ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। কাজেই এই আমাদের শুভক্ষণ, এই সুবর্ণ সুযোগ, যে সময় তরুণ বাংলাকে বন্ধ্যা যোগ্য পথে নিয়োজিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। আমাদের শিরায় পড়িয়া আছে বহু বিস্তীর্ণ মার্গতার ইতিহাস, কিন্তু সম্মুখে থাকুক বহুমুখী সাফল্যের সম্ভাবনা; সে সম্ভাবনাকে দিকে দিকে সত্যে—আগ্রহ সংশয়হীন সত্যে—পরিণত করিবার প্রশস্ত সময় এই। আজ অযোধ্যুক্ত যে চেতনা মহাসমরের পটভূমিকায় রূপ নিয়াছে বাংলা দেশের বহু অতীত কাহিনীর ন্যায় ইহাও যেন উৎসাহ ও পথ প্রদর্শনের অভাবে অকালে লুপ্ত না হইয়া যায়। সে জন্যই আমাদের শিক্ষা রীতি ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে—যাহাতে শুধু চাকুরীর নহে, মহা জীবনের পরীক্ষায়ও আমাদের ভবিষ্যৎ আশাকুলদের আসন বহু উচ্চে ও সম্মানজনক স্থান লাভ করে। তবেই সার্থক হইবে বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষাসমূহে যোগদান।

গ্রামের লোকজন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রামে দরিদ্র ও অলস লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু অভাব তাহাদিগকে নিরানন্দ করিতে পারিত না—কেহ নিতান্ত অবেলায় বসে কাঁচা চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিতেছে কিন্তু গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে—

"পান্তভাতে রেঁধে খাবি
শাক চচ্চড়ি ওল ভাতে।"

অধিকাংশের প্রার্থনা ছিল—

"চাইনে কো মা রাজা হতে
দুবেলা যেন পাই আঁচাতে।"

যারা পাশার ছক সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকিত, তারা সেও গান বানাইয়া লাগিয়াই আছে—দুঃখ তাহাদের একান্ত গা-সহা ছিল, মোটেই কাতর করিতে পারিত না।

অনেকে নিকর্ম্মা ছিল, কিন্তু গ্রামের তাহারাই প্রকৃত কর্ম্মী। সকলের কাজ তাহারাই করিত। মেলা, নবান্নের প্রভৃতি উৎসবে তাহারাই অগ্রণী।

বরযাত্রী যায় তারাই আগে, বরযাত্রীতে ঠকায় তারা,
নষ্টচন্দ্রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় রাত্রি সারা।
রাত দুকুরে ডাকলে পরে লক্ষ দিয়ে তারাই আসে,
সন্দেহেতে দুখের সুখী, বুক প্রাণে তারাই হাসে।
গ্রামবাসীদের বিপদ হলে তারাই আগে কোমর বাঁধে,
গ্রামের মৃত গরু লতে চড়ে কেবল তাদের কাঁধে।
গ্রামে গ্রামে যে ঝগড়াঝাঁটি অনেকো বল এসবি নিয়ে,
তারাই গ্রামের গৌরব যে—আমার পরম বন্ধুরা।

মোটন ঘোষ ছিল এ দলের কর্ত্তা, তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

নাহি কাজ তার নাহি অবসর বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি,
সারা গ্রামখান্ খুঁজে দেখ আর মিলিবে না তার জুড়ি।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা—করিছে চড়ুই ভাতি,
প্রভাত হইতে মোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে ঘরে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা, মোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে চাকর চাহি যে তার,
সব কাজ তার মোটন করিবে কাছে হবে অনিবার।
সে তোমার চির বাধ্য চাকর, অন্যে না কিছুরি আশা,
অন্যে না হাসুক কিছুতেই তার করিবে না ভালবাসা।
তাদেরা এখন চিনেছে তাহাকে কেহ না পাবনা হাতে,
লক্ষ্মীছাড়ার কোনো দোষ নাই কোনো দুখ নাই তাতে।

নাহিক অভাব তেমনি স্বভাব না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কামনা—হৃদয় কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

মোটন সমস্ত জীবন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিধবা বনমীর দিন যারা যায়—যে চিরজীবন আনন্দ দিয়াছে তাহাকে আনন্দময়ী সঙ্গেই যেন লইয়া গেলেন।

ঈমান ঘোষাল ছিলেন খুব আমুদে লোক—

প্রতি মাঠে প্রতি ঘাটে গ্রামের প্রতি গাছে,
আজও বুঝি তাহার গানের ধুলায় চিহ্ন আছে।
বেলা দ্বিত পাঠশালে সে হঠাৎ কভু আসি,
লোহাগের পাঙ্কৌড়ি যেন উঠ্‌তো হঠাৎ ভাসি।
গাইত যখন হাত তুলে সে সংকীর্ত্তনের ছলে,
গান শুনে তার গ্রামের বুড়া ভাসতো আঁখিজলে।
তখন তরা পোক এখন সেই তো তাদের আশা,
পাপিয়া কি গাইতে পারে ঘুঘ্‌তে হলে বাসা?
সারা দিবস পেটে খুঁটে সন্ধ্যাবেলা যায়,
এমনে যে দিনগুলি লোচন পাটে যায়।
অপেক তরে হাসে নাচে তেমনি গাহে গান,
নিশার হিমে জাগে যেন মানস কুসুম ম্লান।
'নীলকণ্ঠের' যাত্রা যদি দুক্রোশ দূরে হয়,
সবার অগ্রে তাহার দেখা না পেলেই তো নয়।

তাঁহার আমোদ অফুরন্ত ছিল। পৌষলা প্রভৃতিতে তিনিই রাঁধিতেন। মতিয়ার ও নীলকণ্ঠের নূতন গান তিনিই আমদানী করিতেন—নূতন নূতন সুর আয়ত্ত করিতেন। "এ যাত্রা প্রণকয় তবের রঙ্গরকমারে" অহিভূষণের এই গানটি প্রথমে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। বাউল ও 'খেপার' গান কত জানিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার বাড়ীতেই সর্ব্বদাই ঢোল তব্‌লা খোল বাজিত। হাসিতে ও হাসাইতেই তিনি যেন জন্মিয়াছিলেন। দারিদ্র্য তাঁহার নিকট আসিয়া অপ্রতিভ হইত। এই শ্রেণীর সদানন্দ লোককে দেখিলে সত্যই মনে হয়—

"কে দিল মানবরূপ 'উন্নী' প্রণাত কে?"

হংস খেয়ারী—গ্রামের উত্তর প্রান্তে তাহার বাড়ী ছিল। সে কুসুম নদীতে খেয়া দিত। একটী পা খোঁড়া ছিল কিন্তু নৌকায় খেয়া দিতে উঠিলেই পা ঠিক হইয়া যাইত। সাঁতার সে খুব ভাল দিতে পারিত। আমি ছাত্রাবস্থায় কাটোয়া "প্রফুল্লের প্রথম বর্ষের ফুতীয় সংখ্যায় "হংস খেয়ারী"র নামে একটী কবিতা লিখি—অনেকের উহা ভাল লাগে এবং হংস খেয়ারী শুনিয়া খুব খুশী হয়।

তালতলার মাঠা ভুলে চালটা আগে ছেকে,
মাটার আগে পিটুলি ভুলের খানটা গায়ে রেখে,
　　নদীর কাল জল,
　　কলসে টলমল,
হাঁসগুলি তার ছেলে ভুলে ডাঙার আগে ডেকে।

২

ভুলাট ছোঙার সারা দিবস যাত্রী করে পার
আটটী জনের বেশী সে যে নেয় না কভু তার,
　　দিজে কভু পুই
　　ভাগে কোণা খুই,
হাটের লোভে আঁজুল আঁজুল দেয় যে পুরবার।

৩

মামলা মোকর্দমা এবং ধরার কোলাহল,
চায়না সে যে শুনতে—দিবা নদীর কলকল।
　　শুধু গঙ্গাস্নানে
　　যায় কাটোয়া পানে,
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।

একবার তাহাকে জবিবার সাক্ষী মানিয়াছিলেন কিন্তু আদালতে ঢুকিতে সে এত কাঁপিতে লাগিল যে, তাহাকে আর সাক্ষী দিতে হইল না—হাসে সে কথা স্মরণ করিলেই গঙ্গা মাঝিকে উপেক্ষে প্রণাম করিত।

শ্রীপতি বকসী—তাহাকে লোকে ছিপ বলিয়া ডাকিত, বড়ই আদুরে ও আমুদে ছিল। শ্রীমানের সহপাঠী। দুই বৎসর 'ফটকে' আসীরের কাছে পড়িতে গিয়া উপেক্ষা ও অনাদরে তাহার মন খারাপ হয়—মন আর বসিল না।

বড় ভাং পিটা ছেলে
সবাই বেড়াত খেলে,
চাহিত না কিন্তু অজয়ের বুকে
　　দাঁড়াইতে শুধু গেলে।
গাছে খেলি লুকোচুরি,
মাঠেতে উড়াত ঘুড়ি,
মাঝিতে মাঝিতে মেলেতে তাহার
　　ঘুড়ি আর মাঝি ছেলে।

তারপর সে ফটক হইতে যখন ফিরিল, মুখে হাসি নাই—সর্ব্বদা আনমনা হইয়া বসিয়া থাকিত, সময় সময় অসংলগ্ন কথা বলিত—

কলের পাপিয়াটারে
এমন করিল কে রে?
ভুলাইয়া গান আঁকি পাখা দুটী
　　মনে দিয়ে গেল ছিঁড়ে।
ঘরে পড়ে মেয়ে তার সাথীদল
সেই শুধু বেথা হয়েরে কেবল,
　　শেষ হেমন্ত মেঘালি ওড়ে
　　মলিন মুখের খানি।

শেষ বয়সে তিনি কৈশোরের আমন্দের দিনের কথা বলিতেন—ঘটনাস্থলে ঘোল খাইবার স্থানটী দেখাইতেন—

ভুলে ভরা চাক মধুমাখী
　　বুকে ধরে দীপ রাশি,
মাতারে দুকূল দীপালীর রাতে
　　সে যে গিয়াছিল ভাসি।
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার,
আছে শুধু দুখ পোড়া মলিতার,
আঁধার তরণী বেয়েছে আজিকে
　　আঁধার ঘাটেতে আসি।

ব্রজ তাঁতি—সে জাতিতে বাগ্দী ছিল, কিন্তু বহু বোনাই তার ব্যবসা—এক সময়ে তাহার কাপড়ের খুব খ্যাতি ছিল—হাট হইতে তাহার কাপড় ফিরিত না—উচ্চ মূল্যে বিকাইত—বিলাতী বস্ত্র আসিয়া তাহার ব্যবসা নষ্ট করিয়া দিল—

ছেলে মেয়ে পাঁচখানা তাঁত, সাথের মাকুপালা,
এক পাশেতে পড়ে আছে নিজের হাতের থালা।
বুনতে হয় যে কাপড় তাকে অর্দ্ধ দু হাত জোড়া,
পরে শুধু প্রবীণ তার প্রবীণ দুজন বুড়া।

রসিক বাগ্দী—সে বড় সাহসী ও বিশ্বাসী ছিল, সর্ব্বদা সাধু ভাষায় কথা বলিত। মাছ ধরাই তাহার পেশা। অত্যন্ত অলস বলিয়া বড় খাটিত না, কিন্তু সব কাজ ভালই জানিত। মাছ ধরা সম্বন্ধে তাহার অগাধ জ্ঞান। সত্য মিথ্যা কত তথ্যই জানিত। মাছের নূতন নূতন টোপের আবিষ্কার করিত। ছেলেদিকে মাছেরা শিখাইত, তাহাদের ছিপ্ বড়শী সংগ্রহ করিয়া দিত। সমস্ত রাত্রি মাছ ধরিত এবং ভূত পেত্নীর অসংখ্য গল্প বলিত।

দীর্ঘ তাহার সবল শরীর, মাংসল বক্ষ তার,
দেখিলেই ঠিক মনে হ'ত যেন ডাকাতের সর্দ্দার।
বাহু দুটী তার কত দিনে যেতে পর উপকার তরে,
ঠেলেছে হেলায় খরার বারি ভীষণ তুফানে ঘড়ে।
ধরি মাছে সেই চালাইবে ছিপ বলিত যখন সুখে
কি মহিমাময় পূতচ্ছায় জ্যোতি জাগিত তাহার মুখে।
কত দিন হল গিয়াছে ধ্বনিক তবু কুসুমের তীরে
এখনো তোমরা দেখিতে পাইবে তাহা তার আড়াইয়ে।
জাগানের জল এখনো তেমনি আসে সে আড়ার কাছে,
দেখে শুধু লেখা নাহি একজন আর সবই পড়ে আছে।

অখিল মাঝি—অজয়ে 'খাদা ঘাটে' সে খেয়া দিত। দুখানা বড় নৌকা তাহার ছিল। তাহার পিতা 'ঘুরে মাঝি' বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল। অখিল দয়ালপ্রাণ ধার্ম্মিক শান্ত-শিষ্ট লোক ছিল।

চাঁদ মেপে তারে প্রত্যহ
সন্তাষে আগে রবি,
সবাকার আগে জাগে সে
প্রত্যূষ শান্তি লভি।
ঘরে পাড়ি আর গাহে গান
ছুটি কারও ধার ধারি সে
কাহারো সঙ্গে থাকি সে ক আমি
কাহারো হিংসা করি সে।

তার বাড়ী 'নয়নতারা' ফুলে সুসজ্জিত থাকিত। গ্রামের গৌরব বাগানে ফুল হয় এমন কাজ সে কখনো করিত না এবং কেহ করিলে বড় কষ্ট পাইত। উজানি বেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিত এবং বড় দলের যাত্রা না হইলে সে ম্রিয়মাণ হইত।

খোলায় মেটে—বড় শান্তিপ্রিয় লোক ছিল—তাল বাসই ছিল সে। তাহার একমাত্র কন্যা ও জামাতা লইয়া আনন্দে থাকিত—সংসারে তার আর কেহ ছিল না।

আশার রেখা জাগলো বুড়ার বুকে
বেলা শেষের রৌদ্রটুকুর মত।

সংসারে আবার মন দিল, কিন্তু মেয়েটী মারা যাওয়ায় সে বড় কাতর হইল।

তুলসীতে বারে আর সে কোমল খানি
থাকে বুড়া দুখটী করে তার,
উঠ্‌লো না আর দুইলো হেথায় পড়ে
আধেক গড়া গোয়ালখানি তার।

রাধানাথ ঘোষাল—আমি তার বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অত্যন্ত হাস্যরসিক লোক ছিলেন—সর্ব্বদা যাবা ও পাশা খেলায় মত্ত থাকিতেন। তাঁহার বহু সঙ্গী ও শিষ্য ছিল।

নারাণ যাদব—তাহাকে আমি খুরখুরে বুড়া দেখিয়াছিলাম। উচ্চস্বরে বাক্যকর ছিল—বিবাহে ও সব উৎসবেই তাহার বাক্য আগে হইত এবং ফেলজোড়া সুখ্যাতি লাভ করিত। পাখোয়াজী বলিয়াও তাহার নাম ছিল। তাহার পুত্র ও নাতিরা সে সবের কোন মর্য্যাদাই বুঝিত না—পাখোয়াজের খোলে তামাক রাখিত—বাঁশী লইয়া নাতিরা খেলা করিত। নারাণের হস্তাক্ষর ভাল তার গুণজ্ঞ গ্রামবাসীকে কাতর করিত। সে মধ্যে মধ্যে তাহার বালিশে আপন মনে বাক্যস্রোত ঢালিয়া দিত, বোধ হয় আনন্দ ও জয় গৌরবের দিন মনে পড়িত।

অশ্বিনী—যৌবনেই মারা যায়, একখানি ঘর প্রস্তুত করিতেছিল—উহার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অশ্বিনী মারা যায়—যখনি ঐ ঘর দেখিতাম আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত—

কাঁদে ও বেচারা তারা, তারা তার বালিকা,
ও যেন আধেক লিখা বিষাদের মালিকা।
এক মেটে প্রতিমা ও রেখে গেছে পূজারী,
হৃদয়ের সব সাধ ঘিরে গেছে উজারি।
যত কথা যত আশা যায় নি সে বলিয়া,
ও বেচারা চলে যেন পাটে পাটে গলিয়া।
যত আশা ভালবাসা রেখে গেল বাগাতে
আজি তারা ফুটে বন মর্ম্মর ভাষাতে।

মাধবা—তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে
ছিলে যেন পিসী মাসী,
তুমি আমাদের 'বাত্রীপাত্রা'
আমাদের 'ভাষা' বাসী।
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর,
গৃহ কাজে রত নাহি অবসর,
সুদীর্ঘ তব জীবন গোঁওলে
আমারিকে ভালবাসি।

২

তোমার বয়, তব শুশ্রূষা
আজ বুকে করে ভিড়,
জননীর পরিচারিকা যে তুমি
অর্দ্ধ শতাব্দীর।
যাতে হাত দিতে তাই পরিপাটি,
তরুতলে সব—ঝরঝরে বাটি,
সবই নির্ম্মল, স্নিগ্ধ কান্তি
মোদের গৃহিণীর।

৩

তোমার চিন্তায় পড়িতাম মঠ
থাকিলে প্রচুর ধন,
দাসীর শ্রাদ্ধে 'ধাম লাঙ্গলের'
করিতাম আয়োজন।
তোমার স্নেহের দু'ত প্রতিদান
যোগ্য তোমার দেওয়া দু'ত মান,
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ
শ্রদ্ধাই নিবেদন।

মাধবা অত্যন্ত সাহসী স্ত্রীলোক ছিল—তাহার মা মরণী করিয়া বলদুকর ধারিয়াছিল, দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল।

আমি গ্রামের যাঁহারা কর্ত্তা, যাঁহারা গৌরবের—তাঁহাদের কথা লিখি নাই। আমার এ রেখাচিত্র তাঁহাদিগকে সম্যক মর্য্যাদা দিতে পারিবে না।

মৃত-জীবন

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

রেল ষ্টেশনের কাছেই গাঁয়ের ছোট ডাকঘর। বিকেলবেলা অনাদি সেখানেই গিয়েছিল। কলকাতা থেকে কতকগুলো দরকারী কাগজপত্র আসবার কথা। তারই খোঁজে কদিন ধরে সে একবার করে এখানটা ঘুরে যায়। ফেরার পথে সরকারী দিঘীটার ধারে প্রকাণ্ড আম গাছটার ছায়ায় বসা একদল লোককে সে অন্যমনস্কভাবে প্রায় অতিক্রম করেই আসছিল। হঠাৎ একটা বিকৃতকণ্ঠ পেছন থেকে আহ্বান করলে—বাবু!

ফিরে তাকাতেই একটা জীবন্ত কঙ্কালের সাথে মুখোমুখি হয়ে গেল। অনাদির সামনে হাতটা মেলে ধরে সে একটা পত্রহীন শুকনো গাছের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোটরাগত দুটো চোখের দৃষ্টি কিছুটা রুক্ষ—কিছুটা বা ভিক্ষার দিনতিতে করুণ। অনাদি এবারে গাছের ছায়ায় জমায়েৎ ছোট দলটার দিকে তাকাল। মেয়ে, পুরুষ, শিশু—সকলেরই এই অবস্থা। সবাই অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার পানে। দৃষ্টিতে তাদের কিছুটা যেন আশা, কিন্তু ভরসা বিশেষ কিছু নেই।

অনাদি প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে এসেছ তোমরা সব?

যেন কথাবলার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই তেমন—এমনি সুরে লোকটা বললে—কত জায়গায় ঘুরলাম বাবু পোড়া পেটের জন্যে—কিছু মেলে না।···বিকৃতভাবে দাঁতগুলো একবার সে বের করলে। হাসবার, না কাঁদবার ভঙ্গি সেটা বোঝা গেল না। বললে—তারপর এইখেনে এলুম।··· হাতটা সে সর্বক্ষণ তেমনিই প্রসারিত করে রইল—যেন এই তার স্বাভাবিক অবস্থা।

অনাদি বললে—তা এখেনেই বা কী সুবিধে হবে বলো! এ গাঁয়ে কে তোমাদের খেতে দেবে? কেউ না হয় দু' একটা পয়সা ফেলে দিয়ে গেল, কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরবে না।

ততক্ষণে দলের ভেতর থেকে আর একটা লোক উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সে স্পষ্টই কান্নার সুরে বললে—কী করি বাবু? কোথা যাই?

অনাদি বললে—আমাকে কী করতে বলো?

কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বললে—বন্দুক নেই আপনার কাছে—পিস্তল? মেরে ফেলতে পারেন না আমাদিকে?

অনাদি বললে—এ গাঁয়ে একমাত্র অতুল চক্রবর্তী তোমাদের উপায় করতে পারে। তাঁর কাছে টাকা আছে—বন্দুকও আছে।

—আমরা তো তাঁর বাড়ী চিনি নে।

—চেনো না তো আমি কী করব?—ভ্রূ দুটোকে ঈষৎ কুঞ্চিত করে অনাদি বিরক্তি প্রকাশ করলে। অবশেষে বললে—আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেখানে গিয়ে যেন আবার আমার নাম কোরো না বাপু!

দূর থেকে অনাদি অতুল চক্রবর্তীর বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে। তারা সেদিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক দিয়ে অনাদি বললে—খুব তো এগিয়ে চললে। কিন্তু দরোয়ান কি তোমাদের ঢুকতে দেবে ভেবেছ? গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করবে।

—তাহ'লে!—লোকগুলো হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আমি তার কী করতে পারি?—অনাদির ভ্রূ দুটী আবার একটু কুঞ্চিত হল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ নীরবতার পর বলিল—আচ্ছা, তোমরা দাঁড়াও এখানে। আমিই যাচ্ছি।

কলকাতার অতুলবাবুর মস্ত মদের ব্যবসা। ছেলেরাই সব দেখাশোনা করছে। অতুলবাবু শেষ বয়সে দেশের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দীর্ঘ-জীবনে সুখ-সুবিধা সব কিছুই পেয়েছেন তিনি। ইদানাং চিন্তা ভাবনা তার ইহজীবন অতিক্রম করে পরজীবনের পানে ধাওয়া করেছে। বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারটায় জাঁকিয়ে বসে তিনি বিকেল-বেলার চা পান করছিলেন, এমনি সময় অনাদি গিয়ে প্রবেশ করল। অতুলবাবু গোঁফজোড়ার ফাঁকে অল্প একটুখানি হেসে বললেন—অনাদির খবর কী? শুনলুম খুব নাকি সভা-সমিতি করছ। তোমাদের বয়সে অমন পাগলামি আমরাও করেছি হে।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অনাদি বললে—আসবার বেলা দেখলুম আপনার বাগানের দক্ষিণদিকে একটা নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ওখানে কী হবে?

দামী শালটাকে কোলের ওপর আর একটু টেনে নিয়ে অতুলবাবু বললেন—আমার সমাধি মন্দির তৈরী হচ্ছে ওখানে। মরে গেলে ছেলেরা কী করবে কী জানি! তাই নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি!

আশ্চর্য্য হয়ে অনাদি বললে—মস্ত জায়গা নিয়ে ভিৎ গাঁথা হয়েছে দেখলুম। প্রকাণ্ড বাড়ী হবে তা'হলে। আমি তো ভেবেছিলাম ধর্ম্মশালা-টালা কিছু তৈরী করছেন দুঃখীদের জন্যে।

—ধর্ম্মশালা না হলেও ধর্ম্মস্থান হবে বৈ কী! রাধাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা করে যাবো ওখানে। তা খরচা তোমার গিয়ে অনেকটাই পড়বে, বুঝলে অনাদি।

—কিন্তু একটা সমাধি মন্দিরের জন্যে অতখানি জায়গা—

—কেন নয় শুনি। বেঁচে থেকে এত জায়গার অধিকারী, আর মরার পর অতটুকু জায়গা অধিকার করতে পারবো না? মৃত্যুর পর সবাই যে আমায় অনায়াসে ঠেলে ফেলে দেবে সে আমি হতে দেবো না। আমার একটা প্রতিকৃতি তৈরী করবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছি। কিন্তু একটা বড় সমস্যায় পড়ে গেছি হে।

—অতগুলি টাকা আছে, তার আবার সমস্যা কিসের? অনাদি কথাটা বলে অতুলবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অতুলবাবু খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব করলেন—সমস্যা আর কিছুই নয়, ভাবছি যে কোনো একজন নামজাদা শিল্পীকে দিয়ে আমার একটা অয়েলপেন্টিং (oilpainting) করিয়ে নেবো—না, কোনো বিখ্যাত ভাস্করকে ফরমাস দেবো আমার পাথরের মূর্ত্তি তৈরী করতে।

অনাদি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। জীবিত থেকে ইনি বহু মানুষের জীর্ণ বুকের ওপর অত্যাচারের যে সিংহাসন স্থাপনা করেছেন মৃত্যুর পরও তা থেকে অবতরণ করতে চাইছেন না কিছুতেই। মরে গিয়েও বেঁচে থাকবার স্বপ্ন দেখছেন ইনি; তাই যারা বেঁচে থেকেও মরে আছে তাদের কথা এঁকে শোনানো নিষ্ফল। উঠে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে—আমি চলি, শিল্পী আর ভাস্কর কাউকেই বাদ দিয়ে কাজ নেই।—বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে এলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অপেক্ষমান বুভুক্ষুদের চেহারা প্রেতমূর্ত্তির মত বীভৎস দেখাচ্ছিল। অনাদি এসে কাছে দাঁড়াতে বললে—কিছু হল না।

একটী নারী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল। কোনো একটী শিশু কাঁদতে লাগল ক্ষীণস্বরে।

—কী হবে তবে বাবু? কী করব আমরা?

—একটা কাজ করতে পারবে?—অনাদি ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখের তারাদুটো।—আজ রাতে দল বেঁধে চড়াও হতে পারবে অতুল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে? ডাকাতি করতে পারবে? আমি তোমাদের লাঠি দেবো—অস্ত্র দেবো—পথ বলে দেবো।

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অনাদির দিকে—টু-শব্দটী করলে না।

—কেমন পারবে?

—না বাবু না; আমরা গরীব কিষাণ, চোর ডাকাত নই।

অনাদির চোখের আগুন এক মুহূর্ত্তে নিভে গেল। নিষ্প্রভকণ্ঠে সে বললে—তা হলে আমি আর কী করতে পারি!

—আপনি দয়া করে আর একবার যান। ওকে বুঝিয়ে বলুন।

মুহূর্ত্তকাল নিষ্ফল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনাদি, তারপর সহসা অদ্ভুতভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের অতুলবাবুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুচোখে আবার আগুন জ্বলে উঠল।

অনাদিকে ফিরে আসতে দেখে অতুলবাবু একটু বিস্মিত হলেন, বললেন—ব্যাপার কী? আবার কী মনে করে?

সোজাভাবে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে—আপনার কাছে কিছু চাইতে এসেছি।

—কী? সমিতির চাঁদা? আমি তো তোমায় অনেকবার নিষেধ করে দিয়েছি। ও-সব ছেলেমানুষির মধ্যে আমায় পাবে না।

—আমি চাঁদা চাইতে আসি নি।

—তবে? কী চাইতে এসেছো তবে?

অতুলবাবুর দিকে আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনাদি পরিষ্কার কণ্ঠে বললে—আপনার বন্দুকটা।

স্বরাজ ও সংগঠন

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ

আজ ভারতের স্বরাজের আশা জাগিয়াছে। কিন্তু আলো ও আঁধারের খেলার মত এ আশার সঙ্গে আশঙ্কার যোগও কম নহে। আলো-আঁধারের সম্মিলন প্রভাতে ও প্রদোষে প্রায় সমভাবেই ঘটিয়া থাকে, এক দৃষ্টে অন্ধকারময় দিকের, অন্যটি আলোকময় দিকের মনোবীক্ষা আনে। আজ আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বে আমরা কোন্ দশায় উপনীত হইব জানি না, সন্দেহের দোলায় কত দিন দোল খাইব, তাহাও বলিতে পারি না। যদি আশা ফলবতী হয়, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনা যদি সিদ্ধি মণ্ডিত হয়, তাহা হইলেও বলিব—ইংরাজের দয়াদত্ত স্বরাজ যে মূর্ত্তিতে আজ ভারতে দেখা দিবে, তাহা প্রকৃত স্বরাজ নহে, অতঃপর প্রকৃত স্বরাজ অর্জ্জন করিতে হইবে। স্বরাজ দানসভ্য সামগ্রী নহে, অধিকার করিবার বস্তু।

১৯০৫ সাল হইতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনুগামী জনসাধারণ মাতৃভূমির পরাধীনতা-নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, অহিংসার আশ্রয়ে কারাবরণ করিয়াছেন ও সর্ব্বস্ব বলি দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—এই আত্মত্যাগ—তপস্যা বিফল; তপস্যার ফলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হৃদয়ে এমন কোন প্রেরণা দিল না তাঁহারই সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে এমন ঘোরাল করিয়া তুলুক, যাহাতে স্বরাজ-কলটি আমাদের করতলগত হয়; অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এরূপ চিন্তা যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে, তাঁহারা মুখে না বলিলেও অন্তরে বুঝিতেছেন যে,—অহিংস সাধনা স্বরাজ-অর্জ্জনের পক্ষে অথবা উপায় নহে। এই জন্যই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাত্রে ঘর্ম্মোদ্রেক হইতেছে না। একমাত্র নেতাজী ইহা উপলব্ধি করিয়া যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের প্রভুদিগের একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন নেতাজীর অমর-কীর্ত্তি। হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি এই বাহিনীতে উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ভারতের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণবলি দিয়াছে ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ও প্রার্থনীয় কি হইতে পারে? সে সংগ্রামে সফলতা লাভ হয় নাই সত্য, কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় ত' আজকার কথা নহে। আট শত বৎসর ব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ—জয় পরাজয় ও পরস্পরের প্রতি বৈরিতা হইতে যে বিদ্বেষ-হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা আজাদী হিন্দ্ ফৌজের অমৃতময় সংস্পর্শে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ভাবী সাফল্যের সোপান প্রস্তুত হইতেছিল; আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের মুসলমান সেনাপতির যেদিন স্বরাজ্যে হয়, তৎপরবর্ত্তী দুইটি দিনে হিন্দু-মুসলিম মিলিত বর্ম্মঘটের প্রভাবে শ্বেতাঙ্গ-নর-নারীদের হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। একদিন দুইদিনের মিলনেই কলিকাতা ও নওয়াখালীতে যে অমঙ্গল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতেই যেন উপলব্ধি করা যায় যে, হিন্দু মুসলমান মিলন ভারতের শুভদিন সূচনা করিলেও ব্রিটিশ শাসনের কালরাত্রি ডাকিয়া আনিবে। এ মিলন কি ব্রিটিশ সহ্য করিতে পারে? তাই পরমশ্রদ্ধেয় চার্চ্চিল সাহেব প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ দীর্ঘ মেয়াদ সন্ধির ষড়্‌যন্ত্র রচনা করিতেছিলেন বহুদিন হইতে। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ১৯০৫ সালে যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ-বিধান রচনা করা হয়, তাহাতেই এই চক্রান্তের বীজ উপ্ত ছিল। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ স্পষ্ট করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।* যতদিন না স্বরাজের টোপ ফেলা হইয়াছিল, ততদিন মুসলিম-লীগের গাত্র উত্তপ্ত হয় নাই। কূটনীতির বড়িশায় স্বরাজ-টোপ এমন ভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইল, যাহাতে লীগভুক্ত মুসলিমগণ উত্তেজিত এবং কংগ্রেসকে প্রলুব্ধ করা হইল। উক্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে স্বরাজ টোপ এখনও ঝুলিতেছে—কিন্তু এই টোপ গিলিবার পূর্ব্বেই এক সম্প্রদায় অন্যের দাঁতোদ্গিরিত ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল—এখন স্বরাজ—"ইয়ানীমাস্বরোর্দ্ধো পরিৎসাগরভূধরাঃ" স্থ্য ব্যবধানে পড়িল! আজ মুসলিম-লীগ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হাতে জীড়া পুতলী শুধু নহে—তাঁহাদের জন্মদাতা বহুবের স্তন্য স্বরূপ।

শাশ্বত বিশ্ব ধর্ম্মের অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি—কুসংস্কার হিন্দুকে দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আজ মনে হয়—লীগপন্থী মুসলমানগণ ত' ঐ সকল কুসংস্কারের ধার ধারেন না, অথচ ব্রিটিশ গোলামীর উপর এত অনুরক্ত কেন? শুধু ব্রিটিশের পদতলে পড়িয়া থাকা নহে, তাহাদের ইঙ্গিতে মুক্তিকামী প্রতিবেশী-দিগকে বৃহৎসঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধ্বংস করিতেও অনুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নারীধর্ষণ, শিশু হত্যা, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিপ্রদান—তদুপরি বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরীকরণ—ইহা যে কোন্ ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করে—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম! ইহার মধ্যে 'অধর্ম্ম' নামক কোন বস্তু আছে কি? বিশ্ব ধর্ম্মের শাশ্বতরূপ যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা

---

* In November 1934, General Sir Henry Page-Croft said: If the white paper goes through, our rule ceases. And India will pass permanently under the control of Hindus dominated by Brahmanism. Inevitably the precepts of Christianity will have to make way for Hindu ascendancy.

হয়,—শ্রীপথহীনের কর্ম্মের কর্ম্মস্থান কোন্‌টি ? 'নমাজ' মাত্র করিলে বা ভগবানের নামে মাটিতে মাথা ঠেকাইলেই যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ শাসনে নমাজকারী চোর ডাকাতের শাস্তি প্রদান হইত কেন ?

বাঙ্গলার বুকের উপর যে বীভৎস তাণ্ডব চলিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম হইবে ইহাই যে,—হয় প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানগণ নীল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেন, না হয়, সমগ্র মুসলিম সমাজ অধঃপাতের নিম্নস্তরে ডুবিয়া যাইবে।

সেকালের রাজগণ রাজ্য লুণ্ঠন করিতেন শুনা যায় বটে, কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অত্যাচারের কাহিনী অতি বিরল। শিবাজী মহারাজের সম্মুখে এক সময়ে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে এক সুন্দরী রমণী উপস্থিতা হইয়াছিলেন, শিবাজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া সম্মানিত ও যথাস্থানে প্রেরিত করিয়াছিলেন।

আর ব্রিটিশের কূটনীতিতে ভুলিয়া মুসলমানগণ হিন্দু ধ্বংস করিতে যতই উদ্যোগী হউন না কেন,—একটা জাতিকে নিঃশেষ করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ মুসলমানগণ নিজ রাজত্বকালেও যে জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই—আজ পাশ্চাত্য বুদ্ধি পরিচালিত পরাধীন মুসলিম সেই জাতিকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবে,—ইহা স্বপ্নবাত্র !

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার জ্যোতিঃ যাহাদের উপাস্য—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—ইহা যাহাদের নিত্য পাঠ্য—তাহাদের সামরিক অবসাদ আসিলেও ধ্বংস হইতে পারে না। আচার নিয়ম-নিষ্ঠা কুলাচার নহে, আত্মলাভের উপায় মাত্র, এই বোধ বিরহিত হইতেই হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের ধ্বনি—'যেন ত্রায়তে'—আজ বোধকে কেন্দ্র করিয়া পুনরুত্থান। আমাদের সংগঠন—আত্মানুভূতির মধুরতা সর্ব্বত্র সঞ্চারণ। কাপুরুষতা, ভীরুতা, অবসাদ বিদূরিত করিয়া তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও উৎসাহের উৎস বিকাশ করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্ম কখনও কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেয় নাই। এই ধর্ম্মের সেবা করিয়াই প্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ, বাজীরাও, প্রভৃতি বীরবৃন্দ পরাধীনতার যুগেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিত হইয়াই বেতাজীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি। অঃ ৮ ; শ্লোঃ ৩৯৮

যে রাজা হত্যা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যকারী ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে সে সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রজাদিগের বিদ্বেষের পাত্র হয়। রাজা নিজের বিত্তের লাভের জন্য বা বিপুল ধনাগমের আশায় সমস্ত জনগণের ভয়াবহ সাহসিক (Criminals) দিগকে কখনই বধ হইতে অব্যাহতি দিবে না। ৩৯৭

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে
দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকাঙ্ক্ষিতে।
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে ৩ ৩ ৩ ৩

দ্বিজাতিগণ ধর্ম্মের উপর আঘাত আসে—সেখানে দ্বিজাতিগণও শস্ত্র ধারণ করিবে। দ্বিজাতি এবং সমস্ত বর্ণের উপর কালকৃত বিপ্লব (ব্যাপক অত্যাচার) ঘটিলে—রাজা না থাকিলে বা রাজা নিজ কর্ত্তব্য না করিলে ব্রাহ্মণও আত্মরক্ষার্থ, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ (আততায়ীকে) হিংসা করিলে দোষভাগী হইবে না। এই স্থানে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—"রাজার ব্যতিক্রম ঘটিলে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষেও শস্ত্র গ্রহণীয়। সেইরূপে রাজাই রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রতি ব্যক্তিকে আটকাইতে পারেন না, এমন কতকগুলি দুরাত্মা থাকিতে পারে, যাহারা বলবান্ রাজপুরুষকেও পীড়া দেয়, কিন্তু শস্ত্রধারিদের ভয় করে, এ জন্য সর্ব্বকালের জন্যই শস্ত্র ধারণ করা উচিত। (সার্ব্বকালিকং শস্ত্রধারণং যুক্তং।) শুধু গ্রহণ নহে, শুধু ভয় দেখাইবার জন্য নহে, হিংসা পর্য্যন্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।" ধন্য ব্রাহ্মণ, পরের আক্রমণের জন্য এ বিধান নহে—কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য।

সমস্ত হিন্দুর মধ্যে আজ হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা বুঝাইয়া দিতে হইবে। আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিলেও অহিংসাধর্ম্মের হানি হয় না। 'আততায়িনমে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন। প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি।' ঐ ঐ ৩৯১

আততায়ীকে বধ করিলে বধকর্ত্তার কোনও দোষ হয় না। প্রকাশ্য ভাবেই হউক বা অপ্রকাশ্যভাবে হউক,—সেস্থলে ক্রোধের অধিষ্ঠাতা দোষকেই প্রাপ্ত হ'ন। এরূপ বধকারীর পক্ষে না প্রায়শ্চিত্ত বা অধর্ম্ম কিছুই হয় না। হিন্দু কখনও অপরকে আক্রমণ করিতে দেশান্তরে যায় নাই, নিজ ধর্ম্মের বোঝা জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপায় নাই, এবং আজও সে তাহা করে না বলিয়া সেই সুযোগ অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ হিন্দুকে জগতে দেখাইতে হইবে—পরকে আক্রমণ না করিলেও পরের আক্রমণকে সে ব্যর্থ করিতে পারে, ইহাই সংগঠনের প্রয়োজন।

এই সংগঠনকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রধানভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হিন্দু সমাজ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের চির-উপাসক। এই ধর্ম্মের প্রাণ হইল—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এবং দেহ হইল অর্থনীতি। অধ্যাত্মবাদ ও অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়াই আজও হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এক একটি হিন্দু সংহতি (communalism)কে আগাইয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের সমাজের সমস্ত অধ্বরগুলি আজ উপেক্ষিত হইয়াছে ; সমাজের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিত যাহারা, তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কুম্ভকার মাটির পাত্র যোগাইত—সেখানে আসিয়াছে বৈদেশিক এলুমিনিয়মের পাত্র ; গোপ ঘৃত দুগ্ধ সরবরাহ করিত—তাহার স্থানে আসিয়াছে বনস্পতি ঘৃত ও বহুবিধ ভেজাল মিশ্র ; আমাদের যন্ত্রশিল্প তন্তুবায় সংহতির হস্তে ছিল, আজ বৈদেশিক বস্ত্র-পণ্য মধ্যে সে শিল্প বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তৈলকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার,—

বেতুজীবী এ সকলকেই আহার দিতে হইবে। এই আহার দিবার সুসমঞ্জস দিবারই আমাদের হিন্দুদিগের সামাজিক সংগঠন। যদিও আজ চতুর্দ্দিকে দেবমন্দির ধূলিসাৎ ও পরস্পর পানভোজনাদির প্রবর্ত্তন হিন্দু-সংগঠনের উপায় বলিয়া গণ্য হইতেছে; কিন্তু ইহাও পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে বেড়শত বৎসরের শিক্ষাগ্রহণের ফল। মাহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—

In my opinion, the idea that interdining or intermarrying is necessary for national growth, is a superstition borrowed from the west. Eating is a process just as vital as the other sanitary necessities of life. (young India "Caste-system") আমার মতে—সহভোজন ও সবিবাহ দ্বারা জাতীয়তা বৃদ্ধি পায়, ইহা পাশ্চাত্য দেশের ধার-করা ভ্রান্তধারণা। ভোজন—স্নান শৌচাদির মতই জীবনধারণের অতি-প্রয়োজনীয় (ব্যক্তিগত) ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই মর্য্যাদাদান করিয়াছে এবং সে মর্য্যাদাকে দুরীকাঙ্ক্ষার দ্বারা লঘু করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে নৈতৃক কর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে সুসঙ্গতম তাহা পালনেই তাহার গৌরব, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।

* * * * *

ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দি দাদা আছে। গতিটুকু অবিতর্কে রাখা হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্বাধীন হইয়া উঠে। বন্ধনের অবাধীনতার ভয় ছোটের হাড়সোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না।

ফুরোপ এই কথা বলেন যে,—সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পর আর কোন অসৌজন্য নাই। ঘরের বাড়ীতে স্নানের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থির নিশ্চিত বলিয়াই ঘরের বাড়ীতে ধর্ম্মচ্যুত করিতে না পারিলেও ঘরের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু ঘরের যদি এমন পাগলামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, ঘরের বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত এবং সেই বৃথা চেষ্টায় সে বারম্বার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। ('মর্য্যাদা')

বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়, এইজন্য ফুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ বহির্ভূত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে গিয়াছি, কোনো আপত্তি করি নাই। (আধুনিক সমাজ)

প্রকৃতপক্ষে—আমাদের সামাজিক সংগঠন ছিল বিত্তের আদর্শ। আজ চাষীর চাষ নাই, কৈবর্ত্তের হাতে নৌ-বিদ্যা নাই, বাগ্‌দি বনস্পত্যাদির হাতে লাঠি সড়্‌কী নাই, চর্ম্মের কাজে চর্ম্মকারের শিক্ষা নাই, সকলকেই আমরা 'বাবু' করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। দেশের যদি পরমুখাপেক্ষ, পক্ষ জল-স্থল পরকীয় হস্তে তুলিয়া দিয়াছি—নৌকার মাঝি ও সাহেবের কাজ অধিকাংশই আমাদের সম্ভ্রমদের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। শিল্পের চিরন্তন মর্য্যাদায় অমর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি। এক্ষণে প্রয়োজন—পুনঃ সংগঠন। ভারতের প্রত্যেক হিন্দু তাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় যাহাতে হিসাব করিয়া দেখিতে চেষ্টা করুন,—ভারতের অর্থ—হিন্দুর অর্থ—আমাদের নিজজনের হাতে অধিক পরিমাণে যায় কি না।

শক্তঃ পরজনে ধাতা স্বজনে দুঃখবীক্ষিনি।
মন্ধাপাত্রো বিষাদাম: ন ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ। (মনু ১০ম অঃ)

সমর্থ ব্যক্তি পরজনকে দান করিতেছেন, অথচ স্বজন দুঃখে প্রাণধারণ করিতেছে, সে দান আপাতমধুর পরিণামবিষময় ধর্ম্মাভাসমাত্র, ধর্ম্ম নহে।

দেশের কোটি কোটি টাকা আজ বিদেশে যাইতেছে—তাহার আকর্ষণে অজনকের মধ্যে সহায়ক করাই যাহাতে এমন সংগঠনের প্রধান উপায়।

পণ্ডীচেরী আশ্রম

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

আশ্রম বলতেই সাধারণত লোক মনে করে ইহ-বিমুখ, কর্মবিহীন ধ্যান, যৌনী, বৈরাগী এবং সন্ন্যাসীর আস্তানা। শতকরা নিরানব্বই জনের এ ধারণায় মাঝে আমার চিন্তাধারাও ছিল লুকিয়ে। কিন্তু পণ্ডিচেরীর পথে যেদিন চর্মচক্ষু মিলে এসে দাঁড়ালাম, সেদিন আমার সমস্ত কল্পনা প্রতিমা ধীরে ধীরে মিলালো যাস্তব সত্যের রূপ প্রকাশে। আশ্রমের প্রচলিত সংজ্ঞা আমার কেড়ে চুরমার হয়ে গেলো। দেখলাম এ আশ্রমের বৃহত্তর ও পৃথক সংজ্ঞা। বিচিত্রমুখী বিপুল কর্ম-প্রবাহের যে স্রোত এখানে প্রবহমান, তারই সীমান্তে দাঁড়িয়ে তারই প্রাণস্পন্দন অনুভব করা কল্পনাতীত নয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "মহামানবের সাগরতীর" যেন সার্থকরূপী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ আশ্রমের প্রতিকক্ষে।

রক্তঝরা ভারতের সমাজেশে পণ্ডিচেরীর আশ্রম আজ পৃথিবীর তীর্থে পরিণত হয়েছে। এ উদ্ভূত সাগর সঙ্গমে ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা-কর্মের মানব-নদী এসে মিলিত হচ্ছে কোন্ এক মহাসাধনার মহাকর্মকে সফলীত করবে বলে কে জানে।

এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র কর্ম কোলাহল নেই। মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির যে নীরব নিপুণ ছন্দে ভোরের কুসুম ফোটে, পূর্বাকাশে সূর্য ওঠে, নদী বয়ে চলে—এখানকার সকল কাজও যেন সে উদার অনন্ত নিবিড় ছন্দে বাঁধা। সংসারে অনেক কর্ম ও কর্মঃ প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। কিন্তু এ আশ্রমের অন্যই বৈশিষ্ট্য হয়েছে বলেই এ সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের ঊর্ধ্বে। এখানকার কর্মানুষ্ঠান অন্যান্য কর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সর্বস্ব সাধক সাধিকারা বিভিন্ন বিভাগে নীরবে আপন আপন কাজ স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন করে চলেছে। এখানে কেবল কাজের জন্য কাজ, কেউ আকাঙ্ক্ষা করে না; সকলেই এখানে কাজ করে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের উপায় হিসাবে। তারা কর্মকে গ্রহণ করছে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও পূর্ণযোগের এক বিশিষ্ট অঙ্গ কর্মযোগ হিসাবে। কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পার্থকে উপলক্ষ করে যে যোগের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আজও অবহেলিত অথচ যার সাধনা ও সিদ্ধি ভিন্ন মানবজাতির ও মানবজীবনের মূল সমস্যা সমাধানের অন্য পথ নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি—আশ্রম বলতে লোকে যা ভাবে, কর্ম-বিমুখ, মানবসমাজত্যাগী, সাধু সন্ন্যাসীর আখড়া—এ তা মোটেই নয়। কর্মপ্রবণ মানব পৃথিবীরই মতো এখানে রয়েছে আশ্রমের গোশালা, কাপড়খানা, ইটের কারখানা, গোশালা, ছাপাখানা, বই বাঁধানোর কারখানা, ছেলেমেয়েদের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক রুচিসম্মত বিদ্যালয়, আর আশ্রমের বিরাট সুন্দর পাঠাগার। এখানে রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, গায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার—বিখ্যাত, অখ্যাত, এমনি কতো প্রতিভা। এ যেন একটা স্বতন্ত্র আত্মনির্ভরশীল রাজ্য। মানুষের একমাত্র পরিচয় এখানে মানুষ। রিয়ালিটি বা বাস্তবতার এত সম্পূর্ণ চেহারা আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না। আশ্রমবাসীদের মধ্যে ভিন্নীর ভৌল বা পরিমাণে নয়—আপন সত্তার পূর্ণ বিকাশে। তাই জানের সীমা কোথাও এর বিরুদ্ধ এঁকে দেয়নি। পণ্ডিচেরী আশ্রমে জাতি, ধর্ম, দেশবিদেশের সংস্কারজনিত কোন ভেদের প্রাচীর নেই,—যেখা ধনিক দরিদ্র একই পথে মানুষের অধিকারের উচ্চতরতরে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে,—পৃথিবীতে এ উদাহরণ অসাধারণ।

আরো উল্লেখযোগ্য—এখানকার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও জীবন জগদাতীত ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি নয়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির ভেতর দিয়ে পরম সত্যসুন্দরকে—কল্যাণময় ভগবানকে—সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে জীবনে ও জগতে প্রতিষ্ঠা করাই এখানকার উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"Life is the altar, works our offering, the transcendental will is the Deity" এই কারণেই দেখি এখানে প্রত্যেকটি কাজের প্রতি, জীবনে প্রতিটি ঘটনার প্রতি কি অসীম জাগ্রত দৃষ্টি; তাতে জীবনের এবং কাজের কোথাও কোন খুঁত, কিছুমাত্র অপূর্ণতা না থাকে। তাঁরা কাজকে মনে করে জীবনের প্রকাশ, তাই কাজের পরিপূর্ণতার জন্য তাদের এত যত্ন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে নারীজীবনের যে বহুমুখ মুক্তির জোয়ার, সারা ভারতবর্ষের কোথাও সে পরিচয় সহজ জীবন যাপনের প্রোজ্জ্বলতা নেই, একথা প্রত্যেক দর্শনকারী মানুষই এখানে এসে স্বীকার করে থাকে। মেয়েদের অন্তর জীবন ও বহির্জীবন বিকাশের এমন সর্বাঙ্গীণ সুযোগ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। পৃথিবীর অপরাপর দেশে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার যে সব বিবরণ শোনা যায় কোথাও তা নির্মল নয়; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর নয়। এখানে বাইরের কোন আইন-কানুন, বিধিবিধান বা উপদেশবাণী নেই। কিন্তু তবুও অন্তরধামে রাজযোগ উপদেশ বিধি বিধান ও অনুজ্ঞায় যা সম্ভব হয়নি, আপন অন্তর উপলব্ধি এখানে তা সার্থক হয়েছে নিশ্চিন্তরূপে। প্রশ্ন জাগে—"কি করে এ সম্ভব হ'ল এখানে।" মনের মধ্যেই উত্তর পাই—"তারা যে মানব জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শকে আপনার

করে নিয়েছে।" এই আশ্বাসটি পেয়েছে, প্রত্যেকে সহজ স্বাভাবিক-ভাবে এসব সম্ভব করে তোলে। সর্বোপরি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মাতৃশক্তি ও গুরুশক্তি রয়েছে এখানকার সহায়।

আশ্রমে ছেলে অপেক্ষা মেয়ের উপর জোর অধিক। তাঁরা বরণীয়কে বরণ করে চলেছেন বর্জনীয়কে দূরে পায়ে মাড়িয়ে। অনেকের জীর্ণ পত্রের মত ঝরে পড়ছে, নূতন গুণ সামর্থ্য ও ভাবরাজী এসে সবাকে ও স্বভাবকে অধিকার করছে।

সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন সৌরজগৎ, তেমনি আশ্রম অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমায়ের প্রেমাকর্ষণ দ্বারায় এই আশ্রম। রহস্যময়ী বিশ্ব দেখে যেমন বিশ্বজননীকে স্মরণে জাগে, সেরূপ আশ্রমের প্রতি গৃহ, ফলফুল ভরা প্রতিটি বাগান, প্রতি বৃক্ষ ও প্রত্যেকটি মানুষকে দেখে আশ্রম জননী শ্রীমাকে মনে জাগে। অসরূপ লাবণ্য ও কল্যাণময়ী নারী সহস্র জীবনের পরতে পরতে মাতৃত্বের স্পর্শের যে কণিকা বিলিয়ে জগন্মাতার মতো প্রকাশিত হয়েছেন,—সে মাতৃত্ব অপার্থিব হলেই ধরণীধাত্রীর মতো বেগবতী। এই এক মাতৃশক্তিকে কেন্দ্র করে, মায়ের অক্ষয় বাণীর অন্তরালে এক একটা ক্ষুলিঙ্গের মতো পণ্ডিচেরীর গোপন কক্ষে যে নতুন মানবযাত্রীদলের প্রস্তুতি চলেছে, অনন্তকালের ইতিহাসে এরাই হয়তো স্মরণে থাকবে জ্যোতিষ্কের মতো। পৃথিবীর কাছে তারাই দিয়ে যাবে ভারতবর্ষের একক অনুভূত সত্যের মর্মবাণী। তাই আশ্রমের প্রত্যেক নরনারী এক মাতৃবাণীকে ধ্রুব করে এগিয়ে চলেছে। শ্রীমা বলেছেন "হে আমার পুত্রগণ, তোমরা মাতার সন্তান হও।" মাতার পুত্র হবার অন্য সাধনাই যেন চলছে এ নির্জন সমুদ্র তীরে—বিশ্ব-জগতের অনন্ত কোলাহলের আড়িপথাকে পশ্চাতে ও একান্তে রেখে। কোলাহলের আড়ালেই এরা কর্মী হয়ে উঠছে। এই অমরী মায়ের সার্থক স্বপ্নের জন্ম হবেই, প্রতিষ্ঠা এর হবেই, তবেই পৃথিবীতে সম্ভব হবে শাশ্বত শান্তি, সত্যকার মঙ্গল।

ভগবান শ্রীঅরবিন্দ মর্ণনের অপেক্ষমান একটি মুহূর্ত অনুপম। উপনিষদের এ আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখে মনে হোল তাঁরই তপঃ সৃষ্ট আশ্রমের বিপুল পতিপ্রসাদে তাঁরই প্রসাদ প্রসাস্থিতে বিধৃত। জয় হবেই, এ মহান পুরুষের জয় হবে তাঁরই কল্পিত ভারতবর্ষে। ভারতের অন্তর্মূর্তি এ তপস্যার আগুনে আহুতি স্নানে সার্থক হ'য়ে উঠবেই। পৃথিবী মাঙ্গলিক রচনার ভার নেবে ভারত মাতার সে বিজয় গৌরব উৎসবের। কবি প্রাণের সে সকল বাঁশিতেই জগত আত্মা জেগে উঠবে। বলবে,— "অরবিন্দ, জগতের লহ নমস্কার!"

নীলাচলে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শুনি ও কাহার কায়?
যেমনা মাথায় কাঁধনে কাঁপিছে নিবীড় অন্ধকার:
আকাশের ভ্রোধে বাষ্প ঘনায়ে আসে:
তারকা-নয়ন আবরিয়া তার কাহার দুঃখ ভাসে?
একাকী গোপনে গম্ভীরা-মাঝে কোন্ বিরহিণী নারী
দূরন্ত তার ধমিতের লাগি ফেলিছে নয়ন-বারি?
ভুবন বিথারী মর্মবিথারী ফেলিয়ে দীর্ঘশ্বাস,
পৃথিবী-পবন সঘন তার লভিয়া ক্ষুব্রাভাস!
হৃদয় মথিয়া উঠিতেছে শুধু ব্যথাভরা হাহাকার।
শুনি ও কাহার কায়?
ধমিতের লাগি ব্যথা,
শত জীবনের শত মিলনের পুঞ্জিত কত কথা,
আকুতিতে ভরা মিথ্যা আশার পথপানে চেয়ে থাকা,
দীর্ঘশ্বসিত হসিত-প্রিয়ের স্মৃতি সুরভিতে মাখা,
কাঁধনের মাঝে মূরতি ধরিয়া এসেছে সকলে তারা;
দেখিতে যে পাই এরি কায়ায় বিরহ আত্মহারা!
স্বর্ণ-তনুর আড়ালে লুকান কায়ে যেন দেখা যায়,
ধূলিধূসরিতা ব্যাকুলা রাধিকা কাঁদে পথ-ধূলিকায়!
পাগলের মত মন্দির-পথে কে ওই ছুটিয়া যায়?
কনকাঙ্কের ছাড়িতে মায়ের তিমির টুটিয়া যায়!
হেইল-তোরণ-তলে
লুটাইছে কার উন্নত তনু নিত্য চোখের জলে!
পাতালে বহ্নি প্রবাহ যেমন ধরণী ছিন্ন করি
বাহিরিতে চায় অগ্নি-গিরির উদ্গার-রূপ ধরি,
তেমনি কি ওর অন্তর-মাঝে প্রেমের অগ্নি জ্বলে,
বাহিরিতে চায় দেহ বিদারিয়া আপন পূর্ণ বলে?
যমুনা বলিয়া নীল-জলধিকে কে করে আলিঙ্গন?
চটকের পানে ছুটিয়া চলে কে তাবিয়া গোবর্ধন?
তমালে জড়ায়ে নিজ বাহু-লতিকায়
কৃষ্ণ বলিয়া কে কাঁদিছে ওই গিরি-ঘন-বীথিকায়?
তরু মর্মরে কে ওই শিহরে চকিত মরমে চায়,
প্রিয়-পদ-ধ্বনি মনে মনে গণি সেদিকে সহসা ধায়?
সিন্ধুর কূলে আকাশের কোলে হেরিয়া পূর্ণ শশী
চির-বাঞ্ছিত-মিলন-অধীর কে উঠিছে উচ্ছ্বসি'?
মন্ত্রিত কার তন্দ্রা-বিহীন হৃদয়ের গাথাবার?
শুনি ও কাহার কায়?

কলিকাতার আশেপাশে বাসগৃহ সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলাদেশ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত হওয়ার উভয় অংশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে তীব্র ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই আতঙ্কজনিত দুর্ভাবনায় পূর্ববাঙ্গলার সহস্র সহস্র হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসস্থান পরিত্যাগ করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে বলিয়াই মনে হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক এইভাবে পলাইয়া আসিবার সুযোগ পাইলেও বহু হিন্দুকে পূর্ববঙ্গে বাধ্য হইয়া থাকিয়া যাইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে লোক কমিয়া যাওয়ার জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক হইতে নিঃসন্দেহে অনেক দুর্বল হইয়া পড়িবে। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া ভীড় বাড়ান সমর্থন করা যায় না। তবে নীতির দিক দিয়া এই অসমর্থনের কথা তুলিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেদের এত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের পলায়নপর মনোবৃত্তিকে নিন্দা করার অর্থ তাঁহাদের একান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা। এইরূপ যাঁহারা এখন পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্য না হইলেও অনেকের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে চাকরী খুঁজিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত অবস্থাপন্ন, টাকার জোরে তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই ; কিন্তু এই ধরণের জনকতক বড়লোককে বাদ দিলে আর যাঁহারা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অল্পবহু পুঁজি লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন অবশ্যই বড় করিয়া দেখিতে হইবে।

যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই পশ্চিম বাঙ্গলায় বাসগৃহ সমস্যা দেখা দিয়াছে। জমি ও বাড়ীর দর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ক্রমবহু মুদ্রাস্ফীতি এই সঙ্কটজনক অবস্থার প্রধান কারণ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পর গত ৮ বৎসরে দেশে অর্ধেক লোক বাড়িয়াছে, অথচ নূতন বাড়ী ঘর বলিতে গেলে মোটেই তৈয়ারী হয় নাই। যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে নূতন এক বিত্তশালী শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ নানাকারণে জমি ও বাড়ীর চাহিদা সম্প্রতি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তদনুপাতে মূল্যও বাড়িয়াছে অত্যন্ত। ইহার উপর বাঙ্গলা ভাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইতেছেন। ইহাদের অবস্থা কাহিল, নিরুপায় হইয়া ইঁহারা সর্বস্ব বিনিময়েও বাধা ভিটায় ঘুঘু চরাইতে উৎসুক হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের সহর ও বাসযোগ্য গ্রামগুলিতে জমি বা বাড়ীর মূল্য গত এক বৎসরের মধ্যেই অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি চাহিদার তুলনায় সঙ্গত হইলেও জমি বা বাড়ীর মালিকদের চোরাবাজারী মুনাফাবৃত্তিও নিঃসন্দেহে ইহার জন্য দায়ী। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া জমি বা বাড়ীওয়ালাদের অনেকে ভাড়া, সেলামী অথবা জমির বিক্রয় মূল্য হিসাবে বেশ দু পয়সা কামাইয়া লইতেছেন। ভাড়ার জন্য কলিকাতা সহরে তবু 'রেন্ট কণ্ট্রোলার' আছে, কিন্তু বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোন আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় অবস্থা সর্বত্রই ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গীয় অসহায় আশ্রয়প্রার্থীরা তো আয়ত্তাতীত মূল্যের জন্য আশ্রয়স্থল সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মনোদুঃখে রহিয়াছেনই, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের জমি বা বাড়ীর একান্ত প্রয়োজন, তাঁহাদেরও অসুবিধার সীমা থাকিতেছে না। আজকাল বাড়ী তৈয়ারীর জিনিষপত্রের অভাব এবং অগ্নিমূল্য সর্বজনবিদিত, ইহার উপর জমির ব্যাপারে মুনাফাবৃত্তি এবং চোরাকারবার পুরোদমে চলিতেছে বলিয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় (বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এবং কলিকাতার আশে পাশে ২০।২৫ মাইলের মধ্যে) বাসগৃহ সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

এই সাংঘাতিক অবস্থা যে চলিতে দেওয়া যায় না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রথমেও কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার নয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থবান ব্যক্তিগণ বা ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর না হইলে ইহার সমাধান সত্যই আশা করা যায় না।

পশ্চিম বাঙ্গলার কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে জমি বিক্রয় সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্তন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া যে পশ্চিম বাঙ্গলায় অতঃপর যে জমি হস্তান্তরিত হইবে তাহার মূল্য ১৯৪০ সালের হিসাবে কোন ক্ষেত্রেই তিন গুণের বেশী হইতে পারিবে না (মোটামুটি বাড়ী-ভাড়ার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া এই ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে)। এ ছাড়া সরকারের এমন এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতাদি সহরের সহরতলী অঞ্চলে বড় বড় জমির দখল লইয়া বহু সংখ্যক ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারী হইতে পারে। এই ভাবে জমি দখলের জন্য প্রচলিত ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের বা জমি দখলের আইনের সুবিধা গভর্নমেণ্ট অবাধেই গ্রহণ করিতে পারেন। একসঙ্গে কাজ হইবে বলিয়া এই সব বাড়ী তৈয়ারীর খরচ অনেক কম পড়িবে এবং বিক্রয় করা হউক বা ভাড়া দেওয়া হউক, যাঁহারা বাড়ী দখল করিবেন তাঁহারা লাভবান হইবেনই। এইরূপ ব্যবস্থা যে

লাভজনক তাহা ইতিপূর্বেই এদেশের একাধিক 'বিল্ডিং সোসাইটি' বা 'ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী'র সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম বাঙ্গলার সরকার যদি এইরূপ পরিকল্পনা কার্যকরী করেন তাহাতে তাঁহাদের আর্থিক লাভ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এজন্য অনেকগুলি টাকা এখনই বাহির করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলার সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া মূলধনের সংস্থান অবশ্যই বড় কথা; তবে এইরূপ লাভজনক কারবারের খাতির যদি সরকার গ্রহণ করেন এবং তদুদ্দেশ্যে চার পাঁচ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়েন, এখনকার কাঁপাই টাকার বাজারে টাকা সংগ্রহে তাঁহাদের বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কারবারে লাভের হার বেশী, ঋণপত্রের জন্য সাধারণতঃ তাঁহারা যে সুদের হার স্থির করেন, অংকের সে তুলনায় সুদ অনায়াসেই একটু বেশী করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে অর্থবান বেশবাসী এই বিশেষ ঋণপত্রে টাকা লগ্নী করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সরকারী উদ্যোগে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা ইতিহাসে নূতন ব্যাপার নয়। বাঙ্গলা সরকারই ইতিপূর্বে কলিকাতাকে পূর্বাঞ্চলে বাড়াইবার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ কর্পোরেশন দ্বারাও মাদ্রাজ সরকারেরও এই ধরণের একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বম্বাতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ—এই ১৮ বৎসরের মধ্যে যত বাড়ীঘর তৈয়ারী হইয়াছে তাহার শতকরা ৪৮ ভাগ হইয়াছে সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ও সাহায্যে।

সরকারী প্রচেষ্টায় মূলাও গুরুত্ব অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের বাসগৃহ সমস্যার সমাধানে অর্থবান বেশবাসীর চেষ্টাও নানাভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে। যুদ্ধের আগে জমি বা বাড়ীর বাজার যখন অত্যন্ত নীচে ছিল, তখনও কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে জমির ব্যবসা করিয়া বা একসঙ্গে কতকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিবার পর খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিয়া অথচ মুনাফাভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। এখন লোকের হাতে কিছু টাকা হইয়াছে, বাজার এখনও খুবই চড়া, এসময় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বড় বড় জমি সংগ্রহ করিয়া জমির উন্নতিসাধনের পর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বা শুধু জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বেচিয়া অথচ লাভবান হইতে পারেন। অবশ্য এইভাবে লাভবান হওয়ার অর্থ চোরাকারবারের মুনাফা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হওয়া নয়। এভাবে জমি বা বাড়ীর মুনাফাখোরী ব্যবসা যে ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক আকারে সুরু হইয়াছে, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। আমরা যে ব্যবসার কথা বলিতেছি তাহাতে ব্যবসায়ীদের বা অর্থবান ব্যক্তিদের আন্তরিক বেশবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক বা সরকারী ঋণপত্রে টাকা খাটাইলে তাঁহারা যে হারে সুদ পাইয়া থাকেন, এই ব্যবসায় তদপেক্ষা কিছুটা বেশী মুনাফা ভোগ করিয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। টাকা যার খাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্য সুদের উচ্চ হারের প্রশ্ন উঠে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবসাটি এতই নিরাপদ যে ইহাতে লোকসান হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। দুচারজন বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি উৎসাহ করিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিলেই এইরূপ জমি বা বাড়ী বেচা-কেনার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকাল লোকে নিরুপায় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা ফেলিয়া রাখে এবং তজ্জন্য সুদ যা পায় তাহা একান্ত নগণ্য। তার উপর ব্যাঙ্ক ছাড়া বেশের মুষ্টিমেয় বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাও এখন এমন কিছু নিরাপদ নয়।

প্রকৃতপক্ষে এখনও কলিকাতার কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলে বহু বড় বড় জমি পড়িয়া আছে। এই সব জমির কতকাংশে উন্নত এবং সেগুলির মালিকও এখন চাহিবার চাপে কিছুটা বাড়িয়াছে, তবে অনুন্নত জমির পরিমাণই বেশী। বেশী টাকা লইয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ অনুন্নত জমির উন্নতিসাধন করা সম্ভব। এই ধরণের জমির মূল্য-মূল্য নিশ্চয়ই কম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে নিজ খরচে জমির উন্নতি করিয়া লইলেও কিছু লাভ রাখিয়া এখনও তাঁহারা সম্ভাবরেই এই জমি বিক্রয় করিতে পারেন। এই সব জমির মধ্যে খুব বড় জমি থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে জমি চরাট করা বা জমির উন্নতি করা, ড্রেন রাস্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, এমন কি জলের কল ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা করাও একেবারে অসম্ভব নয়। বি-এণ্ড-এ রেলপথের মেন লাইন ও খুলনা লাইনের মধ্যে, ডায়মণ্ডহারবার ও বজবজ লাইনের মধ্যে, ই আই আর ও বি এন আর লাইনে কলিকাতার কাছাকাছি ২০।২৫ মাইলের মধ্যে এইরূপ অনেক বড় জমি পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ই আই আর কর্ড লাইনে ডানকুনির জমির এবং খুলনা লাইনে বাকড়ার মাঠের কথা উল্লেখ করা যায়। এই জমিগুলি উন্নত হইলে এবং এখানে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে সেই সব বাড়ীর বাসিন্দারা অল্পেই দৈনিক কলিকাতায় আসিয়া চাকুরী পর্যন্ত করিতে পারেন। কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে ১০।১৫ মাইলের মধ্যে (রেলষ্টেশনের একটু কাছে বা যাতায়াতের উপায় হইলে) জমির দাম অন্ততঃ পক্ষে ২০০ টাকা কাঠা, উপরোক্তভাবে জমি তৈয়ারী করিয়া লইলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের লগ্নী টাকার উপর শতকরা ১২ টাকা হিসাবে মুনাফা ধরিয়াও ১০০ টাকার মধ্যে (রেলপথ হইতে একটু ভিতরে হইলে আরও সস্তায়) সমস্তুকের প্রতি কাঠা জমি বিক্রীত হইতে পারে। এই সব জমির বাস্তু বা সুবিধা পল্লী অঞ্চলে যে সব জমি বর্তমানে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহাদের তুলনায় অবশ্যই বেশী হইবে। এখন বাড়ী তৈয়ারী এক প্রকার সমস্যা, অতি কষ্টে জমি জুটাইলেও মালপত্রের অভাবে বাড়ী তৈয়ারী করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিত্তশালী কোন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিলে এযাবারে খরচ অনেক কম পড়িবে এবং কিছুটা মুনাফা রাখিয়া সেই সব বাড়ী নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদের কিস্তিবন্দী হারে বিক্রয় করিলে দেশের একটি স্থায়ী কল্যাণ হইবে। আইনের বাধন থাকিবে বলিয়া এইরূপ কারবারে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। নূতন নগর বা পল্লী গঠনের সময় স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য রক্ষার যে স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব, পুরাতন গ্রাম

যা সহরে সেই সম্ভাবনা নাই বলিলে চলে। এদিক হইতেও বড় বড় অফিসে যে বাড়ীগুলি বা রাস্তাঘাট তৈয়ারী হইবে সেগুলি পরিষ্কার ও সুন্দর কোন পরিকল্পনা অনুসারে অবাধেই হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিতে এই নগর পরিকল্পনা বা টাউন প্ল্যানিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। অবশ্য এখন হইতেই পশ্চিম অঞ্চলে বাসগৃহ সমস্যা এত জটিল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে যে, যে সব প্রতিষ্ঠান সহায়তার সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া (অর্থাৎ নিজেদের পকেট ভর্ত্তি হাড়াই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না, দুর্গত দেশবাসীর মুখের পানে চাহিয়াই যাহারা লাভের হিসাব করিবেন) এইরূপ জমি বা বাড়ীর কারবার সুরু করিবেন, তাঁহাদের প্রচুর টাকা লইয়া নামিতে হইবে। এখনকার অবস্থায় অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা না লইয়া এইরূপ কাজ আরম্ভ করা চলে না। তবে আশার কথা এই যে যুদ্ধ সম্ভবতঃ খুব শেষ হইয়া আসিলেও কাঁপাই টাকার খুব এখনও চলিতেছে এবং লোকের হাতে এখনও বাড়তি টাকা আছে বলিয়া উপযুক্ত ও দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা এইরূপ বড় প্রতিষ্ঠান গড়িতে উদ্যোগী হইলে এখন কিছুদিন অন্ততঃ মূলধনের অভাব হইবে না। পশ্চিম অঞ্চলে বর্ত্তমানে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই লোকাল সরকারের উচিত নিজ চেষ্টায় বর্ত্তমান বাসগৃহ সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানের ব্যবস্থা করা। এই কর্ত্তব্যপালনে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহের অভাব হইবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। জমি ও বাড়ী কেনাবেচার ব্যাপারে অবাঞ্ছিত মুনাফাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তন করা তাঁহাদের জনসাধারণের সেবা করিবার আগ্রহের অন্যতম পরিচয় হইবে সন্দেহ নাই। এছাড়া উপরিউক্ত নীতিতে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি জমি ও বাড়ী কেনাবেচার কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, পশ্চিম বঙ্গীয় মন্ত্রী-সভা সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে সব দিক হইতে সাহায্য না করিয়া পারেন না। এজন্য গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী মূলধন মাসিক কিস্তী বাদে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 'ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান এ্যাক্ট' অনুসারে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বড় বড় পতিত বা অনুন্নত জমি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সকল প্রকার সাহায্যই আশা করা যায়।

নারী-ধর্ম

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল বাচস্পতি এম-এ, পিএচ্-ডি

বনবাসকালে রাম চিত্রকূটে বাস করিয়া নানাপ্রকার কর্ম দ্বারা এমন চরিত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন যাহা অনুত্তোপম।

কিন্তু পরে বুঝিলেন—এখানে আমি আছি সকলে জানিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগমের সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া সেখানকার মুনিদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত দুই ভাই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে অত্রিমুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। তাঁহার আসার কথা শুনিয়া মুনি বড় আনন্দিত হইলেন। প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য তিনি পুলকিত শরীরে রামের দিকে ধাবিত হইলেন। রাম দেখিয়া রামও ধাবিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। মুনি রামকে বুকে লইলেন, এবং দুই ভাইকে প্রেমাশ্রু দ্বারা স্নান করাইয়া দিলেন। রামের শরীরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুটী জুড়াইয়া গেল। তিনি সীতাসহ রাম লক্ষ্মণকে সাদরে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেখানে যথাবিধিতে বসাইয়া পরম জ্ঞানী মুনিশ্রেষ্ঠ রামকে নিম্ন বোধে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল জ্ঞানস্বরূপ। তুমি শংকরবন্দিত, ব্রহ্মাদি দেব দ্বারা পূজিত। তুমি ইচ্ছা-দ্বেষ রহিত ত্রিগুণাতীত। তোমার চরণকমলে ভক্তি যাও। আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণ কখনো ত্যাগ না করে।

সুশীলা বিনয়ী সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রণাম করিলেন। সীতাকে পাইয়া অনসূয়া দেবীর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। তিনি সীতাকে নিকটে বসাইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

অনসূয়া সীতাকে এমন সুন্দর বসনভূষণ পরাইলেন যাহা নিত্য নূতন ও অমল থাকে। তিনি সীতাকে নারী ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

হে রাজকুমারী, শোনো। বাপ, মা, ভাই, হিতকারীরা যাহা দিতে পারে, তাহার সীমা আছে, কিন্তু হে বৈদেহী, স্বামী অমিত দাতা, তাঁহার দানের সীমা নাই। যে সেই স্বামীর সেবা না করে, সে অধম। ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী এই চারিটীর পরীক্ষা হয় আপদকালেই। কুষ্ঠ, ক্ষয়, মূর্খ, ধনহীন, অন্ধ, বধির, ক্রোধী, অতি দরিদ্র, এই প্রকার স্বামীর অপমান করিলে নারী যমালয়ে অশেষ কষ্ট পায়। স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম ও একমাত্র ব্রত কায়মনোবাক্যে পতির চরণে ভক্তি রাখা। জগতে চারি প্রকার পতিব্রতা স্ত্রী আছে—উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। ইহাদের কথা বুঝাইয়া বলিতেছি, মন দিয়া শোনো।

উত্তম পতিব্রতা স্ত্রীর মনে কখনও এই ভাব থাকে যে, জগতে আর অন্য পুরুষ নাই। মধ্যম পতিব্রতা পরের স্বামীকে নিজ ভাই বা পুত্রের মত দেখে। ধর্ম বিচার করিয়া ও বুঝিয়া যে ভুলে থাকে সে নিকৃষ্ট। আর কেহ না দেখিলে বা পাইয়া বা ভয়ে ভুলে থাকিয়া যায়। তাহাকে জগতে অধম নারী বলিয়া জানিও। যে স্ত্রী স্বামীর সহিত ছলনা করে ও পরের স্বামীর সহিত প্রেম করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে বাস করে। ক্ষণিকের সুখের জন্য যে শতকোটী জন্মের দুঃখ বুঝিতে পারে না, তাহার সমান মূর্খ আর কে আছে? যে স্ত্রী পতিব্রতা ধর্ম অকপটে পালন করে, সে বিনাশ্রমে মোক্ষ পায়। যে স্বামী-বিদ্বেষ, সে পর-জন্মে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়।

শোনো, সীতা! তোমার নাম স্মরণ করিয়া নারীরা পতিব্রতা ধর্ম পালন করিবে। তুমি রামের প্রাণপ্রিয়া। সংসারের হিতের জন্য আমি এই কথা বলিলাম।

অনসূয়ার উপদেশ শুনিয়া সীতা অতিশয় প্রীতি পাইলেন, এবং সাদরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

চিত্রশিল্পে মহিলার সাধনা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতীয় চতুঃষষ্টি কলা (বিদ্যা)র মধ্যে চিত্রকলা অন্যতম। কবি বাৎস্যায়ন ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে মহিলারা অনেকে সঙ্গীতকলার ন্যায় চিত্রকলারও বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে, সখী বিশাখা শ্রীরাধাকে শ্যামের মূর্তি আঁকিয়া দেখাইতেছেন। এমনও আছে যে শ্রীমতী নিজেও শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের পট আঁকিয়া উষাকে দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। গুহায় এবং বৌদ্ধমন্দিরে অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র এখনো বিশ্ববিখ্যাত হইয়া

ইংরাজের আগমনের সময়ে এদেশে আলপনা, বৃৎপাত্রের উপর চিত্রাঙ্কন, সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য প্রভৃতিতে বঙ্গ মহিলাদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যাইত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটিতে থাকায় পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। চারুকলা অনাবৃত হইতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পুনরায় পরিবর্তন সুরু হইয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রকলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই সম্পর্কে সুরমাদেবী, সুপ্রভা

তুষার-শিখর

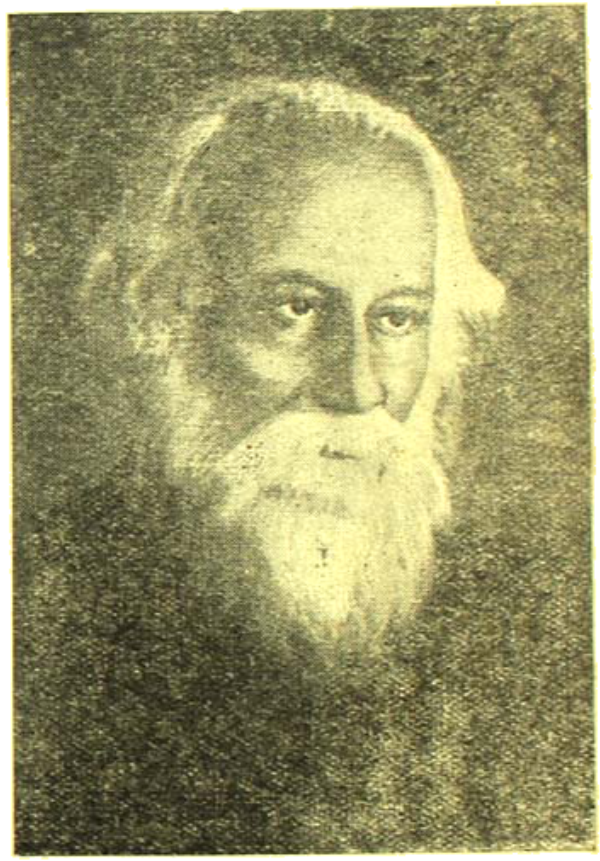

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রহিয়াছে। সে যুগে মহিলারা নিজেদের মুখশ্রীতে নানা চিত্র অঙ্কন দ্বারা মুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, ঘটের উপরেও নানাপ্রকারের চিত্র অঙ্কন করিতেন। মোগলযুগে হারেমের মহিলাদের মধ্যেও চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। সম্রাট দুহিতা জেব-উন্নিসা সুকণ্ঠী এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী উভয়রূপেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সুলতানদের চিত্রকুশলতার বিষয় জগদ্বিখ্যাত।

রাও, অমৃতকুমারিল এবং ইলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি।

বর্তমানে শিল্পবিদ্যালয়সমূহে ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানের গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে এবং শান্তি নিকেতনের কলাভবনে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের চিত্রাঙ্কন ও শিক্ষায়

আজকাল দেখা যাইতেছে। শিক্ষালয়ের বাহিরেও পুরনারীরা কেহ কেহ চিত্রকলার অনুশীলনে রত রহিয়াছেন।

আজকাল নানাস্থানে যে সকল শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মহিলা শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রাবলী ক্রমশঃই চিত্ররসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এবার কলিকাতার "একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্" অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায়চৌধুরাণী

বিশ জনেরও অধিক মহিলা-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের প্রদর্শিত চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০ হইবে। মহিলা শিল্পীরা ছয়টি পারিতোষিকেরও অধিকারিণী হইয়াছেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মহিলা অঙ্কিত সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য এবৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র—"বুদ্ধের গৃহত্যাগ"। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই প্রদর্শনী চিত্রখানি অনবদ্য হইয়াছে। এই মহিলাশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ছাত্রী। অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে অপূর্ব বর্ণ-সমাবেশ করিতে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর মত সুদক্ষ শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতি অনুগামীদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আর কেহ তাঁহার শিক্ষায় এরূপ ভাবে বর্ণ সুষমাকে যে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বিশিষ্ট শিল্পীরা সকলেই চিত্র খানির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। বুদ্ধের মুখ বিষাদ ও সন্ন্যাসের ভাব দুইয়ই একসঙ্গে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা গোপা দেবীর মুখ সুষমামণ্ডিত। তিনি শিশুপুত্র সহ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনের পরম বিপদক্ষণ যে সমাগত সে বিষয়ে তাঁহার কোনই ধারণা নাই। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রখানি শিল্পীর গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রদর্শনীতে এই মহিলাশিল্পীর অঙ্কিত আরও পাঁচখানি চিত্র—"গাঁয়ের বৈঠক", "অভিসারিকা", "কর্ণবধ", "রবীন্দ্রনাথ" এবং "শিল্পীর সুর" স্থান পাইয়াছিল। সেগুলিও চিত্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী বৈদ্যবনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং তথায় একমাত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহধর্মিণী। এই অভিজাত পরিবারের শিক্ষা ও সঙ্গীতানুরাগ ভারত-বিখ্যাত। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে অতি বিরল। বীরেন্দ্রবাবুও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই গুণী পরিবারের মধ্যে যে একজন সুদক্ষ মহিলা শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ইহা অতি আনন্দেরই বিষয় বলিতে হইবে। আশা করা যায়, ইঁহার আদর্শে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ঘটিবে।

অতি অল্প বয়স হইতেই চিত্রকলার প্রতি ইন্দিরা দেবীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। সর্বপ্রথমে ইউরোপীয় মহিলার নিকট ইনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমশঃ একাগ্র সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে,

উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর নিকট শিক্ষায় ইনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিত্র এবং প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা লাভ করেন। খ্যাতনামা প্রতিকৃতি-চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু ইহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। জলরঙ, ও তৈলরঙ, উভয় প্রকারের চিত্র অঙ্কনেই এই মহিলা-শিল্পী সমান অধিকার অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর সংখ্যা শতাধিক হইবে। শিল্পীর ভবনকে একটি স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সম্প্রতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জের ভবনে যাইয়া এই মহিলা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্যে শিল্পী স্বীয় পুত্র এবং শ্রীঅরবিন্দের যে দুইখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া তিনি "শ্রীঅরবিন্দ" চিত্রখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

রাসলীলা

মাতৃস্নেহধারায় স্নাত স্বীয় পুত্রের চিত্রখানিও অনবদ্য হইয়াছে। স্বীয় কন্যা ও 'একটি মহিলা' চিত্র দুইখানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহু চিত্রই নয়নানন্দকর। "পাহাড়ী ঝরণা" চিত্রখানি অতি মনোরম। স্থান নির্বাচনে শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। জলের ধার ও চারিদিকের বর্ণসুষমা অতি সুন্দর। "তুষার শিখর" চিত্রে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভ রশ্মি সমগ্র দৃশ্যকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রখানিতে শিল্পীর সাধনা সার্থক হইয়াছে। "পাগলা ঝোরা" চিত্রের বর্ণসমাবেশ অতি সুন্দর এবং শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক।

"বিধুর পল্লী" এবং "বৃদ্ধা দাসী" চিত্র দুখানি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। পল্লীর শান্ত সমাহিত ভাব দর্শককে মুগ্ধ করে। জপমালা হস্তে বৃদ্ধা দাসী ভগবান তথাগতের নাম জপ করিতেছেন। সুন্দর ভাবে অন্তরের ভক্তি সুপরিস্ফুট। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অতি সুন্দর।

পৌরাণিক চিত্রসমূহের মধ্যে "রাসলীলা", "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ", "কৈলাসে হরপার্বতী", "নবদ্বীপ কৈকেয়ী", "শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা", "মানভঞ্জন" প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুইখানির মত এত বড় আকারের জলরঙ চিত্র সাধারণতঃ দেখা যায় না। শিল্পীর সাহস ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। "রাস-লীলা"র আকার ৫´×৩´ ফুট হইবে। অপরটিও প্রায় অনুরূপ আকারের। "রাস-লীলা" চিত্রে যাবতীয় সৃষ্টি প্রবহ হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মুখে স্বর্গীয় সুষমা। গোপীদের ভাবে ও ভঙ্গীতে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। করুণ কৃষ্ণসহ সমগ্র চিত্রখানি অতি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত। "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ" চিত্রখানি দর্শকের অন্তরে করুণ ভাবের উদ্রেক করে। পুত্রের বিদায়-ব্যথা বহারাজ দশরথের আননে অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিল্পীর পুত্র

সঙ্কটে অটল শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভাব যথাযথ হইয়াছে। সীতা ও লক্ষ্মণ করুণ বদনে দণ্ডায়মান। চিত্রখানির সম্মুখে দর্শকের কিছুক্ষণ না দাঁড়িয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শিল্পীর শ্রম সার্থক হইয়াছে। অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রগুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে ও বর্ণসুষমায় সুন্দর।

মহিলা শিল্পীর চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকখানির স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতে তাঁহার একাগ্র শিল্প-সাধনার গৌরব অতি সামান্যও বৃদ্ধি পাইবে বিনা জানি না। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে যদি একজন বঙ্গমহিলারও চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি—(ইরাক)

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

আমরা অবশ্য পাকীস্থানী রাজনীতিতে মজিয়া যাইতে বসিয়াছি। ভারতবর্ষে ইস্‌লামীয় রাজনীতি যে ভাবেই হউক দানা বাঁধিতেছে, কিন্তু খাঁটি ইস্‌লামের দেশে কি হইতেছে? সম্ভবত ইরাকবাসীরা ঐস্‌লামিক রাজনীতিতে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাই তাহাদের রাজনীতিকে আর নূতন করিয়া চালাই করিতেছে। বেচারী অটোমান সাম্রাজ্যের কবল মুক্ত হইয়াও নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিলনা। অটোমান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল; সেই ভাঙ্গা টুকরা লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্য-প্রাচ্যের ইমারৎ গড়িয়া উঠিল। অর্থাৎ কড়ার কইমাছ যেন ছিটকাইয়া একেবারে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়িল। ইহার পরের অবস্থা ইরাকে কি হইল তাহা সম্পূর্ণ এখানে বলিবার অবকাশ না থাকিলেও কিছুটা আভাষ রাখিয়া যাওয়া ভাল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি ইরাককে একেবারে বাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। ইরাক প্রকৃতির নিকট হইতে তেলের তহবিলদারী পাইয়া অযথি বিপদে পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নব্যবিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের নয়া কূটনীতি ইরাকের সমাজ-জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। সামাজিক জীবনে এমন দেখা যায় যে লোকে তেল দিয়া সন্তুষ্টি আদায় করে, কিন্তু রাষ্ট্রিক জীবনে ইহার ঠিক উল্টো—তেল দিয়া লাভ নাই বরং অ-লাভ, বাণিজ্য কলহ সার হইয়া ওঠে। ইরাকের তাহাই হইল। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তেল যোগাইয়াও সাম্রাজ্যবাদীর মনের নাগাল পায় নাই। মসুল, কিরকুক ও খানাকিন এই তিনটি স্থান জুড়িয়া ইরাকের তেল সম্পদ রহিয়াছে। থাকিলে কি হইবে তাহা ইরাকের ভোগে লাগিবার নহে। তাহা ভোগ করিতেছে Iraq Petroleum Company.

এইবার আমরা কেরো খুঁড়িতে গিয়া একেবারে সাপের গর্তে হাত দিয়াছি। Iraq Petroleum Company'র নিজের মনে এতটা উদ্বর্তনীতি হয় নাই। ইরাকের তেল শোষণ করিতে আসিয়া অন্যকেও তাহার অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বছরের জন্য Iraq Petroleum Company ইরাকের তৈল উত্তোলন, নিষ্কাশন ও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা পায়। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ যাহা 'Transferred Territories' নামে পরিচিত তাহাই শুধু Iraq Petroleum Company'র তৈল চুক্তি বর্হিভূত রহিল।

Iraq Petroleum Company অনেকটা বৈদেশিক কলার মত দেশের ওপরে স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। চারটি গ্রুপ এই কোম্পানির শুরুতরূপ। এর দুটি গ্রুপ (গ্রুপ) খুব ভোরালো অর্থাৎ ব্রিটিশ স্বিত স্বার্থ। আর দুটি গ্রুপ (গ্রুপ) অ-ব্রিটিশ স্বিত স্বার্থ। ব্রিটিশ স্বিত স্বার্থের অংশ হইল (১) The Anglo Iran Oil Company (২) The Royal Dutch Shell আর অপর যাহারা তাহারা হইল—'সাতটি আমেরিকান ও সাতষট্টি ফরাসী কোম্পানি'। এর মধ্যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশ ব্রিটেনের হাতে, পঁচিশ ভাগ আমেরিকা ও ফরাসীর হাতে—ইহার অর্থ এই যে কোম্পানির স্রষ্টা-কর্তা-বিধাতা ব্রিটিশই রহিয়া গেল। ইহার সঙ্গে যোগ হইল—অনেকটা বণিকাকাশ সংযোগের মত—সাম্রাজ্যরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই সব মিলিয়া ব্রিটিশের মধ্যপ্রাচ্য কূটনীতি ও রাজনীতি এক বিশেষ মূল্যের ধারণ করিয়াছে এবং তাহা বহুল পরিমাণে ইরাকের রাজনৈতিক জীবন-যাত্রাকে রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্তমান ইরাকের রাজনীতি এই রাহুসংযোগ এড়াইবারই প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এড়ানো কি এতই সহজ? সহজ নয় বলিয়াই ইরাকে আজ বিভিন্ন শক্তির খেলা চলিতেছে। নূরীসৈয়দ ও সালেহজাবর যে রাজনৈতিক ব্লক গঠন করিয়াছেন তাহাই প্রতিপক্ষেরা অভিযোগ করিতেছে যে, ব্রিটিশের তাঁবেদার, ব্রিটিশ স্বার্থের রাজনৈতিক রূপ। পক্ষান্তরে এই ব্লকবিরোধী দল আখ্যা পাইতেছেন কম্যুনিষ্ট বলিয়া—অর্থাৎ ইহার পিছনে রুশ শক্তির প্রভাব রহিয়াছে। ইহারা সাধারণত National Liberation Party বলিয়া পরিচিত। আর একটি দল রহিয়াছে তাহারা নিজেদের Liberal বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন ওকিল্ গুরেবি।

এই Liberal দলের আসল সমর্থক হইল ব্যবসাদারগোষ্ঠী। ইরাকের খেজুর ও বালির ব্যবসার উপর কোন একটি ব্রিটিশ বণিক প্রতিষ্ঠানের এক-চেটিয়া অধিকার পাইবার পর হইতে ইহাদের টনক নড়িয়াছে। এই দল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এবং তা শুধু নয়, মার্কিণদের সঙ্গে ব্যবসায় করিবার জন্য ইহারা উৎসুক। ব্যবসা করিতে গিয়া শুধু মাত্র একটি খরিদ্দার থাকিবে ও শুধু মাত্র একজনার নিকট হইতে সব কলকব্জা কিনিতে হইবে—এমন বশ্যতা ইহারা দিতে রাজী নহেন। অতএব বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে মার্কিণদেরও শুভাগমন শুধায় ঘটিয়াছে। বিশ্ব বাণিজ্যের কারবারী ব্রিটিশ ও মার্কিণ শুধায় জুটিয়াছে ও বিশ্ব রাজনীতির কারবারী ব্রিটিশ, মার্কিণ ও রাশিয়া শুধায় জলদস্যু প্রভুত্ব হড়াইবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। এই রাজনীতির ঘোরায় পড়িয়া বেচারী ইরাক আহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে।

গত অক্টোবর মাসে যে মন্ত্রীসভা নূরীসৈয়দ গঠন করেন তাতে Liberal এবং National Democratic Party যোগদান করে। তবে এই যোগদান-কার্যটি একেবারেই সর্তাধীন। কেননা ইতিপূর্বে উমারী মন্ত্রিসভা কোন রাজনৈতিক দল—যাহারা মন্ত্রিসভার বিরোধী—তাহাদের কোন স্থায়ীম মন্ত্রণাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেয় নাই। তার ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ বিভিন্ন দলের মধ্যে চলিতে থাকে। নূরী মন্ত্রিসভা এই জাতীয় নীতির পরিপোষক বলিয়াই Liberal দল ও National Democratic দল ইহার সহযোগিতা করে। National

Democratic Party'র বর্তমান নেতৃত্ব কায়িল চাপারমি ও বঙ্গদ হামিদ-এর হাতে শক্তিশালী হইয়া পড়িয়া উঠিয়াছে। দলের প্রচার-কার্য্য হইতে মনে হইতেছে যে ইরাক জাতির রাজনীতির ধর্ম্ম কি তাহার সন্ধান এই দলটি পাইয়াছে। ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা, সবার সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন বৈদেশিক নীতি, আরব সংহতি : জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার : শিল্প প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের অধিকার : ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জমি বিতরণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তবে National Democratic দলকে নূরী ও সালে জাফর পরিচালিত চক্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিতেছে; যে সকল প্রগতিশীল দল আজ ইরাকের কাজ করিতেছে তাহারা সবাই একযোগে করিতেছে যে, ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির নিপাত হউক। কেননা এই চুক্তির ধারা অনুসারে যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সুযোগ-সুবিধা ব্রিটেনরা ভোগ করিতেছে তাহা আজ ইরাকী জনসাধারণের অসহ্য দুঃখের কারণ হইয়াছে। এই দুঃখ নিবারণকল্পে কোন আন্দোলন চালাইবার পক্ষে নূরী-জাফর পরিচালিত রাজনৈতিক চক্রই বড় বাধা। তাহারা ব্রিটিশ স্বিতস্বার্থের পাহারাদার এবং এদের প্রভাব ইরাকের সতরটি হিসার শতকরা আশী ভাগ সামন্ত নেতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রগতিশীল দলগুলি বাগদাদ, বসুল, কিরকুক ও বসরা-র নাগরিক অধিবাসীদের উপর ইহাদের প্রভাববিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আসল চাবিকাঠি এখনও সামন্ত নেতা শেখদের হাতে। ইরাকের সমাজ জীবনের যে আলোড়ন তাহা মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে-ই শুরু হইয়াছে। এই সামন্ত শেখেরা আজও নূরী-জাফর পরিচালিত রাজনৈতিক চক্রের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই চক্রের মূলনীতি স্বল্প কীর্তির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এবং এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অনেকখানি ইন্ধন যোগাইতেছে। কেহ কেহ এইরূপ মত পোষণ করেন যে National Democratic, National Union, ও People's Party এদের কেউই সত্যিকারের প্রগতিশীল দল নয়, এরা সবাই সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকামী মাত্র। কোন নব্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী ইহারা করেন না। অথচ একই আদর্শের ওপর ভিত্তি করিয়া যে তিনটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ হইল নেতৃত্বের লড়াই; তবে একথা সত্য যে নূরী-জাফর পরিচালিত চক্র হইতে ইহারা অনেকখানি বামপন্থী বা Liberal দল হইতেও ইহারা বামপন্থী; কিন্তু ব্রিটিশ প্রভাব আজ নূরী-জাফর পরিচালিত চক্রের মারফৎ এমনভাবে ইরাকের সমাজের ওপর চাপিয়া বসিয়াছে যে তাহাকে সরাইতে গেলে সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। বস্তুত ইরাকে আজ তাহাই ঘটিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাটাইতেছে।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতে ১৯০ বৎসরব্যাপী বৃটিশ শাসনের অবসান হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি ইংরাজ বণিকদল বাণিজ্য ব্যাপদেশে আসিয়া ভারতের সহিত সর্বপ্রথম যোগ স্থাপন করে। এই সময়ে ভারতের ধনরত্ন ও শিল্পসম্ভারের সন্ধান পাইয়া ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহারা স্থানে স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসা করিতে থাকে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলে, কূটনীতিতে চতুর ইংরাজই সকলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

ইংরাজ কুঠী নির্ম্মাণ হইতে লস্পত্তি ক্রয় এবং লস্পত্তি ক্রয় করিতে করিতে দেশজয়ও সুরু করিয়া দেয়। পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত করিয়া শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। তারপর ইংরাজ খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যগুলি জয় করিতে করিতে প্রায় সমগ্র ভারতের অধিপতি হয় এবং শাসনের নামে শোষণ করিতে করিতে ভারতকে যেমন একদিকে দারিদ্র্যের শেষ পর্য্যায়ে নামাইল, অপর দিকে ঠিক তেমনি নিজের দেশ ইংলণ্ডকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে তুলিয়া দিল।

ইংরাজের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। তখন হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের দ্বারা বৃটিশের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করা। পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র কেশরী তিলক তাঁহার "কেশরী" পত্রিকায় নিভীকভাবে স্বাধীনতা প্রচারের ফলে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের কারণে দেশে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ তথা প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু এই সময় হইতে কংগ্রেসে "গরম" ও "নরম" দল হিসাবে দুইটি দল হইল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত দল দুইটি পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ অর্থ ও লোকবল দিয়া বৃটিশকে সাহায্য করে, কিন্তু যুদ্ধান্তে ইহার পরিবর্তে কোনও সুবিধা না পাইয়া ভারতের

তাহার পর যখন রাউলাট আইন আসিল, তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া দেখা দিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে জাতীয় ভাবের যেন এক প্রবল বন্যা বহিয়া গেল। তখন হইতে মহাত্মা গান্ধী ধীরে ধীরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশকে এমন একস্থানে আগাইয়া আনিলেন যাহার ফলে বৃটিশ ডেবনীতির ফলে নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট মুসলিমলীগসহ প্রতিক্রিয়াশীল দল বাধা সত্ত্বেও ভারতে সাম্রাজ্য রক্ষার সম্মিলন হইয়া পড়িল। বৃটিশ জেল, ফাঁসি ও গুলির ব্যবস্থা করিয়াও ভারতের মুক্তিপাগল অহিংস সত্যাগ্রহীদের দমন করিতে পারিল না। ইঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শাসক ও শোষক বৃটিশের নিকটে কেবলই স্বাধীনতার দাবী জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস চরমপত্র হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে "ভারত ছাড়" দাবী জানাইল। কঠোর ও নির্মম হস্তে বৃটিশ ভারতবাসীকে এবারেও দমন করিতে পারিলেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে তাহাকে ভারত ছাড়িতেই হইবে।

এই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও ভারতের বাহিরে একটি অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি শক্তিশালী সেনাদল গঠন করিয়া ভারতের মুক্তির জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে আসিয়া বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপরে আঘাত হানিলেন।

বৃটিশের তখন উভয় সঙ্কট অবস্থা। একদিকে সে বিশ্বযুদ্ধের সহিত জড়িত, অপর দিকে ভারতের ভিতরে বাহিরে ভারতীয়দের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইল। যাহা হউক ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিলে ফ্রান্সিস ও আমেরিকার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও যুদ্ধে জয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশের হাতে বন্দী হইল। কিন্তু এই বন্দী আজাদ হিন্দ্ সেনাদের মুক্তি দাবী করিয়া সমগ্র ভারতে আবার এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। এই সময়ে বোম্বাইএ ভারতীয় নৌ-সেনাদলও বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ভারতে ইংরাজ শাসনের ইতিহাসে এত বড় সামরিক-বিদ্রোহ ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। ভারতের জাতীয় নেতারাও তখন কারান্তরাল হইতে জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশে একটা তুমুল আলোড়ন। রণক্লান্ত ও ক্ষীয়মান বৃটিশ ইহা দেখিয়া যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে নিজেই ভারতের সহিত একটা আপোষ করিবার জন্য আগাইয়া আসিল।

এই সময়ে গ্রেট বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং শ্রমিকদল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই শ্রমিক মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিলাতে প্রথম ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রীসভা নিজেই ভারতে এক মন্ত্রীমিশন প্রেরণ করিবেন। ভারতকে দ্রুত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করাই হইবে তাঁহাদের কাজ।

বৃটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আসিবার কয়েকদিন পূর্বে ১৫ই মার্চ তারিখে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী পুনরায় জানাইলেন—ভারতবর্ষকে নিজই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করিবার জন্যই আমার সহকর্মীগণ ভারতে যাইতেছেন। বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে ভারতীয়গণই তাহা স্থির করিবেন। ভারতবাসী সত্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ইহাও আমরা মনে করি যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার রহিয়াছে এবং যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

ইহার পর ২৩শে মার্চ মন্ত্রীমিশন আসিলেন, কংগ্রেস, লীগ ও শিখদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক বসিল। কিন্তু লীগের পাকিস্থানী জিদ্ লইয়া শেষ পর্যন্ত সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে ১৬ই মে মন্ত্রীমিশন লীগের দাবীমতো পাকিস্থান অস্বীকার করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটি নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন।

কংগ্রেস অনেক বিবেচনার পর মিশন পরিকল্পনায় গণ-পরিষদ ও অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন উভয় প্রস্তাবই মানিয়া লয়। কিন্তু লীগ প্রথমে উল্লাসের সহিত মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও শেষে উহা বর্জন করে এবং ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম লইয়া সমস্ত ভারত ব্যাপিয়াই লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ জনসাধারণ অকাতরে প্রাণ দিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও কিছু ফল হইল না দেখিয়া লীগ কংগ্রেসকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া বড়লাটের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিল, কিন্তু গণ-পরিষদে যোগদান করিল না। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিল লীগকে গণ-পরিষদেও যোগদান করিতে হইবে নতুবা তাহাকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিতেই হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের দাবীতে লীগ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে নিয়োগ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিবেই। ভারতের নেতৃবর্গ বৃটিশের ভারত ত্যাগের একটা নির্দিষ্ট সময় জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিলেন।

বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া পরে জুন তারিখে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে ঘোষণা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুনের স্থলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ত্যাগের কথা বলিলেও বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবসহ ভারত-বিভাগের প্রস্তাব করিলেন। বৃটিশ ভারতত্যাগকালে ভারতশাসনে তাহাদের ডেবনীতির সহায়ক মুসলিম লীগকে তাহাদের দাবী হইতে বঞ্চিত করিল না। লীগের পাকিস্থান বা ভারত বিভাগের অসঙ্গত দাবীকেও শেষ পর্যন্ত তাহারা মানিয়া লইল। বড়লাট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্টের সব সদস্য পর্যন্ত

খণ্ডিত ভারতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেও অখণ্ড-ভারতের জন্য তেমন সাহসের সহিত কাজ করিতে পারিলেন না। লীগ বিনা যুদ্ধে, বিনা প্রাণবিনিময়ে কংগ্রেসের সঙ্গ স্বাধীনতা হইতে পাকিস্থানী ভিন্ন করিয়া "খুস্ত ও বিকলাঙ্গ" হইলেও পাকিস্থান আদায় করিয়া লইল। অবশ্য কংগ্রেস তাহার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের গৃহীত প্রস্তাব—দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশকে জোর করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে না রাখার সিদ্ধান্ত, অনুযায়ীই শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ভারতেই সম্মত হয়।

দেশের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আজ বিশেষ দুঃখের কারণ থাকিলেও, ইংরাজ যে ভারত ত্যাগ করিল এইটাই বড় কথা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে সমগ্র ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড পড়িয়াছে। এই ভূখণ্ড পৃথিবীর বহুশক্তিশালী দেশের আয়তনের তুলনায় অনেক বৃহৎ। এই অংশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদও কোন স্বাধীন দেশের তুলনায় মোটেই নগণ্য নহে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার কৃষি ও শিল্পপ্রসারের সকল রকম সম্ভাবনাই রহিয়াছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারত, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইল এবং বৃটিশ কমনওয়েল্থের সদস্য বলিয়া গণ্য হইল। এই ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মর্যাদা সম্পর্কে ১৪ই জুলাই তারিখে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী বলেন—"ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ষ্ট্যাটুটে (১৯৩১) ডোমিনিয়ন শব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় বলিয়া বলা হইয়াছে।" অতএব বৃটিশ কমনওয়েল্থের শুধু সদস্য পদের মোহ ত্যাগ করিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী দেরী হইবে না বলিয়া মনে হয়।

ভারত আজ স্বাধীন। ভারতের এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল মনীষী বৃটিশের পশু অত্যাচার ও শাস্তিকে হাসিমুখে বরণ করিয়া জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, যে সকল নেতা বৃটিশের হাতে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন এবং সর্বোপরি আমাদের যে মহান্ নেতা মহাত্মা-গান্ধী, যাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিল, তাঁহারা চিরবন্দ্য; বর্তমান ও ভাবীযুগের দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহারা চিরঅমর হইয়া থাকিবেন।

শিখ রমণী—সদাকৌর

শ্রীমতী অমিয়া বসু এম-এ, বি-টি

বর্তমানকালে আমাদের দেশে নারীজাগরণের তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। নারী পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার দাবী করে। সমাজে গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রে, পৌরকার্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কি সমরাঙ্গনে ভারতীয় নারী তাহার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। ভারতীয় নারী আজ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধি, দৌত্য কার্যেও নারীর আসন উচ্চ।

ভারতের অতীত কাহিনীতে নারীর উচ্চ স্থান, বীরত্ব, বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। রাজপুত বীরাঙ্গনাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, দেশ ও ধর্মের জন্য আত্ম-বলিদান আজও আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। রাণী দুর্গাবতী, চন্দ্রাবতী, যোধবাই প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়। মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবন গঠনের প্রধান উপাদান ছিল তাঁহার পুণ্যবতী মাতা জিজাবাঈর ধর্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রচর্চা। মারাঠা ইতিহাসের অহল্যাবাঈ, তারাবাঈ এবং সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা ঝাঁসির রাণীর স্মৃতি ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শুধু রাজপুত ও মারাঠা জাতির ইতিহাসে ভারতীয় নারীর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নহে, শিখ জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে অনেক বিদুষী ও মহীয়সী নারীর পরিচয় পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে মহারাজ রণজিৎসিংহের পত্নীমাতা সদাকৌরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুরু নানক ছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল—"ওয়াহে ঈশ্বর, ঈশ্বরই গুরু।" তাঁহার তিরোধানের পর ক্রমান্বয়ে শিখ সম্প্রদায় এই মূলমন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল। দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দসিংহ শিখ-জাতিকে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন। কিন্তু শিখদের রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। বান্দার মৃত্যুর পর এমন কেহ শক্তিশালী ছিল না যে—সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। শিখজাতি বারটী মিসল্ বা দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের নায়ক একটী রাজ্য শাসন করিতেন। মিসলদের মধ্যে ভাঙ্গি মিসল, কানিহা মিসল, রামগরিয়া মিসল, সুকারচকিয়া মিসল উল্লেখযোগ্য। এই মিসল-গুলির ভিতর পরস্পরে আত্মকলহ চলিতেছিল। অবশেষে সুকারচকিয়া মিসলের নায়ক মহাসিংহের পুত্র রণজিৎসিংহ আপনার শক্তি বলে অন্যান্য মিসলের অধীন রাজ্যগুলি অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অসামান্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একটী বিশাল স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপন করেন।

রণজিৎসিংহের মাতা ছিলেন ঝিন্ডরাজা গজপৎ সিংহের কন্যা। কানিহা মিসলের অধিপতি জয়সিংহের পুত্র গুরবক্সসিংহের স্ত্রী ছিলেন সদাকৌর। এই সময় সুকারচকিয়া ও কানিহা মিসলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। বাতালার যুদ্ধে গুরবক্সসিংহ নিহত হন। এই বাতালার যুদ্ধ হইতেই কানিহা মিসলের পতন আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কানিহা মিসলের অধিপতি জয়সিংহ তাঁহার দুই পুত্র তারাসিংহ

ও জয়বলসিংকে লইয়া শাহ্‌দেরাতে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ সদাকৌর সুকৌশলে সকলে সামক স্থানে নিরাপদে পলায়ন করেন। অতঃপর কাটোচের সংসারচন্দ কানিহা মিসলের অন্তর্গত কাঙ্‌রা আক্রমণ করেন। তিন বৎসর যাবৎ সংসারচন্দের সহিত কানিহা মিসলের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই সময় বিচক্ষণা সদাকৌর অনন্যোপায় হইয়া সুকারচকিয়া মিসলের সাহায্য পাইবার আশাতে মহাসিংহের নাবালক পুত্র রণজিৎসিংহের সহিত তাঁহার কন্যা মহাতাবকৌরের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই বিবাহ প্রস্তাবের আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল যে সুকারচকিয়া দলের সাহায্যে লইয়া মহাসিংহের মৃত্যুর পর সদাকৌর কানিহা দলের নায়িকা হইবেন। মহাসিংহের মৃত্যুর পর ১৭৯৮ খৃঃ সদাকৌরের কন্যা মহাতাব কৌরের সহিত রণজিৎসিংহের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। পিতার মৃত্যুর সময় রণজিৎসিংহ মাত্র বৎসরের বালক ছিলেন। শাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ, বলে তাঁহার মাতা এবং পিতার মন্ত্রী লক্ষ্মীনারায়ণ নাবালকের নামে শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু সুদাকৌর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও কূটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া তদানীন্তন সমাজে পরিচিতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই পরামর্শানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত। এস্থলে রণজিৎসিংহের রাজ্যশাসনের প্রথমাবস্থার সহিত সম্রাট আকবরের রাজ্যশাসনের প্রথমাবস্থা তুলনা করা যাইতে পারে। শাসনের ভার তাঁহার গৃহশিক্ষক বৈরাম খাঁ ও ধাত্রীমাতা মহামাঙ্গার উপর ন্যস্ত ছিল। আকবর সাবালক হইয়া বহুকষ্টে তাঁহাদের হাত হইতে রাজকার্য্যভার নিজে গ্রহণ করিলেন। রণজিৎসিংহও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর তাঁহার মাতা, লক্ষ্মণ রায় ও শ্বশ্রূমাতা সদাকৌরের নিকট হইতে শাসনভার নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত রাজকার্য্যশাসন তাঁহার শ্বশ্রূমাতার পরামর্শানুসারে চলিত। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ার ফলে সদাকৌর তাঁহার কানিহা মিসলের রাজ্যসহ হইতে বঞ্চিতা হইয়া জামাতা কর্ত্তৃক বন্দিনী হইলেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সদাকৌরই রণজিৎসিংহের উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবার একমাত্র সোপান ছিলেন।

রণজিৎসিংহের লাহোর অধিকার তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্ত্তি। লাহোর অভিযানে তিনি শ্বশ্রূমাতার পরামর্শ ও বুদ্ধিকৌশলের জন্য কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তদানীন্তন লাহোরের শাসক চেৎসিংহ প্রভৃতি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। লাহোরের জনসাধারণ শাসকগণের স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হইয়া রণজিৎসিংহকে লাহোর অধিকার করিয়া অত্যাচারী শাসকগণের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। কানিহা মিসলের নায়িকা সদাকৌরকেও লাহোর-বাসীগণ এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করে। রণজিৎসিংহ তখন রামনগরে ছিলেন। এই আহ্বান পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। কারণ তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাব-সিংহাসন স্থাপন করা। অতঃপর তিনি বাঠালার তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাহোর অভিযানের বিষয় পরামর্শ করেন। উভয়েই একমত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হন। রণজিৎসিংহও সদাকৌর তাঁহাদের নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত লাহোর অভিযানের জন্য সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর এই মিলিত সৈন্যবাহিনী রণজিৎসিংহ ও সদাকৌরের নেতৃত্বে অমৃতসর অভিমুখে অগ্রসর হইল। অমৃতসর হইতে রণজিৎসিংহ একাই লাহোরে গমন করিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে লাহোর নগরীমধ্যে প্রবেশ করেন। একমাত্র চেৎসিংহ রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া দুর্গমধ্য হইতে রণজিৎসিংহকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রণজিৎসিংহ দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময় সদাকৌর রণজিৎ-সিংহকে দুর্গ অবরোধ হইতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। সদাকৌর বলিয়া পাঠাইলেন যে চেৎসিংহ দুর্গমধ্যে খাদ্যাভাব ও বহির্জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অল্পকাল মধ্যে নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করিবেন। অতএব দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য রণজিৎসিংহের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। রণজিৎসিংহ দুর্গ অবরোধ করিলেন না। সদাকৌরের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইল। অচিরেই চেৎসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন। লাহোর রণজিৎসিংহের করতলগত হইল। ১৮১৪ খৃঃ রণজিৎসিংহের প্রস্তাবিত কাশ্মীর অভিযানের সময় মহারাজা লাহোরে মুখমচাঁদ এবং সদাকৌরের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কিন্তু মুখমচাঁদের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তখন কাশ্মীর অভিযান স্থগিত রহিল। তাহি মিসলের কেন্দ্র অমৃতসর জয় করিবার জন্য সদাকৌর রণজিতের সঙ্গে অমৃতসর যাত্রা করেন। অচিরেই মহারাজা অমৃতসর দখল করিলেন।

ইতিমধ্যে সদাকৌরের কন্যা রণজিৎসিংহের অন্যতমা মহিষী মহাতাবকৌর অপুত্রক থাকাতে সদাকৌরের সংশয় হইল যে জামাতার উপর তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। অতএব তিনি চক্রান্ত করিয়া প্রচার করিলেন যে তাঁহার কন্যা গর্ভবতী। রণজিৎসিংহ লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাতাব কৌরের দুইটী যমজ সন্তান জন্মিয়াছে এই সংবাদ সদাকৌর রণজিৎসিংহের নিকট প্রেরণ করেন। চতুর রণজিৎসিংহ জানিতেন যে এই সন্তান মহাতাবকৌরের গর্ভজাত নহে। সদাকৌর শের সিংহ ও তারাসিংহ নামক দুটী শিশুপুত্রকে ক্রয় করিয়া নিজের কন্যার গর্ভজ সন্তান বলিয়া প্রচার করিলেন। রণজিৎসিংহও এই শিশু দুইটীকে ঔরসজাত পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পর রণজিৎসিংহের সঙ্গে সদাকৌরের মনোমালিন্যের সূচনা হয়। রণজিৎসিংহ কানিহা মিসলের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরাজ যাইয়া সর্দ্দারগণের নিকট হইতে নজর আদায় করিতে লাগিলেন। জামাতার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সদাকৌর বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। অতঃপর মহারাজা সদাকৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাঠালাতে গমন করেন। তথায় রণজিৎসিংহ মৃগয়া করিবার অছিলাতে মাসাধিককাল অবস্থান করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঠালা এবং সদাকৌরের অন্যান্য সম্পত্তির উপর তাঁহার লোলুপদৃষ্টি ছিল এবং কি করিয়া তাঁহার সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবেন সেই বিষয়ে ফন্দি আঁটিতেছিলেন। এদিকে শের সিংহ বয়োপ্রাপ্তির

সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের পরমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পিতামাতার নিকট একটী পৃথক্ জায়গীর দাবী করিতেছিলেন এবং পিতা রণজিৎসিংহও পুত্রকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন। রণজিৎসিংহের গূঢ় মনোভাব ছিল যে সদাকৌর তাঁহাকে কানিহা মিসলের রাজ্যখণ্ড হইতে সেরসিংহকে জায়গীর প্রদান করিলে অদূর ভবিষ্যতে তিনি সমস্ত কানিহা মিসলের সম্পত্তি গ্রাস করিতে পারিবেন। মহারাজা কানিহা মিসলের সম্পত্তি হইতে সেরসিংহকে জায়গীর প্রদান করিবার জন্য সদাকৌরকে অনুরোধ করেন। সদাকৌর জামাতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলিয়া পাঠান যে সেরসিংহকে জায়গীর প্রদান করা রণজিৎসিংহের কর্ত্তব্য। রণজিৎসিংহের চতুরতায় সদাকৌর ও মহাতবকৌরের সহিত সেরসিংহের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। রণজিৎসিংহের এই কূট চক্রান্তের সহায়ক ছিল সদাকৌরের এক পুরাতন ভৃত্য খানি খানসামা। এই খানসামার সাহায্যে রণজিৎসিংহ সদাকৌরের সহিত তাঁহার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য বৈশাখ সিংহের সহিতও মনোমালিন্য উপস্থিত করেন। অতঃপর এই মনোমালিন্যের সুযোগ লইয়া রণজিৎসিংহ ১৮২০ সনে সদাকৌরকে যুবরাজদের জন্য পৃথক্ জায়গীর দিবার জন্য বড়ো রকম দাবী করেন। তেজস্বিনী সদাকৌর ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই বলিয়া শাসান যে, তিনি শত্রুপক্ষ হইয়া ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন এবং তাঁহার ওয়াজনি সম্পত্তি ইংরাজদের উপর ন্যস্ত করিবেন। রণজিৎসিংহ এই উত্তর পাইয়া ভীত হইলেন। এক বিনীত পত্রে শত্রুমাতার মার্জ্জনা এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। জামাতার এই পত্র পাইয়া শত্রুমাতার হৃদয় বিগলিত হইল। সাহাবারাতে সদাকৌর ও রণজিৎসিংহের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই সদাকৌরের কাল হইল। বার্ধক্য ও চতুর রণজিৎসিংহ শত্রুমাতাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া বলপূর্ব্বক রাজকুমারদ্বয়ের জন্য জায়গীরদান পত্র লিখিতে বাধ্য করিলেন। মহারাজা অতঃপর সদাকৌরকে দুর্গাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে সদাকৌর গুরু অর্জ্জুনের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিবার ভাণ করিয়া দুর্গের পশ্চিমদ্বার দিয়া একটী বন্ধ গাড়ীতে সন্তর্পণে অতি দ্রুতবেগে তাঁহার রাজধানীর দিকে পলায়ন করিলেন। রণজিৎসিংহ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ অন্যতম যুবরাজ খড়্গসিংহকে সদাকৌরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মুখারিস্থানের পথে সদাকৌর গ্রেপ্তার হইলেন। রাত্রপ্রাপ্তে সদাকৌর বন্দিনী হইলেন। এদিকে সিংহ দেওয়ানচন্দকে সদাকৌরের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যাহাহোক প্রাপ্ত করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। সদাকৌরের রক্ষিত মূল্যবান রত্নাদি মুখারিস্থানের দুর্গে রক্ষিত ছিল। সদাকৌরের একজন ক্রীতদাসী কর্ত্তৃক বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দেওয়ানচন্দ দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দেওয়ান চন্দের সামরিক শক্তি ব্যর্থ হইল। উল্লিখিত রত্নরাজি হস্তগত করিবার জন্য দেওয়ান চন্দ এক নব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মুখারিস্থানের দুর্গের রক্ষাধ্যক্ষকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সদাকৌরকে তাঁহার এক স্বাক্ষরিত পত্র লিখার প্রস্তাব করেন এবং সদাকৌর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে ভবিষ্যতে যে, তাঁহাকে অনাহারে মরিতে হইবে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন। সদাকৌরকে খাদ্যসামগ্রীর জন্য দৈনিক দশ টাকা ভাতা দেওয়া হইত। সদাকৌর এক্ষণে এই প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে অনন্যোপায় হইয়া প্রস্তাবিত অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দেওয়ানচন্দ স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া সহজেই মুখারিস্থান দুর্গ অধিকার করিলেন। (১) মুখারিস্থানের দুর্গপতনের সঙ্গে সঙ্গেই কানিহা মিসলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। অতঃপর সৈন্যপরিবেষ্টিতা সদাকৌরকে লাহোর দুর্গাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সদাকৌর বন্দিনী অবস্থায় রহিলেন।

ত্রিশ বছর পাঞ্জাব রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া পরিশেষে সদাকৌর কারারুদ্ধের অন্তরালে জীবনলীলা শেষ করিলেন। ইহাই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। সদাকৌর ও রণজিৎসিংহের প্রকৃতিগত অনেক সামঞ্জস্য ছিল। সদাকৌর বুদ্ধিমতী কূটরাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী ও প্রভুত্বপ্রিয় রমণী ছিলেন। রণজিৎসিংহও তাঁহারই মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রভুত্বপ্রিয় ছিলেন। একথা সত্য উভয়েই চাহিয়াছিলেন সাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতে, একে অন্যকে তাঁহার অভিষ্ট কার্য্যের অন্তরায় মনে করিতেন। সুতরাং উভয় মনের অন্তঃস্থলে একটী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ করিতেন। এমতাবস্থায় রণজিৎসিংহ ও সদাকৌরের একই রাজ্যের মধ্যে নির্ব্বিবাদে বাস করা সম্ভবপর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রণজিৎসিংহ তাঁহার শাসন কালের প্রারম্ভে সদাকৌরের সহযোগ ও পরামর্শানুসারে রাজ্য বিস্তারে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সুবিস্তৃত হইলে সিংহাসনে নিরাপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রণজিৎসিংহ শত্রুমাতার অতীত কার্য্যাবলী বিস্মৃত হইলেন। মহারাজ রাজকার্য্যে স্বার্থপর ও অর্থলোভী ছিলেন। সদাকৌরের রক্ষিত প্রচুর ধনরত্ন ও বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড হস্তগত করাই রণজিৎসিংহের কাম্য ছিল। এই অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কি কৃতজ্ঞতা সমস্তই বিসর্জ্জন দিলেন। সদাকৌরের প্রতি মহারাজার নিষ্ঠুর আচরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কথিত আছে সদাকৌর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য জামাতার বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত ও ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ঘটনার প্রকৃতরূপ উদ্ঘাটন না করিয়া, সত্যানুসন্ধান না করিয়া জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সদাকৌরকে দোষী সাব্যস্ত করা অবিচার, নীতি ও আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে। যুবরাজদ্বয়ের জন্য রণজিৎসিংহ সদাকৌরকে সম্পত্তি দানের দলিল সম্পাদন করিতে বলপ্রয়োগ প্রস্তাব করিলে সদাকৌরের আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করা দুর্নীতি বা বে-আইনী হয় নাই। রণজিৎসিংহ সদাকৌরকে তাঁহার অনিষ্ট সাধনের অন্তরায় মনে করিলে তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে সসম্মানে অপসারিত করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রতি এতাদৃশ লাঞ্ছনা ও প্রতারণা কোনমতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। সদাকৌরের জীবন কাহিনী বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। শিখজাতির মধ্যে তাঁহার মত রাজনীতিজ্ঞ, তেজস্বিনী রমণীর দৃষ্টান্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (২)

(১) সদাকৌরের ধন রত্নাদি যাহাহোক প্রাপ্ত হইল, তন্মধ্যে ৬০,০০০ হাজার টাকার একটি মূল্যবান নেকলেস্ ছিল।

(২) এই প্রবন্ধের অধিকাংশ তথ্য নিম্নলিখিত পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে :—

Cunnighw's—"History of the Sike"
L. Griffin's—"Punjab Rajas."
Syad Muhammad Latiff's—"History of the Punjab"
Dr. N. Singha's—Ranjit Singh.

বনফুল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে আবার। তারপর হেসে বললে—"তখন আর এখনে কিন্তু তফাত আছে অনেক। এখন আমি তুমি এবং ব্রজেশ্বরবাবু ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই"

"কেন অনীতার ?"

"হ্যাঁ অনীতারও অবশ্য আছে"

"দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। আপনি যুক্তির অবতারণা করে' স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি যদি শুধু সেমিজ পরে হ্যারিসন রোডদিয়ে হেঁটে যাই কার কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের মুখ বন্ধ হবে না তাতে"

"সত্যি যদি সাহস করে যাও, আমার মনে হয় না এ নিয়ে খুব একটা আন্দোলন করবে লোকে—"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে বললে—"আপনার শোবার কষ্ট হল তার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। আর ওই মেজেতে শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি ? ওর চেয়ে গোয়াল ঘরে শোয়া ঢের ভাল।"

সুশোভন ঘরের চার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"আমার বিশ্বাস এখানে শুলে একটু ঘুম হত। একটা 'রাগ' আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোনের দিকটায়"

"'রাগ' আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো নিয়ে আপনি গোয়ালেই যান, সেখানেও বেশ ঘুমুতে পারবেন"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু শব্দটব্দ শুনে গোঁসাইজি যদি উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে মুনুর কাছে দেখে ভাববেন কি"

"কি আবার ভাববেন"

"একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন যে গোঁসাইজির চক্ষে আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেলছি তাহলে দুজনকেই এই রাত্রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। অ্যাডমিশন রেজিষ্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে' নাম সই করেছি। আর সেই ভদ্রলোক—শুদ্ধ গোবিন্দ না কি যেন—"

"সদারঙ্গ বিহারীলাল ?"

"হ্যাঁ, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে' জেনে গেছেন। জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাছে যে এর কি জবাবদিহি করব জানি না"

"সে আমি করব। আপনাকে করতে হবে অনীতা দেবীর কাছে"

সুশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

"ব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ দুজনের সম্বন্ধে যদি আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনে না করে তাহলে আমার মেজেতে শোয়াটাও ওরা আশা করি অনুমোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে একাজ করেছি তা বোঝবার মতো সহৃদয়তা ওদের নেই ? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে আর ছাপ্‌পর খাটের তলায় পা চালিয়ে শোয়াটা যে আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না ? নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে অথমও হয়ে পড়তে পারি ; হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা।"

সান্ত্বনা মুচকি মুচকি হাসছিল।

"উনি অবশ্য কিছু মনে করবেন না।"

"বাস তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর যদি আমি সামলাব।"

"উনিও মোটেই কানপাতলা লোক নন। তাছাড়া আমার যাতে কষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না।"

"আমিও করি না। অনীতাকে আমি যত ভালবাসি এত বোধহয় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বাসে না। সত্যি বলছি যত্ত ভালবাসি। যাক বালিশ আর 'বাপ' দাও, তাহলে চেষ্টা করে দেখি ঘুম হয় কি না—"

"কপাটে খিল দিন"

খিল দিতে গিয়ে সুশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি ভাঙা।

"ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা পাশ ফিরে শুল।

"সুশোভনবাবু"

"আঁ্যা—কি"

"ঘুমুচ্ছেন?"

"কেন"

ফ্রেসিং টেবিলের তলা থেকে সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল সুশোভন।

"কিছু মনে করবেন না, জানালাটা যদি খুলে দেন দয়া করে'। আমি শোবার সময় খুলতে ভুলে গেছি"

"জানলা খুলে কি হবে। হু হু করে' হিম ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাও না কি"

"সব জানালা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা দরকার"

"ঘরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন"

"জানালা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে আমার। খুলে দিন লক্ষ্মীটি"

"ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাঁড়াও উঠি আগে। রীতিমত কসরৎ করতে হবে। এই ফ্রেসিং টেবিলের তলা থেকে মাথাটা বার করাই মুস্কিল, তারপর আলমারির তলা থেকে হাতটা—"

জানালা খুলে মিনিট দুই পরে সুশোভন আবার মেঝের উপর এসে বসল, অস্ফুটস্বরে গজগজ করতে করতে হাত থেকে ধুলা ঝাড়লে, তারপর নিজের ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে ফ্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গলিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মনে হল সান্ত্বনা নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে 'ধন্যবাদ' না কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার, সান্ত্বনার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে কুকুরের করুণ আর্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না—চলেইছে একটানা—।

"সুশোভনবাবু"

"কি"

"শুনতে পাচ্ছেন? মরে যাই মাণিক আমার"

"আমাকে বলছ?"

"কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছেন না? আহা বেচারী"

"কই না"

"পাচ্ছেন না? ওই যে"

"ও প্যাচা ডাকছে"

"কি যে বলেন। কুকুর কাঁদছে। আহা, কি যে করি"

"জানলাটা বন্ধ করে' দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে"

"না, না। বেচারী সমস্ত রাত ওই রকম করে কাঁদবে, আর আমরা চুপচাপ শুয়ে থাকব এখানে—"

সুশোভন উঠে বসল।

"ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে বল। ও চেঁচাবেই। কুকুরের স্বভাবই ওই"

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে—লক্ষ্মীছাড়া কুকুর।

"উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে আসতেন"

"আমি 'উনি' হলে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আমার শিরদাঁড়া এমন জখম হত না"

"সুশোভনবাবু, উঠুন, যান লক্ষ্মীটি"

"যেতাম। কিন্তু যাবার উপায় নেই"

"কেন, এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে যেতে চাইছিলেন"

"চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না। আমি হলপ করে বলতে পারি এখন ওই খিড়কি দুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে যাওয়া যাদুকর পি, সি, সরকারের পক্ষেও অসম্ভব"

"কেন বক্সোর খিল দেওয়া আছে—"

"দেখ যে লোক বৈঠকখানায় ডবল তালা লাগাতে পারে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে"

"শুনুন, আহা কি কান্নাটাই কাঁদছে বেচারী। ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি দয়া হচ্ছে না একটু—"

"ওর নাম বোবা জানোয়ার!"

"আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না শুনে স্থির থাকতে পারব না"

সুশোভনকে উঠতে হল। জুতো পরে জামা গায়ে দিয়ে বারান্দা থেকে কমানো লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে নেবে গেল সে। নাবতে নাবতে তার মনে হল—অনাত্মার কুকুরের সখ নেই, আর যাই থাক! উঃ—। (ক্রমশঃ)

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পুনর্বসতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

মহাত্মা গান্ধী বিহারের উপদ্রুত-দর্শিত ভাঃ মাহমুদের আমন্ত্রণে সেখানকার মুসলমানদের সেবার জন্য ৭ই মার্চ তারিখে পূর্ব-বাঙ্গলার তাঁহার ঐতিহাসিক পল্লী-পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ গ্রাম হাইচর ত্যাগ করিয়া বিহার চলিয়া যান। তাঁহার পূর্ববঙ্গ ত্যাগের সংবাদে বিপ্লাত ও হতোদ্যম গ্রামবাসীদের অন্তর দিয়া তিনি পূর্বদিন প্রার্থনা সভায় বলিয়াছিলেন—আপাতকাল আমি বিহার যাইতেছি, কিন্তু অল্প কিছুদিন মাত্র সেখানে অবস্থান করিয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিব। এখন যে সকল উপদ্রুত গ্রামগুলিতে যাইতে পারিলাম না, ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গ্রামে যাইবার চেষ্টা করিব। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ত্যাগ করিব না। আমার অসমাপ্ত কার্য আমার সহকর্মীদের উপর দিয়াই আমি বিহার যাইতেছি।

মহাত্মা গান্ধী বিহারে গেলেন, কিন্তু সেখান হইতে আবার তাঁহার ডাক পড়িল নয়াদিল্লীতে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুপরিবর্তনের কারণে তিনি সেখানে বহুদিন আটকাইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সময়ে উপদ্রুত নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার আরব্ধ ও অসমাপ্ত কার্যভার কি ভাবে যোগ্যতার সহিত চালাইয়া যান এই প্রবন্ধে মূলত তাহারই কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য শান্তির বাণী লইয়া তাঁহার দোভাষী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও সহচর লেখক পীরুভাইকে মাত্র সঙ্গী করিয়া সদ্য মরুদ্যান ছাড়িয়া কাজিরশিল হইতে ইরানদুর অভিমুখে রওনা হন এবং ঐ দিন তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার দলের অন্যান্য সকলেও এক এক জন করিয়া এক একটি উপদ্রুত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িলেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তেরা তখন চারিদিকে অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের আস্ফালন ও শাসানী মোটে কমে নাই। গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম গন্ধ নাই। যাহারা কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহারা আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে। উপদ্রুত গ্রামসমূহের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মীরা প্রকৃত অহিংস বীরের ন্যায় এক একজন করিয়া ঐ সকল গ্রামে গিয়া ক্যাম্প স্থাপন করিলেন অর্থাৎ কোনও একটি পোড়ো বাড়ীতে গিয়া একা একা বাস করিতে লাগিলেন। কর্মীদের মধ্যে মহিলারা পর্যন্ত রহিলেন। কর্মীদের এই সৎসাহস দেখিয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর অন্তর প্রচার ও গ্রাম পরিচয়ের ফলে উপদ্রুত গ্রামবাসীরা আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ক্রমে ক্রমে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন হইতে কর্মীরা ঠিক একভাবেই সেবা ও পুনর্বসতির কাজ চালাইয়া আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহারা বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক ও কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকিলেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় গান্ধী-ক্যাম্পের ২৭টি কেন্দ্রে প্রায় ৫০ জন কর্মী কাজ করিতেছেন। বিভিন্ন গান্ধী ক্যাম্প ও কেন্দ্রসমূহ এবং ঐ সকলের পরিচালকদের নাম দেওয়া হইল :—

কাজিরশিল ক্যাম্প (ইহা গান্ধী ক্যাম্পের হেড কোয়ার্টার)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, জোগেশচন্দ্র সরকার (বিজলিপি সম্পাদন ও মুদ্রণ) চারু চৌধুরী, অরুণাংশু সে, রবীন্দ্রশঙ্কর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র মৌমিক (পরিচালনা ও অফিস) রঞ্জনকুমার দত্ত (হিসাব)

জগদীশচন্দ্র গুহ (ক্যাশ) যতীন্দ্র সে (ভলাম) মণি চক্রবর্তী, আভা গাঙ্গী (চরখা-নির্মাণশালা ও বিদ্যালয়) বিজয় দাশগুপ্ত, আনোয়ার (যন্ত্রশালা) অকলেশ চৌধুরী (বনিয়াদি বিদ্যালয়) যোগেন্দ্রনাথ দাস (চিকিৎসা) প্রিয়নাথ মজুমদার (পাকশালা) বিমলভূষণ দাশগুপ্ত (অনুসন্ধান)

কেন্দ্র সমূহ—চণ্ডীপুর—সৌরীন্দ্র বসু ; চাঙ্গীর গাঁও—হিমেশ্বর দাস ; ফেরোজা—কৃপালচন্দ্র কর্মকার, বাদাল বাজার—কর্ণেল জীবন সিং, ও হরিপদ দালাকার, বাসবী—জীবনকৃষ্ণ সাহা, চরমোহিতা—অন্নদাচরণ গুহ (মুন্টু) সীরশী—আবদুল সালাম, সুধন্য পাল ; চাঁদপুর—অজিত সিংহ, কেন্দুলী—রেজাউল করীম ; পানিয়ালা—অমৃতলাল চাটার্জি, মুরাইম—জানেন্দ্র দাস, মহম্মদপুর—বীরেন্দ্রনাথ গুহ, পাল্লা—যতীশ চক্রবর্তী, পাঁচগাঁও—অজিতকুমার সে, জগৎপুর—দেবেন্দ্র সরকার, ভাটিয়ালপুর—প্যারেলালজী, চন্দ্রশেখর ভৌমিক, গোপাইরবাগ—বিমলরঞ্জন সেন ও নারায়ণকেশব বৈদ্য, রামদেবপুর—কানু গাঙ্গী ; পায়কোট—সাধনেন্দ্র মিত্র ও প্রফুল্লদাস প্যাটেল, আতাকোরা—মুরলীধর জানা, কমলা রায়, বদনপুর—যজ্ঞেন্দ্রনাথ জানা, হাইমচর—মদন চট্টোপাধ্যায় ও ধনমালী ঘোষ। *

এক একটি কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রামকে লইয়া কাজ করিতেছে। অতএব কম করিয়াও প্রায় দুইশত গ্রামে কর্মীরা সেবা ও পুনর্বসতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সতীশবাবু কর্মীদের জন্য "শান্তি মিশন দিনলিপি"তে সকল কর্মীদের কাজ ও কর্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্যে একটা নিবিড় যোগ রাখিয়াছেন। মহাত্মা গাঙ্গী ৪ মাসকাল নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থান করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য মানবতার আবেদন লইয়া যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কর্মীরা তাহাই কার্যকর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি আনয়ন এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদিগকে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষা করার দায়িত্ব বুঝান, তরফীতদের ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় না করিতে বলা এবং প্রকৃত নির্ভীক করিয়া তোলা, হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা দূর করা, গ্রাম পরিচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা দূরীকরণ ও দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে কুটীর শিল্পের প্রবর্তন—এই সকলই ছিল নোয়াখালিতে মহাত্মা গাঙ্গীর কার্যসূচী। কর্মীরা মহাত্মাজীর এই সকল গুরুত্ব কাজগুলিকে সফল করিবারই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দুমুসলমান পুনর্মিলনের জন্য মহাত্মা গাঙ্গী যে পথ অবলম্বন করেন কর্মীরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহারা বন্ধুর ভাব লইয়া সকল মুসলমানের সহিতই মেলামেশা করিতেছেন। সতীশবাবু দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বরাবরই কর্মীদের উপদেশ দিয়া আসিতেছেন—সাধারণতঃ সকল মুসলমানই ভাল এই বোধ ও বিশ্বাস লইয়া উহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে। অবসর সময়ে তাহাদের সহিত মিশিবে এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়া আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবে। হিতকাজের দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। মুসলমানদেরও নানা দুঃখ, শোক ও তাপ আছে ; সহানুভূতির মনোভাব লইয়া মিশিলে মিলনের দরজা খুলিবেই। অহিংসায় পরাজয় নাই, বিষাদ করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া সতীশবাবু কর্মীদের আরও বলেন—গ্রামের যুবক ও বালকদের লইয়া গ্রামের কাজে ও খেলাধূলায় তাহাদের সহিত মিশিবে। কারণ যুবক ও শিশুদের মন অনেকটা সরল এবং তাহারাও সাধারণতঃ নিষ্পাপ।

কর্মীরা এইভাবেই কাজ করিতেছেন, ফলে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে যে অবিশ্বাসের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

মহাত্মা গাঙ্গী নোয়াখালির তরফীতদের নির্ভীক করিবার জন্য এই কথাই শুধু বলেন, ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিবেন না। আপনারা ভয় ত্যাগ করুন, তাহা হইলেই আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করা হইবে।

গাঙ্গীক্যাম্পের কর্মীরাও নোয়াখালি ও ত্রিপুরার তরফীতদের মধ্যে এই কথাটাই প্রচার করিতেছেন। সতীশবাবু দিনের পর দিন দিনলিপিতেও ইহাই বলিতেছেন। এইরূপ প্রচারের ফলে তরফীতদের মধ্যে অনেকেই নির্ভয় হইতেছেন এবং সৎসাহস ফিরিয়া পাইতেছেন। নিম্নে এরূপ সৎসাহসের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ফিরিয়া গ্রামবাসীরা সেবার প্রথম কাজ করিতেছে। মেহেরাও তাই। একদিন সকালে মেহেরা রামধুন গাহিয়া কাজে যাইতেছে, এমন সময়ে পথের ধারে দাঁড়াইয়া কয়েকজন মুসলমান মেয়ে তাহাদের বলিল—তোরা হিন্দু, তোরা এই সেদিন না ফলনা পড়ে মুসলমান হলি, আজ আবার রামনাম করছিস্।

উত্তরে তাহারা নির্ভীকভাবে বলিল—হ্যাঁ রামনামই আমরা করব। তখন ভয়ে মুসলমান হয়েছিলুম। কিন্তু আর ভয় নেই, ভয় আর করবও না। এখন আর একবার মুসলমান করতে আসিস্। আমরা অহিংস থেকে মরব, কিন্তু তবুও আর ঐ রকম নস্তি স্বীকার করব না।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া মুসলমান মেয়েরা হতবাক্ হইয়া গেল এবং চুপে চুপে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থানকালে মহাত্মা গাঙ্গী প্রায়ই তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে জাতিভেদপ্রথার কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার উপস্থিতির সময়েই নোয়াখালিতে অনেকগুলি জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সহ-ভোজনের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। সতীশবাবু ও গাঙ্গী-ক্যাম্পের কর্মীরা হিন্দুধর্মের এই পুরাতন ব্যাধি লোপ করিয়া বর্ণ, অর্থ তুলিয়া একটিমাত্র হিন্দুধর্মের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সহ-ভোজ চলিতে লাগিল। কিন্তু কর্মীরা দেখিলেন—প্রচলিত ব্যাধির

* সম্প্রতি ভাটপাড়া, রামপুর ও বদরবিয়ার ৩টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং দু' একটি কেন্দ্রে পরিচালকরাও বদলী হইয়াছেন।

মত এই জাতিভেদ কতকগুলি লোককে জীবন্তভাবে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালায় যাহারা একদিন হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তাহারা হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের পূর্ব্বের জাতি খুঁজিয়া বাহির করিতেছে এবং হিন্দুর অন্যান্য জাতির সহিত একত্র ভোজনে মাতিয়া উঠিতেছে। এই কারণে সতীশবাবু কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিলেন—এই ব্যাধি লোপ করিবার জন্য গ্রামে প্রচার অন্ততঃ একটি করিয়া সহভোজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ী হইতে চাল ডাল প্রভৃতি আনিবে, তাহা হইলে কাহার পক্ষে ইহা ব্যয়সাপেক্ষ হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি ভ্রমণের সময়ে সেখানকার পুকুরের জল দূষিত দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন—জল এত দূষিত যে ইহাতে হাত দিতেও ঘৃণা বোধ হয়। লোকে যে পুকুরের জল খায়, সেই জলেই অন্যান্য সকল প্রকার কাজও করে, ফলে জল দূষিত হয়।

সতীশবাবু নোয়াখালিতে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য টিউব-ওয়েল বসান ও পুকুরের মধ্যে ফিল্টার কূপের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পুকুরের মধ্যে ফিল্টার কূপের ব্যবস্থাটি সস্তা এবং এইটাই তিনি স্থানে স্থানে চালু করিলেন। এই কূপ সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপে পুকুরের মধ্যে বসান হয় :—

৪খানা ১০ ফুট করিয়া পাশাপাশি জুড়িয়া, পরে উহাকে গোল করিয়া একটি চোঙে পরিণত করা হয় এবং ভিতরে লোহার ফ্রেম দিয়ে উহা শক্ত হয়। এই চোঙ পুকুরের মধ্যে বসাইয়া প্রথমে জল শুদ্ধ করিয়া পরে আবশ্যকমত মাটী খনন করা হয়। জলের নীচে এইরূপ মাটী খনন করাকে কেজুন বোরিং বলে (caisson boring)। তারপর বাঁশের ফ্রেমে বসাইবার দ্বারা তৈরী একটি চোঙ উহার ভিতর বসাইয়া টিনের চোঙটিকে তুলিয়া লওয়া হয়। এই ধরনের চোঙ বসাইবার উদ্দেশ্য পাশের মাটি আসিয়া যাহাতে গর্ত্তটি ভরাট হইয়া না যায়। ইহার পরে উহার মধ্যে ফিল্টার কূপটি বসান হয়। পাঁচ জন লোক একদিনে এইরূপ কূপ খনন করিয়া একটি ফিল্টার বসাইয়া দিতে পারে।

কর্ম্মীরা গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রামবাসীদের লইয়া গ্রামের রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ, পুকুরের পানা ও বনজঙ্গল সাফ করিতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সহযোগিতা না করিলেও তাঁহারা গ্রাম পরিষ্কারের কাজ ছাড়িতেছেন না। তাঁহারা নিজেরাই সাবল ধরিয়া যাইতেছেন। একদিনের সংবাদে জানা যায়—শ্রীযুক্ত কানু গান্ধী তাঁহার ক্ষেত্রে একটি গ্রামের রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য গ্রামবাসীদের শ্রমসাহায্য চাহিলেন, কিন্তু কেহই কাজে আসিল না। অবশেষে তিনি নিজেই মাটি কাটিয়া রাস্তাটি মেরামত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা একাই কাজ করিলেন। এমন সময়ে রাস্তার উপরে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উহা দেখিতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত কানুগান্ধীকে এইভাবে পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার কাজ ছাড়িলেন না। শেষ পর্য্যন্ত যাহারা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও কাজে যোগ দিল।

কর্ম্মীরা যেখানে সহানুভূতি পাইতেছেন না সেখানে ঠিক এইভাবেই পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই কাজ করিয়া যাইতেছেন।

গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য সতীশবাবু কিছুদিন হইতে স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদিগকে কন্‌ট্রোল দামে চাউল বা খয়রাতি বস্ত্র বিতরণ করা হইবে তাহাদিগের পক্ষে একত্রে অসম্ভব না হইলে, প্রত্যেক বাড়ীর একজনকে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কি ১½ ঘণ্টা করিয়া মূলত মূল্যের প্রতিদান হিসাবে গ্রামের মঙ্গলের জন্য রাস্তা মেরামত, পানা তোলা, জঙ্গল সাফ প্রভৃতি যে কোনও একটি কাজ করিতে হইবে। এইভাবেও কিছু কিছু করিয়া গ্রাম পরিষ্কারের কাজ চলিতেছে।

কর্ম্মীরা গ্রামবাসীদের নৈতিক উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা করিতেছেন। কোনও অসৎপন্থা অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতেছেন। এ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের লোভ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে চণ্ডীপুরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বসু একবার অবশন করেন। ইহাতে ফল ভালই দেখা দেয়।

অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কাজিরখিল ও আতাকোরায় দুইটি বয়স্কদের বিদ্যালয় চলিতেছে। শ্রীযুক্ত কানুগান্ধী তাঁহার ক্ষেত্রে ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একটি ব্রতচারী নৃত্যের দল গঠন করিয়াছেন। সর্দ্দার জীবন সিং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বালেবাজারে ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত খেলার ছলে তাহাদিগকে দিয়া সংকল্প গ্রহণের অনুষ্ঠান করান। বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি জাতীয় পতাকা উড়াইয়া উহার চারিদিকে ছেলেমেয়েরা বসিয়া যায়। তারপর একসঙ্গে সকলে উচ্চারণ করে—"এই ভূমি আমার মাতৃভূমি। এই ভূমি আমি ছাড়িব না ও রক্ষণালন করিব। মৃত্যু আসিলে আজ এখন যেমন বসিয়াছি এখনি বসিয়া বসিয়া মৃত্যু লইব। তবু ছাড়িব ও ছাড়িয়া যাইব না।"

সকল ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে রোগীর সেবা চলিতেছে। কাজিরখিলে একটি সস্তা ঔষধালয়ও খোলা হইয়াছে। এখানে প্রতিদিনই রোগীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। সকলকেই আসন তালিকা দেখা করা হইতেছে।

প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান ব্যতীত কর্ম্মীরা মাঝে মাঝে সভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। সভায় পুনর্বসতি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা ও বিনিপি পাঠ করা হয়। কর্ম্মীরা গ্রামবাসীদের বিভিন্ন কুটীর শিল্পের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইয়া দেন। প্রদর্শনীতে সূতা কাটাও দেখান হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবীর উদ্যোগে মাঝে মাঝে মেয়েদের লইয়াও সভার আয়োজন হইয়া থাকে। সভায় মেয়েদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

নোয়াখালি জেলায় নারিকেল অজস্রভাবে ফলে। নোয়াখালিবাসীরা এই নারিকেল কেবল রপ্তানি করিয়াই কিছুমাত্র আয় করিয়া থাকে। সতীশবাবু দেখিলেন এই নারিকেল দ্বারাই নোয়াখালিকে লক্ষ্মীশালী করা যায়। তাই তিনি নারিকেলের তৈল, দাঁড়ি, খোল ও ছোবড়া লইয়া নারিকেল নিজ গড়িয়া তুলিবার জন্য পথ দেখাইয়া দিলেন। ছোবড়া হইতে রশি, পাপোশ, জাজিম করা, নারিকেলের মালা হইতে পেয়ালা মায় হাতল, ঘুরা, বোতাম ও হুকার খোল প্রস্তুত হইতে

লাগিল। কালিরপিল ক্যাম্পে এই সকলের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করিবার জন্য কর্মীরা গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচলন করিয়াছেন এবং কেন্দ্র হইতে গ্রামবাসীদের সুতা-কাটা শিক্ষা দিতেছেন। কেন্দ্রগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্য কালিরপিলে চরকা ও উহার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নবাগত শিক্ষার্থীদিগকেও এখানে চরকা নির্মাণ ও সুতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কোন কোন কেন্দ্রে তুলার চাষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের চাষও চলিতেছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে সতীশবাবু যে সকল সাম্প্রদায়িক অপরাধের গুরুত্ব রহিয়াছে, যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং যাহা তিনি প্রমাণ করাইতে পারিবেন, এইরূপ ঘটনা সকল পুলিশকে জানাইতে থাকেন এবং তাঁহার সম্পাদিত শান্তি-বিপণ বিজ্ঞপ্তিতেও প্রকাশ করিতে থাকেন। জুলাই মাসের অর্ধেক দিবস পর্যন্ত তিনি হত্যা, লুণ্ঠন, চুরী, গৃহদাহ, স্ত্রীলোকের শ্লীলতানাশ ও শ্লীলতানাশের চেষ্টা, ধমকানী ও শাসানী, বয়কট, জোরপূর্বক জমির ধান কাটিয়া লওয়া প্রভৃতি প্রায় সাড়ে চারিশত অপরাধমূলক ঘটনার কথা পুলিশকে জানান। পুলিশ বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছটিৎ দুএকটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিকারের জন্য আগাইয়া আসেন নাই। সতীশবাবু জুলাইএর শেষ দিক হইতে বিজ্ঞপ্তিতে এই অপরাধমূলক ঘটনা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন, তবে কর্তৃপক্ষকে ইহা পূর্বের ন্যায়ই জানান হইতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহাতে কিছু না করিলেও কর্মীরা তাঁহাদের কর্তব্য হিসাবেই এই সকল অপরাধের কথা পুলিশকে জানাইয়া আসিতেছেন।

কর্মীরা এইভাবে দেবার আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। মাসে এপ্রিল মাসে অত্যাচারীর অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়া যায়। সতীশবাবু এই সব ঘটনা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে তিনি অবশ্যই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার উত্তরে জানান—যাহা দেখিতেছি তাহাতে হয় নোয়াখালির হিন্দুদের ঐ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা মুসলমানদের ধর্মান্ধতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করা উচিত তাহা স্থির করিবেন।

কর্মীরা স্থির করিলেন, পলায়ন অথবা মৃত্যু এই দুইটির মধ্যে আমরা মৃত্যুকেই বরণ করিতে প্রস্তুত। নোয়াখালির মাটি ছাড়িব না। মরিতে হয় এইখানেই মরিব, তবুও নিজেদের কর্তব্য ত্যাগ করিব না।

মানুষ আপন কর্তব্যে স্থির থাকিয়া কতখানি নির্ভীক হইলে তবে এমন কথা বলিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন। কর্মীদের এই যে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা ও কর্তব্যে নিষ্ঠা ইহা সত্যই অপূর্ব ও বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

এই সকল কর্মী তাঁহাদের সকল কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আজ ১০ মাসকাল ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সেবা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত নির্বিশেষে সকলের নিকটেই বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুমুসলমান যদি মহাত্মা গান্ধী তথা কর্মীদের এই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তবেই পূর্ববাঙ্গলার এই দুইটি জেলা তাহাদের কৃত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ক্ষালন করিয়া আবার সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং এখানকার হিন্দুমুসলমান মৈত্রী সংক্রামিত হইয়া ক্রমে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ছড়াইয়া পড়িবে, ফলে পূর্ববাঙ্গলায় পাকিস্থানে আগমনে সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায় আজ যে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও একটা সমাধা হইবে।

শহীদ ক্ষুদিরাম

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কে বাজাল ওই প্রলয় বিষাণ জীবনের জয়গান—
প্রাণের যজ্ঞে প্রথম আহুতি—বিপ্লব অভিযান!
পরাধীনতার কঠিন পীড়নে কাঁদে অন্তর যার—
সেই ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াল নির্ভিকার!
বিদ্রোহী প্রাণে জ্বলিয়া উঠিল রক্ত-বহ্নি-শিখা
আপন রক্তে আঁকিল ললাটে দীপ্ত বিজয়-টীকা—
"স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা, স্বাধীন স্বপ্ন যার—
আমার দেশেতে বাঁচিবার আছে আমাদেরই অধিকার!"
দিকে দিকে তারি হেলিহান শিখা জ্বলিছে বহ্নানল—
কত প্রাণ দিল বলিদান শুধু ভাঙিবারে শৃঙ্খল!
কত বীর মাতা আশীষ দিয়াছে কাহিনী রচিয়া যার—
তারই স্মৃতি আলো জাতির জীবনে আহুতির সম্ভার!
তুমি নাই আজ, চ'লে গেছ দূর মরণ-সিন্ধু পার—
তবুও গরবে মাতেঃ মন্ত্রে জীবনের ঝঙ্কার।
সাত্ত্বিক, তব নেভেনি' আগুন—জ্বলন্ত শিখাটি তার—
মরণ-বিজয়ী বিপ্লবী বীর—লহ গো নমস্কার।

ক্ষুদিরাম চিত্র—শঙ্খী ঘোষ

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিল। ঐ দিন বহু বৎসর পরে ভারত আবার স্বাধীনতা লাভ করিল। গত ৬০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস যে সংগ্রাম করিয়াছে, আজ তাহা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে—এ জন্য যাঁহারা সংগ্রামে যোগদান করিয়া নানা-প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন ও জীবনাহুতি দিয়াছেন, আজ স্বাধীনতা লাভের শুভক্ষণে আমরা তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণতিবাদন জ্ঞাপন করি। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমরা নিরানন্দ—কারণ জাতীয়তা-বিরোধী ভারতীয় মুসলেম লীগের আন্দোলনের ফলে আজ ভারত হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুইটি স্বতন্ত্র দেশে বিভক্ত হইয়াছে। হয় ত এই বিভাগ স্থায়ী হইবে না, কিন্তু তথাপি আজ যে সকল হিন্দুকে মুসলমান প্রধান অঞ্চল অর্থাৎ পাকিস্তানে থাকিতে হইল—তাঁহাদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা জানাই যেন আমরা আনন্দের বিজয়োৎসবের মধ্যে তাঁহাদের কথা ভুলিয়া না যাই। ভগবান না করুন, যদি তাঁহারা নির্য্যাতিত হন, আমরা যেন তাঁহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হই। নচেৎ আমাদের এই স্বাধীনতা লাভ অসার ও নিরর্থক হইবে।

পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু—

বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুর মনোভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমাদের জনৈক কথা-সাহিত্যিক বন্ধু কুমিল্লা হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"১৫ই আগষ্ট আগাইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তির দিন আসন্ন। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ভারতবর্ষ উন্মুখ, চঞ্চল। আনন্দোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু আজ অজানা আশঙ্কায় দিন গণিতেছে। আজ তাহার জন্য সৃষ্টি হইবে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার নূতন পৃষ্ঠা। আজ সে স্বাধীন ভারতের কেহ নয়, ভারতের গৌরবের স্মৃতি-বিজড়িত জাতীয়-পতাকা তাহার কাছে বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতীক মাত্র। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার তাহার নাই। চন্দ্রতারকা-লাঞ্ছিত লীগ পতাকাকে রাষ্ট্রপতাকার সম্মান দিতে হইবে—তাহাকে করিতে হইবে অকুণ্ঠচিত্তে অভিবাদন—জয়ধ্বনি করিতে হইবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। যে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আজ ভারতের স্বাধীনতার দিনে তাহার কপালেই বিধাতা আঁকিয়া দিলেন সকলের চেয়ে বেশী দুঃখ—পরাজয়ের ও নিরাশার অপরিসীম গ্লানি। আপনাদের ঈর্ষা করি—ভারতের স্বাধীনতায় আপনারা অংশভাগী। আপনাদের আনন্দ ও গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাউক, এই প্রার্থনা করি। তবুও এই অনুরোধ জানাই, আপনাদের আনন্দোৎসবের মধ্যে স্মরণ করিবেন, এই দুর্ভাগা পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুদের—যাহাদের দুঃখ ও ত্যাগের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা ক্রীত হইয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও অন্তর্বর্ত্তী সরকারের অন্যতম সদস্য চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী নূতন পশ্চিম

চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী

বঙ্গের গভর্নর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি সালেম জেলার সহরে উকীল ছিলেন—গত ২৭ বৎসর কাল তিনি একান্ত-ভাবে নিজেকে দেশের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়া-ছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, ঐকান্তিকতা, নির্ভীকতা ও নিষ্ঠা আজ তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মান দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা যেন তাঁহার নেতৃত্বে নূতন জীবন লাভ করিতে পারে, ইহাই আজ আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার কৃতী সন্তান, খনামধন্য নেতা ডক্টর শ্রীশ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেস দলভুক্ত না হইলেও কংগ্রেস যে আজ তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির সমাদর করিয়াছে, তাহা শুধু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে নহে, বাঙ্গালার পক্ষেও সম্মানের এবং গৌরবের বিষয়। হিন্দু মহাসভা দেশের বহু জাতীয় তাবাপন্ন নেতাকে গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে—আজ কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদকে গ্রহণ করায় কংগ্রেসেরও উদারতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই উচ্চপদে আসীন থাকিয়া সমগ্র ভারতের ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার সেবা করিয়া ধন্য হইবেন।

সংস্কৃত শিক্ষা ও নূতন শিক্ষামন্ত্রী—

নিখিলবঙ্গ পণ্ডিত সমাজ হইতে গত ২৩শে জুলাই বাঙ্গালার নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতিকে কলিকাতা আর্য্যসমাজ হলে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইলে শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন—সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করা সম্ভব না হইলেও সংস্কৃত পঠন, পাঠন, গবেষণা ও আলোচনার ব্যাপক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে।

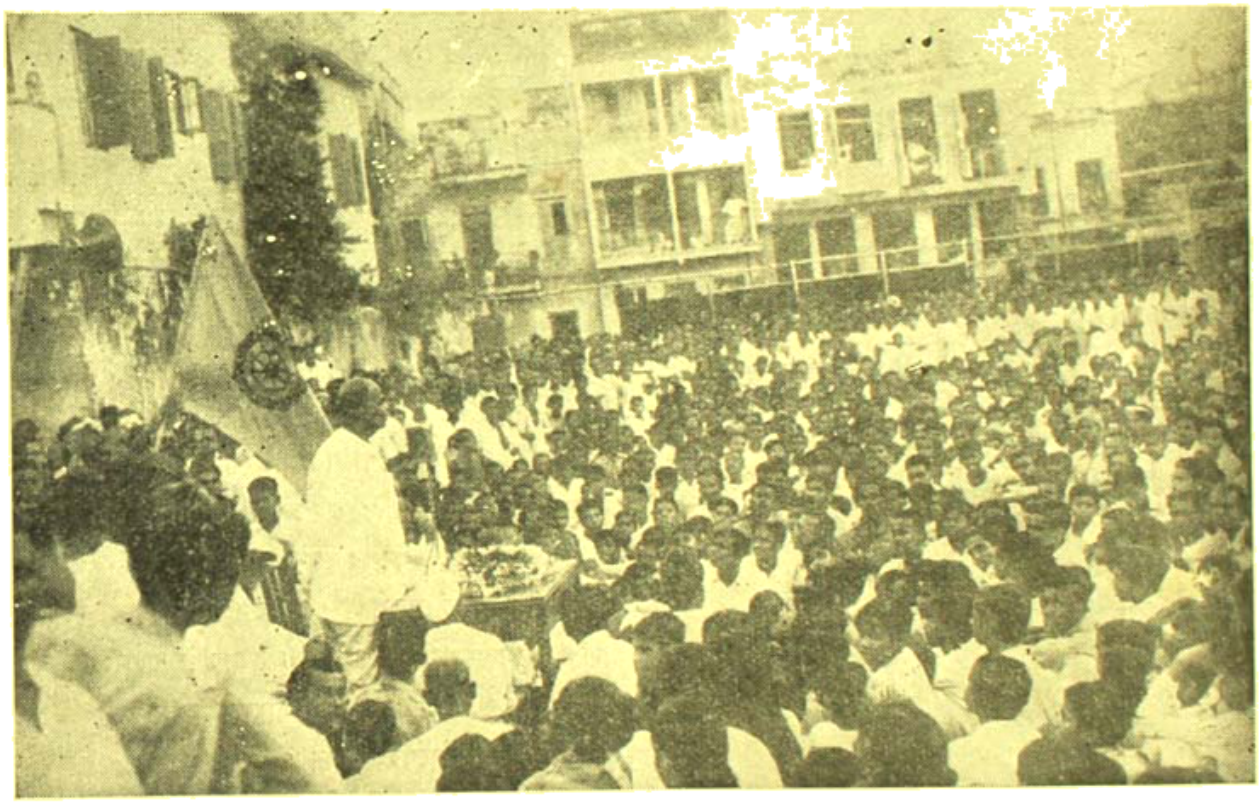

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বক্তৃতা

বিচারপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা নেতা ও দেশসেবক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৫ই আগষ্ট হইতে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এখন দেশের কল্যাণের জন্য

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে আছেন; তাঁহাকে বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রি-সভারও অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এখনও ফিরিতে না পারায় সে পদে কাজ করিতে পারেন

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

নাই। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে, সেজন্য তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর হইয়া কাজ করিবেন। বাঙ্গালী বিধানচন্দ্রের এই অসামান্য সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে চিকিৎসার ক্ষেত্র হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার কথাই এই সুদিনে বার বার মনে পড়িতেছে। বিধানচন্দ্র যুক্তপ্রদেশে বাস করিলে বাঙ্গালী একজন সুচিকিৎসক হারাইবে বটে, কিন্তু বিধানচন্দ্রের এই গৌরবে গৌরবান্বিতও হইবে। বিধানচন্দ্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্ম্মশক্তি অবশ্যই তাঁহাকে তাঁহার নূতন কাজে সাফল্য লাভে সমর্থ করিবে।

দমদম বিমান ঘাটীতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ফটো—ডি-রতন

দেবনারায়ণ সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা ৩১ শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ কিশোর আলেখ্য সম্মেলনের উদ্যোগে গত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যায় শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুলের অমৃতলাল হলে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। কবি শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুত কণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া দেবনারায়ণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২০শে ও ২১শে আষাঢ় সিথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা, দমদম—২০নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে

বয়েজ ওন হোমের বিরাট হলঘরে নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর বক্তৃতার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মঙ্গলাচরণ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু উদ্বোধন করেন ও মূল সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন; দর্শন শাখায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করেন ও নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সভাপতিত্ব করেন, কাব্য শাখায় কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক উদ্বোধন করেন ও ব্যারিষ্টার কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন ও শেষে কীর্ত্তন শাখায় শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। যাঁহাদের চেষ্টায় এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই, বিশেষ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও বৈষ্ণবের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সমাগত সুধীবৃন্দ　　ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সুধীবৃন্দ (১ম দিবস)　　ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

রামচন্দ্রপুরে নূতন প্রতিষ্ঠান—

মানভূম জেলার ঝোরাধী ডাকঘরের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে 'মহাত্মা নিবারণচন্দ্র আদর্শ বিদ্যালয়' ও 'স্বামী বিরণচাঁদ দরবেশ বিদ্যার্থী ভবন' নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করার সকল ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থী ভবন গৃহ প্রস্তুত

হইতেছে, গৃহ সম্পূর্ণ হইলে বহু ছাত্র তথায় থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। স্বামী অসীমানন্দ (পূর্ব্বনাম অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ এবং প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। গ্রামে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন খুবই বেশী; তাহা ছাড়া যে দুই মহাপুরুষের নামে প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের নামকরণ করা হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কাজেই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সকল প্রকারে পূর্ণাঙ্গ হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়, সে বিষয়ে সকলের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

করেন। সম্মেলনে স্থানীয় বহু কবি ও সাহিত্যিকের লেখা পঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহার অভিভাষণে নাটোর মহকুমার গৌরবময় ইতিহাস ও স্থানীয় সাহিত্যিকদিগের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা—

ক্যান্সার রোগ সহজে আরাম হয় না এবং তাহার চিকিৎসাও ব্যয়-বহুল। ঐ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা এ দেশে দিন দিন বাড়িতেছে। সে জন্য কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে উহার চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। তথায় পর্য্যাপ্ত স্থান নাই বলিয়া

ভাঙ্গী কলোনীতে মহাত্মাজীর দর্শন আশায় লেডী মাউন্টব্যাটেন

নাটোর লিটল্‌স ক্লাব—

গত ১১ই জুন রাজসাহী জেলার নাটোর সহরে স্থানীয় লিটল্‌স ক্লাবের বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য

সম্প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি স্বতন্ত্র ক্যান্সার (কর্কট রোগ) চিকিৎসা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। এ বিষয়ে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে। আশা করি, অর্থাভাবে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিলম্ব ঘটিবে না।

খাজা নাজিমুদ্দীন নেতা নির্ব্বাচিত—

গত ৫ই আগষ্ট পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের লীগ দলের

পরিষদ-সদস্যদের এক সভায় বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীকে ১৫—৩৯ ভোটে পরাজিত করিয়া খাজা নাজিমুদ্দীন দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ আই-আই-চুন্দ্রীগড় সভাপতিত্ব করেন। এখন খাজা সাহেবই পূর্ব্ববঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী হইবেন।

নেতাজী সুভাষ রোড—

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ৫ই আগষ্টের সাধারণ সভায় কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত পথটির (উহা এখন ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট, চার্চ্চ লেন ও ষ্ট্রাইণ্ড ষ্ট্রীট নামে পরিচিত) নেতাজী সুভাষ রোড

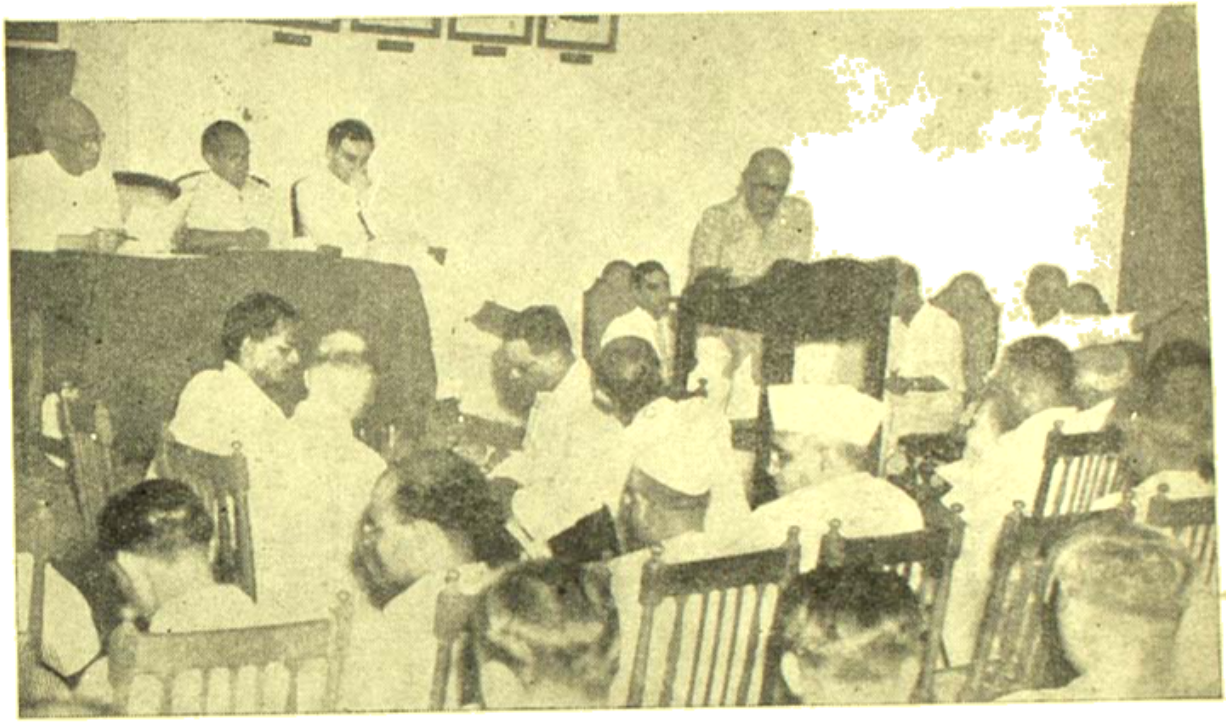

প্রেস কনফারেন্সে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্পর্কে তাঁহার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর ভাষণ ফটো - ডি-প্রতন

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের দায়িত্ব—

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের কি দায়িত্ব থাকিবে সে বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও গত ২রা আগষ্ট দিল্লীতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ঐক্যবদ্ধ ভারতই পৃথিবীর জাতি সংঘে আপনার যোগ্য আসন লাভ করিতে পারে ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। এই গুরুতর কর্মভার গ্রহণের যোগ্যতা দেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই। এই জন্যই কংগ্রেসের দায়িত্ব আজ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক। জনসাধারণের সমর্থনে গঠিত রাজনৈতিক দল না থাকিলে স্থায়ী শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট হইতে পারে না। এজন্যও আজ কংগ্রেসের দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নামকরণ করা হইয়াছে। হেতাঙ্গ ও মুসলিম লীগ দলও প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াছেন।

ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ

গত ৩রা আগষ্ট করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মিলনে রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন—ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ-ভাবে চেষ্টা করিয়া যাইবে। ভারতের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকিতে ও সম্মানজনকভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে দেশান্তর গমন করিতে হইবে। অন্য কারণে দেশান্তর

গমন উচিত হইবে না। যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করিবে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিবে। পাকিস্তানেও কংগ্রেস পূর্ব্বের মতই কাজ করিয়া যাইবে।

গভর্ণরের কাজ করিবেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে—গভর্ণর জেনারেল—মিঃ এম-এ-জিন্না। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্ণর—সার ফ্রান্সিস মুডি। সিন্ধুর গভর্ণর—মিঃ গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর—সার

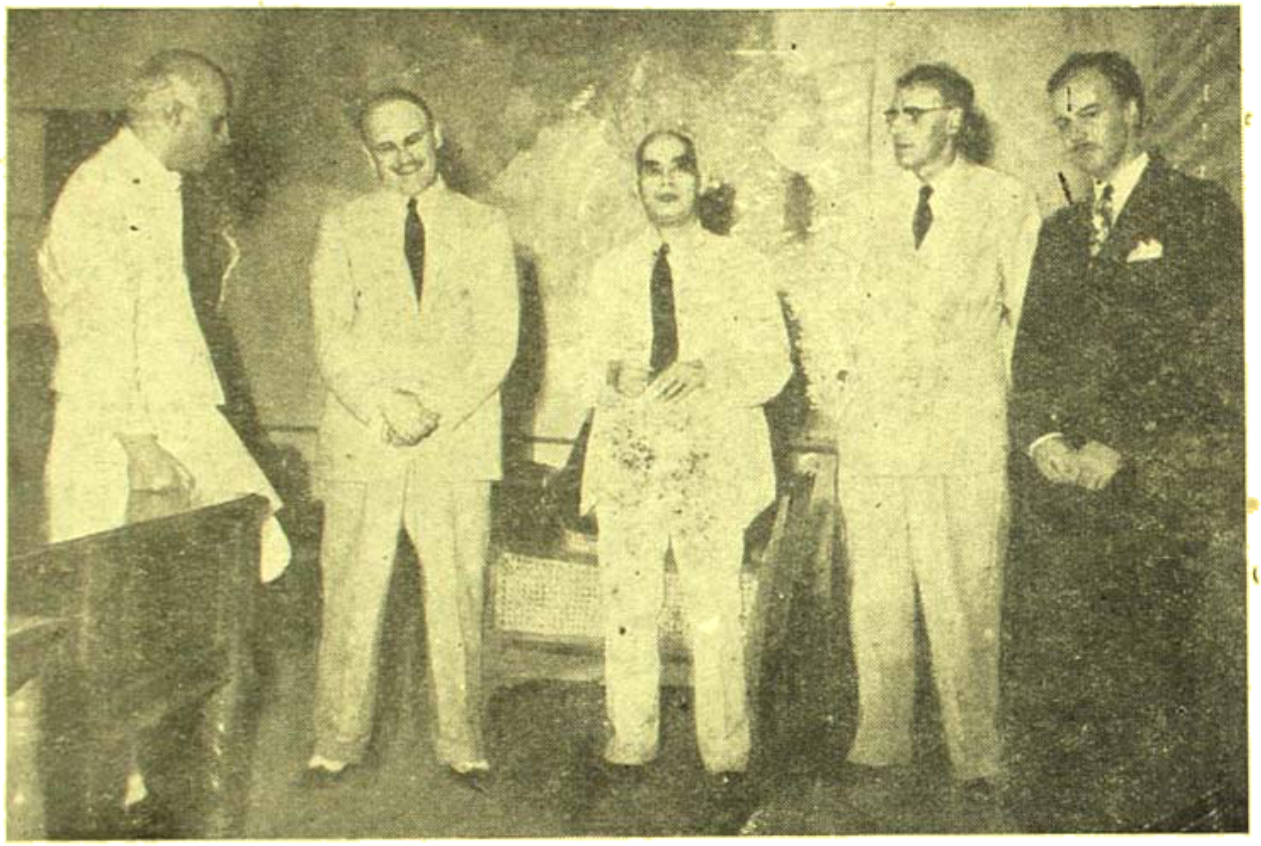

ক্যানেডার উচ্চপদস্থ বিভাগীয় কর্মীগণ ও পণ্ডিত জহরলাল

নূতন গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণর—

১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতের দুইটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের কাজ করিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—গভর্ণর জেনারেল—লর্ড মাউণ্টবেটেন। মাদ্রাজের গভর্ণর—সার আচ্চিবল্ড নাই। বোম্বায়ের গভর্ণর—সার ডেভিড কলভিনি। আসামের গভর্ণর—সার আকবর হায়দারি। পশ্চিম বঙ্গ—শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি। পূর্ব্ব পাঞ্জাব—সার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকোয়াসা। বিহার—শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম। উড়িষ্যা—ডাক্তার কৈলাসনাথকাটজু। যুক্তপ্রদেশ—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ডাক্তার রায় এখন আমেরিকায় আছেন—তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশে

জর্জ্জ কানিংহাম। পূর্ব্ব বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বুর্ণ। শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকোয়াসা বর্ত্তমানে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি, ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু—যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এখন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অন্যতম সচিব। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম সিন্ধুর খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা।

পাকিস্তান গণপরিষদে শ্রীহট্ট সদস্য—

গত ২রা আগষ্ট শ্রীহট্ট হইতে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টবাসীরা অধিক ভোটের দ্বারা উক্ত জেলাকে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—মিঃ আবদুল হামিদ, আবদুল মতিন চৌধুরী ও অক্ষয়কুমার দাস। ১১ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন—

অক্ষয়কুমার দাস, রমেশচন্দ্র দাস ও যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, ভোটে যোগদান করেন। ৭ জন সদস্য কলিকাতায় ছিলেন, যথা সময়ে শিলঙে যাইতে পারেন নাই।

সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন—

সিন্ধু দেশের মুসলেম লীগ মিঃ এম-এ-খুরোকে দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। কাজেই তিনি সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী হইবেন। খুরোর জীবন-কাহিনী অসাধারণ।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও মিস মার্গারেট ভাইকাউন্টেস বন্টগোমারী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—

এই সংখ্যায় অন্যত্র 'শহীদ ক্ষুদিরাম' শীর্ষক যে গান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রচনা ও তাহাতে সুর যোজনা করিবার সময় রচয়িতা—লালগোলার রাজা, আমাদের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে শয্যাশায়ী। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তিনি সত্বর সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হউন।

ছাড়পত্র ও মুদ্রা সমস্যা—

দিল্লীতে স্থির হইয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান যে কোন দেশ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রবেশের জন্য কোন পাসপোর্ট বা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে না। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে ১৯৪৮ সালের ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একই মুদ্রা চালু থাকিবে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর নাগাদ পাকিস্থানে স্বতন্ত্র কারেন্সি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুইটি দেশের মধ্যে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চলিবে। একচেটিয়া অধিকার বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ থাকিবে। এই সকল প্রস্তাবে উভয় রাষ্ট্রই সম্মত হইয়াছেন।

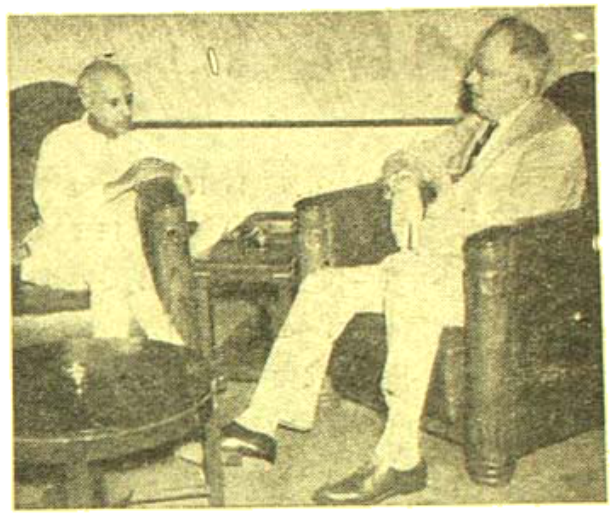

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ হেনরী গ্রেডী ও পণ্ডিত নেহরু

পশ্চিমবঙ্গে নূতন নিয়োগ—

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ভাবে কর্ম্মী নিয়োগ করিয়াছেন—(১) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ এস-সেন আই-সি-এস (২) রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য—মিঃ এস-ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস (৩) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ এস-এন-রায় আই-সি-এস (৪) স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ আর-গুপ্ত আই-সি-এস (৫) অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস-কে-মুখার্জ্জি আই-সি-এস (৬) বিচার ও আইন বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ বি-কে-গুহ আই-সি-এস (৭) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ এস-কে-গুপ্ত আই-সি-এস (৮) কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম-কে-কৃপালনী আই-সি-এস (৯) শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে-সি-বসাক আই-সি-এস (১০) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস-কে-চ্যাটার্জ্জি আই-সি-এস (১১) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মিঃ এ-ডি-খান আই-সি-এস (১২) গভর্ণরের সেক্রেটারী মিঃ বি-এন-চক্রবর্ত্তী আই-সি-এস (১৩) কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার—মিঃ এস-কে-দে আই-সি-এস (১৪) প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ কে-কে-হাজরা আই-সি-এস (১৫) গঠনতন্ত্র, নির্ব্বাচন ও মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী মিঃ এস-বি-বাপাত আই-সি-এস (১৬) বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার

মিঃ বি-বি-সরকার আই-সি-এস (১৭) অন্যান্য জেলার কমিশনার মিঃ হে-এন-তালুকদার আই-সি-এস (বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলা সমূহ ছাড়া জলপাইগুড়ি অন্যান্য সকল জেলার বিভাগীয় সদর বলিয়া গণ্য হইবে।) (১৮) সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিঃ বি-কে-আচার্য্য আই-সি-এস (১৯) কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ এন-কে-রায়চৌধুরী আই-সি-এস (২০) কলিকাতার এডিসনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি-সি-আই-বৈদ্যনাথন্ আই-সি-এস (২১) কলিকাতার স্পেশাল ল্যাণ্ড একুইজিসন কলেক্টার মিঃ বি-এন-মিত্র আই-সি-এস (২২) শ্রমিক ক্ষতি পূরণ ও কৃষি আয়কর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ এস-কে-সেন আই-সি-এস (২৩) ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আর-কে-মিত্র আই-সি-এস (২৪) হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ আর-এ-এস-ব্র্যাসি আই-সি-এস (২৫) হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি-এ-বোরো-হা বি-সি-এস (২৬) বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস-এন-মিত্র আই-সি-এস (২৭) বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার অধিকন মজুমদার বি-সি-এস (২৮) বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন জি-রায় বি-সি-এস (২৯) খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি-সি-এস (৩০) মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ-কে-ঘোষ আই-সি-এস (৩১) জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ আর-কে-রায় আই-সি-এস (৩২) দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার মিঃ বি-জি-ক্রোক আই-সি-এস (৩৩) ২৪ পরগণার জেলা জজ মিঃ এস-এন-গুহ-রায় আই-সি-এস (৩৪) হাওড়ার জেলা জজ মিঃ এ-এস-রায় আই-সি-এস (৩৫) হুগলীর জেলা জজ মিঃ এস-কে-হালদার আই-সি-এস।

অভয় বাঙ্গলার রাষ্ট্রভাষা বাঙ্গলা—

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির উদ্যোগে গত জুলাই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক চাপে আজ সোনার বাঙ্গালা বিভক্ত। বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব বিপন্ন। বঙ্গভাষার গতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কায় বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি সমগ্র বাঙ্গালা ভাষাভাষী নরনারীকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও স্ফুরণ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ ও যত্নবান হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। এই সমিতি আশা করেন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার বাহনে তাঁহাদের শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং দুইটি প্রদেশের যাবতীয় রাষ্ট্র কার্য্যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইবার দাবী করিবেন। এই ভাষার বন্ধনের দ্বারাই সাত কোটি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অখণ্ডতা ও সৌহার্দ্য রক্ষিত হইবে। এই সমিতি বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকগণকে ও কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরূপ জনমত সৃষ্টির জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে।

গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী

৺গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৪শে এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা

লাভ করিয়া অনাড়ম্বর শান্ত ও সন্তুষ্ট জীবন যাপন করিতেন ও শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোরগর পাঠচক্র ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল।

কাশীধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবাসস্থান—

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু কাশীধামে দুই মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের ভিটায় অবস্থান করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করিতেন এবং সন্নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে বসিয়া সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবন প্রকটের পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। কাশীর সেই বটবৃক্ষতল বর্ত্তমানে কাল ভৈরবের মন্দিরের সন্নিকটে যতন বড় (চৈতন্য বট) মহল নামে পরিচিত। এই স্থানটি বেনারস মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের দখলে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও বেনারসের গোপালদাস আগরওলা বাবাজীর চেষ্টায় সে স্থানে একটি চাঁদনী নির্ম্মিত হইয়াছে ও রাস্তার নাম "চৈতন্য রোড" হইয়াছে। সম্প্রতি রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, জ্যোতিষবাবু ও চকদিঘির শ্রীলীলামোহন সিংহের সহিত কাশীধামে গমন করিয়া বেনারস মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নিকট হইতে স্থানটি "স্থান উদ্ধার সমিতিকে" দিবার ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। তাঁহারা ২রা আগষ্ট কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্কুলে চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর জগন্নাথপ্রসাদ মেটার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা করিয়া কাশীবাসীদের চিত্ত গৌরাঙ্গ-স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রকাশ মহাশয় স্থানীয় কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব চৈতন্যদেবের কাশীপ্রবাস স্থান প্রকট করিবার জন্য অর্থাদি সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডে সম্পাদকের নিকট যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা—

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া নূতন স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রী—পররাষ্ট্র বিভাগ (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল —দেশীয় রাজ্য, স্বরাষ্ট্র, সংবাদ ও বেতার বিভাগ (৩) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খাদ্য ও কৃষি (৪) সর্দ্দার বলদেব সিং—দেশরক্ষা (৫) আর-কে-সন্মুখম্ চেটি—অর্থ (৬) ডক্টর বি-আর-আম্বেদকর—আইন (৭) ডক্টর জন মাথাই—রেল (৮) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—শিল্প ও সরবরাহ

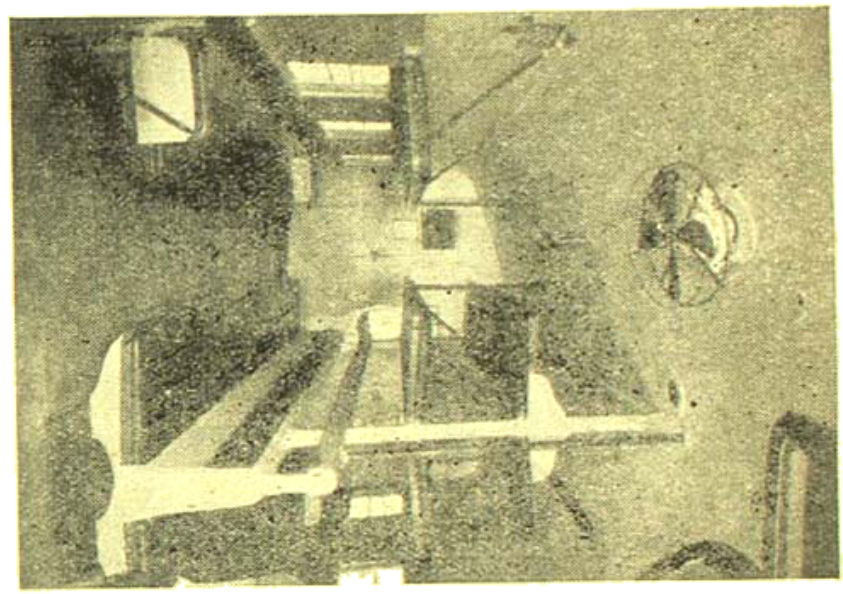

দিল্লীর এয়ারে—নূতন পরিকল্পনার মুক্তপরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ট্রেণ

(৯) মিঃ সি-এচ-ভাবা—বাণিজ্য (১০) মিঃ এন-ভি-গাড-গিল—পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ (১১) রফি আমেদ কিদোয়াই—চলাচল (১২) রাজকুমারী অমৃত কাউর—স্বাস্থ্য (১৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা (১৪) মিঃ জগজীবন রাম—শ্রম।

চট্টগ্রামে ভীষণ বন্যা—

চট্টগ্রাম বিভাগে ভীষণ বন্যার ফলে সমগ্র বিভাগের তিন পঞ্চমাংশ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা, পটিয়া, বোয়ালখালি, সাতকানিয়া, কাঞ্চনা, ধেমসা ও আলোমিয়ার ক্ষতি সাংঘাতিক। কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ৫ সহস্র গৃহের চিহ্ন-মাত্রও নাই। শুধু পটিয়ার বাজারে ৩ হাজার লোক আশ্রয় লইয়া আছে। চক্রশালা গ্রামে বেড় হাজার আশ্রয়-প্রার্থী সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংক্রামক পীড়া

দেবা দিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও অধিক হইবে।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ গত ২০শে আষাঢ় সন্ধ্যায় সম্মিলন স্থানে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক সভায় বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিককে সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমুদরঞ্জন আত্মভোলা মানুষ, স্তুতি-নিন্দার তিনি বাহিরে। তিনি মনের আনন্দে যে কাব্য রচনা করেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সর্ব্বোপরি তিনি পল্লীবাসী। কাজেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে কবির সুদীর্ঘ কর্ম্মময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা—

পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নলিখিতরূপ জাতীয় পতাকা স্থির হইয়াছে—পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হইবে—৩ ও ২। দণ্ডের সন্নিহিত অংশে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তৃত শ্বেতাংশ থাকিবে ও উহা সমগ্র পতাকার এক চতুর্থাংশ হইবে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ গাঢ় সবুজ বর্ণের হইবে ও সবুজের মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র ও একটি পঞ্চমুখী তারকা থাকিবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

১৩ই আগষ্ট মস্কোতে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রথম স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের দূতের কাজ লইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শদাতা মন্ত্রী মিঃ এ-ভি-পাই, সেক্রেটারী মিঃ প্রেমকৃষ্ণ, সাংস্কৃতিক অফিসার ডাঃ বিরেণ ঘোষাল, প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ টি-এন কৌল ও পাবলিক রিলেশন্স অফিসার কুমারী চন্দ্রলেখা পণ্ডিতও তথায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতি
পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি—

১১ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্থান গণপরিষদের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিঃ এম-এ-জিন্না গণপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরিষদে অস্থায়ী সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি হইয়া মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন যে, গভর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও যে কোন প্রকারেই হউক জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে নিরাপদ রাখা। আজ যে ব্যাপক উৎকোচ ও দুর্নীতি চলিতেছে উহা দমন করা হইবে। চোরা-কারবার ও আত্মীয়পোষণ বন্ধ হইবে। দরিদ্র জনসমাজের কল্যাণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। তিনি যে কোন

ধর্মেই বিশ্বাসী হন না কেন বা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন না কেন, তাহার সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

উপলক্ষে প্রার্থনা করি, তিনি সত্বায়ু হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।

তারকেশ্বর হিন্দু মহাসভার বিগত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অধিবেশন কালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত এন সি চ্যাটার্জ্জি

ফটো—তারক দাস

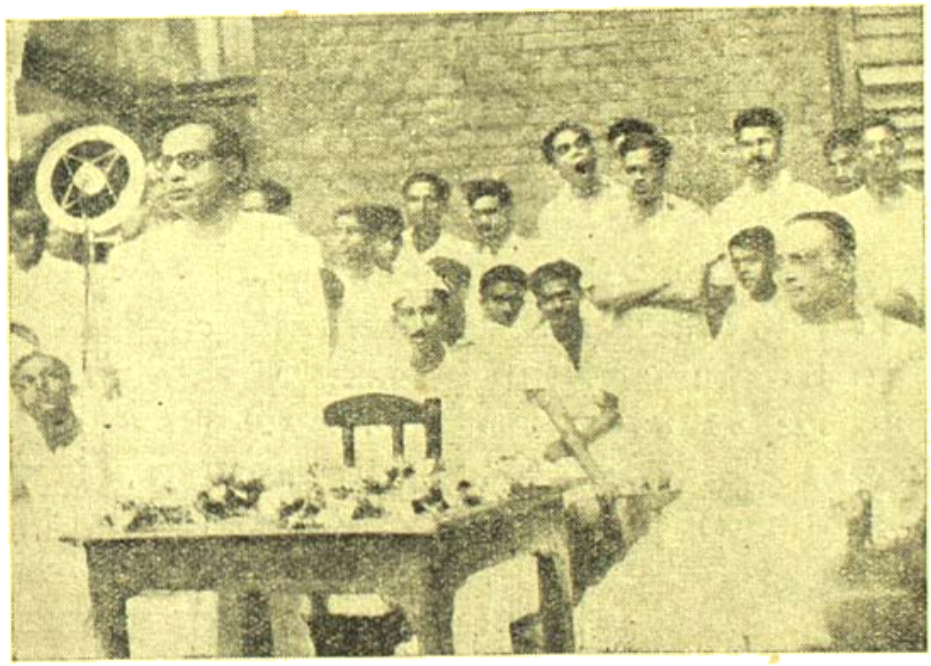

উত্তর কলিকাতার নববর্ষ উৎসবের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ফটো—কে-কে-সাক্তাল

সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সম্বর্দ্ধনা—

গত ৩রা শ্রাবণ খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৪০ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন তাহার প্রীতিকামী বন্ধুগণ সকলে তাঁহাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা এই

নেতাজী সুভাষ রোড—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৩ই আগষ্টের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে হ্যারিসন রোড হইতে হেয়ার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত (ক্লাইব ষ্ট্রীট, চার্চ্চএেস ও ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট) রাস্তার নাম 'নেতাজী সুভাষ রোড' করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লী যাওয়ায় তাঁহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু ঐ বিভাগের প্রথমারম্ভ হইতে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, দিল্লী, নাগপুর, লাহোর, আগ্রা, বোম্বাই, পাটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন।

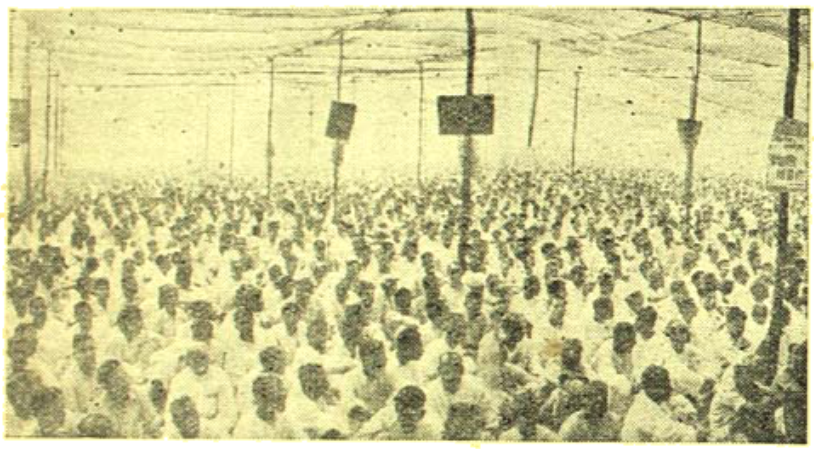

তারকেশ্বরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ
ফটো—তারক দাস

নিখিল ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ দিন নয়া দিল্লীতে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যে যে নূতন নূতন সৃষ্টি ও ভাবধারার প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার সহিত সর্ব্ব প্রদেশের সাহিত্যিকদের সম্যক পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আমরাও এরূপ একটি সম্মেলনের প্রয়োজন স্বীকার করি।

সম্মেলন বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। ইহার কার্য্যকরী সমিতিতে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি আছেন দিল্লী প্রবাসী শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ মহাশয়। তিনি আমাদিগকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে বহু সাহিত্যিকের ঠিকানা না জানা থাকায় সম্মেলন তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে পারেন নাই। সম্মেলনে যোগদান করিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহারা যদি ১নং ওল্ড মিল রোড, নিউ দিল্লী এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত দাশের সহিত পত্রালাপ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালী সাহিত্যের জন্য যে সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা যেন বাঙ্গালী পায়, সে বিষয়ে সাহিত্যিকগণকে অবহিত হইতে শ্রীযুক্ত দাশ অনুরোধ করিয়াছেন।

আক্রান্তাক্রান্ত মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী ৯ই আগষ্ট শনিবার সকালে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে আসিয়াছিলেন। ২ দিন বিশ্রামের পর তাঁহার নোয়াখালি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধির ফলে তিনি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কলিকাতায় বিভিন্ন পল্লী পরিদর্শন করেন ও স্থির করেন যে তিনি কয়েক দিন কলিকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এক পল্লীতে বাস করিবেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী গান্ধীজির সহিত একই গৃহে বাস করিয়া গান্ধীজির এই কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্মত হন। তাঁহারা বেলিয়াঘাটার নবাব আবদুল গণিপরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতেছেন।

সীমা কমিশনের রায়—

১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব রাত্রি হইতে কলিকাতায় হিন্দুমুসলমানের মিলিত শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। মুসলমানগণ দলে দলে পথে বাহির হইয়া হিন্দুদের সহিত স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে ও নিজেরাও উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছে। বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ, মহাত্মা গান্ধীর জয়, আল্লা হো আকবর প্রভৃতি রবে বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে কলিকাতা সহর মুখরিত হয়। শুক্র, শনি ও রবি তিনদিন ধরিয়া অবিরাম সে উৎসব চলে। সোমবার মুসলমানপর্ব্ব ঈদ উপলক্ষে হিন্দুরাও মুসলমানদের উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ করিয়াছে। সেই আনন্দের মধ্যে ১৮ই জুন সকালে সীমা কমিশনের রায় প্রকাশিত হয়। ভাগাভাগির সময় কোন বিচারকই উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।

কাজেই হয় ত কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই। তথাপি বলিতে হয়, সীমা কমিশনের সভাপতি সার সিরিল রাডক্লিফ যে রায় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। তিনি বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—বাঙ্গালা—পূর্ব্ববঙ্গ পাইয়াছে—পুরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহি বিভাগের রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহি ও পাবনা জেলা সম্পূর্ণভাবে ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের সম্পূর্ণ খুলনা জেলা। পশ্চিম বঙ্গ পাইয়াছে—পুরা বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগের পুরা জেলা—কলিকাতা, ২৪পরগণা ও মুর্শিদাবাদ এবং রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং জেলা। তাহার পর নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি ৫টি জেলা ভাগ করিয়া উভয় দেশকে কিছু অংশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নদীয়া জেলার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে—খোকসা, কুমারখালি, কুষ্টিয়া, মীরপুর, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাংনা, দামুর হুদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর ও মেহেরপুর থানা এবং দৌলতপুর থানার মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব্বাংশ। যশোহর জেলার মধ্যে মাত্র বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা দুইটি পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে ও বাকী সকল অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে—রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোবধাণ্ডি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ থানা এবং বালুরঘাট থানার উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রেল লাইনের পশ্চিমের অংশ। দিনাজপুরের বাকী অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার মাত্র তেঁতুলিয়া, পাটগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানা ও কুচবিহার রাজ্যের দক্ষিণের কিছু অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে—বাকী সমগ্র জেলা পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে। মালদহ জেলার সোনতাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভূলাঘাট থানা পূর্ব্ববঙ্গে ও বাকী অংশ পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার ৪টি থানা—পাথরকান্দী, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ ও বদরপুর—আসাম প্রদেশের মধ্যে আছে—জেলার বাকী সকল অংশ পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আসাম প্রদেশের আর কোন অংশ পূর্ব্ববঙ্গে আসে নাই।

সীমা কমিশনের নির্দ্দেশমত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে গিয়াছে—পুরা মুলতান ও রাওলপিণ্ডি বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা ও শিয়ালকোট জেলা। পূর্ব্ব পাঞ্জাব পাইয়াছে—পুরা জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা। লাহোর বিভাগের গুরুদাসপুর ও লাহোর জেলা উভয় দেশের মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

বেদনা বিরহ কাঁপে যৌবন দুয়ার,
কাঁদে দুখে ভাগীরথী সকরুণ সুর।
যৌবনশ্রীহিতা কাঁদে আঁখি তারা ম্লান,
এলোমেলো সব যেন জলধারা গান।
নির্দ্দয় নিমাই কিন্তু বিজ্ঞানের বাণ
প্রতিপলে হৃদয়ের করে সন্ধান।
রক্তাক্ত পরাণ পাখী আর্ত্তনাদ করে,
অলক্ষ্যে শোণিত বিন্দু নিঃশেষিয়া ঝরে।
সার্থকতা বাঁধি নামে তারে বিষ্ণুপ্রিয়া,—
স্বামী পরিত্যক্তা নারী, অদৃষ্টের জিয়া!

হতাশার অন্ধকারে সবল জলধি,
সোপনে গহনে বক্ষে কোরে নিরবধি।
আশাদিত জীবনের সুখা স্মৃতি তার,
রচিয়াছে তার লাগি ক্ষুদ্র কারাগার।
আশার পূরবী মৌন পথহারা সুর,
প্রিয়ের সন্ধানে আঁখি মেলে চলি দূর।
ধৈর্য্যের অভাব তিক্ত প্রচুরের মাঝে,
অন্তরে বেদন করে মিথ্যা প্রতি কাজে!
বিচ্যুতা লতিকা দুঃখে লোটে ধরাতলে—
ব্যর্থকাম পূজারিণী আঁখি ছল ছল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৮সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকান ও বৃটিশ টেনিস খেলা ঃ

আমেরিকান ন্যাশনাল লন টেনিস টুর্ণামেণ্টের আউট-ডোর প্রতিযোগিতা ১৮৮১ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। আর ডি সিয়ার্স ১৮৮১-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সাত বছর সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে রেকর্ড করেন। এর পর উইলিয়াম টি টিলডেন ১৯২০-২৫ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ছ'বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ পান। এবং তাছাড়া ১৯২৯ সালেও তিনি চ্যাম্পিয়ান হ'ন। মেয়েদের সিঙ্গলস টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮৮৭ সাল থেকে। পুরুষদের ডবলসের খেলা ১৮৮১ সালে এবং মেয়েদের ১৮৯০ সালে প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুরুষদের ইন-ডোর ডবলস ও সিঙ্গলসের খেলা ১৯০০ সালে এবং মেয়েদের সিঙ্গলস ১৯০৭ সাল এবং ডবলসের খেলা ১৯০৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকান টেনিস 'Rankings' এ পুরুষদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন আর ডি সিয়ার্স ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত। এর পর উইলিয়ম টি টিলডেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯২০-২৯সাল পর্য্যন্ত পুরুষদের সিঙ্গলস 'Rankings' তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

মেয়েদের 'Rankings' তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। ঐ বছর মেরী কে ব্রাউনী শীর্ষস্থান লাভ করেন। 'আমেরিকান লন টেনিস এসোঃ চ্যাম্পিয়ানস' প্রতিযোগিতায় মহিলা এবং পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলস যথাক্রমে ১৯১৭ এবং ১৯২৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। 'ইলিংস মেন'স সিঙ্গলস ও ডবলস চ্যাম্পিয়ানস' খেলার সূচনা হয়েছে যথাক্রমে ১৮৭৭ এবং ১৮৭৯ সাল থেকে। প্রথম কয়েক বছর ইংরেজ টেনিস খেলোয়াড়দেরই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল কিন্তু পরে পৃথিবীর সকল দেশের টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য এই প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত হয়। মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলসের খেলা যথাক্রমে ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালে প্রথম আরম্ভ হয়।

ডেভিস কাপ ঃ

লন টেনিস জগতে 'ডেভিস্ কাপ'এর নাম সারা পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় Hon. Dwight Filley Davis তাঁর নামে এই 'ডেভিস কাপ' দান করেন। ইউ এস সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতি-যোগিতায় ডেভিস দু'বার রাণার্স আপ্ হয়েছিলেন এবং এইচ ওয়ার্ডের জুটিতে তিনবার ডবলস বিজয়ী হন। ১৯২০ সালে তিনি ইউ এস ক্যাবিনেটে যুদ্ধের সেক্রেটারী হন। ১৯২৯ সালে ফিলিপাইনের গভর্ণরের পদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে ৮৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। প্রথম কয়েক বছর ইংলণ্ড এবং আমেরিকা, মাত্র এই দুটি দেশের খেলোয়াড়রা 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ক্রমশঃ যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৮ সালে ৩৪টি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। গড়পড়তায় প্রতি বারে ২৫টি দেশ আন্তর্জাতিক 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৫-১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪০-১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। আমেরিকা ১৯০৪, ১৯১২ এবং ১৯১৯ সালে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম বছর, ১৯০০ সালে আমেরিকা ৪-০ গেমে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে

পরাজিত করে। এ পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে আমেরিকা ১৩ বার, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—৫ বার, গ্রেট বৃটেন—৪ বার, অষ্ট্রেলিয়া—৭ বার, ফ্রান্স—৬বার। পর্য্যায়ক্রমে ডেভিস কাপ পেয়েছে সব থেকে বেশী আমেরিকা ৭ (১৯২০—১৯২৬), তারপর ফ্রান্স—৬ (১৯২৭—১৯৩২), অষ্ট্রেলিয়া—৫ (১৯০৭—১৯১১), গ্রেট বৃটেন—৪ (১৯৩৩—১৯৩৬), বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—৪ (১৯০৩—১৯০৬)।

হুইটম্যান কাপ ঃ

পুরুষদের আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা বলতে যেমন 'ডেভিস কাপ' তেমনি মেয়েদের 'হুইটম্যান কাপ'। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব ন্যাশনাল সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মিসেস লাজেস চেটচিক্স হুইটম্যান এইমনোরম কাপটি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের বাৎসরিক টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দান করেন।

গ্রেট্ট টেনিস খেলোয়াড় ঃ

মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে মিসেস হেলেন উইলস মুডী পৃথিবীর টেনিস মহলে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে শীর্ষ স্থান অধিকার করে থাকবেন। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন টেনিস খেলায় যোগদান করে তিনি যে রেকর্ড করে গেছেন তা অতিক্রম করা খুব সহজ নয়।

পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকারী ডোনাল্ড বাজের নাম টেনিস জগত থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। বাজ টেনিস খেলায় যে সব রেকর্ড ক'রে গেছেন তা ভাঙতে অনেক দিন লাগবে। তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে ভাইন্সের সঙ্গে খেলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ, ফ্রেড পেরী, ভাইন্স অষ্টিন, কোসে, ব্রমউইচ, পুনসেক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা : ১৭৫ ও ১৮৪

ইংলণ্ড : ৩১৭ (৭ উইঃ ডিক্লে) ও ৪৭ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে যথাক্রমে ১০ উইকেট এবং ৭ উইকেটে পরাজিত করে।

২৬শে জুলাই লিডসে ২০,০০০ হাজার দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়লাভ ক'রে খেলা আরম্ভ করে। খেলার সূচনা শুভ হ'ল না, দলের মাত্র এক রানে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম উইকেট পড়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের মোট ১৭৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। দলের উল্লেখযোগ্য রান করলেন বি মিচেল ৫৩ এবং ডি নোর্স ৫১। ইংলণ্ডের বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন বাটলার ও এডরিচ। বাটলার ২৮ ওভার বল ক'রে ১৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৩৪ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেলেন। এডরিচ পেলেন ৩টে উইকেট ১৭ ওভার বল করে ৬টা মেডেন নিয়ে এবং ৪৬ রান দিয়ে। কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড প্রথম দিনের খেলার শেষে প্রথম ইনিংসে ৫৩ রান ক'রে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড সারা দিনব্যাপী ব্যাট ক'রে ঐ দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ৩১৭ রান তুলে। এল হাটন ১০০, সি ওয়াসব্রুক ৭৪ এবং ডবলউ এডরিচ ৪৩ রান ক'রে আউট হ'ন।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলণ্ড আর ব্যাট না ক'রে প্রথম ইনিংসের উইকেটে ৩১৭ রানের উপরে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের থেকে ১৪২ রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। এবারও খেলার সূচনা ভাল হ'ল না। দলের ৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ল। দ্বিতীয় উইকেট পড়ল ১৬ রানে। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা অনেকখানি আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় স্কোর বোর্ডে দেখা যায় ৩ উইকেটে তাদের ১০৩ রান উঠেছে। ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটন মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরের বল এক হাত দিয়ে চমৎকার লুফে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক এ ফেলডীনকে আউট করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৪ রানে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ করলেন ডি নোর্স ৫৭। ১৪০ মিনিট খেলে ৮টা বাউণ্ডারী ক'রে তিনি মোট রান তুলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে দ্বিতীয় ইনিংসে এই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইংলণ্ডের বোলার বাটলার এবং ক্র্যানষ্টোনের বোলিং সাফল্যের জন্য।

ক্র্যানষ্টোন দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ চারটে উইকেট পেয়েছিলেন ৬টা রান ক'রে কোন রান না দিয়ে। তিনি সর্ব্বসমেত ৭ ওভার বল ক'রে ৩টে মেডেন পান এবং বিপক্ষকে মাত্র ১২টা রান করতে দেন। বাটলার ২৪ ওভার বল ক'রে মেডেন পান ৯টা আর ৩২ রান দিয়ে উইকেট পান ৩টে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন ২৬টা বল ক'রে মাত্র ১২ রান দিয়ে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৩ রান তোলার জন্য ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ৪০ মিনিট খেলার পর কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড ৪৭ রান তুলে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ১০ উইকেট জিতে যায়।

পৃথিবীর ক্রিকেট রেকর্ড ঃ

১৯০৬ সালে ইংলণ্ড এবং সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (Tom Hayward) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৬১ ইনিংসে ৩,৫১৮ রানের পৃথিবীব্যাপী রেকর্ড দীর্ঘ ৪১ বৎসর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যে ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল আজ ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় বিল এডরিচ তা অতিক্রম ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছেন বলে সকলেই আশা করছেন। এ বছরের ক্রিকেট মরসুমে এডরিচ ২৬ ইনিংসের খেলায় ইতিমধ্যে ২,৩১৫ রান তুলে ফেলেছেন। বাকি ১,২০৪ রান তুলে নতুন রেকর্ড করতে তাঁর হাতে এখনও প্রায় ৫।৬ সপ্তাহ রয়েছে। পৃথিবীর ক্রিকেট মহল উদগ্রীব হয়ে তাঁর খেলার দিকে চেয়ে আছে।

জো লুই ঃ

পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা জো লুইকে হারিয়ে কেউ আর পৃথিবীর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপের সম্মান তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারছেন না। নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে জো লুইকে বহু মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গেই লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত অপরাজিত হয়ে আছেন। নিজ সম্মান রক্ষার জন্য তিনি আর কতদিন এই ভাবে লড়াই করবেন তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে ক্ষুরধার ক্রীড়াবিদ জো লুই খুব তাড়াতাড়িই উত্তর দেন 'Just three more fights and then I quit in 1948 if I am still undefeated.

পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ঃ

মস্কো রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, রাশিয়ার 'Strong man' Grigori Novak পৃথিবীর ভারোত্তলন ইতিহাসে আর একটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি দীর্ঘাকৃতি ভারোত্তলন বীর ৩০৬ পাউণ্ড ১০ আউন্স দু'হাতে মিলিটারী প্রেসে উত্তোলন ক'রে পৃথিবীর পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

• • • •

আমেরিকার Cynthia Thompson জর্জ্জটাউনে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলার মহিলাদের ১০০ গজ দৌড় ১০·৮ মিনিটে শেষ করে ১৯৪৪ সালে হলাণ্ডের F. C. Blankers koen কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ডের সঙ্গে সমান ক'রেছেন।

ব্রিটিশ রেকর্ড ঃ

গ্লাসগো রেঞ্জার্স বার্ষিক স্পোর্টসে এ্যালেন প্যাটরসন (বৃটেন) এবং ডিসি (আমেরিকা) উভয়েই ৬ ফিট ৭½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে আধ ইঞ্চির ব্যবধানে পূর্ব্বের 'বৃটিশ হাইজাম্প' রেকর্ড ভেঙ্গেছেন।

• • • •

উইমেনস এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় মিস এম লুকাস ১১৯ ফিট ৯ ইঞ্চি দূরত্বে 'ডিসকাস থ্রো' ক'রে গত বৎসরে প্রতিষ্ঠিত নিজের ১১৭ ফিট ৪ ইঞ্চির বৃটিশ মহিলা রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

• • • •

হার্ডল রেসে ২০ মিটার দূরত্ব মিস এল গার্ডনার ১১৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "টিক্‌টিকি ও চড়াই"—২৲
শ্রীঅশোককুমার মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "সবই যখন অন্ধকার"—১৲
শ্রীরাজমোহন নাথ-সম্পাদিত "তুলোধনের গীত"—৸৹
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসুধাংশুচন্দ্র জানা অনূদিত "গীতা-বোধ"—১৲
শ্রীচন্দ্রেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীশ্রীনবি-পূজা ও কথা"—৵১০
অনিলচন্দ্র রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অনুপমাণি"—১৷৹
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রণীত "বৃটীশ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিল কেন ?"—৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

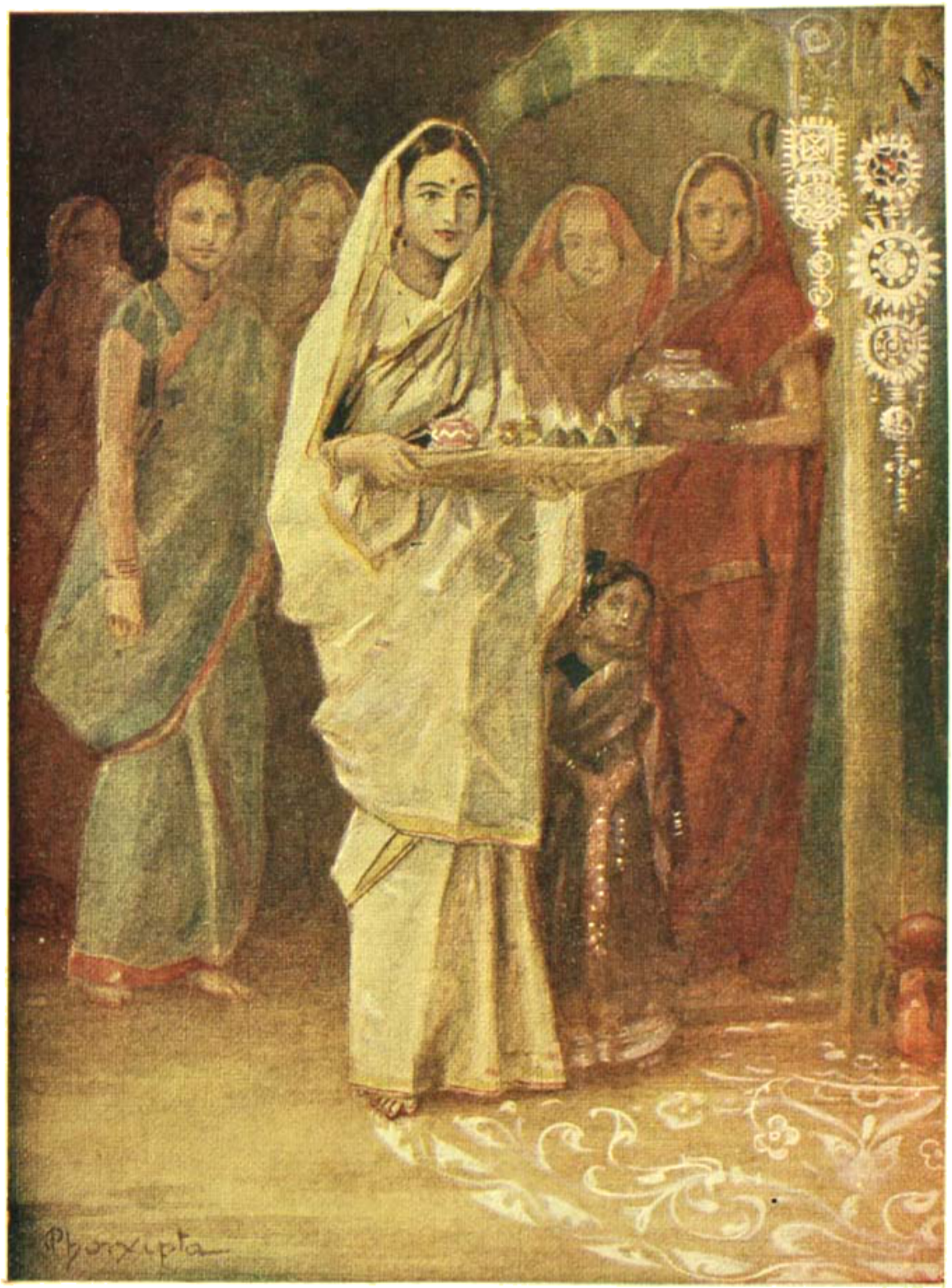

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভানু গুপ্ত　　বরণডালা　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

(১)

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। মুসলমান দেশ শাসন করিতেছিল। সেদিন তাহারা তৃতীয় পক্ষের প্রশ্রয়-প্ররোচিত, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ ভীষণতম অত্যাচারে দেশে নোয়াখালির সৃষ্টি করিত না বটে, কিন্তু অত্যাচার ছিল। দেশে তৃতীয় পক্ষ বলিতে কেহ ছিল না। তথাপি দেশ যেন একটা অনবচ্ছিন্ন রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্য দিয়াই পথ চলিতেছিল। বাঙ্গালার লোভনীয় সম্পদ দেশ বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই রাজপথও নিরাপদ ছিল না। এমন কি গৌড়ের স্বর্ণ-সিংহাসনের মাণিক্যজ্যোতি, রাজভৃত্য—পুর-রক্ষক হাবসিগণকেও উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজাবরোধের শুদ্ধান্তঃকক্ষে রাজমুণ্ড লইয়া তাহারা যেন পেণ্ডুয়া খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিল। ইহার বিষাক্ত প্রভাব রাজধানী হইতে দূরে বঙ্গ পল্লীর দুর্ব্বল দেহেও এক সংক্রামক বিসর্পের সৃষ্টি করিয়াছিল। উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত রাজবন্ধগণ অধিকাংশেই ছিল—কুশাসক, নিষ্ঠুর শোষক, দুর্নীতিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অলস, বিলাসী, ব্যভিচারী। ইহারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। সদাচার পালনে, চিরাচরিত ধর্ম্মাচরণেও ইহারা বাধা দিত। মন্দির লুণ্ঠন করিত, দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিত, লোচনলোভন ভাস্কর্য্যমণ্ডিত দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই উপকরণে মসজিদ নির্ম্মাণ করিত। সুন্দরী যুবতী হিন্দু নারী শান্তিতে সংসার করিতে পারিত না। দেশের সর্ব্বত্রই একটা আতঙ্ক, একটা অনিশ্চয়তা, একটা ভাঙ্গাজড়িত বিমূঢ় ভাব। বিবরণী—প্রায় যবনাংশে বর্ব্বর কুশাসকের দুঃশাসনশাসিত সে কালের বাঙ্গালার এক দিকের ইহাই সংক্ষিপ্ত চিত্র।

অন্যদিকে সমাজ দেহও সুস্থ ছিল না। সমাজের

শীর্ষস্থানীয়গণের মধ্যে এক পক্ষ,—পদস্থ রাজকর্মচারীগণের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন পূর্ব্বক অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও ভোগ্য বিলাস ব্যসনে জীবন যাপনই মাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিত। অপর পক্ষ অপ-প্রয়োজিত অসহযোগের দুর্ব্বাবরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গ লুক্কায়িত রাখিয়া এক দুর্গন্ধ পঙ্কিল বন্ধনালয় জাতির শেষ-শয্যা রচনা করিতেছিল। অর্থহীন আচারের কঙ্কালালিঙ্গনে দেহ ক্ষত-বিক্ষত, নাস্তিকা-বুদ্ধি প্রণোদিত নীরস বিদ্যাচর্চ্চার মিথ্যা দম্ভে মস্তিষ্ক বায়ুগ্রস্ত, অথচ অসহনীয় ঔদ্ধত্যের অন্ত নাই। কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইলেও, তাহার নিম্নাবরণ যেমন অরক্ষিত, কোমল ও অনায়াসভেদ্য, সমাজের নিম্নস্তরের অবস্থা ঠিক তদনুরূপ ছিল। সমাজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ধমনী ছিল না। সমগ্র দেহে শোণিত সঞ্চালনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ দিন দিন নির্জ্জীব হইতে নির্জ্জীবতর হইয়া আসিতেছিল। শাসক ও সমাজ এই দুই দিকের নিষ্পীড়নে এবং রাজজাতিত্ব লাভের তুচ্ছ প্রলোভনে সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী হয় নির্ব্বংশ হইতেছিল, অথবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছিল। এমনই দিনেই শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

বিটপচ্যুত পুষ্পরাশি কোন অভ্যস্থ হস্তের সুনিপুণ গ্রথনে যেমন মনোহর মালাদামে রূপান্তরিত হয়, তেমনই বাহিরের দুর্দ্দান্ত সংঘাতে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, সমাজ বন্ধনহীন, পথহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট বাঙ্গালী, মহাপ্রভুর প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইয়া একটা জাতিরূপে বিকাশলাভ করিল। সেন রাজত্ব অবসানের পর হইতে তিন শত বৎসরের পরাধীনতার প্রাবনে বাঙ্গালী জাতি হারাইয়াছিল। জাতির মোহ ছিল, কিন্তু জাতিত্বও ছিল না, জাতীয়তাও ছিল না। মহাপ্রভুর কণ্ঠোদ্গীত মানবতার উদাত্ত আহ্বান বাঙ্গালায় নবযুগ আনিয়া দিল। তাঁহার মানব দুঃখে বিগলিত অশ্রু ধারায় শতাব্দী সঞ্চিত অজ্ঞানতমঃ কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার প্রেম মন্ত্রে উজ্জীবিত জাতির জড়িমা কলুষ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার করুণা-রসায়ন বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত করিল। মহাপ্রভুর পদরেণুপবিত্র বাঙ্গালার শ্যামলতলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। বাঙ্গালী বিস্ময়-নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিল—অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপ্রাকৃত প্রেম, অপার্থিব করুণা, অলৌকিক রূপ এক অপরূপ লাবণ্য-বল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সঙ্গে তাঁহার অভিন্ন হৃদয় সুযোগ্য সহযোগী অক্রোধ-পরমানন্দ প্রেমোদ্দাম শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া তাহাদের ঘেরিয়া দাঁড়াইল, রাজপুত্র ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ করিল, পণ্ডিতের বিদ্যাভিমান গেল, ক্ষমতাশালী রাজন্যগণ পথের ভিখারী হইল। অধম-পতিত-দুর্গত, চরিত্র-মহাত্ম্যে সর্ব্বজন-বন্দনীয় হইয়া উঠিল। ব্যক্তির সে কি আত্মোন্নতি, জাতির সে কি অভ্যুদয়। বিধর্ম্মী প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমাজের সে কি প্রভাব। শৈব শাক্ত সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম সংস্কারে অবহিত হইলেন। গ্রামে গ্রামে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বিষ্ণু মন্দির, শিব মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিষ্ঠাদি ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠানে, সমাজের আনুগত্য স্বীকার ও জাতির সেবায় পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের অনুগতগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চরিত্রে ও সদাচারে, নরনারীকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। মনুষ্যত্ব সমাদৃত হইল, সজ্জন মাত্রেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পূজা পাইতে লাগিল। সম্প্রদায়ে বৈদ্য প্রাধান্য থাকায় এবং কুল-ধর্ম্মানুসারে জীবিকার্জ্জনে গৌরববোধ জাগ্রত হওয়ায় বৈদ্যগণ ভবরোগের সঙ্গে দেহরোগ নিবারণেও মনোনিবেশ করিলেন। এক কথায় দেহে ও মনে বাঙ্গালী নূতনরূপে গড়িয়া উঠিল। অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হওয়ায় ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালা নিষ্কলুষ অন্তরে যুক্তকরে তাঁহার অন্তর দেবতার উদ্দেশে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে বন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিল—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালার জন্মগত। স্মরণাতীত কাল হইতে স্বাধীনতার সাধনায় বাঙ্গালী দুষ্কর তপস্যা করিয়া আসিতেছে। যাহারা বলে, সপ্তদশ তুরস্ক অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, তাহারা মিথ্যা কথা বলে। বাঙ্গালা জয় করিতে তুর্কীদের বহুদিন লাগিয়াছিল। সেন

রাজবংশধরগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বহুদিন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ভৌমিকের সুতীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহার কথা সর্ব্বজনবিদিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে চণ্ডীচরণপরায়ণ দনুজমর্দ্দনদেব—রাজা গণেশের গৌড় সিংহাসনে পদার্পণ, বাঙ্গালীর সাধের স্বপ্নকে সফল করিয়াছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন অনতিকালেই ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালার আশা আকাঙ্ক্ষা আবার অন্য পথে আত্মপ্রকাশ করিল। সেই প্রকাশ স্বয়ং মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে না গিয়া রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমান্তরালে সমাজ সেবায়, জাতিগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার জন্য মানবের যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাঁহার আচরণ ও প্রচারণে তাহা বহুলাংশে সুসিদ্ধ হইল। বাঙ্গালা ধীরে ধীরে একটা জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন মুখ্যতঃ মহাপ্রভু যে রাধাঋণ পরিশোধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বিশ্বের সর্ব্বমানবের প্রতিনিধিরূপে সেই ঋণভার মাথা পাতিয়া লইয়া তিনি অঋণী হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব মানবের দ্বারে দ্বারে গিয়া চির-অনর্পিত প্রেম বিতরণ পূর্ব্বক তিনি সেই প্রেম পরিশোধের পথ দেখাইলেন। কেমন করিয়া আপনি আনন্দে বিভোর হইয়া অপরকে আনন্দ দান করিতে হয়, বোধ হয় মহাপ্রভুই তাহার পথ প্রদর্শক। লোকে এতদিন মাত্র ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণের কথাই জানিত, তাহারই কথা চিন্তা করিত। কিন্তু এই রাধাঋণ, আনন্দেরঋণ পরিশোধের কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল। অথচ ইহারই জন্য তাহার যুগ হইতে যুগান্তরের পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা, ইহারই জন্য তাহার গ্রীষ্মে বর্ষায় বসন্তে শরতে সুকঠোর তপস্যা! এই আনন্দামৃতই তাহার চরমতম ও পরমতম কাম্য। ইহারই সুধায়, ইহারই পিপাসায় সুদুর্গম মরু-গিরি লঙ্ঘনেও মানুষ পশ্চাদপদ হয় নাই, ভয়াল অরণ্য সে হেলায় পার হইয়াছে। অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছে। পথে কত যাত্রী প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি যাত্রার শেষ নাই। মানব চলিয়াছে, আজিও চলিতেছে।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নহে। এ সাধনা বীর্য্যবানের সাধনা। পতিত মানবকে আহ্বান করিয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন—আইস, আমায় স্পর্শ কর, আমিও কৃতার্থ হই, তুমিও কৃতার্থ হও। ক্লেদ ক্লিন্ন কর্দ্দমাক্ত মানবকে বক্ষে টানিয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন আইস, আমার, অশ্রুধারায় স্নান কর, তোমার সর্ব্ব গ্লানি অপগত হউক, তোমার সর্ব্ব গ্লানি বিধৌত হউক। তেমনই তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তৃণের ন্যায় সুনীচ হও, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হও, অমানীকে মান দাও এবং শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ কর। তৃণের ন্যায় সুনীচ হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, তুমি অকারণে অন্যের পদদলিত হইবে। তৃণাদপি সুনীচের অর্থ—তোমার সদা সুস্থ আচরণের কোমল তৃণাস্তরণ যেন সংসার যাত্রাপথে অন্যের যাতায়াত স্বচ্ছন্দ করিয়া দেয়। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে, অর্থাৎ কুঠারাঘাত সহিয়াও তরু যেমন ছায়া ও ফলদানে কার্পণ্য করে না, তেমনই তুমিও সর্ব্বাবস্থায় আঘাতকারীকেও দয়া বিতরণ করিবে। তুমি নিজে বৃথা আত্মাভিমান—অর্থাৎ বিদ্যা, ধন, জাতি কুলাদি সর্ব্বপ্রকারের অভিমানশূন্য হইলেই তোমার নিকট অমানী বলিয়া কেহ থাকিবে না। আজিকার দিনে এই সমস্ত কথা অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করিবে। কিন্তু ইহাই মানবধর্ম্ম, অন্ততঃপক্ষে ইহাই সর্ব্বমানবের ধর্ম্ম হওয়া উচিৎ। এই ধর্ম্মের গতি অতি গহন। কোথায় কোন্ আচরণের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, কোথায় অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার উচিত নহে, কেমন অবস্থায় আততায়ীকে আঘাত না করিলে আত্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে, এই সমস্ত বিষয় উপদেশের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। যে সমস্ত বীর সাধক এই ধর্ম্মের সাধন করিবেন, সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে সুনির্ম্মল বিবেকই তখন তাহাদের পথ নির্দ্দেশ করিবে। যাহা সত্য, যাহা মানবধর্ম্ম, মূলতঃ তাহা এক হইলেও, শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন হইলেও, দেশ কাল পাত্রভেদে তাহার প্রকাশ ও বিকাশের ভঙ্গি পৃথক। সুতরাং সত্যের আচরণেও পার্থক্য থাকিবে।

মহাপ্রভু আপনার ভক্তগণের মধ্যে এক একজনের আচরণের দ্বারা এক একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও ব্রহ্ম হরিদাসের চরিত্রে যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের যে সাধনার কথা বর্ণিত আছে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এবং

ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে তাহারই কিয়দংশ সুবিকশিত হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে, গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূপাতিত করিয়াছে, তথাপি প্রহ্লাদ কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করে নাই। শত প্রলোভনে—এমন কি মৃত্যুভয়েও তাঁহার বিবেক বিচলিত হয় নাই। ইহা কবি-কল্পিত কাহিনী মাত্র নহে, জগতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ইহা সত্য। যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, হৃদয়ে ভগবানের অপ্রমেয় প্রেমের দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই আচরণ যে স্বতঃসিদ্ধ, ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে সেদিন আর একবার এই সত্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। পশুর অপেক্ষাও হিংস্র, ধর্মান্ধ পিশাচের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া মৃতকল্প অবস্থাতেও তাঁহার অমৃতময়ী নিষ্ঠা জীবন্ত ও অমর ছিল।

(২)

মহাপ্রভু তিরোহিত হইলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও একে একে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। সে ত্যাগ, সে তপস্যা, সে নিষ্ঠা, সে প্রেম আধারের অভাবে ধীরে ধীরে বিলীন হইতে লাগিল। সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিল। আবার সেই সিংহাসন-লাভের ষড়যন্ত্র, ক্ষমতাস্পৃহা, অর্থলোভ, বিলাস লালসা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, জাতির জীবন বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর স্মৃতিভ্রংশ হইল। আকাশ জুড়িয়া দুর্য্যোগের ঘনঘটা, গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকার বাঙ্গালাকে আবৃত করিয়া ফেলিল। যে রণদুর্ম্মদ জাতির অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয় বৈজয়ন্তী বাঙ্গালার সান্ধ্যগগনে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, নিশি দ্বিপ্রহরে তাহা অস্তাচলমূলে চলিয়া পড়িল। এক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বণিকজাতি রজনীর অন্ধকারে পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গালার রাজদণ্ড অপহরণ করিল। কয়েকজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, বিদেশী বিশ্বাসঘাতকের সহায় হইল। একদিন তুর্কী প্রথমে দিল্লী জয় করিয়া বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল, আজ বিদেশী, বিশ্বাসঘাতক বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীও জয় করিয়া লইল। বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকের দল সারা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াফেলিল।

এ জাতির আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের উন্নততর সাহিত্য ছিল, দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছিল। সুশিক্ষিত সুনিয়ন্ত্রিত যোদ্ধৃদল এবং সুপ্রথর মারণাস্ত্র ছিল। আর সেই সঙ্গে তথাকথিত সুসভ্য পরিচ্ছদে ইহাদের বহিরাবরণ যেমন ছিল সুপরিচ্ছন্ন, অন্তরে ছিল তেমনই সাধারণের দুরধিগম্য অপরিসীম ধূর্ত্ততা। সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরের চেষ্টায় মুসলমান যাহা করিতে পারে নাই, মাত্র শতাব্দীর শাসনেই ইহারা তাহাতে সফলকাম হইল। ইহারা বাঙ্গালার তথা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে প্রায় অনায়াসেই জীর্ণ করিয়া তুলিল। কেমন করিয়া জানি না, আমাদের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, উহারা সর্ব্বপ্রকারেই উচ্চ এবং আমরা উহাদের তুলনায় সর্ব্ব বিষয়েই হীন। আমরা আহারে বিহারে, পোষাকে আষাকে, চলনে বলনে সর্ব্বরকমে তাহাদের অনুকরণ করিতে লাগিলাম। এদিকে বণিকের কৌশলপূর্ণ শোষণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাঙ্গালা অধিকার করিল। অজ্ঞ জনসাধারণ ইহাই বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়তি মনে করিয়া অকালে যমভবনে যাত্রা সুরু করিয়া দিল। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

তাহার পর কেমন করিয়া কি ঘটিল, সেকথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ, বাঙ্গালার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বাঙ্গালীর আন্দোলনে সারা ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ, সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য, অরবিন্দ, বৃটিশের অমানুষিক নির্য্যাতনে পরাধীনতার দাবদাহে, হৃদয়ের অসহনায় জ্বালায় ভারতের পথপ্রদর্শক বাঙ্গালীর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ, ফাঁসি, নির্ব্বাসন, কারাবরণ, সুসভ্য বৃটিশের স্বরূপ প্রকাশ, বীভৎস নিপীড়ন যেন চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অকস্মাৎ ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন গান্ধীজী।

কবে গান্ধীর মন্ত্রপ্রাপ্তি, কে তাঁহার দীক্ষাদাতা, কোথায় তাঁহার সাধনভূমি, সিদ্ধিক্ষেত্র, সে সমস্ত আলোচনা না করিয়াও একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে ভাবজগতে মহাত্মাজী শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীমহাপ্রভু যে ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ, মহাত্মাজী সেই ভাব-প্রবাহেরই ধারক, বাহক ও প্রচারক। আধার ভারতীয় এবং আধেয়ও ভারতীয় না হইলে সমগ্র ভারত গান্ধীজীর ভাবে এমন করিয়া মাতিয়া উঠিত না। পৌরাণিক প্রহ্লাদের সাধনাই মহাত্মাজীর জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যে সাধনা মহাপ্রভুর করুণায় ব্যক্তির জীবনে সার্থক হইয়াছিল, সত্যসন্ধ মহাত্মাজী তাহা জাতীয়-জীবনে—ব্যাপক ভাবীর সাধনায় প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সঘন-সংকীর্তনে নবদ্বীপের কাজি বিজয়ে যে ভাবের অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়াছি, মহাত্মাজীর বহু আন্দোলনে—বিশেষ ডাণ্ডী অভিযানে তাহাকেই শতশাখ বনস্পতিরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। কৃশকায় কৃপাকুকর মহামানব—ভারতের অর্দ্ধনগ্ন ফকির যষ্টিমাত্র সম্বল লইয়া নবল সত্যাগ্রহের জন্য একাকী পথে বাহির হইয়াছেন। পশ্চাতে আতঙ্কিত আত্মীয়স্বজন, সমুদ্রপারে অন্তর্জাতি সবরমতীর অনুগতগণ, দক্ষিণে কৌতূহলী দর্শকের ছদ্মবেশে সিংহভাগ-গ্রহণের জন্য ওৎ পাতিয়া উপবিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বামে ভারতের ধীরবুদ্ধি নরমপন্থী হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টাগণ, আর সম্মুখে পৃথিবীর অন্যতম গণনীয় শক্তি বৃটিশ, তাহার সর্ব্ববিধ মারণাস্ত্র ও কূটিল চক্রান্ত জাল বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান। গান্ধীজীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পথে পদক্ষেপ করিলেন; অকস্মাৎ এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই কৃশতনু কৌপীনসম্বল সন্ন্যাসীর পদভরে আসমুদ্র ভারত উদ্বেলিত হইল। এক, দুই, তিন,—ঘরছাড়া পথিকের পদশব্দে ভারতের জনহীন পথ মুখর হইয়া উঠিল—শুধু কি একবার—গঙ্গারিষ্টসানু হিমাদ্রির উপত্যকা হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বার বার আমরা এই আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গান্ধীজী রাজনীতিকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দেশে এইকালে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। ভারতে যাঁহারাই রাজনীতি চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঋষিকল্প মনীষী। প্রাচীন ভারতে ঋষিরাই রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। অর্ব্বাচীনকালেও চাণক্য, হরিষেণ, গর্গদেব, ভবদেব ভট্ট, এমন কি হলায়ুধ পর্য্যন্ত সেই ধারাই প্রবহমান ছিল। মহাত্মাজীর বৈশিষ্ট্য রাজনীতিকে তিনি সত্য ও অহিংসার অভিনব শ্রীসৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন। সত্য ও অহিংসা—এক কথায় প্রেমই তাঁহার রাজনীতির প্রাণ। পশ্চিমের ক্ষাত্রবীর্য্যে প্রমত্ত পরস্বলোলুপ বণিকজাতি, নব নব আণবিক সংহারাস্ত্রের আবিষ্কারে যখন সমগ্র পৃথিবীকে ত্রস্ত ও চকিত করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের এই মহামানব—নবযুগপ্রবর্ত্তক এই ঋষি তখনো আপন ধর্ম্মে অবিচলিত আস্থা প্রকাশপূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করিতেছেন।

হিংসার পরিবর্ত্তে প্রতিহিংসা—মুণ্ডের বদলে মুণ্ডের গ্রহণ যাহাদের মূলমন্ত্র, গান্ধীর মহিমা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কিন্তু তাহারা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবী হইতে হিংসা পাপ দূরীভূত না হইলে মানবের কল্যাণ নাই এবং প্রতিহিংসা এই পাপ দূরীকরণের পন্থা নহে। কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে, কি ব্রহ্মদেশে মানুষ আজ পশুর স্তরে নামিয়া গিয়াছে, বুঝিবা পশুরও অধম হইয়াছে। এই পশুত্ব অপগত না হইলে মানবের শ্রেয় লাভের উপায় কি?

ভগবান আছেন এ কথা যেমন সত্য, তাঁহাকে না জানিলে মানবের মঙ্গল নাই, একথাও তেমনই সত্য। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রেয় লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানকে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। প্রভু, সখা, পুত্র, প্রাণপতি—অধিকার ও রুচি অনুসারে, ইহার যে কোন একটী ভাব গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও, সিদ্ধি তোমার অবশ্যম্ভাবী। বিস্তীর্ণ মানব সমাজ এই ভাবের সাধনক্ষেত্র। মানুষকে যে সম্বন্ধের ডোরে, প্রীতির বাঁধনে বাঁধিতে পারিল না, সে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে কিরূপে? জীব ভগবানের নিত্যদাস এই জ্ঞানে তাহার সেবা করিতে হইবে। প্রেম ভিন্ন এই জ্ঞানের উদয় হয় না। যে প্রেমহীন—যাহার জীবে দয়া নাই, ভগবানের নামে রুচি নাই, বিষ্ণুর আপনার জন—বৈষ্ণব জ্ঞানে সর্ব্বমানবের সেবায় যাহার স্পৃহা নাই, তাহাকে তো মানব নামে অভিহিত করিতে পারি না। জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন—মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই মন্ত্রই মহাত্মাজী নূতন করিয়া প্রচার করিতেছেন। মন্ত্রের যুগোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গত ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনার ভারতীয় ধারার কথাও উল্লেখ করিতে পারি। অন্তরের যে নিষ্ঠা, যে পবিত্র মধুর দৃষ্টিভঙ্গী ও আকুল আবেগ লইয়া মানব ভগবানের উপাসনা করে, সেই নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও আবেগ যদি দেশের, জাতির, তথা মানবের উপাসনায় প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তির সাধনা জাতির জীবনে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলেই পৃথিবীর কল্যাণ হইবে।

যে শিক্ষায় ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির—ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সমন্বয় ঘটে না, তাহা শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে, কুশিক্ষা। আবার যে শিক্ষায় ইউরোপের সর্ব্বনাশা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে, যে শিক্ষায় জাতি অথবা সম্প্রদায়কে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহাও বিষবৎ পরিহরণীয়। পরাধীনতার সন্তসৃঙ্খলমুক্ত যে জাতিকে জীবন গঠনের জন্য বর্ণপরিচয় হইতে পাঠ সুরু করিতে হইবে, জাতীয়তাবাদ, অথবা মানবতাবাদ, কোন্ বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ আছে। কোন বিষয় লেখনীমুখে প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু তাহা জীবনে আচরণে সমস্যা আছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহীর করণীয়ের পার্থক্য আছে। এইরূপ অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল ধর্ম্মেরই সাধন পদ্ধতি আছে, জীবনে তাহার আচরণ করিতে হয় এবং আচরণে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সঙ্কট সৃষ্টি করে। গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংসাও এইরূপ একটী ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম সবলের ধর্ম্ম। যথোপযুক্ত মনোবল না থাকিলে এ ধর্ম্মের আচরণে বিপদ ঘটিতে পারে। আর ভগবদ্ বিশ্বাস না থাকিলে এ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভেরও কোনই আশা নাই। বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের দিনে এ ধর্ম্ম হয়তো মানুষের মনঃপূত হইবে না। মহাত্মাজীর তিরোধানের পর হয়তো এ ধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য অবনতও হইতে পারে, এমন কি বাহ্য দৃষ্টিতে হয়তো ইহার বিলুপ্তির আশঙ্কাও দেখা দিবে। তথাপি একথা ধ্রুব সত্য যে, ইহাই অমৃত, ইহার বিনাশ নাই। এই ধর্ম্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, বিশ্বমানবের চরম ও পরমতম ধর্ম্ম। পৃথিবীর অধিকাংশ মানবকে একদিন এই ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ধর্ম্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবনে সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই তিনি অন্তরের অন্তস্তলে নোয়াখালি পরিক্রমণের প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। নোয়াখালির ঘটনা যেমন ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব, মহাত্মাজীর নোয়াখালি পর্য্যটনও তেমনই ইতিহাসের অজ্ঞাত। ইহাপেক্ষা হিংস্র শ্বাপদ-সমাকুল ভয়াল অরণ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ অতিশয় অনায়াসসাধ্য ছিল। নোয়াখালীর উৎপীড়িত আর্ত্তের ব্যথিত হাহাকার তাঁহাকে এতই বিচলিত করিয়াছিল, যিনি বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসের নিয়ামক, বুঝিয়া তাঁহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র রচনার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অজ্ঞাতসারেই নোয়াখালি আসিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় গান্ধীজীর জীবনেতিহাসে নোয়াখালিই শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়।

পরিপূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করা সহজ কথা নহে। তাহার রূপও সর্ব্বত্র নয়নাভিরাম নহে। সত্য আবির্ভূত হইয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানব ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, আবার অনেকেই তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রকাশে বাধা দিয়াছে, এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি পুরাতন। মহাত্মাজী যে দিন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন—প্রকাশ দিবালোকে বিশ্বজন রাজপথে দাঁড়াইয়া এই কটিবাসপরিহিত কর্ম্মযোগী যে দিন সুস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি, সেদিন তাঁহাকে গ্রহণের অসংখ্য বাধার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা ছিল বৃটিশভীতি। তাঁহারই বাহুদণ্ড প্রভাবে সে ভীতি অতি দ্রুত অপসৃত হইতেছিল, আজ তিনিই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছেন। আশা করি অপরাপর যত বাধা, অনতিবিলম্বে সেই সমস্তও নিশ্চিহ্ন হইবে এবং এইবার আমরা তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিব। গান্ধীজীর বাণী—ভারতেরই মর্ম্মবাণী। এই বাণী পৃথিবীর সর্ব্বমানবের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠুক, শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি পৃথিবী হইতে হিংসা বিদূরিত হউক। মহাত্মাজীর সাধের সাধনা সার্থকতা লাভ করুক।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠোঁটফোলানো ছোট্ট ছেলের গোঙানীর মত সারা রাত ধরে অতন্দ্র আকাশের ওপরে ওপরে কান্না আর থামতে চায় না। এক ঘেয়ে একটানা টিপ্ টিপে বৃষ্টির সুর।

আধোজাগ্রত ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠে রাসমণি—অ্যাঁ, ঐ কাঁদচে না—ভয়ে আঁতকে সে ঠেলা দেয় তাড়ির তাড়ায় হতচেতন-ভবহরিকে—তার সুপুষ্ট উচ্ছিষ্ট যৌবনের নবতম রসিক মালিক—তিন তরফা কষ্টিবদলের জোরে হাতবদলী ঘরণী স্বত্ত। কে শোনে কার কথা।

চোখ রগড়ে উঠে বসল রাসমণি, ছেলের কুপোটা আলগে, তারপরে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলে—ছোট ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে কিনা—

আধা-বয়সী ভবহরির উঠন্ত ভুঁড়িটা নাকের ডাকের সঙ্গে তাল রেখে উঠছে আর নামছে, তার দিকে চেয়ে রাসমণি বিতৃষ্ণায় কঠিন হয়ে ওঠে, মনে একটা বিরাট্ অজগরের সর্পিল নিঃশ্বাস তাকে কুৎসিৎ লেহন করছে, আশ্চর্য্য হয়ে যায় রাতের পর রাত এধেরি হাত ধরে আবার ভাঙা ঘর মন জোড়া দিয়ে গাড়ি জমাতে চেয়েছিল সে। ঘন দুধ খাওয়ার পর পিটুলি গোলা জল গেলা আর কি, হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

হঠাৎ রেগে সজোরে ভবহরিকে নাড়া দিয়ে বলে—এমন ঘুম-কাতুরে নেশাখোর লোক দেখিনি বাপু বাপের জন্মে।

অতিকষ্টে চোখ মেলে চায় ভবহরি, হাত ধরে টেনে বলে—কি হলো এতো রাত্তিরে, ঘ্যানর ঘ্যানর কেন?

আস্তে আস্তে রাসমণি জিজ্ঞেস করে—শুনতে পাচ্ছো? কী—খুলেই বল না।

কান্না—

চটে ওঠে ভবহরি—কান্না আবার কোথায়, ও কিছু নয়, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ—

না, না, রাত তিন পহরে পাগলামীর আর জায়গা পেলে না—ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে, শ্যামের বাঁশি বাজতে না বাজতেই, এখন আর ঢং পীরিতির সময় নেই, মিলের ম্যানেজার সাক্ষাৎ কিছু ভাই সম্বন্ধী নয়।

মৌজ করে পাশ ফিরে সে নাক্ ডাকাতে সুরু করলে।

তন্দ্রাহত রাসমণি চুপ করে বসে থাকে, তার মনের ভিতর কি রকম করছে—নিশ্চয় খোকা কাঁদচে।

অস্থির হয়ে উঠে পড়ে সে, দাঁড়িয়ে দরজা একটু খুলে নিরন্ধ্র ধারাভূল অন্ধকারের মাঝে দেখতে চেষ্টা করে, দূরে পার্কের পাশে তিনতলা বাড়ীর একটা বড় কামরা থেকে নীলচে আলোর ক্ষীণ আবছা আভা আসছে কিনা। নাভের মধ্যে শুধু বড় বড় জলের ফোঁটা তীক্ষ্ণ তীরের মত বেঁধে তার ক্ষত বিক্ষত উন্মুক্ত দেহটাকে। ব্যাপারটা হচ্চে বস্তীর ও ধারে বড় বাড়ীর সেজবাবুর মেজ ছেলের অসুখ—সে আজ পার্কে বেড়াতে গিয়ে শুনে এসেছে।

বিকেল বেলা ঠেলা গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে, সে শুনতে পেয়েছিল বুড়ী ঝিমলি বলে চলেছে—বাঁচে কিনা সন্দেহ, সারাদিন কাঁদচে, বৌটারও কি নাকাল, অতি বড় শত্রুরেরও যেন ও রকম রোগ না হয়।

লক্ষ্মীঝি মেজ বৌরএর খাস ঝি, বেশ গোদিয়ানী চেহারা, বলে—অনেক কিছু ডাক্তার ওষুধ, মানত মাদুলী গিন্নীমা ত করলেন্, কপালে নেই, কাজের কিছু হলো না—

ঝাঁমিয়ে ওঠে ঝিমলি—রেখে দে তোর কপাল, কালে কালে কতই দেখলুম্, কচি খুকী নই, পাপ। পাপ—বড়লোক মনিব বাড়ীর নিন্দের লক্ষ্মী অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে পেছন ফিরে

শ্যামার দিকে চেয়ে বক্র—গিন্নিমা কুষ্ঠি দেখিয়েছিলেন দুষ্ট শনির দৃষ্টি পড়েছে, আচার্য্যি ঠাকুর বলেন, ডাইনীতে চোখ দিয়েছে, তা না হলে আর অমন্ রাজপুত্তুরের মত ছেলে—

মুচকি হেসে বিমলি বলে—ডাইনীই বটে, তবে সেটা সেজবাবুর পেছনে, বাঘে যোগিনী, অমন্ রূপসী বিদুষী বউ, দুধে আলতা রং, দুর্গা পিতিমের মত চেহারা, তারও রং কালি করালি। প্রথমটিত ঐ রকমেই গেল—পেঁচোয় পেয়ে, ষাট্ ষাট্ বাছারে—এটাকেও বিবে শুবে খাচ্ছে!

লক্ষ্মী চটে ওঠে—বড্ড নিন্দুক তুমি মাসী, বড়ঘরের মান ইজ্জত রেখে কথা বলতে পারো না—কাজ কি বাপু

এখন মুরকাটুরে মেশাখোর লোক মেশি বি বাপু বাপের জন্মে

কথায়। দেখেছিস্ ত শ্যামা, ছেলের ভাতের সময় সে কি ঘটা, সাত দিন ধরে খেয়ে পেটের ব্যথায় মরি।

তা আর দেখিনি দিদি, বড় বাড়ীর বড় কাণ্ড কি সুন্দর মানিয়েছিল হারটায়। ছেলেটাকে দেখলে কিন্তু কান্না পায় দিদি, কি কষ্টটাই না পাচ্ছে।

বিমলি ছাড়বার পাত্রী নয়, ফোড়ন দেয়—শাশুড়ী মাগীও তেমনি, সারাদিনই বউএর পেছনে খিটি খিটি, ছেলে যে বারমুখো তা আর নজরে পড়ে না, ভাবটা বউ কেন বাঁধতে পারে না ছেলেকে।

রাসমণি তার চার্জের ছেলেটিকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে এগিয়ে আসে, আঁচল খুলে একখিলি জরদা-দেওয়া পান দেয় বিমলিকে, জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ মাগী, কি হয়েছে গা সেজবাবুর ছেলের।

আর সবাই কলকাতার পোড় খাওয়া, চোখ্ টেপা-টিপি করে। বিমলি মুখ ঘুরিয়ে বলে—থাম্ ছুঁড়ি, নিজের চরকায় তেল দে, কতদিন গা ছেড়ে এসেছিস্, গলা টিপলে দুধ বেরোয়—

শ্যামা হেসে বলে—ভরহরি এখন বেশ সেরেছে—বেশ ভাল পান তো, গিন্নীর ডাবর থেকে সরিয়েছিস্ বুঝি—

হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওপরের দিকে তাকায়, ছোট্ট ছেলের সমস্ত শেষ শক্তি নিংড়ে নিয়ে গলা ফাটানো সে কী করুণ কান্না। তার সাথে কান্নাভেজা মিহি গলায়—মর, মর তুইও জুড়ো, আমিও জুড়োই। সঙ্গে সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠী শাশুড়ীর তারিকি ধমক্—রোগা ছেলের গায়ে হাত—এমন্ রাক্কুসী মাকেও বলিহারি, কি অপয়া বউই নিয়ে এসেছিলাম সংসারে, জ্বালিয়ে খেলে, ঝাড়ু মারি নেকাপড়া শেখা মেয়েকে।

মাগী বিমলিও চুপ মেরে যায়, শুধু থেকে থেকে বলে—ষাট্ ষাট্ বাছারে।

চুপি চুপি শ্যামাকে বলে—বৌটাও ফুঁপিয়ে কাঁদচে না? শুনতে পাচ্ছিস্? হে মা তারা, মেয়েজাতের কি পেরাণ!

হঠাৎ দামী মোটরের হর্ণে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। ট্যালবট্ হাঁকিয়ে সেজবাবু নৈশ অভিযানে বেরিয়ে গেলেন, গন্ধ ছড়িয়ে। শ্যামা বলে—সেজবাবুর মোটর, ঐ যে রোগা ছেলে কোলে সেজ বউও জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে, সেজবাবুর বিকেলে বেরুনোর সময় মোটরের হর্ণ শুনলেই ওর বারন্দায় এসে দাঁড়ানো চাই।

রাসমণি হাঁ করে চেয়ে দেখে—দুটো কঠিন চকমকির যেন ঠোকাঠুকি, আর ছেলেটা—কি নলি নলি হাত পা, প্যাকাটির মত সরু, সাদা ফ্যাকাশে চেহারা, চোখের পাতায় পাতায় ঘা—ঘুকঁছে।

পাঁচবাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী, ছেলেমেয়ে, বউ ঝির মুখ-রোচক্ খবর নেওয়া দেওয়ার আসর আর জমল না। না জমল গল্প ছোকরা চাকরগুলোর সঙ্গে, শুধু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী শ্যামা ও বাড়ীর খাস্ খানদামা রামুর সঙ্গে কি

যেন ইশারা করে বজ্রে হেসে দুলে। রাসমণি 'থ' হয়ে বসে রইল, কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

রাসমণি 'থ' হয়ে বসে রইলো

শ্যামা ফিরে এসে ঠেলা দিয়ে বল্লে—এই রাসমণি। আবার কার ধ্যানে বসলি লো, মেঘ জমেছে আকাশে, সবাই চল্ল যে।

চমক্ ভেঙে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। একটা অজানা শিশুর একটানা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে ভাসচে।

পোয়াটাক্ দূরেই তার মনিব বাড়ী গিয়েই ছেলেটাকে নামিয়ে সে গিন্নীমাকে বল্লে—বড্ড শরীরটা খারাপ লাগছে মা।

একটু সাবধানে থাকিস্ বাছা এ সময়ে, তা বাড়ী যাবি ত যা—সকালেই আসিস, কিন্তু ওরে থাকিসনি যেন। একটু আচার নিয়ে যাস্ বুঝলি? ভাল লাগবে মুখে। বলেই পাশের বদ্ধ ননদকে বল্লেন—শুনেছো ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বাড়ীর এ ছেলেটাও বুঝি বাঁচে না, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। হরিনামের মালা মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুরঝি চুপ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। রাসমণির বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে লাগল—তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল বাসার দিকে। বাসায় গিয়ে নিজের দাওয়ায় বসে হাঁফাতে লাগল।

ভজহরি তখনও ফেরেনি। মনে মনে সে মানত করে—ভজহরি আর যেন না আসে। দূরে সন্ধ-নিভে-আসা আলোর শেষ রেশ বড়বাড়ীর তিনতলার দেওয়ালে রক্ত রাঙা। অশরীরী কিছু যেন একটা ঘটছে সেখানে, বুঝতে পারছে না রাসমণি। নাল আলো জ্বলে উঠল, চকচকে একখানা বড় মোটর এসে দাঁড়াল, হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীর সরকার গোসাইজী নামলেন—হাটকোটপরা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে। হাতে ওষুধে বস্তরে ভরা ব্যাগ। শুধু মিত্তির বাড়ী ছাড়া সবকটা বাড়ীতেই শাঁঝের শাঁখ বেজে উঠল। রাসমণি আকুল হয়ে মানত করে—যেমতর কল্যাণ হোক্, ছেলেটিকে ভালো করে দাও ঠাকুর। চোখের সামনে ফুটে ওঠে একটা রুগ্ন শিশুর ব্যথাকাতর ডাগর চোখের অসহায় দৃষ্টি, পাশে সারা বিশ্বের অবিশ্বাস ও হতাশ নিয়ে তারি বয়সী অতি বড় রূপসী একটি শুকনো মায়ের মুখ, চোখে মুখে জলের রেখা।

এক বছর আগে বানের রাতের কথা রাসমণি কোন দিন ভুলতে পারে না। সেদিন আকাশের কি ভেঙে পড়া কাতরতা। মত্ত সাগরের উন্মত্ত নর্ত্তনের মাঝে দুর্দ্দম দোলায় দুলতে দুলতে রুদ্ধ অভিশাপের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে এগিয়ে এসেছিলেন মরণের দেবতা—সে কী রূপ, ধবধবে, বিরাট—মাথাটা গুলিয়ে যায় যেন—ভাবতেই পারে না, সব কিছু খুইয়ে, সব কিছু হারিয়ে সে এখনও বেঁচে, আর তাও ওই হিংস্র মথর সহরে—উঃ, না ছেলেটা কাঁদচে না?

হারাণী সেদিন সত্যই মেরেছিল। মানুষটার কি আকেল, জোয়ান্ মরদ, ঘরে ও আমাশয় ভুগে কঙ্কালসার, তিনদিন উপোষের পর না খাওয়া না দাওয়া কড়কুটি মাথায় করে চল্লেন কিনা ভিনগাঁয়ে কীর্ত্তনের আসরে। কীর্ত্তনের নামে লোকটা যেন পাগল হয়ে যেত। সত্যিই তার মত খোল-বাজিয়ে ও তল্লাটে আর কেউ ছিল না। খোল যখন বোল দিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, তখন মনে হোত দুহাত তুলে জয় গোবিন্দ বলে হেমকান্তি গৌরতনু নদের নিমাই নেমে এল।

বুকটা মুচড়ে উঠল রাসমণির—জাত বোষ্টমের মেয়ে সে—গৌরবিনোদ বাবাজীর আখড়ায় এক জমাটী কীর্ত্তনের

আসরেই তার প্রথম রসের কলি ফুটেছিল। তার বয়সই বা কতো, সবে সতেরো, ছিপছিপে তন্বী, গদাইএর বেটা ভীম তখন ভীমই ছিল বটে—সুন্দর সুঠাম চেহারা, চল চল স্বাস্থ্য ও যৌবন। বুড়ো বাবাজী দেখে শুনে বলেছিলেন —রাধারাণী কৃপা করলেন দেখছি, গৌর হে সবই তোমার কৃপা।

চুপ করে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। কালো অন্ধকার—দেখা যায় না কিছু—ঐত কাঁদচে না। টস্ টস্ করে জল পড়ে চোখ বেয়ে তার।

কী দিনই গেছে, ভীমের দরাজবুক, জোয়ানদিন, সবল পেশী, মুখর ভালবাসা—আর আজ, ভজহরির মত মনে ও দেহে রুগ্ন রোগাক্রান্ত মানুষগুলো—গা যেন ঘুলিয়ে ওঠে তার। হঠাৎ জাঁতকে ওঠে সে—বিমলির কথা মনে পড়ে—ওই রকম রুগ্ন ছেলে যদি তার কোলে এসে থাকে—না, না. কিছুতেই পারবে না সে।

ষোটে ছবছর আগের কথা, বাড়বাড়ন্ত ঘর, ক্ষেত-খামার, জোৎস্নারাত—গোয়ালভরা গাই বলদ—কোলভরা ছেলে—ছেলে! তার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে, শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে ওঠে গা। তারপর অন্নদা, বেনা, রোগ, মহাজন, ডিক্রী, ক্রোক, যুদ্ধ, মন্বন্তর, বান—বান—ছেলে—সব ডুবে গেল। জিনিষ থেকে মানুষ অবধি, মনুষ্যত্ব থেকে সততা পর্য্যন্ত, ছেদ পড়লো প্রাণের ধারায়—সে বেঁচে থাকে আজো—আশ্চর্য্য!

সারাদিন পরে ঝড়বৃষ্টি মাথায় দুর্য্যোগঘন ভর রাতে যখন ভীম বাড়ী ফিরেছিল তখন রাত অনেকটা এগিয়েছিল। রেড়ির সিদ্ধিটা গিছল নিভে—কোলের ছেলেটা মায়ের শুকনো বুকে দুধ না পেয়ে এলিয়ে পড়েছে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে। বাইরে আকাশে বাতাসে জলে সে কী মাতামাতি মিতালী। ভীমের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রাসমণির শুধু রাগটা গিছল ফুরিয়ে, মুখের 'রা' সে কাড়েনি। অমুখর মৌন অভিমানে শুয়ে পড়েছিল স্বামীর পাশে।

ভীম ভেবেছিল—নাঃ রক্ত রেগেছে আজ, রাগবারই কথা। শুধু তার গায়ে হাতটা রেখেছিল সে।

ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল রাসমণি।

শেষ রাতে সে কী জলের তোড়, বাইরে কি গোঁ গোঁ শব্দ; 'ওঠ ওঠ' ভীম বলে—বান নেমেছে।

চালের উপর উঠেছিল তারা পুঁটলিপাটলা নিয়ে, চারদিকে অথই জলের রাজত্ব।

চালটা ছিটকে চলল বানের স্রোতে, অন্ধকারে লাগল একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা। কোলের ছেলেটা জলে পড়ল টাল সামলাতে না পেরে।

'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাসমণি।

'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাসমণি

নাড়ী ছেঁড়া প্রথম সন্তান—উঃ মাগো! শির শির করে ওঠে গা।

তাকে ধরতে গিয়ে ভীমও গেল তলিয়ে মহা-বন্যার রাঙা জলে।

হায় ভগবান, সত্যই কি তুমি ছিলে, না আজও আছো।

একটা ঘোর কান্নার শব্দে বর্ত্তমানে ফিরে এলো রাসমণি—কাঁদচে, কে, কারা কেন কাঁদচে? এবারে আর ভুল নেই, ঠিক শুনেছে সে, আশ্চর্য্য ভেতর থেকে ভজহরির নাকের ডাকও বেশ শোনা যাচ্ছে। মা, মাগো! অসহ্য—পেটের নাড়ীগুলোও বুঝি মোচড় দিচ্ছে—বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে—এতদিনের সব কিছু অশুচি অজাত—

থাকতে পারলে না রাসমণি, বেরিয়ে পড়ল ঘোড়ে বস্তি বেয়ে রাসবিহারী এ্যাভিনিউর দিকে। পার্কের পাশে

বড়বাড়ীর তিনতলার নীল আলোটা কিছু পরে নিভে গেছে, শুধু একটা গুমরে ওঠা চাপা কান্নার সুর—খোকা, খোকারে, মাণিক্ আমার।

রাসমণি এগিয়ে চলল—নিশিতে পাওয়া তিমিত। ঢং ঢং করে তিনটে বাজল—তীরবেগে একটা মোটর ছুটে গেল—নেশাজড়িত কণ্ঠে সেজবাবুর গলা—হটো হট্ যাও—।

রাসমণি কিন্তু আর ফিরল না।

সহজ শিক্ষা

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সহিত আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেরও দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে রেডিও, এরোপ্লেন ও এ্যাটম বোমএর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান যুগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

অধুনা আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তনশীল বিভিন্ন পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সহজ ছন্দে চলিতে না পারিলে, গণতান্ত্রিক সমাজের জনসাধারণের নিকট আমাদের ইট, কাঠ, টেবিল, চেয়ার অনুষ্ঠিত এই বিরাট শিক্ষাসৌধ শুধু বিস্ময়ের নহে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। অগ্রগামী দেশের নেতারা তাঁহাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছেন।

সুখের বিষয় এই যে হিমগিরির দুর্ব্বারদুর্গ অতিক্রম করিয়া আমাদের দুয়ারেও আজ নূতন যুগের আহ্বান বার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা এখন এক যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপার নহে। পরিবর্ত্তন জগতে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতনকে বরণ করা চলিবে না। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এখন আর কোনও বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির সহিত আপনা হইতেই সখ্যতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের মায়ামন্ত্রে, আমাদের একান্ত অজ্ঞাতসারেই এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। তাই জনসাধারণের মধ্যে সহজ উপায়ে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কবির ভাষায় আমাদের শিক্ষার বাহন এতদিন চারি ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ীতে চড়িয়া প্রশস্ত রাজপথ কাঁপাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। গাড়ীর পিছনে উর্দ্দীপরা হুকুমবারি সহিস্ ক্রমাগত হাঁকিয়াছে, হট্ যাও, হট্ যাও। ভীত, নম্রস্থ, পথচারি মূঢ় বিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিরাট শিক্ষা সকট গলি ঘুঁজির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার গৌরবেই জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। এরূপে কালবিলম্ব না করিয়া এই বিপুল জনসাধারণের প্রতি এখন দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইহাদের শিক্ষার সহজ ও সুখবোধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শিক্ষাপদ্ধতি স্কুল, কলেজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক পথে চলিবে না। ইহা জনসাধারণের স্বীয় আবেষ্টনের মধ্যে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শুভ অবসর মুহূর্ত্তে আপন প্রাণধারায় সিক্ত হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তবে কি সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাদের সুখস্থান, কক্ষচ্যুত হইয়া বাজারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে? আমরা বলিব, ক্ষতি কি? সক্রেটিস্ দর্শনশাস্ত্র স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া মানব সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। অ্যারিস্টটল দর্শন, বিজ্ঞানকে স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া যারোয়ারীর আটচালায়, ক্লাবে, পাঠশালায় ও রেস্তোঁরায় হাজির করিয়াছে।

পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিলে চলিবে না। স্কলার ও জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে জনসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ; পণ্ডিত বা স্কলার পাঠকরা ১০ জনও নহেন। স্কলার একটি বা দুইটি বিষয়ে জানিতে চাহেন অনেক, কিন্তু অনেক বিষয়ে বুঝিবেন কম। অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সচেতন জনসাধারণ সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের অল্প কিছু জানিতে চাহেন এবং বুঝিবার অনুভূতি শিক্ষিতের অপেক্ষা কম নহে। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে এই সহজাত অনুভূতিকেই অকৃত্র "অশিক্ষিতপটুত্ব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই "পটুত্বের" সুযোগ লইয়া বয়স্ক জনসাধারণের informal educationএর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু একাদশ, চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিলেই গণ-শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইল—একথা মনে করা ভুল। 'Education is a life long process' গণ-তন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের সামাজিক জীবনযাত্রার সহিত একরাতে মিলিত করিতে হইবে। "for the great majority learning is a social activity." সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চাহে না ও এই শিক্ষার উপযুক্তও নহে। এই শিক্ষার অভাব প্রকৃত

অভাব নহে বলিয়া সমাজের নিকট ইহার জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দিবারও প্রয়োজন নাই।

বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক জনশিক্ষায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ। সামাজিক আচার ব্যবহারের পার্থক্যই এই প্রভেদের কারণ। কিন্তু ইহার মূলনীতি সর্ব্বত্র এক। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা সিলেবাস থাকিবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যসূচক ভীতিপ্রদ নামের উল্লেখ থাকিবে না। যে কোনও সামাজিক প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ আলোচনা চলিতে পারে। মাতৃভাষাই এই আলাপের বাহন হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলা চলে :—

সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সামান্য সেলাইএর বুননের মধ্যে বীজগণিত ও অঙ্কশাস্ত্রের বহুতথ্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজ কোনও বিজ্ঞানবিদ বা শিক্ষাবিদ পণ্ডিতের চোখে এই সেলাইএর সাইকোলজি, থেরাপি ও educational value ধরা পড়ে নাই। তাই যখন সেলাই নিপুণা কোনও ইংরেজী অপরার মার্কের প্যাটার্ণের সুখ্যাতি করেন, তখন দ্বিতীয়া প্রথমাকে মাত্র প্যাটার্ণটি বুনিবার কৌশল দেখাইয়া দেন। প্রথমার বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না; প্যাটার্ণটি তখনই তুলিয়া ফেলেন। কিন্তু এই সামান্য জিনিষের এডুকেশন্যাল ভ্যালু ধরা পড়িলে কি বিভীষিকার সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সেলাই তখন 'এডুকেশন্যাল নিটিং'এ পরিণত হইবে। দ্বিতীয়া তখন প্রথমাকে বলিবেন,—প্যাটার্ণটি ভাল ভাবে শিখিতে হইলে তোমাকে নিম্ন আফ্রিকার মরুপ্রান্তর আর্ট একাডেমির ইভনিং ক্লাসে যোগদান করিতে হইবে। সেখানে পুরাপুরি বারটি লেক্চার শুনিতে হইবে: তিনটি লেক্চার সেলাই শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, তিনটি মনস্তত্ত্বের, চারিটি সেলাইএর বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, একটি অঙ্কন ও আর মাত্র একটি হাতে কলমে সেলাই। সেবেরউইতে ফেল করিলে কোনও অসুবিধা নাই—কেবল নম্বর বোধ হইবে না। প্রথমবার সমস্ত উৎসাহ, আগ্রহ উবিয়া যাইবে।

ধরুন, ক্লাবের রেডিওটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী একজন মেকানিক আসিয়া যন্ত্রটি ঠিক করিয়া দিল। উপস্থিত সভ্যগণ স্বাভাবিক কৌতূহল প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রশ্ন সুরু করিলেন :—কি গোলযোগ হইয়াছিল? আপনি কি করিলেন স্যার? মেকানিকের উত্তর অতি সংক্ষেপ: সব কথা বুঝিতে গেলে প্রতি রবিবারে আমাদের ক্লাসে এ্যাটেণ্ড্ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্ত্তাদের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত কৌতূহল কিউড় হইয়া যাইবে।

উৎসুক জনসাধারণ ক্লাসে যোগদান করিতে চাহেনা। তাহারা তৎক্ষণাৎ রেডিও সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহে। এই সুযোগে বলা চলিত—রেডিও-যাদুকর ডাঃ মিত্রকে একবার আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনুন না কেন? তিনি এ সম্বন্ধে খুব ভাল গল্প বলিতে পারেন। বলা বাহুল্য এই যাদুকর হইবেন একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। বিশেষজ্ঞের মুখে বক্তব্য বিষয় গল্পে ও ছলে কৌতূহলের ভিতর দিয়া ক্লাবের আবহাওয়াকে মুখর করিয়া রাখিবে। কেননা, যিনি যে বিষয়টি সম্পূর্ণ করিবার করিয়াছেন তিনিই সেই বিষয়টি লইয়া যাদুমন্ত্রের উদ্রেক করিতে পারেন।

ধরিত্রী পরীর—বিশেষতঃ শ্রমিক অঞ্চলের সাধারণ পরিত্র হোটেল, চায়ের দোকান ও অন্যান্য রেস্তোরাঁগুলির নোংরামি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। পৌরসভা ও কর্তৃপক্ষ এগুলি পরিদর্শন করিয়া চলিবার নির্দ্দেশ জারি করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু চায়ের দোকান ও হোটেলগুলির আম্বেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই যে অপরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকাংশে দায়ী সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। নতছিন্ন, মলিন অয়েলক্লথ আবৃত ভাঙ্গা টেবিলের উপর নোংরা পেয়ালায় চা পরিবেশন করিলে, পরিবেশক ও ভোক্তা উভয়েরই হাত হইতে দু এক গলক চা টেবিলের উপর ক্রমাগত পড়িতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উপর চা-পানরত ভদ্রলোকদের কনুইএর গুঁতার আধিক্যিকতাও আছে।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে সাদা কাপড়ের টেবলক্লথের উপর পরিষ্কার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিলে সকলেই পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। খোলা মেঝের উপর উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু মেঝের উপর কার্পেট বা অন্য কোনও আস্তরণ বিছান থাকিলে সকলেই সতর্ক হইবেন। এইরূপে জনসাধারণের Informal শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল ফল হইবে।

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখিতে ভালবাসি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন মানবের আদর্শবাদকে রূপ, রস ও গন্ধে প্রাণবন্ত করিয়া আসিয়াছে। ভাবী ভারতের জন-শিক্ষার স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে। অনেকে ইহা নিছক স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু স্বপ্নও সত্য হয়। বন্ধুবর শ্রীঅশোককুমার, শ্রীচারুলাল এবং সমপর্য্যায়ভুক্ত আরও কয়েকজন visionary একটি ক্লাব গড়িয়া তুলিয়াছেন। সেখানে চা পান ও জলযোগের ব্যবস্থাও আছে। কোনওরূপ colour (collar?) bar নাই। উদ্যোক্তারা কেহ পরিচারক, কেহ waiter রূপে সকলের আগে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহকোণে রেডিও হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপ ভাসিয়া উঠিয়াছে। চাপানরত কোনও অতিথি হঠাৎ তাঁহার সঙ্গীতকে বলিলেন, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মনে হয় যেন সবই একরকম, কিন্তু ভাই, বাই বল, বেশ কসরৎ আছে—নয় নাপেনা।' এই শুভ মুহূর্ত্তটিতে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোককুমার সহে,—সঙ্গীতজ্ঞ অশোককুমার তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে তিনি বলিতে সুরু করিয়াছেন যে ভূপালীর মেজাজে পাঁচটি সুর লাগিয়াছে,—গান্ধার লাগে নাই এবং এই সব কারণেই সাধারণে যাহাকে কসরৎ অর্থাৎ সাধনা বলে তাহার প্রয়োজন হয়। হয়ত আপনার আনন্দেই ও শ্রোতাদের আনন্দ দিবার জন্যই তিনি ভূপালীর আরোহণটিও গাহিয়া দেখাইবেন—সা রা গা পা ধা সাঁ।

ওদিকে আর এক টেবিলে সাহিত্যিক চারুলাল তখন সিনেমার অভিনীত চণ্ডীদাসের সমালোচনার তুমুল তর্ককোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন এক সময়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের উঁচু পর্দ্দায় সুর ধরিয়াছেন। মুগ্ধ শ্রোতারা শুনিতেছে— সবার উপর মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

আধুনিক শিক্ষা ও বনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীউমাপতি ঘটক

আজকাল ভারতের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও তাহাদের অধীন স্কুল ও কলেজে যে ধরণের কল্পনাপ্রধান (Subjective) শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে, তাহা ছাত্রগণের কল্পনা-শক্তি বিকাশে সাহায্য করে। সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যালয়ে এবং কলকারখানায় ইহার খানিকটা কাজে লাগে। কিন্তু সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে—বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঠিক সে ধরণের নয়। আধুনিক শিক্ষা অর্থ-বিত্ত ও ধনিক অভিভাবকগণের নিকট ভার-স্বরূপ।

বস্তুতঃ, আধুনিক শিক্ষার শেষে ছাত্রের জীবনে আসে অবসাদ—তখন "যেন তেন প্রকারেণ" জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিতে যাইয়া শিক্ষিতগণ বিষম সঙ্কটে পড়ে। সামান্য কেরাণী হইয়া জীবন-যাপন করা বাঞ্ছনীয় নয়; অথচ নানা কারণে এই সামান্য কেরাণীগিরিও অনেকের ভাগ্যে জুটে না। অথচ এইরূপ শিক্ষা অর্জ্জনের ঘটা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই শিক্ষার ফলে শিশুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একটী কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সে বিশুদ্ধ বায়ু, রৌদ্রতাপ ও আলোক হইতে বঞ্চিত হয়। এই শিক্ষা শিশুমনের সব বৃত্তিকে বিকশিত করিতে না পারিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিদ্যাপীঠের অবরোধের মধ্যে থাকিয়া তাহার মানসিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়। নীরস পাঠ্য-পুস্তকের হিজিবিজি অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া তাহার মন কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। সত্য কহিলে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র পাঠাভ্যাসে অবহেলা করে—আর শিক্ষকগণ যাহাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হন, তাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ না করিয়াও জীবন-যুদ্ধে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে।

আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রকার কল্পনাপ্রধান শিক্ষার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ ও মহাপুরুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়া তিনি বলিতেছেন,—"জ্ঞান দুই প্রকার;—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান মনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ; কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না।"

আধুনিক শিক্ষায় মস্তিষ্কের কাজটাই হয় বেশী; কিন্তু শরীর ও মনের সমান বিকাশ না হইলে, শিক্ষার্থীর জীবন সামঞ্জস্যভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই কারণেই বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী কোন শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা ও সময়োপযোগী।

যুদ্ধের পূর্ব্বে যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, কলকারখানা ও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে চাহিদার একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া বালকের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা হইত। এই সব দেশে নূতন নূতন শিক্ষাবিলয়ন শিল্পপ্রসারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিত। এইরূপে উদ্দিষ্ট দেশসমূহ নানা দিকে সম্প্রসারণী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ শিক্ষার পর ছাত্রগণকে কলকারখানায় পাঠানো হইত; সেখানে শিক্ষার্থিগণ কারখানা চালানো কাজের মোটামুটি একপ্রকার ধারণা করিয়া লইত—তাহা ছাড়া প্রাথমিক যন্ত্রপাতি (Elementary Tools) ব্যবহারে অভিজ্ঞতা লাভ করিত। কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইত ইহার ঠিক পরেই। রুশিয়ার লেনিন-প্রবর্ত্তিত পলিটেকনিক শিক্ষা অনেকটা এই ধরণের।

কিন্তু রুশিয়ায় তার সমাজতন্ত্র যতদিন না এদেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন এই প্রকার শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যত বাড়িতে থাকিবে, ততই বেকার-সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে কলকারখানার প্রসার তেমন নাই,—তাই যে নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার ও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ইউরোপের শিল্পশিক্ষা এখন আমাদের দেশের উপযোগী নহে। পরে ঐরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে।

এদিকে যুদ্ধের আঘাতে দেশে বেকার সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে; যুদ্ধের সময় যেরূপ ধরণের কার্য্যপদ্ধতির প্রয়োজন ছিল, আজ আর তাহার তেমন চাহিদা নাই। সুতরাং সৈন্যপক্ষকে ও যুদ্ধকালীন কার্য্যে নিযুক্ত অধিকপক্ষকে জীবিকা অর্জ্জনের নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর বেকারগণের মধ্যে যাহারা কোনপ্রকার শিল্পকার্য্যে দক্ষ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী অপর কোন শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই, তাহারা যদি ধৈর্য্যধারণ করিয়া কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার ফল ও নেহাত মন্দ হইবে না।

আমাদের মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধির আদর্শ অনুসরণে ওয়ার্দ্ধাতে যে বনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষার অনেকখানি অভাব পূরণ করিতে পারে। এই শিক্ষা কুটীরশিল্পাশ্রয়ী; তবুও ইহা এমনভাবে পরিকল্পিত যাহাতে ইহা ভবিষ্যতে কোন কোন যন্ত্র-শিল্পেরও পরিপূরক (Supplement) হইয়া উঠিবে। ইহাতে শরীর ও মনের সমান বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা (General Education) দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী

করিয়া তোলা। ইহার পর উদ্দেশ্য হইল,—শিক্ষাগ্রহণকালে শিক্ষার্থীকে কতকটা স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়; কিন্তু এই শিক্ষার জন্য তাহাদের বিশেষ কিছুই ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার ছাত্রগণ শিক্ষাগ্রহণকালে যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিবে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগৃহীত হইবে। এইরূপ স্থলে শিক্ষকের দায়িত্ব বড় সামান্য নহে।

এই শিক্ষা সাত বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া সাত বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। মাতৃভাষাই হইবে এই শিক্ষার বাহন। কোন বিশিষ্ট শিল্পকে আশ্রয় করিয়া এই শিক্ষা অগ্রসর হইবে; অর্থাৎ যে শিল্পকে অবলম্বন করা হইবে, তাহাকে কেন্দ্রস্থ করিয়া অন্যান্য মানসিক শিক্ষাকে এই শিক্ষার অধীন করা [illegible]। নির্ব্বাচিত শিল্প-বিদ্যাটি (craft) নিম্নে অনুসারে শেখানো হইবে। বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বহন করিতে হইবে রাষ্ট্রকে; শিল্পদ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহারের দায়িত্ব এবং উহার উদ্বৃত্তাংশ বিশেষ বাজারে বিক্রয়ের ভারও রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। ইহাই হইল মোটামুটি পরিকল্পনা। সব পরিকল্পনাতেই কিছু না কিছু দোষ থাকিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও অব্যাহতি দেওয়া যায় না; তবে কার্য্যক্ষেত্রে ইহার অনেক দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে—শিশুর আবেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অন্যান্য শিক্ষাকে এই প্রধান শিল্প শিক্ষার অধীন করা বাঞ্ছনীয়। ইহার অর্থ এই যে—যদি কেহ বস্ত্র-বয়ন-শিল্প শিক্ষার্থীর বিষয়রূপে গ্রহণ করে,—তাহা হইলে তাহাকে বয়নের উপাদান তুলা, তাহার আবিষ্কারের ইতিহাস, কৃষি-পদ্ধতি, বিস্তার ও পৃথিবীর যে সব ক্ষেত্রে তুলা পাওয়া যায়, তাহা জানিতে হইবে। তুলার উহাদের কথা জানিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য বীজের কথা জানিতে পারিবে। যে আবহাওয়ায় ও যে মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার কথাও স্বাভাবিক ভাবে জানা যাইতে পারে। এই প্রকারে সে ভূগোল, ইতিহাস ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবে তাহার মূলা অনেকখানি। এই শিক্ষার বিষয়বস্তুর কোন অংশ কষ্টকর করিবার প্রয়োজন নাই।

তুলা পরিষ্কার করা শিক্ষাকালে মানব-ইতিহাসে এই জন্য যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও যে যে পদ্ধতি কার্য্যকরী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানাও অপরিহার্য্য। বস্ত্র বয়নকালে সে ওজন, মাপ ও সময়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এ পর্য্যন্ত বস্ত্র বয়নের জন্য যতপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যবহার-পদ্ধতিও তাহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। যে যন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করা হয়, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করাও স্বাভাবিক। এইভাবে প্রতি পদে পদে তাহার যেমন জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, তেমনি অন্যান্য জ্ঞানের সহিত তাহার সমবয় জ্ঞান সম্মিলিত হইতে থাকিবে। এইপ্রকারে তাহার ব্যক্তিত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা বর্দ্ধিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সমালোচনা

মহাত্মা গান্ধি-প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উঠিয়াছে। আচার্য্য কৃপালনী তাঁহার "Gandhiji's Latest fad" (Basic Education)—শীর্ষক পুস্তিকায় এই সমস্ত প্রশ্নের সমুখীন হইয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলে সমগ্র শিক্ষাটাই ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। রুশিয়ার পলিটেকনিক শিক্ষার ন্যায় ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত। রাষ্ট্র বা সমাজের নিরপেক্ষতা এ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবে। আমরা একে একে সমস্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়; এই সময়ে শিশু বা বালক যাহা উৎপাদন করিবে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু, ইহার ফলে কি শিশু শিশু-শ্রমিকে (Child Labour) পরিণত হইতেছে না? এখন সমাজতন্ত্রবাদিগণ এই ব্যবস্থা সমর্থন করিবে কি? কিন্তু, কার্ল মার্কস এই শিশু-শ্রমিক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—যে স্থলে বড় বড় কলকারখানার অস্তিত্ব রহিয়াছে,—সে ক্ষেত্রে শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করার মূলে বিজ্ঞান সম্মিলা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করাও যদি সম্ভবপর হয়—তাহাও সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যাইবে।*

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—শিশু বা বালক-বালিকার শিল্পকার্য্য হইতে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগৃহীত হইবে কি না। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গিয়াছে—একটী ছাত্র যদি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া চরখায় সূতা কাটে, তাহা হইলে সে মাসে এক টাকা হইতে দেড় টাকা (যুদ্ধ-পূর্ব্ব হার) পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। একজন শিক্ষকের মাহিনা কমপক্ষে ২০৲ টাকা ধরিলে এই ব্যবস্থায় তিনি ২০।২৫ জন ছাত্র লইয়া ক্লাস চালাইয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষকের মাহিনা ভারতে ১০।১১ টাকা ধরা হইয়াছিল। ইহাই ভারতে সাধারণ (Average) শিক্ষকের উপার্জ্জন মনে করিয়া, এই নূতন পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষকের মাহিনা উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। একজনের জীবিকা হিসাবে এই পারিশ্রমিক যুদ্ধের পূর্ব্বে গৃহীত হইতে পারিত, কিন্তু সমগ্র দেশ যতক্ষণ না রুশিয়ার আদর্শে সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কোন

* "It is necessary to indicate the age below which children should not be permitted to labour. A general prohibition of child labour is inconsistent with the existence of large industry and therefore can be nothing more than a good intention. And even if the introduction of such a prohibition were possible it would be a reactionary measure."—Latest Fad p. 66.

শিক্ষকের পক্ষে এইপ্রকার সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অসম্ভব। অন্যথা, শিক্ষকগণকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একদিক হইতে সমাজের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকিতে হয়। ইহা ঠিক স্বাভাবিক জীবন নহে। তাহা ছাড়া ভারতে কোন যুগেই সন্ন্যাসজীবন কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। যে কেহ ইচ্ছায় সন্ন্যাস-জীবনযাপনে অধিকারী ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষকের পারিশ্রমিকের হার এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহা তাহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিবে।

অনেকে হয়তো বলিবেন যে, আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে, সামান্য আয়ে চলিয়া যায়। ২০৲ টাকা সেখানে সামান্য নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় সর্ব্বত্র একরূপ অবস্থা নহে। তাহা ছাড়া যাঁহারা জাতিগঠন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের পারিশ্রমিক সামান্য হইলে উপযুক্ত শিক্ষক এগুলে আসিবে না। যে যুগে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে—সে যুগে ভারতের শিক্ষকগণ কেন অত সামান্য মাহিনায় জাতিগঠন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহা বুঝি না।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে—পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় এদেশে যদি ব্যাপকভাবে কলকারখানার প্রবর্ত্তন হয় তাহা হইলে কুটীরশিল্পাশ্রয়ী বনিয়াদী শিক্ষার আবশ্যকতা কি? তখন গ্রামে গ্রামে চরকায় সুতা কাটা, সূত্রধরের কাজ শেখা, বই-বাঁধানো, কাগজ-তৈয়ারী, কার্ডবোর্ড প্রস্তুত করা প্রভৃতি শিখিয়া কি প্রয়োজন সাধিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হয় যে—রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে প্রাথমিক পরিকল্পনায় যে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে—তাহাও প্রায়ই ছোট ছোট শিল্প-বিদ্যালয়ে। তাহা ব্যতীত, ১৮ বৎসর বয়স না হইলে সে দেশে কোন শ্রমিককে কলকারখানার কাজে নিযুক্ত করা হয় না। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে,—যদি কোন বালক কলকারখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করে, ভবিষ্যৎ জীবনে যে সে শিক্ষা কোন কাজে লাগিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। এদিকে যুদ্ধ শেষে আমাদের দেশে যখন কলকারখানার প্রসারে বিলম্ব আছে—তখন শিশুগণের পক্ষে কোন শিল্প শিক্ষা করা মন্দ কি? ভবিষ্যতে যদি এদেশে রুশিয়ার ব্যাপক-ভাবে প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলেও এই সব বনিয়াদী শিক্ষার অধীন বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন ফুরাইবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে—বিদ্যালয়গুলি হইতে যে বিপুল শিল্প-সম্ভার উৎপন্ন হইবে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ভারত এখনও প্রয়োজনমত শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ নয়; সুতরাং যদি কোন নূতন শিল্প-পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের নূতন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা কি জাতি বা সমাজের দিক হইতে লাভজনক নহে? ইহার ফলে এদেশে বিদেশী কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পজগতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে কি না। যন্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা ত' আছেই; অধিকন্তু, ইহা কি কুটীরশিল্পীর (যাহারা বনিয়াদী শিক্ষা পাইবে না) উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না? ইহার উত্তরে বলা যায়,—ভারতে শিল্প সামগ্রীর চাহিদা সামান্য নহে। ভারতকে বৎসর প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকার বিদেশের কল-কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিতে হয়, তখন যে কোন উপায়ে ভারতে শিল্প-সম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; নূতন শিল্পপ্রচেষ্টা কোন বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে না। প্রথম অবস্থায় শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের উৎপন্ন সামগ্রীগুলি এদেশের কুটীর-শিল্পজাত বা বিদেশের যন্ত্র-শিল্পজাত সামগ্রীসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে না সত্য; কিন্তু, পরে যখন শিল্পসম্ভার বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে—তখনই সমস্যার গুরুত্ব হ্রাস হইতে পারে। এক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব থাকিবে সরকারের। সরকারকে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমাইয়া স্বদেশী দ্রব্যের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। শিল্পসম্ভার ক্রয়ের, বিক্রয়ের এবং ব্যবহারের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হন—কিম্বা যদি আমদানী বা রপ্তানী শুল্ক কমিয়া যাইবার অজুহাতে এই ব্যবস্থা অকল বলিয়া বাতিল করিতে চাহেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দায়িত্ব তার গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় নাই। যেখানে মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—জাতিকে অবৈতনিক শিক্ষাদান—সেখানে কোন সরকারই এই সুচিন্তিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা জানি—ইতিমধ্যেই ভারতে অনেক প্রদেশে এই বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কংগ্রেস প্রভাবান্বিত প্রদেশগুলিতে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। আমরাও বনিয়াদীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার কামনা করি।

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

শতদলে ঘেরা ফুলের মাটি
নীরবে ঝরে যায়

সৌরভ তার চপল মনের
অন্বেষণে করে জয়।

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১

অবিশ্রান্ত বর্ষণে আর ভোলো-হাওয়ায় আকাশ বাতাস যেন ভারি হইয়া আছে। নদীর দুইকূল ভরিয়া গৈরিকজল উপছিয়া পড়িয়া পাক খাইয়া ফেনাইয়া ছুটিতেছে। অবিশ্রাম ধারাপাতের বিরাম নাই। বর্ষণধৌত বৃক্ষগুলির সবুজপত্রে দিনশেষের ক্ষীণ রশ্মিরেখা যেন শেষ সঙ্গীতের করুণ সুরটির মত জড়াইয়া আছে। স্কুল বিল্ডিংয়ের সকল দুয়ার-গুলি বন্ধ হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইয়া হেড চাপরাশী রামরতিয়া দারবানকে গেট্ বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়া এই মাত্র চলিয়া গেল।

হোষ্টেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া নবাগতা তরুণী শিক্ষয়িত্রী-দের কিসে গল্প করিতেছে শোনা যায় না, তবে তাহাদের উচ্ছ্বসিত মিষ্টি হাসির আওয়াজ এখানেও ভাসিয়া আসিতেছে।

আপনার শ্রান্ত দেহখানি ইজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া মিসেস সিং (স্কুলের লেডি প্রিন্সিপ্যাল) আপনার ড্রইংরুমে বসিয়া বাহিরে নদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ-মুখের রুক্ষতা কখন অপসারিত হইয়াছে কে জানে, সারা-মুখে একটি করুণ বিষাদের ম্লানিমা জড়াইয়া আছে। বেণীবদ্ধ রুক্ষ কেশের দুই একটি গুচ্ছ বাঁধনভ্রষ্ট হইয়া মুখে চোখে উড়িয়া পড়িতেছে। উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সুখলতা বসিয়াছিলেন। শূন্য নির্জ্জন গৃহ। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে তিনি একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। উপরে ষ্টাডিরুমে তাঁহার পালিতা কন্যা রেখা পড়িতেছে। স্কুলের সেকেণ্ড টীচার তাহাকে পড়াইতেছেন। দূরে আউট-হাউসে ও বাবুর্চ্চি-খানায় তাঁহার দাসী ভৃত্যগণ জটলা করিতেছে, তাহাদের কণ্ঠস্বর এখানে আসিয়া পৌঁছায় না। তাঁহার গৃহে সূচী পতনের শব্দটুকুও বুঝি শোনা যায়। যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এই ভয়ে তাঁহার গৃহে ও স্কুলে সবাই ত্রস্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ক্রোধের উগ্রতা যে ভয়ানক, তাহা সুখলতা নিজেও জানেন, যেন কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত, উড়াইয়া ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া তাসাইয়া আপনার প্রান্তিভারে আপনি কখন শুদ্ধ হইয়া যান। কঠোর আত্মগ্লানি মনকে নিপীড়িত করে। কিন্তু কেন? নির্জ্জন বর্ষণাচ্ছন্ন শুষ্ক সন্ধ্যায় আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া কর্ম্মহীন অবসরের এই ক্ষণটুকুকে সহসা সুখলতার মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। কেন? বর্ষার অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতের করুণ রাগিণী তাঁহার সুপ্ত মনের চেতনায় অকস্মাৎ যেন রুদ্ধ আবরণ খসিয়া পড়িয়া যায়। বর্ষার বারিপাতের এই উদাস বাউল রাগিণী ইহা বড়ই বিস্ময়কর। মানবের মনকে সুখের মুহূর্ত্তে উদ্বেল করিয়া তোলে, আবার দুঃখের ক্ষণে অভিভূত করিয়া ফেলে। আপনার মনের অবস্থা বিশেষে হৃদয় যেন নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। স্মৃতি আসিয়া বর্ত্তমানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া গিয়াছে। চক্ষুর উপরে করতল আচ্ছাদন করিয়া সুখলতা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন। ধীরে ধীরে ছায়াচিত্রের ন্যায় তাঁহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আজ হইতে কতবৎসর পূর্ব্বের সে জীবন? যখন তরুণী সুখলতা কিঞ্চিন্ন অনার্স লইয়া চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে?

২

১৯১৯ সাল। মহাযুদ্ধ তখন শেষ হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধিপত্রে চুক্তি স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত রাজ্যচ্যুত কাইজার হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মরণাহত জার্ম্মানী পাশবদ্ধ অজগরের মত একধারে পড়িয়া আছে, তাহার ফুঁসিবার অনুমতিটুকু পর্য্যন্ত নাই। অসহায় জনগণ চাহিয়া আছে কালিমাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে।

বিজেতা ব্রিটিশের উল্লাসধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিতেছে। কি গৌরবপূর্ণ স্ফূর্ত্তি সে কি তাহার উল্লাস! অহিংসোমন্ত্রে দীক্ষিত ভারত সে উল্লাসধ্বনিতে সুর মিলাইতেছে, কিন্তু ব্যর্থ আশাহত ক্ষীণ করুণ সেই সুর।

সেই তেমনি দিনে সুখলতা কলেজে পড়িত। অনাগত ভবিষ্যতের রঙীণ স্বপ্নে বিভোর তরুণী সুখলতা দেশ বা

কালের চিন্তা তখন করিত না—ভাবিত কেবল আপন ভবিষ্যত!

প্রফেসারগণের মন্তব্য কানে যাইত Her future is very bright. Highly intelligent girl—ইত্যাদি।

মুগ্ধ ভক্ত ছাত্র ও সহপাঠিগণের সরব ও নীরব স্তুতি। সহপাঠিগণের ঈর্ষা ও প্রশংসা তাহার দিবারাত্রকে যেন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহস্থঘরের কন্যা সে। পিতা মার্চেন্ট অফিসে সামান্য চাকুরে। বড় ভাইটি আই-এ ফেল করিয়া একটি চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অপর ভাই ও বোনটি নিতান্ত ছোট, স্কুলে পড়িতেছে। তাহাদের মাঝে অসাধারণ হইয়া যেন সুখলতা আসিয়াছিল। যেমন তাহার রূপ, তেমনি তাহার বুদ্ধি। পিতামাতা বোধ করি সেইজন্য তাহাকে অধিক স্নেহ যত্ন করিতেন এবং হয়ত প্রশ্রয়ও দিতেন। ভ্রাতা ভগ্নীগণও তাহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। সুখলতা জীবনে কোনও দিন সেকেণ্ড হয় নাই। একে একে প্রতিক্লাশে অজস্র পারিতোষিক লাভ করিয়া ফার্স্ট হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ম্যাট্রিকে যখন সে stand করিয়া প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে স্থান পাইল তখন তাহার আশা, কল্পনা সীমা ছাড়াইয়া ছুটিয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের আশা ও আনন্দের সীমা নাই।

আই-এস্‌সিতে সুখলতা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কিছিন্ন অনার্স লইয়া বি-এস-সি পড়িতে সুরু করিল। সায়েন্স তাহার ভাল লাগে। তাই ম্যাট্রিকে অঙ্ক শাস্ত্রে উচ্চ নম্বর পাইয়া সে আই-এস সি পড়িতে মনস্থ করে। তখনকার দিনে সায়েন্সে মেয়ের সংখ্যা থাকিত নগণ্য। বিশেষ করিয়া সেইজন্য সুখলতা সাড়াশব্দ লইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে পদার্থ বিজ্ঞান যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সৃষ্টির এক বিশাল রহস্য যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। কত নূতন তথ্য ইহার অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এক একজন মণীষী তাঁহার আজীবনব্যাপী সাধন দ্বারা এক একটি রহস্যের দুয়ার খুলিয়াছেন। অনুমানকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আজীবনব্যাপী জ্ঞানপিপাসাকে কথঞ্চিত পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

সাধারণ মানব তাহার সুবিধা, তাহার শুভফল গ্রহণ করে, কিন্তু সুযোগদাতাগণকে দিনান্তে একবার স্মরণ করিতেও ভুলিয়া যায়। তা যাক্। সেই সাধকগণ নিন্দা সুখ্যাতিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন কর্ম করিয়া গিয়াছেন। একের পর আর একজন আসিয়া আরব্ধ কর্মকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক রহস্য, এই আলোকতত্ত্বের অপূর্ব রহস্য লোকচক্ষে আনিয়া ধরিয়াছেন। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎজ, ব্রাঁলি, স্যার জগদীশ, অলিভার, লজ, সংখ্যাতীত নীরব সাধক মণীষীগণ। পড়িতে পড়িতে সুখলতার মনে হয় আমিও ওই রকম হইব। গবেষণা করিব, নূতন বৈদ্যুতিক শক্তির তথ্য আবিষ্কার করিব। হায় রে, আশা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ তরুণ জীবন। একাগ্রচিত্তে গভীর অভিনিবেশে সুখলতা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির প্রতিভায় প্রফেসারগণও বিস্মিত হইলেন। সকল ছাত্র ছাত্রী অনুমান করিতে লাগিল যে এবারও প্রতিযোগিতায় সুখলতা প্রথম হইবে। আঃ, সেইসকল দিনগুলি!

৩

সকলের আনন্দ ভনভন কোলাহল উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইতে সেদিন বেশ একটু বিলম্ব হইয়াছিল। এম-এস সি ক্লাসের প্রথম দিন। সুখলতা আসিয়া যখন ট্রাম ধরিল তখনও তাহার মাথাটা যেন গরম হইয়া আছে। আনন্দে সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ। অবশেষে প্রথম হইয়াছে? তাহার ছাত্রাজীবনের সকল কামনা। সেইদিনই রজতের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। সে সময়টা ট্রামে অত্যন্ত ভীড়। আনন্দ পরিপূর্ণ আপনচিন্তায় নিমগ্ন সুখলতা। অত লক্ষ্য না করিয়াই এই ট্রামে উঠিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া যখন দেখিল ভীড়—স্থান নাই, তখন ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াছে, নামিতে পারিল না। সুখলতা একপাশে দাঁড়াইল। একটু পরেই রজত তাহাকে ডাকিয়াছিল, কথাগুলো, যেন এখনও কানে আসিয়া বাজে, "আপনি যদি কষ্ট করে একটু এগিয়ে আসতে পারেন তবে এখানে একটু জায়গা হতে পারবে।" অপরিচিতের আহ্বানে বিরক্ত সুখলতা মুখ তুলিয়া আহ্বানকারীর পানে চাহিতেই তাহার মন যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুবেশ সুদর্শন রজত হাসিভরা আগ্রহপূর্ণ আঁখি তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে।

সুখলতা ধন্যবাদ জানাইয়া কোনক্রমে অগ্রসর হইয়া গেল। বসিবার স্থান দিয়া রজত নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিল "Congratulations" বিজ্ঞান কলেজের দুর্লভছাত্রী আপনি। আপনাকে আনন্দ জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।

সুখলতার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোনও মতে কহিল "বহু ধন্যবাদ।"

রজত তাহার নিজের পরিচয় দিল তাহার নাম রজত রায়। সম্প্রতি সে বিজ্ঞান কলেজে electro magnetic theoryর পার্টটাইম লেকচারার।

এতক্ষণে সুখলতা দাগ্রহদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "আপনি? আপনি আমার আনন্দ জানাচ্ছেন? আপনার মত এম-এসসির রেজাল্ট, ইউনিভার্সিটির কেরিয়ার। সে আমাদের মত যে কোনও ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কামনার বস্তু।"

আপনি এখন বহু বিজ্ঞানমন্দিরে উদ্ভিদবিজ্ঞান রিসার্চ করছেন শুনেছিলুম। আচ্ছা আপনি দুটো ডিফারেন্ট সাবজেক্টে কি করে রেকর্ড রেখে ফার্ষ্ট হলেন?

সুখলতার উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে রজত হাসিল। মৃদু হাস্যধ্বনি এখনও যেন কর্ণে ধ্বনিত হয়। রজত উত্তরে বলিয়াছিল "তাহলে গুণগ্রাহী হিসাবে আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। হাঁ উপস্থিত আমি রিসার্চ বন্ধ করে কলেজে পার্ট-টাইম কাজ করছি এবং ফাইন্যাল লাভিদের জন্য তৈরি হচ্ছি। কাজেই এখন ভাবি—যে বিদ্যাকে জীবনে সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারলুম না, তাতে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হওয়াটা অর্থহীন।"

সুখলতা বুঝিল তাহার প্রশংসা ইহার কোনও গোপন ব্যথায় ঘা দিয়াছে। অপ্রতিভ হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

রজত প্রসঙ্গটি সহজ করিয়া কহিল "জানেন? বাড়ীর লোকেরা যখন দেখলেন যে দুটো সাবজেক্টে প্রথম হলুম, তখন তাঁদের ইচ্ছা হল যে দেখা যাক ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে ছেলেটা ফার্ষ্ট হতে পারে কিনা। তাঁদের ইচ্ছাপূর্ণ করতে গিয়ে আমার ইচ্ছা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেল। অর্থাৎ কিনা আদর্শপুত্র হতে চেষ্টা করলাম।" বলিয়া সে হাসিল। এবারকার হাসিতে আনন্দের উচ্ছলতা নাই, ব্যথিত হাসি। সুখলতা সহানুভূতির দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়াছিল।

তাহার পর কলেজে, ক্লাশে, করিডোরে, দৃষ্টি বিনিময়, হাসি, দুই চারিটি বাক্য বিনিময়। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইতে লাগিল। সেই সব দিনগুলি? বাহিরে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। মেঘভারে সমস্ত আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসিয়া নদীর এপার হইতে ওপার যেন অনাবৃত করিয়া দিতেছে। মিসেস সিং আপনার অজ্ঞাতসারেই চোখের উপর হাত ঢাকা দিলেন। সে সুখস্বপ্নে মনটা নিবিড়ভাবে ডুবিয়া গিয়াছে তাহা যেন এমনি ভাঙ্গিয়া না যায়। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, তাহার প্রবল শব্দে পৃথিবীর আর সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বসিয়া পৃথিবীর একটি প্রাণী তাহার জীবনের বিষামৃত একাকী মোহভরে পান করিতেছে। আহা সেইসব আনন্দ পরিপূর্ণ দিনগুলি! কত আলাপে, কত আলোচনায়, কত অর্থ-হীন গুঞ্জনে, দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া চিন্তাহীন লঘু দিনগুলি যেন উড়িয়া গিয়াছে। সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই কলিকাতা নগরী—আজো কি তাহা তেমনি আছে?

তাহারপর ধীরে ধীরে একদিন উভয়ের মনের গোপন কামনা প্রকাশ হইয়া গেল। অপরূপ আনন্দব্যাকুল সেই মুহূর্ত্ত। অত্যধিক সুখাবেগে বোধকরি নয়নের অশ্রু বাধা মানে না? তাই রজতের বলিষ্ঠবাহুর বন্ধনে উত্তপ্ত বক্ষের সান্নিধ্যে সুখলতা কাঁদিয়াছিল। সেই তৃষিত ওষ্ঠের গাঢ় উষ্ণ স্পর্শ আজো যে সুখলতা অসীম যুগান্তরেও ভুলিতে পারে না? তাহার সমস্ত দেহ মনে আজো যে সেই নিবিড় সোহাগ স্পর্শের স্মৃতি উদ্বেল করিয়া তোলে?

যেন রঙীন স্বপ্নে সেই দিনগুলি কাটিয়াছে। ছুটির দিনে বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘুরিয়াছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখনীড়ের রচনার গল্পে সময় কাটিয়াছে। আবার কলেজ আওয়ারে সাধনার সহিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। পড়াতে রজতের কি আগ্রহ কি উৎসাহ। অথচ মনোনিবেশে সুখলতা পড়িতেছিল। ষ্ট্রেট্ স্কলারশিপ সে লইবেই। কে জানে—তাহার জীবনেও মাদাম কুরী বা ইতাল কুরীর ন্যায় সাফল্য আসিবে কিনা?

৪

রজত ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছে বছরখানেক। আসিয়াই কলেজে অস্থায়ী কর্ম্মটি গ্রহণ করিয়াছিল। রজত কেন

করিয়াছিল viva voceতে। অন্যান্য বিষয়ে উচ্চনম্বর পাইয়াও সে ব্যর্থ হইয়াছে। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। রজতের মনেও আঘাতটা একটু বেশীরকম বাজিয়া তাহাকে এই পরীক্ষার সফল হইতে দৃঢ়কাম করিয়া তুলিল।

রজত কলেজের চাকুরী ছাড়িল। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী।

সুখলতা বলিয়াছিল "এক্সপেরিমেণ্টের সময় তোমার অভাবটা আমাকে বেশী লাগবে। তা হোক, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কর।"

রজত বলিয়াছিল "তোমায় ছেড়ে যেতে কষ্ট কি রকম হবে সেটা তুমি নিজেকে দিয়ে অনুভব করছ বোধহয়। তবু কর্ত্তব্য আগে। আমি না থাকলে তোমার এক্সপেরিমেণ্ট, একাগ্রতায় আরো ভাল হবে। আর তা ছাড়া সু, তোমাকে শীঘ্র কাছে পেতে হলে আমার তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তো প্রয়োজন ?"

সুখলতা ও রজতের পিতামাতার নিকট তাহাদের প্রণয়ের বার্ত্তা অবিদিত ছিল না। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে সুখলতা এম-এসসি পাশ করিলেই ইহাদের বিবাহ হইবে। ইহারাও সেকথা জানিত।

সুখলতা গভীর বিশ্বাসের সহিত ভাবিত, রজত তাহার স্বামী। তাহার কুমারী হৃদয়ের প্রথম প্রণয় একান্তভাবে রজতকে নির্ভর করিয়া বাড়িতেছিল। রজতের প্রতি চাহিলে তাহার হৃদয় গভীর আনন্দরসে সিক্ত হইয়া যাইত। তাহার হৃদয় যেন চিরন্তন রজতের মঙ্গল কামনা করিত। ইহা তাহার নারীত্বের স্ফুরণ। নারীর নারীত্ব, শুধু প্রেম, শুধু স্নেহ দিয়া পরিপূর্ণ। অন্ধ আবেগে ভরা।

প্রেমের পূজায় জ্ঞান বিদ্যা যুক্তি তর্ক অর্থহীন। সে পূজার নৈর্ব্যাল্য ভক্তি ও ভালবাসা। তরুণী সুখলতা তাহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়খানি নিঃশেষে রজতকে সমর্পণ করিয়াছিল।

সুন্দরী সুখলতার স্তাবক ভক্ত মিলিয়াছিল প্রচুর। তাহার একনিষ্ঠ হৃদয় কাহারোও পানে চাহিয়া দেখে নাই।

ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া গেল। সুখলতার একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নের বিরাম নাই।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠায় দিন কাটিতে লাগিল। খবর বাহির হইলে জানা গেল। সুখলতা উচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছে। কি সে আনন্দভরা দিন। আনন্দ অভিনন্দন আশীর্ব্বাদ প্রশংসার স্রোতের বিরাম ছিল না। তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত আশা সফল হইয়াছে। সে স্কলারশিপ পাইবে। তাহার পর বিবাহ ও দুইজনে মিলিয়া বিলাত যাইবে। তাহাদের স্বপ্ন দিয়া রচিত ইংল্যাণ্ড।

রজত তখন দিল্লীতে। তাহাকে সব খবর দিয়া সুখলতা পত্র দিল।

উত্তরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ জানাইয়া প্রথমে টেলিগ্রাম ও পরে পত্র আসিল। বহু আনন্দ জানাইয়া আশীষ দিয়া যে পত্র আসিল তাহার শেষদিকে রজত লিখিয়াছিল। "সু, এবার তুমি ইংল্যাণ্ডে যাবে। যে মাটিতে তুমি আছ সেই মাটিতে আমিও রয়েছি। এ দূরত্ব বোধ হয় না, কেন না ট্রেণে চড়লেই তো তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাবো। কিন্তু তুমি বহু দূরে যাবে মনে করলে মনটা অস্থির হয়। তা হক, আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ—তুমি তোমার শিক্ষা সমাপ্ত কর ও সুখী হও।"

মাতা একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন "জানিস সুখ্, তোর শাশুড়ীর আর তর সইছে না—সে আমাকেও যেমন তাড়া দিচ্ছে তেমনি নিজেও বরণডালা সাজাতে বসে গেছে।"

সুখলতা সলজ্জ হাস্যে কহিল "তোমারও তো তাতে কম উৎসাহ নেই মা ?"

মা বলিলেন "তা সত্যি বলতে কি, আমার ইচ্ছেও কম নয়। মেয়ে বড় হলে কি কম চিন্তা ? তবে তোমার মত মেয়ে ভাগ্যে পেয়েছিলাম, তাই আজ পাত্রপক্ষ বিয়ের জন্যে নিজে থেকে সাধছে।" মা গর্ব্বভরে হাসিলেন।

সুখলতা হাসিল, বলিল "কিন্তু ওঁরাও খুব ভাল মা, কেন না ওঁদের ছেলে তো মেয়ের চাইতে খাটো নয়।"

মা ব্যস্ত কণ্ঠে কহিলেন "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার রজতের মত পাত্র বহু ভাগ্যে বহু আরাধনায় মেলে। সে কথা একশো বার। না রে আমি ঠাট্টা করছিলুম। তবে রজতের বাপ মা বিয়ের জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। এই কদিনে পাকাপাকি করে বোধ হয় অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করবেন।"

সুখলতা নীরবে শুনিল। গভীর সুখাবেশে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রজত ? তাহার রজত

এইবার নিকটতম হইবে। তাহাদের হৃদয় বহুদিন এক হইয়াছে, এইবার সামাজিক বাঁধন তাহাকে দৃঢ় করিবে —স্থাপিত করিবে লোকচক্ষে। হেমন্তের এক কুহেলী আকুল সন্ধ্যা অপেক্ষা করিয়া আছে তাহাদের জন্য। তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবে তাহা সার্থক হইবে। তাহার পর আসা, জননী, গৃহিণী। কিন্তু? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—জননী হইবার পূর্ব্বে সে নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক হইবে। বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক। তাহার জীবনের চরম কামনা। মনের তৌলদণ্ডে ওজন করিলে একদিকে রজত, একদিকে বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা।

বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে। রজতও গিয়াছিল। তাহার পর সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ইউরোপ ভ্রমণ সারিয়া দেশে ফিরিবে। কি সে সুখের দিন! কি সে আনন্দময় জীবন!

প্রফেসারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জাহাজ তথ্য জানিয়া লইয়া এ্যাপ্লাই করিল। D. P. I. এর সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিল। তার নিজের মৃত্যুশয্যা আপন হস্তে রচিত করিয়াছিল সেইদিন।

ইতিমধ্যে পরীক্ষা শেষে রজত দেশে ফিরিল। রজতের মাতা ভগ্নী তাহাদের বাটি আসিতে লাগিলেন। পিতার পিতায় গোপনে পরামর্শ হইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দুই বাটির মাতাদের কাপড় জামা গহনার অর্ডার লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

আর রজত? হাসি খুসী কোলাহলের ফাঁকে তাহাকে নির্জ্জনে দেখিলেই মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া গাহিত "ওগো প্রিয়া, নিতি আসি তব দ্বারে"……

আরক্ত হইয়া লজ্জিত কণ্ঠে সুখলতা বলিত, "আঃ কেউ শুনতে পাবে যে?"

"শুনতে পেলেই বা? তুমি কি আমার প্রিয়া নও?" রজতের মৃদু কণ্ঠে কৌতুক উচ্ছল হইয়া উঠিত।

"তাই বলে চেঁচিয়ে"……লজ্জায় সুখলতার বাক্য অর্দ্ধ পথে থামিয়া যাইত। বলিত "নাম করে ডাকতে পার না যেন?"

আবেগবিহ্বল অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে চাহিয়া রজত বলিত "নাম? ওই একটাই তো তোমার নাম? প্রিয়া, প্রিয়া, আমার চিরকালের অন্তহীন জীবনের একমাত্র প্রিয়া।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

'দেহ মনের' গঠন ও উৎকর্ষ সাধন

ডাঃ শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-বি

প্রসবকালে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সাধারণতঃ সে ক্রন্দন করে। এই প্রথায় সে প্রথম শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিবার অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ফুসফুস (placenta) মাতৃ হইতে পৃথক হওয়ায় অঙ্গারক বাষ্পের অভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ বহির্ম্মণ্ডল বায়ু চর্ম্মে লাগিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রক্রিয়া করে।

জীবনের প্রারম্ভ মুহূর্ত্ত হইতেই এই দেহের অভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা আমরা উপলব্ধি করি, উহা আমাদিগের উপর সারাজীবনই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

এই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের পর হইতেই দেহের কার্য্যের বিকাশ ক্রমশঃ ঘটিয়া ক্রমে শিশুটী পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে দেহের মধ্যে ও বাহিরে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন, গঠন ও সংবর্দ্ধন ঘটে। অবশ্য প্রয়োজনীয় মনের গঠনও দেহের গঠনের ন্যায় ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে। জীবনের অন্ত হইলেই উহাকে মৃত্যু বলে। শ্বাসপ্রশ্বাস থামে থাকে না। মনের ক্ষয় আর জীবনের লক্ষণও অপসারিত হয়। শিশুকাল হইতে পূর্ণযৌবনাবস্থায় পৌঁছাইবার কাল অবধি দেহ ও মনের সংবর্দ্ধন হইতে থাকে। দেহের পরিবর্ত্তন অবশ্য সারাজীবনই চলিতে থাকে।

অতি শিশুকালে ক্ষুধা পাইলে শিশু ক্রন্দনরূপে ঐ বেদনা ব্যক্ত করে। ক্রমে ক্ষুধা ও মলমূত্রত্যাগ ও অস্বচ্ছন্দতা ইত্যাদির অনুভূতি হয়। ক্রন্দন ও তৎসহ হস্তপদাদি অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রমে পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে ক্ষুধায় লিপ্সা, আনন্দে হাস্য দর্শনের অভিলাষ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের পরিলক্ষণ পরিস্ফুটিত হয়। ক্রমে প্রয়োজন হেতু বাসনা, উহা হইতে অনুভূত সুখের লিপ্সা, বেদনায় বিরক্তি ও আপত্তি প্রকাশ করে।

বাসনা কল্পনায় পরিণত হয়। কল্পনাকে সফল করিতে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চিন্তা ও কার্য্য কৌশল অবলম্বন করে। কাজেই দেখা যায়, শরীর ও মন স্তরে স্তরে উভয়েই উভয়কে উৎকর্ষের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব অবধি দেহ কেবল গঠন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে। মনটি চাঞ্চল্যপরিপূর্ণ থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে মনটি অধিক চঞ্চল হয়—তাহার কারণ দেহে নানাপ্রকার কার্য্য হইতে থাকে, উহা মনটিকে অজানা সুখের স্বপ্নে পরিধাবিত করে। এই পরিধাবন অবশ্য স্বাভাবিক হইলেও, বিভিন্ন ব্যক্তির ও নরনারীর মধ্যে বহু পার্থক্যের লক্ষণ দেখা যায়। দেহের এতদবস্থায় একমাত্র গঠন-মূলক কার্য্য সর্ব্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হইলেও শিক্ষা সংযম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠনমূলকের সাথে আবার ধ্বংসমূলক কার্য্যের সূচনা আরম্ভ হয়। দেহের গঠনমূলক কার্য্য পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থা অবধি সংসাধিত হওয়াই নীতি, এই অনুযায়ী ধ্বংসমূলক কার্য্য অপরিমিত হইলে দেহের পূর্ণ গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মনটি যৌবনের প্রারম্ভ কাল হইতে সুখপ্রিয়, অভিলাষী ও অনুসন্ধিৎসুতার পরিচয় দেয়, উহাও প্রয়োজনের দায়ে। দেহের পূর্ণ গঠনের পরে মনের চাঞ্চল্য স্থিরীভূত হয়, তাই পূর্ণপ্রাপ্ত বয়স হইতে প্রৌঢ়কালের মধ্যেই স্থির চিন্তাশক্তির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রৌঢ় হইতে বার্দ্ধক্য অবধি স্থির ধীর বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ হইলেও, দেহের কার্য্য যখন ক্রমে অধোমার্গে ধাবিত হয় তখন স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি কমিতে থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে বার্দ্ধক্যকাল অবধি মানসিক শক্তির বিকাশ অধিকতর হয় বলিয়া যৌবনের প্রারম্ভজীবনের কার্য্যকরণ অবস্থার উপর ভবিষ্যত জীবনে মানসিক স্ফুরণ নির্ভর করে। প্রবৃত্তি মার্গের পরিবর্ত্তন ও দেহের বিকার এই জীবনের পিচ্ছিল সঙ্কট স্থলে অসংযত বা সংযত ভাবে চলার উপর নির্ভর করে। (১) প্রাকৃতিক, স্বভাবীয় প্রাণিকুলের কার্য্যাবলী সুবুদ্ধিমান মানব ঘৃণাসহকারে বর্জ্জন অভিলাষে জ্ঞানকল্পিত দেববাঞ্ছিত নিয়ম-কানুন পালনে সমর্থ হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।(১) ধর্ম্মের সমর্থন অতি নিম্নতর প্রাণীদিগের মধ্যেও বিচার করিলে বর্ত্তমান দেখা যায়। মানব স্বভাবের নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া পাশবিক যে হিংস্রভাবের উদয় হয়—উহাকে দমন করিবার জন্য ধর্ম্মনীতি গঠন করেন। ধর্ম্মনীতি, সমাজ ও শাসন নীতির ভিত্তিস্থাপন করে। সমাজ ও শাসননীতি গঠন করিবার উদ্দেশে পাপতত্ত্বের উদয় হয়। পাপতত্ত্ব, অবাঞ্ছনীয় পশুভাবের বিরোধ আনিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। পাপপুঞ্জ হইতে হইতে সংযম শিক্ষা প্রয়োজন। মানব বিচার ও শিক্ষার দ্বারা পশুভাব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কি একেবারে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য উপেক্ষা করিতে পারে? ইহাই সমাজ শিক্ষার সমস্যা। স্বভাবের স্ফুরণ বজায় রাখিয়া সংযম, মানব সমাজের ইহাই লক্ষ্য। বিভিন্ন সমাজ তাহাদের শিক্ষা, ধর্ম্ম, দীক্ষা আবহমান কালের প্রচলন অনুযায়ী চলে ও ক্রমে দেশ ও কাল অনুযায়ী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়।

হিন্দু সমাজের, উচ্চ ধর্ম্ম ও সমাজনীতিগুলি জগৎ মধ্যে আদর্শ হইলেও উহাদের পূর্ণ বিকাশ কোনও জাতির মধ্যে এখন দেখা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় মনীষীগণের মধ্যে অনেকেই উহা সুপ্রথা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও উহার নীতি এত কঠোর যে অপর কোন জাতি উহা গ্রহণ করিয়া পালন করিতে অক্ষম।(২) হিন্দুরাও এখন উহা পালন করিতে অক্ষম। কোনও ভাষা প্রচলন অভাবে মৃতপ্রায় হইলে যেমন উহার চর্চ্চার সুফল ও সুফল পাওয়া কঠিন হয় সেইরূপ আমাদিগেরও ধর্ম্ম আলোচনা সুফলপ্রদায়িনী বলিয়া এখন আর মনে হয় না।(৩)

হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মসাধনপ্রণালী কেবল কুসংস্কারপূর্ণ কঠোর সমাজ-নীতি বা নিয়মের কুসংস্কারপূর্ণ পূজাপাঠ ভাবিলেই চলিবে না। ধর্ম্ম-সাধনপ্রণালীর দ্বারা দেহ ও মনের গঠন হয়। উহা স্বভাবিক নিয়মের পন্থায়। সাধনে দেহের অপেক্ষা মনের শক্তি ও স্থির জ্ঞানের অধিক বিকাশ হয়।(৪) যৌন ব্যাধিই অধিকতর দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক। হিন্দুপদ্ধতি উহার প্রতিবন্ধক। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বাস স্নায়ুগুলিকে সচেতন করিয়া দেহের কার্য্য করাইয়া ও বিশ্রাম দিয়া মনের একাগ্র চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়।(৫) ধর্ম্মপন্থার সাধন করিলে উহার চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ পথই যোগসাধন মার্গ।(৬) যোগ সাধনায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ বুঝা যায়।(৭) ইহাই দেহের বিরামের শক্তি অর্জ্জন ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির পন্থা। মনের স্থৈর্য্য ও শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। যোগসাধনই একমাত্র দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থা।(৮)

মানব প্রকৃতে বিজেতা হয়—মনের শক্তি প্রভাবে(২) শারীরিক মনে সর্ব্বদা আধুনিক যুগে উহা সম্ভব হয় না। আত্মসংযম না করিলে সমাজ ও শাসন বিশৃঙ্খল ব্যক্তিকে সমাজে বাস করিতে দিবে না(১)। মানব নিজ সংযম শক্তির প্রভাবে সমাজে স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিয়া, নিজস্বাধীনতা ও সম্মান অর্জ্জন করেন। যিনি যত সংযত, শক্তিসম্পন্ন ও পরহিতৈষী, সভ্য সমাজে তাঁহার তত সমাদর করে। সভ্যতার চরম ধৈর্য্য কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ—যাহার দ্বারা মানব পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগৎ মানে না বলিয়া সভ্য হিন্দু জাতিও কি তাহাদের আদিম সভ্যতা ত্যাগ করিবে? অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে কি হিংসা নীতি টিকিবে।' হিন্দুর গভীর নাগরিক নীতিমূলক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া—দেহমনের গঠন করিলে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে নীতির প্রভার প্রকাশ পাইবে(১)।

যোগ সাধনায় দেহের উপর মনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা জন্মে, ক্রমে—মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়—উহা হইতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হেতু দেহ ও মন উভয়েই স্বীয় অধীনস্থ হয়। 'অধীনস্থ দেহ ও মন—সংযম সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারে। সংযমই মনের অলৌকিক শক্তির কারণ।(৯)

বাল্যকাল হইতে শারীরিক পরিশ্রম করিলে অবশ্যই দেহের গঠন বিরামময় হয় ও সুস্থকায় হওয়া যায় ।(৩) শ্রমজীবীদিগের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।(১) ব্রহ্মচর্য্যের যৌবনের

প্রারম্ভকালে কঠোর ব্যায়াম চেষ্টা আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রাপ্ত যৌবনে যদি সম্ভব হয় তখনও লঘু ব্যায়াম হিতকর এবং উহাতে বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরণে বাধা দেয় না। শিশুকাল হইতে কঠোর ব্যায়ামে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণে বাধা পাইতে পারে। অধিক ও কঠোর ব্যায়াম, সারা জীবন একাধারে চালান সম্ভব নহে। যাহাদের চালনা করিয়া যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাদের অবশ্যই মধ্য বয়সের পরে ব্যায়াম চেষ্টা ছাড়িতে হয় ও ছাড়িলে যকৃৎ ও উদরের প্রক্রিয়া উত্তমভাবে না হওয়ায়—বাত, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়।(২) অধিক পরিশ্রম করিলে, তদনুরূপ পুষ্টিকর আহার ও বিশ্রাম না করিলে দেহের ক্ষয় ও মনের দৌর্ব্বল্য অবশ্যই আসে! কঠোর ব্যায়ামে পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। পরাধীনতার দেশে মধ্যবিত্ত লোক আজ প্রায় নিরন্ন। পুষ্টিকর আহার ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক এতদুভয়ের অধিক পরিশ্রমই ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। অলস ব্যক্তির অধিক মানসিক পরিশ্রমে শরীর সুস্থ রাখা সম্ভবপর হয়। দ্রুত ভ্রমণাদি লঘু ব্যায়ামের প্রয়োজন। অধিক মানসিক চিন্তার পর মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন। অধিক চিন্তায় চিত্তবিকারগ্রস্ত হয়, তাই উন্মাদ, অনিদ্রাদি হইতে উদরের ও প্রাথমিক ব্যাধি কখনও কখনও হৃদযন্ত্র ও ধমনীগুলিতে বিকৃতি লক্ষণ হইয়া অধিক হৃদ্রোগ চাপজনিত ব্যাধি আদির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যোগসাধন মার্গে কিন্তু দেহ ও মনের একাধারে উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই পন্থার ইচ্ছা অনুযায়ী দেহ ও মনের কার্য্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা যায়, ও তদধিক বিশ্রাম উপভোগ করা যায়।

শিক্ষা পাইলে অনেকের পক্ষেই যোগসাধনা করা সম্ভব হয়। নিত্য অল্পক্ষণ সাধন করিলে শরীর ও মনের যথেষ্ট মঙ্গল হয়। বিষয়টি গোপনীয় রাখা যে ঠিক যৌক্তিক তাহাও বলা চলে না। কারণ শিক্ষা পন্থা প্রস্তুত প্রণালী, ব্যবসার মূলতত্ত্ব ইত্যাদি যদি গোপন রাখা কার্য্য হয়, তবে এই তত্ত্বোৎকর্ষক পরাবিদ্যার গোপনতা বাঞ্ছনীয়?

তবে বিদ্যাটি মূল্য হইতে দেওয়া উচিত নহে।

References :

(1) The Journal of the Indian Medical Association, Calcutta Vol XIII no 3 Page 77, (Dec 1943)

(2) The Journal of Ayurveda, Cal Vol III Pages. 98, 306,375 ; Vol XV Page 46, 287 (1936-39)

(3) The Chikitsa-Jagat, Calcutta. Vol XV no 7 Page 147 (May 1944) Baisakh Bs 1351

(4) The Indian Medical Record, Calcutta, Vol LXIV no 4 Page 101 : no 6, P 199 (1944)

(5) The Health, Madras, Vol XXI no 5 Page 98 (May 1943)

(6) The Bharatvarsha, Calcutta Vol XXXII no 1 Page 57 (Asarh Bs 1351)

(7) The Calcutta Municipal Gazette, Cal Vol XLI no 10, Page 298 ; (27th Jounary 1945)

পথ

"ভাস্কর"

১

এ স্থানটা এতদিন ছিল একটা শালবন।

কিছুদিন হইতে এ স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বড় একটা রাস্তা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বড় বড় গাছ কাটিয়া সরাইয়া ফেলা হইতেছে। উঁচু নীচু স্থানগুলিকে কাটিয়া ও মাটি ভরিয়া সমান করা হইতেছে। বহু দূর হইতে লরী বোঝাই ইট, খোয়া, পাথরকুচি আরও কত কি আসিতেছে। গোটা দুই প্রকাণ্ড রোলার এক স্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এক দল ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার ও অন্যান্য কর্মচারী সর্ব্বদা ঘোরাফেরা করিতেছে।

যেখানে পথ ছিল না, সেখানে পথ হইতেছে। যেখানে কখনও কোন মানুষ যাতায়াত করে নাই, সেখানে বহু লোক যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। অজ্ঞাত স্থানটি সহসা অতিকায় হইয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। নির্জ্জন বনস্থল কলরবমুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এপাশে ওপাশে কয়েকটি তাঁবু পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বাস করেন কয়েকটি কর্মচারী, আর মজুত থাকে নানাপ্রকার কাগজপত্র আর যন্ত্রপাতি। কয়েকটি টিউব-ওয়েল বসান হইয়াছে প্রয়োজনীয় জলের জন্য।

প্রকৃত পরিশ্রমের কাজ যাহারা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে আছে পুরুষ, আছে নারী, আছে বালকবালিকা। ইট বহা, মাটি কাটা, জল

তোলা, গাছ কাটা, রোলার টানা প্রভৃতি কত রকমের কত কাজ। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু পুরুষ ও বহু নারী মিলিয়া নিজেদের শরীরের সকল শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে এই পথ। এই পথে নরনারী গমন করিবে, বালক-বালিকা গমন করিবে, গরুর গাড়ী, রিক্‌শ, মোটর গাড়ী চলিবে। কত দ্রব্য দূর হইতে দূরান্তরে যাইবে এই পথের উপর দিয়া। কেহ যাইবে ধীরে, কেহ যাইবে দ্রুতগতিতে। কেহ যাইবে নিকটে, কেহ যাইবে দূরে। কত অপরিচিতের সঙ্গে কত অপরিচিতের সাক্ষাৎ হইবে ক্ষণেকের জন্য। এই পথ বাহিয়া কেহ যাইবে আনন্দের গান গাহিতে গাহিতে, আবার কেহ যাইবে করুণ বিলাপ করিতে করিতে। এই পৃথিবীর, এই সমাজের কত সুখ, কত দুঃখ বহিয়া যাইবে, ভাসিয়া যাইবে এই পথের বুকের উপর দিয়া।

এই নূতন পথের কাজে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আছে একটি ক্ষুদ্র পরিবার—রামু, রামুর মাতা, আর রামুর স্ত্রী শোভা। রামুর শরীরটা যেন মানুষের শরীর নয়, কাল পাথরের মূর্তি যেন। নিরেট কাল পেশী-বহুল সুন্দর সবল যৌবনদীপ্ত দেহখানির দিকে যাহারই দৃষ্টি পড়ে সেই তাকাইয়া থাকে। কাজ করে অসুরের মত। তাহারই মত অন্য শ্রমিকরা যে কাজ করে একদিনে, রামু তাহা শেষ করে একবেলায়। বেশী কাজ করিতে পারে বলিয়া তাহার আদরও বেশী। পুত্রের দিকে চাহিয়া মাতার বুক আনন্দে ভরিয়া ওঠে। স্বামীর দিকে চাহিয়া শোভার মন গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়। রামুর মনিবরা তাহাকে ভালবাসে, সহকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, হয়তো মনে মনে একটু হিংসাও করে।

পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামুদের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে থাকে। দিনের পর দিন ক্রমশ যেমন প্রশস্ত পথটির স্বকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি রামুদের কুটীরখানিও ক্রমশ শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। গৃহখানি বেশ ভাল করিয়া পুনর্নির্মিত হইয়াছে। চারিদিকে একটা বেড়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ফুল গাছও রোপণ করা হইয়াছে। প্রকৃতির শোভা, কুটিরের শোভা একত্রিত হইয়া শোভার সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। নূতন পথ হইতে বেশী দূরে নয়। ছোট একটি পল্লী। প্রায় সকলেই এই পথে কোন না কোন কাজ করে। সকলেরই অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু স্বচ্ছল হইয়াছে। তবু রামুই যেন এদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী।

শোভার কুটীরের শোভা বর্ধন করিতে নূতন অতিথির আগমন-সম্ভাবনা হইয়াছে। রামুর উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে। শোভা কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। রামুর মা আনন্দে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া পুত্রবধূর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একটা আশা, একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ বাতাসে কুটীরখানির অন্তর ও বাহির ভরিয়া উঠিয়াছে।

২

সেদিন মাতা ও বধূ সারাদিন ধরিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়া নানাবিধ আহার্য প্রস্তুত করিয়াছে। স্থানীয় রীতি অনুসারে আজ তাহারা এবং তাহার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা একত্র বসিয়া প্রীতিভোজন করিবে, আর অনাগত যাদুধনটিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিবে।

রামু কর্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিল একটু যেন বিষণ্ণমুখে। সে নিজে যথাসাধ্য তাহার বিষণ্ণতা ও অবসাদ চাপিয়া রাখিল। শোভা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও সে জানাইল, ও কিছু না। এমনি।

ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র উৎসব শেষ হইয়াছে। রামুকে একান্তে পাইয়াই শোভা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে তোমার?

বিশেষ কিছু না। শরীরটা তেমন ভাল নাই।

শোভা রামুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত গরম। সে বলিল, একি গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে।

ইহার পরের সংবাদে নূতনত্ব কিছু নাই। কয়েক দিন খুব জ্বর হইল। ক্রমশ জ্বর কমিল, কিন্তু ছাড়িল না। জ্বর গায়ে লইয়াই কাজ করিতে গেল। শরীরের পেশীগুলি যতদিন সহ্য করিতে পারিল, ততদিন কোনমতে কাজ চলিতে লাগিল। যখন অসুখ আরো বাঁকিয়া বসিল, তখন একদিন একখানি ইটের গরীতে বসিয়া সুদূর সহর হইতে একশিশি ঔষধ লইয়া আসিল। কিছুদিন চিকিৎসার প্রহসন চলিল। রামুর মা নিকটস্থ মন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে একটি মাদুলী আনিয়া উহার

হাতে বাঁধিয়া দিল। নিয়তি হাসিতে লাগিলেন। পাথরে কোঁদা নিকল কাল অসুরের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে শীর্ণ হইতে লাগিল। বধূ উদ্বেগে আকুল হইয়া অসহায়ভাবে তথাকথিত করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের মিনতি জানাইল।

করুণাময় করুণা করিলেন না।

একদিন মাতা ও বধূর শত অনুনয় উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে গিয়া হঠাৎ রক্তবমি করিয়া পথের মাঝখানে একটি বালির কুড়ি সমেত পড়িয়া গেল রামু। আর উঠিল না।

মাতা আসিয়া উন্মাদিনীর মত পথের মাঝখানে "বাবা আমার" বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কুটীরে ফিরিয়া দেখিল, পাড়ার কতকগুলি মেয়ে পুরুষ জড় হইয়াছে তাহাদের অভিনয়—মৃদুর মধ্যে শোনা যাইতেছে নবাগত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন। আর মাতা! তিনি একটু পরে কাঁদিলেও তাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।

৩

ইহার পরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া কাটিবার কথা, ঠিক তেমনি করিয়াই কাটিয়াছে। সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে, শাশুড়ী ও পুত্রবধূ কোন মতে তাহা দিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে, শিশুটিকে পালন করিয়াছে। রামুর মা পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। তাহার কথায় কাজে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে। ক্রমশ লোকে তাহাকে 'পাগলী' আখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামুর এক বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা সে শোভাকে বিবাহ করে। বহুদিন শোভা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু বন্ধু তথাপি বন্ধুত্ব অস্বীকার করে নাই। অভাবে অভিযোগে, অসুখে বিসুখে সর্বদাই সে প্রকৃত বন্ধুর মতই ব্যবহার করিয়াছে। শাশুড়ীর বর্তমান অবস্থা, শিশুর ভবিষ্যৎ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া শেষ পর্যন্ত শোভা বিবাহে মত দিয়াছে। সর্ত্ত এই যে বন্ধুকে রামুর বাড়ীতে আসিয়াই বাস করিতে হইবে এবং রামুর মাকেও 'মা' মনে করিতে হইবে। বন্ধু একসঙ্গে মাতা, বধূ ও পুত্র লাভ করিতে সানন্দে স্বীকার করিয়াছে। বিবাহের দিনও শোভা রামুর জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছে, বন্ধু সান্ত্বনা দিয়াছে, রাগ করে নাই। কুলীর বন্ধু তো।

রামুর মার অবস্থা ক্রমশই যেন খারাপ হইতে লাগিল। এখন প্রায় কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে। শোভা ও তাহার স্বামী অনেক কষ্টেই তাহাকে আগলাইয়া রাখে। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্নানাহারের কথাও মনে থাকে না। মাঝে মাঝে নূতন রাস্তার মাঝখানে, ঠিক যেখানটায় রামু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানটায় বসিয়া পড়ে, "বাবা আমার" বলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। এই সময়ে পথে যে সব গাড়ী চলে, কোনটি একটু থামিয়া যায়, কোনটি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, কোনটি হইতে কেহ হয়তো একটু 'আহা' বলিয়া সমবেদনা জানায়, কেহ বা দু একটা পয়সা ছুড়িয়া দিয়া যায়। যে সব গাড়ী সর্বদা এই পথে যাতায়াত করে, তাহারা এই পাগলীকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রাণের গভীরতম প্রদেশের যে ব্যথা তাহাকে আজ পাগল করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ইহাদের মনেও উদাস সহানুভূতি জাগে।

৪

সেদিন গাড়ীর খুব ভীড়। এই প্রকাণ্ড রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অসংখ্য গাড়ী—মোটর গাড়ী, লরী, মোটর বাস। সাইকেল, সাইকেল-রিকশ ও সহর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীরও অভাব নাই। নিকটেই কোথায় একটা মেলা বসিয়াছে। তাই এত যাত্রীসমাগম। বিবিধ পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া এবং বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ জনমণ্ডলী বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অগণিত যানবাহন।

পাগলী তাহার অভ্যাসমত রামুর শ্মশানতীর্থ সেই রাস্তার ঠিক সেইখানটায় আসিয়া আজও বসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে একা নয়। কোলে তাহার নাতি—রামুর পুত্র। কোন ফাঁকে শোভার অলক্ষিতে তাহার নয়নের মণিটি কোলে করিয়া পাগলী চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। রাস্তার প্রায় সব গাড়ীগুলিই পাগলীকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

একবার একখানি লরী একখানি রিকশাকে বাঁচাইতে গিয়া একেবারে আসিয়া পড়িল পাগলীর গায়ের উপর।

যথাসাধ্য ব্রেক করিয়াও গাড়ীর গতি রোধ করা গেল না। প্রকাণ্ড চাকার তলায় পড়িয়া পাগলী ও তাহার নাতির দেহ নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল।

পুত্রকে বাড়ীতে না দেখিয়া শোভা ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার পাশে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা বিহ্বল হইয়া গেল। প্রাণ দিয়া তাহার স্বামী যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই পথের যাত্রীর উল্লাস সমারোহে তাহার প্রিয়তম পুত্রের সমাধি রচিত হইল, এটা ভগবানের কোন্ জাতীয় পরিহাস, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শোভা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

শ্রীকালিদাস রায়

অনুপমার প্রেম

যে সমাজে এগারো বারো বছরের মধ্যেই বালিকাদের বিবাহ হইয়া যাইত—সে সমাজের কথা লইয়া নরনারীর প্রেমের উপন্যাস লিখিতে হইলে নবদম্পতির কিম্বা বিবাহের আগের প্রেমই দেখাইতে হইত। আর কুমারীর প্রেম দেখাইতে হইলে ছবছ-বিনিময় দেখানোর সুবিধা হইত না—অনুপমার মত মুখর কিশোরের প্রতি একতরফা অনুরাগ দেখানো চলিত। শরৎচন্দ্র এইরূপ প্রেমের অস্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিয়া এগারো বছরের অনুপমাকে রাশি রাশি অক্ষর পড়াইয়াছেন এবং তাহাকে ধনীর আদুরী দুলালী করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—রাশি রাশি অক্ষর পড়িয়া এগারো বছরের অনুপমা বুড়ি বছরের মেয়ের মত পাকা হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজেই নিজের পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিল। সমগ্র গল্পটি অনুপমার এই অপরাধের মত বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য শরৎচন্দ্রকে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অনেক আয়োজনই করিতে হইয়াছে।

১। সুরেশের মত গুণবান ছেলে—যে বি-এ পরীক্ষায় (অবশ্য কোন বিষয়ের অনার্সে) প্রথম স্থান অধিকার করে, দেখাইতে হইয়াছে সেও মাতা পিতার অবাধ্য হইয়া বিবাহের দিন সকলকে বিপদেও একটি সরলা বালিকার অদৃষ্ট বিপন্ন করিয়া পলায়ন করিতেছে।

২। বর বিবাহের রাত্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে অন্যত্র সহিত কন্যার সেই রাত্রেই বিবাহ দিতে হইবে অন্যথা জাতিচ্যুতি হইবে—এইরূপ একটা কুসংস্কার সেকালে প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া অনেক গল্প কাহিনী সেকালে বিরচিত হইত। সুরেশের অভাবে পাত্রানুসন্ধান অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অনুপমার জন্য গ্রামে কিম্বা নিকটস্থ গ্রামে একজন যে কোন বিবাহার্থী যুবক পাওয়া গেল না, শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। অনুপমার পিতা সুরেশের পিতাকে ৫ হাজার টাকা দিতে রাজী ছিলেন—এজন্য তাঁহার দশ হাজার টাকা দিতেও অসম্মতি হইত না। দশ হাজার টাকার লোভেও কোন যুবকের পিতা বিবাহ দিতে রাজী হন নাই—ইহা অস্বাভাবিক মনে হইবে। তাহাতে অনুপমার অধিবেচনার দণ্ড হয় না। কাজেই একজন কাল্পনোগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে অনুপমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে।

৩। অল্প বয়সে অনুপমার বৈধব্য ঘটানো হইয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মাতা পিতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

৪। অনুপমার পিতার উইল গোপন করা হইয়াছে।

৫। অনুপমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একটি পিশাচ করিয়া তোলা হইয়াছে। অনুপমা চন্দ্রনাথবাবুর একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী, সে বিধবা সুন্দরীমা, চন্দ্রনাথবাবুর বিধবা সম্পত্তিতে তাহার দাবি-দাওয়া নাই—সে পরিচারিকার মত পরিশ্রম করিয়া ভ্রাতৃ সংসারে একবেলা অন্নগ্রহণ করে, এইরূপ ক্ষেত্রে অনুপমার নির্য্যাতন হইবার কথা নয়। যে শরৎচন্দ্র রামের সুমতিতে মায়াবতীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তিনিই চন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা অথবা অনুঢ়ার মত স্নেহস্বাধীন প্রতিপালিতা অনুপমাকে সে নারী নিজের সংসারে গ্রহণ করিতে পারিল না। এ সমস্ত অনুপমার মতবিধানের আয়োজন ছাড়া কিছুই নয়।

৬। অনুপমার পিতা যখন অনুপমার বিধবা বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন তখন অনুপমাকেই তাহার বিরোধিনী করা হইয়াছে—ইহা স্বাভাবিক হইলেও তাহার অধিকতর দণ্ডের সমুচীন করার জন্যই এ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে।

৭। যে ললিতকে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের যুবকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—যে ললিত মদ্যপায়ী, জুয়ার আসক্ত, অমিতব্যয়ী, যে ললিতকে জেলে পাঠাইবার জন্য অনুপমাই সহায়তা করিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত তাহার হাতেই সমর্পণ করিয়া শরৎচন্দ্র অনুপমার চরম দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

অনুপমা যে ভুল করিয়াছিল—স্কুলের মত আজ কাট, কিন্তু এত বেশী দণ্ডের আর সঙ্গত কাট সঙ্গ করিতে পারে না। মেজদাদা স্নেহোন্মাদিনী বালিকা অনুপমার চরিত্র বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একভাবে অগ্রসর হইয়াছে। বিবাহের পর হইতে আর একভাবে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার

চরিত্রের প্রকৃতিস্থতা রক্ষার জন্য আমাদের কাছে উজুক হইয়াছে—যখন সে বলিয়াছে—"বাবা আমায় রক্ষা কর।"

কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। এই প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আবেদন পিতা শোনেন নাই বলিয়া সে বিবশা হইয়া অগত্যা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত অভিমানকে প্রকাশ করিল। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন অভিমানিনী অনুপমা বাড়ু বাড়িল। মনে মনে বলিল—তখন হাত গেল, আর এখন মরব না। যখন চক্ষু কর্ণ বন্ধ ক'রে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারো চোখ ফুটেছে—আমিও তারোরূপ প্রতিশোধ নেব।

কিন্তু প্রতিশোধ কাহার উপর? আত্মনিগ্রহের দ্বারা নিজের দণ্ডই ঘনীভূত করা। অনুপমা নিজেকেই নিজে দণ্ডিত করিল সব চেয়ে বেশি।

শরৎচন্দ্র পরিহাস-রসিকতায় গল্পটির আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত গল্পটিকে ভাবগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার শেষ বক্তব্য দাঁড়াইয়াছে—যে ভালবাসে না, ভালবাসিতে জানে না—সে কি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া Gilchrist বৃত্তি পাইলেও তাহাকে ছুরি দান করা চলে না, কিন্তু যে মূর্খ, অমিতব্যয়ী, ছেলে খাটে, মদ খায় সেও যদি ভালবাসে তবু তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করা চলে। নিজের চেয়ে এ জগতে যাহার বড় কিছু নাই সে ভালবাসার অযোগ্য—যে নিজেকে ভুলিতে পারে সে যত পাপিষ্ঠই হোক সে ভালবাসার যোগ্য। মরীচিকায় পিছে ছুটিলে নিরপরাধ দুর্ঘটনাও কি সর্ব্বনাশ হয় না? সোনার হরিণের লোভে মহীয়সী সীতার দণ্ডের কি অবধি ছিল?

কাশীনাথ

কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা, কাঁচা লেখা। কাশীনাথ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের লোক—এই অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র লইয়া তিনি গল্পটি আরম্ভ করিয়াছেন। যুবজনসুলভ Sex-appeal এই চরিত্র হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে। কাশীনাথ চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকার (Heredity) ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের সহায়তা লইয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ তাহার চরিত্রে একটা উদাস ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই ঔদাস্যে প্রেমের পরিপন্থী, শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র যে যুগের কাহিনী রচনা করিয়াছেন—সে যুগে কৌলীন্যের প্রভাব পুরামাত্রায় বিদ্যমান। জমিদার তাহার একমাত্র কন্যাকে অজ্ঞাত কুলীন যুবকের হাতে দান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। সংস্কৃত শিক্ষাই সে যুগে ব্রাহ্মণের জন্য প্রধান শিক্ষা-রূপে গণ্য। অন্য একদিকে পল্লীগ্রামের ছোট জমিদারের কাছারির ম্যানেজার কি-এ পাশ-করা কোর্ট-শার্প-পড়া যুবক। উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক শেষ সময়ের চিত্র এইখানি তাহা অস্বীকার উপায় নাই। যে সময়ের কথাই হউক—সে সময়ের আবহাওয়া ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। চতুরালী ও জমিদার কুলের আবেষ্টনীও এ চিত্রে ফুটে নাই। নায়িকা কমলাকেও শেষ পর্য্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রে পরিণত করা হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত কিন্তু কাশীনাথেই হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য এবং নারীচরিত্রের সক্রিয়তা ও প্রাধান্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একটা বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য কাশীনাথেও আছে। পল্লীসমাজের রমার পূর্ব্বাভাস কমলার আছে। রমা ও কমলা একার্থক। পুরুষ চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের রচনার একটা টেকনিকেরই অঙ্গ। ইহাতে তাহাও আছে। "অহেরিব গতি প্রেমঃ"—প্রেমের গতি ঋজুপথ ধরিয়া নয়, কুটিল পথ ধরিয়া। শরৎচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে ইহাই দেখাইয়াছেন। কাশীনাথেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। তবে প্রেমপথের কৌটিল্য এতবেশি ঘুরে চলিয়া গিয়াছে যে তাহাকে আবার সহজ ঋজু পথে ঘুরাইয়া আনিতে অনেক আয়োজন করিতে হইত, শরৎচন্দ্র তাহা করেন নাই। অবতরণের জন্য ঘোড়াই সময় লাগে, অধিরোহণের সময় তাহার চেয়ে ঢের বেশি লাগে, কলা বিজ্ঞানের এই সত্য শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছেন। গোরুর গাড়ী না হইলেও ঘোড়ার গাড়ীতে ঘুরে চলিয়া গিয়া যেন বিমান যোগে ফিরিয়া আসা।

কমলা বিনয় সম্পর্ক নিজের নামে লিখাইয়া লইয়াছিল—প্রেমের সম্পর্কে বৈচিত্র্য সম্পাদনের পক্ষে প্রেমের প্রতি কৌটিল্যের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল। শরৎচন্দ্র এই ব্যাপারে একটু বেশী পরিমাণে Emphasis দিয়া ফেলিয়াছেন। একটা মকর্দ্দমার অবতারণা ও কাশীনাথের সাক্ষ্য দান পর্য্যন্ত যথাযথ গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তাহার পর যাহা ঘটিল—তাহা শরৎচন্দ্রের অভ্যাসসংযত লেখনীর পক্ষে স্বধর্ম্মচ্যুতি। শরৎচন্দ্রের সহজয়া প্রেমিকারা বুকে প্রেম পোষণ করিয়া মুখ কটু-ভাষিণী। এই কটু ভাষা আঘাত করিবার জন্য ছুটে, কিন্তু জীবনকে বিপন্ন করার জন্য নয়। কাশীনাথকে আদরে বলাইয়া যখন সে খরের অন্ন গ্রাস মুখে তুলিতেছে তখন কমলার উক্তি—

যে চিরকাল পরের খেয়ে মানুষ—এখনও যাকে পরের মুখ খেয়ে উপোস করতে হয়, তার সত্য কথা বলবার সখই বা কেন, আর এত অহঙ্কারই বা কেন!...যে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তার স্নেহ পোষা পায় না। এই সকল কথা কাশীনাথের পক্ষে আত্মহত্যার প্ররোচক। তারপর কমলা কাশীনাথকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। কাশীনাথের বিদায়কালীন কথা, প্রেম ও সহিষ্ণুতার বাক্যগুলি তাহার চিত্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না। ইহাতে প্রেমের শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ইহার পর আর প্রেমের প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। কোর্টশার্প-পড়া কি-এ পাশ ফেল যুবক ম্যানেজারের সঙ্গে টুলো পণ্ডিতের জমিদারিণী পত্নী কমলার পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কথা হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা বলিল—আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিনয়বাবু—ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ মৃদু মৃদু কথা

হইল, তারপর বিজয়বাবু বাহিরে আসিলেন। তারপর আধঘণ্টা নজর কমলার কট্ ভাষা। তারপর রাত্রে কাশীনাথের বিষ খুন। সে সংবাদ শুনিয়া কমলা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কি করিয়া এই অনর্থ ঘটিল এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল—একেবারে খুন হয়ে গেছে? এইগুলি এক সঙ্গে করিলে বুঝা যায়, বিজয় ও কমলার মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, কাশীনাথকে মৌখিক প্রহারের দ্বারা শাস্তি দিতে হইবে, যাহাতে বেশ দুই চারিদিন শয্যাগত থাকে। কিন্তু বিজয়ের আবেগেই হউক, আর শুশ্রূষার সতর্কতার অভাবেই হউক—কাশীনাথকে এরূপ আঘাত করা হইয়াছে যাহাতে সে 'একেবারে খুন।'

ইহার ফলেই কমলার মূর্ছা। কাশীনাথ লোক চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহারা শ্বশুর পরিবারেরই অনুজীবী বলিয়া বাস করে নাই এবং অন্যের অলক্ষ্যে কাশীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—'ওগো কমলা, একাজ তুমি করনি। আমি মরেও সুখ পাব না, কমলা, শুধু একবার বল, এসব কীজ তোমার দ্বারা হয়নি।'

কমলা যে প্রেমকে এতদূর অত্যাচারের ও অপমানের দ্বারা বিদায় দিল, দুই দিন অচেতন থাকিয়াই সে প্রেমকে সে একমুহূর্তে ফিরিয়া পাইতে পারে না। যদি পায় কখনও তবে তাহা সুদীর্ঘকালের বাসর শয্যার দ্বারা। অন্যের ক্ষমা ও প্রেম এক জিনিস নয়। অপ্রকৃতিস্থ কাশীনাথ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থতায়—তাহার ক্ষমা লাভ করা কঠিন নয়—কিন্তু চির-উদাসীন কাশীনাথের প্রেম ফিরিয়া আসিতে পারে না। প্রেমের গতি অধিক দ্রুত বটে, কিন্তু অধিক বাসনে প্রেমের রক্ষা পাওয়া কঠিন।

কাশীনাথে শরৎচন্দ্র কথাশিল্পের যে মাত্রা সৃজন করিয়াছিলেন পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে সে মাত্রায় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভুলেন নাই।

একই সুর

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

১

"আমার ব্যথা যিস্ সে ব্যথী
আমি সকল লথা রে.
প্রাণের কানু কেমন আছে
দেখ্‌ব চোখের দেখা রে।
যা ভাবায় নয়নমণি,
বৃন্দাবনের কানু সে.
কেমন করে সাজ্‌ল রাজা
হৃদয়সমের ভানু সে!
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু
দূর হ'তে একবার গো.
দুখের কথা কইব না রে
খোল্ রে দ্বারী, দ্বার গো।"

২

দ্বার খুলে যে দ্বার খুলে যে—
খোল্ রে দ্বারী খোল্.
স্বাধীনতার শব্দ নিতে
এলো এ কোন্ জন?
কতই রাজা রায় বাহাদুর
আসেন নানা বেশে,
ধূলায় মলিন বেশের সেবক.
এল দুয়ার দেশে।
সে এল রে নগ্নপায়ে—
চোখের জলে ভাসা,
রাজপ্রাসাদে মন্ত্রীবেশে
যমদূতের পাসা!

৩

বদ্‌লে গেছে বেশের ছাওয়া
বদ্‌লে গেছে কাল.
বেশের প্রতিনিধির গায়ে
নাই রে খাদী শাল।
রাঢ়ের রাঙা মাটীর ধূলায়
ধূসর সকল দেহ.
এই যে মায়ের বুকের পাঁজর
চিনল না হায় কেহ।
যেমন হাসে চাঁদ আকাশে
নাই রে বসন কুসি;
সুখ আকাশে রও, লাগে রে—
যখন হাসে উষা।

৪

রাজার সভায় চিন্‌ল না তো
সেই সেকালের দ্বারী.
মাটিপ্রাসাদে চিন্‌ল রে
কে এল কাঙারী।
রাজার রাজায় অনেক পরে
সেই সে কালের সুর.
আজকে বুক উঠ্‌ল ভরে,
চিত্ত যে ভরপুর।
মন্ত্রীসভায় আশিনাতে
বৃন্দাবনের বাঁশী.
স্মরণ করি পুলির দিনে
পুলিরামের ফাঁসী।

আবিষ্কার

শ্রীসুবোধ বসু

বম্বে শহরের অপামর সাধারণ এক-জোট হইয়া আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ খবরটা আগে টের পাইলে বম্বের ত্রি-সীমানা মাড়াইতাম না। ভারতের এই 'প্রবেশদ্বার'টির পাছ-দুয়ার দিয়া অতি চুপেচুপেই ভিতরে ঢুকিয়াছিলাম, কিন্তু অতি শীঘ্রই টের পাওয়া গেল, খবরটা এখানকার কাহারও কাছে গোপন থাকে নাই। বিখ্যাত ব্যক্তি হইলে অনায়াসেই মনে করিতে পারিতাম, ইহা খবরের কাগজের কুকীর্তি; আমার বম্বে আসার খবরটা পূর্ব্ব হইতেই প্রচার করিয়া আমার বিরুদ্ধে নিরীহ জনতাকে উস্কাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলি আমাকে স্বভাবতই উপেক্ষা করিয়াছে; কোনও সভা-সমিতিও সম্বর্দ্ধনা জানায় নাই। তবু বম্বের জনসাধারণ অনায়াসেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি সদ্য বম্বে আসিয়াছি। আমাকে নাকাল করিবার জন্য প্রত্যহই বিভিন্ন অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বম্বের বিভিন্ন দুর্গম স্থানের পথের নির্দ্দেশ আমার কাছ হইতেই জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথম ক'দিন ইহাতে সন্দেহ করি নাই। ভাবিয়াছি, আমার মতোই কোনো নবাগত হালে পানি না পাইয়া তৃণ আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। কিন্তু যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নতুন নতুন লোক জগতের অপরাপর লোকদের উপেক্ষা করিয়া একমাত্র আমার কাছ হইতেই পথের হদিস্ জানিবার ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল, তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা ষড়যন্ত্র বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলাম।

আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গল আবিষ্কারে লিভিংষ্টোন যে দুর্জ্জয় সাহস ও অ্যাডভেঞ্চার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সাহস এবং অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গে আমি বম্বের 'গেট্ অব্ ইণ্ডিয়া', তাজমহল হোটেল, ইয়াট ক্লাব প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়াছি এবং মিউজিয়মের সমুখের ট্রাম-টার্মিনসে পৌঁছিয়া পরিচিত স্থানে প্রত্যাগত অভিযানকারীর গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এমন সময় একটা বদ্ লোক আমার সমস্ত তৃপ্তি ও গর্ব্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিল। আশেপাশে অপেক্ষমান যাত্রীর কোনই অভাব ছিল না, কিন্তু লোকটা তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিল না। জনতার মধ্য হইতে ঠিক আমাকেই বাছিয়া লইয়া ঘাড় শক্ত করিয়া আগাইয়া আসিল। অর্থাৎ, তোমাকে ছাড়া চলিবে না। অত্যন্ত চিন্তিতে সে প্রশ্ন করিল, 'এই ট্রামটা কি মহম্মদ আলী রোড হয়ে যাবে?'

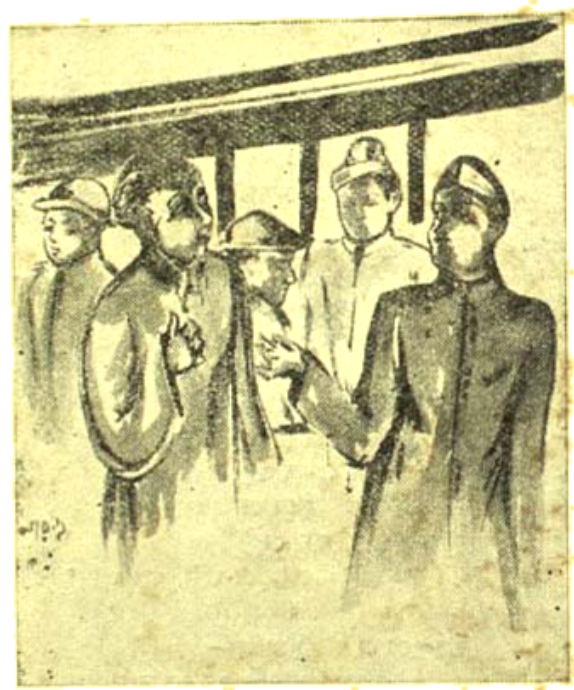

ট্রামটা কি মহম্মদ আলী রোড হ'য়ে যাবে?

একবার প্রশ্নটা শুনুন। বম্বের ট্রাম কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে যায়, কিছুই জানি না; এমন কি, ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান আছে কিনা, না মাঝপথে দিক বদলাইয়া যে কোনও দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ হই নাই। সেই আমার কাছে উপস্থিত

হইয়া মহম্মদ আলী রোডের ট্রামের খোঁজ না করিলেই কি চলিত না?

আঙুল দিয়া লোকটাকে ট্রাম-কোম্পানীর উর্দ্দি-পরা এক কর্ম্মচারিকে দেখাইয়া দিলাম। ভাবখানা এই যে, এত কাছে ট্রামের লোক দাঁড়াইয়া থাকা সত্ত্বেও আমার মতো ভদ্রলোককে বিরক্ত করা কেন? আশঙ্কা হইতে লাগিল, লোকটা হয়তো এইবার বলিয়া বসিবে, 'এইটুকু বলে দিলে তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যেত না।' কিন্তু দেখা গেল, মানুষটা অত খল নয়; আমাকে আর জব্দ করিবার চেষ্টা না করিয়া সে ট্রাম-কর্ম্মচারির কাছেই আগাইয়া গেল। বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম। গত ক'দিন ধরিয়া যে সকল ব্যক্তি আমাকে শুধু গন্তব্যস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া রীতিমত জেরা করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহাদের তুলনায় ইহাকে দেবতুল্য লোক মনে হইল। ভাবিলাম, মহম্মদ আলী রোড নামে বম্বে শহরে যে একটা রাস্তা আছে, এই অমূল্য সংবাদটি নোট বইয়ে টুকিয়া রাখি।

পাঁচ দিন বম্বেতে বাস করিবার পর একটি তথ্য খুব ভালো করিয়াই শিখিয়াছি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ স্টেশনের সামনে গোলাকার পার্ক-ধরণের যে ভূখণ্ডটুকু আশে পাশে সকল নিম্নশ্রেণীর বেকার ও অলস জনতার বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'বোড়ি বন্দর'। এইটা কি করিয়া বন্দর হইল এবং কোন্ বেদের মাঝে ইহাকে বড়ো বলা চলে তাহা সমস্যার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন একটা সর্ব্বজনবিদিত 'ল্যাণ্ডমার্ক' পাইয়া আমার বড় সুবিধা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ ফিটন গাড়ির চালককে ভিক্টোরিয়া টার্মিনসে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলে পথ ভুল করিয়া বসিতে পারে, কিন্তু 'বোড়ি বন্দর' বলিলে কখনও ভুল করিবে না। অতএব আমি এই বোড়ি বন্দরকে অনিত্য জগতে একমাত্র নিত্য বস্তু হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও মিউজিয়মের টার্মিনস্ হইতে বোড়ি বন্দরগামী ট্রাম আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। যেদার গাড়ি যাবার যাইতেছে, কলবাদেবী বা জৈবিতলাও, ভারদেও বা গোরাপিয়া ট্যাঙ্ক যাইতেছে, অথচ বোড়ি বন্দরের বোর্ড একটা ট্রামেও খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া আগাইয়া গিয়া ট্রামগুলি কর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

লোকটা একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাইল। ভাবখানা এই যে, এটা আবার কোথাকার আনাড়িরে! অতঃপর কড়ে আঙুলটিকে কষ্টের সঙ্গে সামান্য উঁচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া গাড়িগুলোর কোনও একটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

আর বাদানুবাদ অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি সামনে আগাইয়া গেলাম এবং সম্মুখের দোতলা ট্রামটিকে উপেক্ষা করিয়া পরের ছ্যাকরা ট্রামগাড়িটাতে চাপিয়া বসিলাম। এইটাই ইঙ্গিতের লক্ষ্য মনে হইয়াছিল, এজন্যই দোতলাকে উপেক্ষা করিয়া একতলাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বম্বের ট্রাম টার্মিনস্ হইতে কখন ছাড়িবে বা ছোটেই ছাড়িবে কিনা, কিছুই ঠিক নাই। অপরিচ্ছন্ন আসনগুলি মোটেই আরামপ্রদ নয়; ট্রামের যাত্রীরাও অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। বম্বের ভদ্রলোকেরা অধিকাংশই বাস্-এ চড়েন। বাস্-এর গতিবিধি আরও রহস্যজনক মনে হওয়ায় আমি কখনও বাস্-এ চড়িতে ভরসা পাই না। কিন্তু নিরুপায় ট্রামে অবস্থিতে সারা হইয়া স্থির করিলাম, আগামী কাল হইতেই বাস্ অভিযান শুরু করিব। এমন সময়, আমাকে নিরস্ত করিবার জন্যই যেন ঘটাং ঘটাং শব্দ করিয়া ট্রাম ছাড়িল। ল্যাণ্ডো-গাড়ির সইসের মতো পোশাক-পরা ট্রাম-ড্রাইভার হইলে উল্টা প্যাচ মারিয়া গাড়ি ছাড়িস।

এইবার নূতন অবস্থিতে তটস্থ হইয়া উঠিলাম। যাইবে তো এইটা বোড়ি বন্দর! অথবা কলবাদেবী বা ঘোবিত-লাওয়ের গোলক ধাঁধার মধ্যে টানিয়া লইয়া আমাকে নির্দ্দয়ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে? সারা রাত ধরিয়া মাকড়সার জালে-পড়া মাছির মতো মুক্তি পাইবার জন্য হাত-পা ছুঁড়িয়া মরিব!

এই তো 'কালা ঘোড়া'! বম্বের পরিচিত 'ল্যাণ্ডমার্ক'-গুলির মধ্যে এই 'কালা ঘোড়া' অন্যতম। মহামহারথীরা স্বর্গীয় হইলে রাস্তার মোড় অথবা পার্কের মধ্যে স্তম্ভের উপর প্রস্তরীভূতরূপে দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা জানি। কিন্তু এইখানে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোড়াকে প্রাধান্য দেওয়ায় বম্বের 'কালা ঘোড়ার' প্রতি প্রথম হইতেই আমার সম্ভ্রম আকৃষ্ট হইয়াছিল। এমন মহাপুরুষ ঘোড়া দর্শনে

কে না অভিভূত হয়। এখন ইহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম, ঠিক পথেই চলিয়াছি। দিক্‌চিহ্নহীন অর্ণবের মধ্যে আমার কাছে 'কানা ঘোড়া' ধ্রুবতারার মতো মনে হইতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া উদ্বিগ্ন মাথাটাকে জানালার বাহির হইতে ভিতরে টানিয়া আনিলাম।

কয় মিনিট অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেখিলাম, আমি হারাইয়া গিয়াছি! ট্রামগাড়ি আমার সঙ্গে জঘন্য প্রবঞ্চনা করিয়াছে! কানা ঘোড়া দেখাইয়া আশ্বস্ত করিয়া এখন আমাকে সম্পূর্ণ অজানা রাজ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

মিউজিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ পর্য্যন্ত রাস্তাটা আমার মুখ-চেনা। কিন্তু কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজাবাই টাওয়ার, কোথায় মহাত্মা গান্ধী রোডের বড় বড় দোকান অফিস বাড়ি, কোথায় ফ্লোরা ফাউন্টেন? এ কোন্ দুর্গম-লোকে আসিয়া পড়িয়াছে? এই অপরিচিত পথ দিয়া, রুদ্ধশ্বাস অট্টালিকাশ্রেণীর গা-ঘেঁষিয়া ট্রাম-গাড়ি আমাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? চকিতে বুঝিতে পারিলাম, ভুল ট্রামে চড়িয়াছি; ট্রামের কর্ম্মচারি আমার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করিয়াছে! তবু নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পাশের যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাই হর্ণবি রোড তো?' সে লোকটা দুই সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'এটা মিণ্ট রোড।'

আর সন্দেহ রহিল না। আমাকে নাকাল করিবার ষড়যন্ত্র ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। হাঁক ডাক করিয়া তখনই ট্রাম থামাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নির্দ্দয় ট্রাম পরের ষ্টপের আগে থামিল না। আমি প্রথম সুযোগেই নামিয়া পড়িয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আরও গভীর এবং অপরিচিত অঞ্চলে গিয়া পড়িবার আগেই যে নামিয়া পড়িতে পারিয়াছি, সেইটাই বাঁচোয়া। এইবার উল্টো-মুখী ট্রামে চড়িয়া মিউজিয়মে ফিরিতে পারিব বলিয়া আশা করি—অবশ্য যদি ওদিকের ট্রামগাড়ি ইতিমধ্যেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া না থাকে।

যা দিকে উঁচু রেলিং-ঘেরা একটা গোলাকার পার্ক। রাস্তার আলোতে ইহার সরকারী নামটা পড়িলাম—'এলফিনষ্টোন সার্কল্'। ইহার আশেপাশে মস্ত উঁচু উঁচু সব বাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও জানালাতেই আলোর আভাস নাই। যেন ইহারাও সব ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আছে। না হইলে এত বড় বড় বাড়িতে আলো জ্বলিবে না কেন? পরে অবশ্য জানিয়াছিলাম, এই-গুলি সবই অফিস বাড়ি; কিন্তু তখন তো ইহাও জানিয়াছি, মিণ্ট রোড ঘুরিয়াও ট্রাম বোড়ি বন্ধর যায়।

যাহা হউক, বড় রাস্তার উপরে, এলফিনস্টোন্ সার্কেলের ঠিক উল্টা দিকে, প্রাসাদোপম একটা বিরাট হালান নজরে পড়িল। অন্ধকার রাতে জনবিরল রাস্তার উপর এই বাড়িটা প্রায় রূপকথার রাজার বাড়ির মতো স্তব্ধ ও রহস্যপূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বারবার তাকাইয়া এইটাকে কেবলই আমার ভূতুড়ে বাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ঐদিকেই আমার ট্রাম ষ্টপ্। রাস্তা পার হইয়া বাড়িটার সামনে গিয়াই দাঁড়াইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, সত্য শহরের সঙ্গে দুর্গম অরণ্যের তফাৎ কোথায়। উভয় স্থানেই দেখিতেছি, বেমালুম পথ হারাইয়া বসা সম্ভব।

সহসা পার্থক্য-নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিল। চকিতে পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, একটি ভারতীয় নাবিক একেবারে আমার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে কি সে আমার জলে-পড়া গোছের মুখের ভাব দেখিয়া উদ্ধার করিতে আসিয়াছে? কপালকুণ্ডলার মতো সমুদ্র-অকূল-প্রত্যাগত আমাকে সে-ও কি প্রশ্ন করিবে, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' শীঘ্রই সে প্রশ্ন করিল, কিন্তু প্রশ্নটি অন্যরূপ। সে বলিল, 'টাউন হল্ কোন্‌টা, বলতে পারেন?'

আমি প্রায় হিংস্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। আমার মনের যা অবস্থা তাহাতে নিজের নাম ভুলিবার উপক্রম হইয়াছি, অথচ এই লোকটা কিনা আমারই কাছে আসিয়া টাউন-হলের খোঁজ করিতেছে! বম্বেতে যে টাউন্-হল্ আছে, তাও এই প্রথম শুনিলাম। কাজেই টাউন-হলটা বাইকুল্লা না মহালক্ষ্মীতে, ভালাবার হিল-এ না প্যারেলে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুবিসর্গ ধারণাও নাই। কিন্তু রাগে গা জ্বলিয়া যাইতেছিল; সকলে এক-জোট্ হইয়া যদি আমাকে মিছিমিছি নাকাল করিবার

কাজে লিপ্ত হয়, তবে রাগ সংযত রাখিবার উপায় কি? আমিও প্রতিশোধ লইতে জানি।

বলিলাম, 'টাউন-হল? সে তো এখান থেকে বহু দূর। সি-বাস্-এ করে যেতে হয়। ঐ তো একটা বাস্-স্টপ দেখা যাচ্ছে রাস্তার মোড়ে। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। আধঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বাস্ পাওয়া যাবে।'

টাউন হ'ল? সে তো এখান থেকে বহু দূর

'বলেন কি, তাই নাকি?' সে লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল। 'আমাকে বলে দিলে খুব কাছেই। চার্চগেট্ স্টেশন থেকে সোজা রাস্তায়ই তো হেঁটে আসছি...'

'কত বাজে লোকে কত কথা বলে', আমি সন্ত্রান্তভাবে বলিলাম। 'কিন্তু আমার কাছে আর নয়। স্টপে গিয়ে দাঁড়াও। বম্বের বাস্ একটা ফস্‌কালে দারা রাত্তিরেও আর একটা পাবে না।...'

'আপনি ঠিক জানেন তো?'

'আলবৎ।' আমি জোর দিয়া বলিলাম।

আশা করি, আমার ট্রাম দু-চার মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে।

লোকটা চলিয়া গেল, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইবার বাছাধন টের পাও গিয়া। বম্বের রাস্তায় কেবল আমিই নাকাল হইব, ইহা একটা কথাই নয়।

কিন্তু ট্রামের কি হইল? অন্তত পনেরো মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, কোনও ট্রামের এদিকে আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমাকে জব্দ করিবার জন্য অন্য রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া শুরু করে নাই তো? নিশ্চিন্ত হইবার জন্য অবশেষে রাস্তার মধ্যখানে আগাইয়া গিয়া সেখানে দুই জোড়া ট্রাম-লাইনই আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় একজোড়া বুটের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখি, আমার ক্ষণকাল পূর্বের প্রশ্নকর্তা রাস্তা পার হইয়া আবার এইদিকেই আসিতেছে।

আবার কি চায় এটা? জেরাটা বাকি রাখিয়া গিয়াছে মনে পড়ায় জেরা করিতে ফিরিয়া আসিতেছে না তো? সি-বাস্ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কোন্ দিকে, কোন্ রাস্তা দিয়া, কোথায় যায়, এইবার হয় তো সেই প্রশ্নই করিয়া বসিবে। এমন কি, বম্বের টাউন-হলের স্থাপত্যরীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই বা যাবে কে?

আক্রমণাত্মক রণনীতিই আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া আমিও প্রস্তুত হইলাম।

'সে কি মশায়, আবার ফিরে আসচেন কেন?' আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম।

আপনার পিছনের দালানটাই টাউন হ'ল কি না—

সে বলিল, 'আপনার পেছনের দালানটাই টাউন-হল কিনা, তাই অগত্যা ফিরেই আসতে হলো। ওখানে নাবিকদের জন্য একটা ক্যান্টিন খোলা হয়েচে। সাহায্য করবার জন্য 'ধন্যবাদ! নমস্তে।' বলিয়া সেই দুষ্ট লোকটা খিটিমিটি হাসিয়া আমার পিছনের রাজপ্রাসাদ-মার্কা সেই বাড়িটার ফটকের দিকে আগাইয়া গেল।

পৃথিবীর বিখ্যাত অভিযানকারীরা আবিষ্কারের জন্য বহু দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা সহ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অর্দ্ধেকও অপমানিত হইয়াছেন তাঁহারা; এমন শুনি নাই। নিদারুণ ক্ষোভেপায়ের দিকে চাহিয়া বলিতে যাইতেছিলাম, ধরণী দ্বিধা হও, কিন্তু সমুখ দিয়া একটা খালি ট্যাক্সি যাইতে দেখিয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়া ডাকিলাম, 'ট্যাক্সি!'

গ্রামের জীবজন্তু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের গ্রামে অনেক ফুলবাগান ছিল এবং বনে বহু ফুল ফুটিত; সেই জন্য মৌমাছি ও প্রজাপতির ঝাঁক খুব বেশী দেখা যাইত। প্রতি বাড়ীতেই ২।৩ পানা মৌচাক থাকিত। আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই মৌমাছির গুঞ্জন শুনিতাম, বড় ভাল লাগিত তাই লিখিয়াছিলাম—

যখন যেখানে দেখি আমি মৌচাক,
দুই আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক।
বরষ সোনায় গঠিত কক্ষগুলি
দেখিয়া রাজার প্রাসাদ যাইবে ভুলি।
কবি ও শিল্পী নিজেরা ওখানে যেন
কোথা গুণিদের পরিমণ্ডল হেন?
রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা সুর,
অর্থের সাথে সঙ্গীত সুমধুর।
কোথায় এমন রসিক দলের হাট?
এক সাথে কোথা এত কবি-সম্রাট?

বিবিধ বিচিত্র রঙের প্রজাপতিগুলি উড়িয়া বেড়াইত—যেন এক একটী জীবন্ত ফুল, কতই বাহার। শুনিয়াছি ডিম পাড়িয়াই প্রজাপতি মারা যায়—একবার একটী করবী গাছের পাতায় দুইটী সুন্দর ডিম ও মৃত প্রজাপতি দেখিয়া লিখিয়াছিলাম—

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটী করবী গাছে—
মণিপদ্মিত দুইটী ডিম রাখি
বারেক ফিরালো মৃত্যু-আঁধার আঁখি,
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনী বহি!
সুত মঙ্গল কামনায় ছিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি
নিঃশেষ করে দিয়ে গেল যেন হৃদি।

গ্রামের মাঠে অনেক গরুগোরু থাকিত, অজয়ের তাণ্ডব ও বন্যা সমস্ত বৎসর প্রায় অপসারিত করিয়াছে। বৈশাখে নদীর ঘাটে যাইতে-যাইতে দুইটী গরুকে দেখিতাম—

"তৃণের মুগাগুলি নীরবে যেত ভুলি
বসিয়া তৃণ বন মাঝে।"

এক বৎসর প্রবল বন্যা আসিল—

প্রিয় বসতি ত্যজি শশক ছুটী আজি,
ভয়ে গুমুরে গেল দরি।
শুকায়ে গেল ঘাস, তবু সে নীড় খাস
শূন্য রহিল যে পড়ি।
আসিতে ফেরে আমি নিয়ত চেয়ে দেখি,
তা' দিকে দেখি নাক আর,
সাঁঝেতে মাঠ একা পড়িয়া থাকে ফাঁকা
আঁধার ঘন চারি ধার।

অনেক দিন পর তাহাদিগকে সেই মাঠে মৃত অবস্থায় দেখিয়া,

নিকটে গিয়া ধীরে দিলাম গায়ে হাত
সাড়া শব্দ কিছু নাই,
শান্ত বনভূমে দোঁহার মুখ চুমে
দুজনে পড়ে আছে তাই।
তা'রা কি পারে নাই ভুলিতে প্রিয় তুমি
তাদের প্রিয় তরুলতা?
মনে কি পড়েছিল সাঁঝে শ্যামল মাঠ
সে সুখ দিবসের কথা?
দেখা কি দেখেছিল ইহার ছায়া ছবি
চারিটী ছোট আঁখি কোণে?
এই যে শ্যামলতা মায়ায় বাঁধন কি
বাঁধিয়া ছিল দুটী জনে?

কুকুর নদীর তীরে ঘনঘন থাকায় নানা বন্য জন্তু আসিত। শৃগাল অসংখ্য ছিল, বড়ই উৎপাত করিত। কত বাঘ, চেড়া, হায়না তাহারা মারিত তার ইয়ত্তা নাই। তবে দু তিন বৎসর অন্তর এক একবার 'শিয়ালমারা' দল আসিয়া শিয়াল দল প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া যাইত। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পরও ৩৪ দিন ভয়ে শিয়াল ডাকিত না। মনে একটা অভাব ও কষ্ট অনুভব করিতাম। বানরগণও খুব উপদ্রব করিত, ত্রেতাযুগ হইতে উহা চলিয়া আসিতেছে—কাজেই সহনীয় হইয়া গিয়াছে। 'বানরমারা'র দল গ্রামে ঢুকিতে পাইত না—আমাদের গ্রাম তীর্থস্থান, এখানে বানরবধ নিষিদ্ধ। যে হেতু শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কায় যাইতে সাহায্য করিয়াছিল সেই জন্য কাঠবিড়ালও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী। গাঁওতালেরা মারিতে এলে লোকে বাধা দিত।

গ্রামে মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রভয় আসিত কিন্তু গ্রামবাসীর নিকট যে অভ্যর্থনা পাইত তাহাতে তিষ্ঠানো সম্ভব হইত না। শৈশবে শুনিতাম শীতকালে মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মাত্র এক রাত্রির জন্য ব্যাঘ্র অজয়ের তীরে আসে এবং প্রণাম করিয়াই চলিয়া যায়, গ্রামে ঢুকিবার অধিকার নাই। শীতের রাত্রে 'কেউ' ডাকিলেই আমরা বুঝিতাম আজ বাঘ ওপার হইতে মাকে প্রণাম করিতেছে—আমরা উহার হিংসায় মারিব।

আমাদের গ্রামে বহু গোয়ালার বাস ছিল তাহারা অনেক উৎকৃষ্ট গাভী রাখিত। ক্ষীর ঘনি ছানা মাখনের জন্য আমাদের গ্রামের নাম ডাক ছিল। এখানকার ক্ষীর ও ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই গো-পালন করিত। এক সের খাঁটি দুগ্ধের মূল্য ছিল মাত্র এক আনা এবং ঘৃত টাকায় তিন পোয়া। চাষের জন্য মহিষও ব্যবহৃত হইত। মাত্র একঘর গোয়ালা দুগ্ধের জন্য গাই-মহিষ রাখিত। গো-মাতারা যেখানে সম্মান পাইতেন, প্রত্যেক দুগ্ধবতী গাভীকে 'অপিলা' ও 'সুরভি' মনে করিতাম। নবৎসা গাভী বেশী বাচ্চার শুভ-সূচক বলে, পল্লীপথের উহা একটী বৈশিষ্ট্য।

অনেক গৃহস্থই কুকুর পুষিতেন। কেহ কেহ সখ করিয়া গ্রে-হাউণ্ড, স্পেনিয়েল প্রভৃতি মূল্যবান কুকুর আনিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বেশীদিন টিকে নাই। গ্রামের কুকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

ওরো, ভুলো, সুখদাস, টাইগার, বো,
কত নাম, কি তাদের আদর বেশুমার।
কখনো ঠেলেছি পিঠে, করেছি খোড়া,
স্নেহে কারো ঘুমঘুমি কেঁদেছি মোরা,
গলে লয়েছ গলস্, সহিত ঘুঘুর,
সোনাহুলি পায় হ'ত ওরা এ 'কমুর'।

২

শিক্ষিত পরিবারে ছিল কত সখ,
মেরিছি—ধরিতে 'সেট্ ব্রাউনার্ড ডগ'।
সঙ্গে ঘুরে ফিরে টেনেছি গরুর,
শিকার খেলাই যেন যে কোথা জন্তু।

খেলা করে বিদেশের শিকার ও পাঠ
তাদেরে শিখাতে সে কি চেষ্টা বিরাট!

৩

পার্কাসে কুকুরের খেলা দেখে রাম—
গ্রামের কুকুরগণে কিবলা বিরাম।
সব দিকে তাহাদের হিতপিয়াসী,
পিটারেন্টি করিবারে নিরামিষাশী।
তাদের তাহাদের খাদ্য পেটায় আভাব,
না শিখুক, ছিল বেশ শিখিবার ভাব।

৪

সাথে লয়ে কুকুর, হাতে বন্দুক তীর,
শক্ত ছিলাম মোরা খেঁকশিয়ালীর।
বাসনে ও উৎসবে, চড়ুই ভাতে,
সাথী তারা ছিলদেতে, প্রহরী রাতে।
গ্রামেতে ঢুকেছি কভু রাত্রি দুপহর,
দু মাইল হতে শোনা যেত ঘেউ ঘর।

৫

তাড়াইলে লজিত না—আহা যাহারা,
আজি তা'রা তাকিলেও দেয় না সাড়া।
তাহাদের লাগি মন ব্যথা পায় মোর,
সঙ্গী যে ছিল দারে রোদ পোহানর।
যুধিষ্ঠিরের মত ভাগ্য হলে,
লয়ে নিতাম সেই কুকুর বলে।

কুকুরের পরই বিড়াল—তাহারা দুধ, মাছ প্রভৃতি খাইয়া গৃহস্থের বহু অনিষ্টই করিত, তবু তাহারা গ্রামে অনেক ছিল। ষষ্ঠী মেয়ীর বাহন বলিয়া কেহ বিড়াল মারিত না। 'ধবিমুখী' বিড়াল খুব আদর পাইত—গ্রাম্য ছড়ায় আছে—

তাল, তেঁতুল, বাবলা
কি করবে ধবিমুখী একলা?

এই সঙ্গে সাপের নাম ও উল্লেখ যোগ্য। গৃহপালিত না হইলেও উহারা অনেকেই গোপনে গৃহেই বাস করে, এবং সময় সময় বৃহৎ অনিষ্টও ঘটায়। এ অঞ্চলে অন্যান্য পল্লীগ্রামের ন্যায় আমাদের গ্রামেও মা মনসার খুব সম্মান—বিশেষতঃ আমাদের গ্রাম যখন "বেহুলার" পিতৃভূমি তখন মনসার বিশিষ্ট দাবী আছে! বর্ষা কালে প্রত্যেক পল্লী তিথিই ভক্তির সহিত পালিত হয়। 'সোনদা' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে "ঝাঁকুলাই" নামে এক প্রকার সর্প পূজিত ও রক্ষিত হয়, তাহারা থাকায় মাকি অন্য বিষধর সর্প আসিতে পায় না এবং ঐ সকল গ্রামে সর্পদংশনও হয় না। বহু গ্রামে সমারোহের সহিত 'মনসাপূজা' তখনও হইত এখনও হয়।

আমাদের গ্রামে পাসুলী বাড়ী কিন্তু মনসা পূজার দিন যে সব দ্রব্য খাওয়া শিবের আহারই খাইবার ব্যবস্থা আছে। উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠ

মাণিক গাঙ্গুলী মহাশয় 'চাঁদ সদাগরে'র মত তেজস্বী শৈব ছিলেন—তিনিই বাধা নিষেধ উঠাইয়া ঐ প্রথা করিয়া গিয়াছেন ইহাই অনেকের ধারণা।

আমাদের বাড়ীতেও সাপ ধরাইতে বা মারিতে নাই; আমার মাতাঠাকুরাণী যখন বলিকা তখন তাঁহার কাকার মাতামহদের একটী সাপ সাপুড়েদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া কিরাইয়া আনেন। তাই লিখিয়াছিলাম—

বাস করি মোরা পল্লীগ্রামেতে সেটা অদ্ভুত তুমি
অবাক হইবে তার কথা শুনে তুমি,
অজয়ের তীরে তাম্বু পাতিল একদল সাপুড়িয়া
শুধু বিষধর সাপ ধরে যায় নিয়া।
আমাদের গ্রামে একটী বাড়ীতে একথা তাহারা আসি
বলিতে লাগিল তাহাদের কে পূর্ব্বপুরী।
প্রাচীন হতে প্রাচীর তাহাদে কত দিন ধরে ছিল
তাদের বয়স বেহুলতা তার, কথাটি চমৎকার
তারো কোথাও চিহ্ন নাহিক তার।
সূর্য্য কিরণে সেই সে শুভ্র তমাল কান্ত রূপ,
দেখিয়া সকলে একেবারে হলো চুপ।
মুহূর্ত্তে তাহার কাঁপি ধরে দিল, সর্প ঢুকিল তাতে···
সাপুড়িয়াগণ নিয়ে গেল কাঁপি মাথে।
বাড়ীর কর্ত্তা দশ বছরের খোকার বয়স যেই
কাঁদিতে লাগিল, ভুলাতে পারে না কেহ।
বাবাকে বলিল সাপ ফিরে আনো, সাপ ফিরে আনো তুমি
মা যে বলিলেন আজ 'নাগ-পঞ্চমী'
তিন পুকুরের ও সাপ মোদের বাস্তু আগুলি আছে।
সে কি দেওয়া যায় সাপুড়িয়াদের কাছে?
স্নেহেতে তাহার দিব্যজ্যোতি—চাহিল মায়ের পানে
রোষে নয় বাবা—নিদারুণ অভিমানে।
বলিল সে যেন 'ছেড়ে যাব আমি এই সব ছেলে পুলে
সাপুড়িয়া হাতে থেকে মোরে দিলি তুলে?
মা মোর কাঁদিছে, বোনেরা কাঁদিছে, কাঁদিছে বাড়ীর ঝি,
মা বলেন কেহ এ কাজ করে কি ছিঃ:
বুঝাতে পারে না পিতা যত বলে—বুঝেও বুঝে না হায়,
যুক্তি হারায় কান্নার কান্নায়।
নিরুপায় পিতা অবশেষে গিয়া বনে সাপুড়িয়া কাছে—
সাপটী তখনো ঝাঁপিতেই ভরা আছে।
"বাপু সাপুড়িয়া লও পাঁচ টাকা সাপ দিয়ে এসো ফিরে
বাড়ীতে সবাই ভাসিতেছে আঁখি নীরে।
গোটা পরিবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলায়ে ফেলেছে চোখ
সাপের জন্য দেখিনি এমন শোক।"
সাপুড়িয়া হাসি 'বলিল' বাবুজী সাপটী পুরানো বড়
মঙ্গলকারী—অরিষ্ট নাশে দড়।
ওধায়ে সকলে বলে খুব দামী, ভারী উপকারী বিষ,
কিরে যেবে—দিস্ দিস টাকা বখ্‌সিস্।
দশ টাকা নিয়া সাপুড়িয়া আসি সাপ পুনঃ গেল দিয়ে
কোলো দেশে তুমি এমন শুনেছ কি হে?
উল্লসিত সে বাড়ীর সকলে, শান্ত হইল তুমি—
সার্থক হ'ল আজ নাগ-পঞ্চমী।
ভাবি কি করিয়া সর্পবন্ধু করিল অন্বেষণ—
কন্যা তাহার ছিলনাকো বিদ্যমান?

এই সব জীব জন্তু লইয়া আমরা এক পরিবারে যেন বাস করিতাম—বিপদ-আপদ সহজের চেয়ে বেশী ছিল মনে হয় না।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ-ডি

(১)

এই বৈষ্ণব মহাসম্মিলনের মূল সভাপতি পদে মানুষ অযোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করায় আমার যে মনোভাব হইয়াছে তাহা বৈষ্ণব-সংস্কৃতি-নির্দ্দিষ্ট বিনয়ের দ্বারাও ঠিক প্রকাশিতব্য নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরাট দর্শনশাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—সুতরাং এইরূপ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মিলনে সভাপতির করিবার মত যোগ্যতা আমার যে অতি সামান্য সে বিষয়ে আমি তীক্ষ্ণ ভাবে সচেতন। অথবা হয়ত এ ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি আমার নিজের হাতে নহে, আপনাদের স্নেহাশীর্ব্বাদমিশ্র অনুজ্ঞা। যে মহাপ্রভুর কৃপায়, অনুগ্রহের কল্পনায় পাশ্চাত্য উদার লাভ করিয়াছে ও পশু গিবিলিংহনের দ্বারা অযাচ্য সাধন করিয়াছে, তাঁহার প্রসাদ-কণা আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে এই গুরুভার বহনে শক্তি দিক্ ইহাই আমার প্রার্থনা।

কালের দুরতিক্রম্য প্রভাবে প্রায় সমস্ত ধর্মই কম-বেশী আদর্শগত বিশুদ্ধি হারাইয়াছে—উহাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রেরণা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কতকগুলি বহিরঙ্গমূলক আচার—অনুষ্ঠান পালনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে কোন ধর্ম্মেরই পূর্ব্বের ন্যায় সার্ব্বভৌম প্রভাব—প্রতিপত্তি নাই। হিন্দুধর্ম্ম গীতা—উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, সর্ব্বভূতে সম-দর্শিতা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস সাধারণ

হিন্দুর অন্তরতম মানসলোকে শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকিলেও তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুজ্ঞার ক্ষমা ও দিবা-বিশ্বাস্থতার আদর্শ আজ আর্থিক যোগার অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ইসলাম ধর্ম্মের অবাধপতনের ইতিহাস মোপ্লাস্থান ও পুল্লাবের অমানুষিক বীভৎস অত্যাচারে অবিস্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শক্তি-পূজা-সাধনা রামপ্রসাদ—রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া এখনও ইহার সজীবতার পরিচয় দিতেছে; কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও শত শত হিন্দু পরিবারে ইহা যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-শুদ্ধ কর্ম্ম-প্রেরণা-যোগাইত, যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপূত কাত্রশক্তির উদ্বোধন করিত, আজ তাহা বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাণিবহুল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের তুলনায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রশংসনীয় বাতিক্রমের পর্য্যায়ভুক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত ইহার অনুরাগীদের বাস্তব জীবনে অনেকটা সজেজভাবে ক্রিয়াশীল। ইহার গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের আদর্শ ও সরল, প্রত্যক্ষ আবেদন জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। নাম-সংকীর্ত্তনের আকর্ষণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে অনুভূত—এখনও তাহাদের সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা এই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কোনও প্রাকৃতিক বৈপত্তিবিপাক, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, শুভ কর্ম্মের সূচনা বা বৈরাগ্যাধিক্য ভক্তির প্রেরণা তাহাদিগকে সংকীর্ত্তনের আশ্রয়-গ্রহণে প্রণোদিত করে। এই সংকীর্ত্তনের জন্য পূজা-পার্ব্বণের পোরাণী দুষ্প্রাপ্যতা নাই; ইহা বিশেষ কোন তিথি, কোন সুনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা উদ্যোগ-আয়োজনের নিখুঁত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। ইহার আয়োজন অতি সামান্য; ইহার বিধি অত্যন্ত সরল; ইহা অকৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভক্তিরসের সহজ বিকাশ। ইহা জপ-ধ্যান-সাধনার কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়া মানব-মনকে এক প্রত্যক্ষ উপায়ে অধ্যাত্মলোকে উন্নীত করে, ভগবদারাধনার এক অতি সহজ প্রণালী নির্দ্দেশ করে। সুরের মাদুর্য্য, ভাবের উচ্ছ্বসিত আবেগে, বহু মনের একলক্ষ্যাভিমুখীনতায় ও পারস্পরিক প্রভাবে ইহা একটী নিবিড় ভাব-তন্ময়তার আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া এই পাপ-পঙ্কিল ধরাতলে এক ক্ষণকালস্থায়ী স্বর্গরাজ্যের বর্ণবিন্যাস করে।

(২)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠত্বের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্র-মহিমা; দ্বিতীয়তঃ অর্পিত ভক্তের জীবনে ইহার আদর্শের আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল অনুসরণ। চৈতন্যদেব জগতের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা-সংঘের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক—আজ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তিরোভাব ঘটিয়াছে। যদিও ভক্তবৃন্দের উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তি অতিপ্রসার দ্বারা তাঁহার জীবনীতে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তথাপি তাঁহার চরিত্রের নিছক মানবিক আকর্ষণ ইহার দ্বারা মোটেই দূর হয় নাই। যাহারা তাঁহার অবতারত্বে আস্থাহীন, তাহারাও তাঁহার মহামানবত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। শত শত ভক্তের লেখনীতে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে যাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের অনুপম মাধুর্য্য, অসীম করুণা, বাহ্যজ্ঞানহীন ভক্তি বিহ্বলতা ও দিব্যোন্মাদ এবং অন্যান্য আদর্শের অবনুকরণীয় শুচিতা আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে। সুদূর অতীতকাল হইতে অতিপরিচিত বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কাহারও জীবনী আমাদের নিকট এত সুপরিচিত, কাহারও ব্যক্তিত্ব এত সুস্পষ্ট নহে। চৈতন্যদেবের জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা, তাঁহার মানস অবস্থার প্রত্যেকটী স্তর, তাঁহার সৌম্যবর্ণ দেহে ভাব-কদম্বের প্রত্যেকটী রোমাঞ্চ-শিহরণ, তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেম ও করুণার প্রতি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস, এমন কি তাঁহার কণ্ঠোপকথন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটী পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-চরিতকারদের বহু যত্নের সাহায্যে আমাদের মানস চক্ষুর নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বালক নিমাইএর শৈশব দুরন্তপনা হইতে তাঁহার যৌবনের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রাভিমান, তার পর তাঁহার জীবনের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, তাঁহার সংসার-বন্ধনচ্ছেদের হৃদয়-গ্রাহী, করুণ কাহিনী, তাঁহার অপরূপ মৃত্যানুকরণ লীলান্বিত কীর্ত্তনানন্দ, তাঁহার শেষ-জীবনের ধ্যান-তন্ময়তা, ভাবাবেশ ও আনন্দ-বিভোর সংজ্ঞাহীনতা—যাহাদের চোখে দেখিয়াছি তাহাদের জীবনী অপেক্ষাও এই সমস্ত খুঁটিনাটি সহজে যেন আমাদের আরও গভীর, অন্তরঙ্গ পরিচয় অনুপম "গৌরাঙ্গসুন্দরী" লইয়া কত শত পদ রচিত হইয়াছে; কত মন্ত্র-ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা গৌরাঙ্গদেবের সাত্ত্বিক-ভাবোৎপন্ন স্বেদ-কিন্নু-মকরন্দের সহিত-মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার অকৃত্রিম বাৎসল্যের, স্নিগ্ধ, নিরভিমান আচরণের, আচণ্ডাল প্রেমবিতরণে অকুণ্ঠ উদারতার উদ্দেশ্যে কত উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতির অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে! এ হেন মহাপুরুষ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমাদের অধ্যাত্মজীবনের একটী গভীরতম আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিয়াছে, হৃদয়ের একটী চিরস্থায়ী প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছে। কাজেই আধুনিক যুগেও ইহার প্রেরণা ও প্রভাব নিঃশেষিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের স্মৃতি আমাদের মনে যে পরিমাণে উজ্জ্বল থাকিবে, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মও ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের জীবনে কার্য্যকরী হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন বিষয়ে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত ও পরিকরবৃন্দ যেরূপ প্রচার-নৈপুণ্য ও সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর খোলাবার সর্ব্বত্র প্রেম-ধর্ম্মের প্লাবন বহাইয়া দিলেন ও বিধিবদ্ধ সমাজ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মঠ—আখড়া গড়িয়া উঠিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের জপ-আরাধনা-পদ্ধতি সুনির্দ্দিষ্ট হইল, ত্যাগ, বিনয় ও বৈরাগ্যের আদর্শে গঠিত জীবনযাত্রা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল ও সাম্প্রদায়িক সংঘবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা জীবনের নিয়ামক শক্তিরূপে অলংঘনীয় মর্য্যাদা লাভ

করিল। এই বিষয়ে বঙ্গদেশের ভক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী-গোষ্ঠীর সহযোগিতা মণি-কাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় ফলপ্রসূ ও সুষমান্বিত হইয়া উঠিল। গোস্বামীগণ এই নব-ধর্মের যে রচনা করিলেন, ইহার দার্শনিক ভিত্তি, ইহার স্মৃতির অনুশাসন, ইহার সাংস্কৃতিক গৌরব তাঁহাদের কর্তৃক অদ্ভুত শিল্প-সুষমাবোধ ও নির্মিতি-কৌশলের সহিত গঠিত হইল। কীর্তনের ভাব-গম্ভীর ভক্তি-বিহ্বলতা ও পদাবলীর অনুপম কাব্যসৌন্দর্যের ভিতর দিয়া ইহার মাধুর্যরস জনসাধারণের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। চৈতন্যোত্তর সমাজে বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-মহিমায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল, ও ভক্তিশ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ পাত্র হিসাবে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব" এই যুগ্ম সম্বোধন-সৌকর্য তাহার মধ্যে ইহাদের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার স্থায়ী নিদর্শন-স্বরূপ স্থান লাভ করিল। চৈতন্য-ভক্ত সাধুজনের দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক-ভাবে অনুশীলিত হইয়া সমাজে এক নূতন মহিমান্বিত আদর্শকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত নব-জাগরণের যুগ। মঙ্গল-কাব্যের গতানুগতিক ধারার অনুসরণে শ্লথ সাহিত্যসৃষ্টি অকস্মাৎ এক নূতন ও অফুরন্ত রস-উৎসের সন্ধান পাইয়া নবজীবনের পরিপূর্তির উজ্জীবিত হইয়া উঠিল—নূতন সুরের মূর্ছনায়, অভিনব ভাবোন্মেষের ঐশ্বর্যে, উপমার বিস্ময়কর প্রাচুর্যে হৃদয়ানুভূতির অকৃত্রিম গভীরতায়, সৌন্দর্যবোধের নব-নবায়মান অভিব্যক্তিতে সাহিত্যের অর্ধমৃত শুষ্ককণ্ঠ ফুলে-ফলে অনুরঞ্জিত হইল। ভক্তির অনির্বচনীয় প্রেরণা কল্পনাকে উন্নীত করিল, হৃদয়ের আলোড়নে ছন্দোবৈচিত্র্যের নূপুরশিঞ্জিতে ধ্বনিত লাভ করিল, নয়নের উদ্গত প্রেমাশ্রু মুকুলিত কুসুম-গুচ্ছের ন্যায় কাব্যলক্ষ্মীর পুলকিত দেহে লুটিয়া উঠিল। অন্তরের আবেগের ঘেটুকু কাব্যের রন্ধ্রপথে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, সেই অতিরিক্ত অংশ কবিদের দীর্ঘ দিন অব্যক্তের ইতিহাস-বোধকে জাগাইয়া তুলিল ও মানব-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন-চরিত-রচনার সূত্রপাত করিল। সংস্কৃতে ও বাংলায় মহাপ্রভুর যে অনেক জীবনী রচিত হইল, সেগুলিতে অলৌকিক ঐশী শক্তির গুরুত্বহীন বৃহদ্বহ তথ্য-সন্নিবেশের অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু কল্পনাবিলাস ও সচেতন তথ্যানুবর্তিতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জীবন-ঘটনার প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটি, তাঁহার তীর্থ-পর্যটনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, তাঁহার গতিপথের বিস্তৃত মানচিত্র-অঙ্কনের প্রয়াস, তাঁহার ভাব-সঙ্গীতের বিস্তৃত পরিচয়, তাঁহার প্রাত্যহিক কার্যকলাপের দিনলিপি-রচনা—এই সমস্তই এক নব যাচাই-বোধ ও মানবিক জ্ঞানের উন্মেষ সূচনা করে। সনাতন অতিপ্রাকৃত-প্রবণতা ও অতিপ্রাকৃতে অন্ধ বিশ্বাস এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়-সূত্র রেখায় রহিয়া গিয়াছে ও পরস্পর বিরুদ্ধ এই দুই বিপরীত ধারার একত্রাবস্থিতি যে উদ্ভট অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাতেও লেখকদের সত্যনিষ্ঠার সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহিত অনুভব করে নাই।

(৩)

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম যে সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফল আরও সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক। তিনি বাঙ্গালীর মনে যে ভাবের প্লাবন বহাইয়া দিলেন তাহাতে সমাজের সনাতন শ্রেণীবিভাগ-গুলির সীমারেখা ঘুইয়া মুছিয়া গেল। সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে যে অলৌকিক কিংবদন্তী জড়িত থাকে, বাঙ্গালী ঐতি-হাসিক মুগে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হইল। মুহূর্তে মুহূর্তে ঐশ্বরিক দ্রুততার সহিত অধিকাংশ পরিবর্তন পরম্পরা ঘটিতে লাগিল। পাপী তাপী মাথাই-দলের নিমিষে শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হইল; জ্ঞানাভিমানী বৃদ্ধ সার্বভৌম ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জন দিয়া শিশুর ন্যায় ধূলায়লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; নরপতি প্রতাপরুদ্র এই মহাসন্ন্যাসীর চরণতলে নিজ মুকুট লুটাইয়া তাঁহার প্রসাদ-কণিকা ভিক্ষা করিয়া লইলেন; রাজনীতি-চর্চায় অভিজ্ঞ, ঘোরতর বিষয়ী রূপ-সনাতন লৌকিক মর্যাদা-প্রতিষ্ঠাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন হইলেন; রাজ-মন্ত্রী রঘুনাথ আধুনিক যুগের বুদ্ধের ন্যায় রাজৈশ্বর্য ও সংসারসুখ উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। পৌরাণিক যুগের বিস্ময় আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনীত হইল; পৃথিবীর উপর স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়

"এসেছে সে এক দিন
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।"

বুদ্ধদেবের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে বাঙ্গালী কি আকর্ষণে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ-বিহারের অভ্যুদয়ে অতিবিক্ত হইয়াছিল, অতীশ-দীপংকরকে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্য হিমালয়ের অপর পারে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার উপলব্ধি আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অনুমানের কুহেলিকাচ্ছন্ন। কিন্তু চৈতন্যধর্মের নিবিড় মোহ ও অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আমরা এখনও হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীতে, রক্তপ্রবাহের শিরা-উপশিরায় অনুভব করি।

অপেক্ষাকৃত নিম্ন লৌকিক স্তরেও পরিবর্তনের কাহিনী কম বিস্ময়াবহ নহে। বৈষ্ণবের ঘাট-আখড়ায় অধ্যাত্মসাধনার নূতন প্রণালী, শান্তিময়, বিষয়-বিস্পৃহ নূতন জীবনাদর্শ অনুশীলিত হইতে লাগিল—তাহার গ্রাম-প্রান্তস্থিত কুঞ্জবনে বৃন্দাবনের চিরন্তন সরলতা ও মাধুর্য-রসাস্বাদের আংশিক প্রতিচ্ছায়া মায়া বিস্তার করিল; যমুনাতীরের স্নিগ্ধসুরভিত মলয়ানিল-স্পর্শ বর্ষাক্লান্ত কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিল। রাজনৈতিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগগুলিতে অত্যাচারের খরতাপ বাঙ্গালীর চিত্তকে যে সম্পূর্ণ ঝলসাইয়া দিতে পারে নাই তাহার মূলে এই স্নিগ্ধ শান্তিনীড়-সমূহের প্রতিষেধক শক্তির কতখানি প্রভাব তাহা কে নির্ধারণ করিবে? তাহার মন এই ভাবনির্ঝরে অবিরত সিক্ত থাকিত বলিয়াই বোধ হয় বিদ্রূপ-

বহিরাভাড়িত মরু-বালুকার শুষ্কতা ইহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব-কবির প্রেমপূত হৃদয়ের চিত্তভূমিতেই ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্যের বীজ এত সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারিয়াছিল।

প্রাকৃত জনসাধারণের মনেও অজ্ঞাতসারে এই রসধারা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস কীর্তনের রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। উহার নিবিড় আবেশে বাঙ্গালীর অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ; মণ্ডলীকৃত্যের ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহু যেন তাহার অন্যান্য অতীন্দ্রিয় পরিমাপ ও বহির্বিকাশ। নূতন নূতন মেলা ও মহোৎসবের প্রচলন বাঙ্গালীর সামাজিক চঞ্চলতা ও অতিথি-পরায়ণতাকে নূতন আন্তরিকতার অবলম্বন দিল, তাহার সমাজ চেতনাকে নূতন স্ফূর্তির পথে অগ্রসর করিল। এই মেলা-মহোৎসব-গুলি তাহার পরাধীনতা-পিষ্ট, অভাবক্লিষ্ট জীবনের মরুভূমিতে সরসতার নির্ঝর বহাইয়া সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছায়াশ্রিত ভূখণ্ড রচনা করিল। বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্বণের যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সার্থকতা প্রতিপাদনে বৈষ্ণব ধর্মের অবদান বিন্দুমাত্র সামান্য নহে। পৌরাণিক দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে বৈষ্ণবের ঝুলন, স্নান, ফুলন, রাস ও দোলযাত্রা মিলিত হইয়া বর্ষাবর্ত্তির উৎসব-চক্রের সম্পূর্ণতা বিধান করিল। গুরুপূজার শ্রদ্ধা-শুচিতার সহিত হোলির মত আতিশয্য সংযুক্ত হইয়া ভক্তি-প্রবৃত্তির সমস্ত স্তরের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। এই সমাগত ধর্ম নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির জোরেই স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের গণ্ডীভেদ করিয়া অবশ্য-পালনীয় বিধির মধ্যে নিজ স্থান করিয়া লইল। শ্রাদ্ধ-বাসরে কীর্তন-গানের প্রচলন কখন আরম্ভ হইল জানি না। কিন্তু শ্রাদ্ধ বিধির মধ্যে ইহার অন্তর্ভুক্তি বিশেষরূপে প্রমাণ করে যে সনাতন শাস্ত্র এই আগন্তুক ধর্মের অনিবার্য্য প্রভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় বাঙ্গালার তীর্থ-গৌরব অনেকটা ক্ষীণ—বাঙ্গালার খুব কম তীর্থস্থানই গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরীর মত সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শিব ও শক্তিপূজার পীঠস্থানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল প্রাদেশিক ভক্তমণ্ডলীকেই আকর্ষণ করিত। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে বাঙ্গালার তীর্থস্থানের এই আপেক্ষিক অগৌরব ও অপকর্ষ অনেকটা কালিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও লৈলাচারলীলা-ক্ষেত্র নবদ্বীপের মাহাত্ম্য প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিয়াছে; আর বৃন্দাবন ও পুরীর আধুনিক প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদেরই সৃষ্টি—উক্ত তীর্থই চৈতন্য-দেবের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত হইয়া তাহাদের পৌরাণিক মহিমাকে নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছে। তা ছাড়া, তীর্থের মাহাত্ম্য কেবল তাহার আকর্ষণের পরিধির উপরই নির্ভর করে না, করে ইহার অন্তর্নিহিত ভক্তি উদ্দীপন করার শক্তির উপর। সেই হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম সমস্ত দেশে নানা ছোট ছোট পুণ্যভূমি সৃষ্টি করিয়া পরীবাসীর চিত্তকে ভক্তিরসে আর্দ্র রাখিয়াছে, ধর্মসাধনার প্রতি উন্মুখ করিয়াছে ও গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রাম্য তীর্থ-গুলি ঠিক যেন আষাঢ়ের মাঠের ছোট ছোট জলাশয়গুলির মত—পুষ্করগুলি যেমন অনাবৃষ্টির চাষের মধ্যে শুষ্কপ্রায় শস্যগুচ্ছকে জিয়াইয়া রাখে, তেমনি এই সমস্ত অনাড়ম্বর পল্লী-তীর্থগুলি তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংসারতাপক্লিষ্ট মানবের ধর্মবোধকে বিলুপ্তির গ্রাস হইতে রক্ষা করে। হয়ত কোন বৃহৎ চিত্ত-শুদ্ধি দিবার ইহাদের ক্ষমতা নাই, ধর্ম-সাধনার উন্নত স্তরে পৌঁছাইয়া দিবার মত সম্বল ইহাদের অসামান্য; ইহারা কেবল দুর্ভিক্ষের মধ্যে দুষ্টিকার মত কোনরকমে প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, জীবনে এইরূপ পরিত্রাণের মূল্য বড় কম নহে। আমাদের প্রতিদিনের অন্নের মধ্যে অমৃতের কণিকাবিন্দু নিহিত আছে। দুর্গম-প্রবাহিনী মরুপথের মধ্যে ভাগীরথীর বিপুল বিস্তার ও কলুষনাশিনী পাবনী শক্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার অন্ততঃ তৃষ্ণার অঞ্জলি পূর্ণ করিবার মত উপকরণ আছে।

(৩)

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজে বৈষ্ণবধর্মের অবদান-প্রাচুর্য্যের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বাঙ্গালার কান্না, মর্মনে, স্মৃতিব্যবহারে, লৌকিক আচার-ব্যবহারে ও ধর্মসাধনায় ইহার প্রভাব সর্বত্র ও অবিসংবাদী। কিন্তু অধুনা ইহার সে গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিয়াছে। আর বৈষ্ণবধর্ম শক্তি-প্রাচুর্য্যের প্রেরণায় বিশ্বজয়ে বাহির হয় না; মানুষের অধিবাসীর চিত্তপরিবর্তনের বা ভগবৎ-প্রেম-বিতরণের উপযোগী প্রাণস্পন্দ ইহার নাই! ইহা এখন বহির্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া নির্জন গৃহকোণে অধ্যাত্ম সাধনার রত। অনেকের ক্ষেত্রে মহিমাকুলক আড়ম্বর অন্তরের ধর্ম-প্রেরণাকে অভিভূত করিয়াছে—আদর্শ আত্ম-প্রচারের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। ইহাই সকল ধর্মের শেষ পরিণতি—অগ্নিশুদ্ধ নিজের আহার-নির্বাপণ! যে কাষ্ঠে আগুন জ্বলে, যে প্রক্রিয়ায় ধর্মবোধ উজ্জ্বল হয়, তাহাই শেষ পর্যন্ত তাহার চিতাশয্যা রচনা করে—সৃষ্টিকার্যারই নিয়তির অনিবার্য বিধানে সমাধিস্থলে পরিণত হয়। মহাকালের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে অনুযোগ বা বিদ্রোহ বৃথা। বৈষ্ণবধর্মের পূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগেও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনা একেবারে শুরু হয় নাই। প্রেম-বিহ্বলতা ও বিষয়-বৈরাগ্যের আতিশয্য রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। উড়িষ্যার কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে গজপতি প্রতাপরুদ্রের আত্যন্তিক বৈষ্ণবধর্ম-প্রীতি তাঁহাকে রাজকার্যে উদাসীন করিয়া উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-লোপের কারণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি—"বৈষ্ণবধর্মের সনাতন মূলে জল ঘটে, কিন্তু ইহা বৌদ্ধধর্মে জাত বিরাজে"—শিরনে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আজ বাঙ্গালীর যে অবসন্ন কোমল, মননীল অন্যবৃত্তি, ও দেহমনঃশীনতা তাহার কর্মশক্তি ও বুদ্ধপ্রতিজ্ঞতাকে

মুহূর্ত্তে শিথিল করিয়া দিতেছে, তাহার অপরিমিত ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহার মূলে হয়ত কিছুটা চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রভাব থাকিতে পারে। অধিকন্তু ভাবোচ্ছ্বাসিক মনোভূমিতে দৃঢ় পাদক্ষেপের অবসর থাকে না, রাজনৈতিক কৌশলনির্দ্ধারণোচিত দৃঢ় ভিত্তি মিলে না। আধুনিক বোমা-বিক্ষুব্ধ জগতে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষুক্ত বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আধুনিক মূলের উত্তরাধিকারী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ-সংশয় স্বভাবতঃই জাগে। কিন্তু এই বাস্তব অনুপযোগিতাই নীতির উৎকর্ষ বিচারে একমাত্র মানদণ্ড নহে। ইহা খুবই সম্ভব যে অহিংসা বা প্রেমধর্ম্মকে কার্য্যকরী করিতে হইলে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ইহার অনুশীলন প্রয়োজন, তাহা আমাদের শক্তির অনায়ত্ত। আততায়ীর উদ্যত অস্ত্রের নিকট শুধু বিনা প্রতিরোধে নয়, ভীতিহীন ও বিদ্বেষহীন, প্রসন্ন চিত্তে আত্মসমর্পণ মানুষের বর্ত্তমান নৈতিক পরিণতির স্তরে অসাধ্য। মনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিশোধ-স্পৃহা ও হিংসার লাভ্রত হইলে দৈহিক নিষ্চেষ্টতার কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। বিশেষতঃ এই অপ্রতিরোধের সঙ্গে কাপুরুষতার ভেদ-রেখা নির্দ্ধারণ করাও সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু যদি চৈতন্যদেবের ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ পূর্ণভাবে বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিত, তবে বোধ হয় পৃথিবীর রূপটাই বদলাইয়া যাইত। যখন আমরা যুগে কোন বৃহৎ আদর্শের দোহাই পাড়ি, তখন ভিতরে ভিতরে আমাদের সুবিধাবাদ, ভীরুতা, জয়-পরাজয়-সম্ভাবনার আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলি উহার তলে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহাকে দুর্ব্বল ও অনির্ভরযোগ্য করিয়া তোলে। এই জন্য মহান্ আদর্শ বাস্তব জীবনের পরীক্ষায় লাঞ্ছিত হয়; বার বার অকৃতকার্য্যতার নজীরে ইহাকে বাস্তব কর্ম-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করা হয়। ইহার জন্য অপরাধ কেবল আদর্শের অননুসরণীয়তার নহে, অপরাধ আমাদের আদর্শের অনুসরণে আন্তরিকতার অভাবেরও।

যাহা হউক বৈষ্ণবধর্ম্ম যে এখনও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে সজীব ও সক্রিয় আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ইহার চর্চ্চা ও অনুশীলন করেন ও তাঁহাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহার আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। অন্ধকারস্তূপের মধ্যে এখনও অগ্নিশিখা সুপ্ত আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টার অনুকূল বায়ুপ্রবাহে এই নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিকে আবার প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় বৈষ্ণবতীর্থগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় বিদ্যমান—মহা-পুরুষের স্মৃতিজড়িত এই স্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে, ইহাদের অতীত মহিমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। বক্তৃতা, প্রচারকার্য্য, পাদপাঠ প্রভৃতির দ্বারা এই সমস্ত মহাপুরুষের কীর্ত্তিকে আবার জনসাধারণের নিকট উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। রামকেলিতে রূপসনাতন, খেতুরীতে নরোত্তমদাস, ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সাধু মহাপুরুষের স্মৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে অমৃতধারা তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন তাহার আস্বাদ আমাদের রসনাকে নূতন করিয়া উপভোগ করাইতে হইবে। সেই সমস্ত স্থানে মেলা-মহোৎসবের প্রবর্ত্তন দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা পরিবেষণের আয়োজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর ভারার্পণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি, কাব্য ও দর্শনকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হইবে। এইরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার দ্বারা এই জড়ত্বময় ও পশুশক্তিপ্রাধান্যের যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নত আদর্শকে জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে অতীতের উত্তরাধিকারকে সে ঠিক বজায় রাখিতে পারে না। সে যেমন তাহার ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের সঙ্গকে, তেমনি তাহার ঐতিহ্য-সম্পদকেও জীবনের পথে পথে ধূলিকণার মত ছড়াইয়া দিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার নূতন আবরণের পথ বিস্মৃতির শুষ্কস্তূপের ভিতর দিয়া। নদীর স্রোত যেমন তটের এক দিক ভাঙ্গে—আর এক দিক গড়ে, মানবের মানস অগ্রগতিও তেমনি এক দিকে পুরাতনকে তোলে ও অন্যদিকে নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করে। আমরা পুরাণের যুগে গীতা-উপনিষদকে ভুলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভুলিয়াছি, রঘুনন্দনের অনুশাসনের প্রভাবে পূর্ব্বতন উদারতা ও সাম্যভাবকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, জড়বাদ ও বিজ্ঞানের যুগে প্রাচীন অধ্যাত্মবোধের সারাংশ ফেলিয়া তাহার বাহ্য আবরণটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেই জন্য আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এক কালগত যোগ ছাড়া আর কোন অন্তরঙ্গগত সংযোগ গড়িয়া উঠে নাই। এই সর্ব্বযুগ-প্রসারী, সর্ব্বসংস্কৃতিমিলনকারী সংশ্লেষণ-শক্তির (Synthesis) অভাবেই আমাদের জীবনে আপিসাতে অগ্রগতির পরিবর্ত্তে চক্রাবর্ত্তন। তাই যে পশুশক্তিকে আমরা বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, অতি আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও তাহার প্রভাব আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। তাই উন্নতির বাগে বাগে অগ্রসর হইতে হইতে কোন নির্ভরযোগ্য অবলম্বনের অভাবে আমরা পা পিছলাইয়া আবার ভূতলশায়ী হই। জানিনা মানুষ কোনদিন তাহার এই পশ্চাদপসরণপ্রবণতা জয় করিতে পারিবে কি না। তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ সাধনা এই এক-লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার প্রয়োজন। যদি এই সাধনায় কোনদিন সিদ্ধিলাভ হয়, তবে সমস্ত অতীত যুগের প্রাণশক্তি আমাদের রক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইবে, সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কৃতি আমাদের মানস ঐশ্বর্য্যও প্রসাদে প্রতিফলিত হইবে ও আমরা আধুনিক যুগে বাস করিয়াও বেদ, উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্ম্মের বিচিত্র প্রেরণা ও নিগূঢ় প্রভাব আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর মধ্যে রূপায়িত করিতে পারিব।

(নিখিল-বঙ্গ-বৈষ্ণব-সাহিত্য-সম্মেলনে মূল-সভাপতির অভিভাষণ)

শিল্পোরলেখা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

দূর থেকেই ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে : বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম্। বৈশাখী বিকেলে ঈশান কোণ থেকে যখন হু হু করে একটা উন্মাদ কালো ঝড় ছুটে আসে—বয়ে নিয়ে আসে দূরের গাছপালাগুলো থেকে একটা উত্তরোল আর্তনাদের শব্দ, ঠিক তেম্‌নি ভাবেই শোনা যাচ্ছে : বন্দেমাতরম্—বন্দে—

ইস্কুলের সামনে প্রায় দুশো আড়াইশো ছাত্র। চারদিকের চারটে ফটক তারা আগলে রেখেছে, পাঁচ সাতজন করে শুয়ে আছে ফটকের সামনে। যারা ঢুকতে চাও, তাদের মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। দুটি চারটি ভালো নিরীহ ছেলে বিপদের মতো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে আছে একটা সুযোগ পেলেই সাঁ করে ভেতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু ওই সব গোবেচারী ভালো ছেলেদের ওপরে কড়া নজর আছে সকলের।

ওদের মধ্যে বক্সী বলে একটা ছেলে কী করে ঢুকে পড়ল ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে। আর ঢোকবামাত্র আর কোনো কথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ইস্কুলেরদিকে। পেছন থেকে শতকণ্ঠে ধিক্কার উঠল : শেম্—শেম্—

কে একজন বলতে যাচ্ছিল, একবার বেরিয়ে আসুক না ওখান থেকে। চিরকাল তো আর ইস্কুলে বসে অ্যাসল্‌ট্রা করতে পারবে না। একবারটি বেরিয়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে এক চাটিতে—

কিন্তু আক্রোশটা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই আর একজন কেউ মুখে একটা থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। বললে, চুপ। আমরা সত্যাগ্রহী—কোনো রকম ভায়োলেন্সের কথা আমাদের মুখে কেন, মনেও আসতে পারবে না।

একটু দূরেই ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে কালো স্যুট্ পরে দাঁড়িয়ে আছেন হেড্ মাস্টার। তাঁর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে; চাপা আক্রোশে কোঁচকানো ভুরুটো চোখের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে—হঠাৎ একটা জোরালো আলো চোখে পড়লে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সেই রকম। সত্যিই তো, বড্ড বেশি জোরালো আলো পড়েছে। সদ্য রায়সাহেব হয়েছেন হেড্‌মাস্টার—এ আলো তাঁর সহ্য হচ্ছে না। নতুন যুগের নতুন সূর্য উঠেছে ছেলেদের রক্তের ভেতরে, হাজার হাজার চোখে সে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সূর্যকিরণের চেয়ে অতসী কাচের প্রতিফলন যে অনেক বেশি দুঃসহ একথাই বা কে অস্বীকার করবে।

বক্সীর এই আকস্মিক সাফল্যে হেড্‌মাস্টার যেন অনুপ্রেরণা পেলেন একটা। হিংস্রভাবে নাচের ঠোঁটটাকে বার করেক চিবিয়ে নিলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এলেন ছেলেদের দিকে। আগুন-ঝরা গলায় ডাক দিলেন : মৃগাঙ্ক।

ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় মৃগাঙ্ক ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ছেলে, আজ পর্যন্ত তার মুখের হাসির কেউ ব্যতিক্রম দেখেনি। মৃগাঙ্ক এক মুখ হাসি নিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি কিছু বলতে চান স্যার?

—বলতে চাই? হাঁ—বলতে চাই বই কি।—হতাশা-জর্জরিত রুদ্ধস্বরে হেড্‌মাস্টার বললেন, তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি।

—অন্যায় তো কিছু করিনি স্যার।

—অন্যায় করোনি!—বিকৃত ভঙ্গিতে হেড্‌মাস্টার বললেন : পড়াশুনো বিসর্জন দিয়ে ভারত মাতাকে মুক্ত করা হচ্ছে! তা করো—আপত্তি নেই। নিজেরা গোল্লায় যাবে যাও, কিন্তু অন্য ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন?

সত্যাগ্রহী মৃগাঙ্ক চটল না : আমরা তো আর কারুর মাথা খাইনি স্যার।

—খাওনি?—হেড্‌মাস্টার বললেন, নিজেরা ইস্কুল বয়কট করেছ করো, কিন্তু যারা আসতে চাইছে তাদের বাধা দিচ্ছ কোন্ অধিকারে?

মৃগাঙ্ক তেম্‌নি হাসতে লাগল: মনুষ্যত্বের অধিকারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার, আপনাকেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেটা সত্য, সেটা অন্যকে বোঝাতে সকলেরই অধিকার আছে স্যার।

—বটে!—হেড্‌মাস্টারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল: খুব বড় বড় কথা শোনাচ্ছ যে! আচ্ছা বেশ, এ সম্পর্কে আমারও কতটা অধিকার আছে সেটা একবার জানানো দরকার।

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরলেন হেড্‌মাস্টার। উচ্চকণ্ঠে উঠতে লাগল: বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

মিথ্যেই শাসানি রায়সাহেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিশ! লাঠিধারী তোড়-পুরী আর সশস্ত্র ভর্খার দল। মস্তিষ্কহীন যান্ত্রিক মানুষ—চোখে মুখে ক্লান্ত গ্লানির অপচ্ছায়া।

ওয়োয়ান ঘুরিয়ে উইণ্ড্‌-মিলের সঙ্গে লড়াই করত কোন্ পাগলা লোকটা? ডন্ কুইক্‌সোট্। গল্পের বইতে তার ছবি দেখেছিল রঞ্জু—এবার চোখের সামনে তাকে দেখতে পেলে।

বাঙালি ডি-এস্-পি—নামটা শুনেছিল, দিগম্বর সাহা। বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়ুয়ার মতো অস্থিসার চেহারা। আলনায় ঝোলানো জামার মতো শরীরে ঢল ঢল করছে ইউনিফর্মটা। রোগা হাঁটু আর হাড়সর্বস্ব পায়ে জুতো মোজা যেমন বেখাপ্পা, তেমনি বেমানান দেখাচ্ছে—কেন যেন "পুস্ ইন্ বুটস্"-এর গল্প মনে পড়ে যায়। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলভার, গাঁট বের করা আঙুলে সেটাকে আগলে আছেন ডি-এস্-পি; সন্দেহ হয় রিভলভার ছুঁড়বার আগেই আঙুলগুলো প্যাকাটির মতো মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে কিনা।

চেরা-গলায় ডি-এস্-পি হুঙ্কার ছাড়লেন। হার্মোনিয়ামের প্রথম আর শেষ রীড্‌দুটো একসঙ্গে টিপলে যেমন একটা মিহি-মোটা বিচিত্র স্বিস্বর বেরোয়, গলার আওয়াজটা শোনালো সেই রকম।

শাদা বাংলায় বলে পাছে ছেলেরা বুঝতে না পারে সেজন্যে দিগম্বর সাহা সাধু ভাষায় বললেন, বালকগণ, তোমরা বে-আইনি কাজ করিতেছ।

উত্তর এল: বন্দে মাতরম্—

—যদি ভালো চাও তো এখনি এখান হইতে প্রস্থান কর।

জবাব এল: মহাত্মা গান্ধী কী জয়—

—শেষবার বলিতেছি, না গেলে লাঠি চালাইবার হুকুম দান করিব। গুলিও চলিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ছেলেরা: ভারত মাতাকি জয়—

হার্মোনিয়ামের ছুটো স্বর এবার চারটে হয়ে ঠিকরে বেরুল: লাঠি চার্জ।

লাঠি চলল। প্রথমে পড়ল মৃগাঙ্ক, তারপরে আরো, আরো, আরো অনেকে। দশজন পালালো, বিশজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। রক্তের ছিটে বইল স্রোত হয়ে। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। লাঠি চালাতে পারো, গুলি ছুঁড়তে পারো, কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে পারো না।

আহত ছেলেদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ফেলা হল। বাকী জনপঞ্চাশকে একটা মোটা কাছি দিয়ে কর্ডন করে নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, সেখান থেকে জেলখানাতে। ধুলো আর রক্তের রাঙটীকা পরে অকম্পিত পায়ে এগিয়ে চলল ছেলেরা।

রঞ্জু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

উনিশ শো তিরিশ সালের ছবি। অজস্র, অসংখ্য।

চৌমাথার মোড়ে একটা বেঞ্চি টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিন চারটি খদ্দরের টুপি পরা ছেলে। একজন বলতে সুরু করল: বন্ধুগণ, বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচারে—

দুদিকের ভিড় সরে গেল। দারোগা ঢুকলেন বাহিনী নিয়ে।

দারোগা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করুন।

ছেলেটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। বলে চলল, নির্মম অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। আজ এই অত্যাচারের জবাব দিতে হবে—

দারোগা বললেন, নেমে আসুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এইবার উঠল দ্বিতীয়জন। দারোগা বললেন, আমি

নিষেধ করছি, আপনি এখানে কোনো কথা বলতে পারবেন না।

দ্বিতীয় বক্তা কথা বললে না, আবৃত্তি সুরু করলে :

"ওরে তুই ওঠ্ আজি,
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি"

—নেমে আসুন—ইউ আর অ্যারেষ্টেড্।

তৃতীয় জন বক্তৃতা করলে না, আবৃত্তিও না—সোজা গান ধরে দিলে :

"বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—"

—আপনাকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

ছবির শেষ নেই। একটার পর আর একটা—অসংখ্য গণনাতীত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—রঞ্জু এর ভেতরে যেন দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অসহ্য উন্মাদনায় ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে মাথার শিরাগুলো, তবু কোথায় যেন বাধা পড়েছে তার। এই উন্মত্ত জীবন-স্রোতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি। নিজের ভেতরে একটা বিচিত্র একাকিত্ব—বড়বাবুর ছেলের আশৈশব-লালিত স্বাতন্ত্র্য-বোধনা তাকে সরিয়ে রেখেছে। তারা গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে দেখেছে বন্যাকে, তার কোনিল ভয়ঙ্কর রূপকে, কিন্তু একটি মাত্র পা এগিয়ে গিয়ে সেই প্লাবনছন্দে মাতামাতি করতে পারেনি। খোলা জানলার মধ্য দিয়ে যেমন করে দেখেছিল তিরিশ সালের বন্যাকে—ঠিক সেই রকম। কেন? রঞ্জু ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতে পারত : মনের ভেতরে যত প্রচণ্ড হয়ে তার ঝড় জেগে ওঠে, বাইরের পৃথিবী তার কাছে তত ছোট হয়ে যায়। সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোকে উগ্র প্রখর করে দিয়ে, বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তিষ্কে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থিরভাবে পায়চারী করে সে নিজের ভেতরে আস্বাদন করতে ভালবাসে বিপ্লবের আবর্তকে; আর অদ্ভুত—বাইরে সে ভীরু, সে সংশয়ী। আত্মকেন্দ্রিক—ব্যক্তি আর অনুভূতি-সর্বস্ব। এখানেও হয়তো প্রশ্ন উঠবে—কেন? শুধু রঞ্জু নয়, রঞ্জুর মতো আরো অনেকের কাছেই হয়তো এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ থাক। সত্যিই—ছবির শেষ নেই।

একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের দাগ চটে-যাওয়া বিবর্ণ ছোট সাইন বোর্ড চোখের সামনে ভেসে উঠছে এবারে। কাঁচা অনমান অক্ষরে লেখা রয়েছে : "লাইসেন্স-প্রাপ্ত দেশী মদের দোকান। ভেণ্ডার : হারানিধি পাল। সময় সকাল আটটা হইতে রাত্রি নয়টা।"

কিন্তু আটটা বাজবার আগেই ভিড় জমে গেছে সেখানে। পিকেটিং চলছে।

একজন বলছে, ভাই, দেশের বড় দুর্দিন। মদ খেয়ে দেশের আর সর্বনাশ কোরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি, নেশা ছেড়ে দাও—

দশ বারোটি ক্রেতা জটলা করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর—ধাঙড়, মেথর জাতীয় লোক। নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকও আছে দু একজন। কিটফাট বাবুদের মদ কেনাটা এমনিতেই আড়ালে আবডালে চলে, সুতরাং আপাতত তারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নেই—রয়েছে নেপথ্যে।

কাউন্টারে আসীন লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার হারানিধি পাল বসে আছে প্যাঁচার মতো মুখ করে। গোল গোল মস্ত চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে যেন নরখাদকের দৃষ্টি। খালি গা, গলায় সোনার হারের সঙ্গে মস্ত বড় সোনার তাবিজ বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় দোল খাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের বিপুল বপু জুড়ে নিবিড় রোমাবলীর স্বচ্ছন্দ অরণ্যময়, অনেকটা অনুসন্ধান করলে হয়তো চামড়ার সন্ধান মিলতে পারে। সবটা মিলিয়ে মনে হতে পারে, যেন শিকারের আশায় গেড়ে বসেছে একটা ভালুক।

কোমল স্বরে হারানিধি বললে, এ আপনাদের ভারী অন্যায় বাবুমশই। এমনভাবে যদি আপনারা গরীবের অন্ন মারেন—

পিকেটারেরা তার দিকে ফিরেও তাকালো না। তারা বলে যেতে লাগল : ভাই সব কথা শোনো। বাড়ি ফিরে যাও—

ক্রেতাদের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অভ্যস্ত নেশার সময়ে এরকম অবাঞ্ছিত বিঘ্ন ঘটাতে সে খুশি হতে পারেনি। বললে, হামাদের পয়সায় হামলোগ যাকু পিব, তুমহারা কোনো বাধা দিতে আসিয়েশে বাবু?

বাকী লোকগুলো বোধ হয় এই কথাটার অপেক্ষাতেই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল; সরিয়ে যাও—হামরা দারু পিব—হামাদের খুশি।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ালো পিকেটারেরা।

—না, তোমরা মদ খেতে পাবে না।

লোকগুলো চেঁচামেচি করছিল বটে, কিন্তু পিকেটারদের ঠেলে কেউ এগিয়ে যায়নি। কিন্তু রক্তে রক্তে অত্যন্ত নেশায় নিয়ন্ত্রিত দাবী। এগোতে পারছে না, পিছোনোও অসম্ভব। মদ ছাড়া ওদের চলবে না।

হারানিধি আবার কাতরকণ্ঠে বললে,যারা নিতে চাইছে, তাদের নিতেই দিন না। কেন খালি খালি আপনারা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন বাবুমশাই?

অবস্থাটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবেই হয়তো আরো খানিকক্ষণ চলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি লোক ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল। লম্বা খিটখিটে চেহারার লোক, গায়ে বিলিতী আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবী, কানে একটা সিগারেট। বড় বড় বাবরী চুল, সংপ্রতি অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল—পরিপূর্ণ লম্পটের চেহারা। লাল চোখ দুটো চরকির মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার—দুদিন ধরে নেশা করতে না পারায় আপাতত খুন চড়ে উঠেছে তার মাথায়।

দোকানের সামনে এসেই বাবরী চুল আদেশ করলে হটো—তফাৎ যাও—

পিকেটারদের ভেতরে যে উৎসাহী হয়ে সকলকে বোঝাচ্ছিল এতক্ষণ, সেই-ই জবাব দিলে। বললে, কালতো ফিরে গিয়েছিলে ভাই ব্রিজবিহারী, আজও ফিরে যাও।

—কেয়া? ব্রিজবিহারী কদর্য একটা মুখভঙ্গি করে গাল দিলে অশ্লীল ভাষায়। বললে, নেহি জায়গা, তুম্ ক্যা করোগে শালা?

অপমানে এক মুহূর্তের জন্যে ছেলেটির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সংযম চক্ষের পলকে আচ্ছন্ন করে দিলে তাকে।

—তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই, ফিরে যাও।

—কেয়া লেক্চার ঝাড়তা? কভি নেহি। হটো শালা লোগ্—দিল্লাগি সে কাম ন চলে গা।

—না। তোমাকে মদ কিনতে দেব না।

—হটো—ব্রিজবিহারীর চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—না।

—না?

নক্ষত্রবেগে মাটি থেকে একখানা খান ইট তুলে নিলে ব্রিজবিহারী—বসিয়ে দিলে সজোরে। আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটি। হাতের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল, তবু সেই অবস্থায় সে বলল, আমার কথা রাখো ভাই—মদ খেয়ো না।

তখন চারদিকে কলরব উঠেছে: খুন খুন। বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেছে মদ্যপায়ীর দল, ঝনাৎ করে কাউন্টারের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে হারানিধি! সবাই পালিয়েছে, শুধু পালাতে পারে নি ব্রিজবিহারী নিজে। মাটির ভেতর থেকে একটা অলক্ষ্য বৃশ্চিক যেন তার পা দুটোকে আটকে ফেলেছে সেখানে।

রক্ত ভুলতে পারবে না ব্রিজবিহারীর সেই মুখ। আড়ষ্ট সংকুচিত হয়ে গেছে—বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেছে একটা বাসি মড়ার মতো। ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ছাদ ভেঙে পড়বার মতো নিজের অপরাধের আকস্মিক চৈতন্যনিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ব্রিজবিহারী, ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিজবিহারী থর থর করে কাঁপতে লাগল, তারপর আহত ছেলেটির মতোই দু হাতে নিজের মাথা মুখ ঢেকে বসে পড়ল ধুলোর ওপরে। যেন চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার।

সাতাশ, লম্পট ব্রিজবিহারী নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। ব্রিজবিহারী আর কোনদিন মদ খাবে না। (ক্রমশঃ)

বঙ্গ-বিভাগ ও হিন্দুধর্ম্মসংস্কৃতি সংরক্ষণ

স্বামী বেদানন্দ

খণ্ডিত বাঙ্গলাকে প্রাণপণ সংগ্রামে অখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল যাহারা, সেই বাঙ্গালী হিন্দু পুনরায় অখণ্ড বাঙ্গলাকে তীব্র সত্বর ও প্রবল আগ্রহে খণ্ডিত করিয়া ফেলিল ; কিংকিং ইতস্ততঃ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু কংগ্রেসী, হিন্দু মহাসভাইট্, সনাতনী—সকলেই অখণ্ড বঙ্গকে খণ্ডিত করিবার সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। কেন, কী উদ্দেশ্যে ? বঙ্গদেশ যখন বিভক্ত হইয়া দুইটী খণ্ডিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল তখন বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে প্রশ্ন—বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, বিভাগ তো হইল ; যে উদ্দেশ্যে বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্যটী কি এবং তাহা সম্পাদন করিবার পথে করণীয় কি কি ? 'ততঃ কিম্' ?

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা ও কর্ম্মীগণের মনে কি আছে —জানিনা। কিন্তু হিন্দু-জনতার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার মনোভাব লক্ষ্য করিতেছি। একদল ভাবিতেছেন—লীগ গভর্ণমেণ্টের দশ বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল ; লীগ-রাহুমুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বঙ্গে নিশ্চিন্তে নির্ব্বাটে থাকা যাইবে। আর একদল ভাবিতেছেন—বাঙ্গালাদেশে লীগ গভর্ণমেণ্ট তো চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছিল ; জাতীয়তাবাদীগণের কোনো স্থান ছিল না, ভবিষ্যতেও স্থান পাইবার আশা ছিল না। বাঙ্গলার যতটুকু বিভাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জুড়িয়া দিতে পারিলাম, ততটুকুই লাভ ; জাতীয়তাবাদের একটী ঘাঁটি বাঙ্গলাদেশে রহিল। পূর্ব্ব পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের মনে আশ্বাস—পাকিস্থানী শাসন অসহ্য হইয়া উঠিলে হিন্দুস্থান বা জাতীয়তাবাদী বঙ্গে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব। যাহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু-ধর্ম্ম ও সদাচার পালন করিয়া চলেন—অবশ্য তাহাদের সংখ্যা অল্প —তেমন হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি রক্ষার একটা স্থান বাঙ্গলাদেশে রহিল। এবম্বিধ নানা ভাব ও ধারণা হিন্দু জনগণের মধ্যে বর্ত্তমান। যখন বঙ্গ-বিভাগের জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর কণ্ঠে সম্মিলিত দাবী উঠিয়াছিল, তখন কোন্ উদ্দেশ্যটী মূল এবং কোন্ গুলি গৌণ—ততদূর সকলে ভাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

সর্ব্বপ্রথম যখন কয়েকব্যক্তি বঙ্গ-বিভাগের যৌক্তিকতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন ; তৎপরে যখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন, তখন যেটীকে উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাই ছিল—বঙ্গ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ; বিভিন্ন দলের হিন্দুগণ বিভিন্ন গৌণ উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে যোগদান করেন। বঙ্গ-বিভাগের বা বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের সেই মূল উদ্দেশ্যটী কি ছিল ? সে হইতেছে—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ।

বঙ্গ-বিভাগ তো হইয়াছে ; কিন্তু উহার মূল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কি ? দায়িত্ব কার ? হিন্দুর ধার্ম্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং হিন্দুজননেতা ও কর্ম্মীগণের উপরই উপরোক্ত দায়িত্ব।

হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝিব ? লীগ গভর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক আঘাত আক্রমণাদির কবল হইতে হিন্দুর ধার্ম্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পদ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, রীতি নীতি, আচার প্রথা, স্বার্থ, অধিকার, সম্মান রক্ষাকেই পূর্ব্বে অনেকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিত ? পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের সম্বন্ধে এখনো সেই তাৎপর্য্যই খাটে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণের সম্বন্ধে তো সে কথা আর এখন প্রযোজ্য নয়। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ এক্ষেত্রে আর কোনো আবশ্যকতা নাই ?

এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্ব্বে আমরা বিচার করিব—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এবং তাহার রক্ষণ বলিতে আমরা কি বুঝি ? হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আছে দুটী দিক—(১) আদর্শ ও সাধনার দিক ; এটীকে তাত্ত্বিক দিক বলা চলে। (২) শিক্ষা-দীক্ষা, আচারপ্রথা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, মন্দির-বিগ্রহাদি এবং ধার্ম্মিক, সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অধিকার প্রভৃতি ;—এটীকে বাস্তব দিক বলা চলে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বলিতে উক্ত দুই দিকেরই রক্ষা বুঝিতে হইবে।

উক্ত প্রত্যেক দিকটী রক্ষণের জন্য কয়েকটী করিয়া পন্থা অবলম্বনীয়। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ ও সাধনার দিক রক্ষা করিতে গেলে—(১) যেটুকু হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আছে, সেটুকু ত্রু-সংস্কারমুক্ত করিয়া দিতে হইবে ; (২) যেটুকু বিলুপ্ত হইয়াছে, সেটুকুর পুনরুদ্ধোধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ; (৩) হিন্দু সমাজের যে সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কিছুই কিছু নাই, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি শিখাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাস্তব দিকটীর রক্ষার জন্য করেকটী পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে—(১) যেগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে ; (২) যেগুলি বিলুপ্তির পথে সেগুলিকে বাঁচাইতে হইবে ; (৩) যেগুলি আছে, সেগুলির উপর আঘাত আক্রমণ না আসে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু হিন্দুজনতার জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা কতটুকু দেখা যায় ? বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে কয়জন নৈমত্তিক উপাসনা করে ? কয়জনে পর্ব্বাহাদির অনুষ্ঠান পালন করে ? কয়জনে মন্দিরে যায় ? কয়জনে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করে ? কয়জনে সদাচারানুষ্ঠান প্রথা পালন করে ? কয়জনে হিন্দুয়ানী সম্মত আহার গ্রহণ ও পরিচ্ছদ

ব্যবহার করে? কয়জন হিন্দু আদর্শে জীবনযাপন করে? কয়জন হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরব-গর্ব্ব পোষণ করে? এভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত যারা তাহাদের অধিকাংশই তো হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যারা ভাবেন যে তারা হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা লইয়া চলিতেছেন, তাহাদেরও প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন কতকগুলি লোকাচারে ও দেশাচারে সত্তার মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুজনতার অবশিষ্টাংশের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কোনো আলোক আজিও প্রবেশ করে নাই।

সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক :—(১) হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ আদর্শ ও সাধনার প্রচার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা। (২) হিন্দুত্বের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে শিক্ষা বিস্তার (৩) সমাজ-সংস্কার, (৪) সমাজ-সংগঠন, (৫) শুদ্ধি; (৬) আত্মরক্ষা; (৭) মন্দির বিগ্রহ রক্ষা; (৮) আধিব ও পাশ্চাত্য জনতাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দান পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে গ্রহণ; (৯) হিন্দুজনতাকে শাসন, সখ্য, সহযোগিতার সূত্রে সম্বদ্ধ করা; (১০) হিন্দুজনতার মধ্যে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও কার্য্যকারিতার পুনরুদ্বোধন।

উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য প্রথমেই চাই :—

(১) হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনার ছাঁচে সুগঠিত এবং হিন্দু-সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিত, ত্যাগ-সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের ভাবে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র প্রচারক ও কর্ম্মী।

(২) গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুজনতার সাপ্তাহিক ও পর্ব্বাহিক সম্মেলন-ব্যবস্থা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ভাবে এবং "হিন্দুমিলন মন্দির রক্ষীদল গঠন"—কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বহুসংখ্যক প্রচারক ও কর্ম্মী দুই সহস্র "হিন্দুমিলন মন্দির"এর মধ্য দিয়া উপরোক্ত কার্য্য করিতেছেন।

সঙ্ঘের পরিকল্পনা

হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্গ-বিভাগ। সুতরাং আজ উপরোক্ত কর্ম্মপদ্ধতিকে দ্রুত বহুব্যাপক রূপদানের সময় সমুপস্থিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ অদ্যকার কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীতে "কেন্দ্রীয় হিন্দুমিলন মন্দির" স্থাপনপূর্ব্বক এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রীয় হিন্দুমিলন মন্দিরে থাকিবে :

(১) সমাজ সেবা-ব্রতী প্রচারকগণকে হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারক শিক্ষায়তন।

(২) সহস্র সহস্র পল্লী রক্ষীদলগুলিকে ব্যায়াম চর্চ্চা ও বীরত্বমূলক অস্ত্রশস্ত্র ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক রক্ষীদল নায়ক গঠনের উদ্দেশ্যে রক্ষীদল শিক্ষায়।

(৩) হিন্দুত্বের আদর্শ ও সাধনার ভিত্তিতে বিদ্যার্থিদের জীবন ও চরিত্র গঠনের সুযোগসাধনের জন্য বিদ্যার্থি ভবন।

(৪) ব্যায়াম চর্চ্চা ও লাঠি, তরবারি, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যায়ামাগার।

(৫) হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থাদির রক্ষণ ও পঠন পাঠনের জন্য গ্রন্থাগার।

(৬) সমবেত উপাসনা, কীর্ত্তন, স্তবস্তুতি পাঠ, ভজন, পূজা-আরতি, জপধ্যানাদির জন্য উপাসনা মন্দির।

(৭) হিন্দুজাতীয়তা মন্দির—ইহাতে থাকিবে বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, সমাজ-সংস্কারক, সাম্রাজ্য সংগঠক | ঋষি, অবতার, আচার্য্য, বীর, সম্রাটগণের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়; শাস্ত্রাদি হইতে সমন্বয়-মূলক আদর্শ ও সাধনার তত্ত্ব প্রকাশক শ্লোক, উপদেশাবলী ও বাণী, হিন্দুর গৌরবময় ইতিহাসের ঘটনাবলীর চিত্র ও পরিচয় এবং হিন্দু জাতীয়তার প্রেরণামূলক বাণী ও চিত্র।

এতদ্ভিন্ন চিকিৎসালয়, অতিথি নিবাস, সন্ন্যাসী নিবাস, যজ্ঞশালা প্রভৃতি থাকিবে। প্রতি বৎসর যাহাতে শত শত প্রচারক ও রক্ষীদল-নায়ক শিক্ষিত হইয়া সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে প্রেরিত হইতে পারে—এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্ঘ উপরোক্ত পরিকল্পনা করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে ৫০ লক্ষ টাকা আবশ্যক :—

প্রচারক শিক্ষায়তন—৫০ হাজার; রক্ষীদল শিক্ষালয়—৫০ হাজার; বিদ্যার্থিভবন—৫০ হাজার; চিকিৎসালয়—৫০ হাজার; অতিথি নিবাস—৫০ হাজার; ব্যায়ামাগার—৫০ হাজার; গ্রন্থাগার—৫০ হাজার; কর্ম্মীনিবাস—৫০ হাজার; হিন্দু জাতীয়তা মন্দির—১ লক্ষ; উপাসনা মন্দির ও নাটমন্দির—১ লক্ষ; অন্যান্য আবশ্যক গৃহাদি—এক লক্ষ। এতদ্ভিন্ন প্রচারক, বিদ্যার্থি, রক্ষী, শিক্ষক, রোগী, চিকিৎসক, সন্ন্যাসী, কর্ম্মী, অভ্যাগত, আশ্রয়প্রার্থিগণের ভরণপোষণ ব্যয় মাসিক ২৫ হাজার টাকা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই বিপুল অর্থের জন্য ধনী, দানশীল, সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

কমলার কাহিনী

শ্রীসন্তোষকুমার দে

কোন বড় জংসনে একখানা ট্রেণ থেকে নেমে আর এক-খানা ট্রেণের জন্য যখন কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তখন আপনার ফ্রাশ ওয়েটিংরুমে ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে হালকা সাহিত্য পড়ুন অথবা কলম নিয়ে ডাইরি লিখুন, এর চেয়ে আরামের জিনিষ প্রাত্যহিক জীবনে আর আমি পাইনি। নতুন দরের যেখে সব যাত্রীগণ লণ্ডনের ডরচেষ্টারের মতো হোটেল মিলবে তেমন ভরসা কম। মিলবেও সেখানে হয়তো মেহেরুর মতো কোন গণ্যমান্য অতিথির জন্য সারা বাড়ীটা সরগরম হয়ে আছে, নতুবা হাজার স্থানীয় দর্শনীয় বস্তু টানবে আপনার মন, ছিটেটুতে দেবেনা ঘরে।

কিন্তু এই ওয়েটিংরুম, নিতান্তই প্রতীক্ষা করবার জন্য তৈরী। ছোট বেলায় ইস্কুলে পড়েছিলাম একটি ইংরাজি কাহিনীতে—কোন বৃদ্ধা মাতা সাগর কূলের ঘরে—মোম-বাতি জ্বালিয়ে রাখত, তার নাবিক পুত্র ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায়। এই ওয়েটিংরুমের বাতি জ্বলছেই, আপনার আমার সবার জন্য। লৌহবর্ত্মের উপর ঢেউ জাগিয়ে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার-মেল এক্সপ্রেস-লোকাল। কতজন নামছে, উঠছে। এলো গেল আপনার পাশে ভারত-ব্রহ্ম-চীন হতে সুদূর গ্রাইবর্কের পটিয়াক হোটেলের লেবেল লাগানো এটাচি-ওয়ালা সুটকেশ স্যুট-ধারী। আপনার খেয়াল রাখবার দরকার শুধু হাত ঘড়ির দিকে, আপনার ট্রেণের সময়টা আপনি জানেন।

অমরাবতী হতে ফিরে নাগপুর যাব। বাডনরা জংসনে এসে মেলের অপেক্ষা করছি। গাড়ী আসবে প্রত্যুষে। এখন সবে সন্ধ্যা।

কেরোসিনের আলো জ্বালা একখানা গোল টেবিলের উপর, দেওয়ালে একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে দার্জিলিংএর ছবি, তলায় লেখা 'ভারতবর্ষ দেখুন'। আশে পাশের যাত্রীরা লিগ কংগ্রেস আর কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করছেন। আমার পকেটে তাকিয়ে দেখি, কলমটার ক্লিপে কেরোসিনের আলো চিক চিক করছে।

কলমেরও ভাষা আছে—আমরা সেটা ভেবে দেখিনি। ভেবে দেখুন আপনার কলমটি দিয়ে এযাবত কতকিছু লিখেছেন—প্রেমপত্র হতে সুরু করে 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট' পর্যন্ত। যারা লক্ষীমন্ত পুরুষ, তারা বলতে পারবেন, কত লক্ষ টাকার চেক সই করেছেন ওই কলমে। কিন্তু এমন কিছু কি করেন নি যাতে হৃদয় হাল্কা হয়ে গেছে, মনে হয়েছে আপনি যে কথা মুখে বলতে পারেন নি তাই লিখে রাখলেন। এমনও কি হয় না, যে কথা আপনার অন্তরতম মনেই গুপ্ত ছিল, কলম জানত সেই কথা, আপনার অগোচর সে কথা সে বলে দিয়েছে। পরে আপনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন, মনে হয়েছে—যেন খানিকটা কর্ত্তব্যপালন হ'ল, যেন ঋণশোধ হ'ল কিছুটা। কিন্তু সব ঋণ তো শুধবার নয়। বলি শুনুন একটা ছোট্ট ঘটনা।

আমি ঘুরছি অনেকদিন বাংলার বাইরে। আমার চেহারাটা কন্দর্প-কান্তি নয় বলেই জানি, পরন্তু ট্রেণে টহল করে বেড়ালে কন্দর্পেরও দর্প থাকত কিনা সন্দেহ। কোথায় স্নান, কোথায় আহার কিছুরই ঠিক নেই। নেহাৎ শরীরটার বয়স বেশী নয়, তাই সয়ে যাচ্ছে। তবে যেদিনের কথা বলছি সেদিন রীতিমত অবগাহন স্নান করেছি, পথে ঘাটে যা নিতান্তই অমিল বস্তু। ওখার সমুদ্র পেয়ে ডুবিয়ে নিলাম এক চোট। পুরীর সমুদ্রের মতো অত বড়ো বড়ো ঢেউ নেই। জল দূরে গাঢ় নীল, তবে ওয়ালটেয়ার-বিশাখা পট্টমের সমুদ্রের মতো নয়। নিকটের জল নীলাভ।

তীরে বড় বড় ঘানার উজ্জ্বল বালি প্রচণ্ড রোদে চিক চিক করছে। অনেক দূর নিয়ে বালুর চর। ছোট ছোট জাহাজ মেরামত করছে কাথিয়াবাড়ী মিস্ত্রী। স্নানের ঘাটে আলাপ হ'ল মাসিকের বালক্লিনার নামে একটি যুবকের সাথে। সে কলকাতা চেনে, চেনে ভারতের

ছোট বড়ো নানা সহরে আমারই মতো ভবঘুরের বেশে। ওর সাথে আলাপ হয়ে গেল।

ফিরলাম একসাথে, এক ট্রেণে, ঠাসাঠাসি ভিড় তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কামরায়।

ঝগড়াটে বাধালো বালকিসন, কথা প্রসঙ্গে বলে ফেল্লে—আমি বাঙ্গালী। কিন্তু আমার চেহারা বা চাল-চলন যে বাঙ্গালীসুলভ নয় এটাই সন্দেহ করলেন একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী। কলকাতার সুতাপটিতে তাদের 'চল্লিশ সাল কি'—কারবার আছে। 'বন্দিপাধ্যায়', 'মুকারজি' প্রভৃতি তার কত 'দোস্ত' আছে, 'জান পচান' আছে 'হরেক কিসিম' বাঙ্গালী বাবুর সাথে। কিন্তু 'দে-বাবু' 'কভি নেহি শুনা'।

সন্দিগ্ধ সুরে তিনি হিন্দিতে আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি বাঙ্গালী? 'সাচ' বলছেন?

কি উত্তর দিই? বল্লাম—বাংলা দেশে জন্মালে, মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন সবাই বাঙ্গালী হলে যদি বাঙ্গালী বলা হয় তবে আমি বাঙ্গালী।

আবার প্রশ্ন হ'ল—আপনি বাংলা বুলি জানেন?

না হেসে পারলাম না, বল্লাম, আমি বাংলা বল্লে কি আপনি বুঝতে পারবেন?

'জরুর।' তিনি বল্লেন—'হাম ভি বাংলা সামঝাতে পারি। আচ্ছা বলিয়ে জি জরুর কৌন চিজ হ্যায়?

বল্লাম উত্তরটা।

আবার প্রশ্ন—'মাথায় কেমন আছে'—এর 'সামাল' কি?

হাসি চেপে জবাব দিলাম।

আবার প্রশ্ন—হামি ভালো আছে।

বললাম উত্তর।

প্রশ্নকর্ত্তা বল্লেন—বাংলা আপনি থোড়া থোড়া সমঝেছেন। 'লেকিন' লেখা পড়া তো নেহি আয়ে গা।

বালকিসন এবং নিকটস্থ অনেকগুলি সহযাত্রী এতক্ষণ সাগ্রহে আমার অগ্নিপরীক্ষা লক্ষ্য করছিল। এবার বাল-কিসন রুখে উঠল—বল্লে, লেখা পড়া পারবেন না মানে? ইয়ারকি নাকি? কাগজ বের করুন, দেখাচ্ছেন লিখে।

মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও এভাবে নিজেকে বাঙ্গালী প্রমাণিত করবার অদম্য উৎসাহ আমার ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। জানিনা বালকিসনের মতো আমিও এবার তেড়ে উঠতাম কিনা। সকালে দ্বারকা হতে ট্রেণে চেপে ওখা গেছি, তিন মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেট দ্বীপে মন্দির দর্শন করেছি। এপারে এসে সমুদ্র-স্নানের পর সারা বন্দরে এক টুকরা পুরী কি ভাজি পাই নি, এক কাপ চিনিশূন্য চা খেয়েছিলাম, তদবধি পেটে কিছু পড়ে নি। মাথায় তেল নেই, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ে চোখে মুখে পড়ছে। পেটও চো চো করছে। বাইরে বাতাসে বালি উড়ে আসে, ট্রেণের ইঞ্জিন হতে ছাই ও কয়লার গুড়া উড়ে আসে, তাই চোখে গগলস আটা আছে। জামা কাপড় তীর্থকাকের উপযুক্ত অবিন্যস্ত এবং যথাসাধ্য ময়লা। এই বেশটাকে বাঙ্গালীর বলে প্রমাণিত করবার দৃঢ় ইচ্ছা ক্রমেই আমার শিথিল হয়ে আসছিল। কিন্তু এই সময় একটি অঘটন ঘটল।

আমার বেঞ্চের সুমুখের দুখানা বেঞ্চ পেরিয়ে তৃতীয় বেঞ্চে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে একটি সুশ্রী যুবতী। তার গায়ের রংটা উজ্জ্বল গৌর, মুখাবয়ব অনেকটা আমার ছোট বোনের মতো, হাতে সরু চুড়ি, গলায় সূক্ষ্ম মফচেন, কানে মুক্তার দল বসানো কুণ্ডল। এলো খোঁপার উপর মাথার সামান্য কাপড় দেওয়া। শাড়ী পরবার ধরণটা অবিকল বাঙ্গালীর মতো, এমনি কি গায়ের সাদিজটাও। সহসা দেখলে তাকে বাঙ্গালী বলে ভুল করা কঠিন নয়, কিন্তু মুখাবয়বে অবাঙ্গালীত্বের বিশিষ্ট ছাপ অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে।

পাশেই তার ছোট বোন, অত্যন্ত চঞ্চল। মুখখানা অবিকল বড় বোনের মতো। বাংলার হলে এ বয়সে সে ফ্রকই পরত, কিন্তু তার মাথায় ওড়না, পরণে শাড়ী। ওদের সাথে আর কে আছে জানতে পারিনি।

কাব্য করবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না সে কথা পূর্বেই বলেছি। বেলা পড়ে আসবার সাথে সাথে শরীর ক্লান্ত হয়ে আসছিল। লবণ সমুদ্রে স্নান করবার দরুণ চর্মে খড়ি উড়তে লাগল। কৌতুকজনক ব্যাপারে জড়িত হয়ে না পড়লে হয়ত আমি নিতান্ত বিব্রত বোধ করতাম।

অনেকক্ষণ বিমনা থাকবার পর এই সিন্ধী বণিকটির সাথে বাদানুবাদের সময় লক্ষ্য করলাম, তৃতীয় বেঞ্চে উপবিষ্ট ওই যুবতীটি অকারণতার ভান করলেও অধিকাংশ সময়

আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে বাইরে বহুযোজনব্যাপী বিস্তারিত মাঠে দৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমি বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেই ওর দৃষ্টি ফিরে আসচে। এ ব্যাপারটা যে অনেকক্ষণ ধরে চলছিল সেটা আমি অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত বেশ তদুপরি গগলস আটা পাগল চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু আছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আমার ভুল ভাঙল যখন আমার সুমুখের দ্বিতীয় বেঞ্চে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসা পাগড়ী মাথায় একজন বৃদ্ধ ঘুরে বসে সোজাসুজি আমার সাথে পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না, তিনিই এই কন্যাধনের পিতা। জ্যেষ্ঠা কন্যার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিম্বা সিন্ধী বণিকের অনুচিত বাদানুবাদে বিরক্ত হয়ে আমার সাথে কথা বললেন—বোঝা গেল না।

আমাদের আলাপটা অল্পেই জমে গেল, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—আমি সত্যি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার বর্তমান খবর কি তাই শুনবার জন্যেই যে আমি ঠিক বাঙ্গালী কিনা তার পরখ হচ্ছিল সেটাও বুঝিয়ে বলেন। কলকাতার দাঙ্গার সংবাদ তখন সর্বত্র দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে—সেই সব কথাই তিনি বিবৃতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে গেল, আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক পরিস্থিতি হতে ক্রমে পারিবারিক আলোচনায় পর্যবসিত হয়ে গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। আমার ব্যক্তিগত খুঁটি নাটি খবর তিনি শুনতে চাইলেন, নিজের সম্যক পরিচয়ও জানালেন।

কলকাতায় কুড়ি বছর ধরে তিনি কমলার কারবার করেছিলেন। যুদ্ধের গোলযোগে ওয়াগন অভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়। সংসারে তিনি একা, পুত্র সন্তান নেই, ওই দুটিমাত্র কন্যা। তাই আর ঝঞ্ঝাট না বাড়িয়ে কলকাতার বাস তুলে দিয়ে জন্মস্থান রাজকোটে চলে এসেছেন। এখানেই পৈতৃক বাস, বসত বাটি আছে। তা ছাড়া যা দু চার পয়সা জমিয়েছিলেন তাতে রাজকোটে কয়েকখানি 'মকান' খরিদ করে তারই ভাড়ায় দিন গুজরান করছেন।

মুস্কিল হয়েছে বড়ো মেয়েটিকে নিয়ে। ওর নাম কমলা। দুই বোনেরই জন্ম কলকাতায়। কিন্তু ছোটটি খুব ছোট থাকতেই এ দেশে ফিরেছে বলে এ দেশি ভাব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছে। পারে নি কমলা, পারে নি—কারণ সে চায় নি। এ নিয়ে মাতা কন্যার অহোরহো সংঘাত লেগে আছে। কলহে পিতা কোন পক্ষ নিয়ে থাকেন সেটা আভাসে বুঝলাম। বস্তুত কেবল কমলার নয়, তাঁর পিতারও গভীর অনুরক্তি আছে বাংলার সংস্কৃতির উপর। বিশেষ করে ষোল সতের বছর ধরে মেয়েকে যে শিক্ষা ও আদর্শে মানুষ করেছেন সেটা পুরাপুরি বাঙ্গালীর আদর্শ। পরিষ্কার বলেই ফেললেন—কমলাকে কোন উপযুক্ত বাঙ্গালীর হাতে দিতে পারলেই তিনি খুশী হতেন, কমলাও সেটা নিশ্চয় পছন্দ করত। কিন্তু বাংলা হতে হাজার মাইল দূরে বসে এ স্বপ্ন তাঁর নিরর্থক।

কমলা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনছিল আমাদের কথা-বার্তা। শেষের দিকে পারিবারিক আলোচনা সুরু হতেই সে অন্যমনস্কের ভান করে নিজেকে দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু সে যে আদৌ অন্যমনস্ক নয় সেটা বুঝতে বেশ পেতে হ'ল না।

আমি কাথিয়াবাড়ের গুণগান করলাম, বল্লাম—যে দেশে বাপুজীর জন্ম হয়েছে সে দেশের সংস্কৃতিও তো তুচ্ছ করবার নয়।

বৃদ্ধ বললেন—কি জানো বাবা, দোষটা আমার। এই যে পাগড়ি এটা আমি এদেশেই পরছি, বাংলায় আমি বাঙ্গালী হয়েই ছিলাম। আমার বন্ধুরা তোমার দেশের গণ্যমান্য লোক। আমি বাংলাকে অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা করি।

কমলা আমার সেই বাংলার ঘরে জন্মেছিল, সেই আবহাওয়ার মানুষ হয়েছে, আমি ওকে বাংলার আদর্শ হতে বিচ্যুত করতে চাইনি, আজও যে মনে প্রাণে চাই তেমন নয়। ওটা যে কি জিনিস, সেটা তো জোর করে বোঝাতে পারব না। তুমি বাঙ্গালী, বিদেশীর এই মনোভাব হয়তো তুমি বুঝবে না। তবু এটা সত্য। আমি জানতাম রবীন্দ্রনাথের বাংলা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলা, স্যার রাজেন মুখার্জির বাংলা। সে বাংলাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব।

রাজকোট ষ্টেশন এলো। তারা সবাই নামলেন। আমিও নেমে বৃদ্ধকে নমস্কার করলাম। তিনি প্রতি নমস্কার

করলেন। কমলাও পরিষ্কার কণ্ঠে 'নমস্কার' জানালো। কিন্তু তার মুখে কিছুক্ষণ আগে দেখা হাসির জ্যোতিটি খুঁজে পেলাম না।

রাজকোট ছাড়িয়ে ভিরমগাম, সেখানে হতে বোম্বাই, আমার ট্রেণ কোন বাধা মানে নি। কিন্তু আজ কতো দিন পরে বাডনরা জংশনের ওয়েটিং রুমের এই প্রায়ান্ধকারে আমার স্মৃতিকণা লিপতে বসে কমলার কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেদিন রাজকোট ষ্টেশন হ'তে ট্রেণ ছাড়লে, মনে হয়েছিল কমলার ব্যবসায়ীর ঘরেই ভগবান কি চীরক পাঠিয়েছেন? আজ মনে হচ্ছে, সেদিন তার নির্বাক প্রশংসমান দৃষ্টি দিয়ে আমার হতশ্রী চেহারাকে উপলক্ষ করে এক বিমুগ্ধা নারী বাংলাকে, বাংলা ভাষার, বাংলা সাহিত্যের, বাংলার সংস্কৃতির আভিজাত্যকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, বোধ হয় এসিয়ার সর্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ দিয়েও নোবেল কমিটি বাংলাকে সে সম্মান দিতে পারেনি। জানিনা কমলা কোথায়, বাংলার ঘরের বধূ হওয়ার আশা তার পূরণ হয়েছে কিনা, কিন্তু এই যে যুগের বঙ্গের প্রশার এতো চলবেই, বন্ধ হবে না।

ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ

শ্রীত্রিবিক্রম পাঠক

প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষের আহ্বানে কত শত বৎসর ধরে কত মানব গোষ্ঠির ধারা এসেছে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তারা আপনার করে নিয়েছে। ভারতের সভ্যতাই তাদের দান অনস্বীকার্য। দুরন্ত মরুপথ অতিক্রম করে এসেছে শক, হূণ, তুর্ক, মোগল, পাঠান প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতি, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে ভারতীয় সমাজে তারা তাদের ঠাঁই করে নিয়েছে, কিন্তু যারা ভারতকে তাদের দেশ বলে মেনে নিতে পারে নি, যারা শুধু তাকে তাদের বাজার আর শোষণের লীলাভূমি মনে করেছে, প্রতিযোগিতের পরাস্তকারী ধূর্তকৌশলী ইংরাজই তাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী জনকল্যাণের নামে স্বশ্রেণীর কল্যাণেই সর্বদা আত্মনিয়োগ করেছে তাই সমগ্র প্রাচ্য ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত রামমোহন যেদিন মাত্র যুগোপযোগী শিক্ষার দাবী জানিয়ে লর্ড আমহার্স্টকে ঐতিহাসিক চিঠি দিয়েছিলেন সে দিনও তার দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে স্বশ্রেণীর প্রয়োজনে স্বল্প মাহিনায় কেরাণী ও প্রযুক্তক শ্রেণীর সৃষ্টি করা। এই আত্মপোষণ করা মৃত্য সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই নিবন্ধে আমরা তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

ভারতের বিস্তৃত আলেকজাণ্ডার, তৈমুর ও নাদিরশার লুণ্ঠন বিভীষিকা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার স্বল্পকালস্থায়ী অত্যাচারে জনসাধারণের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘাত প্রতিঘাত দেখা যায়নি। গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায় পারদর্শী ভারতবর্ষ সেদিনও তার সুকুমারশিল্প, তার কারুকার্যে ও তার জ্ঞানচর্চায় আত্মসমাহিত ছিল। তার জীবন যাত্রার বিপর্য্যয় ঘটাবার মত শক্তি দেখা দিয়েছে বহুকাল পরে বণিকপ্রধানের পূর্ণ বিকশিত রূপ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের এই মহা মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনে। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জনসমষ্টিকে শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, আহার, বাসস্থান চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রচিত হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারত সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যিক শোষণের আলোচনা করতে গেলেই মনে পড়ে ভারতের বিগত দিনের সমৃদ্ধির কথা। রোমক সভ্যতা যেদিন মেধীপাদান হয়ে ইউরোপকে সুসভ্য করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ করেও তাকে বিলাস-ব্যসন, কলা প্রভৃতির জন্যে নির্ভর করতে হত ভারতবর্ষের ওপর। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলেছেন "সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল রোম মিশরী থেকে আনা সোনা রূপার প্রোকেডে সুসজ্জিত থাকত। যারা সভ্য জগতে ঢাকার মসলিনের খ্যাতি প্রচারিত ছিল। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র, রত্নাদিখচিত বস্ত্র, সূক্ষ্ম সূচিকার্য, প্রোকেড, কার্পেট, সর্বশ্রেষ্ঠ কলাইয়ের অস্ত্রাদি আসবাব পত্রাদি, চমৎকার ও অতি তীক্ষ্ণ বিভিন্ন আকারের তরবারি প্রভৃতি, ভারতের কারশিল্পের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছে। M. Martin Indian Empire এ লিখেছেন ঢাকার মসলিন, কাশ্মিরী শাল ও দিল্লীর সিল্কের প্রোকেডই শিল্পরের দরবারের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করত। তখন বৃটেনের বর্বর অধিবাসীরা রং মেখে সং সেজে থাকত। ধাতু দ্রব্যের কারুকার্য্যসমন্বিত অস্ত্রাদি, মণি-মুক্তা হীরা, কেমখেট, কার্পেট, চমৎকার ইস্পাত, চীনা মাটির বিভিন্নপত্র, মাহাদের চমৎকার তাঁবোয়া—ভারতের এই সব বিবিধ দ্রব্য সভ্য মানুষ যখনি দেখেই প্রশংসা করে আসছে এবং তাঁর কথায় "Before London was known in history,

India was the richest trading mart of the earth. কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক পরিচয়ই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ধর্ম, শিক্ষা, কলা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অপরিমিত দান ভারতীয় উপনিবেশকারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার ছড়িয়ে দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে। তার সাক্ষ্য আজও অবলিপ্ত হয়ে রয়েছে। মানব সভ্যতা সব সময়েই যে অগ্রগামী ইতিহাস তা' স্বীকার করে না। গ্রীক, এ্যাসিরিয়, ব্যাবিলনিয়, মিশরিয়, রোমক সব সভ্যতাই অস্তাচলে গিয়েছে, তাই বাইরের আঘাতে জীর্ণ সভ্যতা ধ্বংস পায় বা রূপান্তরিত হয়। ভারতের ইতিহাসেও এই বিধানের ব্যতিক্রম ঘটেনি। রূপকথার মত মনোরম কল্পনার মায়াজাল রচনাকারী ভারতের ঐশ্বর্যকাহিনী শুনে লুব্ধ বণিকের দল ভারতের সন্ধানে সপ্ত সমুদ্র তোলপাড় সুরু করে দিল মধ্যযুগে। প্রতিযোগী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে দলে দলে আবির্ভাব হলো বণিকগোষ্ঠীর। মুখে প্রভু যীশুর বাণী আর অন্তরে রয়েছে পরধন লুণ্ঠনের দুর্দমনীয় লোভ।

কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ ও ভাগ্যের বহু প্রতিকূলতাকে জয় করে বণিক প্রতিনিধি ক্লাইভ যেদিন বাংলার বারভূঁইয়া বাঙ্গলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন—সেদিন তাঁহাকে শোষণের রূপে তিনি পাগল হয়েছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন "কোম্পানী আজ যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেছেন তা' ফ্রান্স ও রাশিয়া বাদ দিলে ইউরোপের যে কোন রাজ্যের চেয়ে বড়। ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং খাজনা তাঁরা পাবেন আর পাবেন সমপর্যায়ভুক্ত বাণিজ্যিক লাভ।..... আপনারা বর্তমানের চিন্তায় অধীর হবেন না, ভবিষ্যতের লাভের কথা ভুলবেন না.....এখুনি লুট পাটের বখরায় হস্তে অধীর হবেন না। (হাউস অব কমন্সে ৩০শে মার্চ, ক্লাইভের বক্তৃতা) আপনারা ২০০ লক্ষ সিক্কা টাকা পাবেন। সিক্কাই ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা মুদ্রি পাবে। কখনই সামরিক ও অসামরিক কাজে ৩০ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হবে না। (ক্লাইভের চিঠি, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৭৬৫)।

ক্রাফটন লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ থেকে ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং ইংল্যাণ্ডে লুণ্ঠনরাজ করে আনার ফলে কোম্পানী তিন বৎসর ধরে ব্যবসা চালিয়েছেন বিনা পুঁজিতে এবং তাহা বিদেশী কোম্পানীদের পাওনাও পরিশোধ করেছেন। ক্লাইভ নিজে করে ২৪০০০ পাউণ্ড এনেছিলেন ও ভারত থেকে তাঁর নিজস্ব জমিদারী বাবদ বাৎসরিক ২৭০০০ পাউণ্ড পাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাইভের উপরোক্ত চিঠি থেকে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বর্ণনা থেকে বাংলার জনসাধারণ যে কি ভয়ানক সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিল তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বর্তমান যুগের মুদ্রার মূল্যে হিসেব করলে এই লুণ্ঠনের অঙ্ক ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে। মেকলে সাহেব ও ক্লাইভ, হেষ্টিংসের বাঙ্গালী অনুচরদেরই বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি মনে করে তাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছেন তার সহস্রগুণ বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছে পরমাত্মীয়রূপে সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্রে। ক্লাইভ, হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত চুরি বন্ধ করার চেষ্টা করা হলেও জাতিগতভাবে এই শোষণ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে রইল জনসাধারণের ওপর অগদল পাথরের মত। ফলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, আর এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে দিন বৃভুক্ষু নর-নারীর কবরে পুতি অন্নে সারা দেশ ছেয়ে গেল সে দিনও এই লোভাতুরতার হাত থেকে দেশবাসী মুক্তি পায়নি। এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হল, আর এক তৃতীয়াংশ দেশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য জঙ্গলে পরিণত হল। ১৭৭০ সাল থেকে যে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুতেরে মন্বন্তরে তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হেষ্টিংস লিখেছেন যে এক তৃতীয়াংশ দেশের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলেও খাজনা আদায় ১৭৮৮ সালের চেয়ে ভালই হয়েছে "খাদ্য শস্যের গোলা, বাণিজ্যের ও শিল্পের প্রাচুর্যের ক্ষেত্র বাংলা ২০ বৎসরের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হয়েছে"—এ কথা লিখেছেন একজন ইংরাজ ১৭৮৭ সালে।

বর্ণধী বার্ক, হেষ্টিংসকে পার্লামেন্টে বিচারকালে তাঁকে বিসূচিকা রোগের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বৃটিশ শাসনের কুশাসনকে ব্যাঘ্রের হিংস্রপরায়ণতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অত্যুক্তি করেছিলেন বলে মনে হয় কি? ভারতে বৃটিশের এই ভয়াবহ দুঃশাসনের শোষণের প্রতিবাদ করার জন্যে বার্ক, ব্রাইট, মরাবর্তি এ্যাণ্ড্রুজ ইংরেজ জাতের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য জেবে আমরা কিছুটা সান্ত্বনা পাই। কিন্তু আমরা ভুলতে পারিনা যে, কোম্পানীর রাজত্বে ইংরেজ জাত যখন তার দুধের অংশ দিয়ে স্বদেশের জনসাধারণকে শিল্প বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন সে ভারতের শিল্পকে ধ্বংস করে সারা দেশের ধ্বংসে আত্মনিয়োগ করেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে যে অভূতপূর্ব বিলাস দেখা দিল তা Brooks Adams-এর লেখা থেকে, Palme Dutt তাঁর India to-day-তে উদ্ধৃত করেছেন আধুনিক যুগের যাদু, বোনার কল, শক্তিচালিত তাঁত, বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি যুগান্তকারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল এই সময়ে। তিনি বলেছেন "Possibly since the world began no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder, because for nearly fifty years Great Britain stood without a Competitor." কিন্তু কোম্পানীর এই লুণ্ঠনে অংশী প্রতিযোগিতা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠল Adam smith তাই লিখলেন "Such exclusive Companies are nuisances in every respect, always more or less inconvenient to the Countries in which they are established & destructive to those which have the misfortune to fall under the Government."

ফক্স, বার্ক, পেটিসন যেদিন কোম্পানীর বিশ্বাসঘাতে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিল বঙ্গিত অংশেরবাসীদের জন্যে কথাও প্রকাশ পেয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে বন্দোবস্ত তাঁরা কায়েম করলেন, তাতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থাই করা হল। শাসনের নামে শোষণের জঘন্যরূপ যেদিন ভারতের

ওপর দিয়ে চলেছিল ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা সব কিছুই সেদিন তার রথের চাকায় পিষ্ট হয়েছিল।

১৮৪০ সালের পার্লামেন্টারী এনকোয়ারি কমিটির বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে যে বিলিতি পণ্যকে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সুতি বস্ত্রের ওপর শতকরা ১০৲, রেশমের ওপর শতকরা ২০৲ এবং পশমের বস্ত্রের ওপর শতকরা ৩০৲ টাকা কর ধার্য্য করে বিলাতি বস্ত্রব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষা করেছিল, আর Navigation Act দ্বারাও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা হয়েছিল, নিজেদের এক চেটিয়া অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

১৮১৩ সালের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ বাজারে ভারতের তুলার ও পশমের বস্ত্র অনুরূপ বিলিতি বস্ত্রের চেয়ে শতকরা ৫০৲, ৬০৲ টাকা কম মূল্যে বিক্রী করেও তাদের লাভ থাকত, তাই শতকরা ৮০৲ টাকা কর স্থাপন বা সরাসরি ভারতীয় বস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে এরওপর ভারত সরকারের চাপান করের বোঝাও ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থে ভারতীয় তাঁতীদের উৎসাদনে বৃটিশ সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন বস্ত্রনির্ম্মিত বিলিতি বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলনে ভারতীয়েরা কি অনুরূপ ঈর্ষাপরায়ণতা দেখিয়েছে? নীল করের অত্যাচার, তাঁতীদের আঙুল কাটার গল্প আজও বাংলাদেশে শোনা যায়। মনে হয় যে দুরন্ত লোভের অসহ্য অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না।

১৭৮৭ সালে ৩০ লক্ষ টাকার চাকার বসলিন ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছিল। কাঁসা, পেতল, লোহা সব শিল্পেই শিল্পীদের অভাব দেখা দিয়েছে ১৯০৯ সালে। ভারতীয় শিল্পের ওপর এই সর্ব্বাত্মক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষকে শুধু মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা সমত ভাবে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হল।

শিল্প বিপ্লবের নবযুগের সঙ্গে তার পরিচয় ব্যাহত করার জন্যে পরে পরে সাম্রাজ্যবাদ যে বাধা রচনা করলে তা আজও প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি স্তরে। ভারতীয় পরাধীনতার সমস্যা বুঝতে হলে এই দিকে দৃষ্টিপাত করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

ক্রীতদাস ব্যবস্থা উঠে যাওয়াতে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে চা বাগান, রবার, কফি প্রভৃতি বাগানে পুঁজি নিয়োগ করে দাস ব্যবস্থা নতুন করে প্রবর্ত্তন করেছে। ফলে যারা বস্ত্র প্রস্তুত করে তাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করত, তারা তুলা চালান দিয়ে জীবনধারণ সুরু করলে, পালকর পশম চালান দিয়ে আত্মরক্ষা করলে। তৈল বীজ, চামড়া খনিজসম্পদ বিবিধ কাঁচা মাল নামমাত্র মূল্যে চালান দিয়ে ভারতবাসী তার দুর্ভাগ্যের পেয়ালা পূর্ণ করেছে।

সিপাই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে ভারতের সবপ্রথম জাতীয়তা বোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। হতসর্ব্বস্ব ভারতীয় জনসাধারণের সমাজ ব্যবস্থায় যে ওলট পালট সুরু হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সেই ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যেই এই বিদ্রোহ ঘটল। সাম্রাজ্যবাদ সেদিন তার বিপদের সঙ্কেত বুঝে নতুন রূপে নিজেকে সংগঠিত করে নিল। কোম্পানীর হাত থেকে নিজেই শাসনভার বুঝে নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট এক চেটিয়া ভারত শোষণ সুরু করে প্রতিযোগিতার মুখ বন্ধের ব্যবস্থা করলে, এবং এই শোষণ ব্যবস্থাকে বহু নামের নামাবলীতে ঢাকা হয়েছে। তুলকের সুলতান সপারিষদ ইংলণ্ড পরিদর্শন করতে এলে তার জন্যে যে নাচের পার্টি দেওয়া হয় এবং ভূমধ্যসাগরে নৌ রাজাদের টহলের যুদ্ধাবাসের খরচা এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাবার ব্যয় প্রভৃতিও ভারতের কাছে আদায় করা হত। ইংলণ্ড ভারত থেকে Home Charge বলে একটা বিরাট অঙ্কের পাওনা আদায় করে। তাতে শুধু ১৯০৩-০৪ সালে যথাক্রমে ২৭০৫ লক্ষ ও ৩৮০৭ লক্ষ পাউণ্ড বলে হিসেব দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেনি, তাই যুদ্ধের সময় ১৬০০ কোটি টাকা দেনা বলে ভারতীয় জনসাধারণকে বঞ্চনা করে আদায় করা হয়েছে এবং তাও তামাদি করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের কাছ থেকে লুণ্ঠন করা অর্থের অংশ ভারতে খাটিয়েছে। ভারতের শোষণ ব্যবস্থার এই দিকটা মিঃ ব্রেলস ফোর্ড তাঁর property or peace বইতে লিখেছেন যে ৭০০ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন ভারতে খাটছে। কয়লার খনিতে লগ্নী করা টাকা থেকে তারা শতকরা ১২০ টাকা লাভ পেয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের মাত্র তাদের ৮ পেন্স দিতে হয়েছে। ৫১টা চটকলের মধ্যে ৩২টাই ১৯১৮ থেকে ১৯২৭ পর্য্যন্ত শতকরা ১০০ টাকা লাভ করেছে, বাকী গুলোর লভ্যাংশও বিস্ময়কর। এই চটকলগুলোর লাভ, শ্রমিকের মোট মজুরির ৮ গুণ বেশী হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের যখন তারা ৮ পাউণ্ড দিয়েছে তখনই তারা স্কটল্যাণ্ডে অংশীদারদের দিয়েছে ১০০ পাউণ্ড। এই শোষণের তুলনা আছে কি? তাই চা বাগানের অত্যাচারের কথা প্রকাশে ও ডিগবয়ের ধর্ম্মঘটের কথা শুনে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আধুনিককালের ক্লাইভেরা উন্মত্ত হয়ে ভারতবন্ধু ষ্টেটসম্যান বারম্বার কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে 'Criminal Govt' বলে গাত্রদাহ মিটিয়েছিল। এই সব ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে তাদের কথা বলার লোভ সংবরণ করতে হল, কিন্তু যাঁরা এদের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা জানেন যে কি দুর্ব্বিষহ মধ্যেই তারা দিন কাটাচ্ছে। একদিকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের বিলাস বহুল জীবনযাত্রার বহিঃসম্ভারোহ, আর তার পেছনে রয়েছে আদিম যুগের অন্ধ বস্ত্রহীন নরনারীর ভীড়। এ যেন প্রাসাদবাসীর গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রাসাদের পাশে দরিদ্রকে কুটীর নির্ম্মাণে বাধ্য করে নির্লজ্জ ধনীর আত্মমহিমা প্রকাশের অশোভন আত্মম্ভরিতার উগ্র উদ্যমতা।

ভারতের নামে প্রথম ১৮৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ৩ কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমশ তা বৃদ্ধি করে একটা বিরাট অঙ্কে পরিণত করা হয়। শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্র জারের আমলের ঋণ অস্বীকার করায় সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টায় যারা তৎপর হয়ে উঠেছিল, তারা তাই ভবিষ্যতের জন্যে ভারতের কাছ থেকে সব পাওনা আদায় করে নিয়েছে। খালি ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংএর বেলায় তারা কিস্তির খুঁজছে। ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে কি বিরাট বঞ্চনা করেই

না এই টাকা আদায় করা হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যারা মরেছে তাদের অস্থিও চালান দেওয়া হয়েছে। রক্ত-পিয়াসী সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতার তুলনা আছে কি? ভারতের রেলপথ বিস্তারের প্রসঙ্গে লর্ড ড্যালহৌসি খোলাখুলি ভাবে বলেছিলেন যে রেলপথ বসাবার উদ্দেশ্য এই যে, সহজেই ভারত থেকে তাঁতা মাল রেলপথ-যোগে ভারতের বন্দরগুলোয় নীত হবে ও বিলিতি বিলিতি মালে ভারত ছেয়ে যাবে; তা ছাড়া সামরিক কাজে এর প্রয়োজনও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ভারতে প্রস্তুত জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ভারত জাহাজ নির্মাণের ইতিহাস আধুনিক লেখকরা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। ১৮৬৩ সালেও বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ বোম্বাই বন্দরে নির্মিত হয়েছে; পরে তার রবার্ট পিলের নেতৃত্বে যে রিপোর্ট রচিত হয় তাতে অযুত যুক্তির অবতারণা করে ভারতের জাহাজী কারবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। জাহাজী কারবারে সিন্ধিয়া কোম্পানী যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তা আজ ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত নেই। দেশের অভ্যন্তরে আজও বিদেশী কোম্পানীর স্টীমার চলাচল করছে। ভারতের উপকূলে আজও কোন জাহাজী কারবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তার কারণ বৃটিশ জাহাজী কারবারের প্রতিকূলতা। সারা পৃথিবীর জাহাজী কারবারে ভারত পেয়েছে মাত্র ·২০ ভাগ, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের ভাগে হয়েছে ২৪ ভাগ। ভারতের শোষণ মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কনীতির মধ্যেও ফুটে উঠেছে। ১৯২৬ সালে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস টাকাকে ১ শিলিং ৬ পেন্স হারের বিনিময়ের প্রতিবাদে বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থায় ভারতীয় উৎপাদনকারীরা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করবে। ৪ আনা অধিবাসীর পেশা কৃষি, আর তারাই এর ফলে পতিত হবে। তাই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে ভারত ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপের অনুকরণের কোন পথ না পেয়ে ২০৩০ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা বৃটেনকে দিয়েছে। তারপরও ২৪১০ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সে আর নিজ মুদ্রাব্যবস্থা করে বৃটেনের প্রতিযোগী হতে না পারে। এর সঙ্গে আমরা যদি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে ভারতের যুদ্ধ ব্যয় জুড়ে দিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে দেশবাসী বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে কেন? এই খাতে যে ব্যয় হয়েছে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিসেব আজও সম্পূর্ণ হয়নি।

র‍্যাপিড এনকোয়ারি কমিটির হিসেবে ভারতীয় কৃষি ঋণ ১৯২৯ সালে ৯০০ কোটি টাকা ছিল। দশ বৎসর বাদে এই ঋণ ১৪০০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক ব্রজ ভাই ঘোরেটারিয়াম ঘোষণা করে তাদের রক্ষার জন্যে সহিংস আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহরা কোন সাড়া দেয়নি। জাতির দেহাবশেষরূপ এই কৃষককুলের ধীবিকার্জন আজও দুরূহ সমস্যা হয়ে রয়েছে। স্বদেশী বিদেশী পরভূকদের হাত থেকে এদের মুক্তিলাভ সম্ভবপর না হলে স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকবে না, এ কথা আজ সকলকেই বুঝতে হবে।

বিদেশী লেন-দেন, হুণ্ডী বিনিময় এই সব কাজে আজও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পেছনে পড়ে আছে। অঢৌল চুক্তির দলিলের মত যে কোন দলিলে সই করিয়ে নেওয়ার দিন আজ শেষ হয়ে এসেছে, তা প্রমাণিত হল সম্প্রতি প্রত্যাগত ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বিবৃতিতে।

ভারতের খনিজ সম্পদের নূতন করে না করতে পারলে আমাদের সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা আছে এ কথা স্যার হিঁলজাই বামোদর ব্যাকার্সে বলেছেন বহুদিন পূর্বে। এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একথা উল্লেখ করছি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধারণকে শোষণের উদ্দেশ্যে যে পথ বেয়ে এসেছে তা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুরু থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে ভারতীয় সমাজকে বিকৃত করার চেষ্টার কোন ত্রুটিই করা হয়নি। পাকোলকমত নেতা স্বর্গীয়প্রমোদন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সরকার-পরিচালিত দাঙ্গা বলে অভিহিত করেছিলেন কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের কোন উত্তরই দিতে পারেন নি।

পরিশেষে আমরা জানাচ্ছি যে ভারতের শোষণকে অন্তে প্রকাশের চেষ্টা সম্ভবপর নয়। এই শোষণ প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে। খাদ্য, বস্ত্র, সভ্যতা সকল বিষয়েই যে অভূতপূর্ব দারিদ্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে তার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যিক শোষণ। এই শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতাকে সর্বাঙ্গীণ রূপ দেবার গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয়দের অন্যতম কর্তব্য বলে পরিগণিত। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়পুষ্ট শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য লোপও এই সংগ্রামের অন্যতম কর্মসূচি। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যাঁর সভাপতিত্বে কালে সর্বপ্রথম কার্যকরী রূপ পেয়েছে সেই মুক্তি সংগ্রামজয়ী নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle-এ লিখেছেন পরিষ্কার ভাষায় "ভারতের ভবিষ্যৎ দুটো ভাবে নির্ভর করবে সেই দলের ওপর—যার মতবাদ, কর্মসূচি ও কাজের পরিকল্পনায় কোনো গোঁজামিল থাকবে না—যে দল শুধু স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেই ক্ষান্ত হবে না, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে সর্বাঙ্গীণরূপে কার্যকরী করে তুলবে।—যে দল ভারতের পরম অভিশাপ তার এতদিনের দুনিয়ার জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে তাকে আনবে···যার গভীর বিশ্বাস থাকবে যে ভারতের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা রয়েছে বিশ্ব মানবের সঙ্গে।"

দিগম্বর

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

মানভূমের পার্বত্য অঞ্চল। মাটিহীন প্রস্তরময় ময়দান—শুধু মাঠ আর নয় পাহাড়—ছন্নছাড়া ভিখারীর মত এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটার গায়ে দু-চারটা পলাশ, আবার কোনোটা সম্পূর্ণ দিগম্বর। দূরে দূরে চারিপাশেই অবস্থিত শৈলশ্রেণী—সবুজ সীমারেখা দিগন্তে মিশে আছে। দেখলে মনে হয় এইটুকুই হয়ত জগৎ। এই পরিবেষ্টনের মধ্যেই আবার জেগে উঠেছে ঘন পলাশ জঙ্গল। এক সময় এখানে নাকি শালেরই বন ছিল, আজ সে শালের চিহ্নও আর দেখা যায় না। পলাশ—শুধু পলাশ। বসন্ত যখন ধরার আঙ্গিনে—তখন আগুন লাগে পলাশ বনে। লালে লাল হ'য়ে উঠে বনভূমি। বিটপীর শীর্ষে শীর্ষে শাখায় শাখায় রক্তরাঙা ফুলির স্পর্শ, সভা বসবার আগে বিছিয়ে দেওয়া লাল গালিচার মত। এই পলাশ জঙ্গলেরই সীমান্তে ছোট্ট জলস্রোত ব'য়ে চলেছে। এখানের মানুষ এটাকে বলে, "বীর কাডা" (বনের ছোটনদী)। প্রবহমান জল কঠিন মাটির আবরণ উন্মোচন করে প্রকাশিত ক'রে দিয়েছে শিলাসন। দীর্ঘ পরিধি—বিশাল আয়তন! অপ্রশস্ত বাঁকা-বাঁকা নদীটির অপর পার্শ্বে উচ্চ মালভূমি। এখানেও হয়ত এককালে শালবন ছিল। তারই কয়েকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এখনো দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ নাকি—ঐ সব গাছে এখানের অধিবাসী যারা তাদের দেবতা থাকেন। লোকে বলে "বঙা-বঙির" (সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা দম্পতি) থান। বঙা-বঙির থানেরই সংলগ্ন ক্ষুদ্র পল্লী, নাম "লাখুড়ি"। এদের পূর্বপুরুষ লাখু কোন এক অখ্যাত দিবসে এখানে এসে প্রথম বাসা বেঁধেছিল—তাই তার নামেই পল্লীটার নামকরণ করা হ'য়েছে। কে এই নামকরণ করে, তার কোনো ইতিহাস নেই। ছোট ছোট মেটে চালাঘর; গোবর মাটির প্রলেপ দেওয়া চালাঘরের দেয়ালগুলো। শুধু তাই নয়—খড়পুড়িয়ে তার ছাই দেয়ালের গায়ে গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে আবার প্রলেপ দেওয়া হ'য়েছে, দেখলে মনে হয় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। চক্ চক্ করছে—চোখ জুড়িয়ে যায়। শান্ত সমাহিত পল্লীর আবহাওয়া—কোলাহল নেই, আধুনিক যান-বাহনের উৎপাত নেই। দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর লাখুড়ির সাঁওতাল-দের জীবন। বনের কাঠ কেটে পাতা এনে "খালা" (দোনা) বানায়, লাঙলের ফলা দিয়ে কঠিন মাটির বুক চিরে অনুর্বর জমীকে উর্বর করে তুলে—চাষ করে, ফসল ফলায়। শ্রমের বিভাগ নেই কর্তব্যের বাঁধা-ধরা "রুটিন" নেই। ভোরে যখন ঘরের মুরগিগুলো একস্বরে প্রভাতের সূচনা জানিয়ে দেয়, তখন এরা শয্যা ত্যাগ ক'রে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে।

সেদিনও হ'য়েছে ঠিক তাই। মোরগের প্রভাত-জাগরণ শঙ্খে বিছানা ছেড়ে মংলী কাঁকে ঝুড়ি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। বঙা-বঙির থানে প্রণাম করে এসে দাঁড়ালো "বীর কাডা"র শিলাসনে। আকাশের গা লাল হ'য়ে উঠেছে তখন। বনানীর অন্তস্থল হ'তে টিয়া ময়নার প্রভাতীসুরে বন্দনা গান ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে; আর তারই সাথে মধুর কোমল সুরে গাইতে গাইতে ছুটে চলেছে "বীর কাডার" জল স্রোত। ধীর শান্ত সে গতি! মংলী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো স্বচ্ছ জলস্রোতের পানে তাকিয়ে; তারপর গায়ে একটু উত্তাপ লাগতেই বন থেকে দাঁতন ভেঙে এসে বসলো শিলাসনের উপর প্রবহমান জল তরঙ্গের পাশে।

মংলী!

মংলী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো গারগু—তারই সমবয়সী গারগু। অনাবৃত কালো দেহ, চিকন কালো ঐ দিগম্বর পাহাড়টার মতো। বাহু আর বক্ষদেশের সুস্পষ্ট মাংসপেশীগুলো অচঞ্চল। সেই অনাবৃত দেহটার উপর পড়েছে সূর্যের প্রথম কিরণ। গারগুর কাঁধে কাঁড়-বাঁশ (তীর ধনুক), আর হাতে কোদাল। সে জিগ্যেস করলো, বিদাগাম্ আ আব্ সাগাব কানায়া? (তোর কাঁধে কাঁড়-বাঁশ কেন)

গারও এ প্রশ্নের আর কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো।

মংলীর দাঁতন করা হ'য়ে গিয়েছিল, হাত মুখ বেশ ক'রে ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো কুড়িটা নিয়ে।

—কুড়ি কেনে? গোবর কুড়াবি নাকি?

হুঁ মংলী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, হাঁ তাই করবে।

মাঠ থেকে ধান কাটা হ'য়ে গেলেই ক্ষেতের মাটিকে উর্বরা করবার জন্যই এরা পৌষ মাস থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে গোময় সংগ্রহ ক'রে ক্ষেতে জমা করে রাখে। এ গোময় এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সার। বেশী সার দিলে বেশী ধান হ'বে।

গারও একেবারে মংলীর নিকটে এসে বল্লো, চ কেনে আমার সঙে দুটি মাটি ফেলে দিবি? যাবি?

মংলী এক কথাতেই রাজী ল'য়ে গেলো।

তারা দু জনে এক সঙ্গে এসে উঠলো বনের মধ্যে। তখন বিহঙ্গদের ঐক্যতানের বিরাম ঘটেছে, কিন্তু সুরটা তখনো মিলিয়ে যায়নি। এক একটা পাখী মনের আনন্দে বনের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গিয়ে বসছে—যেখানে দু চারটা সমগোত্রীয় পাখী কলরব করছে, প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রতিবেশীর খবরাখবর নিতে যাওয়াও যেন তাদের কর্তব্য। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে স্থানটা আছে ভরে। অপূর্ব পরিবেশ। গারও এক গুচ্ছ কুড়চি ফুল তুলে তবক ক'রে গুঁজে দিল মংলীর এলায়িত খোঁপায়। মংলী গারওর দিকে তাকিয়ে এক টুকরো হাসলে। খুশির আতিশয্যে গারও গেয়ে উঠলো :—

ধীরয়ে বাহাও কানা
ঠেঙ্যা রাএহা,
সাগরত্যা ঘাউতু বালা কানা
মংলী হন্ তুলুং দেলাম কেনা।

বন ছাড়িয়ে তারা এসে দাঁড়ালো অনুর্বর কঠিন মাটির উপর, যেখানে বনের শ্যামলিমা হারিয়ে গেছে গৈরিক মাটির প্রভাবে। এই স্থানেরই খানিকটা অংশ কেটে গারও ক্ষেত তৈরী করবে, খানিকটা মাটি কাটা আছে আরো "চুরা" (দশ ফুট লম্বায় ও এক ফুট গভীর কাটা অংশ) পাঁচ মাটি কাটলেই সুন্দর ক্ষেত হ'বে।

গারও কাঁধের কাঁড়-বাঁশ নামিয়ে রেখে মংলীকে বল্লো, ডাঁড়া তোলমে চালা হোরও মেৎ। (নে কোদর বাঁধ) মংলী কুড়িটা গারওর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বল্লে, আগে তুই কুড়ি ভর।

গারও শক্ত হাতে কোদাল চালাতে আরম্ভ করলে। ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি পরাজয় স্বীকার করলে গারওর কাছে। আত্ম-সমর্পণ করলে সৃষ্টির আদিম মানবের বংশধরের বাহুবলের নিকট।

বেলা বেড়ে উঠেছে। প্রভাতের বালারুণ এখন পরিপূর্ণ যৌবনের সীমানায়। সূর্যতাপে পাথর-মাটি উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আরো বেশী উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে পাহাড়ের নগ্ন দেহটা।

মংলী মাথা থেকে কুড়ি নামিয়ে বল্লে, উঃ বড় ধূপ!

—বেলা না নিউইণ্ডয়াদা, (চল জল খেয়ে আসি)

—বেলা। (চল্)

গারওও মাটি কাটতে কাটতে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে। সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। তারও জল পিপাসা পেয়েছে। তাই সম্মত হ'য়ে গেলো মংলীর প্রস্তাবে।

মাঠের কাজ শেষ করে যখন তারা ঘরে ফিরে এলো তখন সূর্য পাটে বসবার আয়োজন করছেন। গ্রামে ঢুকে দেখলে তাদের ভূস্বামীর গোমস্তা পাঁচকড়ি গ্রামের মাতব্বরদের জমা ক'রে কি সব বলছে। গারও আর মংলী তাদেরই এক পাশে এসে দাঁড়ালে।

পাঁচকড়ি গারওকে দেখে বল্লে, ফিরে যাবি তুই?—কুথা? জিগ্যেস্ করলে গারও।

পাঁচকড়ি আপনার পেট থাপড়ে বল্লে, উপোসে মরতে হবে না, আর অমন টেনাও পরতে হ'বে না। চল যাবি ত—টাকা পাবি মোটা, চাল পাবি, কি হ'বে মাঠে কোদাল চালালে? সারা বছর খেটে পাবি ত মোটে শশি কতক চাল, তাতে পেটও ভরে না। শুধু খাটাই সার হয়!

পাঁচকড়ির এক বর্ণ কথাও গারও বুঝলে না। সে বল্লো, কুথা যাব ঠেকুর বল্।

—ঐ দিগম্বর পাহাড়ীটার কাছ হ'বে—খাটবি ঐ খানে? হাজরি পাবি অনেক।

—কি কাজ?

—পাথর কাটা।

—কত দিবি?

—এক টাকা হাজরি—আর কাদিনের দশ আনা।

—কাল আসবি, বলব।

—আচ্ছা তাই আসব। চলে গেলো পাচকড়ি।

অনাগত কালের অলীক রূপের ছবি তুলে ধরলে পাচকড়ি এদের সামনে। প্রলোভনের জাল ফেলে এদের সে ধরতে চেষ্টা করলে। সে জানে অবশ্য ধরাও পড়লো অনেকে—গারশু, মংলী, শুকার বৌ, গুড়মা। তারা এলো মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে। কোদাল ছেড়ে ধরলো গাইতি আর ঝুড়া।

এত কাল তারা যুদ্ধ করে এসেছে বৈরাগী মাটির সঙ্গে। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ক'রে পরাজিত করেছে উপল-সর্বস্ব কঠিন ভূমিকে। তারা কোথাও পরাজিত হয় নাই, কিন্তু ঠিকাদারের কাজে হাত দিয়ে তারা যেন প্রথম পরাজয় স্বীকার করে।

দিগম্বর পাহাড়টা তাদের জমীদারের। জমীদার পাহাড়টা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন ঠিকাদারকে। পাহাড়ের পাথর কেটে চালান হ'বে দূরে—যেখানে এরোড্রাম তৈরী হ'চ্ছে—মিলিটারী রোড্ তৈরী হচ্ছে।

সকাল হ'তে কাজ চলে। দ্বিপ্রহরে আধ ঘণ্টার জন্য কুলি মজুরদের ছুটি মিলে খাবার। তারপর আবার কাজ চলে সন্ধ্যে পাচটা পর্যন্ত। গারশু শক্ত মুঠিতে গাইতি ধ'রে সজোরে পাথরের উপর বসিয়ে দেয়, গাইতির ফলা কখনো কখনো ছিটকে আসে। নিষ্প্রিব পাথরগুলো সজীব হ'য়ে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে—লোভী স্বার্থপর মানুষের বিরুদ্ধে। গারশু বিদ্রোহী পাথরগুলোর কাছে পরাজিত হ'য়ে যায়। আঘাতের পর আঘাত ক'রেও একটী কণাও সে ছাড়াতে পারে না। মাথা থেকে ঘাম ঝরে—সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। ঘন ঘন ভারি নিঃশ্বাস পড়ে, বুকের মাংসপেশীগুলো ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামা উঠা করে। ক্লান্ত গারশু গাইতি রেখে বসে পড়ে। কিন্তু ঠিকাদার ঐ আধ ঘণ্টা ছুটি বাদে আর এক মুহূর্তও বিশ্রাম দিতে রাজী নয়, তাই ধমক দিয়ে বলে, এই বসলি কেন? এ কী আরাম করবার জায়গা? উঠ্ ধর গাইতি। নিরুপায়, আবার গাইতি ধরতে হয়—আবার পাথরের বুকে আছাড় মারতে হয়।

মংলার জন্য তার ভাবনা হয় বেশী। তার কথাতেই মংলী এখানে এসেছে। তাকেও এমনি পরিশ্রম করতে হয়। সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিশালকায় পাথরগুলোকে হাতুড়ির ঘায়ে খণ্ড খণ্ড (রবল) করতে হয়; তারপর সেই বিখণ্ডিত উপল—জমা ক'রে সাজিয়ে রাখতে হয় ঠিকাদারের "হাটের" পাশে। খাটতে খাটতে সে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। মুখের সে সজীবতা আর নাই;—গলার হাড়গুলো পর্যন্ত উঁকি মারতে শুরু করেছে। কাজ নাকি মংলী বেশ ভাল করে—কাজে ফাঁকি দেয় না। ঠিকাদার তার উপর তাই বেশ সন্তুষ্ট। শুকার মা আর গুড়মাকে এ দুদিন কাজে লাগিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বুড়ো-বুড়ি, শক্ত কাজ বুঝ-বুঝার ধারা হবে না।

মধ্যাহ্নের পর সন্ধ্যা আসে। সারা আকাশের গায়ে আবীর ছড়িয়ে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপন করেন। দূরে ঐ বনানীর পাতায় অস্তগামী রবির রংয়ের পরশ লাগে—বিহঙ্গের কণ্ঠে কণ্ঠে সান্ধ্য বন্দনা গান মুখর হ'য়ে উঠে। কুলি-মজুর-কামিনের দল এসে সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঠিকাদারের "হাটের" সামনে। এক এক করে নাম ডেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সত্যনারায়ণের প্রসাদ নেওয়ার মত সকলে হাত পেতে গ্রহণ করে দৈনিক মজুরী। তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় আপন আপন আস্তানার পানে।

সেদিনও কুলি-কামিন মজুরের দল সমবেত হ'য়েছে ঠিকাদারের কুটীরের দ্বারদেশে—দৈনিক মজুরী নেওয়ার জন্য। প্রত্যহের মত সেদিনও ঠিকাদারের লোক এক এক করে নাম ডেকে যায়—বিন্দ্ বাগ্দী একটাকা, লোখু বাউরী আজকার একটাকা আর কালকার বাকী আট আনা, গদাই একটাকা, গারশু এক টাকা, সীতা দশ আনা, মংলী আট আনা—নে নে ধর, হাত পাত। তাড়া দিয়ে উঠলো ঠিকাদারের মুহুরী।

মংলী মুখ গম্ভীর করে বল্লো, না আট আনা পুইসা কেনে লিব? সারা দিন খাটলুম।

—কি খেটেছিস? সারাদিনে তিরিশ কুড়িও পাথর বইতে পারিস নাই! ধর—

দুটো ছোট ছোট গোলাকার সিকি মুহুরি ছুঁড়ে দিলো মংলীর গায়ে।

মংলী সিকি দুটো কুড়িয়ে মুহুরীর সামনে "কিকে" (ছুড়ে) দিয়ে বল্লে—মিছা কথা কেনে বুলছিস?

সারাদিনে আড়াই কুড়ি কুড়ি বইয়াছি। না সিব নাই আট আনা।

টানা টানা আয়ত চোখ দুটো উঠলো জল জল করে তার। দুলে উঠল সর্বাঙ্গ। বাহুর উপর অসংবৃত বস্ত্র খসে পড়লো।

ঠিকাদার মুহুরীকে বল্লেন, ওকে একটা টাকাই দাও। মুহুরী একটা টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে বল্লো—নে ধর!

ঠিকাদার বল্লেন, কি খুসি হ'য়েছিস্?

মংলীর মুখে দেখা দিলো হাসি। মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি চক্ চক্ করে উঠলো।

দেখতে দেখতে দিগম্বর পাহাড়ের অর্দ্ধেকটা অঙ্গ খসে পড়লো—উচ্চতা আর তার থাকল না। সমতল হ'য়ে গেলো প্রান্তরের সঙ্গে। লাকুড্ডির ঘর বাড়িগুলো—আর রেল ষ্টেশনের পাকা ইমারত পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেলো। তাদের মধ্যিখানের প্রাচীর ধ্বসে পড়েছে! লাকুড্ডির সীমান্তে কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত চব্বিশ প্রহর দণ্ডায়মান থেকে যে বীর বহিঃশত্রুর হাত হ'তে রক্ষণ করে এসেছে লাকুড্ডির মানুষগুলোকে—সেই বীর আজ ধরাশায়ী, প্রতিপক্ষের বলে ক্ষত বিক্ষত তার অঙ্গ। শুধু তাই নয়, লুব্ধ শকুনি আজ তার অঙ্গের মাংস-পিণ্ড কুরে কুরে তার ধারাল দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে।

গারুও গাঁইতি রেখে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল কতকালের পাহাড় এটা, এর গায়ে কেউ কোনোদিন পদাঘাত করতে সাহস করেনি, কিন্তু আজ তা অস্ত্রাঘাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে বসেছে। এর জন্যে তাদের অভিশাপ পেতে হ'বে। মনে পড়লো তার, তাদের মাতব্বর নিমাইএর কথাগুলো—ওরে উখেনে দেবতা থাকে, দেবতার গায়ে "গাঁৎ" (গাঁইতি) মারলে—লাকুড্ডির মানুষগুলা সব মরে যাবেক। যাস্ না—উখেনে কাজ করতে যাস্ না! সেদিন গারুও এ কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু আজ আর না বিশ্বাস করে উপায় নেই। প্রথম হয়ত সে-ই মরবে। তকার মা বুড়ি পোরুও মরে গেছে—হয়ত এই পালেই—

এই বসে বসে কি ভাবছিস্। উঠ্ মাটির তল থেকে সাদা সাদা পাথরগুলো বের করতে হবে। ওগুলো ভাল পাথর।

গারুও উঠলো।

—তোরা সব গাল-গল্প করবার জায়গা পেয়েছিস্ নাকি? আজ আর সব কামিনের পাথর ভেঙ্গে কাজ নেই। মংলী ঐ-যে ছোট ছোট পাথরগুলো পড়ে আছে ওগুলো কুড়িতে কুড়িয়ে এনে জমা করে রাখ পাথর গাদার।

ঠিকাদারের কর্কশ কণ্ঠ আর শোনা গেল না। গারুও তাকিয়ে দেখলো ঠিকাদার চলে গেছে, আর মংলী গারুওর পায়ের নীচের পাথরগুলোকে কুড়িতে কুড়িয়ে ঝুড়িতে ভরছে।

দাঁড়া আমি ভরে দিছি। গারুও বল্লো।

গারুও ঝুড়ি সাজিয়ে নিলো—মংলী ফিরে এলো সেই ঝুড়ি ভর্ত্তি পাথর গাদায় ফেলে। এক দুই তিন—চার—পাঁচ—দশ—পনেরো—। মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে এলো, মধ্যাহ্নের পর বেলা শেষের করুণ রক্তিমা ফুটে উঠলো। কিন্তু কই মংলী সেই যে ঝুড়ি নিয়ে গেল আর ত ফিরল না। সে কপালের ঘাম মুছে কপালের উপর হাত রেখে তাকিয়ে দেখলো মংলী আসছে কি না—কিন্তু কই তার দেখা মিলল না। উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আবার ভালো করে আসবার পথটা—উন্মুক্ত প্রান্তরটা দেখে নিলে সে, কোথাও তার চিহ্ন নেই। তবে সে গেল কোথা? সে গাঁইতি ফেলে চল্লো পাথরের গাদার দিকে। কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখলে ঠিকাদারের "হাটের" দরজার ফাঁকে কার শাড়ির প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। ভালো করে পরীক্ষা করলো শাড়ীর পাড়টা—চেনা চেনা মনে হয় শাড়িটা। তবে কী—

ক্ষিপ্রপদে সে ছুটলো কুটীরের পানে।

—ছাড় ছাড় বুলছি—হাত ছাড় বুলছি!

থমকে দাঁড়ালো গারুও। মংলীর গলার সুর!

—তুই যা চাইবি তাই দিব। কাপড় টাকা আরো অনেক জিনিষ—

ঠিকাদারের কলুষিত দৃষ্টি, ঘৃণিত প্রশুব্ধ প্রস্তাব। গারুও আর স্থির থাকতে পারলে না। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। যা কল্পনা করেছিল

তাই দেখল সে। ফেলে আসা জীবনের ঝিমিতপ্রায় চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বন্য পশুর সঙ্গে বুনো মানুষের বৈরথ সমরলিপ্সা জেগে উঠলো! সজোরে সে আঘাত করে ঠিকাদারের মুখে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ঠিকাদার—ব্যাঘের হাতে হিংস্র ভল্লুর পরাজয় যেমন ক'রে ঘটে! মুখ নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু এত সব লক্ষ্য করবার মত সময় গারগুর ছিল না। সে মাঝীর হাত ধরে সহজ সুরে বল্লে—আলাং ইজমু রমুমে। (আয় আমরা যাই) গাইতিটা পড়ে থাকলো পাহাড়ের পাদদেশে—সেটার আর প্রয়োজন নেই। কোদালই তাদের ভালো। কিন্তু দিগন্তর পাহাড়—আজ আর নেই, এদের স্বাতন্ত্র্য কি রাখতে পারবে এরা?

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও শোষিত রাজ্যগুলির স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের কংগ্রেস-মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডল দুর্বল পশ্চিম আফ্রিকার পক্ষাবলম্বন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন ঐ রাজ্যটী কৌশলে কুক্ষীগত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিবাদ জানান। তাঁহাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়; জাতি-সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত জানান যে, পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অবশ্য, শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয় কি না—জাতি-সঙ্ঘ কোনও অবাধ্য রাজ্যকে সায়েস্তা করিতে পারেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিকামী প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার স্কন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজদের অন্যায় ও অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ভারতীয় প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ ব্যতি পরিষদের সদস্য নহে বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি এই সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের আবেদন অনুসারে জাতি-সঙ্ঘের ব্যতি পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

গত বৎসর নভেম্বর মাসে স্কুদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ তাহার সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া চেরিবন্ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া—বিশেষতঃ বিশ্বের জনমত প্রতিকূল হইয়া ওঠায় ওলন্দাজ খুষ্টধরা ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া কিছু সময় লইতে চাহিয়াছিল। শক্তি সঞ্চয় করিবার পর কৌশলে, প্রয়োজন হইলে সাময়িক বলপ্রয়োগ করিয়া নবীন ইন্দোনেশিয়ান্ রিপাবলিককে ধ্বংস করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। নাৎসী আক্রমণে পঙ্গু হল্যাণ্ডের পক্ষে নিজ শক্তিতে ইন্দোনেশিয়ার আয়ত্ত ৭ কোটি অধিবাসীকে প্রতিরক্ষিত করা সম্ভব নহে। ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৃটেন্ ও আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার তৈল ব্যবসায়ে বৃটেনের বিশেষ স্বার্থ; বৃটিশ সেল্ ও ওলন্দাজ সেল্ কোম্পানী একত্রে ইন্দোনেশিয়ার তৈল আহরণ করে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আমেরিকার লোভ প্রচুর।

ইন্দোনেশিয়ার শত বৎসরের ওলন্দাজ শাসনের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে এই কোম্পানীর ব্যবসা আরম্ভ হয়। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটির মত ওলন্দাজ কোম্পানীও ব্যবসায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। অতি সত্বর ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে জয় করে। দুই শত বৎসর কোম্পানীর রাজত্ব চলিবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন হয়। তদবধি ১৯৪২ সালে জাপানের আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া ওলন্দাজরা পলায়ন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইন্দোনেশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সিঙ্কোনা, গোলমরিচ, রবার, নারিকেল, পেট্রোল, চা, চিনি, কফি প্রভৃতি এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং বহু পরিমাণে বিদেশে চালানও যায়। এই সব কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের উৎপাদনে এবং ব্যবসায়ে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ওলন্দাজদের; দেশীয় জনসাধারণ কঠোর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত। শতকরা ৯জন ইন্দোনেশিয়ের বাৎসরিক আয় ছিল ২ হাজার টাকা; গড়পড়তা মাথা পিছু বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০ টাকা। পক্ষান্তরে শোষক ওলন্দাজদের মাথা পিছু গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৫ হাজার টাকার উপর।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ-নিষ্পিষ্ট ইন্দোনেশিয়ের পক্ষে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাপানের তড়িৎগতি আক্রমণে ও দ্রুত সাফল্যে তাহারা উৎসাহিত হইয়া ওঠে। প্রতিবেশী জাপানকে তাহারা মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙিতে দেরী হয় নাই। প্রতিবেশী পীত জাতিটি যে শ্বেতাঙ্গ শোষক অপেক্ষা কম নির্মম ও কম স্বার্থপর নহে, তাহা বুঝিবামাত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। প্রতিরোধকারীদের বিরামহীন তৎপরতার ফলে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানীরা কখনই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তারপর ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে জাপানের পরাজয় ঘটিবামাত্র প্রতিরোধকারীরা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সমস্ত উপনিবেশিক রাজ্য নব-প্রতিষ্ঠিত ইন্দোনেশীয় রিপাবলিককে অভিনন্দন জানায়। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট তখন ছিলেন নিরুপায়। মাৎশুী আঘাতে পঙ্গু ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় অধিকারে জয় করা আর সম্ভব ছিল না।

উপনিবেশিক রাজ্যের শোষণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চিরদিন ঐক্যবদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বৃটিশের স্বার্থের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কুটেন্ এই সময় ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে জাতীয় আন্দোলনের পুষ্টি, তাহাকে জাপানী চক্রান্ত আখ্যা দিয়া তাহার বিরুদ্ধে বৃটিশও জাতীয় সৈন্য লেলাইয়া দেয়। ইন্দোনেশীয়রা তখন স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে, অস্ত্রবলে তাহাদিগকে দমন করা সহজসাধ্য নহে। বৃটিশ সৈন্য নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালাইয়া বাৎশী প্রথায় নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে পোড়াইয়া মারিয়া ইন্দোনেশিয়াকে পদানত করিতে পারে না। এদিকে বিশ্বের জনমত ক্রমেই প্রতিকূল হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৪৭ সালের প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়া ও ইউক্রেন জাতি-সঙ্ঘে ইন্দোনেশিয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং অবিলম্বে তথা হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী করে। জাতি-সঙ্ঘে এই দাবী গ্রাহ্য না হইলেও লাঞ্ছিতরক্ত ইন্দোনেশীয়দের অনুকূলে বিশ্বের জনমত তৈয়ারী হয়। অস্ত্রবলে ইন্দোনেশীয়দের দমন করা ক্রমেই অসাধ্য হইয়া উঠিতে থাকে। তখন এই দ্বীপপুঞ্জকে অবরোধ করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান সহীর ভারতবর্ষকে এলক টন্ চাউল দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বৃটিশ ও ওলন্দাজরা একযোগে এই চাউল ভারতে পৌঁছান বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

যাহা হউক, স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশীয়দিগকে দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ওলন্দাজরা এক চুক্তি (হেরিবন্ চুক্তি) করিতে সম্মত হয়। এই চুক্তির খসড়া তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর ৪ মাসের মধ্যে তাহারা উহাতে স্বাক্ষর করে না। এদিকে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত তাহারা ক্রমাগত লঙ্ঘন করিতে থাকে; অধীনতিক অবরোধও কঠোরতর হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার বহু ওলন্দাজ সৈন্য স্বদেশে ফিরিবার কথা, তাহার সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পশ্চিম জাভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ওলন্দাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ অধিকার করিয়া বসে; অধিকন্তু, ঐ অঞ্চলের সন্তানীরা ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব চায়।

এই সব বিরোধ সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক গত মে মাসে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ওলন্দাজদের পক্ষ হইতে ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক অন্তর্বর্ত্তী ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য এই ফেডারেল গভর্ণমেণ্টে ওলন্দাজ প্রতিনিধি থাকিবার অসঙ্গত প্রস্তাবেও আপত্তি করে নাই। তবে, ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি অপমানকর সর্তে রিপাবলিকান্ কর্তৃপক্ষ প্রবল আপত্তি তোলেন; আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ওলন্দাজ কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে তাঁহারা কিছুতেই রাজী হন নাই। হেরিবন্ চুক্তিতে (পরে লিখিতভাবে অনুমোদিত) জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরায় রিপাবলিকান্ গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি রিপাবলিকান্ গভর্ণমেণ্টের এই কর্তৃত্বের অধিকার মানিয়াও লয়। তাই, ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমীর শরিফুদ্দীন সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিয়াছেন, "We therefore, ask the question why then should we accept the joint police force in our own territory?"

ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসায় যখন এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ ওলন্দাজরা আবেদন করে যে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীকে তাহাদের অবস্থানক্ষেত্র হইতে ১০ কিলোমিটার সরাইয়া লইতে হইবে। এইভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ সামরিক প্রশ্ন টানিয়া আনিয়া ওলন্দাজরা "রায়মুখো" হইয়া ওঠে এবং ২১শে জুলাই ওলন্দাজ বিমান বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্থলবাহিনীও তৎপর হয়।

ওলন্দাজরা কেবল সময় লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে হেরিবন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহা তাহাদের আচরণে সুস্পষ্ট। কুটেন ইন্দোনেশিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে বাধ্য হইলেও ওলন্দাজদের সে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছে। ওলন্দাজ সামরিক বিভাগকে কুটেন্ প্রচুর পরিমাণে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়াছে। ওলন্দাজ সেনাবাহিনী শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছে কুটেন। বৃটিশ বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই তিনিসন সৈন্য তখন ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে। সম্প্রতি মিঃ বেভিন্ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ওলন্দাজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কাজ বন্ধ করিবেন না।

ইন্দোনেশিয়ার দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইবার আর্থিক সঙ্গতি ওলন্দাজদের ছিল না। কুটেন্ ধনিক, তাহার পক্ষে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব নহে। তাই, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওলন্দাজ গভর্ণর জেনারেল ঘোড়াম মনমুখেরও যেন আমেরিকায়। মার্কিন মনমুখেরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সকলে ডলার খাটাইবার জন্য উদগ্রীব। ইন্দোনেশিয়ার

চলার খাটাইয়া লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজ খবর লইবার জন্য তাহারা বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছিল। খোঁজ খবর লওয়া শেষ হইয়াছে। এখন তথাকথিত মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে বর্ণবিদ্বেষী ইংরেজীয় বেণ্ডলিকে সাহায্য দানের আশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে চলারের চাকায় বাঁধিবার যে চেষ্টা হইতেছে, সেই চেষ্টার বেমোল্যাজের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হইবে। আমেরিকা যে ইথোপেনিয়া সম্পর্কে এত বেশী আগ্রহী, তাহার মূল কারণ পূর্ববর্তিত ওলস্যাজদের ফেডারেল গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি প্রস্তাব ইথোপেনিয়ান্ রিপাবলিককে ধামাইয়া লইবার জন্য মার্কিণ গভর্নমেণ্ট চাপ দিয়াছিলেন। তাহারা ইথোপেনিয়ান রিপাবলিককে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব না মানিলে তাহারা ইথোপেনিয়াকে কোনরূপ অর্থসাহায্য করিবে না।

ইথোপেনিয়া প্রস্তাব জাতি-সঙ্ঘে উত্থাপিত হইলে ফ্রান্স ও আমেরিকা সমগ্র ব্যাপারটা ভণ্ডুল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইবার পূর্বে ফ্রান্স আবিসিনিয়াকে এক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিল যে, ইথোপেনিয়া সম্পর্কে ফ্রান্স পক্ষপাতশূন্য আচরণ করিবারে. সে আমেরিকার পূর্ব প্রস্তাবিতেই ফ্রান্সিসকে এই কথা জানাইতে বাধ্য হইল। তাহার পর, যখন পরিষদে ফ্রান্স ইথোপেনিয়ার অনুকূলে ভোট দেয় নাই। আমেরিকা তখন বাস্ত হইয়া ইথোপেনিয়ার বিরোধ মীমাংসা করিতে আগাইয়া আসে। আমেরিকার আশঙ্কা—পাছে জাতি-সঙ্ঘ তাহার নিজস্ব প্রতিনিধিবর্গকে পাঠাইয়া প্রকৃত ব্যাপারটা জানিয়া ফেলে এবং ইথোপেনিয়ার অনুকূলে রায় দেয়। তাই, সে নিজে এই ব্যাপারে মোড়লী করিতে চায়। শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের আপত্তিতে আমেরিকার চাল ব্যর্থ হইয়াছে; কথা থাকুক—পূর্ব হইতে আমেরিকা যদি সরিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে অনায়াসে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পারিত। জাতি-সঙ্ঘে এই প্রকার উত্থাপনার প্রয়োজনই ঘটিত না।

শিল্পী মুকুন্দ মজুমদার

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অন্যান্য দেশে এক সময়ে যাঁহারা ভারতীয় শিল্প-আদর্শে সহজ কথায় 'ওরিয়েণ্টাল আর্টিস্ট' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিষ্ঠা ও সাধনোদ্যমের রাশি রাশি ভক্তি ঐভাবেই সঞ্চিত হইয়াছিল। যখন সমাজের দিক হইতে এবং সমালোচকদিগের নিকট হইতে অবহেলা ও ব্যঙ্গ আসিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ সেই ঃ দিন কাটিয়া গিয়াছে।

মুকুন্দদেব

অবনীন্দ্রনাথ, তাঁহার স্নেহ শিষ্যকুল অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে প্রভৃতি অন্ত-

অন্দেহের মেয়ে

এখন তাঁহারা শুধু বাঙ্গালা দেশে বা ভারতবর্ষেই নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও তাহাদের প্রাপ্য হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সি, আই-ই উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। আজ অবনীন্দ্রনাথ যশস্বী এবং অতুল গৌরবের অধিকারী তিনি। তাঁহার শিল্প প্রতিভা চিত্রজগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া তাঁহারই শিক্ষা ও আদর্শে গৌরবকে বেগে বেগে ভূষিতা করিয়াছেন।

আজ আমরা যে তরুণ শিল্পীর পরিচয় দিতেছি তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস' হইতে ১৯৪১ সালে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিল্পী মুকুল

মুকুল লিখিত

মুকুল আপনাকে কোনদিন জনসমাজে প্রচারের জন্য উদ্গ্রীব নয়, জীবনে আপন মনে শিল্প সাধনাই তাহার জীবনের ব্রত।

এখানে যে কয়টি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহার সব কয়টিই তাহার ব্রাসওয়ার্ক, এবং সবেল হইতে গৃহীত। খোলা মুখাইয়া আছে তাহার পাশে পড়িয়া আছে তাহার লাঙ্গুল মুখখানি। মুকুল এই শিশুর মুখে যে স্বাভাবিক সরলতা এবং পশু সাধুর্য্যের ছাপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা সত্যিকারই উপভোগ্য। আমাদের ভারতীয় চিত্রকরেরা বিদেশী চিত্রশিল্পীদের মত তাহাদের অঙ্কিত চিত্রে শিশু ও বালক-বালিকার জীবনের সহজ সরল সম্বন্ধ গতি ও সাবলীল অভঙ্গী—হাসি, কান্না, আদর, খেলা ধূলার বৈচিত্র্য প্রায় দেখা যায় না, তাহাই এই নিত্রিত শিশুটির চিত্র দেখিয়া আমরা আকর্ষিত হইয়াছি।

মুকুলের অঙ্কিত মুরগীর ছানাদের ছোট চিত্র দুইটি ব্রাসওয়ার্ক। ছিপ্রা দুইটির শুধু ব্রাসের টানে দুইটি অপূর্ব্ব সুগোলাম বিভিন্ন ও ধর্ম্মি ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উভয় ভঙ্গীর চঞ্চল দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটা চলৎশক্তি নিরীক্ষ অথচ প্রাণময় বিশ্বাসী বিকশিত হইয়াছে। আমরা তাহার এই চিত্র কিনটির ভিতর দিয়া শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাই।

শিল্পী—মুকুল বসুমজুমদার

আমরা এখানে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়াও সঙ্গত মনে করিতেছি। মুকুল কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজসাহেব ৺মন্মথনাথ বসুমজুমদার মহাশয়ের পৌত্র। মুকুল পারিবারিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইয়া—এই শিল্পীর জীবনকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

শিল্পী মুকুল যত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার অঙ্কিত সেই সমুদয় চিত্রের একটি প্রদর্শনী হইলে তাহা চিত্রামোদীদের কাছে আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে করি।

আশা করি একদিন এই তরুণ শিল্পী বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের ভিতর অন্যতম হইবেন। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করি।

বনফুল

১০

খিড়কীর দরজার সামনে সুশোভন এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দেখলে একটা নয় দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, নীচে একটা—লোহার ছিটকিনি। নীচেরটা চল-চলে গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্তু এত বেশী চল-চলে যে একটুতেই পড়ে যাচ্ছে, আর এমন একটা খড়খড় আওয়াজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয়, আশঙ্কাজনকও। গোঁদাইজির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। উপরের ছিটকিনিটি আবার ঠিক বিপরীত, এমন আঁট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আছে। সুশোভনের বাঁ হাতে লণ্ঠন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান মারলে একটা। ক্যাঁ—চ করে' বিকট একটা আওয়াজ হল কিন্তু খুলল না। অর্দ্ধেকটা খুলে থেকে গেল। আলোটাও নিবে গেল ঘপঘপ করে'। সুশোভন আলোটা তুলে নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতালার দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কি না। না, ভাঙেনি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জ্বাললে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে আর একবার টান দিলে ছিটকিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হল 'জাম' হয়ে এঁটে বসেছে আরও। বাঁ হাতের আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিতে হল দেশলাই কাঠিটা। আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। কুকুরের একটা ছিদ্রে না করে' সান্ত্বনার কাছে ফেরা যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে' হোক। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে' রুমালটা ছিটকিনিতে বেঁধে খুলে পড়ল সেটা ধরে' সে। ক্যাঁ—চ খটাং—ভীষণ শব্দ করে' খুলে গেল। যাক। উপর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। না' গোঁদাইজির নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। কপাটটা খুলে বেরিয়েই সুশোভনের পা পড়ল ছাতার মতো একটা জিনিসের উপর। দেশলাই জেলে দেখলে জায়গাটা আঁস্তাকুড় গোছের। ভাঙা টিন, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরো, গোবর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের অনও বোধহয় পড়ে এইখানে। স্যাঁত স্যাঁত করছে চতুর্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জেলে সেটা তুলে ধরে' সুশোভন দেখলে—সর্ব্বনাশ, সামনে আর একটা দেওয়াল এবং তাতে আর একটা কপাট। মনে হল এইটেই বোধহয় আসল খিড়কি। এটা পার হতে পারলে তবে গোয়ালঘরে পৌঁছানো যাবে। ভাগ্যক্রমে এ কপাটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল। বিশেষ বেগ পেতে হল না। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ালটা পেলে। জুগুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি সুরু হল ঝির ঝির করে'। কনকনে হাওয়া তো ছিলই। রুমালটা মাথায় দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালতে জ্বালতে গোয়ালটার দিকে অগ্রসর হল সুশোভন। ছাপ্পর-খাট-শায়িতা কল্পনাবৃতা সান্ত্বনার ছবিটা অনিবার্য্যভাবে ফুটে উঠল মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে। একটু আগে তার শয্যাপ্রান্তে বসে তার ছিন্নছাম ধরোয়া মূর্ত্তি দেখে একটু অভিভূত সে যে হয় নি তা নয়। বিলাসী, বেদি,

খরচে অনীতার সঙ্গে তুলনা করে' সান্ত্বনার সাদাসিধে ভাবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু সুশোভনের মনে পড়ল সান্ত্বনাও এক কালে কম করে নি। সেই লেখন-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকেই ও বদলে গেছে এবং তারপর বোধহয় আবিষ্কার করেছে যে সাদাসিধে চাল চলনই ভাল। একটু আগে—সত্যি কথা বলতে কি—সান্ত্বনার ধীর স্থির শান্ত গার্হস্থ্য লক্ষ্মীশ্রী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম প্রকৃতির সঙ্গে তার তুলনা করে' সুশোভনের মনটা সান্ত্বনার দিকেই ঝুঁকে ছিল একটু। কিন্তু এখন সে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করছিল এইসব লক্ষ্মী-শ্রী-মার্কা স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীণ ব্যাপার। তাকে যেচ্ছায়, শুধু যেচ্ছায় নয় সানন্দে এই ঠাণ্ডায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে' লক্ষ্মীছাড়া একটা কুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে! কি রকম দাম্পত্যজীবন এদের? ভদ্রহাসি-মাখানো শান্ত্রীয় মাধুর্য্যের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি। না, তার অনীতা ঢের ভাল এর চেয়ে। উদ্দাম জিদি আবদেরে বদরাগী কিন্তু প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে—আর এতটা অন্যুন স্বার্থপরও নয়। অনীতা কখনও তাকে এমনভাবে কুকুর আনতে পাঠাতো না। কখনও না।

কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে—সেই সেকালের কমরেড সান্ত্বনার সঙ্গে—একরাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত মন্দও লাগছিল না সুশোভনের। বেচারী! কি বদনামটাই রটিয়েছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধহয় গৃহলক্ষ্মীটি হয়ে গেছে একেবারে। এরকম আরও দেখেছে সে। বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা খুব বেশী প্রগতিশীলা থাকে বিয়ের পর আর চেনা যায় না তাদের। একেবারে সটান তুলসীতলা আশ্রয় করে তারা। সান্ত্বনার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি হচ্ছিল তার।

এইবার কুহুর খোঁজ করা যাক।

কুহুর কান্না শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের কপাটটা খোলা ছিল। সুশোভন কপাটের কাছে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে একটু। কিছু দেখা গেল না। খড়ের খড় খড় শব্দ আর কুহুর আর্তনাদ ছাড়া শোনাও গেল না কিছু। সুশোভন ভিতরে ঢুকে দেশলাই জ্বাললে। সুশোভনকে দেখে কুহু হাহাকারের সঙ্গে সমর্থনসূচক একটা হর্ষোচ্ছ্বাস মিশিয়ে অদ্ভুত ধরণের শব্দ করতে করতে এগিয়ে এল। সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে দিতে চাটলে দু' একবার ভয়ে ভয়ে। আহা, আপাদমস্তক থর থর করে' কাঁপছে। লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। বেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরণে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চীৎকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা আনুনাসিক কোঁতানি আরম্ভ করলে যা অতিশয় শ্রুতিকটু।

"চুপ কর"

"কুঁই কুঁই কুঁক কুঁক"

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। সুশোভনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক।

"চুপ কর"

সুশোভন ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এ রকম ছিঁচকাঁদুনে হতে পারে তা সুশোভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠল কুহু।

"চুপ কর বলছি, মারব না হলে—"

সুশোভন যে-ই একটু হাত তুলেছে কুহু "কেঁউ" করে' বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের মধ্যে।

"আরে, এ কি হল"

কপাটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সুশোভন।

"আঃ আঃ চু চু চু"

টুসকি দিতে লাগল। কোন ফল হল না। বেরুতে হ'ল গোয়াল থেকে। বৃষ্টিও নামল বেশ জোরে।

"আয় আয় কুহু—আঃ—আঃ—"

নাভি-উচ্চ-কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে এগুচ্ছিল হড়মুড় করে' হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামলা গোছের কি ছিল, গরুর জাবখাওয়াবার ডাবা বোধ হয়।

"কুহু কুহু, আর বলছি। এস লক্ষ্মীটি। মারব না, কিচ্ছু বলব না, আঃ আঃ। আর না—উঃ কি লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বাবা—ধরতে পারি যদি একবার। কুহু—কুহু"

দূরে বহুদূরে শর্ষে-ক্ষেতের ভিতর ছুটতে ছুটতে একটা খেজুর গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে 'কেঁউ' করে' উঠল

ঝুনু। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সুশোভন চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি রি করে' উঠল রাগে। কিন্তু করবারই বা কি আছে! এগুতে হল। শব্দটা যে দিক থেকে এল সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল সে হন হন করে'। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল কিসের উপর একটা। তলপেটে গুঁতো লাগল। টিউব ওয়েলের পাম্প না কি এটা! আর একটু গিয়ে আবার হোঁচট —আর একটা পিপে। ঝন ঝন শব্দ করে' টিনও পড়ে গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জব জবে কিসে পা বসে যাচ্ছে। সেখানটা অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার ঠোক্কর খেতে হল, সান-বাঁধানো জায়গা ছিল একটা সামনেই। বোধহয় স্নান করবার জায়গা। একটা ঝাঁটা পায়ে ঠেকল, লাথি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। তারপর সে দাঁড়াল একটু। এ কোথায় এসে পড়ল! আর তো কোন শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। একটা গাছের ডাল থেকে ফোঁটা কয়েক জল পড়ল টপ টপ করে' নাকের ডগায়। সরে' দাঁড়াতে হল।

"উঃ কি ফ্যাসাদে পড়লাম। এর পর যদি কুকুরটাকে ধরতেও পারি, কি যে হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ভিজে কুকুরকে সান্ত্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেঝেয় শুতে হবে, শুয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়, জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেব একেবারে। ঝুনু—আ:—আ:—ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। আর একটু এগিয়ে সুশোভন দেখলে একটা বেড়া রয়েছে, তারের বেড়া। এর ওপারেই মাঠ। মাঠে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বেড়াটার তার দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই।

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোভনের মনে হল আর পারছে না সে। সীমা অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে দুরবস্থা আর হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়। ওই গোয়ালে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাক। থাকুক গোবরের গন্ধ, ওই খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কেটে যাবে কোনক্রমে। ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে'। কোলকাতার তার নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনাতা শুয়ে আছে। কল্পনা করেও যেন আরাম হল একটু। কিন্তু একটা কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম করে' একটু ঘমেও গেল সে। এ সমস্তর জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। রাগ পড়ে' গেল। একটা শূন্য বিমর্ষভাব খাঁ খাঁ করতে লাগল সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছিল খুব···। বেড়াটা পেরিয়ে খুঁজে দেখবে না কি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল না সে। আর এতে লজ্জারই বা কি আছে। ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম না হয় নাই হবে। ঘুম হবেই না বা কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে।

কিন্তু না, তার মনের অন্তরতম প্রদেশে আর একটা কি যেন খচখচ করছিল। কি সেটা? সে এমন কিছুই করে নি এখনও পর্য্যন্ত যা অন্যায়, যাতে অনাতার ন্যায়ত রাগ হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে অনীতা বুঝবেই নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত। কিছুই তো করে নি সে। কিন্তু তার মনের এই বিমর্ষভাবের সঙ্গে অনীতাই যে নিগূঢ়ভাবে জড়িত এ ধারণাটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল না কিছুতে···।

"ঠিক"—হঠাৎ মনে হল তার—"আসলে অনীতার জন্যে মন কেমন করছে। মানে বিরহ"

হ্যাঁ, বিরহই। নিজের বান্ধবীদের কাছে যে অনীতার বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাকে বিয়ের পর এক রাত্রিও ছেড়ে থাকে নি সে। নিজের বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে—পরের স্ত্রীর কুকুরের পিছু পিছু ছুটে একটা হতভাগা হোটেলের পিছনে মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে রাত দুপুরে। অনাতার সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সান্ত্বনার কাছে!

অনীতার মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া। কিন্তু ওই অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অম্লমধুর অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, তার এই মুহূর্ত্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা যদি অনাতা পেত কোনক্রমে—একরাত্রি তাকে ছেড়ে কি

রকম মন কেমন করেছিল তার—তাহলে তার কড়া মেজাজ নরম হয়ে যেত ঠিক।

সান্ত্বনা বড্ড বেশী নরম—একটা কুকুরের জন্যেই হেদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক্ তার কুকুর। হোটেলের দিকে ফিরল সে মরীয়া হয়ে। পত্নী-নিষ্ঠা, স্বামীর নিরুদ্বেগ চরিত্র-মাধুর্য্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত তখন পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব কম শব্দ করে' দুটি দুয়ারের ছিটকিনি বন্ধ করলে, বলাবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের ছিটকিনিটি স্পর্শ পর্য্যন্ত করলে না। লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি—ক্যাঁচ কোঁচ একটু আধটু শব্দ নিবারণ করা গেল না কিছুতে। উপরে উঠে সিঁড়ির উপর বসে' ভিজে জুতো দুটো খুলে ফেললে সে সর্ব্বাগ্রে। ইস্, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। জুতো খুলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে একটু। এইবারই তো—। উপরের ঘরে (মানে গোঁসাইজির ঘরে) খুটখাট শব্দ শোনা গেল দু' একবার। চকিতে উপরের দিকে একবার চেয়ে নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। সান্ত্বনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দেশলাই জ্বাললে, তবু সান্ত্বনার কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা তাকের এককোণে মোমবাতি রয়েছে একটা। হেডমাষ্টারের সম্পত্তি, বোধহয় তাড়া-তাড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক। চট্ করে' মোমবাতিটা তুলে জ্বেলে ফেললে সে।

বালিশে মাথাটি রেখে সান্ত্বনা ঘুমুচ্ছে—বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে মনে' মনে হল—অধরে শান্ত প্রসন্ন হাসি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকাতে গণ্ডের ও গ্রীবার এমন একটা লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর বললেই সবটা বলা হয় না। সুশোভন হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে' ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সামান্য একটু নড়ে চড়ে উঠল সান্ত্বনা, বাঁ হাতখানা বুকের উপর ছিল নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। অনামিকার বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল তার পাথরখানা। সুশোভন সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। সে বেচারীও বোধহয় একা একা ঘরে ঘুমুচ্ছে এখন। কিম্বা সে হয় তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে··· বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ···একটা অভূতপূর্ব্ব বেদনা আকুল করে' তুলেছে হয় তো। সুশোভনের শীত করছিল, মাথাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাল সে একবার। না, সে শোবে না এখানে। সান্ত্বনা, সান্ত্বনার স্বামী এবং সমস্ত শোনবার পর অনীতাও তার এখানে শোওয়ার সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, সিঁড়িতে কিম্বা ওই গোয়াল ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন উচিত তা বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা হয় তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। তার কেমন যেন আবছাভাবে মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে শুলে অনীতার সঙ্গে আত্মিকযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমন্ত সান্ত্বনার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্য আরও চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"উঃ কি সাংঘাতিক প্যাচেই যে পড়েছি। ভিজে জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন ছুঁকছুঁক করছে, বিবেক দংশন, রাম রাম! কি যে করি এখন ঘোড়ার ডিম"—স্বগতোক্তিটা জোরেই হয়ে গেল একটু।

"কে, ও আপনি, কি বলছেন"—জেগে উঠল সান্ত্বনা।

"বলছি, কি করি এখন"

"কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঘুমু কই"

"ঘুমু এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই আসতে চাইছে না। থাক না বেশ আছে, বাইরে আরামে থাকবে"

"খেলা করছে! না, না, সুশোভনবাবু নিয়ে আসুন তাকে। ঠাণ্ডায় অসুখ করে' যাবে"

"কিচ্ছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে"

"কেন"

"ঘা অন্ধকার। সূচীভেদ্য বললে কিছুই বলা হয় না। আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা—"

"ঘুমু কোথায়"

"শেষবার যে তার সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান করছি সর্ষে ক্ষেতে ঢুকেছে"

"সর্ষে ক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে গেছেন একেবারে দেখছি"

সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তার সিক্ত কোটের দিকে শুভ্র বাহুটি প্রসারিত করে বলল—"ছি, ছি, আমার দশা কি হয়েছে আপনার"

"তাতে কি হয়েছে"—ঔদাসীন্যভরে সুশোভন জবাব দিলে—"বেশী ভেজেনি, সামান্য একটু"

"সামান্য একটু কি! ভিজে সপসপ করছেন, এর নাম সামান্য একটু? এত ভিজলেন কি করে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না কি?"

"আজ্ঞে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম"

"কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুণি। অসুখ করে' যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই বা কি করে'—আপনার সুটকেশ তো আসে নি—সে তো অনীতার সঙ্গে চলে গেছে। মুস্কিল হল দেখছি, কি করা যায়"

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় সীমানা-নির্ধারণ কমিশনের রায় কি অযৌক্তিক?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভারত বিভাগ সাব্যস্ত হওয়ায় পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশও বিভক্ত হইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে ছোটলাটের নির্দেশ অনুযায়ী ৪ঠা জেলাকেও পূর্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল, বড়লাট বাহাদুরের ৩০শে জুনের ঘোষণা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কমিশন নিযুক্ত হয়। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় সীমানা কমিশনের বিচার্য বিষয় নিম্নলিখিত রূপ স্থির করা হইয়াছিল।

"সীমানা নির্ধারণ কমিশনকে মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যা অঞ্চল নির্ণয় করিয়া বাংলার উভয় অংশের সীমানা নির্ধারণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সীমানা নির্ধারণ করিতে গিয়া কমিশন অন্যান্য বিষয় ও বিবেচনা করিবেন।" সীমানা কমিশনকে যথাসম্ভব ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ জানান হয়। বাংলাদেশে বিচারপতি বিমলকুমার মুখার্জী, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি আবুসালে নওয়াজ আক্রান এবং বিচারপতি এস, এ, রহমানকে লইয়া কমিশন গঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগের সমর্থন অনুযায়ী স্যার সিরিল রাডক্লিফ কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিশনই ৪ঠা জেলার সীমানা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। পাঞ্জাবপ্রদেশের জন্য বিভিন্ন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য স্যার সিরিল পাঞ্জাব কমিশনেরও সভাপতি ছিলেন।

প্রাথমিক কয়েকটী বৈঠকের পরে কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের নিকট হইতে স্মারকলিপি আহ্বান করেন। বহু বিঘোষিত নানা দলের স্মারকলিপির মধ্যে জাতীয় মহাসভা, হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগের স্মারকলিপিই উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৬ই হইতে ২৪শে জুলাই কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। কমিশনের সভাপতি প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া কোনও পক্ষেরই যুক্তিতর্ক শোনেন নাই। কমিশনের নিকটে উত্থাপিত উপাদান এবং কৌঁসুলীদের যুক্তিতর্ক পাঠ করার পরে কমিশনের সভ্যদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যার জন্য কয়েকদিন আলোচনা করেন। কমিশনের সভ্যগণ বহু আলোচনার পরও সর্ব্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হন, এমন কি প্রধান প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কেও দুই মত হওয়ায় সভাপতি স্যার এক আপোষনামা দেন। সভাপতি স্যার সিরিল তাঁহার আপোষনামা দেওয়ার কৈফিয়ৎএ জানান যে কমিশনের দুইজন সভ্যই কোন স্থির সিদ্ধান্তে একমত হইতে না পারায় সভাপতির উপরে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দেন। আপোষনামায় আলোচ্য প্রশ্নগুলি উল্লেখ করিবার সময় স্যার সিরিল জানান যে বাংলাদেশকে দুভাগ করিবার মতন সন্তোষজনক প্রাকৃতিক সীমারেখা নাই বলিলেই হয়; মুসলমান ও অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় এমন কোন প্রাকৃতিক রেখা নাই। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরের দ্বারা সীমারেখা টানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন—কলিকাতা নগরী কোন ভাগে পড়িবে কিম্বা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কলিকাতা যদি সমগ্রভাবে একটী রাষ্ট্রের ভাগে পড়ে তবে কলিকাতা সহর ও বন্দর নির্ণয় করে এমন কোনও অংশের সহিত ইহার সংযুক্তি অবশ্যম্ভাবী (নদীয়ার সমস্ত নদী ইহাদের অংশ অথবা মূলটীর নদীসমূহ)।

তৃতীয় প্রশ্ন—যশোহর ও নদীয়া জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দাবী অপেক্ষা পদ্মা, পদ্মা ও যমুনতী নদী রেখার আকর্ষণ বেশী কিনা এবং তাহা দ্বারা কমিশনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ নির্ণয় করা হয় কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন—খুলনা এবং যশোহর জেলাকে পরস্পরের সহিত পৃথক করা যায় কি না?

পঞ্চম প্রশ্ন—মালদহ এবং দিনাজপুর জেলার অমুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করা উচিত কি না ?

ষষ্ঠ প্রশ্ন—দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ী জেলা কোন অংশে পড়া উচিত। প্রথমটীতে শতকরা ২'৬০ জন এবং দ্বিতীয়টিতে শতকরা ২৩'০৮% জন মুসলমান বাস করে কিন্তু এই দুইটী জেলা কোনও অমুসলমান প্রধান অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত নহে।

সপ্তম প্রশ্ন—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল কোন অঞ্চলে পড়া উচিত। এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৩ জন মাত্র হইলেও ইহা চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করা মুস্কিল।

গত ১৮ই আগষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাঁটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত সকলেই অবগত হইয়াছেন। ইহার পরে সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভা-সমিতিতে বাঁটোয়ারার বিপক্ষে উভয়পক্ষেরই বিরুদ্ধ আলোচনা ও ধিক্কারের যে ঢেউ উঠে আজও তাহার সমাপ্তি হয় নাই। কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে উভয় বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীরয় আপোষনামাকে শান্তির সহিত গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। উক্ত আবেদনে তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে আপোষনামার ত্রুটীসমূহ সংশোধন করিতে হইলে বিতণ্ডা না করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনার শান্তির সহিত সীমাংসা করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন. কিন্তু এই আবেদনের সাথে সাথেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুখপত্র আজাদ পত্রিকায় রাডক্লিফ সিদ্ধান্তে হিন্দুসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে বলিয়া লিখিত হয়। উক্ত পত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব লিখিতেছেন, রিপোর্টখানি দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে হিন্দুদের অবজ্ঞাত আত্মপ্রতিশ্বাসবশতঃ বাঙ্গলার মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করিয়া এইরূপ রায় দিয়াছেন। মৌলানা সাহেব স্বসমাজের মুসলমানদিগকে হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে তিক্ততা বাড়াইতে নিষেধ করিয়া সম্ভবতঃ মনের অগোচরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অত্যন্ত ইন্ধন যোগাইয়াছেন। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক স্যার সিরিল রাডক্লিফ তাঁহার রিপোর্টে কোন সম্প্রদায়ের "কোলে ঝোল" টানিয়াছেন। স্যাংকোনাল্ড সাহেবের ঐতিহাসিক আপোষনামা আমরা ভুলি নাই, ঐ আপোষনামায় প্রভুর লজ্জা হইল অথচ ভারত খণ্ড বিখণ্ড। বাংলাদেশ বিভিন্ন করার মূলে কোনও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কারসাজী আছে কিনা বিচার্য্য।

ব্রিটীশ বাংলার পরিমাণ ফল ৭৭৪৪২ বর্গমাইল।

বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫'৩ ভাগ অমুসলমান। অমুসলমানের বর্ত্তমান বসতীকৃত ভূভাগের পরিমাণ শতকরা ৭৭ভাগের বেশী, বাংলা দেশের মোট খেয় চাষযোগ্য ৮০ ভাগ খেয় অমুসলমান। কাজেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবার সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে হিন্দুদের ভূভাগ অন্ততঃপক্ষে লোকসংখ্যানুযায়ী ৫৫ ভাগ হওয়া উচিত ছিল। বড়লাট তাঁহার আনুমানিক বিভাগ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ৩১৯১৯ বর্গ মাইল জমি দিয়াছিলেন। রাডক্লিফ সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম বাংলায় ২৮২১৯ বর্গমাইল জমি পড়িয়াছে, অথচ অমুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ ৩৫ হাজার বর্গমাইল হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়, পর্ব্বত, অনাবাদী ও অনুর্ব্বর জমির অংশ হিসাবে ধরিলে নীট আবাদী জমির পরিমাণ আরও বেশী দাঁড়ায়, অথচ বাংলার সমগ্র আয়তনের ৩৩'৭ ভাগ পড়িল পশ্চিমবঙ্গে, আর ৬৬'৩ ভাগ পড়িল পূর্ব্ববঙ্গে। প্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে কুমিল্লা জেলায় ১ বিঘা জমির দামে বর্দ্ধমান বাঁকুড়ায় ১০ বিঘা জমি কিনিতে পাওয়া যায়। ধান্য উৎপাদিকা শক্তির উপরে এই মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৬০০৬১২৫জন, পশ্চিম ও পূর্ব্ববাংলায় লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২ কোটী ৭৫ লক্ষ ও ৩ কোটী ১০ লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে মাত্র ২ কোটী ১২ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৫২ লক্ষ থাকিল মুসলমান। মুসলমানের এই সংখ্যা সমগ্র বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ১৬ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ২৪'১১ ভাগ মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গে অমুসলমান দেওয়া হইল এক কোটী তের লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র বাংলার অমুসলমান জনসংখ্যার ৪২ ভাগ পাকিস্তানের পূর্ব্ববঙ্গে এবং পূর্ব্ব বাংলার লোকসংখ্যার মধ্যে ২৯'১৭জন রহিল অমুসলমান। বাংলার হিন্দু জনসাধারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্তর্ভুক্ত থাকিবার জন্য অখণ্ড বাংলাকে বিভিন্ন করিতে রাজী হইয়াছিল, সেখানে এই বিপুল-সংখ্যক হিন্দুকে রাষ্ট্র পরিচালনের অধিকারচ্যুত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মুখাপেক্ষী সাধারণী মাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে ঠেলিয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি ? প্রধান দুই জাতি একসঙ্গে এক রাষ্ট্রে থাকিতে অরাজী হওয়ায় দুই জাতির সংলগ্ন বেশী সংখ্যক লোকের পৃথক রাষ্ট্রভূমি রচনা করিবার জন্যই এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। সীমা নির্দ্ধারণের ফলে এক অংশে জনসংখ্যার ½ অংশ লোক ও ভূমি দেওয়া ব্রিটীশ সুবিচার, ন্যায় ও নীতির কি সঙ্গতিই না হইয়াছে ? সীমা নির্দ্ধারণকালে অন্যান্য বিষয়গুলিও চিন্তা করিয়া দেখিতে কমিশনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কমিশন এই মূলনীতিও কতটা মানিয়া চলিয়াছেন তাহাও দেখা যাউক।

রিপোর্ট দেখিয়া মনে হয় কমিশন "থানা"কে সীমানা নির্দ্ধারণের "ইউনিট" ধরিয়াছেন। বাংলা দেশে মোট ৬৫৭টী থানা। ইহার মধ্যে ২৯৩টী থানায় অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ এই ২৯৩ থানায় বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৩টী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ২০৯টী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসিয়াছে। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের (সিলেট ব্যতীত) ৩৭৩টী থানার মধ্যে ৪৪টী অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। * ইহার ভিতর ৪২টী থানা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন।

রাডক্লিফ সাহেব যে কয়েকটী প্রধান প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করা হউক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় শতকরা ৭৭জন অমুসলমান কতিপূর্ণ কলিকাতা নগরীকে পশ্চিমবঙ্গে না ফেলিয়া পারেন নাই। এই মহানগরীকে যে বিভক্ত করা অসম্ভব তাহাও তিনি

* এই তালিকা দেখুন।

বুঝিতে পারিয়াছেন এবং কলিকাতা নগরীও বঙ্গের গৌড় কিম্বা অপরাপর পুরাতন নগরীর ন্যায় যাহাতে পরিত্যক্ত না হয় তজ্জন্য ভাগীরথী নদী এবং যে সকল বড় নদীর জলে ভাগীরথী পরিপুষ্ট থাকিতে পারে তাহাও তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীর পয়ঃ প্রণালী উন্মুক্ত রাখিবার জন্য কয়টী নদীও যে একান্ত প্রয়োজন তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভৈরব, জলঙ্গী ইত্যাদি নদনদী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া বহিতেছিল। বর্ত্তমানে এই সকল নদনদী মৃতপ্রায় এবং ইহাদের সংস্কার করিতে হইলে যে ভূখণ্ডের উপরে অধিকার থাকা প্রয়োজন তাহাও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভৈরব সংস্কার বিপুল অর্থসাধ্য বলিয়া পরবর্ত্তী মাথাভাঙ্গা নদী তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু পদ্মানদীর জলস্রোত যে স্বল্পপরিসর ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া মাথাভাঙ্গার মধ্যে প্রবহমানা—মাত্র সেইটুকু ভারত ইউনিয়নে রাখিয়া সম্পূর্ণ মাথাভাঙ্গা নদীকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া কি রকম ভৌগলিক-জ্ঞানসঙ্গত তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। দ্বিতীয়তঃ নদীয়ার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত স্থান। ভঙ্গীপুর মহকুমা সংলগ্নতার জন্য প্রয়োজন এবং এই নামান্য প্রয়োজনের বালাইএর জন্য সম্পূর্ণ খুলনা জেলার দাবী পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ভৈরবের পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত খড়ারাইল ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদের মৃত ভূখণ্ড কোন কারণেই এবং কোন হিসাবেই খুলনার দাবী রহিতকরণে সমর্থ হয় না।

তাঁহার তৃতীয় প্রস্তাবে পদ্মা, পদ্মা ও মধুমতী পর্য্যন্ত ভূভাগকে একদিকে আনিলে সীমারেখা প্রাকৃতিক হইতে পারে কিন্তু এতদঞ্চলের অন্তর্গত মুসলমান জনসংখ্যা তাঁহাকে বিব্রত ও বিরত করিয়াছে। মধুমতী নদীকে সীমারেখা ধরিলে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ মিলিয়া যে ভূখণ্ড হয় তাহার অমুসলমান সংখ্যা হয় শতকরা ৬৯ভাগ এবং মুসলমান হয় শতকরা ৩১জন। এই জনপদ ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক হিসাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংবদ্ধ। সুতরাং যশোহর ও খুলনার বিষয়ে কেবলমাত্র মুসলীম লীগের অখণ্ড মুসলীমবঙ্গের দাবী উপেক্ষিত হইলে বিচার্য্য বিষয় সংক্রান্ত যুক্তিনীতি লঙ্ঘন করা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী খুলনা জেলা, যে জেলা কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী, বরং বৃহৎ কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার গোলাবাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বাগেরহাটের সংলগ্ন দুইটী থানা বাদ দিলে যে জেলা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুপ্রধান, সেই জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দিতে আইনজ্ঞ আর রাজনিকের বিচারে অন্যায় হয় নাই। খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন নড়াইল মহকুমার অধিকাংশ ভূভাগ, অভয়নগর থানা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা, মজের এবং কলকিনী থানাসমূহ, বাগেরহাট জেলার ৪টী উল্লেখযোগ্য থানা এই মোট ভূভাগের আয়তন প্রায় ১৯১১ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ২২ লক্ষ, অমুসলমান সংখ্যা ১৭ লক্ষের উপর (শতকরা ৭৯ ভাগ)। এই বিরাট ভূখণ্ড খুলনার সহিত আসিয়া যায় ইহা কোন বৃটীশ বুমেরাঙ্গাঙ্গ আর রাজনিকের দৃষ্টিপথের অগোচরে থাকে নাই। সমৃদ্ধিপূর্ণ এই ভূখণ্ডের সুসংগঠিত কারবারীপূর্ণ নগরসমূহ জাতি সম্বন্ধঃ বিচারের সময় চাষের পোয়ালার তুফান তুলিয়াছিল, খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ ও প্রবহমানা নদনদী, পশ্চিমবঙ্গের হস্তচ্যুত হওয়ায় কেবলমাত্র লোকসংখ্যায় এই নূতন প্রদেশ দুর্ব্বল হইল না, ভাবী জনসংখ্যার সম্ভাব্য আবাসভূমি, সুন্দরবন ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম চাউলের কেন্দ্র হস্তচ্যুত হইয়া গেল। অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ বীর নমশূদ্র জাতিও দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পঞ্চম প্রশ্নে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার অমুসলমান অংশকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া যায় কিনা? প্রশ্নের এই ধারা ও ক্রমবিকাশ দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে খুলনা ও যশোহর জেলাদ্বয়কে পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া সাব্যস্ত হইলে খুলনা যশোহরের কয়েকটী মুসলমানবহুল থানার বদলে হিন্দু বহুল দিনাজপুর ও মালদহের কয়েকটী থানা পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া বিচারসঙ্গত হয় কিনা—কিন্তু খুলনা, যশোহর বাগেরহাট ও ফরিদপুরের ৩০টী হিন্দু প্রধান থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়ার পরেই উক্ত প্রশ্নের আদৌ সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে এখানেও এই অসঙ্গত বিচার করা হইয়াছে। মালদহ জেলা রাজসাহীর সংলগ্ন বলিয়া মালদহের ৪টী মুসলমান প্রধান থানার সহিত একটী হিন্দুপ্রধান থানা (নবাবগঞ্জ) রাজসাহী জেলায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার সহিত সংলগ্ন পদ্মানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হিন্দুপ্রধান রাজসাহী সহরও বোয়ালিয়া থানাকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না কেন তাহা দেবতারও অবোধ্য! রাজসাহী বরেন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সহরসমেত চারিটী হিন্দুপ্রধান সংলগ্ন থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে দিয়া, হিন্দুপ্রধান দিনাজপুর জেলার পশ্চিম অংশকে কোণঠাসা করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ব্ব সীমান্ত বিহার প্রদেশের সহিত ঠেলিয়া দেওয়ার সঙ্গত কারণ কি, আপোষনামায় তাহার উল্লেখ নাই। যশোহর ও খুলনার মুসলমান পরিষ্ঠতার যেমনার ন্যায় এখানে কোনও নৈতিক প্রশ্নই বিচারকের বিচারে উদয় হয় নাই। চিহ্নিত ১নং তপশীলে দেখা যাইবে যে এই অঞ্চলের সহিত জলপাইগুড়ির তলদেশ পর্য্যন্ত গড়দিয়াবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আছে। জলপাইগুড়ী মালদহ ও দিনাজপুর বিচ্ছিন্ন করিবার সময় নদনদীর গতিপথ, সাংস্কৃতিক কিম্বা সামাজিক, পারস্পরিক যোগাযোগও বিচার করা হয় নাই, এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী মহানন্দা, করোতোয়া, ত্রিস্রোতা ও আত্রেয়ী। প্রায় সকল নদনদীই ত্রিস্রোতার জলে পুষ্ট ছিল। ত্রিস্রোতা বর্ত্তমানে পূর্ব্বগামিনী হওয়ায় উত্তরবঙ্গের সকল নদনদীই মৃতকল্প। ভবিষ্যতে ত্রিস্রোতা নদীর যদি কোন পরিকল্পনা করা হয় তবে এইভাবে উত্তরবঙ্গ ও তাহার নদনদীকে দুই ভাগে "দুটো জগন্নাথ" করা হইল কেন? ত্রিস্রোতার জল যেখানে শক্ত পার্ব্বত্য ভূভাগের উপর দিয়া প্রবাহিতা সেই ভূভাগ রহিল ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে, নীচে যাহারা জল কুড়াইবে অর্থাৎ বন্যার জের সামলাইতে তাহারা রহিল পূর্ব্ব পাকিস্তানে। ভূভাগ বণ্টনেও মন্ত্রার গবেষণা করা হইয়াছে। জলপাইগুড়ী জেলার বোদা, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ এবং তেঁতুলিয়া একদিকে

বলা হয় বোধ পরগণা। এই অঞ্চলের মোট ১২২১৯৩৯ন লোকের মধ্যে ৮৭৮১০জন মুসলমান. মোটা কথায় ঐ পরগণা এখনও হিন্দুপ্রধান অঞ্চল. তবাচ এই অংশকে পাকিস্তানে দিয়া জলপাইগুড়ীর বাদবাকী বিপুল জনসংখ্যাকে ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করা হইল কেন? এই স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গকে তথা বাংলা দেশকে কার্যতঃ ছিন্ন ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত রায়বংশীসমাজ ভিন্নভাগে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর এই জাতির মৃত্যুবীজ বপন করা হইল কিনা ভবিষ্যৎ একমাত্র সহায়ক্ষা. সবচেয়ে সেরা হইয়াছে ভাগের খেলায় পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া. ঠিক যেন কোচবিহারের বুকে পিস্তল তাগ করিয়া আছে এই ক্ষুদ্র পাটগ্রাম। কোচবিহারের কোলে ছোট এই হিন্দুপ্রধান থানা. তামাকের জন্য বিখ্যাত। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ী জেলার সংলগ্ন রংপুর জেলার ডিমলা ও হাতিবাঁধা নামক হিন্দুপ্রধান থানা দুইটীকে জলপাইগুড়ীকে না দিয়া হিন্দুপ্রধান পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গে গুর্খাদের আন্দোলনে এবং জলপাইগুড়ীতে অসমিয়া ব্যবসায়ীর গুণ্ডেস্থাপিত্ব প্রেরণ, ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন। "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের দ্বারা কি পূর্ব্বগামিনী? মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উদ্দেশে। এই অঞ্চল মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগের কিঞ্চিৎ বেশী। অধিকাংশে অধিবাসীই উপজাতি এবং শাসনবহির্ভূত অঞ্চল। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ৯১ ও ৯২ ধারানুসারে শাসিত এই অঞ্চল ব্যবস্থাপরিষদে কোনও সদস্য প্রেরণ করিত না. উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মগদের সংখ্যা অত্যধিক। মোট আয়তন ৫০৭৭ বর্গমাইল। বড়লাট আনুষানিক অঞ্চল বর্ণনা করার সময় মুসলীমপ্রধান অঞ্চলের তপশীল দেন, সেই তপশীলে এই জেলার কোনও উল্লেখ ছিল না; কিন্তু শাসন বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছিল কিনা তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই: সীমানির্ধারণ কমিশন এই অঞ্চলের কোন প্রতিনিধি কিম্বা মন্তব্য গ্রহণ করে নাই। কোনও কারণেই এই অনাবৃত অঞ্চল মুসলীম বঙ্গে যাইতে পারে না. পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত না থাকায় শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এই অঞ্চল হয় আসাম প্রদেশে কিম্বা সংলগ্ন স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত যুক্ত হইতে পারে। বিচারপতি রাডক্লিফ কোন আইনে বলিলেন যে চট্টগ্রামের মালিকই এতদঞ্চলের স্বাভাবিক অধিকারী, ধর্ম্ম কিম্বা নৃতত্ত্ব কোন কারণেই চট্টগ্রামের সহিত এই উপজাতিদের কোনও সম্পর্ক নাই। তার সিরিল রাডক্লিফএর বিচার দেখিয়া মনে হয় বিচারক সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই বাংলাদেশ ভাগ করিতে বসেন নাই। তাঁহার হিসাবে আছে একদিকে কলিকাতা নগরী ও অপরদিকে বাংলাদেশ; কাজেই মুসলিম বঙ্গ কিসে দাঁড়াইবে, আয়তনে, জনসংখ্যায় কিম্বা খাদ্যে দ্রব্যে, কলনার বলে হাইড্রো-ইলেকট্রীক স্কীমের সুবিধা দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত ত্রিস্রোতার অববাহিকা ভূমি, নিম্নের পক্ষে সুসঙ্গ দুর্গাপুর, চট্টগ্রামের (পার্ব্বত্য) কাঠ, সুন্দরবনের কাঠ ও মধু, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাউল, সেতাবগঞ্জের কিম্বা বর্ণনার চিনি পাটগ্রাম ও চেংমারির উৎকৃষ্ট তামাক, কলিকাতা মহানগরীর বদলে না দিলে, নবজাত প্রদেশের চলে কি করিয়া! শরিয়তএর আদর্শে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে এক কোটী ব্যয় লক্ষ হিন্দুর বলিদান. মোটেই অসঙ্গত নহে। স্পষ্টভাবে এই রকম না বলিলেও কতকটা যে এইরকম ভাব তাহা সুস্পষ্ট। কাজেই আগে হইতে আক্রান্ত খাঁ সাহেব যে দোহার টানিয়া চলিতেছেন, ইহা কি একেবারে না বেশিয়া অন্ধকারেই কোপ মারা। ম্যাকডোনাল্ডের স্বজাতি স্যার সিরিল রাডক্লিফ বিচারকের আসনে বসিয়া মুসলীতি, "দুই পক্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি" ও স্যার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মুরপনের অন্যায় করিয়াছেন। সীমানির্ধারণ কমিশনের সভাপতি হইয়া তিনি একান্ত বৈঠকে উপস্থিত হন নাই, যে অঞ্চল দিয়া সীমারেখা টানা হইয়াছে তাহাও তিনি নিজ চোখে দেখিবার সুযোগ বা প্রয়োজন বোধ করেন নাই, দুইপক্ষ সম্মিলিত সিদ্ধান্তে করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি "কাঁচি" হস্তে বাংলার মানচিত্র সোজা ভিন্নভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য দুইভাগ করার দিয়া মানসিক সংযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন! কাজেই এই অনুমান অহেতুক নহে যে, ইহা বিচার নহে, রাজনীতিজ্ঞের কৌশলমাত্র। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের বাঁটোয়ারা অপেক্ষাও এই রায় আরও অসন্তোষজনক. স্বাধীনতার পূজারী বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু ও ক্লীব করা চাই. ইহাই বাঁটোয়ারার মৌন নির্দেশ।

তপশীল নং ১

দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী ও রংপুর জেলার সংলগ্ন ভূভাগ। অযৌক্তিক-ভাবে এই ভূভাগকে পাকিস্তানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগ কি পশ্চিমবঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুর্বিষহ স্থায়ী করিবার জন্য?

থানার নাম	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন বর্গমাইল
তেতুলিয়া	১৩১৯০	১৭২৮২	১৪০
পাঁচগড়	১৪৮০৭	১৭৮০৭	
বোদা	৩৬৭৪২	৩৭৮৪৪	৩৪২
দেবীগঞ্জ	৪১৪৮৪	১৪৯২৭	
পাটগ্রাম	৩১০৩৭	২০৪৯৮	১০০
সম্পূর্ণ ঠাকুরগাঁ মহকুমা	২৯২১২৮	২৮৯১০৭	৫১৭৪
বামাইর হাট*	৩২৪৪২	২২২৪১	১১৩
বিরল	৩৫৯১০	৩১৩৪২	১৩৭
দিনাজপুর	৪০২২৩	৪১৬৯২	১৩৭
হাতিবাঁধা	৩৩২৯৮	৩৩১৮৩	১১১
ডিমলা	৪১১০৩	৪০৬৪৫	১২৭
	৯৩৩৪২৭	৪৮৩৯৪৮	২৪০৪

* বামুনহাট থানার সংলগ্ন এই থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার কি কারণ হইতে পারে?

তপশীল নং ২

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমপ্রধান থানাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা :—

থানা	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন
হরিশ্চন্দ্রপাড়া	১৬৩১৮	৩৮৭৮৩	৯৮
ভোমরুল	১৪৪৯৩	৬১০১০	১১৭
নওদা	২৩১৫৬	৩৪২৯৪	৮৯
জলঙ্গী	১০৮৮৪	৪৪৩২৩	৭৭
বেলডাঙ্গা	৩৭৩৩৪	৭৭৩০০	১৪৩
লালবাগ	৩৯৭৮৭	৮০৯৩০	১০০
সুতী	৪০৭৬০	৫১৪১৪	১০২
রঘুনাথগঞ্জ	৫৫৫৭০	৭২৪১৭	১০২
ন্যালপোলা	১৭৪৪৩	৫৩২১৭	৮৪
ভগবানগোলা	১৪৮৩২	৩৪৩২৭	১১৭
মুর্শিদাবাদ	১৯০০০	২৪২২৯	৩০
রাণীনগর	১৪০২৩	৭৪০৯৩	১২৩
কলগ্রাম	৪০৯৪৪	৪৩০৪১	২২৬
সৈদাবাটী	১৫০৪৭	২৪০৪১	৯৪
কবিরপুর	২১৪৪০	৭৯৮৩২	১৭২
তেহাট্টা	৩৯৯০২	৫২৪১৭	১৭৫
নাকাশীপাড়া	৩২০৪১	৩৪৭৮৪	১৪০
চাপড়া	২০৩০০	৫০০২১	১৩১
হরিণঘাটা	১৯৯৫৩	১৪৫৪৪	৩৫
ধাঁসবালি	৯৭১৫	২৭৮০৬	১০৩
হরিশ্চন্দ্রপুর	৪৩২৭৮	৫৬১২৬	১৪০
খরবা	৪১৯১৪	৬১১৪৮	১৪২
রতুয়া	৪৪৩৭৫	৫৮৬১০	১৪৪
কালিয়াচক*	৭০২৯৮	১২৪০০৬	২০৭
মুহারাই	৪৬২৬৯	৫৫৭৪০	১৩৮
মালিয়াবুরুজ	৪৯৭৩৮	৫৬১৩৪	৪
ভাগ্রেড়	৪৮২১১	৬৪৯৭২	১২৭
হাবড়া	২৯৩১৯	৪২৩৯৯	১০৯
মেদন্তা	১৯৪০৯	৪৫১৯৯	৭৮
বারাসত	৩৯৭৩৪	৫৯৩০০	১০৪
আমডাঙ্গা	১৪৪৭৯	৫০৭১৭	৫৪
স্বরূপনগর	২৬৩০৮	৩১২৩৪	৮১
বাদুড়িয়া	৩৩৮৪৪	৪৮৮৩০	৮১
	১,২৫৪,২২	১৭৪০৯৭৪	৩৭৩৭

তপশীল নং ৩

পূর্ব পাকিস্তানে সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান থানা

(এই হিসাবে অসংলগ্ন হিন্দুপ্রধান থানা কিম্বা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ধরা হয় নাই)

থানা	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন বর্গ মাইল
অষ্টগ্রাম	৩১৭৪৩	৩০৪০৫	৯৫
শালিখা	২২৪২০	২০৮৯৩	৮৮
নড়াইল	৩২৪৯০	৪৮০৯৩	১৪৮
কালিয়া	৩১৩৩৪	৪১৪৩৫	১১৮
বাইগ্রাঘাটা*	৩৯৪৩৮	১৭৪৪২	৯৭
দৌলতপুর*	৩১২২৪	২৫০৮৮	৩৪
দাকোপ*	৪০৮৪৩	১০৪৪৩	১১০
তারাপাদা*	৩৪৭২০	৩২০৭০	৮৩
খুলনা*	৪৪৯৪৫	২৪৮৪৩	৩৮
ধামুরিয়া*	৪৮২৮০	৪৭৮৪০	১৭৪
পাইকগাছা*	৪১১৭৪	৭৯৩৪৯	২৪৭
কচুয়া*	৩৪০৩৩	৩১০৩০	৫৪
বাগেরহাট*	৪৪৩১৪	৪৪০১৪	১২৬
ফকিরহাট*	৩২৭৪১	২০৭০৩	৬১
মোল্লাহাট*	৪৩৮৩১	৫৭৮৪৭	১১৩
রূপসা*	৫৪৮৪৯	৪০০২৮	১২৪
দেবহাটা*	২৪১০৬	১২৩০৯	৬৮
আশাশুনি*	৬০৭৩৬	৫৬১২১	১৫৮
শ্যামনগর*	৬১৪৩৭	৪৩২০৯	১৭৬
গোপালগঞ্জ মহকুমা	৩৪৮৭৭৯	২৬৮২৩৩	৬৭২
বালিয়াকান্দী	৪৮৬৪৩	৪৩০৯২	১২৫
রটের	৬০৪৫৯	৫৭৭৩৮	১০০
গৌড়নদী	১২৩৮৭৭	৯১৩৮৭	২০০
ভঙ্গীরপুর	৫৮৭৫৬	৬৭৮৩০	
কালকাঠি	৭০৪৭৫	৬২৮৯০	৯০
স্বরূপকাঠি	৬০৮৮৫	৫৫৫১৩	১৫০
নাজিরপুর	৪২৯৬১	৩৫৫৪১	
বোয়ালিয়া	২৮৪২০	২০৩৮০	
গোবাগাড়ী	৩২৮৯৩	৩৪৩০৬	
নাচোল	২৩২১৫	৭১৫০	
দিনাজপুর	৫০২২৩	৫১৬৯২	
বিরল	৩৯৯৭০	৩১৪৪২	
হরিপুর	১৩২২৫	১৪১৮৩	
পীরগঞ্জ	৩৭৪৩৭	৩৭৬০২	৩৮৮
বীরগঞ্জ	৪৪৭৪৩	২৩৩২৭	
বাঘাইবাড়াট	৩২৪৪১	২৮২৪০	
হাতীবাঁধা	৩৩২৯৮	৩৩১৮৩	
ডিমলা	৫১১০৩	৫০৬৪৫	
দেবীগঞ্জ	৪১৫৮৪	১৪৯২৭	
পাচপড়	১৫৮০৭	১৭৮০৭	৩৫২
বোদা	৩৭৮৪৪	৩৬৭৪২	
পাটগ্রাম	৩১০৩৭	২০৫৬৮	১০০
	২২৫৪৪২৭	১৮৪২৩৮৩	৫৩৬১

* খুলনা জেলার সংলগ্ন থানা সমূহ।

(স্টেট্ গেস্ট)

অচলগড় প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম মন্দাকিনী কুণ্ডের ঘাটে। ঘড়ি খুলে দেখলুম পাঁচটা বাজতে দেরী আছে। আমাদের বাস্ ঠিক পাঁচটায় আসবার কথা। সিরোহী বাস সার্ভিস্ কোম্পানীর ম্যানেজার স্বয়ং আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন অচলগড়ে। কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ৫টা থেকে ৬টায় এসে দাঁড়ালো, তবু বাসের দেখা নেই। অচল গিরিদুর্গ হ'তে অস্তাচল বোধ করি বেশী দূর নয়, কারণ সূর্য্য বেলাবেলিই ডুবে গেলেন। ৬টার আগেই বাড়ী ফেরার কথা ছিল, কাজেই আমরা কেউ গরম কাপড় সঙ্গে আনিনি। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপটুকুও চলে গেল। পাহাড়ী দেশের নিঃশেষ সদসকার অনভ্রুত হলেও অননুভূত যে নয় এটা অতি দ্রুতই বোঝা যাচ্ছিল।

ট্রেণের কামরায় নবনীতা ফটো—শ্রীসুরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ের ঘাসস্তরের উপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার তিমিরাবরণ নেমে এল। মিলিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আপাতায় ভরা চারপাশের জঙ্গল, কুশবন, নুড়িপাথর, মন্দির চূড়া, গিরিগুহা। ঠাণ্ডা বাতাসের শীতল স্পর্শ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম বাড়ী ফেরবার জন্য। সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার চারিদিক থেকে অধীর যাত্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবন শুষ্ক রুক্ষ মুখে নতশিরে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে তাঁকে কিছু বলতে বাধা হচ্ছিল। যেহারা বার বার জোড় হাত ক'রে সকলকে জানাচ্ছিল যে "আমিও তো আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি—কেন যে গাড়ী আসছে না—কেমন ক'রে বলবো? দু'টো ট্রিপ্ যাবার সময় উৎরে গেছে। দুখানা বাসের একখানারও দেখা নেই—আমি কিছু বুঝতে পারছিনি। কোনোও এ্যাকসিডেণ্ট্ হয়েছে কি পথের মাঝে

দুখানা গাড়ীরই কল বিগড়ে ব্রেক্ ডাউন হয়েছে কিছুতেই। আসতে পারছিনি !"

শীত বাড়ছে। সন্ধ্যা গভীর হয়ে আসছে। আর বাইরে থাকা চলে না। বরনীতার মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেয়ের ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয়ে। তাঁর নিজের শরীরও একেবারেই ঠাণ্ডা-সহ নয়। জঙ্গলে হল্লার উপদ্রব শুরু হ'ল। অগত্যা আমরা সকলে মিলে নিকটস্থ একটি ছোট শিব মন্দিরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। অন্যান্য যাত্রীরা সবাই একটি বাঁধানো বটগাছের তলায় বসে গল্পটা করতে লাগলেন।

ভাগ্যে আর্থোক্লাসে তখনও কিছু চা ও টিফিন ক্যারিয়ারের মধ্যে খানকয় টিফিন আনা হয়েছিল. ক্ষুধার্ত কলেবরে আমি ধাওয়া হলেম। বাবাজী চায়ের ফ্লাস্কেই খুশি। একটি পাহাড়ী রাজপুত মেয়ের কাছে কিছু ছোলা-ভাজা কিনতে পাওয়া গেল। ছোলা ভাজা চিবুতে চিবুতে

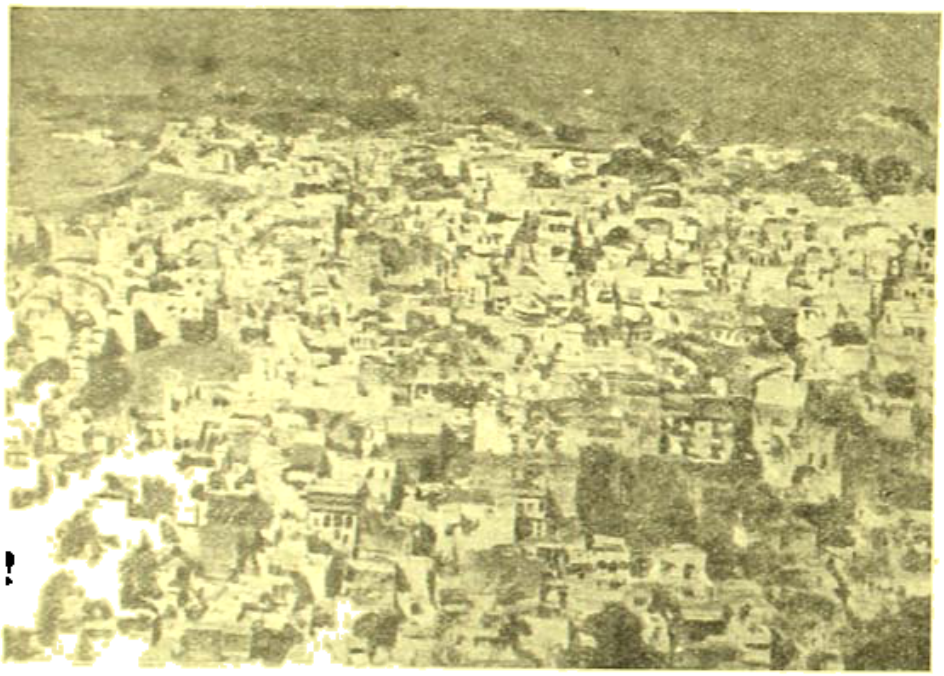

বোধপুর—নূতন সহর ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাজপুতানীর সঙ্গে দেবী তাঁর বাঙ্গালী সহ গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় জানা গেল মেয়েটির স্বামী খুব জোয়ান ও পরিশ্রমী ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। তার নিজেরও ঐ রোগ ধরেছে। কিন্তু এখানে কোনও ডাক্তার কবিরাজ নেই। ওষুধপত্র পাওয়া যায়না। 'বোখারে' ভুগে অনেক লোক মারা পড়েছে।

দেবী তাঁর 'হাতব্যাগ' খুলে কি একটা ওষুধ বার করে দিলেন তাকে। বলে দিলেন 'বোখার' ছাড়লেই জুলে ফেলে জল দিয়ে গিলে খাবে। মেয়েটি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেলাম করে চলে গেল। আমরা মনে করলুম নিশ্চয় 'কুইনিন সালফেটের' গ্রেণ বড়ি তিনি ওকে দিলেন, কিন্তু পরে জিজ্ঞাসা করে জানলুম 'কুইনিন' নয়, সেগুলি বারোকেমিক্—'ফেরাম ফস' টাব্‌লেট ! বলুন—এ পাহাড়ী ম্যালেরিয়া সাধারণ 'বারোকেমিকের' কাজ নয়।

শ্রীমতী বারোকেমিকের পরম ভক্ত। কাজেই এই বেহাদ মজবা নিয়ে যখন তর্ক যুদ্ধ জমে উঠবার উপক্রম, 'ভোঁ ভোঁ' করে বাসের হর্ণ্ আর ঘর্ ঘর্ শব্দে ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। জলের বাঁশী শুনে শ্রীরাধা বোধ করি যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ঘর ছেড়ে যমুনাতীরে ছুটে যেতেন তেমনি করেই এঁরা বাসের হর্ণ্ শুনতে পেয়ে আত্মহারা হয়ে ছুটলেন।

সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার আমাদের জানালেন যে, দুখানা বাসের ড্রাইভারই পর পর দু'টি ট্রিপ দিয়ে দিয়েই ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়েছে। এইজন্য বাস আসতে এত দেরী হ'ল।

আমি বলনুম—কিন্তু আবু থেকে যে আমাদের মোটর সিরোহীতে আসবার কথা ছিল ঠিক ৪টায়। এখন ৭টা বেজে গেছে। সিরোহী পৌঁছতে আমাদের আরও কিছু মিনিট কি আধঘণ্টা লাগবে। আবুর মোটর যদি এতক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রে চলে গিয়ে থাকে তাহ'লে আমাদের আবু ফেরবার উপায় কি হবে?

সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার প্রতিশ্রুতি দিলেন আমাদের গাড়ী অপেক্ষা না ক'রে যদি চলে গিয়ে থাকে, তা'হলে এই বাসই আমাদের মাউণ্ট আবু পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাঁচা গেল। একটা মস্ত দুর্ভাবনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলুম। গাড়ীতে উঠে আর কোনও কথা নয়—শুধু ঐ ম্যালেরিয়া ! ইস ! এ কোথায় এসেছি? এবার থেকে যেখানে যেখানে যাবো আগে সেখানকার স্থানীয় স্বাস্থ্য-সংবাদ জেনে তবে যাবো।

অজলগড়ে ম্যালেরিয়া, সিরোহীতে ম্যালেরিয়া, মাউণ্ট্ আবুতেও ম্যালেরিয়া !! এ আবার এমন পাহাড়ীয়া ম্যালেরিয়া যে জ্বর হ'লেই বেহুঁস ! বাপ্ ! পত্রপাঠ কাল পালাতে হবে আবু ছাড়তে হবে।

সিরোহীতে পৌঁছে দেখি ভগবানের দয়ায় ও পণ্ডিতজীর কৃপায় আমাদের আবুর গাড়ী তখনও অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার গাড়ীর মধ্যে মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। দেখে তার হুঁস—ম্যালেরিয়ায় বেহুঁস নয়ত? তাড়াতাড়ি করতে ধড়্‌মড়িয়ে উঠলো। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম—ভবিষ্যৎ আচ্ছা তো? গাড়ী লেংঘানে দেকেগা? বোখার নেই আয়া?

নেতিবাচক উত্তরে আশ্বস্ত হয়ে—গাড়ীতে উঠে বাড়ী ফিরলুম।

যাবার পৌঁছেই একেবারে অর্ডেমাস জারি করে দিলুম—গোটাও তোমাদের আস্তানা। বেঁধে ফেলো দশ দিনের পত্র। পরশু সকালেই রওনা যেয়ো—যোধপুর। আর এখানে নয়। মাউণ্ট আবুর সুখ-স্মৃতিটুকুই স্মরণে থাক, তাকে আর অযথা যন্ত্রকে বিকারের মোঁকে বিকৃত ক'রে কাজ নেই। "চলো মুসাফের্—বাঁধো গাঠ্‌রিয়া—"

পরদিন বেলা ১টায় আমরা আবু পাহাড় থেকে আবু রোড ষ্টেশনে নেমে এলুম। সেখান থেকে আহমেদাবাদ—দিল্লী মেলে রওনা হ'য়ে আবার 'মারুওয়াড়' ষ্টেশনে এসে নামলুম গাড়ী বদল করতে। বেলা ৩টা নাগাদ যোধপুর—বিকানীর ষ্টেট রেলওয়ের গাড়ী ধ'রে রাত্রি ৮টায় যোধপুর ষ্টেশনে পৌঁছলুম।

যোধপুরের ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আমাদের বন্ধুবর শ্রীমান ভূপতি চৌধুরী একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন। ভূপতির সহপাঠী ছিলেন তিনি। উভয়ের অবস্থানের মধ্যে আজ যথেষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব আজও নিকটতমই আছে। আমি মাউণ্ট আবু থেকে তাঁকে আমাদের যোধপুরে পৌঁছবার সময়টা জানিয়েছিলুম এবং সেখানে তাঁর জানা কোনও একটি ভালো হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলুম।

গুপ্ত সাহেব দেখি স্বয়ং আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে নিজের মোটর সহ এসে হাজির হয়েছেন। বহুসমাদরে আমাদের গাড়ী থেকে তিনি নামিয়ে নিলেন। তারপর আর আমাদের কিছু করতে হল না। কুলির ব্যবস্থা করে আমাদের লগেজ নামিয়ে কিটসে বোঝাই ক'রিয়ে দিয়ে তোলানাথকে তার সঙ্গে দিয়ে আমাদের তিনি মহারাজার পাঠানো ল্যাণ্ডো জুড়িতে এবং নিজের মোটরে তাগাতাগী-করে নিয়ে চললেন যোধপুর রাজ্যের নূতন রাজধানীতে।

ষ্টেশনে শুল্ক ও আবগারী বিভাগের রাজকর্মচারীরা প্রত্যেক যাত্রীরই মালপত্র আটক করছিলেন—নগরে নিষিদ্ধ দ্রব্য বা পণ্য কিছু শুল্ক ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য। আমাদের পাঁচটি মানুষের দলের ছোট বড় ২২টি লাগেজ অত্যন্ত সন্দেহজনক! কর্তব্য-পরায়ণ রাজকর্মচারীরা করেছিলেনও ঠিক আমাদের মালপত্র পরীক্ষার জন্য। কিন্তু স্বয়ং ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার গুপ্ত সাহেব আমাদের জামীন হাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্বে সমস্ত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুটি কথা শুধু তাঁর মুখে শুনলুম—এঁরা 'ষ্টেট গেষ্ট'...exempted from inspection!

সত্বরে জিজ্ঞাসা করলুম—ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তো বেশ বুদ্ধি করে আমাদের ষ্টেশন পার করে নিয়ে এলেন, কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে যে আমরা হোটেলে উঠেছি, তখন হয়ত' আবার জালাতন ক'রতে আসবে? গুপ্ত সাহেব হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন—তার নেই। আপনাদের শুভাগমন বার্তা যথাসময়ে মহারাজ মহারাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর হয়েছিল। রাজ আদেশে আপনাদের ষ্টেট-গেষ্ট রূপে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা হাত জোড় করে বললুম—দোহাই মশাই! আমরা 'রাজ-অতিথি' হওয়ার চেয়ে কোনও হোটেলে সাধারণ পরিব্রাজকরূপে থাকতে পারলেই সুখী হবো। কারণ, রাজকীয় ব্যাপারে আমরা মোটেই অভ্যস্ত নই! গুপ্ত সাহেব বললেন—হোটেলে থাকলেও—আপনারা যোধপুর রাজের 'ষ্টেট-গেষ্ট' হয়েই থাকবেন। কিন্তু মহারাজের 'গেষ্ট-হাউস' খালি থাকলে—রাজ-অতিথিদের ষ্টেটহোটেলে উঠতে দেওয়া হয় না। গেষ্ট-হাউসে স্থানাভাব ঘটলে তখন অতিরিক্ত অতিথিদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আপনাদের থাকার

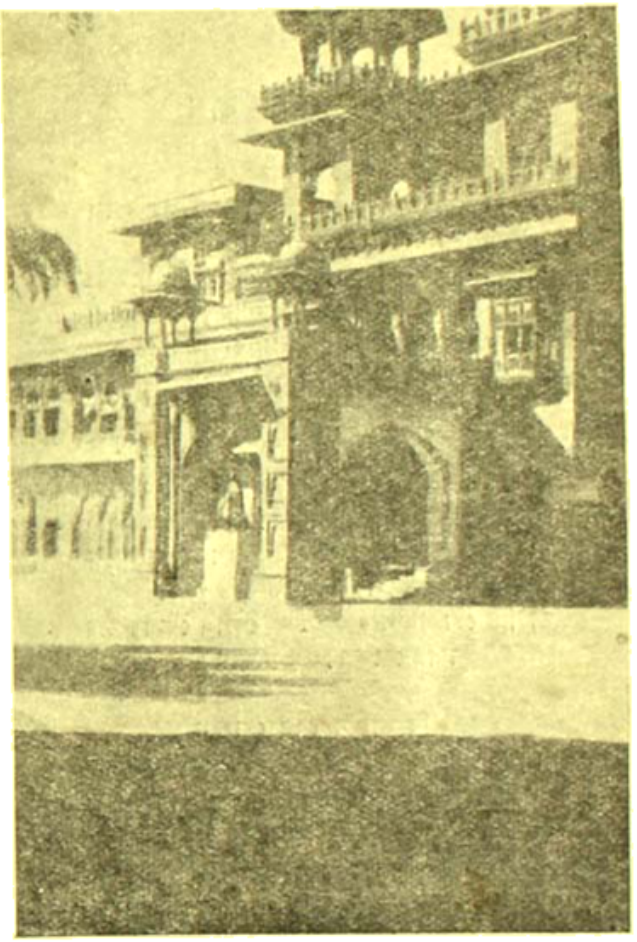

রাজকীয় বস্তুরখানা ফটো—শ্রীদরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

জন্য মহারাজার 'গেষ্ট-হাউসে' সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে। আপনাদের সেখানে কোনও অসুবিধা হবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—গেষ্ট-হাউসে উপস্থিত আর কোন্ কোন্ অতিথিরা আছেন? গুপ্ত সাহেব বললেন—আপনারা সপরিবারে এসেছেন। তাঁরা ফ্যামিলি নিয়ে আসেন তাঁদের পৃথক বাড়ী দেওয়া হয়। আপনাদের জন্য গেষ্ট-হাউসের দুটি পৃথক কোয়ার্টার মুক্ত অর্থাৎ একটি দো-মহলা বাড়ী সম্পূর্ণ রিজার্ভ রাখা হয়েছে। আপনারা সেখানে যে ভাবে খুশী থাকতে পারবেন। কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

ইয়োরোপীয় বা ভারতীয় যে প্রথা গ্রহণ করেন সেই রকম ব্যবস্থাই করা হবে।

যোধপুর শহরের রাজপথ দিয়ে রাজঅতিথিদের নিয়ে ষ্টেটের ল্যাণ্ডোখুড়ি পথ সংকীর্ণ করে চলেছে। পাঁচ ঢালা প্রশস্ত রাজপথ। দু'ধারে বড় বড় বাড়ী। কতক আধুনিক ইয়োরোপীয় আদর্শে প্রস্তুত, কতক বা ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যকলার সৌকর্য্য গৌরব ঘোষণা করছে। পথের দু'পাশে গাছের সারি। সুদৃশ্য বিজলী বাতির পোষ্ট দেখা যাচ্ছে যাতে আছে টেলিগ্রাফ, ও টেলিফোনের তার চলেছে সারি সারি লাইন ধরে। একবারও মনে হচ্ছে না যে আমরা বাংলার রাজধানী থেকে বহুদূরে—ভারতের মরুপ্রান্তে—রাজপুতানার এক ঐতিহাসিক নামজাদা নৃপতির স্থাপিত নগরে এসে পড়েছি। আধুনিক জগতের অতি আধুনিক শহরের সমস্ত সুব্যবস্থাই চোখে পড়ছিল। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

কাহারে হেরিছ ঘুমে নিশীথে,
কাহার পরশ তাপে তোমার হৃদয় কাঁপে
আপনি চাহিছ নিজে সঁপিতে?
কাহার বেদনা ভরে গহন গুহার পরে
উঠিল তোমার কাছে স্বপনে?
কাহার পূজার ডালা মিলন অশ্রুর ঢালা
ভরিয়ে জিনিয়া দুখে গোপনে?

কে তোমা' চাহিয়াছিল দিবসে?
কাহার হৃদয় মাঝে ভুবন মোহন সাজে
পশিয়া হরিলে মন বিবশে?
কে তোমা দেখেনি চোখে, অরূপ অদৃশ্য লোকে
তবুও কাহার আশা পূরিতে?
কাহারে তোমার পরে বেদনা বেদনা ভরে
আবার ডেকেছ হেসে নিকটে।

তুমি কি জান না সেও গোপনে
বাহিরে চলার দিকে ভিতরে স্বপন নিয়ে
রচিছে তোমার ছবি আপনে?
পুলকিত পৃথিবীর কেহ কোথা নহে স্থির
তুমি যে রয়েছ থাক নীরবে
অসহ উষার ছিন্না পলকের শান্তি নিয়া
নয়নের মুকুর করে পরবে।

কাহারে দেওনি কিছু আলোকে
আঁধার সাগর পারে বেদনা কল্লোল ভারে
পড়িয়া ফিরো না আশা ভুলোকে।
ফুটালে না যেই রাগ তাহা অবনিই থাক
জানাতো না চেয়েছিলে দিতে
সহজে পেয়েছ যারে অনেই মুছিয়ে তারে
তুলিয়ো দেয়েছ তারে নিশ্চিতে।

স্বাধীন ভারত*

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা স্বাধীন পথের সাথী;
গৌরবে আজি ফুটেছে প্রভাত কেটেছে তিমির-রাতি।
দুশো বছরের ম্লান জীবনের হ'য়ে যাক্ অবসান—
মায়ের চরণে শৃঙ্খল ভার ভেঙ্গে পড়ে খান্ খান্।

আপনার ঘরে পরবাসী হ'য়ে দেশের ভক্ত বীর—
দিয়ে গেল প্রাণ ফাঁসির মঞ্চে না ফেলি' অশ্রুনীর।
কত বীর-নারী বক্ষ পাতিয়া বিদেশী-শাসনে হায়,
দিয়াছে ঢালিয়া তপ্ত রুধির দেশ-জননীর পায়।
শিয়রে জাতির হানিল বজ্র নর-রূপী শয়তান—
রক্তধারায় হ'ল বলিদান লক্ষ বীরের প্রাণ!
ভুলে যাও আজ অতীতের ব্যথা—জীবনের অপমান—
মিলিত কণ্ঠে গাও-সবে আজ জীবনের জয়গান!

বাঙ্গালীর বীর ঘর ছেড়ে গেছে সুদূর সিন্ধুপার—
বলেছে "তোমারে দেব স্বাধীনতা, দিলেও শোণিত ধার"।
কোথায় নেতাজী, দাও দেখা দাও, নূতন উষার রথে—
অনুসারী জনে নিয়ে যাও তুমি এর গৌরব পথে।

* কলিকাতার লেক-ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাধীনতা উৎসবে এবং অন্যান্য বহু সভা সমিতিতে শ্রীমতী রবিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত।

স্বাধীনতা-লাভ-উৎসব

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াও স্বাধীনতা লাভ করিল। ঐ উপলক্ষে সেদিন প্রত্যেক প্রদেশে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী ও করাচীতে স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নিয়োগে ভারতের বড়লাট হইলেন। দিল্লীতে ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রি হইতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে উৎসব ও বক্তৃতাদি চলিল—দিল্লীর লাল কেল্লায়—এতদিন যেখানে কংগ্রেস-সেবকগণকে আবদ্ধ রাখিয়া নির্য্যাতন করা হইয়াছে—তথায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িল। কিন্তু এ

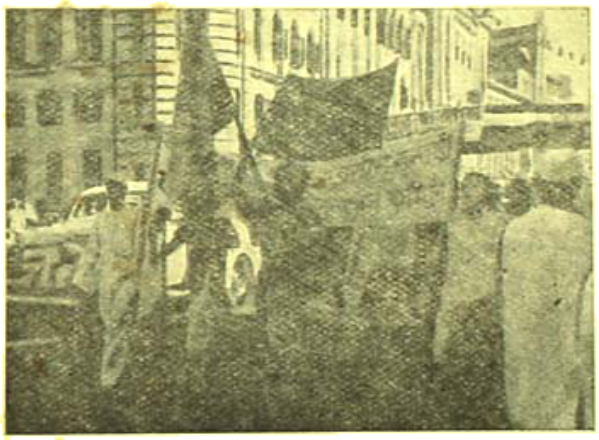

স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির শোভাযাত্রা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

সকলের অপেক্ষা অনেকগুণ মূল্যবান এক ঘটনা কলিকাতা-বাসী সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। ১৫ইএর মাত্র ২দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা সহরের বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য বাঙ্গালার অনাচারী লীগ-মন্ত্রিসভার নেতা শ্রীযুক্ত এচ-এস-সুরাবর্দ্দীকে সঙ্গে লইয়া বেলিয়াঘাটার বিধ্বস্ত অঞ্চলে এক মুসলমানের গৃহে বাস আরম্ভ করিলেন। তাহার পূর্ব্বে পশ্চিম বাঙ্গালায় হিন্দু-মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছে—কাজেই গান্ধীজির কলিকাতা আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়দিন জনকতক হিন্দু নির্ভয়ে মুসলমান মহলে অগ্রসর হইয়াছিল। গান্ধীজি আসিয়া কি শান্তিবারি ছিটাইলেন তাহা জানি না—কিন্তু ১৩ই আগষ্ট অপরাহ্ণ হইতে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানে অপূর্ব্ব মিলন আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ

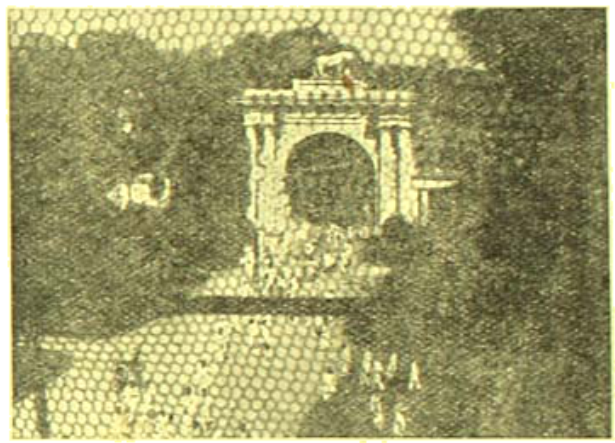

১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে কলিকাতার সম্মুখস্থ জনতা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদের স্বাধীনতা উৎসবে পূর্ণভাবে যোগদান করিল—হিন্দুপল্লীতে যাইয়া হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিল ও হিন্দুদিগকে মুসলমান পল্লীতে পাইয়া সম্বর্দ্ধিত করিল। এইভাবে কলিকাতায় শান্তি আসিল—সাধারণ মানুষ বিস্মিত হইল—চমৎকৃত হইল—মুগ্ধ হইল। কলিকাতার খবর সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল—বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানিল—কাজেই পাকিস্থান পাইয়াও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিল না, বরং কলিকাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। পাকিস্থানে—বাঙ্গালার হিন্দু-অধিবাসীদের মন হইতে আশঙ্কা চলিয়া গেল। ১৫ইএর আনন্দ উৎসব ১৬ই ও ১৭ই পর্য্যন্ত চলিল—তাহার পর

১৮ই আগষ্ট আসিল, মুসলমান পর্ব্ব ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসবে হিন্দুরা যোগদান করিল—মুসলমানগণের জন্য মসজিদে মসজিদে খাদ্য পাঠাইয়া বন্ধুত্ব স্মরণীয় করিল। মহা-সমারোহে হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া ঈদ উৎসব সম্পাদন করিল। কলিকাতায় ট্রামবাস সকল পথে চলিল—যে সকল পথে গত ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত ১৬ই আগষ্টের পর হইতে হিন্দুরা যাইতে সাহস করে নাই, সে সকল পথে হিন্দু পূর্ব্বের মত অবাধে চলাফেরা করিতে লাগিল। পাছে দুষ্ট লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়, সেজন্য কর্ণীর দল, ছাত্রের দল, নেতার দল কলিকাতার পথে পথে মিছিল করিয়া ঘুরিয়া মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ২৬শে আগষ্ট সারা কলিকাতাব্যাপী মিলন-মিছিলের প্রদর্শন

স্বাধীনতা উৎসবে রাজপথে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা উৎসবে রাজপথে ছাত্রীবাহিনী

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হইল—সেদিনের দৃশ্যের কথা দর্শক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না।

গান্ধীজি কলিকাতায় থাকিয়া প্রতিদিন বিকালে এক এক পল্লীতে যাইয়া প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান দ্বারা মিলন ও পুনর্বসতি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। নূতন মন্ত্রীরা গান্ধীজির উপদেশ মত দ্রুত দাঙ্গা পীড়িতদিগকে সাহায্য করিতে ও গৃহহীনদিগকে নিজ নিজ গৃহে পুনঃস্থাপিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। এ কার্য্যও বেশ সাফল্য লাভ করিল।

কিন্তু আবার সহসা একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। ২রা সেপ্টেম্বর গান্ধীজির নোয়াখালী যাত্রার দিন স্থির হইয়াছিল। ৩১শে আগষ্ট রাত্রিতে একদল যুবক গান্ধীজির শিবিরে উপস্থিত হইয়া জানাইল—মুসলমানগণ সেদিন সন্ধ্যা হইতে পথে হিন্দুদের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সে সংবাদ তখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহারা গান্ধীজির গৃহ আক্রমণ করিল—জানালার কাচের সার্সি ভাঙ্গিয়া দিল, গান্ধীজির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করিল। ঐ ঘটনার পর হইতে সারা সহরে আবার দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িল—হিন্দু পল্লীতে মুসলমান মরিল, মুসলমান পল্লীতে হিন্দু মরিল—উভয় সম্প্রদায়ের লোকের শোকানল পুঞ্জিত হইল। কত ক্ষতি হইল, তাহা বলা কঠিন। ১লা সেপ্টেম্বর সারাদিন ঐভাবে চলিতে দেখিয়া মহাত্মাজী স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি রাত্রি সওয়া ৮টা হইতে আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন। তিনি জানাইলেন—আমার আর কোন অস্ত্র নাই—আমি উপবাস করিব—যদি কলিকাতার হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা বন্ধ না করে, তবে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করিব।

যেদিন ১৫ই আগষ্ট সারা ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতা উৎসব সম্পাদনে আত্মহারা হইয়াছিল, সেদিন ছিল, গান্ধীজির প্রিয়তম ও পুত্র-প্রতিম শিষ্য মহাদেব দেশাইএর মৃত্যুতিথি। স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজি উপবাস, চরকায় সুতা কাটা ও উপাসনায় সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যেদিন প্রথম গান্ধীজি কলিকাতা বেলিয়াঘাটার বাড়ীতে বাস করিতে যান, সেদিনও ঐ পল্লীর এক সম্প্রদায়ের লোক গান্ধীজির আগমন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল।

যাহা হউক, ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গান্ধীজি অনশন আরম্ভ করিলেন—২রা সারাদিন অবিশ্রান্ত অতিবৃষ্টি চলিল। দেবতা বোধ হয় সুপ্রসন্ন হইলেন—কলিকাতার রাজপথে সোমবার যে রক্ত ছড়ান হইয়াছিল, মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে তাহা ধুইয়া গেল। বুধবার ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা আবার শান্তভাব ধারণ করিল। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী গান্ধীজির অনশন সংবাদ পাইয়া বুধবারে কলিকাতা আসিলেন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী

লাটসাহেবের প্রাসাদ শিখরে স্বাধীন ভারতের পতাকা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হইলেন। সহরের সকল নেতা—গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী, প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মী-বৃন্দ—মুসলমান নেতৃবৃন্দ—সকল সম্প্রদায়ের নেতা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—কেহই বাদ গেলেন না—সকলে মিলিয়া কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা নিজেদের শরীর ও জীবন বিপন্ন করিয়া মঙ্গলবার অতি বৃষ্টির মধ্যেও পথে পথে ঘুরিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই দলে নেতৃত্ব করিতে যাইয়া খ্যাতনামা কর্ম্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও সুরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাণ দিলেন—আরও অনেকে আহত হইলেন। কিন্তু প্রহার ও হত্যা সহ্য করিয়াও সকলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একাগ্রতা দেখাইলেন। ফলে শান্তি আসিল। বুধবার ও বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণ কলিকাতা দেখিয়া ৭৩ ঘণ্টা অনশনের পর মহাত্মা গান্ধী বৃহস্পতিবার রাত্রি সওয়া ৯টার সময় অনশন ভঙ্গ করিলেন। তৎপূর্ব্বে কলিকাতার ৭জন নেতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং গিল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ আর-কে-হৈডকা গান্ধীজির নিকট নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দান করিলেন—

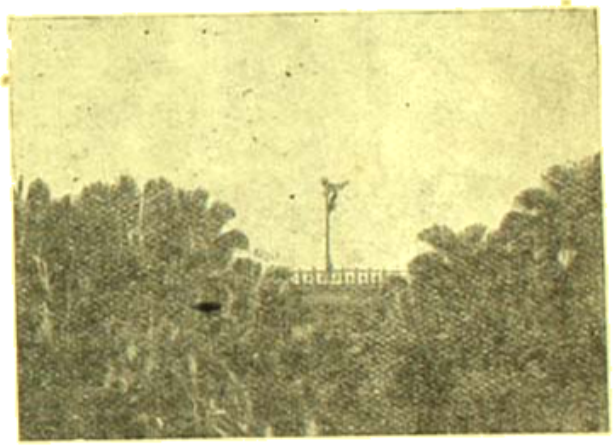

রাইটার্স-বিল্ডিংএ স্বাধীন ভারতের পতাকা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আমরা গান্ধীজির নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে যখন কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে তখন আমরা সহরে আর কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করিতে দিব না এবং মৃত্যুপণ করিয়া উহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিব।"

তাঁহার পূর্ব্বে আচার্য্য কৃপালনী প্রধান মন্ত্রীর গৃহে শতাধিক নেতার উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ৮জন নেতাকে লইয়া শান্তি কমিটী গঠন করেন—(১) মৌলানা আক্রাম খাঁ (২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (৩) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (৫) মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দি (৬) শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় (৭) শ্রীযুক্ত

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইস-চ্যান্সেলার) ও (৮) ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

গান্ধীর অনশনে সারা ভারতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বহু কর্ম্মী অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মীরা—যাহারা এতদিন তাহাদের লাঠিবাজির জন্য কুখ্যাত হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে উত্তর কলিকাতার প্রায় ৫শত পুলিশ বৃহস্পতিবার সারাদিন গান্ধীজির সহিত উপবাস করিয়া নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

১৪ই আগষ্টের শান্তিপ্রতিষ্ঠা যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, ৫ঠা সেপ্টেম্বরের শান্তিও তেমনই কি করিয়া সম্ভব হইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। গান্ধীজির ৭৩ ঘণ্টা

রেড ক্রস অফিসের সম্মুখে ফটো—ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনশন—তাহার সঙ্গে শচীন্দ্র সুধীর প্রভৃতির জীবনদান—সত্যই কি আমাদের মনকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? এই কথাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে।

পাঞ্জাবে হাঙ্গামা—

সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের রায় প্রকাশের পর হইতে পাঞ্জাবের উভয় খণ্ডে—মুসলমানপ্রধান পশ্চিম-পাঞ্জাব ও হিন্দুপ্রধান পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছে তাহার বিবরণ দেওয়া যায় না। উভয় খণ্ডে কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পশ্চিম-পাঞ্জাবের মুসলমানগণ যেমন তথায় শিখ ও হিন্দুদিগকে ধ্বংস করে, পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরাও সেইভাবেই মুসলমানদিগকে হত্যা করে। লর্ড মাউন্টবেটেন, কায়েদে আজম জিন্না, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান নেতারা কয়দিন ধরিয়া উভয় অংশে দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ফল তেমন হয় নাই। পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে প্রায় সকল হিন্দু ও শিখ পলাইয়া আসিয়াছে, কতক পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে স্থান পাইয়াছে—বাকী সব দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গালা এমন কি সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমানগণও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হইতে কতক পূর্ব্ব দিকে চলিয়া আসিয়াছে, কতক পশ্চিম দিকে গিয়াছে। ইহার ফলে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা পাঞ্জাব আজ শ্রীহীন, বিধ্বস্ত। পাঞ্জাব প্রদেশে সেচের ব্যবস্থার ফলে কৃষি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতের কুত্রাপি আর সেরূপ হয় নাই। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের অবস্থা ও সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের অবস্থা কল্পনা করিলেও হৃদয় আতঙ্কিত হয়। রেলপথগুলি নষ্ট করা হইয়াছে—মোটর যাতায়াতের পথ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, কাজেই পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে উড়োজাহাজে করিয়া অধিবাসীদের সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। খাদ্যহীন ভারতে আজ আবার নূতন করিয়া কয়েক কোটি লোক খাদ্যহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িল—কে তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে কে জানে? শান্তিদূত মহাত্মা গান্ধী আজ অনশনজীর্ণ শরীর লইয়াই দিল্লী গমন করিয়াছেন। সারা ভারতের লোক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, গান্ধীজির শান্তি প্রচেষ্টা সার্থক হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক।

পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ—

২৬শে আগষ্ট কলিকাতার এক সাংবাদিক সভায় প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জানাইয়াছেন যে পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই—তবে নভেম্বর মাসে নূতন ফসল না উঠা পর্য্যন্ত খাদ্যবণ্টন সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করা যাইবে না। কিন্তু আমাদের ত অন্যরূপ অবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে। রেশনের দোকানে চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাত খায়, আটা লইয়া তাহার ক্ষুধা মেটে না। কয়েক সপ্তাহ শুধু মোটা আতপ চাউল খাইতে হইয়াছে—ফলে সর্ব্বত্র উদরাময় ও আমাশয়ে লোক কষ্ট পাইতেছে। খাদ্যরূপে

গ্রহণের উপযুক্ত চাউল এখনও পাওয়া যায় না। বাজারে অন্যান্য সকল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, ডাইল ও তদ্বিতরকারী দুষ্প্রাপ্য—মাছ ত দুর্লভ বলিলেই হয়। ১ টাকা সের দরে ডাইল ও তিন টাকা সের দরে মাছ কিনিবার অবস্থা কয়জন বাঙ্গালীর আছে, প্রধানমন্ত্রীর তাহা অজ্ঞাত নহে। দুগ্ধ বা ঘৃতের কথা না বলাই ভাল। আলু, শুষ্ক প্রভৃতি যাহাতে নূতন বৎসরে প্রচুর উৎপন্ন হয় ও বাজারে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, সেজন্য সরকারী চেষ্টা অবিলম্বে প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

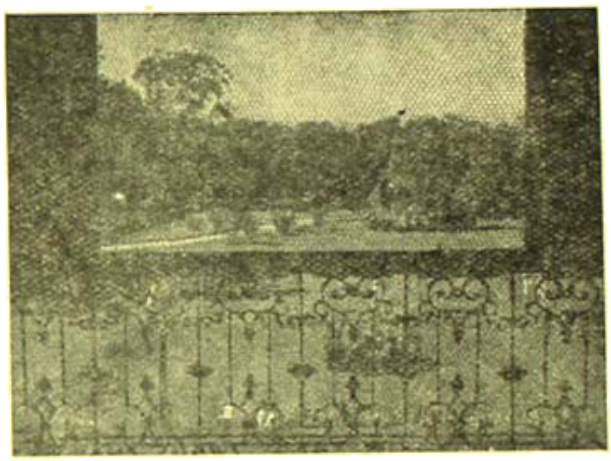

লাট সাহেবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালার নূতন শ্রমিক-নীতি—

২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় পশ্চিম বাঙ্গালার শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন মন্ত্রিসভার শ্রমিক-নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শ্রমিকদিগকে লাভের অংশ প্রদান করার ব্যবস্থা হইবে। ধনী দ্বারা শ্রমিক-শোষণ বন্ধ করা হইবে। ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে।

গভর্ণরদের বেতন—

২১শে আগষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন—প্রত্যেক গভর্ণর সমান বেতন পাইবেন—তাঁহাদের বার্ষিক বেতন ৬৬ হাজার টাকা। মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের খেতাঙ্গ গভর্ণরদ্বয় পূর্ব্ব বেতন পাইবেন। গভর্ণরদের বেতন আয়কর মুক্ত নহে—ফলে তাঁহাদের মাসিক প্রকৃত বেতন হইবে তিন হাজার টাকা। পূর্ব্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণররা বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ও বিহারের গভর্ণর ১ লক্ষ টাকা, মধ্য প্রদেশের ৭২ হাজার টাকা ও উড়িষ্যার গভর্ণর ৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইতেন।

পশ্চিম বাঙ্গালায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—

৩১শে আগষ্ট মধ্যরাত্রির পর হইতে বাঙ্গালা দেশের সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দিয়া ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের অনুরূপ করা হইবে। সকল সরকারী অফিস নূতন সময়ের ১০টা হইতে কাজ করিবে।

ডালহৌসী স্কোয়ারে বেতারী ষ্টেশন

ফটো— শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতায় ইলেকট্রিক ট্রেণ—

কলিকাতায় শীঘ্রই ইলেক্ট্রিক ট্রেণ চলাচল করিবে। দমদম হইতে চিৎপুর, বাগবাজার, নিমতলা ঘাট ও হাওড়া পুল হইয়া পোর্ট কমিশনারের রেল যে পথে গিয়াছে সেই পথে ফেয়ারলী প্লেস পর্য্যন্ত রেল চলিবে। পরে দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া উহা মাঝেরহাট পর্য্যন্ত যাইবে। বেলগাছিয়া, চিৎপুর, কুমারটুলী ঘাট, নিমতলা ঘাট, হাওড়া পুল ও ফেয়ারলী প্লেসে প্রথমতঃ ষ্টেশন খোলা হইবে। পরে ক্রমশঃ (১) হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান—হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড ও হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান উত্তর পথে (২) শিয়ালদহ হইতে কাচড়াপাড়া হইয়া রাণাঘাট, দমদম হইতে বনগাঁ, শিয়ালদহ হইতে বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর ও ক্যানিং (৩)

হাওড়া হইতে খড়্গপুর ষ্টেশনের সকল পথেই ইলেকট্রিক ট্রেণ চলিবে।

মাদ্রাজে মাদক বর্জ্জন—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আগামী অক্টোবর মাস হইতে মাদ্রাজের ২।৩ ভাগ মাদক বর্জ্জিত হইবে। ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, নীলগিরি, মাদুরা, মালাবার, নেলোর, গুণ্টুর ও দক্ষিণ কানারায় নূতন ব্যবস্থা হইবে। পূর্ব্বে তেলেগু অঞ্চলের ৫টি ও তামিল অঞ্চলের ৩টি জেলায় মাদক বর্জ্জিত হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লী ও ভিজিয়ানাগ্রামের ২টি স্কুলে ৭৫০ জন পুলিশ কনেষ্টেবলকে মাদক বর্জ্জন কার্য্য শিক্ষা দান করা হইবে।

নূতন ব্যবস্থার নিয়োগ—

বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইবার পর নিম্নলিখিত ৪টি জেলার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে দেওয়া হইল—(১) পশ্চিম দিনাজপুর—মিঃ বি-কে আচার্য্য ও (শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না আসা পর্য্যন্ত, শ্রীপ্রফুল্ল দত্ত (২) নবদ্বীপ—শ্রীদেবব্রত মল্লিক ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (৩) মুর্শিদাবাদ—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীনীরোদচন্দ্র সেনগুপ্ত (৪) মালদহ—শ্রীরাধাকমল সিংহ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে হাইকোর্ট—

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে নূতন হাইকোর্ট হইয়াছে, দেওয়ান রামলাল তাহার প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজন, সর্দ্দার বাহাদুর তেজ সিং, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভাণ্ডারী, শ্রীযুক্ত অছরুরাম ও শ্রীযুক্ত গোপালদাস খোসলা পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিভাগ নির্ণয়—

পূর্ব্ববঙ্গে ২টি বিভাগ পুনর্গঠন করা হইয়াছে—চট্টগ্রাম বিভাগে থাকিবে—চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট। রাজসাহী বিভাগে থাকিবে—রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, যশোহর ও নদীয়া। কুষ্টিয়া মহকুমা ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমা লইয়া নূতন নদীয়া জেলা হইয়াছে—তাহার সদর হইয়াছে কুষ্টিয়া সহর।

গান্ধীজিকে পৌর-সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৪শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা ময়দানে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের নিকট মাঠে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীকে পৌর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই তৃতীয়বার কর্পোরেশন হইতে গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। উত্তরে গান্ধীজি কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১৭ই আগষ্ট লাটভবনে পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ও প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফটো—শ্রীপান্না সেন

সীমান্তে নূতন মন্ত্রিসভা—

সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর পুরাতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন লীগ-মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। খাঁ আবদুল কোরাম খাঁ প্রধান মন্ত্রী ও খাঁ মহম্মদ আব্বাস খাঁ অন্য মন্ত্রী হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব ও শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খান্না মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

গত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা টালীগঞ্জে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীকে বিহারে বাঙ্গালীদের অধিকার স্বীকৃত হইবে কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে গান্ধীজি

বলিয়াছেন—"ভারতের প্রত্যেক নাগরিক ভারতের প্রত্যেক অংশে সমান অধিকার পাইবেন। বিহারে বাঙ্গালীদের ও বিহারীদের সমান অধিকার থাকা উচিত; কিন্তু বাঙ্গালী-গণকেও বিহারীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইবে। তাঁহারা বিহারীগণকেও শোষণ করিবেন না। তাঁহারা বিহারকে বিদেশ বলিয়া মনে করিবেন না বা বিহারে গিয়া বিদেশীর মত ব্যবহার করিবেন না।"

দেশোন্নতিকর ব্যবস্থা বাবদ—১ কোটি ৩৩ লক্ষ

পথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বাবদ—৩ কোটি।

চোরা বাজার বন্ধের আইন—

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট চোরা বাজার বন্ধের জন্য ২৯শে আগষ্ট নূতন জরুরী আইন ঘোষণা করিয়াছেন। বিচারে ৬ মাস হইতে ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও 'যে কোন পরিমাণ' অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। আপাততঃ ৬ মাস এই আইন

বাংলার বয়েজ স্কাউট প্রতিনিধিবর্গের ফ্রান্স যাত্রা ফটো—ইণ্ডিয়া নেস

ভারতের নিকট বাঙ্গালার ঋণ—

বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যে বিভাগের কথা উঠে, তখন দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট মোট ৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছেন। তাহার বিবরণ এইরূপ—

বেসামরিক রক্ষা বাবদ—১ কোটি ৭৭ লক্ষ।

দামোদর বাঁধ মেরামত বাবদ—৬৬ লক্ষ।

অধিক ফসল ফলাও বাবদ—২১ লক্ষ

কৃষকদিগকে ঋণ বিতরণ বাবদ—১০ লক্ষ

চলিবে। চোরা বাজার ধরিবার জন্য গুপ্তভাবে কয়েক হাজার লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সহরবাসী গোপনে খবর দিবার অধিকার পাইয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের বস্ত্র সমস্যা—

৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় সকল বণিকসমিতির এক সম্মিলিত সভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিবেন। ঐ পরিকল্পনায় ভারতের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা আছে।

যাহাতে দেশে বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সে জন্য দেশের ধনী ও শ্রমিকদিগকে একযোগে কাজ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন কেন্দ্র—

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গে নিম্নলিখিত কয়টি নূতন নির্ব্বাচন কেন্দ্র ঘোষণা করা হইয়াছে—(১) মুর্শিদাবাদ সাধারণ—২ জন (২) দিনাজপুর মালদহ সাধারণ—২ জন (৩) দিনাজপুর ও মালদহ তপশীলী—১ জন (৪) নবদ্বীপ সাধারণ—১ জন (৫) পশ্চিম দিনাজপুর গ্রাম্য সাধারণ—১ জন (৬) নবদ্বীপ পশ্চিম মুসলমান—১ জন (৭) বহরমপুর মুসলমান—১ জন (৮) মুর্শিদাবাদ মুসলমান—১ জন (৯) জঙ্গীপুর মুসলমান—১ জন (১০) দিনাজপুর মুসলমান—১ জন (১১) মালদহ মুসলমান—১ জন। কোন মুসলমান কেন্দ্রে বা মুর্শিদাবাদ সাধারণ কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে না—পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কাজ করিবেন। বাকি ৪টি কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে।

বেলিয়াঘাটা গান্ধী-আশ্রমের সম্মুখে গান্ধীজীর দর্শনার্থী জনতা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

দামোদর পরিকল্পনা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ৩০শে আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতে কোন নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম দামোদর পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। উহা সম্পূর্ণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে। বিহার ও বাঙ্গলা (পশ্চিম) গভর্ণমেণ্টকে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় ভারত রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা স্থির করিতেছেন।

একটি চার বৎসরের বালিকার গান্ধীজীর হস্তে হরিজন ফণ্ডে অর্থদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

কলিকাতায় বস্তির উন্নতি—

গত ২১শে আগষ্ট কলিকাতা মহম্মদ আলি পার্কে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার বস্তীগুলির অধিবাসীরা যাহাতে আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া সুখে বাস করিতে পারে, সে জন্য বস্তীর মালিকদিগকে বাধ্য করা হইবে। যে সকল নূতন কারখানা প্রস্তুত হইবে, তাহাদের মালিকদিগকেও প্রথমে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পরে কারখানার কার্য্য আরম্ভ করিতে বাধ্য করা হইবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের কল—

মধ্যপ্রদেশের জিমার জেলায় জি-আই-পি রেলের বরহানপুর-খাণ্ডোয়া শাখার চাঁদনীতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত করার জন্য শীঘ্রই একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কলপ্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিভাগ—

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ৪ জেলা (মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কলিকাতা ও ২৪ পরগণা—যশোহরের অংশ ২৪ পরগণার মধ্যে গিয়াছে) ও রাজসাহী বিভাগের ৪টি জেলা (দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ) লইয়া

নূতন একটি বিভাগ করা হইয়াছে। জলপাইগুড়িতে তাহার সদর কার্য্যালয় থাকিবে ও মিঃ জে-এন-তালুকদার নূতন বিভাগের কমিশনার হইয়াছেন।

বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী—

গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে অধ্যাপক শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—এই সভা বাঙ্গলা ভাষাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করে এবং গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ কমিটীকে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব-ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী ও যোগ্যতা বিবেচনা ও বিচার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। উক্ত রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ কমিটীতে কোন বাঙ্গালী সভ্য না থাকায় এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং গণপরিষদের কোন বঙ্গ ভাষাভাষী সভ্যকে এই কমিটীতে গ্রহণ করার দাবী জানাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্যের জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, এই সভা তাহা সমীচীন মনে করে। এই সভা পাকিস্থান গণপরিষদকে এই দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। অনতিবিলম্বে উচ্চ শিক্ষায় ও অফিসে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন করিবার নিমিত্ত সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

গান্ধীজি ও ধনীসম্প্রদায়—

কলিকাতার হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপ ধনী সম্প্রদায় গত ৩১শে আগষ্ট বিকালে কলিকাতা গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সভায় গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। সেখানে গান্ধীজি সকলকে বস্তী ও বিধ্বস্ত গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ কল্পে অর্থ-সাহায্য করিতে আবেদন জ্ঞাপন করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি—

গণপরিষদে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল রাষ্ট্র পরিচালনার নিম্নলিখিত মৌলিক নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) আইনকানুন প্রণয়নের সময় এই মৌলিক নীতি প্রযুক্ত হইবে (২) রাষ্ট্র সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবে (৩) রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য

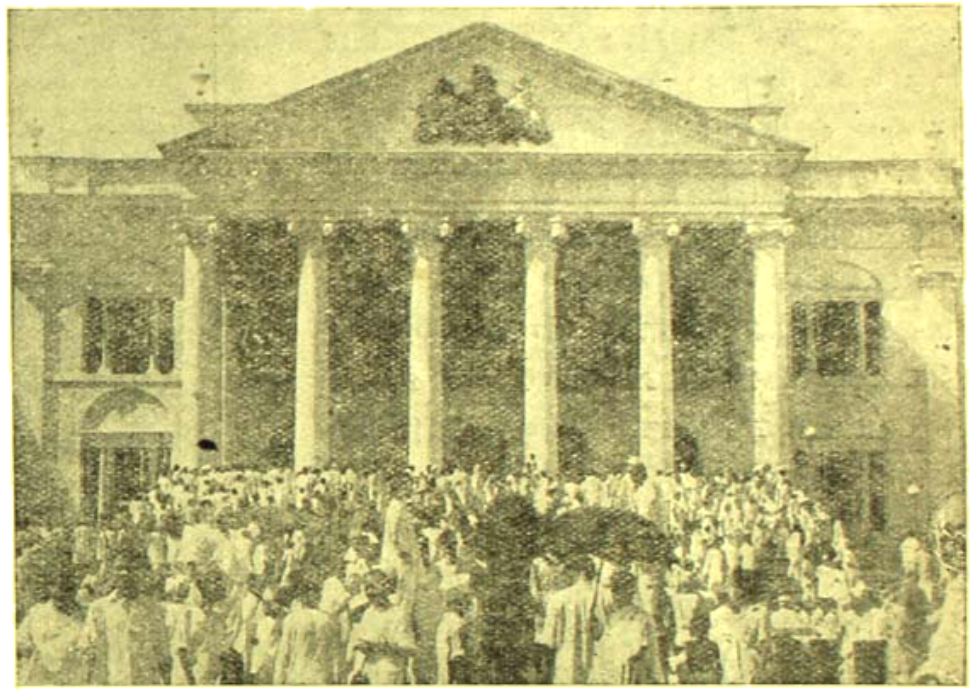

১৫ই আগষ্ট গভর্ণর-হাউসে জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

রাখিবে (ক) স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবিকার্জ্জনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা (খ) সমাজের কল্যাণের জন্য দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্ত্তৃত্ব সমভাবে বণ্টন (গ) প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের মালিকানা ও কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত না হয়, তজ্জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করার ব্যবস্থা (ঘ) নরনারী নির্ব্বিশেষে সমান কাজে সমান বেতনের ব্যবস্থা (ঙ) শক্তি ও স্বাস্থ্যে কুলায় না এরূপ পুরুষ ও নারী শ্রমিক ও অল্প-বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ না করার ব্যবস্থা। অভাবের তাড়নায় কেহ যাহাতে বয়স ও

সামর্থ্যের অনুপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা (৫) কেহ যাহাতে শিশু ও যুবকদের শক্তির অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করে তাহার ব্যবস্থা এবং তাহাদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। (৪) রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের জন্য চাকরী ও শিক্ষা এবং বেকার, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারের ব্যবস্থা (৫) শ্রমিকরা যাহাতে মানুষের যোগ্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে পারে এবং নারী শ্রমিকরা যাহাতে সন্তান প্রসবের সময় ছুটী পায় রাষ্ট্র কর্তৃক তাহার ব্যবস্থা। (৬) রাষ্ট্র কর্তৃক আইন, অর্থনীতিক সংগঠন ও অন্যান্য উপায়ে শিল্পে নিযুক্ত ও অন্যান্য কায়-শ্রমিকদের জন্য চাকরী, বেতন সুষ্ঠু জীবন যাত্রা, ছুটি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ ও সুবিধাদানের ব্যবস্থা (৭) নাগরিকদের মধ্যে সমান সামাজিক রীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আইন (৮) প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা (অনুন্নত ও দুর্ব্বল সম্প্রদায়, বিশেষতঃ তপশীলী ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত হইতে রক্ষা, (১০) দেশে পুষ্টি, জীবন ধারণের মান ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য (১১) শিল্পকলার নিদর্শন ও ঐতিহাসিক সকল স্মৃতিস্তম্ভ ও স্থান রক্ষার ব্যবস্থা (১২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা।

সৈন্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা—

গত ২৯শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে এক সভায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী পাঞ্জাবের হাঙ্গামাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের পর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলিয়াছেন—"এক সম্প্রদায়ের সৈন্যদের প্রহরাধীনে অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের প্রেরণ করা নিরাপদ নয়। হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের সৈন্যদের প্রহরাধীন ছাড়া পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আসিতে পারিবে, ইহাও আশা করা যায় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সেরূপ ভাবে না হইলেও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বর্ত্তমান। মুসলেম সৈন্যবাহিনীর ন্যায় হিন্দু ও শিখরাও নিজ সম্প্রদায়ের উপর গুলী চালাইতেছে না।" এই বিষ দূরীভূত না হইলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(গত ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে ইঁহার জন্মোৎসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)

কলিকাতায় রাহাজানি বৃদ্ধি—

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে মোট ২৬টি স্থানে ডাকাতি, লুঠ, রাহাজানি প্রভৃতি হইয়াছে। জিপ গাড়ীতে করিয়া বন্দুক লইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ লুঠতরাজ করিয়াছে। ঐ সম্পর্কে ১৮ জন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিস উপযুক্ত ব্যবস্থার মনোযোগী হইয়াছে।

গান্ধীজির প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা—

গত ২৮শে আগষ্ট দিল্লীতে গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদ ভবনে মহাত্মা গান্ধীর এক চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চিত্রটি ৫০ ইঞ্চি লম্বা ও ৪০ ইঞ্চি চওড়া। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যখন বিলাতে যান, তখন বিখ্যাত চিত্রকর সার ওসওয়াল্ড বীরলে ঐ চিত্র অঙ্কন করেন। সার প্রভাশঙ্কর পত্তনী উহা ক্রয় করেন ও স্বাধীন ভারতের জাতিকে দান করার মনস্থ করেন। তাহার পুত্র গণপরিষদের সদস্য মিঃ এ-পি পত্তনী উহা পরিষদকে দান করিয়াছেন।

পুলিসের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক—

কলিকাতার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে পুলিস বাহিনীর সাহায্যের জন্য এবং পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের কথা গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতা লাল-বাজার পুলিস অফিসে এক সভায় আলোচিত হইয়াছে। জনসাধারণের বহু প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয়, তজ্জন্য সকলেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুলিস কমিশনার এ বিষয়ে কাজ করিবেন।

বাঙ্গালীর সম্মান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী ১৯৪৮ সালের জন্য ওয়াশিংটন (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিজিটিং প্রফেসার' নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী অমিয়বাবুর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

গান্ধীজি ও নেতাজী—

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী ছাত্রগণকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, পাঠ্যাবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রের জীবনযাত্রা সন্ন্যাসীর অনুরূপ হওয়া উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের আচরণ আত্মসংযমের আদর্শ হইবে। গান্ধীজি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নেতাজী নশ্বর দেহে জীবিত নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভারতসেবকের অন্তরে তিনি বিরাজমান। তাঁহার জীবন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। তাঁহার দুঃসাহসিকতা অতুলনীয়। বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম সামান্য কথা নয়। তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও নেতাজির প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিন্দু-মাত্র হ্রাস পায় নাই। ছাত্রগণ হিংসা বা অহিংসা যে মতেই বিশ্বাসী হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন—এই কথা তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

১৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কে জাতি সংঘের সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলে নেত্রীত্ব করিবার জন্য শ্রীযুক্তা

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মস্কো হইতে নিউইয়র্ক যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার কন্যা চন্দ্রলেখা পণ্ডিত ও সেক্রেটারী মিঃ টি-এন-কাউল যাইবেন। মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসে সকলে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

কোলাঘাটে ট্রেণ দুর্ঘটনা—

গত ১০ই ভাদ্র বুধবার মধ্যরাত্রির কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেলের কোলাঘাট

ষ্টেশনে (মেদিনাপুর জেলা) ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে ১৬ জন নিহত ও ১১৮ জন আহত হইয়াছে। আপ হাওড়া পুরুলিয়া টাটানগর প্যাসেঞ্জার কোলাঘাট ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল—আপ হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার তাহার উপর যাইয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটা হইতে লাইন পুনরায় ট্রেণ চলাচলের উপযুক্ত হয়। ঘটনার পর ৪।৭ দিনে আরও বহু আহত ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

হরিহরানন্দ আরণ্যের দেহত্যাগ—

মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা) কপিল মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজ গত ৫ই বৈশাখ ৭৯

স্বামী হরিহরানন্দ

বৎসর বয়সে মধুপুর কাপিল গুহায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন ও ২১ বৎসর যাবৎ একটি গুহার প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত যোগদর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পাকিস্থানের সম্পত্তি ও মিঃ জিন্না—

গত ২৪শে আগষ্ট করাচী মিউনিসিপালিটী হইতে কায়েদে আজম জিন্নাকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইলে তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন—"আমরা আশা করি পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিবে এবং পরস্পর সৌহার্দ্য ও শান্তির মধ্যে বাস করিয়া একে অন্যের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। আমরা আরও আশা করি যে, ভবিষ্যতে এই দুই ডোমিনিয়ান বিশ্বের দরবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। যে কোন প্রকারের ভয় ও অভাব দূর করাই কেবল নয়, পবিত্র ইসলামের আদর্শে স্বাধীনতা, সৌহার্দ্য ও সাম্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭ সালের বি-এস্-সি পরীক্ষায় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

বিদ্যাভূষণের পুত্র শ্রীমান ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান, উভয় বিষয়ে অনার্সসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে বিবেচনা—

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে রোয়েদাদ ঘোষণা করিয়াছেন যে বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে লইয়া এক সাবকমিটী গঠন করিয়াছেন—পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার পেটেল, সর্দ্দার বলদেব সিং, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর আম্বেদকর ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পাইকারী জরিমানা মুকুব—

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে কলিকাতা ও মফঃস্বলীতে যে সব পাইকারী

অতিমানা ধার্য্য হইয়াছে, তাহা মকুব করা ও এ পর্য্যন্ত যে সব পাইকারী অতিমানা আদায় করা হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির উপর যে জামানত দাবী করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।

পরলোকে কবিরাজ হিরণ্ময় সেন—

পরলোকগত কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ হিরণ্ময় সেন গত ২৭শে আগষ্ট ৫২ বৎসর বয়সে

৺হিরণ্ময় সেন

তাঁহাদের নিমতলা ঘাটষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মাড়োয়ারী হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ও বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দিল্লীতে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা—

গত ৪ই সেপ্টেম্বর হইতে দিল্লী প্রদেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। ফলে ট্রেণ চলাচল, তার, টেলিফোন, এমন কি বিমান যাতায়াত পর্য্যন্ত কয়েক দিন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে তথায় যে নিখিল ভারত সাহিত্যিক সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, তাহাও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার পেটেল প্রভৃতি হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা, তাঁহার গ্রন্থাদির প্রচার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কলিকাতায় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে সভাপতি ও ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি নামক এক সমিতি রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে; কলিকাতা কাশীপুর ৬৬ মণ্ডলপাড়া লেনে সমিতির প্রধান কার্য্যালয় করিয়া এ বিষয়ে কাজ চলিতেছে। লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে সমিতির এই কার্য্য প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

পাঞ্জাবের আশ্রয়হীনদিগের সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীকে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মন্ত্রিসভার এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। ক্ষিতীশবাবু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি—তাঁহার এই নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।

বাঙ্গালার মন্ত্রী পরিবর্ত্তন—

পশ্চিম বাঙ্গালার ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার তিনজন মন্ত্রী—শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঞ্জা, শ্রীযুত রাধানাথ দাস ও শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ পদত্যাগ করিয়াছেন। গভর্ণর ঐ দিনই তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীকে নূতন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্নদাবাবু অর্থ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জন স্বাস্থ্য বিভাগের ভার লইয়াছেন ও শ্রীযুত ভাণ্ডারীর উপর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার পড়িয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ইংলণ্ড ও মিডলসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী দু'টি রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯২৮ সালে জ্যাক হবস ক্রিকেট খেলায় এক মরসুমে ১৬টি সেঞ্চুরী ক'রে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলায় যে নতুন রেকর্ড করেছিলেন তা দীর্ঘ ২১ বছর পর গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডেনিস কম্পটন ১৭টি সেঞ্চুরী ক'রে ভঙ্গ ক'রেছেন। হবসের রেকর্ড ভঙ্গ করা এবং নতুন রেকর্ড স্থাপন করা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে হবসের তুলনায় কম্পটন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৬টী সেঞ্চুরী করতে জ্যাক হবসের ৪৮ ইনিংস খেলার প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু ৪৫ ইনিংসেই কম্পটন ১৬টি সেঞ্চুরী করেন। কম্পটন তাঁর ৪৬ ইনিংসের খেলায় ১৭টি সেঞ্চুরী ক'রে হবসের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ সময়ের খেলায় হবস পাঁচবার নট আউট থাকেন, অন্য দিকে কম্পটন ছিলেন ৭ বার। হবসের ৭০·৩২ এভারেজ এবং কম্পটনের ৮৫·৯৪ এভারেজ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যখন উভয়েই ১৬টি সেঞ্চুরী পূর্ণ ক'রেছেন সে সময়ে হবসের গড়পড়তা রাণ ৩,০২৪, কম্পটনের ৩,২৬৮। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ডেনিস কম্পটন যে রেকর্ড স্থাপন করলেন তা অতিক্রম করা কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে সহজ ব্যাপার হবে না। কম্পটনের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান খ্যাতনামা বোলার ডগ্লাস রাইট বলেছেন ২৯ বছর বয়সের মিডলসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় এমন পদ্ধতির ক্রিকেট খেলেছেন যা খেলার গোড়ামী শূন্য, অথচ ক্রিকেট খেলার পাঠ্যপুস্তকের বিধিনিষেধগুলি নির্ভুলভাবেই তিনি পালন করেছেন।

একই মরসুমে বেশীসংখ্যক সেঞ্চুরীর রেকর্ড ঃ

খেলোয়াড়ের নাম	সাল	সংখ্যা
জ্যাক হবস	১৯২৫	১৬
হ্যামণ্ড	১৯৩৮	১৫
সাটক্লিফ	১৯৩৫	১৪
ব্র্যাডম্যান	১৯৩৮	১৩
সি বি ফ্রাই	১৯০১	১৩
হ্যামণ্ড	১৯৩৩ ও ৩৭	১৩
হেওয়ার্ড	১৯০৬	১৩
হেমড্রেন	১৯২৩, ২৭, ২৮	১৩
মীড	১৯১৮	১৩
সাটক্লিফ	১৯২৮ ও ১৯৩১	১৩

উক্ত রেকর্ড ছাড়া ১৯০৬ সালে সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (Tom Hayword) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক মরসুমে ৩,৫১৮ রাণের পৃথিবীর রেকর্ডও ডেনিস কম্পটন ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড করেছেন। সম্প্রতি ভর পেলহাম ওয়ার্নারের দলের বিপক্ষে দক্ষিণ ইংলণ্ডের পক্ষে এক প্রদর্শনী খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসে নটআউট ৩৫ রাণ করলে পর তাঁর মোট ৩,৫১৯ রাণ উঠে টম হেওয়ার্ডের পূর্ব্ব ৩,৫১৮ রাণের রেকর্ড অতিক্রম করে। এই রাণ তুলতে কম্পটনকে ৪৯ ইনিংস খেলতে হয়। অন্যদিকে হেওয়ার্ডের রেকর্ড করতে লেগেছিল ৬১ ইনিংস। এই মরসুমের শেষ খেলায় কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান মিডলসেক্সের পক্ষে খেলে ইংলণ্ডের অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে কম্পটন ২৪৬ রাণ তুলতে সক্ষম হন। ইংলণ্ডে ইহাই তাঁর সর্ব্বোচ্চ রাণ। এই রাণ তোলার

কম্পটন স্থাপিত এক মরসুমে পৃথিবীর রেকর্ড রাণ সংখ্যা ৩৮১৬তে দাঁড়াল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কম্পটন ছাড়া মিডলসেক্সের বিল এডরিচও এই মরসুমে টম হেওয়ার্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মরসুমে তাঁর রাণ সমষ্টি ৩৫৩৯ হয়েছে।

ডেনিস কম্পটন ও এডরিচ ছাড়া নিম্নলিখিত ১৪ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় তিন সহস্রাধিক রাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার একই মরসুমে ডেনিস কম্পটনই করেছেন সর্ব্বাধিক রাণ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খ্যাতনামা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্জিৎসিংজী ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলে ১৮৯৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে সর্ব্বপ্রথম ৩,১৪৯ রাণ তুলে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

খেলোয়াড়	বছর	মোট	এভারেজ
হেওয়ার্ড	১৯০৬	৩,৫১৮	৬৬·৩৭
টলি	১৯০৮	৩,৩৫২	৬১·০৩
সাটক্লিফ	১৯৩২	৩,৩৩৬	৭৪·১৩
হ্যামণ্ড	১৯৩৩	৩,৩২৩	৬৭·৮১
হেনড্রেন	১৯২৮	৩,৩১১	৭০·৪৪
এবেল	১৯০১	৩,৩০৯	৫৫·১৫
হ্যামণ্ড	১৯৩৭	৩,২৪২	৬৪ ০৪
হেনড্রেন	১৯৩৩	৩,১৮৬	৫৬·৮৯
মীড (সি. পি)	১৯২১	৩,১৭৯	৬৯·১০
হেওয়ার্ড	১৯০৪	৩,১১০	৫৪·৬৫
রণজিৎসিংজী	১৮৯৯	৩,১৫৯	৬৩·১৮
ফ্রাই	১৯০১	৩,১৪৭	৭৮·৬৭
রণজিৎসিংজী	১৯০০	৩,০৬৫	৮৭·৫৭
এমেস	১৯৩৩	৩,০৫৮	৪৮·৮০
টিলডেসলি (জেটি)	১৯০১	৩,০৪১	৫৫·২৯
মীড (সি পি)	১৯২৮	৩,০২৭	৭৫·৬৭
হবস	১৯০৪	৩,০২৪	৭০·৩২
টিলডেসলি (ই)	১৯২৮	৩,০২৪	৭৯·৪৭
হ্যামণ্ড	১৯৩৮	৩,০১১	৭৫·২৭
হেনড্রেন	১৯২৩	৩,০১০	৭৭·১৭
সাটক্লিফ	১৯৩১	৩,০৬৬	৯৬·৯৬
পার্কস (জে এইচ)	১৯৩৭	৩,০০৩	৫০·৮৯
সাটক্লিফ	১৯২৮	৩,০০২	৭৬·৯৭

এ পর্য্যন্ত একই মরসুমের খেলায় সাটক্লিফ, হেনড্রেন ও হ্যামণ্ড তিনবার তিন সহস্রাধিক রাণ করেন। রণজিৎসিংজী মীড ও হেওয়ার্ড করেন দু' বার।

ক্রিকেট খেলোয়াড় সম্বন্ধীয় খবর

পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সব থেকে দীর্ঘ দিন খেলোয়াড়জীবন যাপন করেছিলেন জর্জ্জ হার্স্ট। তিনি ১৮৮৯ সালে ইয়র্কসায়ারের পক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন। তাঁর সর্ব্বশেষ খেলা ১৯২৯ সালে।

• • • •

১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়ার বনাম ওয়ারউইকসায়ারের ক্রিকেট খেলায় যে অভূতপূর্ব্ব রাজযোটক যোগদেখা গিয়েছিল তা এ পর্য্যন্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯১৯ সালের উক্ত খেলায় ডবলউ জি কোয়াইফ এবং তাঁর পুত্র বি ডবলউ কোয়াইফ একত্র জুটী হয়ে খেলতে থাকেন এবং অপরদিকে যাঁরা তাঁদের জুটী ভাঙবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা হলেন ডবলউ বেষ্টউইক ও আর বেষ্টউইক —দু'জনের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ।

ফুটবল খেলোয়াড় সম্বন্ধীয় খবর

'ফুটবল পুল' প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী ক'রে ৪৭ বছর বয়সের ষ্ট্রোকার জর্জ্জ স্মিথ নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। বৃটিশ চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার ডাঃ ডালটন গত এপ্রিল মাসে সিগারেটের উপর আর এক দফা ট্যাক্স চাপিয়ে দিলে জর্জ্জ স্মিথ বিরক্ত হয়ে ধূমপান একেবারে বর্জ্জন ক'রে সিগারেট খরচার টাকাটা 'ফুটবল পুলে' খাটাতে লাগলেন। সেই থেকেই তাঁর ভাগ্য আজ ফিরেছে। তিনি ৩,০০,০০০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদল

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদলের ক্যাপটেন ভি এম মার্চ্চেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার জন্য দলে যোগদান করতে সক্ষম হলেন না; তাঁর স্থলে লালা অমরনাথ দলের অধিনায়কত্ব করবেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবরের মধ্যে কোন এক তারিখে বি ও এ সি এরোপ্লেনে ১৪জন খেলোয়াড়সহ দলের ম্যানেজার অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন।

ডেভিস কাপ ঃ

গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকা ৪-১ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে এ বছরও ডেভিস কাপ বিজয়ী হয়েছে। আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ১৩বার উক্ত কাপ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশীবার ডেভিস কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

সিঙ্গলস ফাইনাল ঃ

সিঙ্গলসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সখের খেলোয়াড় জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ডিনি পেল্‌সকে (Dinny Pails) সহজেই পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসের দ্বিতীয় খেলায় Tod Schroeder ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩ ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার নং খেলোয়াড় জন ব্রোমউইচকে পরাজিত করেন। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে জন ব্রোমউইচ ও কোলিন নং (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ২-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে জ্যাক ক্রামার ও টেড সক্রোডারকে (আমেরিকা) পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

অপর এক সিঙ্গলসের খেলায় জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে জন ব্রোমউইচকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসে টড সক্রোডার (আমেরিকা) ৬-৩, ৮-৬, ১-৬, ৮-১১, ও ১০-৮ গেমে ডিনি পেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

'ইউরোপীয়ান সুইমিং চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতায় ১৭ বছর বয়সে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান এলেন্স জেনী ২০০ মিটার দূরত্ব ২ মিঃ ৪'৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তাঁর পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্বের থেকে তিনি এক সেকেণ্ড কম সময়ে উক্ত দূরত্ব পথ অতিক্রম করেন। এ ছাড়া এলেন্স জেনী সাঁতারে ৪০০ মিটার দূরত্ব ৪ মিঃ ৩৫'২সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে আমেরিকার বিল স্মিথ প্রতিষ্ঠিত ৪ মিঃ ৩৮৫ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ইংলণ্ড: ৪২৭ (এম হাটন ৮৩) ও ৩২৬ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ডি কম্পটন ১১৩) দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩০২ (বি মিচেল ১২০) ও ৪২৩ (৭ উইঃ মিচেল নট আউট ১৮৯, নোর্স ৯৭) ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ 'ড্র' গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বি মিচেল উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "বিষন্ন মানব"—৪৲

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে কানাই বসু কর্ত্তৃক গ্রথিত নাটারূপ "বিরাজ-বৌ"—২।০

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মন্বাক্রান্তা"—৩।০

অন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "বাঁধন হারা"—২।০

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাত্রি"—১৲

শ্রীপবিত্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "রাশিয়ার রূপ"—১।০

বিজয় ব্যানার্জী প্রণীত "সংগ্রাম ও সমর-নায়ক"—৩৲

"নূতন পথে বিজ্ঞানে"—১।০

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "আমাদের বাঙ্গলা" (১ম পর্ব্ব)—১।০

নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পণপরিষদ ও কংগ্রেস"—৩৲

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "তরল-বিজ্ঞান ও বায়ু"—২।০

প্রণব রায় প্রণীত "সাত সমর ঘাড়ী"—২।০

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সঙ্কলিত "নয়া-বাঙ্গলা"—৩৲

যমদগ্নি—সম্পাদিত উপন্যাস "দুঃসাহসিক অভিযান"—২৲

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত প্রণীত "শাশ্বত তরণী"—২৲

ঋষি দাস কর্ত্তৃক রোমাঁ রোলাঁ রচিত গ্রন্থের অনুবাদ "মহাত্মা গান্ধী"—২।০

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীরহস্যময় রসবাণুরী—৪।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ভগবানের চাবুক"—১৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী উপন্যাস "কলঙ্কী চাঁদ"—১৲

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "পল্লীর প্রচুর চাকরী ও কুবিরাম"—১।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

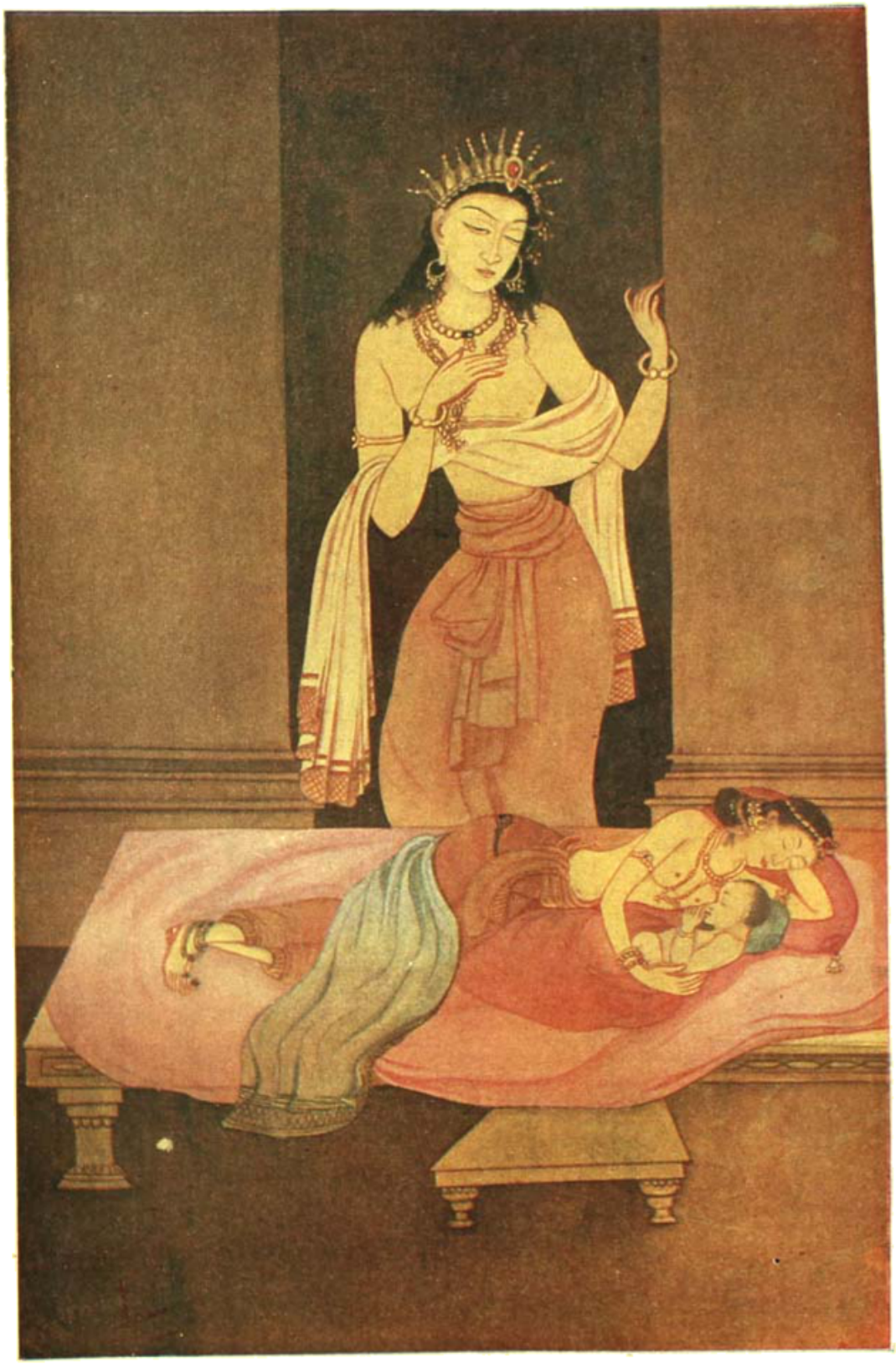

বুদ্ধের গৃহত্যাগ

শিল্পী—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর পদপ্রান্ত হ'তে
অগণিত সন্তানের গাঢ় তপ্ত তাজা রক্ত স্রোতে
সিক্ত হয়ে বারংবার—বন্ধন-শৃংখল তার—বজ্র সুকঠিন—
হ'তেছিল ক্ষীয়মান জীর্ণপ্রায় অগোচরে যাহা দীর্ঘ দিন
বিশ্বের অঙ্গনে তাহা সহসা পড়েছে আজি খসি,
বংশ পরম্পরা যার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠা বহিয়া ছিনু মোরা বসি,
এসেছে সে আকাংখিত দিব্য শুভদিন ;
বন্দিনী জননী ছিল সর্বলোক মাঝে দীর্ঘকাল মর্যাদা বিহীন
মুক্তি তাঁর এতদিনে আচম্বিতে হয়েছে সম্ভব ;
এ নহে বিজয় বন্ধু, শুধু মাত্র স্বদেশের নব-লব্ধ মুক্তির উৎসব !
এ প্রাচীন পদানত ভূমে ছোট বড় ধনী কিংবা হীন
কেহ আর নহে আজ অবাঞ্ছিত শাসন-অধীন।
স্বাধীন এ ভারতের রুধিরার্দ্র রক্তিম আকাশে
বন্ধন-মোচন-দীপ্ত নূতন অরুণ উষা হাসে।

যে সূর্য উঠেছে আজ পূর্বাচলে মুক্তির গগনে
ওঠেনি' সে এতকাল পরাধীন এ প্রাচী গগনে।

নবীন অরুণোদয়ে তোমারে স্মরণ করি আজ
বাসুদেব, হে কংসারি, বৃষ্ণিকুলরাজ!
মহাভারতের স্বপ্ন একদিন দেখেছিলে তুমি;
কুখ্যাত সে কুরুক্ষেত্র রণ-রঙ্গভূমি
আত্মীয়-শোণিত-স্রোতে স্নান তব করেছিল ম্লান,
সেদিন এ আর্যাবর্তে ঘটেছিল কী যে সর্বনাশ!
ভ্রাতৃবিরোধের বীজ—হস্তিনার বিষাক্ত গরল—
ভারতের মৃত্তিকারে স্বজন বিদ্বেষ বিষে করে গেছে তিক্ত অমঙ্গল।
আসিয়াছে তার পরে বারে বারে কত মহারথ
চাহিয়াছে বাঁধিবারে 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'
ব্যর্থ করি সেই চেষ্টা বাধিয়াছে আত্মঘাতী রণ:
ভারতে মরেনি আজও স্ব-জাতীয়-বৈরী বিতীষণ!
ভগ্ন-উরু কুরুপতি—দ্বন্দ্ব-লিপ্ত আজও হেথা বৈপায়ন হ্রদে;
পরাজিত প্রাজ্ঞ পুরু, পৃথ্বীরাজ হারায়েছে প্রাণ,
ইরাণী তুরাণী সেনা, শক, হুন, মোগল পাঠান
এসেছিল বারে বারে, দিল্লীর দুর্গের দ্বারে করেছিল নির্মম আঘাত,
একতা-বিচ্যুত এই দুর্ভাগা দেশের হায় আঁধারে আচ্ছন্ন দিবা রাত—
কাটিয়াছে তীব্র দুঃখ বেদনার মাঝে—
প্রতিপদে প্রতিক্ষণে জীবনের দৈনন্দিন কাজে,
পরবশতার রূঢ় দৃঢ় নাগপাশ
কলংকিত করিয়াছে স্বজন-বিরোধ লিপ্ত এদেশের শেষ-ইতিহাস।

আজ তাহা রাখিব না মনে।
পলাশী ও পাণিপথ ডুবে যাক চির বিস্মরণে।
জননীর পাপ-মুক্তি শুভ সন্ধিক্ষণে
রাতের দুঃস্বপ্ন যত যাক্ মিলাইয়া প্রভাতের নব সূর্য সনে।

আজ শুধু এই স্মৃতি উজ্জীবিত করুক স্মরণ
মহারাণা প্রতাপের স্বাধীনতা লাগি চিতোর-অরণ্যে মৃত্যুপণ,
ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্রে নব অভ্যুদয়,
পঞ্জাব-কেশরী যারা গুরুজীর পুণ্য নামে স্বাধিকার করেছিল জয়!
চাঁদ, কেদারের কথা, যশোরের অনন্ত প্রতাপ;
মনের বিপ্লবী চিন্তা—দুঃসাহসী বিদ্রোহের ছাপ—
জাগে আজও বাঙালীর মনে।

স্বরাজ্য লাভের এই আগন্তুক আনন্দ-লগনে
নমি' নানা ফড়্নবীশ্—মারাঠার বিদ্রোহী প্রধান!
নমামি ঝাঁসীর রাণী,—স্বাধীনতা যুদ্ধে দিলে প্রাণ;
হে নির্ভীক ধুন্ধুপন্থ্ তোমারেও করি নমস্কার
দেশের মুক্তির লাগি যুগে যুগে সর্বত্যাগী—স্মরিয়া তাঁদের বার বার
মনে মনে আজি মোরা জানাই প্রণতি।

হে পার্থ-সারথি!
তব সুদর্শন চক্র—লাঞ্ছিত কেতন
আজি মোরা করিতেছি ঊর্ধ্বে উত্তোলন
সার্ধ সপ্ত শতাব্দীর পরে—
বন্ধন-বিমুক্ত নব ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে।
অশোক-গৌরব-গাথা-মুখরিত যে চক্রের সিংহধ্বজ রথে,
অতীতের লক্ষ স্মৃতি আবর্তিত যে চক্রের উত্থান পতন গতি পথে,
ভারতের অভিনব জাতীয় পতাকা এল বক্ষে ল'য়ে সে দিব্য প্রতীক
উজ্জ্বল করিতে পুন সপ্তমুক্ত এদেশের রুদ্ধ দশদিক!

• • •

ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত এই গণ-দেবতার পুণ্য পতাকা সম্মুখে
বহু আকাংখিত স্বপ্ন সাফল্যের সংবিধান সুখে
মিলিত হয়েছে পুন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সকল সন্তান।
জননীর মুক্তি লাগি অকাতরে দিল যারা প্রাণ—
হাসি মুখে ফাঁসীমঞ্চ করিল বরণ
বহুদূর দ্বীপান্তরে গেল যারা চির-নির্বাসন।
আজি এ প্রভাতে স্মরি তাঁদের সকৃতজ্ঞচিত্তে—শ্রদ্ধানত শিরে
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই সব দুঃসাহসী দেশভক্ত বীরে।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত যাহাদের রাজদ্রোহী বলি দিয়াছিল মিথ্যা অপবাদ।
কারা-কক্ষে সমাহিত যাহাদের সাধনা ও সাধ
তাহাদের সসম্ভ্রমে করিয়া বন্দন
আমাদের প্রীতি-অর্ঘ করি নিবেদন।

যাহাদের শৌর্য বীর্য ত্যাগের প্লাবনে
জেগেছিল মৃতজাতি সৌরুষের দুরন্ত জীবনে
যাহাদের কণ্ঠে শুনি অভয় হুংকারে—দৃপ্ত-তাজার দীপ্ত গান—
সঞ্জীবিত হয়েছিল আপনা-বিস্মৃত অচেতন কোটী সুপ্ত প্রাণ,
তাহাদের পুণ্য-স্মৃতি স্মরি—
তোমারে বরণ আজি করি,

স্বাধীন এ ভারতের হে আরাধ্য জাতীয় পতাকা !
তোমার ত্রিবর্ণে আছে আঁকা
ত্যাগের গৈরিক-মন্ত্রে প্রাণ-শুকে নব উদ্বোধন
অকলংক শুভ্রচ্ছটা শান্তির স্তোত্রনা, সুস্থামল সবুজ জীবন ;
চক্রসম আবর্তিত নিত্য যাহা গতিহীন অনন্ত জগতে,
তারি চিহ্ন বুকে ধরি মানব প্রেমের জয়রথে
লয়ে যাবে এ জাতিরে নব নব চিত্তজয়ে জানি,
তোমারে তাই ত মোরা বহুমানে লইলাম মানি—
প্রাচ্য গৌরবের ওগো অসামান্য সুন্দর প্রতীক !
তোমার মর্যাদা লাগি কত বীর তরুণ নির্ভীক
আগের অস্ত্রের বুকে পাতিয়া দিয়াছে নিজ বুক,
পুত্রহারা কত মাতা সয়েছে সে বজ্র শোক—সে দুঃসহ দুখ—
সন্তানের বীরত্বের কীর্তিগাথা স্মরি।
তোমারে বরণ তাই করি,
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ—নিনাদিয়া আনন্দ বিষাণ—
হে সুন্দর মনোহর জাতীয় নিশান !

অনুকূল বায়ুভরে আন্দোলিয়া রেখে যাক দিগে
ভুবন ভরিয়া দিকে দিকে,
এই নব পতাকার পত-পত্ প্রতি সঞ্চালন—
দেশের মঙ্গের কাজে উৎসর্গিল যাহারা জীবন,
ব্যর্থ নহে তাহাদের ব্রত।
অতীতের ইতিহাসে উৎকীর্ণ হইয়া আছে কত
তোমার সম্মান-রক্ষা অপূর্ব কাহিনী !
বিশ্বের সমর ক্ষেত্রে মৃত্যুপণে কতনা বাহিনী
রেখেছে তোমারে উচ্চে ধরি।
তাহাদের অবিনাশী কীর্তি কথা স্মরি'
যে পতাকা দিনু আজ ঊর্ধ্বাকাশে তুলি,
মর্যাদা তাহার যেন কভু নাহি ভুলি।

জাতীয় পতাকা নহে সৈনিকের করে ক্ষুদ্র এক তুচ্ছ ক্রীড়নক
রণক্ষেত্রে রচে ইহা বীরত্বের স্বর্ণ-ইতিহাস—অসামান্য শৌর্যের নাটক,
দেশের গৌরব আর জাতির সম্মান বিজড়িত এর প্রতি সূত্রটির সাথে।
এ পতাকা সোঁপে শুধু সত্যনিষ্ঠ বীর্যবান বাহকের হাতে।
এই পতাকার লেখা—শহীদের শোণিত তর্পণ,
পিতৃ পিতামহ যাহা বংশধরে করিবে অর্পণ,

বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীর আদর্শ পূজারী—বেণী যত তরুণ সৈনিক—
এ শুরু দায়িত্বভার সবার বলিষ্ঠ স্কন্ধে আজ তারা হেসে তুলে নিক ;
সুগম্ভীর কণ্ঠে হোক এ-সংকল্প মহাবাক্য মাতৃমন্ত্র সনে উচ্চারিত
"পৃথিবীর কোনো ভয়ে নাহি হয়ে ভীত—
দণ্ড এর উচ্চে যেন রাখিবারে পারি !"
মূঢ় করি মুষ্টিবদ্ধ ধরুক ইহাকে দুর্জ্জয় যৌবনদৃপ্ত যত নরনারী,
বহিয়া চলুক এরে বিজয়-উল্লাসে ভুবনের দিকে দিকে আজ।
বিশ্বকে করিতে শ্রদ্ধা ভারতের পুন—জগতের মানব সমাজ।
শান্তি প্রীতি সৌহার্দ্যের অকপট বাণী প্রচারিয়া
বেঁধে দিক বিশ্ব আজ একতা বন্ধনে প্রেমের ঐশ্বর্যে ভরি দিয়া।
ভারত-পতাকা আজ এনে দিক ফিরাইয়া এশিয়ার গৌরব সম্ভ্রম
আসমুদ্র হিমাচলে কোটী কণ্ঠে উঠুক ধ্বনিয়া—'বন্দে মাতরম্'।

কর্ম্মযোগ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

কেন আমরা সব কিছুকে নিজের দিকে আঁকড়ে রাখতে চাই? এ আমাদের অহঙ্কার। মাধ্যাকর্ষণ আছে ব'লে যেমন যা-কিছু সব পৃথিবীর বুকে আঁকড়ে আছে, খসে খসে পড়ছে না, আমাদের অহঙ্কারও সেই রকম আমাদের মাধ্যাকর্ষণশক্তি। কেন ভগবান অহঙ্কার দিলেন আমাদের? না দিলেও তো পারতেন? তাহলে তো কেউ আর নিজের জন্য অমন করত না, নিজের জন্য সঞ্চয় করত না, পরের ভোগ খর্ব ক'রে নিজের ভোগ বাড়িয়ে চলত না, সমস্তই পরার্থে নিবেদন ক'রে দিত। মঙ্গল তখন অবাধ হ'ত, ত্যাগে আর আপত্তি থাকত না।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এরকম ভাবা ভুল। ত্যাগের কোনো মানেই হয় না, অহঙ্কার যদি না থাকে, স্বার্থ যদি না থাকে। দান করার মানেই হয় না, আগে যদি অর্জন না করি। এ সংসারে এমন কি জিনিষ আছে যা মানুষের নিজের? জল বাতাস আলো, গাছ এবং তার ফল, ভূপৃষ্ঠের এবং মাটির নীচের যত জিনিষ—সবই তো ভগবানের। তেমনি তো কাজও, কর্ম্ম অনন্তকাল ধ'রে চ'লে আসছে। সব উপকরণ, সমস্ত কাজ যদিও ঈশ্বরের, যদিও তিনিই তাদের একমাত্র স্রষ্টা,—তবু তিনি মানুষকে এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন,—এ সব জিনিষ, এ সব কাজ একমাত্র আমার হলেও, এসব তোমার অর্জন করবার ক্ষমতা রইল। তিনি এই চালাকীর হুকুম দিয়ে রেখেছেন—তুমি তোমার ইচ্ছার দ্বারা যাকে নিজের দিকে টেনে নেবে, সে জিনিষ, সে কাজ তোমারি হবে।

তাই দান করতে হ'লে আগে নিজের করা চাই। তুলসীর পাতাকে জলাশয় দেখিয়ে দিলে তাকে কি জলদান করা বলে? জলাশয় থেকে যে-জল সংগ্রহ ক'রে এনেছিলে ঘরে, তা থেকে ভাগ দিলে তবেই তাকে বলব জলদান। নইলে জলাশয়ের জলও ভগবানের জল, তোমার ঘড়ার জলও সেই ভগবানের জল। আকাশের আলো দেখিয়ে তুমি কি বলতে পারো ঐ তুমি আলো দিলে, ঐ তুমি অন্ধকার দূর করলে? ও আলোকে আগে তুমি নিজের তো করনি, তাই ওকে দান করবার অধিকার তোমার নেই। তুমি তোমার শ্রমের দ্বারা মাটি খুঁড়ে তেল এনে, বা তোমার সঞ্চয়ের দ্বারা সেই তেল খরিদ ক'রে, তাতে যখন অগ্নি সংযোগ করো, সে আলো তোমার হ'ল। নইলে সব আলোই তো ভগবানের, তোমার আবার আলো কোথায়? তেমনি ধরো যে-কোনো একটি সৎকাজ। এটা করা না করা আমার ইচ্ছা। আমি তা করতে ইচ্ছা করতেও পারি, নাও পারি। যে-মুহূর্ত্তে তা করতে ইচ্ছা করলুম, আমার মন ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রগুলিকে সেদিকে নিয়োজিত করলুম,—তখন হ'তে সেই কাজ আমারি কাজ হতে থাকল, যদিও তা করছে ঈশ্বরের দেই যন্ত্রগুলি। আমার যা কিছু সম্বল সবই ঈশ্বরের, কেবল ঐ ইচ্ছাটি ছাড়া। তিনি আমার এই ইচ্ছাটির ওপর হস্তক্ষেপ করেন না, একে তিনি কোনো দিন জোর ক'রে কেড়ে নেন না, ভিক্ষা ক'রে নেন।

নিজের দিকে টানবার, নিজের করবার এই যে ইচ্ছা,—তাকে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কার আছে বলেই ত্যাগ আছে। ত্যাগ করতে হলে আগে নিজের দিকে টানা চাই। তাই অহঙ্কার নামক বিষ্টি যে

ভগবান বৃথা সৃষ্টি করেছেন একথা ভেবো না। যার অহঙ্কার নেই তার আত্মসংযম নেই, তার মনুষ্যত্বও নেই। মানুষ যে অহঙ্কারকে সযত্নে বিসর্জন দিয়ে জড়পদার্থের মতিন হ'য়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, এ শিক্ষা গীতার শিক্ষা নয়,—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। অহঙ্কার যখন প্রবলাকারে জাগা দেবে, তার আয়োজন-উপকরণের সঞ্চয়কে যখন পর্বতাকারে পুঞ্জ যখন ক'রে আনতে থাকবে, তখন তোমার অপরের প্রতি ভালবাসা যেন প্রবলতর হ'য়ে সেই স্তূপীকৃত আয়োজনকে, পুঞ্জীভূত শক্তিকে পরের মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে,—এই শিক্ষাই গীতার। তাই গীতা বলেছেন, কর্মেই তোমার অধিকার,—কাজ করবে কি না করবে এ ইচ্ছাটি একমাত্র তোমারি ইচ্ছা। তোমার এই ইচ্ছার, এই স্বাধীন ইচ্ছায় কারো হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা নেই। তোমার এই অধিকারকে, তোমার এই অহঙ্কারকে মনে মনে জাগিয়ে রেখো, ইচ্ছাশূন্য হ'য়ে, অহঙ্কারশূন্য হ'য়ে ইট পাথরের মতো জড়পদার্থ হ'য়ে যেও না, নৈষ্কর্ম্মের অহঙ্কারশূন্য স্তব্ধপথে তাকে বিলুপ্ত হ'তে দিও না,—তবেই তো ত্যাগের অধিকারী, মঙ্গল করবার অধিকার পাকা হবে।

এখন, কোন্ কাজে মঙ্গল হবে, কোন্ কাজে অমঙ্গল, এ কেমন ক'রে জানব? কে তার নির্দ্দেশ দেবে? নিঃস্বার্থ কাজই যে মঙ্গলের কাজ,—সব সময় এমন নয়। ভক্ত বলবেন যে-কাজ ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাই মঙ্গল। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রেত যে কোন্ কাজ—এ নিয়ে এক ভক্তের সঙ্গে আর এক ভক্তের লাঠালাঠি বেঁধে যেতে পারে। যাজনা বুদ্ধিরা মসজিদের ধারে রাস্তা দিয়ে প্রতিমা নিয়ে গেলে মঙ্গল হয় কি অমঙ্গল—এ দুই সম্প্রদায়ের ভক্তদের বিস্তর লাঠালাঠিতেও আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হল না। এক সম্প্রদায়ের ভক্তরা মঙ্গলের জন্যে অনাথার বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মেরেছেন, দেবী-প্রতিমার সামনে শত শত নরবলি দিয়েছেন, শিশুসন্তানদের সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আর এক সম্প্রদায়ের ভক্তরা বিধর্মীদের মন্দির চূর্ণ করেছেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেনি বলে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এ সব কাজকেই ভক্তরা ভেবেছেন ঈশ্বরাভিপ্রেত কাজ। এ সব কাজ নিঃস্বার্থ কাজ, কিন্তু মঙ্গলের কাজ নয়। স্বার্থ যেমন পরকে ঠকায়, নিঃস্বার্থতা তেমনি আপনাকে ঠকাতে পারে। আত্মপ্রবঞ্চনার মার থেকে মানুষকে বাঁচাবে কে? কোন্ পথে যে যথার্থ মঙ্গল, যথার্থ কল্যাণ, কে তা ব'লে দেবে?—মানুষের "স্বল্প মোহ বিমির্মুক্ত" বুদ্ধি, মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধি, মানুষের বিবেক, মানুষের reason, যাঁরা বলেন প্রশ্ন কোরো না, তর্ক কোরো না, কিছু জানতে চেয়ো না, শুধু চোখবুজে অন্ধ ভক্তিতে এই রকম ক'রে যাও, তাঁরা মানুষের বিবেককে মানেন না, মানুষের যুক্তি তর্ককে, জ্ঞানকে অস্বীকার করেন। এ পথ গীতার পথ নয়। গীতা বলেছেন, গহনা কর্ম্মনো গতিঃ—কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়, কোন্ কাজ যে কিসে গিয়ে যায়, কোন্‌টিতে মঙ্গল আর কোন্‌টিতে অমঙ্গল, তা জানা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম্মযোগিন বোদ্ধব্যং—কোন্ কাজ করা উচিত সেটি বেশ ভাল ক'রে বুঝে দেখতে হবে। "বোদ্ধব্যং"—বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। তাহলে কর্ম্ম নির্ব্বাচনের পথপ্রদর্শক অন্ধ ভক্তি নয়, জীর্ণ কুসংস্কার নয়, মোহ, ভ্রান্তি বা রিপুর তাড়না নয়,—বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ—ইন্দ্রিয়কে বড় বলা হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, মন ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ। আর সেই মনের চেয়েও বুদ্ধি বড়,—মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ। বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া—বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। পরমাত্মার নীচেই বুদ্ধির স্থান দিয়েছেন গীতা। অন্যান্য ইন্দ্রিয় মনেরই দাসত্ব করে, তাই ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন বড়। কিন্তু মন হ'ল "সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা" অন্তঃকরণ-বৃত্তি। মন একবার বলে এইটে করি, আবার বলে ঐটে করি। বুদ্ধি হল "নিশ্চয়াত্মিকা" অন্তঃকরণবৃত্তি। বুদ্ধিই স্থির ক'রে দেয় কোনটি করা উচিত। তাই বুদ্ধির স্থান এত উচ্চে নির্দ্দেশ করেছেন গীতা, শুধু এক পরমাত্মার নীচেই। এই বুদ্ধিই হল সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

আর জ্ঞান কি? অসংখ্য মাইল ব্যাপী বৃহদ্বের প্রজ্বলনে যেমন উজ্জ্বল দীপশিখা, অসংখ্য তারকার সম্মিলিত জ্যোতিঃকণার যেমন জ্যোৎস্না, অসংখ্য বিষয়ের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সমাবেশে তেমনি জ্ঞান। গীতা বলেছেন এই জ্ঞান অতি পবিত্র জিনিষ, এর মত পবিত্র আর কিছু ইহজগতে নেই—নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তাই গীতার কর্ম্মযোগ আর জ্ঞানযোগ হাতধরাধরি ক'রে চলেছে। তাই জ্ঞানীর এত আদর—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ।

"জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্"—গীতার মত, জ্ঞানী ঈশ্বরের আত্মস্বরূপ।

মঙ্গল যে কোন পথে আসবে, তা নির্দ্দেশ ক'রে দেবে এই জ্ঞান। এত বড় অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক আর কে আছে? মানুষ কতবার ভুল করেছে, কতবার ঠকেছে, অবশেষে এই বিংশশতাব্দীর ভুলে পৌঁছবার পথ থেকে এবার নিঃসংশয়ে বলতে আরম্ভ করেছে—reasonই একমাত্র নির্ভুল পথপ্রদর্শক। কিন্তু তার কত সহস্র বছর আগে সেই একথাই বলে গেছেন গীতা। মানুষ তা একবার ভেবেও দেখেনি।

যদি কোনো কাজ নিয়ে মনে কোনোদিন সংশয় আসে, যদি কোনোদিন মনে কোনো দ্বন্দ্ব বাঁধে,—এই কাজে মঙ্গল, না ঐ কাজে মঙ্গল,—গীতা বলেছেন,—অজ্ঞানতা যদি পথ ভোলায়, তাহ'লে হে ভারত, জ্ঞানের অসি দিয়ে তোমার সেই ভ্রান্তিকে, সেই মোহকে, সেই অজ্ঞানতা, সেই সংশয়কে যেমন ক'রে যথার্থ কর্ম্মযোগে, যথার্থ মঙ্গল কর্ম্মযোগে উঠে দাঁড়াও—

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।

মেড়ী-ইত্যাদি ব'লে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁরা শুনে আশ্বস্থিত হবেন নিশ্চয়ই, কোনো ধর্ম্ম সংস্কারকে, কোনো ধর্ম্মযাজক বা পুরোহিতের প্রত্যাদেশকে, কোনো শাস্ত্রের বচন বা বিধিনিষেধকে গীতা এ স্থান দেন নি—দিয়েছেন মানুষের সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত মোহমুক্ত বুদ্ধিকে, জ্ঞানকে। আশা যাঁরা আজিকেদের কাটিয় বজায় রাখতে যাওয়ার

সঙ্গে লড়াই ক'রে মরেন, সকল রকম মাচে-পড়া কুসংস্কার পূরণীবিত করতে চেষ্টিত, তাঁরাও শেষ ভুলে যা যান—সকল মঙ্গলের একমাত্র অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক মানুষের মোহমুক্ত বিবেক, মানুষের জ্ঞান।

এই জ্ঞান, এ বুদ্ধি যদি নিজের না থাকে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

প্রণিপাতের দ্বারা, পরিপ্রশ্নের দ্বারা, সেবার দ্বারা সেই জ্ঞানকে জানো। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দেবেন।

এই জ্ঞান যার হয়েছে, একটি সুন্দর লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। পাকা আমটিকে একপাশ সবুজ কলা পাতার মাঝে শুধু তার রঙ দেখলেই যেমন চিনে নেওয়া যায়, এও তেমনি। সে লক্ষণটি হচ্ছে এই—

যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।

সমস্ত ভূতগ্রাম নিজের আত্মাতে এবং ঈশ্বরে যদি দেখতে পাওয়া যায় তবেই বুঝতে হবে এই জ্ঞান লাভ হয়েছে।

এর মানে হল নিজের বিরে পরকে দেখাই আসল দেখা, নিজের বিরে পরকে জানাই আসল জানা। সকলের মধ্যে আমি আছি, আমাতে সবাই আছে, আমি এবং আর সকলে ভগবানে আছে,—এই জানাই হল শেষ জানা। নিজের বিরে যখন পরকে বুঝে দেখতে পারব, তখন তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার হৃদয় বিদ্ধ হবে। তোমার কষ্ট, তোমার শোক তখন আমারি কষ্ট, আমারি শোক। তোমার আনন্দে তখন আমারি আনন্দ। যে জ্ঞানে সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় সেই হ'ল বিশুদ্ধতম জ্ঞান। সেই জ্ঞানের চোখেই ঠিক চিনতে পারে কোন্ পথ মঙ্গলের পথ। যে মানুষে মানুষে ভেদ করে, আপন সম্প্রদায় বা ধর্মমতকেই নিজের মনে করে আর অন্যান্য সম্প্রদায়কে পর ভাবে, নিজের জাতিকে বা বর্ণকে ভাল—আর ভিন্ন জাতি বা বর্ণকে ইতর মনে করে, সে তো মানব-দ্বেষী, সে তো অবিবেকী, অজ্ঞানী,—কোন্ রূপে মঙ্গল মানবে সে কেমন ক'রে তা নির্দেশ করবে!

কী সুন্দর এই মঙ্গলের আবর্শটি, কী উদার, উন্নত এই মনোভাব! এই তো মানুষের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার পথ। এই আদর্শ হিন্দুর, এই আদর্শ হিন্দুর, নইলে আবার কিসের হিন্দুত্বের বড়াই করি! এই সর্বজাতি সর্বমানবের মঙ্গলই হিন্দুর শিবরূপে উপাস্য, এই বিশ্ব-হিত হিন্দুর ঘরে ঘরে শক্তিরূপে পূজিত। হিন্দুর শক্তি এই কল্যাণকারিণী শক্তি, তাই তিনি বরদাত্রী। আমাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সমস্তারে এই কল্যাণমন্ত্রই আরাধনা করেছেন, তাঁদের তপস্যা ছিল সর্বমানবের এই কল্যাণকেই অর্জন করার তপস্যা—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

কী অনির্বচনীয় এই নমস্কার! ঈশ্বরকে বন্দনা করেছেন তাঁরা সর্বমানবের কল্যাণতম রূপে,—সর্বমানবের কল্যাণকে অর্জন করার মানেই তাঁকে পাওয়া। এই কল্যাণেরও যেমন শেষ নেই, তাঁকে পাওয়ারও তেমনি শেষ নেই। তাই নমস্কার এই প্রণাম।

হে মৌন মৃত্তিকা

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

তাদের প্রথম বিরোধের কাহিনীতে নূতনত্ব আছে বই কি! বাগানের একাংশের আবর্জনা পরিষ্কার করে' ঠাকুরমা প্রস্তাব করলেন: লাউ লাগানো যাক। সত্যব্রত বাধা দিয়ে বলল: না, ফুলের গাছ এখানে হবে ভাল। আলো আছে, বাতাসও আছে।.....

প্রথম বিরোধের ইতিহাস এখানেই শেষ।

দীর্ঘ দিন পর এ গল্পের দ্বিতীয় ও শেষ অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। ঠাকুরমা আজও বেঁচে আছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যাত্রা করেন। কিন্তু তা শুধু মনে হওয়াই মাত্র। আবার তিনি উঠে দাঁড়ান। লাঠিতে ভর করে তিনি এগিয়ে যান। চাকরবাকরদের কর্তব্য-চ্যুতির জন্য তিরস্কার করেন। বড় নাতির বউ সুবর্ণা এক এক সময় বিদ্রূপ করে বলে: তোমার কি মরণ নাই, ঠাকুরমা।

কাত্যায়নী বলেন হতাশার সুরে: কি করব ভাই? চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে বোধহয় নামটি মুছে গেছে, তাই...

লাঠিতে ভর করে কাত্যায়নী এ ঘর থেকে ও ঘরে, ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে পূজামণ্ডপে যান। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে সবাইকে তিরস্কার করেন এবং কিছু পরে নিজেই চুপ করেন।

সুবর্ণা জিজ্ঞাসা করলে: কি হল, ঠাকুরমা?

—আর হয়েছে! সংসারই ডুবে গেল।

সুবর্ণা মৃদু হাস্য করে বললে: সংসার ডুবে যাচ্ছে, ক্ষতি কি? তুমি ভেসে থাকলেই ত হ'ল।

ঠাকুরমা বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন: চিরকাল ভেসে থাকার বিদ্যেটা আমার জানা আছে। তাই, এত দিন গেল, তবুও ডুবলাম না।

তাঁর কথাটা ঠিক। জীবনের এতটা পথ অতিক্রম করেছেন তিনি, এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু পেছনের অনেকটাই তিনি আজ ঠাওর করতে পারেন না। পথে পথে এত রইল পদরেখা, ঘটনায় ঘটনায় এত রইল স্বাক্ষর, তবু যেন চেনা যায় না। তারা বলে, ঠাকুরমার ভীমরতি ধরেছে। হয়ত, তাদের কথাই ঠিক। নইলে, কাত্যায়নীর সামনে, অনেকটা তাঁর হাতের উপর দিয়েই যে এ সংসারে এত পরিবর্তন এল, তা' তিনি ঠেকাতে পারলেন না কেন? বাড়ুয্যে-বাড়ির গিন্নি-ঠাকরুণ রূপে এত কাল তিনি যে কর্তৃত্ব করে এসেছেন, তাও ত নিতান্ত ভুঁয়া ছিল না। বাংলা-দেশের এক বনেদী জমিদার বংশ তাঁর চোখের সামনে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে তালুকদারে পরিণত হল। পূর্ব পুরুষের প্রজা ছিল মিত্তিরবংশ, তারাই মাত্র কয়েক বৎসর আগে জমিদারীর অধিকাংশ কিনে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাঁর আঙিনার পাশ দিয়ে চলে গেল, তা' তিনি ঠেকাতে পারলেন না।

ম্যানেজারবাবুকে ডেকে বলেছিলেন কাত্যায়নী: মিত্তিরদের এ বাজনা বন্ধ করতে ব'লো।

ম্যানেজার অনায়াসেই বললে: এ হুকুম তারা মানবে কেন?

কাত্যায়নী উঠে বসলেন। তাঁর চোখ দুটি জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বললেন: মানবে না! এ কথার অর্থ? আমি বলছি, তাদের এ বাজনা বন্ধ করতে হুকুম দাও তুমি! ম্যানেজার মৃদুহাস্য করে সরে গেল। অগত্যা তিনি ডেকে পাঠালেন সুব্রতকে। অভিমান করে বললেন: ম্যানেজারকে হুকুম করলেম, কিন্তু সে কথাটা গ্রাহ্যই করল না।

সুব্রতর ঠোঁটের কোণে বিবর্ণ হাসি। আস্তেই বললে: ম্যানেজার আমাদের কথা শুনবে কেন? সে এখন মিত্তিরদের কর্মচারী। মিত্তিরদের কাছারীতেই সে এখন চাকুরী করে।

কাত্যায়নী কথাটি মেনে নিলেন না। কিন্তু প্রতিবাদও করলেন না।

কিন্তু এটা শুধু কাহিনীর প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল—পাল বংশের লোকেরা বাড়ুয্যেদের জমিদারীর বাকি অর্ধাংশ নিলামে কিনে সদরে গিয়ে কাগজপত্র রেজিষ্ট্রি করে এল। সুবর্ণাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। জানতে চাইলেন: এ ছাড়া কি উপায় ছিল না?

সুবর্ণা অসহায় কণ্ঠে বললে: উপায় আর ছিল কোথায়? তাদের নগদ দশহাজার টাকা আমরা দেবো কোথা থেকে? তা' ছাড়া, তাদের ঋণ শোধ হয়ে যে বাকি কুড়ি হাজার টাকা ঘরে এল, আপাততঃ এটাই ত একটা লাভ।

জবাবের প্রত্যাশায় সুবর্ণা বৃদ্ধার দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য, সে মুখখানা একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সুবর্ণা সেই পাষাণমূর্তির দিকে একবার তাকাতেই কাত্যায়নী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন: আপাতত এটাই লাভ! কিন্তু আজ থেকে জমিদারের পুত্রবধূরূপে তোমার পরিচয় যে শেষ হয়ে গেল, সে কথাটা তুমি ভেবে দেখেছ? বড় লাভ হ'ল এই যে, কোম্পানীর আমল থেকে জমিদার বাড়ুয্যেরা কাল থেকে সাধারণ প্রজা সাধারণের সামিল হ'য়ে পড়ল।

সুবর্ণাকে আর কিছুমাত্র বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি দরজায় খিল দিলেন। বহুদিন আর তিনি অন্দর-মহল থেকে বাইরে এলেন না। সত্যই ত, কি পরিচয় নিয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়াবেন। তা' ছাড়া, তিনি যখন বাইরে এসে দাঁড়াবেন, তখনই হয়ত মিত্তিররা বা পালরা কোন একটা অছিলায় শোভাযাত্রা নিয়ে তাঁরই আঙিনার পাশ দিয়ে চলে যাবে। লোকে ইসারা করে বলবে, বাড়ুয্যেদের দুরবস্থাটা দেখেছ?

কিন্তু তথাপি এক একটি অনতর্ক মুহূর্তে তিনি বের হয়ে পড়েন। আঙিনা পার হয়ে তিনি দরোয়ানদের ঘরের পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ান। সেখান থেকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের ওধারে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের শ্যামল রেখা দেখা যায়। এককালে ঐ গ্রামের জমিদার তাঁরাই ছিলেন। কিন্তু গ্রাম ও হিজলবনের উপর দিয়ে একটি চারতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না কি?

তিনি অকস্মাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বাঁড়ুয্যেদের সেকেলে দোতলা বাড়িকে লজ্জা দেবে বলে মিত্তিররা যে চারতলা বাড়ি তৈরী করেছে, বাঁড়ুয্যে বাড়ির গিন্নি হয়ে তিনি সেদিকে তাকিয়ে থাকলে কি বাঁড়ুয্যে বাড়ির বিগত পুরুষকেই লজ্জা দেওয়া হয় না?

তিনি ছুটে চলে গেলেন সেখান থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে বন্দী হয়ে রইলেন। এ সংসারে সকল দিক থেকে আসছে বিদ্রূপ, আসছে নিঃশব্দ ভর্ৎসনা, বিগত কালের ঐশ্বর্য্যের মৃত আলোকে একালের মৈত্র উলঙ্গভাবে ধরা দেয়।

আবার একদিন তিনি বের হলেন। সুব্রতর ছেলে সত্যনারায়ণ গরমের ছুটিতে আসছে আজ সহর থেকে। সারা বাড়িতে তা' নিয়ে হৈ চৈ চলছে। সবার সঙ্গে কাত্যায়নীও গিয়ে দাঁড়াল। কোম্পানির আমলের জমিদারের বংশধর আজ পায়ে হেঁটেই ইষ্টিশান থেকে এল। এটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। তথাপি বিশ্বাস করতে হ'ল। কাত্যায়নী তাকালেন ছেলেটির দিকে। মুখের আদর্শটি ঠিক পিতার মতই হয়েছে। হবেই ত। বাঁড়ুয্যে বাড়ির আভিজাত্য তাদের চেহারাতেই প্রকাশ। মিত্তিররা বা পালেরা টাকার মালিক হতে পারে। দোতলা, তিনতলা বা দশতলা বাড়ি তুলতে পারে। কিন্তু চেহারার এ আভিজাত্য তারা পাবে কোথায়?

সত্যনারায়ণ সারা গাঁয়ে ঘুরে এসে। বললে: অনেক পরিবর্ত্তন দেখলাম। বাস্তবিক, গাঁটিকে চিনে নিতে আমার কষ্টই হ'ল।

অন্যেরা কথাটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করলে, তেমন কিছু মন্তব্যও করলে না। কিন্তু বৃদ্ধা একপাশে মুখ ঘুরিয়ে আপন মনেই বললেন: হাঁ, পরিবর্ত্তন হয়েছে বৈ কি। মিত্তিররা বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির পাশ দিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যায়। ধীরে ধীরে তিনি গেলেন সুব্রতর ঘরে। সামান্য দু একটি কথার উপর তিনি এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন। বললেন: বলছিলাম যা' সামান্য টাকা জমিদারী বিক্রী করে' পাওয়া গেল, তা' দিয়ে তোমরা আমার স্বামীর দোতলার উপর আরও অন্ততঃ তিনটি তলা খাড়া করে দাও। পালেদের চারতলার উর্দ্ধে আমার স্বামীর বাড়ির পাঁচতলা মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে, এ আমি দেখে যেতে চাই।

প্রস্তাবটি এমনই অসম্ভব যে সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু ঠিক সে সময় একটি স্প্রিংয়ের রেলগাড়ি হুইসেল দিতে দিতে ঘরে প্রবেশ করলে এবং তার পেছনে পেছনে সত্যনারায়ণও এসে হাজির হ'ল।

বৃদ্ধা অনুকম্পার দৃষ্টিতে খেলাটির দিকে তাকালেন। বললেন: আমাদের কালে এসব খেলাই ছিল না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে সত্যনারায়ণ বললে: আমাদের কালে আছে। "তোমাদের কালে ছিল না, আমাদের কালে আছে"—এই কথাটি দ্বারা ছেলেটি কি বিদ্রূপ করছে সে কালকেই, যে কাল মরে গেছে এবং যার প্রতীক হয়ে একমাত্র কাত্যায়নী বেঁচে আছেন? কিন্তু, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না এ যুগকে, এ যুগের মানুষকে। অকস্মাৎ রেলগাড়িটিকে খপ্ করে ধরে তিনি জানালার পথে ছুঁড়ে দিলেন এবং আবার কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

একটু পরে সত্যনারায়ণ জামা কাপড় পরে' বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই কাত্যায়নী তাকে বাধা দিলেন। জানতে চাইলেন: যাচ্ছ কোথায়?

—যাচ্ছি, একটা সভা আছে বিকালে। কাত্যায়নী বুঝতে পারলেন। সত্যনারায়ণ সহর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই এ বাড়িতে বহু লোকের আনাগোনা চল্‌ছে, তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। দৃঢ়ভাবে বললেন: কিন্তু, তুমি যে বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলে।

সত্যনারায়ণ কথাটিতে কান দিল না। তার পথের দিকে তাকিয়ে কাত্যায়নীর দৃষ্টি কাঁপতে লাগল। সুবর্ণাকে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। বললেন: সত্যনারায়ণকে বললুম, সবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলেদের মান থাকে না।

সুবর্ণা কৈফিয়তের সুরে বললে: ছেলেমানুষ, ওরা ও সমস্ত বোঝে না।

কাত্যায়নী চোখ দুটিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে দৃঢ়ভাবে বললেন: কিন্তু ওরা যে বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলে।

অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল প্রান্তরের দিকে। সেখানে বিরাট জনস্রোত দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতে বিচিত্র বর্ণের পতাকা, বিপুল ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে' তারা এগিয়ে আসছে। সবার সামনে প্রকাণ্ড একটি

পতাকা নিয়ে যে আসছে, সে সত্যনারায়ণ। কাত্যায়নী আর্ত্তনাদ করে উঠলো। বললেন: তোমরা থামাও ওকে। বলো নীলরতন বাঁড়ুয্যের বংশধরদের পক্ষে বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা অন্যায়, অপরাধ।

কিন্তু মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে পতাকা আন্দোলিত করে' তারা এদিকেই আসছে। কাত্যায়নীর স্বামীর ভিটের আঙিনায় এসে তারা প্রবেশ করলে বুঝি।

কাত্যায়নী আসন ছেড়ে উঠলেন। জানালার ও প্রাচীরের প্রত্যেকটি ছিদ্রপথ তিনি বন্ধ করে দিলেন। তাঁরই স্বামীর ভিটিতে বাজে লোকরা পতাকা নিয়ে এসে দাঁড়াবে, বক্তৃতা দিবে, তা তিনি সইবেন কেমন করে? জীবনে আজ প্রথমবার তিনি মৃত্যুকে কামনা করলেন। বাইরে চলেছে জীবনের কলোচ্ছ্বাস, জনতার বুকে বিপুল তরঙ্গ। কিন্তু তার জন্য কী? কাত্যায়নী এবার মৃত্যু চান, তাঁর প্রথম ও শেষ মৃত্যু।

বাইরের বক্তৃতা শেষ হয়েছে, জয়ধ্বনিও হয়েছে নীরব। কিন্তু ভিতরের একটি নিরাশ ও নিরুদ্ধ অন্ধকারে একটি ক্ষুব্ধ ফণিনী দংশনের জ্বালায় প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরছে। গভীর রাত্রিতে কাত্যায়নী বেরিয়ে এলেন। কি যে করবেন, তিনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু প্রতিশোধ নিতেই হ'বে—আর কিছুর উপর না হ'লেও নিজের উপর, বাঁড়ুয্যে বাড়ির বিগত দিনের প্রতীকের উপর প্রতিশোধ নিতেই হবে। বন্দিরের দ্বারে এসে তিনি দাঁড়ালেন, বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে দেখলেন···এই যুগের উপর, এই সংসারের উপর, বাঁড়ুয্যে বাড়ির মৃত গৌরবের উপর তিনি প্রতিশোধ নিবেন। তিনি এগিয়ে গেলেন, দিলেন বৈঠকখানার পেছনের দিকে আগুন ধরিয়ে,—ছড়িয়ে দিলেন তা' উত্তরের দিকের ফুলের বাগানে। বাঁড়ুয্যে বাড়ি মুছে যাক লুপ্ত হয়ে যাক ইতিহাস থেকে, কোন দুঃখ তিনি করবেন না। অগ্নিশিখা প্রসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে তা দিকে দিকে। এবার তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

কাত্যায়নী এখনও বেঁচে আছেন। স্বেচ্ছাকৃত বন্দী জীবনে কেউ তাঁকে বাধা দেয় না। বন্ধ কুঠুরীতে বসে তিনি ভাবেন শুধু সে দিনের কথাই—যেদিন পাইক বরকন্দাজরা সারারাত টহল দিয়ে বেড়াত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজাত—সেদিন কি আবার আসছে না? কিটনে চড়ে' জমিদার বাড়ির ছেলেরা ইষ্টিশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পাড়ার লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে—এ কি নিতান্তই অসম্ভব?

বহু আশা করে তিনি জানালাটির সামান্য একটু খুললেন। হায়রে, এ তিনি করেছেন কি? তাঁর স্বামীর ভিটেতে আগুন দিয়েছেন তিনি—একে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন তিনিই! তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন, বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। বৈঠকখানার চিহ্নমাত্রও নাই, কতকগুলি ইট-পাটকেল ও ছাইভস্ম পড়ে আছে।

অকস্মাৎ একটি জিনিষ তাঁর চোখে পড়ল। কাত্যায়নী সেটাকে টেনে তুলে নিলেন। নেড়ে চেড়ে দেখলেন ভাল করে', তারপর ছুঁড়ে দিলেন জঙ্গলের দিকে।

এটি তাঁর স্বামীর গড়গড়ার নল। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে সেটা গিয়ে পড়ল, বুঝা গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্য, অকস্মাৎ তাঁর চোখে জল নেমে এল।··· অনেক ইতিহাস, অনেক কথা, অনেক কিছু যা' মরে গেছে, যা' চলে' গেছে।

আবার ভস্মস্তূপের মধ্যে তিনি হাতড়ে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। কি যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি তা' জানেন না। একটা ভাঙ্গা বাক্স, কাত্যায়নী লাঠির ঠেলা দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হলেন দেখে, বাক্সের নিচে অনেকটা বায়গা জুড়ে কতকগুলি তৃণাঙ্কুর মাটি ভেদ করে আজ উঠে এসেছে। কাত্যায়নী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, লতা কি দুর্ব্বাদল, বুঝা গেল না। কিন্তু একটি নূতন ইতিহাসের আবির্ভাব, প্রাণের প্রথম কলরব।

কাত্যায়নী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ইচ্ছা হ'ল, সবাইকে ডেকে এটা দেখান। হবেই ত, এ মাটি যে বাঁড়ুয্যে বাড়ির, এ মাটি কোনদিন পোড়ানো যায় না। এখানে প্রাণের আবরণ শুধু বিস্মৃত অতীতের সাক্ষী নয়, জাগ্রত ভবিষ্যতেরও।

কাত্যায়নী আবার অচঞ্চল দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

শূন্যপথে কলিকাতা—নাগপুর—বম্বে

"বিহঙ্গ"

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৬। কুয়াশা-ঢাকা কলকাতার বুকের উপর দিয়ে রাত্রি ৪।০টায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে পৌঁছলাম। রাস্তাগুলি নিস্প্রাণ, তার আলোগুলি মৃতের চোখের মত পাণ্ডুর, কিন্তু হোটেলের লাউঞ্জ আর পোর্টিকো তীব্র আলোর দ্যুতিতে উজ্জ্বল, প্রাণ-চঞ্চল। গভীর নিশীথ অবধি এই লাউঞ্জ নৃত্য-বিলাসিনীদের চটুল পদাঘাতে মর্ম্মরিত হোয়ে এখন ভ্রমণ-বিলাসীদের মিলন-কেন্দ্র হোয়েছে। সামনের রাস্তায় টাটা এয়ার লাইনের অভিজাত এ্যম্বিসিডার-বডি বাস অপেক্ষমান—লাউঞ্জের ভিতরে বাহিরে যাত্রী ইতস্ততঃ বিচরণ কোরছে, কেউ বা ইতিমধ্যে প্রভাতী সংবাদপত্রে সেয়ারের বাজারের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। সকলের ওজন নেওয়া হোল ছাই হংএর সৌখীন ওজন কাঁটায়, মাল-পত্রগুলিও ওজন হোল। যাদের ওজন নির্দ্দেশিত ওজন সীমা লঙ্ঘন কোরল, তারা বিলাতী ওয়ালেট খুলে, নোট হেলা ভরে ছুঁড়ে দিল "কিলো" হিসাবে মাশুল। হাওড়া ষ্টেশনের কোলাহল নেই, সেই কুলীদের হেঁড়াহেঁড়ি, কাজ এগিয়ে চলেছে বিহ্যৎ-

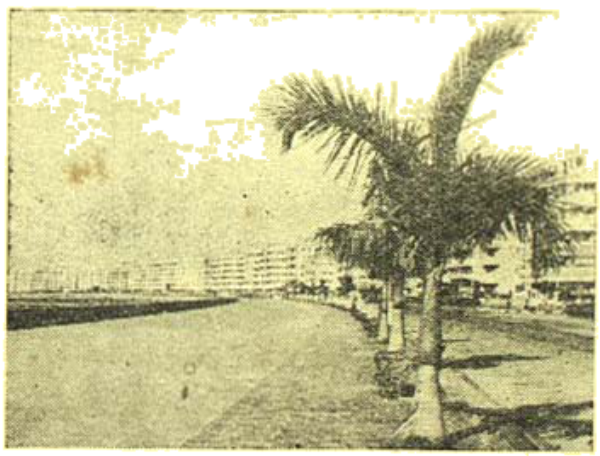

মেরিণ লাইনস্—বম্বে

গতির মত। সকল যাত্রীকে একটা করে কুপন দেওয়া হোল, ঘরঘর বিমান-ঘাঁটিতে চা-পানের জন্যে। ৫টা বাজতে ১০ মিঃ আগে বাসে ওঠার সঙ্কেত দেওয়া হোল। ঠিক ৫টায় আবছা আঁধারে বাস ঘরঘর বিমান-ঘাঁটির উদ্দেশে যাত্রা কোরল। যারা বাসে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে ছেড়ে পরমাত্মীয়, তারা নিজেদের লিমোসিন গাড়ী কোরে মাটীর উপর দিয়ে ৩০ মাইল পাড়ি ঘরঘর বিমান-ক্ষেত্রে উড়ে গেল।

কাঁচের পর্দ্দা ঘেরা আর নরম গদি মোড়া বাস হাল্কার গতিতে ঘরঘর বিমান-ঘাঁটিতে এসে পোষা বিড়ালের মত নিঃশব্দে দাঁড়াল। বাক্যহীন যাত্রীদল, সিগার, সিগারেট এবং পাইপ মুখে অল্প পদবিক্ষেপে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল।

বাইরে আঁধার ফিকে হোতে আরম্ভ হোয়েছে, বিমান-ঘাঁটীর প্রাসাদের ভিতর হাজার হাজার বাতি সূর্য্যকে ম্লান কোরেছে। কুপন দিয়ে প্রাতঃ চা খাওয়া হোল। পরম জল বং ফিকে হলদে, খাব নাই। সকলেই মুখ চাওয়া-চাই কোরে নিঃশব্দে পেয়ালা নিঃশেষ কোরলেন।

কিন্তু সময় হাতে আছে। লাউঞ্জে ইতস্ততঃ বিচরণ কোরে ফিরে পড়া গেল আমাদের আকাশ পাখীর উদ্দেশে। ডাইনে বাঁয়ে সোজা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে দর্শন পাওয়া গেল অবশেষে। বৃহৎ দুটী পাখা ডানা মেলে ক্লান্ত পাখী এটী শান্ত চরণ মাটীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রামে নিচ্ছে। আহাঃ! আবার এখুনি যাত্রা সুরু অসীম নীলাকাশে—

—কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কী পাও
তারি সুর মিঠাই উধাও—

একজন ইউনিফর্ম্ম-পরা লোক নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন—শুধালাম এইটি কী বম্বে যাবে?—কিন্তু লোকজন দেখছি না কেন! তিনি ব্যস্ত ভাবে

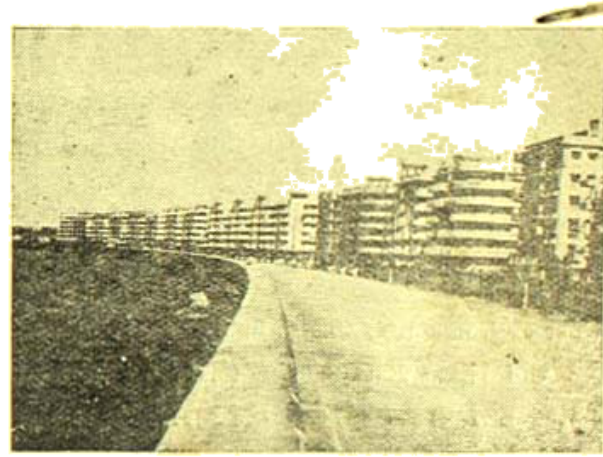

অপর একটি দৃশ্য···মেরিণ লাইনস্—বম্বে

কহেন—না, না, এটা Far East যাবে—বম্বের পাখী ঐ ঐ দিকে (হাত দিয়ে দেখালেন)—ছাড়ল বেলে।

কবিতা শুখিয়ে গিয়েছিল, গায়ের গতি তীব্র কোরতে হোল। ওভার কোট, গরম কোট, সোয়েটার ও গরম পেন্সীর তলায় দেহ ঘেমে উঠল, ঐ যে এসে পড়েছি, মেঘের তলায় রং বেরঙএর লোক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—এখনও দাঁড়িয়ে আছে—মাইলঃ।

—ওরে বিহঙ্গ, বিহঙ্গ মোর,
অয়ি, বন্ধ কোরো না পাখা—

কিন্তু কাছে এসে বুকটা আবার ধক্ করে উঠল। এঁরা যাঁরা ধাড়িয়ে তাঁদের কাউকে হোটেলে বা বাসে তো দেখিনি—

—এটা কী বন্দে যাবে? জিজ্ঞাসা কোরলাম একজনকে।—

—না, না, এটা চালনা যাইত, ঐ যে ঐ দিকে বম্বে মেল একুণি চালনা যোগে, যোড়ুব।

ঘড়িতে দেখলাম, ৯টা বাজে বাজে, দৌড়ুতেই হোল। বাক্স এসে গিয়েছে। তখনও লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছে। আমরাও উঠলুম এবং ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের দরজা বন্ধ হোল।

ভিতরে পরিপাটী ব্যবস্থা। মাঝ দিয়ে কার্পেট মোড়া রাস্তা—দুধিকে বসবার সোফা। একটাতে গা ঢেলে দিলুম, সর্ব্বাঙ্গ আরামে ভুবে গেল। পাশে আয়না, কাঁচ দিয়ে মোড়া, সৌখীন নীল পরদা দিয়ে ঢাকা। পরদা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। ট্রেনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোয়ে গিয়েছে, তারই ইঞ্জিন গর্জ্জন কোরছে। "Fasten your belt, please" কানের কাছে একটি মিষ্টি স্বর শুনলাম মুখ ফিরিয়ে দেখি

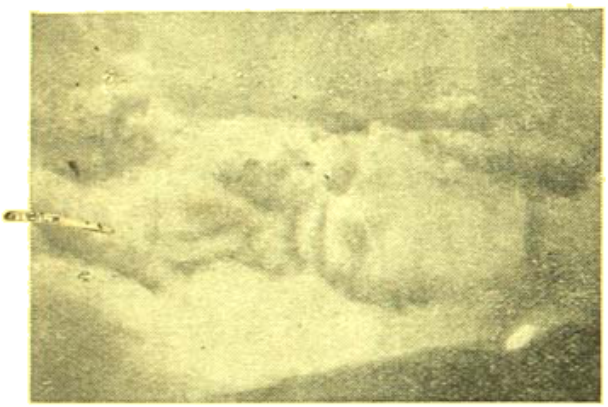

মেয়েলোকে

একটি তরুণী, নীল-সার্জ্জের পোষাক, মাথায় নীল ঝাঁকা টুপী, চোখে মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে, সোফার সঙ্গে যে চামড়ার বেল্টটী সংলগ্ন আছে তা যেন কোমরের সঙ্গে আটকে নেই। এরকম বেল্টটীর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কৈফোরে কলেজ পালিয়ে যে জীপলীঙ্কে শুয়ে চকোর দিয়েছিলাম—তাতে না ছিল সোফা, না কিছু কার্পেট মোড়া রাস্তা, না মাথার উপর আস্তরণ, তখন বাঁধতে হয়েছিল নিজেকে পিছমোড়া কোরে বসবার আসনের সঙ্গে, মাথায় পরতে হয়েছিল চামড়ার টুপি ও চোখে মোটা কাঁচের চশমা—

মুচকি হেসে আবার জিজ্ঞাসিত হোল—আমি আপনাকে সাহায্য কোরছি। দুটি শুভ্র হাত, আঙুলগুলি নিখুঁত ম্যানিকিউর করা, ক্ষিপ্রগতিতে আমাকে বসবার আসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোমর বেল্টটীতে আবদ্ধ করে দিল। ট্রেন এতক্ষণে Taxi অর্থাৎ মাটীর উপর দিয়ে দৌড়ুতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এবার হঠাৎ একটু মৃদু আলোড়ন—একটা ঈষৎ কোমল ধাক্কা, যা কোথাও কখনো না থাকলে সভয়ে পর্য্যবসিত হোত, অনুভব কোরলাম। বাইরে চেয়ে দেখি শূন্যে উঠে গিয়েছি এবং মাটীর পৃথিবী দূরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। পূব আকাশে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে তপনদেব দৈনন্দিন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উপরে উঠ্‌ছেন—ম্লান, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। নাই সেই বর্ণালীর উজ্জ্বলতা যা দৃষ্টিগোচর হয় হিমালয় শিখর হোতে, নাই সেই চমকপ্রদ ঘরিতগতি যা প্রতিফলিত হয় সাগর নীলিমায়। আমাদের আকাশ-রথ এবার সূর্য্যকে পিছনে ফেলে পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে এগিয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণে আমরা ২০০০ ফিট উপরে উঠে পড়েছি—নীচে বাঁদিকে বালী ব্রিজ রেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী শুভ্র উপবীতের মত ধরিত্রীর বক্ষ বেষ্টন করে আছে। আমাদের রথ বাজ পাখীর মত উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে উঠে অসীম নীলাকাশে দুটী শুভ্র পাখা বিস্তার করে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথের উপর দিয়ে রাজহংসের মত ভেসে যেতে লাগল। বাহিরে এটী ইঞ্জিনের বিকট গর্জ্জন কাঁচের পর্দ্দার বারে বারে ব্যাহত হোয়ে ভিতরে মৃদু গুঞ্জনে প্রবেশ কোরছে

মেয়েলোকে

যেন ভ্রমরবধূর একটানা শুরুগম্ভীর জীবন-যাপনা। নীচে বহু নীচে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা প্রাকৃতিক সম্ভার নিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছে। বিশাল বনস্পতি, অনুন্নত জনতাতার ঘরবাড়ির মত ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠে নয়নের অগোচরে আবার সরে যাচ্ছে।

এ যেন প্রকৃতিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নিরীক্ষণ করা, এ যেন ক্ষুদ্র অবহেলা ভরে উপর থেকে নীচে দৃষ্টিপাত করা, এ যেন দূরবীক্ষণকে উল্টে ধরে বড় জিনিষকে ছোট করে দেখা।

এবার ভিতরে মজর দিলাম। দেখি যাত্রীদল অধিকাংশই আমাদের মত বাইরের দৃশ্য দেখছেন। কেউ কেউ বা ইতিমধ্যে কম্বল নিজেদের চেকে, সোফার বদলে শুভ্র পড়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা যায় তার চেষ্টা কোরছেন। এই কম্বল রেলের জন্যেই থাকে, বসবার আসনের

উপরদিকে সংশ্লিষ্ট তাকের ভিতর। আমাদের গরম বোধ হচ্ছিল, কম্বল তো দরকার হোলই না, উপরন্তু ওভারকোট ও গরম কোটও খুলে রাখলাম। প্লেনের ভিতর টেম্পারেচার control করা হয়, বাইরের হাওয়ার প্রবেশ পথ নিষিদ্ধ, কেবল মাথার উপর একটি সঙ্কীর্ণ বায়ুর পথ দ্বারা ইচ্ছামত হাওয়া পাওয়া যায়। আবার বাইরে তাকালাম—আমাদের প্লেন দুটি রজত শুভ্র ডানা মেলে হংসবলাকার মত একতালে উড়ে চলেছে। বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম—আমাদের উচ্চতা কত হবে? কতই বা গতিবেগ—একখানি সুদৃশ্য কার্ড সামনের আসনে; উপবিষ্ট যাত্রিণীর নিকট থেকে চালান পেলাম। দেখি,—কার্ডখানা আসলে আমাদের পাইলটের নিকট থেকে, তাতে লেখা আছে আমরা তখন মধ্যপ্রদেশের বড়দুখড়ায় উড়ে যাচ্ছি, আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭০ মাইল, আমাদের উচ্চতা ৫০০০ ফিট এবং আমরা ঠিকই পৌঁছিব নাগপুরে, ঠিক বেলা ১০টায়। কৌতূহল নিবৃত্ত হোল, বড় আরামবোধ হোল। কার্ডখানা পিছনদিকে চালান দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম।

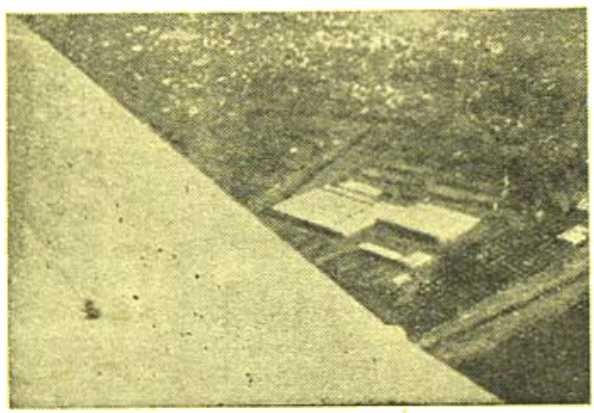

বিমান হ'তে নাগপুরের দৃশ্য

এখনও মাটি দেখা যাচ্ছে, গাছপালার রং বোঝা যাচ্ছে। ভাবি—প্লেনের গতিবেগ এত প্রখর কেন, উহাকে কি চক্ষের পলকে পৃথিবী পরিক্রমার আর দেরী কত? উর্দ্ধে আরো উর্দ্ধে উঠে চাঁদের দেশে যেতেই বা আপত্তি কী?

কানের কাছে আবার সুমিষ্ট কথা বেজে উঠল, আপনার কী ম্যাগাজিন চাই? Life? Esquare? Punch কিম্বা Tatler?

মুখ ফিরিয়ে দেখি আমাদের হষ্টেস্ একগাদা বিলাতী ও আমেরিকান সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা নিয়ে হাস্যমুখে দণ্ডায়মানা। ধন্যবাদ দিয়ে একখানি Readers Digest বেছে নিলাম। এবার মাথাটা একটু বাঁকিয়ে, চুপিটি বেঁকিয়ে, নয়নে ঝিলিক ছুটিয়ে হষ্টেস্ জিজ্ঞাসা কোরলেন—স্কচ্ না টফি? অন্তরের গভীর কন্দরে লুক্কায়িত অনাদিকালের চিরন্তন শিশু মুখপত্র আনন্দ ও বিস্ময়ে হস্তীগ কণ্ঠেসে জন্য চীৎকার করে উঠলেও গম্ভীরভাবে বললাম টফি। মৃদু হেসেকালন করে গৃহকর্ত্রী দুটি টফি আমার হাতে দিলেন। আবার ধন্যবাদ দিলাম এবং টফি দুটি গালে ফেলে Digestএর একটি সুরাভিজের মনোরম কাহিনীর মধ্যে মনোনিবেশ করলাম। সুখের বিষয় তাহার তিনি লিখে গিয়েছেন কেমন করে সুরার মাধ্যমে ছিন্ন কোরে সুরাকে তিনি নিজের দাস কোরলেন—নিজে সুরার দাস হোলেন না। আবার পরীক্ষে একটি কল্পন, একটু শিহরণ অনুভব কোরলাম, প্লেনের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল Fasten your belt please। এবার আর কারুর সাহায্য দরকার হোল না। নিজেই নিজেকে কোমর বেষ্টনীতে বেষ্টন করে বাইরে চেয়ে দেখি আমরা নাগপুরের উপরে এসে পড়েছি—নীচে বিস্তর ঘরবাড়ী ও কলকারখানা ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হোয়ে উঠছে, আমরা মাধ্যাকর্ষণের টানে ক্রমে নীচে নামছি। ঠিক ১০টায় আমাদের প্লেন, মাটি ছুঁলো।

সকলেই নেমে সুরের একটা বাড়ী লক্ষ্য কোরে চলতে লাগলেন, অর্থাৎ দৌড়তে লাগলেন। আমাদের গৃহকর্ত্রী ও পাইলটরয় বাদ গেলেন না। বুঝতে কষ্ট হোল না এখানেই আছে, জীবন-বাঁচনের

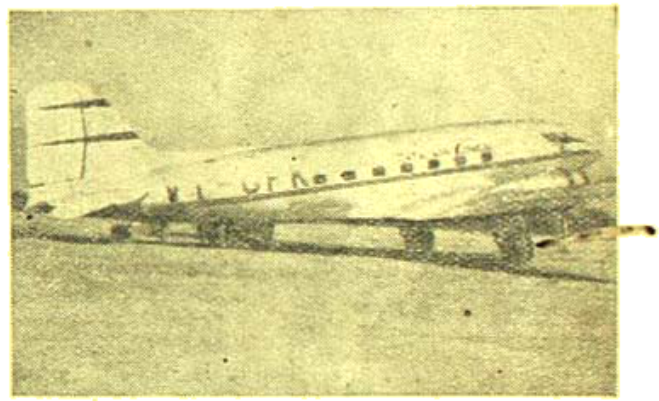

আমাদের আকাশযান

সোনার-কাঠি, অর্থাৎ খাদ্য ভাণ্ডার ও পানীয় সম্ভার। আমরাও পিছু নিলাম। খানিকটা বেশ মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হয়, মাথার উপর মার্ত্তণ্ডদেব প্রায় মধ্যগগন থেকে মধ্যাহ্নাভিমুখে আগুন ছড়াচ্ছেন। যাক্, গিয়ে টেবিলে বসা গেল। নাগপুরি কলা আর কমলা লেবু টেবিলের উপর সাজানো আছে। অন্যান্য সকলের ইতিমধ্যে অর্দ্ধ ভোজন হয়ে গিয়েছে। আমাদের খাবারের প্লেটগুলিও বেয়ারা ম্যাজিকের মত করে দিয়ে গেল, আমরাও বিনা বাক্যে ভোজনে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর আমরা সিগারেট ধ্বংসে মনোনিবেশ করলাম—এবং যেহেতু প্লেনে থাকাকালীন ধূমপান নিষিদ্ধ, সেহেতু অতীত এবং ভবিষ্যতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বর্ত্তমানকে ভস্মীভূত কোরতে লাগলাম।

১০।৪০ মিঃ আমাদের প্লেন আবার গর্জ্জন কোরে নাগপুর ছাড়ল। আর নতুনত্ব নাই, তাই অজানাকে জানার আশঙ্কা আর উদগ্রীব কৌতূহল। Hostess আবার ঘুরে ঘুরে কাউকে Coffee কাউকে Sweet Drinks দিলেন। যাত্রীরাও ধারে ধারে (প্রয়োজন না থাকলেও) Toilet-এ আনাগোনা কোরতে আরম্ভ কোরল। আরামপ্রদ

নৌকা এবার যেন ফ্লাস্টিকের হোয়ে উঠছে। আমার দুই বন্ধু তাস খেলায় মনোনিবেশ করলেন। হষ্টেল তাঁদের এক প্যাকেট নূতন তাস দিয়েছেন।

বাইরে তাকালাম। মার্তণ্ডদেব মধ্যগগনে। আমরা এবার অনেক উঁচুতে উঠেছি। এখন যত যত শাদা মেঘ পাল তোলা নৌকার মত আমাদের আশে পাশে ভেসে চলেছে। প্লাইমিটর কার্ড থেকে জানা গেল আমরা যখন প্রবেশের 'ওকালা'র উপর দিয়ে যাচ্ছি, উচ্চতা ৮০০০ ফিট, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭৮ মাইল। মাথার উপর যান্ত্রিক পথ ঘুরিয়ে ৮০০০ ফিট উপরের হাওয়া মাথায় লাগালাম।

এবার আমরা প্রকৃত মেঘলোকে প্রবেশ করলাম।

নীচে ধরণীর চিহ্ন মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। দিকে দিকে সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত নীলাকাশের পটভূমিকায় মেঘের বৈচিত্র্য অপরূপ মহিমায় ফুটে উঠতে লাগল। মেঘে মেঘে যে রঙ্গলোকের সৃষ্টি হোল, তাতে প্রতিফলিত দেখলাম—সর্ব্বংসহা ভারত মাতার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল ধান-দুর্ব্বা বৃক্ষ, অরণ্যানী গিরি-পুঞ্জ···। হঠাৎ একটি বিশাল মসীকৃষ্ণ ভয়াল-কালো মেঘের চাপ বৈদ্যুতের মত ঝলসা দিয়ে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমাদের রথ ছুটে উঠল, মনে হল শূন্য পথে পাহাড়ের গুহ্যের মাঝে প্রবেশ করেছি, এমনিই অন্ধকার, কিন্তু নিমেষে দুটী শাণিত ডানার অন্যুঘাতে এই কালো মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে আমাদের রথ আবার আলোর আলোকপুরীর মাঝে প্রবেশ কোরল।

মেঘের কাছাকাছি এসে পড়েছি, ঘড়িতে ১টা বেজেছে, আর বাকী ৪০ মিঃ। হষ্টেল বইগুলো কেরৎ নিয়ে গেল। যেন অল্প অল্প শিহরণ লাগতে আরম্ভ কোরেছে, একটু একটু দোলন লাগছে। দূরে পশ্চিম ঘাটের শৈলমালা দেখা যাচ্ছে। ১।৩০ মিঃএ মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া হোল, যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই পৌঁছে গেছে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটার কাঁটায় না চললে থাকবে না কোন মর্য্যাদা। কাজেই ১০ মিঃ এদিক ওদিক কোরে ১।৪০ মিঃ আমাদের বিহঙ্গ রথে হতে ১৪ মাইল দূরে বুদ্ধর মাটী ছুঁলো।

বাঁধ-ভাঙা

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী এম-এ

বর্ষার মধুরাক্ষী। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে শক্ত মাটির আস্তরণকে—তাই ঘটেছে স্তর-বিপর্যয়। তাই ভাঙনটাই চোখে পড়ে—ভাঙার প্রাবল্যে সংগঠনা বৃত্তিটা লোপ পেয়েছে কালিন্দীর।

পালেদের ভাঙা বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে মধুরাক্ষীর ধারে। সেখানেও ভাঙনের আস্তানা। বাড়ীটা এককালে বড় ছিল। কয়েক কাঠা জমী বাড়ীর সঙ্গে লাগোয়া—এককালে বুঝি বাগান ছিল। এখন সেখানে হেলে-পড়া বাড়ীটার ইঁট কাঠ ছড়ানো। সামনের দিকের মহলটার খান তিনেক ঘর এখনো কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই বর্ত্তমানে পালবংশীয়দের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ মাথা গোঁজবার ঠাঁই। অধুনাতন অপ্রাচুর্য প্রাক্তন-প্রাচুর্যকে পরাভূত করেছে, তার নিদর্শন এ বাড়ীর সর্বাঙ্গে। আর অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের মতই এ বাড়ীতে লক্ষ্মীর সতারাত নেই, কিন্তু মা ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টি আছে পুরোমাত্রায়। সর্বসাকুল্যে বাড়ীর জনসংখ্যা দশ। কর্ত্তা চরণদাস ও গিন্নী মোক্ষদাসুন্দরী ছাড়া আটটি প্রাণী তাঁদেরই সপত্য, ভবিষ্যৎ বংশধর। তাঁরাই করবেন ভাবী কালের কাছে চরণদাস ও মোক্ষদাসুন্দরীর প্রতিনিধিত্ব। চরণদাসের আয় সামান্য, জমীজমার ধান। তাই দিয়ে ত আর এতগুলি প্রাণীর ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নয়। সুতরাং অবস্থাটা বেশ জটিল এবং করুণ। তার ওপর বড় ছেলে কৈলাসনাথ কলকাতার কোন কাগজের কলে শিক্ষানবীশ। তাকেও কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। বোঝার ওপরে শাকের আঁটি আর কি।

চরণদাসের বাড়ীর মাথায় ক্ল্যাগষ্টাফ। বিদেশের মধ্যে প্রকৃতির বেহিসেবী খেয়াল। একটা অশথ গাছ বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে গৃহস্থের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে। তার মাথায় ব'সে কাক ডাকে। গাও চিল উড়ে এসে বসে, তারপরে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় নদীর বুকে। সেদিন সকালে হঠাৎ কৈলাসনাথ এসে হাজির। বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেল। খবর আছে, সুখবর। কৈলাসনাথের কাগজের কলের ম্যানেজার না কি বলেছে যে, আগামী মাস থেকে কৈলাসনাথের কাজ হ'বে, সে মাইনে পাবে। সারা বাড়ীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। ভাই বোনেরা হুটোপুটি লাগিয়ে দিল। দাদার কাজ হ'লে কে কি নেবে, তারই

ফিরিস্তি করতে ব'সে গেল তারা। মা মোক্ষদাসুন্দরী তুলসীতলায় হরির লুট দেবার কথা জানালেন তাঁর অন্তরের ঠাকুরকে। কর্ত্তা চরণদাস ভাবেন, চক্রের জমিটা তা'হলে ফিরিয়ে আনবার একটা ব্যবস্থা হ'তে পারবে। বাড়ীর আবহাওয়া বেশ খানিকটা তাতিয়ে দিয়ে ফিরে গেল কৈলাসনাথ তার কলকাতার আলোহাওয়াশূন্য মেসের ঘরে।

বেচারী কৈলাসনাথ। জ্ঞান হ'য়ে পর্যন্ত সে দেখেছে একটানা দারিদ্র্য। কখনো স্বাচ্ছন্দ্য সে তাদের ঘরে দেখেনি। তাই ছাত্রজীবনের শেষে অকালে ছেদ টেনে দিয়ে সে কলকাতায় এসেছিল অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায়। ঢুকেছিল একটা কাগজের কলে তারই গাঁয়ের ভটচাজ্জি ম'শায়ের সুপারিসে। কিন্তু পয়সা সে রোজগার করতে পারে নি এখনো। তাকে কাজ শিখতে হয়—বেগার দিতে হয়। কর্তৃপক্ষ তার পরিশ্রম অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করছে, কিন্তু কৈলাসনাথ তার ন্যায্য প্রাপ্য চাইলেই তাকে বলা হয়, তোমার অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে আমাদের কারখানার কোন কাজই হয় না। সুতরাং তোমায় পয়সা দেওয়া চলে না। নিরুপায় কৈলাসনাথ। সে নিজে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে এবং আরো সহ্য করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু তার বাপ, মা, ভাই বোনদের সে যে কিছু সাহায্য করতে চায়। তাদের দুঃখ অন্তত কিছুটাও লাঘব সে করতে চায়। কিন্তু সে তা' পারে না। রাতের গাঢ় আঁধারে খদ্যোতের আলো দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

তাই এবার যখন ম্যানেজার তাকে জানিয়েছিল যে আগামী মাস থেকে সে মাইনে পাবে, তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হ'বে, তখন সে ছুটে গিয়েছিল তার প্রিয়পরিজনদের মাঝে, তাদেরকে জানিয়েছিল এই সুসংবাদ। অবশ্য ম্যানেজার তাকে জানায়নি তার বেতনের পরিমাণ। তা' না জানাক্, তাতে কিছু আসে যায় না কৈলাসনাথের। যা-ই সে পাক্, তা'তে অন্তত: নিজের খরচটাও চলবে। তার বাবাকে আর কর্জ্জ ক'রে তা'কে টাকা পাঠাতে হ'বে না? কৈলাসনাথ নিশ্চিন্ত হল।

আসবার সময় মা বলেছিলেন কৈলাসনাথকে চিঠি দিতে। নিয়োগপত্র পেলেই যেন কৈলাসনাথ বেতনের পরিমাণ উল্লেখ ক'রে চিঠি দেয়। কৈলাসনাথ মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল 'তাই করবো মা। 'টেলিগ্রাম করবো।' বেশী খরচের ভয়ে চরণদাস আপত্তি জানিয়েছিল, বলেছিল 'চিঠিই লিখো বাবা, তারে কাজ নেই।' কৈলাসনাথ ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল বাবার এই কার্পণ্যে। অন্তত: একটি দিনের জন্যেও কৈলাসনাথ তাদের দারিদ্র্য ভুলতে চায়। সেদিনটি তার নিয়োগপত্র প্রাপ্তির দিন। মায়ের চোখ এড়ায়নি পুত্রের এই ক্ষুণ্ণ মুখের ছবি। তিনি জোর ক'রে বলেছিলেন 'না, তারই ক'রো। চিঠি আসতে বড় দেরী হয়।' অগত্যা চরণদাসকে সময় দিতে হ'য়েছিল।

সে এক ঝড়ের রাত। সারা রাত ধ'রে ময়ূরাক্ষীর জলে সে কী উন্মত্ত তাণ্ডব! ভীষণ গর্জ্জনে রাক্ষসী ভেঙেছে তার সীমারেখা, মাটির বুকে অনধিকার প্রবেশ করেছে। জল ঝরেছে, ঝড় ব'য়েছে—গো গো শব্দে নদীর বুক থেকে জোলো ঝড় ছুটে এসে ঘা দিয়েছে চরণদাসের জীর্ণ ঘরের দেওয়ালে। থর থর ক'রে দেওয়ালগুলো কেঁপে উঠেছে, বুঝিবা ভেঙে প'ড়ে যায়! এতদিনের খ'সে-না-যাওয়া চুণ বালি ঝরঝর ক'রে খ'সে পড়ে গেছে। ছাদের ফাটল দিয়ে অবিশ্রান্ত জলধারা গড়িয়ে পড়েছে ঘরের সব ক'টি প্রাণীর গায়ে। সবাই জেগে। দুঃখের বরষায় সে ধারাসম্পাত তারা নিঃশব্দে গ্রহণ করেছিল বিনা প্রতিবাদে। এতে তারা অভ্যস্ত। দুঃখ দিয়ে তাদের জীবন গড়া হ'য়েছে, তারা এত সামান্যতেই বিচলিত হয় না, অভিযোগ জানায় না অদৃশ্য দেবতার কাছে বা অদৃষ্টলিপির বিরুদ্ধে। তারা জানে, সে অভিযোগ কেউ শোনে না, কেউ তার প্রতিকার করে না। সবাই চুপটি ক'রে বসে থাকে গুটি-সুটি মেরে। বিছানাপত্তর সমস্ত ভিজে গেছে। মোক্ষদা-সুন্দরী কোন রকমে কোলের রুগ্ন ছেলেটাকে চরণদাসের জীর্ণ ছাতাটা দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছেন। ছেলেটার জ্বর এসেছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশী। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে কাশি; 'হুপিং কফ' বলেই মনে হয়। কারো গায়ের কাপড় শুকনো নেই। জীর্ণ পরিচ্ছদ ভিজে বিশ্রী হ'য়ে উঠেছে। সবাই তাকিয়ে আছে প্রভাতের প্রত্যাশায়। কখন হ'বে সকাল, কখন সূর্য উঠবে? কখন থামবে এই বিশ্রী জল আর ঝড়? তারা প্রতীক্ষা করে। তারা প্রহর গোণে।

সকাল হয়। নদীর বিস্তৃত বুকে থেমে গেছে ঝড়ের মাতন। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবু মাটি এখনো ভিজে।

সূর্য্য উঠছে নদীরাক্ষীর বুকে—জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতিমান কাশ্যপতনয়। প্রাণশক্তির উৎসমুখে স্ফুরিত হয়েছে ভুবনে মৃত্যুহরণী অভয়মন্ত্র। মোক্ষদাসুন্দরী তাঁর অঙ্গনে মেলে দিচ্ছেন গতরাত্রের বর্ষণসিক্ত ছিন্ন কাঁথা, আর কাপড়-গুলি। চরণদাস বার হ'য়েছেন মাঠের পথে জমি দেখতে। এমন সময় এল ডাক পিয়ন—চিঠি বিলির পিয়ন নয়, তার বিলির পিয়ন। মোক্ষদাসুন্দরী ছুটে আসেন। মহা মুস্কিল। সই ক'রে যে তার নিতে হ'বে। তিনি ডাকতে পাঠান চরণদাসকে। নিশ্চয়ই কৈলাসনাথের চাকরীর তার এসেছে। খুশিতে তাঁর সারাটা মুখ ভ'রে ওঠে। দুঃখরাত্রির অবসানে তাঁর মুখেও দেখা দেয় তিমিরজয়ী আনন্দ—সূর্য।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পিওনকে ঘিরে ফেলে। তাকে ঘিরে কলরব করে। চরণদাস হন্তদন্ত হ'য়ে আসেন। ব্যগ্রহাতে সই ক'রে তিনি নেন টেলিগ্রামখানা। তার পরে খাম ছিঁড়ে পড়েন টেলিগ্রাম। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে আসে। মোক্ষদাসুন্দরী ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন তারের মর্ম। বুকভাঙা স্বরে চরণদাস বলেন 'কৈলাস মারা গেছে দার্জ্জার। সে আর নেই।' তার কলের ম্যানেজার টেলিগ্রাম করেছে। মোক্ষদাসুন্দরী হঠাৎ ট'লে পড়ে যান। তাঁকে ধরবার আজ আর কেউ নেই। অদূরে নদীর বুকে বাঁধ ভাঙার শব্দ হয়। ডাক-পিওনটা অনেক দূরে চলে গেছে।

একটি মজার ম্যাজিক

যাদুকর পি-সি-সরকার

কয়েকমাস পূর্ব্বে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ Magic Capital of the world-এর আমন্ত্রণক্রমে আমি কতকগুলি মৌলিক খেলা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের মুখপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি। তন্মধ্যে আলোচ্য খেলাটির স্থলে একটি খেলা ছিল; উহার নামকরণ করিয়াছিলাম Sorcar's Improved Think a-Name, এবং উহা আমেরিকার সে কাগজের ১৯২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকগুলি যাদুকরের নাম দেওয়া হয়—দর্শকগণ তন্মধ্য হইতে যে কোন একজনের নাম মনে করিলে তাহা বলিয়া দিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছিল। যাদুকরদের পত্রিকার জন্য উক্ত প্রবন্ধটি লেখিয়া বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় বাংলা ভাষার প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নাম দিয়া একটি খেলা আবিষ্কার করিতে বলেন। তাঁহার সেই কথা শুনিবার পর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আলোচ্য সহজ অথচ সুন্দর খেলাটি আবিষ্কার করিয়াছি। খেলাটি Improved Think a Name হইতেও ইহা তদপেক্ষা অনেক নীচু দরের। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে খেলাটিকে ব্যবসায়ী যাদুকরের ন্যায় কঠিন পর্য্যায়ের করিলে আমার পাঠকপাঠিকারা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। তাই হইয়া খেলাটিকে সহজ করিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত খেলাটির ন্যায় অত সুন্দর কৌশলপূর্ণ করা গেল না।

আপনার রাইটিং প্যাড হইতে সাতটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া উহাতে প্রদত্ত চার্ট অনুযায়ী নামসমূহ টাইপ করিয়া লইবেন অথবা সম্ভব হইলে সমান সাইজের পুরু কার্ডে ছাপাইয়া লইবেন। ছাপান কার্ড হইলে খেলাটি খুব ভাল হয়। প্রথম কার্ডটিতে নিম্নলিখিতভাবে একুশটি নাম ছাপাইয়া লইতে হইবে।

লেখক—যাদুকর পি-সি-সরকার

১।	সজনীকান্ত দাস	১১।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২।	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২।	প্রবোধকুমার সান্যাল
৩।	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩।	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪।	হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১৪।	প্রমথনাথ বিশী
৫।	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৫।	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৬।	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৬।	সুরেশনাথ ঘোষ
৭।	বুদ্ধদেব বসু	১৭।	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৮।	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৮।	বনফুল
৯।	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯।	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১০।	অন্নদাশঙ্কর রায়	২০।	মনোজ বসু
		২১।	প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরবর্তী ছয়টি কার্ডে নিম্নলিখিত কথাটি ছাপাইয়া লইবেন "আপনি যে সাহিত্যিকের নাম মনে করিয়াছেন তাঁহার নাম যদি এই কার্ডে না থাকে তবে এইটি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিন।" ইহার নীচে নিম্নলিখিত নামের লিষ্ট অনুযায়ী নামগুলি ছাপাইয়া লইবেন।

প্রথম কার্ড

সজনীকান্ত দাস
বুদ্ধদেব বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেশনাথ ঘোষ
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দ্বিতীয় কার্ড

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মনোজ বসু
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু
সুরেশনাথ ঘোষ
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল

তৃতীয় কার্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সুরেশনাথ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
বনফুল
মনোজ বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র

চতুর্থ কার্ড

হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
সুরেশনাথ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বনফুল
মনোজ বসু

পঞ্চম কার্ড

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বনফুল
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মনোজ বসু
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ কার্ড

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বনফুল
মনোজ বসু
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেশনাথ ঘোষ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

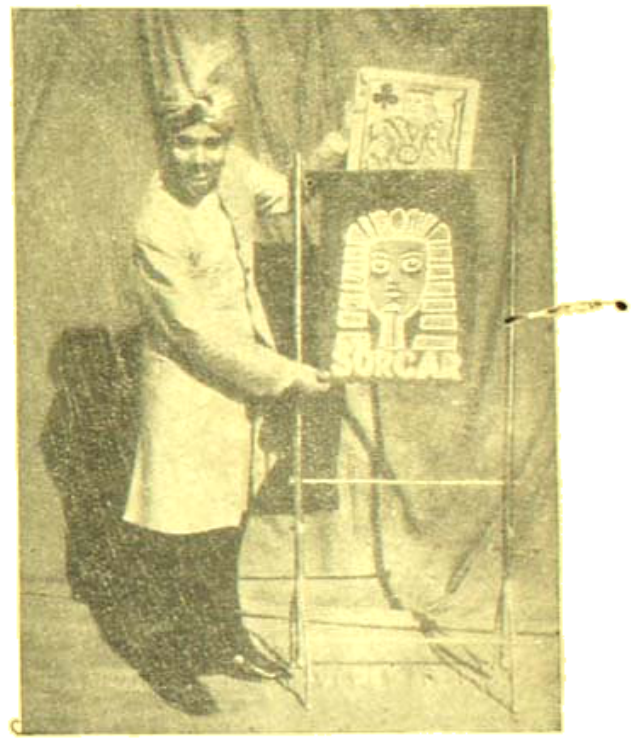

বিখ্যাত তাসের খেলা "হারাণি খেলা কোথায় ?"
প্রদর্শনিরত যাদুকর পি-সি-সরকার

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সর্বপ্রথমে একটি কার্ডে একশজন প্রখ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নাম লিষ্ট করা হইয়াছে ; এইটির নাম দেওয়া হইল key card যাদুকর ইচ্ছা করিলে এই কার্ডে নামের পাশের এক, দুই, তিন প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যাগুলিও দিতে পারেন। কাহার নামে কত ক্রমিক নম্বর তাহা মনে রাখিবার জন্য ট্রিক করা হইয়াছে। মনে রাখা মোটেই কঠিন নহে প্রথম কলমে দশটি নাম পর পর আছে ; দ্বিতীয় কলমে পরবর্তী দশটি অর্থাৎ এগার হইতে কুড়ি পর্যন্ত আছে এবং সর্বনিম্নের নামটি একুশ নম্বর। একটু ভাবিলে দেখুন ক্রমিক নম্বর

ছাপা না থাকিলেও অতি সহজে উহা গণিয়া বাহির করা যায়—ঘোটেই শক্ত নহে। কাজেই ক্রমিক নম্বর ছাড়া নামগুলি পর পর প্রথম কার্ড অনুযায়ী ছাপাইয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। পরবর্তী কার্ড ছয়টিতে প্রত্যেকটি পূর্ব্বোক্ত key card হইতে এগারটি করিয়া নাম তালিয়া তালিকা তৈয়ার করা হইয়াছে। উহা এলোমেলো করিয়া সাজান হইয়াছে মাত্র।

প্রদর্শনকালে কোনই অসুবিধা নাই। যাদুকর প্রথমে key sheetটি দর্শকদের হাতে দিবেন এবং তাঁহাদিগকে ঐ একুশজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মধ্য হইতে যে কোন একজনের নাম মনে মনে ঠিক করিতে বলিবেন। এরপর ঐটি নিজে ফিরাইয়া লইয়া অবশিষ্ট কার্ড ছয়টি তাঁহাদের নিকট দিবেন। প্রত্যেকটি কার্ডের উপরিভাগে লেখা আছে "আপনি যে সাহিত্যিকের নাম মনে করিয়াছেন তাঁহার নাম যদি এই কার্ডে না থাকে তবে এইটি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিন।" দর্শকগণ

পি-সি-সরকার কর্ত্তৃক ছিন্ন কাউয়া ঘোড়া বেওয়ার খেলা

তদনুযায়ী কার্ডগুলির প্রত্যেকটি খুঁটানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লক্ষিত নাম পাইবেন সেইটি বা সেগুলি নিজেদের নিকট রাখিয়া বাকী কার্ডগুলি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দিবেন। যাদুকর এইবার অনায়াসে দর্শকদের মনোনীত সাহিত্যিকের নাম বলিয়া দিতে পারিবেন।

খেলাটির মূলকৌশল কিন্তু খুবই সহজ। দর্শকগণ যে কার্ডগুলি ফেরৎ দিবেন উহার কার্ডের নম্বরগুলি মনে মনে যোগ করিয়া যোগফল 'একুশ' হইতে বিয়োগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে key cardএ অনোনীত নামের উক্ত সংখ্যাই 'ক্রমিক নম্বর' হইবে। প্রত্যেকটি কার্ডের উপর প্রথম কার্ড, দ্বিতীয় কার্ড, তৃতীয় কার্ড প্রভৃতি ছাপান থাকে। যাদুকর ইচ্ছা করিলে প্রথম কার্ডে একটি পিনের ছিদ্র, দ্বিতীয় কার্ডে দুইটি পিনের ছিদ্র, তৃতীয় কার্ডে তিনটি পিনের ছিদ্র এইরূপ করিয়া রাখিতে পারেন। অথবা অন্য কোনরূপ চিহ্ন করিয়া রাখিতে পারেন। প্রকৃত কথা এই যে কার্ডের Index number ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি বুঝিবার সহজ একটি উপায় রাখা ভাল। খেলাকে কঠিন করিবার ইচ্ছা না থাকিলে ঐ প্রথম কার্ড, দ্বিতীয় কার্ড, তৃতীয় কার্ড প্রভৃতি ছাপাইয়া লইতে পারেন। দর্শকগণ কার্ড ফেরৎ দিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর উহার কার্ড নম্বর যোগ দিতে থাকিবেন এবং অবশেষে যোগফল 'একুশ' হইতে বিয়োগ করিয়া key cardএ নামের ক্রমিক নম্বর পাইবেন।

উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন key card হইতে ১৫ নম্বর নাম সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র মনে মনে ধরা হইল। ইহাতে দর্শকগণ দ্বিতীয় কার্ড ও চতুর্থ কার্ড ফেরৎ দিবেন। এক্ষণে যাদুকর (২+৪) দ্বিতীয় এবং চতুর্থ যোগফল ৬ সংখ্যাটি একুশ হইতে বিয়োগ করিয়া মনে মনে (২১—৬)—১৫ পাইবেন। তখন key sheet হইতে ১৫ ক্রমিক নম্বরের নাম সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র অনোনীত হইয়াছে

পি-সি-সরকার একটি খালি বাক্স হইতে একটি প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা বাহির করিতেছেন

বলিয়া দেওয়া এবং key card হইতে উহা বাহির করা মোটেই অসুবিধার নহে। যদি কোন কার্ডই ফেরৎ পাওয়া না যায় তখন বুঝিতে হইবে যে ২১ হইতে কিছুই না (০) শূন্য বিয়োগ দিতে হইবে অর্থাৎ একুশ নম্বর নাম অনোনীত হইয়াছে। key cardএ একুশ নম্বর নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র অনোনীত হইয়াছে বুঝা গেল।

পোষ্টকার্ডের আকৃতিতে সাদা কার্ড কিনিয়া লইয়া প্রত্যেকটিতে ঐ নামগুলি টাইপ করিয়া লইয়া এই খেলা দেখান চলে। তবে ছাপাইয়া লইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। খেলাটি সহজ অথচ ভারী সুন্দর। আপনারাও অনায়াসে এইটি দেখাইতে পারিবেন। খেলাটি আমার আবিষ্কৃত একথা স্মরণে রাখিবেন। আমার যাদুকর বন্ধুরা এখনই খীকার করিতে ভুলিয়া যান। ভবিষ্যতে অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে এইটি আমি আবিষ্কার করিয়াছি, তাঁহারা জানেন।

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৫

D. P. I.এর অফিস হইতে ফিরিয়া সুখলতা আপন কক্ষে সরাসরি গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার মাথার ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মনের ভিতরে যেন ঝড় বহিয়া সমস্ত অন্তর মথিত করিতেছিল।

সে যে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া আসিল? সেই বিতর্ক ও ব্যঙ্গ-হাস্যের উত্তাপে তাহার মাথার ঠিক ছিল না। জেদের সহিত সে স্বাক্ষর করিয়াছে। কিন্তু? কিন্তু তাহার বিবাহ যে স্থির হইয়া গিয়াছে? আর সে অবিবাহিত অবস্থায় স্কলারশিপ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবে বলিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল? রজত! আচ্ছা রজত কি ভাবিবে? কি ভাবে ইহা গ্রহণ করিবে? তাহার পর রজতের পিতা মাতা? তাহার নিজের পিতা মাতা? কিন্তু ম্যাকনীলের ওই ব্যঙ্গভরা মৃদু হাস্য ও বক্রোক্তি তাহার মনে যেন জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। যখন মৃদু হাস্য ভরে চিবাইয়া চিবাইয়া ম্যাকনীল বলিতেছিল "আমার ক্ষমা করো, কিন্তু আমার নিজেরো ধারণা যে বিবাহিত মেয়ে-ছেলেরা প্রায়ই স্কলারশিপের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে না। হয়ত সেইজন্যই এই ব্যবস্থা যে অবিবাহিত অবস্থায় স্কলারশিপ নিয়ে তবে যাবে। আমি অন্তরের সঙ্গে ইহা সমর্থন করি।"

ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সুখলতা স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিল "আপনি কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কি একে সমর্থন করছেন?"

"না মাদাম। তা না থাকলেও আমার দৃঢ়বিশ্বাস এইরূপ যথার্থ। আমার নিজের দেশের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা সমাপ্ত করে আপনি উপার্জ্জনক্ষম হয়ে তার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়। তাই এ রূল তাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমার মনে হয় এটা বিশেষ করে ভারতবাসীদের জন্য হয়েছে।'

সুখলতা বলিয়াছিল যে "আপনার ভুল ধারণা ভেঙে দিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হচ্ছে।"

"আমি দুঃখিত মাদাম। তা অসম্ভব।"

ইহার পর দুই চারিটি বাক্য বিনিময় করিয়া ক্ষুব্ধা সুখলতা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল যে সে বিবাহ না করিয়াই স্কলারশিপ গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইবে।

রজত ব্যতীত কেহ সুখলতার কার্য্যকে সমর্থন করিলেন না। দুইটি পরিবারে অসন্তোষের ঝড় বহিয়া গেল যেন।

রজতের মাতা বলিয়াই ফেলিলেন "বিলেত না হয় নাই যেতে? কিম্বা বিয়ের পর তোমার সাথ মেটাতে না হয় আমি ঘর থেকেই খরচ করতুম মা? এ কেলেঙ্কারীর চেয়ে সে ভাল ছিল।"

তাহার মাতা অনুরোধ করিতে লাগিলেন "ছেড়ে দে সুখ ও স্কলারশিপ ছেড়ে দে তুই। মেয়েমানুষের যা দরকার তার চেয়ে অনেক বিদ্যে তুই বেশী শিখেছিস। লোক হাসিয়ে এমন কাণ্ড করিস নি।"

কিন্তু সেদিন লোকের হাসি অপেক্ষা ম্যাকনীলের হাসি আরো মর্ম্মান্তিক বোধ করিয়া সুখলতা আপন ক্ষোভ বজায় রাখিয়াছিল। চুপ করিয়াছিল।

তাহার মৌন অসম্মতি দেখিয়া মাতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন "জেদের বশে তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস্। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন পরে তোকে অনুতাপ না করতে হয়।"

কেবল রাগ করিল না রজত। নীরবে সব কথা শুনিয়াছিল। তাহার পর বলিয়াছিল "ও যখন যাবেই, তখন যাওয়ার আগে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে ওর মন খারাপ করে দিচ্ছ কেন? বিয়েটা না হয় বন্ধ থাকলো, কিন্তু ওটা না হলে যে ওর সবটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওকে সুদ্ধ মনে যেতে দাও।"

তাহার পর তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়াছে। কতদিন সুখলতা জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তুমিও কি অসন্তুষ্ট হলে?"

রজত মৃদু হাসিয়া নীরবে থাকিয়াছে, অথবা বলিয়াছে "তোমার কি মনে হয়?"

সে প্রশ্নের আজিও সমাধান হয় নাই।

৬

তাহার পর তাহার বিগত প্রবাসের দিনগুলি? অধ্যয়ন আর অধ্যয়ন। সমস্ত দিন ও রাত্রিগুলি যেন এক্সপেরিমেণ্ট ও অধ্যয়ন দিয়া ঢাকিয়া গিয়াছিল।

Electro magnetic, laws of causality fundamental equations. আইনষ্টাইন, বর ব্রোয় ডিস্কার,ভন্‌নরম্যান্। প্রামাণ্য থিয়োরী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা, ও আলোচনা,ইহাই তাহার মস্তিষ্ক ও মনকে ব্যাপৃত রাখিত।

ব্রেকফাষ্ট সারিয়া সে ইউনিভারসিটির বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারে চলিয়া যাইত। লাঞ্চ কলেজেই সারিত। কাজ কাজ, ম্যাকনীলকে দেখাইতে হইবে। তাহার নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ পুরাইতে হইবে। ভারতীয় মহিলা বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী সুখলতা গুপ্ত। হায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ!

তাহার পর? তাহার সাধের সংসার আরম্ভ হইবে। রজতও দেখিবে সুখলতা শুধু দুর্লভ ছাত্রী নহে, দুর্লভ গৃহিনীও।

রজত? রজতের প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রেম জগতারার মত অবিচল গতিতে বহিয়া তাহাকে তাহার লক্ষ্যে পৌছিয়া দিবে। রজতের কথা ভাবিয়া মন যত ব্যাকুল হয় তাহার অধ্যয়ন ততই প্রগাঢ় হয়। যত শীঘ্র থীসিস সমাপ্ত হইবে, ততশীঘ্র দেশে ফিরবো। সুখলতা আপন চিন্তা ও মনোভাবে লজ্জিত হয়। সবাইকার জন্যই মন কেমন করে, কিন্তু সবাইকে ছাপাইয়া রজত জাগিয়া ওঠে কেন? সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া যেন রজতের আসন পাতা হইয়া গিয়াছে। রজতের সুদর্শন আকৃতি, সুমধুর হাস্য, সপ্রতিভ বাক্যগুলি মনে পড়িয়া যায়। কর্ণের নিকট বহু গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া ওঠে, ওগো প্রিয়া···

দুই বৎসর অধ্যয়ন, তাহার পর তাহার অধীত বিদ্যার পরীক্ষা। উঃ এখনও কতদিন। মধ্যে মধ্যে নিঃসঙ্গচিত্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে। সেই সময়টা অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকার্থীর সঙ্গ যেন তাহাকে শান্তি দান করে।

ডক্টর ম্যাকার্থী পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর। তাঁহার আন্তরিক সাহায্যদান, পিতার ন্যায় স্নেহ ও সুমিষ্টবচন তাহার স্বজনবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ক্লান্তমনকে যেন সঞ্জীবিত করিয়া তোলে।

আলোক তরঙ্গের গতি, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাখ্যা করিতে করিতে ম্যাকার্থী তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার সেই সময়কার মূর্ত্তি আজো যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসে—সৌম্য সাধক মূর্ত্তি।

প্রথম দিকে প্রতি মেলে রজত ও পিতামাতার পত্র আসিত, দীর্ঘপত্র। তাহার জন্য ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র। রজত লিখিয়াছিল "সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিও সু, তোমার মধ্য দিয়াই আমার ভ্রমণস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবে।" রজতের পত্র আসিলে সেইদিন ইংল্যাণ্ডের ঘোলাটে আকাশে বর্ষণসিক্ত দিন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বারম্বার পড়িয়া আশা মিটিত না। সেই সব দিন।

বৎসর ঘুরিবার সঙ্গে পত্রও বিরল হইতে লাগিল। সুখলতা ভাবিত একথা তাহারা বারবার কি জানাইবে? ক্রমে থীসিস লিখিতে আরম্ভ করিল। ম্যাকার্থী বলিতেন "তোমার থীসিস সবচাইতে ভাল হবে, তুমি কেবল পড়, আরো বেশী করে এক্সপেরিমেণ্ট কর।"

সফলতা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহারি আভাস ম্যাকার্থীর বাক্যে। সুখলতা অসীম আগ্রহে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অধ্যয়ন, অধ্যয়ন। হায়, অধ্যয়ন বিপুল বিশাল হইয়া তাহার জীবনকে আবৃত করিয়া দিল। রজত পত্র দিতেছে কিনা, মাতা কি লিখিতেছেন,কোনদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

মিষ্টার সিংএর সহিত সেই সময় তাহার পরিচয় হইয়াছে। ব্যারিষ্টার হইতে এবং সেই সঙ্গে ভ্রমণ সারিতে মিষ্টার সিং এখানে আসিয়াছেন।

সুখলতার সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটি সভায়। ক্রমে মিষ্টার সিং তাহার সেই পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। সুখলতা বুঝিয়াছিল যে হীরা সিং তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তবে সুখলতা হীরা সিংকে তাহা জানিতে দিত না। সে তাহাকে মিলিবার খানিক সুযোগ দিত। পাঞ্জাবের অধিবাসী হীরা সিং, শিখ—তাহার দেশের লোক—তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া খানিকটা তৃপ্তি হয় হোক্।

হীরা সিং কিন্তু তাহাকে যথার্থ ভালবাসিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ক্রমে গভীর প্রেমে পর্য্যবসিত হইতেছিল। সুখলতা হাসিলে, সুখলতা কথা কহিলে সে যেন আপনাকে কৃতার্থবোধ করিত।

৭

চরম দুঃখের দিন সেইদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যেদিন তাহারা বিশ্রাম এবং আনন্দের লোভে রোইং কম্পিটিশনে দর্শক হইয়া গিয়াছিল। ম্যাকার্থী তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রমের পর আমোদ প্রমোদে যোগ দিলে মনের খানিকটা বিশ্রাম হয়। সঙ্গে হীরা সিং গিয়াছিল।

গত কয় বৎসর কেম্ব্রিজ "ব্লু" হইয়াছে। সেজন্য কেম্ব্রিজের ছাত্র ছাত্রাগণের উল্লাসধ্বনির সীমা নাই।

টেমসের বুকে সারি সারি বাচের নৌকা দাঁড়াইয়া আছে। কিনারায় অসংখ্য নরনারী ভীড় করিয়া আছে। চীৎকার আনন্দ হৈ হৈ একটানা চলিয়াছে।

সুখলতা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল। কত ভারতবর্ষীয় ইহা দেখিতে আসিয়াছে। একটি যুবক কিছু দূরে রহিয়াছে, তাহাকে সুখলতার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। যেন তাহাদের সমবয়স্কার সহপাঠী। সুখলতা অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল "আপনি যেন বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে?"

বিস্মিত যুবক আনন্দিত হইয়া বলিল "হ্যাঁ আমি বাঙ্গালী, কলকাতা থেকে আসছি।"

ইহার পর পরিচয় অগ্রসর হইয়া গেল।

যুবকটি দুই মাস হইল আসিয়াছে, সে ইংলিশের প্রফেসার। ইংলিশ লিটারেচারের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া ডিগ্রী পাইতে আসিয়াছে।

ক্রমে পরিচয় হইতে হইতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে যুবকটি রজতের পরিচিত। রজতের সহিত পড়িয়াছে।

ইহার নিকট রজতের খবর পাওয়া যাইবে। রজত আজ প্রায় তিন মাস হইয়া গেল কোনও পত্রাদি দেয় নাই। হয়ত সুখলতার উপর অভিমান হইয়াছে, কিম্বা ব্যস্ত আছে কে জানে? মাকে লিখিলে তিনিও বিশেষ কোনও খবর যেন না আজকাল, ছোট ছোট পত্রগুলিতে কেবলমাত্র কুশল জিজ্ঞাসা থাকে, নিজেদের সংক্ষিপ্ত কুশলদান করেন। ইহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। সুখলতার সহিত রজতের যে সম্বন্ধ এ হয়ত তাহা জানে না। সুখলতা অসঙ্কোচেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। "রজতবাবুর খবর কি কিছু আপনি জানেন? ওঁর যেন পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল? তার কি হল? তিনি কেমন আছেন?"

ছেলেটি তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল "সে বড় দুঃখের ব্যাপার! আশ্চর্য্য অত বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু এবার আই-সি-এস পরীক্ষায় ফেলিয়র হল। ফিনান্স পরীক্ষায়ও ফেল করলো। তার পর বাপ মা জোর করে ধরলেন বিয়ের জন্য, বিয়েও করলো। এখন বেদরকারী কলেজে প্রফেসার হয়েছে। কিন্তু তার মত ছেলের পক্ষে স্যুট্ করবে ওরকম চাকরী? জীবনটা তার যেন কেমন একদিকে চলে গেল, বড় মন-মরা হয়ে গেছে।"

সুখলতা সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল "আর বিয়ের কথা কি যেন বললেন? বিয়ে ঠিক হয়ে আছে সেই কথা?"

ছেলেটি বলিল "হাঁ বিয়ে বহুত আগেই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু চাকরী নিয়ে তবে বিয়ে করলেন। আর চাকরীটাও নিলেন যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, শুধু যেন বিয়ে করবার জন্য। অবশ্য বিয়ে হল খুব হাইফ্যামিলির·····ওকি? আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?" ছেলেটি অগ্রসর হইয়া থামিল।

সুখলতা প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার পা দুটো—অবাধ্য পা দুটা বাধা মানে নাই, থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ছেলেটির ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে সে কি বলিয়াছিল মনে পড়ে না তার। তবে হীরা সিং সেই সময়ে তাহার পাশে উপস্থিত ছিল এবং তাহারি বাহুর আশ্রয়ে সে চেতনা হারায়।

জ্ঞান হইয়াছিল হসপিটালে, চোখ চাহিয়াই দেখিয়াছিল তাহার পাশে হীরা সিং রহিয়াছে। তাহার পর প্রবল জ্বর হয় ও চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ব্রেন ফিবারে সে প্রায় একমাস শয্যাশায়ী ছিল।

সেই অসুস্থতার সময় সুদূর প্রবাসে আপনজনের অধিক হইয়াছিল হীরা সিং। তাহার উদ্বেগ, তাহার ব্যাকুলতা, তাহার সেবা ভুলিবার নয়।

ডক্টর ম্যাকার্থীও নিয়মিত তাহাকে দেখিতে আসিতেন।

ক্রমে রোগ সারিল। আচ্ছন্ন চেতনা জাগ্রত হইতে কিছু সময় লাগিল।

তাহার পর মাকে লিখিল এই বাক্যের সত্যতা নিরূপণ

করিতে। যে বাক্যের উপর তাহার ভবিষ্যত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে।

পত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার রজতকে সে অবিশ্বাসী অপরাধী ভাবিবে?

মায়ের চিঠি যথাসময়ে সত্য খবর বহন করিয়া আনিল।

"রজত পিতামাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অবশেষে বিবাহ করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুখলতার উপর তাহার পিতামাতা মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের অশেষ চেষ্টা প্রবল অনুরোধ ও চোখের জলে রজত বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে রজতকে দোষ দিই না। কতকাল সে অপেক্ষা করিবে? সবই অদৃষ্ট? রজতেরই বিশেষ অনুরোধে তোমায় খবর দেওয়া হয় নাই। তোমার পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া। যাহা হউক মন খারাপ করিও না। কত সম্বন্ধ এমন ভাঙ্গিয়া যায়। মন সুস্থ রাখিয়া পড়াশুনা করিয়া এস।"

বালিকা কন্যাকে মাতা সান্ত্বনা দিয়াছেন। সুখলতা পত্রখানা হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মায়ের চিঠির ওই লাইনটা যেন কর্ণে বাজিতেছে, "রজত আর কতকাল অপেক্ষা করিবে?"

আর সুখলতা? ওরে সুখলতা যে জন্ম-জন্মান্তরকাল ধরিয়া রজতের অপেক্ষা করিতে পারিত। রজত যদি বলিত অপেক্ষা করিতে, তবে সুখলতা যে শবরীর মত পথ চাহিয়া এ জীবনটা অনায়াসে কাটাইয়া দিত। তারপর পরজন্মে যদি চেতনা থাকিত তবে···ওঃ পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া খবর দিতে মানা করিয়াছে? দয়ালু! সহৃদয়! হৃদয়বান ব্যক্তি!

সর্ব্বস্বহারা বাঘিনীর ন্যায় অস্থির চঞ্চল পদে সুখলতা ঘরের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া নিরাশ হীরাসিং ফিরিয়া গেল। চক্ষের মনিকায় অগ্নি জ্বলিতেছে। হস্তে মায়ের পত্র দলিত পিষ্ট হইয়া ক্রমে ধূলার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল।

ধীরে লণ্ডন নগরীর জন কোলাহল স্তব্ধ হইয়া আসিল। গভীর রাত্রির নীরব নগরী যেন পরম সহানুভূতিভরে সুখলতার পানে চাহিয়া রহিল। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া যখন সুখলতা শয্যায় বসিল তখন তাহার আঁখির দাবদাহ শীতল করিয়া অশ্রুবন্যা নামিয়াছে। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া হাহাকার উঠিতেছে—একি করিলে রজত? একি করিলে? তুমি চিরকালের জন্য পরের হইয়া গেলে? বলে যাও—বলে যাও তুমি এ বিরাট শূন্যতা আমি কি দিয়ে পূর্ণ করবো? রজত বলে যাও।

৮

রোগের সময় হইতে হীরাসিং সুখলতার নিকট ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সুখলতা তাহার বন্ধুত্ব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া হীরাসিং তৃপ্ত হইয়াছিল।

রোগের আক্রমণ কাটিয়া গিয়াছে তবু সুখলতা এখনও সুস্থ হইতে পারে নাই। তাহার শীর্ণদেহ স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি হীরাসিংকে বিচলিত করিত। আপনার স্নেহ প্রীতির সান্নিধ্যে সে তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত।

ক্রমে কয়মাস কাটিল। সুখলতা এখনও লাইব্রেরীতে যায় না, পড়াশুনা করে না। ম্যাকাথা অনুযোগের সুরে বলিতে সুরু করিয়াছেন, তুমি একেবারে পড়ছ না মিস গুপ্ত, এইবার আরম্ভ কর। বেশী দেরী হলে তোমার লেখার link হারিয়ে যাবে যে।

মৃদু করুণ হাসি হাসে সুখলতা। কি প্রয়োজন? কি প্রয়োজন তাহার? আর প্রয়োজন থাকিলেও তাহার সে শক্তি কই?

হায় জীবনটাকে যদি আপনার হাতে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া নিঃশেষে শেষ করিয়া দেওয়া যাইত?

মনের অসহায় কাতর অবস্থার মাঝে একদিন হীরাসিং সহসা তাহার প্রেমভিক্ষা করিল।

হ্যাম্পষ্টেডহীথের একটা নির্জ্জন কুঞ্জের ভিতর একটা বেঞ্চে তাহারা বসিয়াছিল। শুনিয়া চমকিয়া চাহিল, কোন পরিচিত সুর ইহার কণ্ঠে বাজিল? কোন বিশ্বাস ভরা প্রেমপূর্ণ আঁখির চাহনী ইহার আঁখিতে ধরা দিয়াছে? না, না, তাহা কি হয়?

স্তব্ধ সুখলতা বসিয়া রহিল। হীরাসিংএর সপ্রেম নিবেদন বুঝি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল "এই তো প্রতিশোধের পন্থা রয়েছে? তুমি পার। আর আমি পারি না? যে আগুন জ্বেলেছ তা যদি বাইরের হত, তবে একটা পৃথিবীকে অনায়াসে ছাই করে দেওয়া যেত, তবে!"

পূর্বপ্রকাশিতের পর

গোষ্টহাউসের ফটকের মধ্যে আমাদের গাড়ী এসে ঢুকলো। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ও বাগান-ঘেরা মহারাজার অতিথিশালা। সারি সারি প্রায় ৫০ খানি বাড়ী দু'ধারে সাজানো। বাড়ীগুলি সব ভারতীয় স্থাপত্য কলার আদর্শে নির্মিত। সুন্দর সুদৃশ্য মনোমুগ্ধকর! ১২ ও ১৩ নং বাড়ী দু'খানি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গাড়ী থেকে তার সামনে দাঁড়াতেই, লোকজন সব ছুটে এল। সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে তারা উপরে তুলে দিলে। আমি মণিব্যাগ বার করে কুলিভাড়া আর গাড়ীভাড়া কত দিতে হবে গুপ্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে গুপ্ত সাহেব বললেন—আপনারা হ'লেন 'ষ্টেট্ গেষ্ট' ষ্টেশনে নামা থেকে এখানে থাকা এবং ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত খরচ মহারাজা বহন করবেন। আপনাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। গোষ্টহাউসের ম্যানেজার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। আপনারা উপরে চলুন। কাপড় চোপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসুন। খাবার সময় হয়েছে' রাত্রি ৯টা প্রায়। আশা করি আপনারা কেউ বিশ্রামির বন। আমি আপনাদের জন্য আমিষ খাদ্যের ব্যবস্থাই করেছি। শুনে বাবাজী বললেন—উত্তম করেছেন।

গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে আমরা উপরে গিয়ে উঠলুম। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই একটি হলে গিয়ে পৌঁছলুম। হলের দুপাশে আবার দুটি ছোট ছোট সিঁড়ি। এই দুটি সিঁড়ি দিয়ে গোষ্টহাউসের পৃথক দুটি মহলে যাওয়া যায়। বিজলী বাতীতে অতিথিশালায় দুটি মহল ঝলমল করছে। ছোট সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠলাম দুধারের দুটি

গোষ্ট-হাউস অভিমুখে ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঝকঝকে-ঘেরা দীর্ঘ প্রশস্ত দালানে। দালানটি জোড়া হলদে রংয়ের একখানি গালচে পাতা। দালানের কোলে প্রকাণ্ড দু'খানি ঘর।

বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোয় সুসজ্জিত। ঘরের মেঝের কার্পেট বিছানো। সেই ঘরের এক ধারে সারি সারি তিনখানি খাট পাতা। ধবধবে বিছানা বালিশ সাজানো। আর একধারে বড় গোলটেবিল ও চেয়ার সাজানো। এককোণে লেখার সরঞ্জাম সমেত লেখার টেবিল চেয়ার পাতা। দেয়ালের গায়ে তিনদিকে তিনটি আল্না আঁটা আছে।

বড় ঘরের পাশেই সংলগ্ন আর দু'টি ছোট ঘর আছে। একটিতে আমাদের মালপত্র রাখা হয়েছে দেখলুম। অপরটি একেবারে আল্না

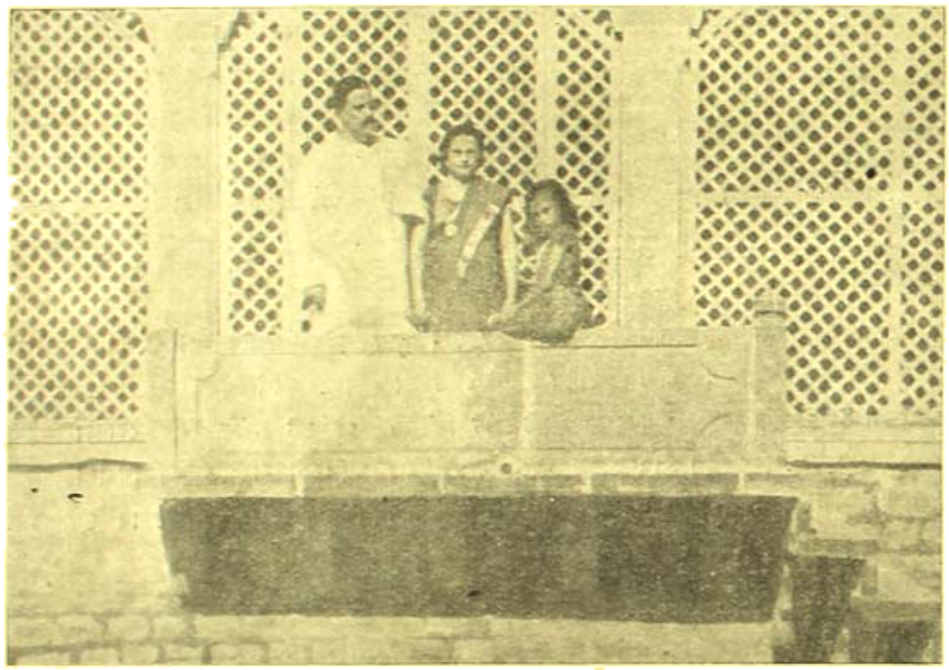

গেষ্ট হাউসের অলিন্দ ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেয়াল আলমারি দিয়ে সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম। ড্রেসিংরুমের সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাথরুম। কল আছে, বাথটব্ আছে। ওয়াশিংমেসিন, জগ, গ্লাসকেস্ প্রভৃতি সাজানো বুথ-ধোবার টেবিল। এক কোণে উঁচু ষ্ট্যাণ্ডের উপর পানীয় জলের পাত্র রয়েছে। ড্রেসিংরুম ও বেডরুম সংলগ্ন মচার্ণ ল্যাভেটরী। সমস্ত সুব্যবস্থা দু'মহলে সমানভাবে রয়েছে দেখে আমরা তখনি বয়স দু'টি ভাগ করে নিলুম। ডানদিকের মহলে থাকবেন মেয়েরা তিন জন এবং বাঁ দিকের মহলে পুরুষরা অর্থাৎ আমি ও শ্রীমান বাবাজী। তোলানাথকে রাজভৃত্যরা তৃতীয় মহলে স্থান দিলে। ভৃত্যবহল আমাদের মহলের ঠিক নীচেই। কেবলমাত্র রাজ-অতিথিদের ভৃত্যরাই সেখানে ঠাঁই পায়। শ্রীমান তোলানাথ একাই সেখানে রাজা বিরাজ করলেন।

মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে প্রস্তুত হ'তে না হতেই আমাদের নৈশ ভোজনের খাদ্য এসে হাজির। হ্যাঁ, রাজ-অতিথির যোগ্যখানাই বটে! গোলাও মাংস মটর লুচি পুরী তরকারী, চাটনি, পাশে মিষ্টান্ন ফলমূল সে প্রায় পঁচিশ রকম পদ। সব খাওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। দেখেই খুশী। গুপ্ত সাহেব আমাদের খেতে বসিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—কাল সকালে ৯টার মধ্যেই আসবেন। আমরা যেন শহর ভ্রমণে যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে থাকি।

আহারাদির পর গোলাপসুরভিত ঠাণ্ডা বরফ জল, হুঁচি পান, সুগন্ধী এলাচী মশলা এলো; আর এলো—প্রত্যেকের জন্ত এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি করে দেশলাই। মেজেদেরও ম্যানেজার বাদ যায় যেন নি। শুনলুম রাজপুত মেয়েরা নাকি অনেকেই ধূমপান করেন। সৌভাগ্যবশতঃ মধীয় যাত্রাসঙ্গিনীরা কেউই ওটা এখনো শেখে নি। যা যা স্ত্রী ও ধূমপানে বঞ্চিত। কাজেই সমস্ত সিগারেটের প্যাকেটগুলি একা আমারই ভোগে লাগলো।

আহারপর্বটা আমরা একসঙ্গে মেয়ে মহলেই সারলুম। তারপর অনেকক্ষণ গল্প ক'রে রাত্রি ১১টা নাগাদ আমরা যে যার মহলে শুতে চলে গেলুম।

সকালে উঠে দেখি, চা এসে হাজির। তার সঙ্গে তিন রকম মিষ্টান্ন ও প্রচুর ফলমূল। প্রাতরাশের সদ্গতি ক'রে আমরা শহর প্রদক্ষিণের জন্ত প্রস্তুত হলুম। গুপ্ত সাহেব ঠিক সময়ে এসে হাজির তিনি মোটর নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের ল্যাণ্ডো দুটিও সকাল থেকে দরজায় হাজির ছিল। মেয়েদের গুপ্ত সাহেবের মোটরে তুলে দিয়ে আমরা ল্যাণ্ডো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গুপ্ত সাহেব আমাদের 'গাইড ফিলজফার ও ফ্রেণ্ড' হ'য়ে নিয়ে চললেন।

প্রথমেই আমরা গেলুম মহারাজার নূতন প্রাসাদ দেখতে। চিতোর শৈল সরনীর উচ্চ পথে প্রায় তিনকোটী টাকা ব্যয় ক'রে যোধপুর মহারাজের এই নূতন প্রাসাদটি তৈরী হয়েছে। যে বিলিতী ইঞ্জিনীয়ার সাহেব এর নক্সা ক'রেছিলেন। তিনি এটি পরিকল্পনার জন্ত মোট ফী নিয়েছেন ৭ লক্ষ টাকা। প্রাসাদ তৈরী হ'তে ১৭ বছর সময় লেগেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অনেক বাকী রয়েই গেছে। এই সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর যীরেন্দ্রনাথ এই প্রাসাদের নির্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর কর্মসংজ্ঞাই ছিল—"প্যালেস্ ইঞ্জিনীয়ার" সম্প্রতি তিনি ষ্টেট্-ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হ'য়েছেন। মিলনগুণে তিনি যোধপুরবাসী সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। মহারাজা, যুবরাজগণ রাজকর্মচারীবৃন্দ থেকে সুরু করে পথের একজন নগণ্য সামান্ত লোক

পর্য্যন্ত গুপ্ত সাহেবকে চেনে জানে শ্রদ্ধা ক'রে এবং ভালবাসে। তাঁর সহৃদয় ব্যবহারে যোধপুরবাসীরা সকলেই মুগ্ধ। তিন কোটী টাকা যে প্রাসাদ নির্ম্মাণে ব্যয় হয়েছে তা' এই গুপ্ত সাহেবের হাত দিয়েই হয়েছে। ইচ্ছা করলে এই একটা কাজ ক'রেই লক্ষপতি হ'তে পারতেন তিনি, কিন্তু নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছাড়া তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না কারুর কাছে। এমন কি, ঠিকাদার ও মালমসলাসরবরাহকারীদের উপহার ও উপঢৌকন পর্য্যন্ত ফেরত পাঠান। এই দৃঢ় সংকল্প ও নির্লোভ চরিত্রের জন্য তিনি সকলের সম্মানার্হ হয়েছেন। সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা আমাদের পরম স্নেহাস্পদা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সুযোগ্য অগ্রজ ইনি। লেখিকা ভিন্নেও এঁর উপর আমাদের যে দাবীটুকু আছে, ইনি তা অস্বীকার করেন নি। যে ক'দিন আমরা যোধপুরে ছিলুম ইনি সমস্ত কাজ ফেলে এমন কি অসুস্থা পত্নীকে একলা বাড়ীতে রেখেও দু'বেলা এসে আমাদের নিয়ে যোধপুরের চারি-পার্শ্বের ৫০-৬০ মাইল পর্য্যন্ত সেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে ঘুরে ঘুরে সমস্ত আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ তাঁর এই নবনির্ম্মিত রাজ প্রাসাদের নাম রেখেছেন 'চিতোর প্রাসাদ'। চিতোর শৈল সানুর পরে নির্ম্মিত প্রাসাদের নামকরণ অতি সুন্দর হয়েছে। প্রাসাদটি দেখে আমোদের মনে হল একে রাজপুতের যেসের তাজমহল ব'ললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না, এমনিই অপূর্ব্ব সুন্দর অনুপম ও অপরূপ হয়েছে এই 'যোধপুরের "চিতোর প্রাসাদ।"

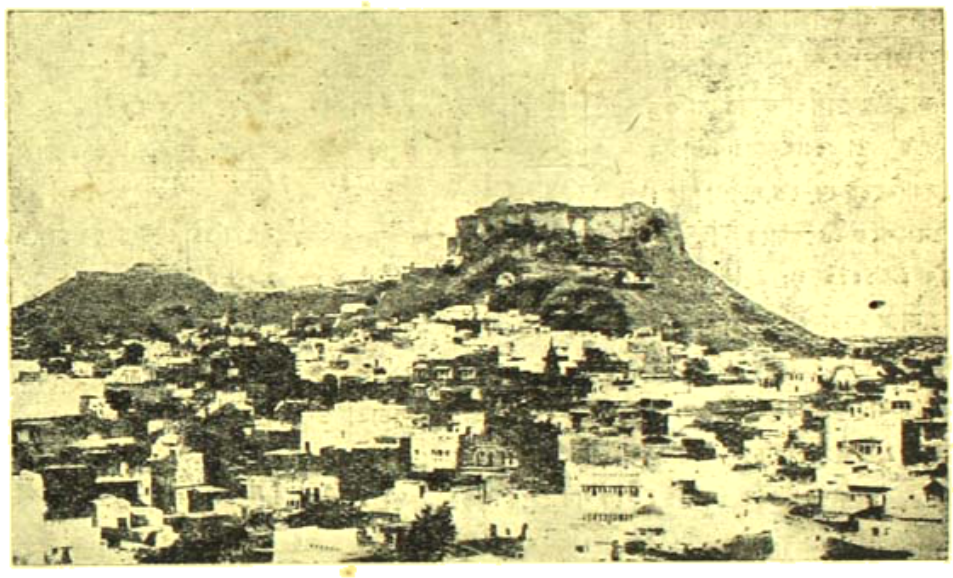

যোধপুর দুর্গের নীচে প্রাচীন সহর

যাঁরা 'তাজমহল' দেখবার জন্য আগ্রা পর্য্যন্ত ছোটেন, আমি তাঁদের অনুরোধ করবো—আর কিছুদূর এগিয়ে এসে তাঁরা যেন যোধপুরের এই 'চিতোর-প্রাসাদ'—মরুভূমির বুকের এই অপরূপ সৌন্দর্য্য মেটল একবার দেখে যান। প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে উপর নীচের সমস্ত কক্ষ ঘুরিয়ে যান রাণীদের মহল, রাজারাণী ও রাজ-অন্তঃপুরের অধিবাসিনীদের সন্তরণ উপযোগী বহুমূল্য স্নানকুণ্ডটি পর্য্যন্ত, এমন কি প্রাসাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত বৈদ্যুতিক রন্ধনশালাটিও ভাল করে দেখিয়ে দিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেক ইঁটটি থেকে যেন শিল্প ও সৌন্দর্য্যের পরম প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। কত সেই অজানা স্থাপত্য শিল্পী, যাঁর উদার কল্পনায় প্রথম এই বিরাট প্রাসাদের খানচপটি রচা দিয়েছিল। মরোয়া রাজ্যের "লক্ষ্মীবিলাস" প্রাসাদের পর এইটিই বোধ হয় দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদ বলে গৌরব করতে পারে।

এই প্রাসাদটি সর্ব্বাগ্রে দেখার ফলে—যোধপুর মহারাজাদের পূর্ব্ব প্রাসাদগুলি মরুরাজ্যের মরোয়ারীপতির ধনী বেনিয়া ব্যবসায়ীদের বাড়ীর চেয়ে বিশেষ উন্নত বলে মনে হ'ল না। যেমন 'রায়কাবাগ রাজপ্রাসাদ।' মহারাজ এখনও মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর 'রতনাদা রাজপ্রাসাদ'। 'রায়কাবাগ প্রাসাদ' তৈরী হবার পর মহারাজ এ প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। এ প্রাসাদটি এখন য়ুরোপীয় অতিথিবর্গ, অথবা বিশেষ কোনও রাজা মহারাজা যাঁরা যোধপুরে বেড়াতে আসেন তাঁদের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক প্রাসাদটি মূল্যবান উপকরণে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানগুলি অতি মনোরম। রায়কাবাগ প্রাসাদের সন্নিকটেই যোধপুর রাজ্যের সামরিক সেনা-নিবাস। এখানে সর্দ্দার বাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনারা থাকে। 'যোধপুর লান্সার্স'দের নাম সামরিক ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। রতনাদা প্রাসাদের সন্নিকটে মহারাজের বিরাট অশ্বশালা ও রথাগার। সারি সারি রকমারী ঘোড়া—মরোয়ারী, ওরেলার, [illegible] পানি, রাইডিং ও রেস হর্স ইত্যাদি। রথাগার রথের পরিবর্ত্তে অসংখ্য মূল্যবান মোটরগাড়ী [illegible] রয়েস্ থেকে সুরু করে বুইক, স্যালোন্ [illegible] শেভ্রলে, ফোর্ড 'কি' এইট, উ [illegible] ভারগাড়ী আর ব [illegible] লাইটো [illegible]

যোধপুরের মহারাজা ছিলেন স্বয়ং একজন উচ্চশ্রেণীর বিমান পরিচালক। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। তা ছাড়া যোধপুর রাজ্যই একমাত্র দেশীয় রাজ্য যেখানে ভারতের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বিমানঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। এখানে একটি বিমানঘাঁটি ছাড়া আরও কয়েকটি বিমানাবতরণের উপঘাঁটিও এখানে আছে। এ ছাড়া যোধপুর, দুটি প্রসিদ্ধ 'পোলো গ্রাউণ্ড' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড়দের অত্যন্ত সুপরিচিত। মহারাজার নিজের 'পোলোটিম' বিশ্বের পোলো প্রতিযোগিতায় বিশ্বজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল। মহারাজা স্বয়ং একজন অপরাজেয় পোলো খেলোয়াড় ছিলেন।

ভারতীয় স্থাপত্য কলার যাবিছু পরিচয় তা যোধপুরের প্রাচীন রাজধানিতেই দেখতে পাওয়া যায়। নূতন শহর একেবারে বিলিতি ধাঁচা। ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে রাঠোর বংশীয় রাজপুত সর্দার রাও যোধা যাঁর নামে আরাবল্লী উপত্যকার মরু প্রান্তরে এই যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাইল ব্যাপী সুদৃঢ় উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত ও নয়টি তোরণ দ্বার যুক্ত এই প্রাচীন রাজপুত নগর আজও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় চিহ্ন বহন করছে। নগরের নয়টি তোরণ দ্বার নয়টি রাজপথের উপর নির্মিত। যে পথ দিয়ে নিকটবর্তী যে নগরে যাওয়া যায় তোরণ দ্বার গুলির নামকরণ সেই সেই নগরের নামানুযায়ী হয়েছে। যেমন উত্তরে 'মারোরিয়া'। পূবে 'মাঠিয়া'। দক্ষিণে 'সোজাতিয়া'। 'জালোরিয়া' ও 'শিবাকিয়া' তোরণ দ্বয় দক্ষিণ-পশ্চিমে। পশ্চিমে 'চাঁদপোল' তোরণ।

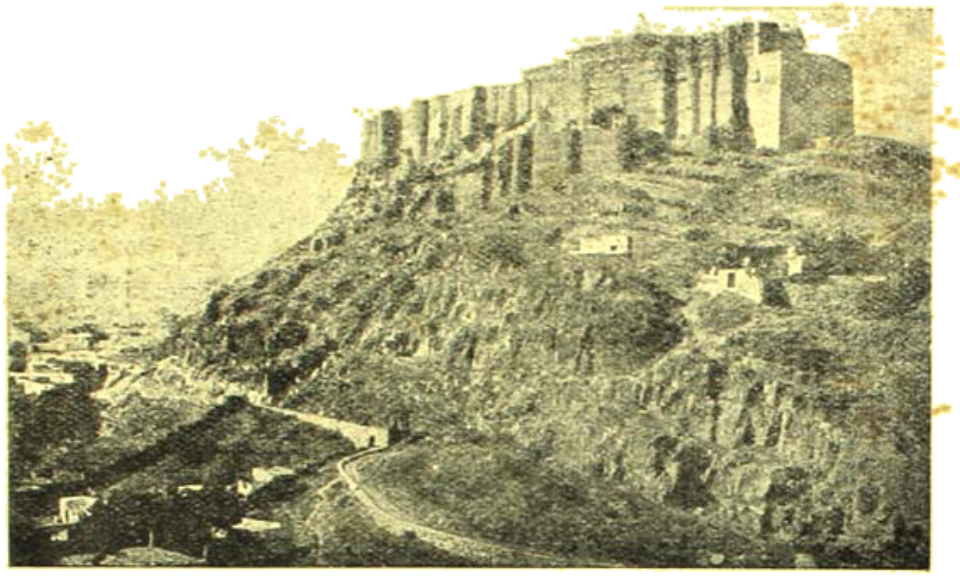

মারোরিয়া গেট হইতে কেল্লার দৃশ্য

যোধপুরের প্রাচীন রাজধানী 'মাণ্ডোর' পরিত্যাগ ক'রে রাও যোধাকে এই প্রাকার বেষ্টিত নগর প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল শত্রুর আক্রমণ থেকে নগর সুরক্ষিত রাখবার জন্য। 'মাণ্ডোর' আক্রমণ করা অত্যন্ত সহজ ছিল, কারণ একেই নগরটি ক্ষুদ্র, তার উপর, এর চারিদিক খোলা। যোধপুরের বিখ্যাত দুর্গেরও নির্মাণ কার্য্য ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

যোর গানখানি রেখে যাব
রাতের তারার প্রিয়
ঘুম-ভাঙা রাতে মোরে যদি পড়ে মনে
সেই গানে সাড়া দিয়ো।
মোর হাসি র'বে তোমার শিশির
একা পথে যবে যাবে তুমি ধীরে—
বনফুলে-ভরা মোর হাসিটিরে
আনমনে চিনে নিয়ো।

মোর বাণী রবে তোমার বীণার তারে
তোমার বুকে-জাগিবে আমার ঝোঁয়া
শাঁঝের অন্ধকারে।

প'ড়ে র'বে খেলাঘর খানি
হারাবেনা তবু মোরে, জানি—
এ জীবনে যত ভালবাসা দিয়ে গেনু
তারে তব সাথী করিয়ো।

সঙ্কটে মুনাফাবৃত্তি

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের (অন্ততঃ মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির) পুনর্গঠনের নীতি নির্দ্ধারিত হইবে, এই বাক্যের খই বড় বড় কথা দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা শুনিয়া আসিতেছি। এই উদ্দেশ্য লইয়া আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার, ইউ এন আর আর এ (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনঃসংস্থাপন সমিতি), এফ এ ও (খাদ্য ও কৃষি সমিতি) প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রমাণ করিবার দিন আসিতেছে তখন অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত্রেণীর সম্বল ও শক্তিমান দেশগুলির উপর এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব অতি সামান্য এবং এই অক্ষমতার ফলে দুঃস্থ ও অসহায় সমস্ত দেশগুলির দুর্দ্দশা বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষের অবস্থা বর্ত্তমানে এইরূপ। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর হইতে ভারতের খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা একটুও কমে নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতবাসী স্বতঃই আশা করিয়াছিল যে, এইবার অন্ততঃ সম্মিলিত জাতিসমূহের সহযোগিতায় তাহাদের দুঃসহ দুঃখের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংগঠিত হওয়ায় এইরূপ আশা করা অন্যায়ও হয় নাই। কিন্তু অভাবগ্রস্ত ভারতবর্ষে খাদ্যপ্রেরণ এবং প্রেরিত খাদ্যশস্যের জন্য দাম আদায়ের নীতিতে যে অসাচারের প্রাবল্য চলিতেছে, তাহা আন্তর্জাতিক খাদ্যপ্রতিষ্ঠানের সুনামের পরিচায়ক নয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষিপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোর করিয়া বলা হইয়াছিল যে, সারা পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমতা রক্ষা করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণ এই প্রতিষ্ঠানের নীতি।* ভারতবর্ষে কিন্তু অবটনের হিসাবে যে পরিমাণ পণ্য আমদানী হইতেছে এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ দক্ষিণা দিতে হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে উপরিউক্ত বাগাড়ম্বর অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

এ বৎসর খাদ্যশস্যের হিসাবে ভারতবর্ষের অভাব অন্ততঃ ৪০ লক্ষ টন। বৎসরের এযাবৎ পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক খাদ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ইহার মধ্যে আবার মাত্র ২ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এই আমদানীর বরাদ্দও যে ভারতে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের অনুপূরক, একথা আন্তর্জাতিক খাদ্যপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই জানেন।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদন শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই জানা গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে সব দেশের রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত আছে, তাহাদের উপর চাপ দিলে ভারতের ন্যায় বিপন্ন দেশে অধিকতর পরিমাণ খাদ্যশস্য যে প্রেরণ করা যাইত না, এমনও নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেন্টিনায় শুধু মাত্র গো মহিষাদির খাদ্য হিসাবে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৩ লক্ষ টন শস্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার একাংশমাত্র পাইলেই বহুসহস্র ভারতবাসীর প্রাণরক্ষা হইতে পারিত (যেসে খাদ্যাভাব ঘটিলে সেই অভাবজনিত আতঙ্কে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইয়া অপরের ও মজুতদারী যে বাড়িয়া যায়, একথা ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে নিষ্করুণ-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।) ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় উপরিউক্ত চারিটি দেশে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে (৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টন হইতে ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টন), তথাপি এই দেশগুলি হইতে বাটতি এলাকায় রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৩৯ লক্ষ টন কমাইয়া ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি টনে দাঁড় করানো হইয়াছে।

এই তো গেল খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা। খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অসহায় ভারতবর্ষের উপর দিয়া বিভিন্ন দেশের যে মুনাফাবৃত্তি চলিতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। আর্জ্জেন্টিনা খাদ্যশস্যের দিক হইতে উদ্বৃত্ত দেশ। আর্জ্জেন্টিনায় এক মুদ্রণ (প্রায় সাড়ে ৯ সের) ওজনের বস্তা পৌনে এক ডলারের মত (২৩/- টাকার কাছাকাছি), অথচ এই বস্তা আনিতে ভারতবর্ষকে ব্যয় করিতে হইতেছে প্রায় তিন ডলার। ব্রহ্মদেশ হইতে জাপবাহিনী বিতাড়িত হইবার পরও ব্রহ্ম হইতে ভারতে আমদানীকৃত প্রতি টন চাউলের দর ছিল ১৭ পাউণ্ড ১৭ শিলিং, ইহা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০ পাউণ্ড ৭ শিলিং ৩ পেনী হয়, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে প্রতি টন বর্ম্মী চাউলের জন্য উন্নত ও নিম্নশ্রেণীর হিসাবে যথাক্রমে ৩০ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স ও ২১ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইতেছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৯৮০ পাউণ্ডের প্রতি বস্তা গম ১ পাউণ্ড ১৪ শিলিং ৮ পেন্স দরে সংগ্রহ করিয়াছে, এই দর বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে ৪ পাউণ্ড ৮ শিলিংয়ে পৌঁছাইয়াছে। মার্কিণ

* "To develop and organise production, distribution and utilisation of basic food, to provide diets on a health standard for the people of the world and to stabilise agricultural prices at levels fair to the producers and consumers alike."

মুদ্রাস্ফীতির সময় ভারতবর্ষ গত বৎসরের হিসাবে এ বৎসর শতকরা ২০ ভাগ বাড়তি দাম দিতে বাধ্য হইতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, রপ্তানীকারক এই সব দেশের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধিই এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ, যুদ্ধাবসানের পর এই সব দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এখন কিছু হ্রাস পাইয়াছে যাহাতে সম্প্রতি পণ্যমূল্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইতে পারে।

সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ভারতবর্ষের শোচনীয় খাদ্যাভাব ও আর্থিক পরিস্থিতির বর্ণনা করিয়া রপ্তানীকারক উন্নত দেশসমূহের উপরিউক্ত মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। আবেগ ও যুক্তির দিক হইতে ডাঃ কাটজুর মন্তব্য মূল্যবান হইলেও এবং সাধারণভাবে (অন্তত তাঁহার কথা শুনিয়াই বোঝা যায়) সম্মেলন এইরূপ মূল্যবৃদ্ধির নিন্দা করিলেও সম্মেলনে উপস্থিত মূল্যদাতার দেশসমূহের সদস্যবৃন্দের উপর ইহা কোনরূপ প্রভাববিস্তার করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সংবাদপত্রের কাগজ

আধুনিক যুগে সংবাদপত্রের প্রয়োজন লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। ভারতবর্ষের ন্যায় বহু দিক হইতে পশ্চাৎপদ দেশেও সংবাদপত্রের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রের চাহিদা নিঃসন্দেহে আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজন বা চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও এ পর্যন্ত সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের জন্য ভারতবর্ষ অসহায়ভাবে ফিনল্যাণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাহির হইতে আমদানী সমুচিত হইয়াছিল বলিয়া যুদ্ধের সময় এদেশে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের কলেবর কিভাবে কমানো হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। যুদ্ধাবসানের দু বৎসর পরে এখনো অবস্থার কিছু কোন উন্নতি হয় নাই।

কাগজশিল্পের দিক হইতে সাধারণভাবে ভারতবর্ষ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ এ পর্যন্ত যে এদেশে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হয় নাই, ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে ৪০ হাজার টনের মত নিউজপ্রিণ্ট বা সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ আমদানী হয়। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণনীতি চালু থাকায় এবং তজ্জন্য সংবাদপত্রাদির কলেবর সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও এই আমদানীতে ভারতবর্ষের চলিতেছে না। ঠিকভাবে কাগজ ছাপিলে ভারতবর্ষে এখনই বৎসরে ৮০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টন নিউজপ্রিণ্টের প্রয়োজন হইতে পারে। অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনায় এই চাহিদা কিছুই নয়। বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৎসরে ১১ লক্ষ ১০ হাজার টন নিউজপ্রিণ্টের প্রয়োজন হয়।

'নিউজপ্রিণ্ট' শিল্পের ন্যায় বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনেক আগেই অবহিত হওয়া উচিত ছিল, দুঃখের বিষয় এদিক হইতে এতদিন তাঁহাদের বিশেষ কোন কার্যকরী আগ্রহ দেখা যায় নাই। অথচ বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতে 'নিউজপ্রিণ্ট' উৎপাদনের উপাদানের অভাব নাই। কাশ্মীর ও গাড়োয়াল রাজ্যের একপ্রকার কাঠ হইতে এই শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় এবং ডেরাডুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টীটিউটে এই কাঠ লইয়া বর্তমানে গবেষণা চলিতেছে। অনেকে এমনও মনে করেন যে সাধারণ কাগজ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান সাবাই ঘাস হইতেও সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। একাধিক ব্যক্তিগত একটি প্রতিষ্ঠান সাবাই ঘাস হইতে 'নিউজপ্রিণ্ট' তৈয়ারীর সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

বেলনাইয়ের কাঠ তৈয়ারী করিতে যে শ্রেণীর কাঠ (aerocolia camcanaluta) লাগে, তাহা হইতেও বর্তমানে নিউজপ্রিণ্ট তৈয়ারীর কথা চিন্তা করা হইতেছে। এই কাঠ আন্দামান দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এক টন এই শ্রেণীর কাঠ (কলিকাতার কারখানা হইলে) ১৫।১০ টাকার মধ্যে আনান চলে। বলা বাহুল্য এই কাঠ সম্পর্কে গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হইলে 'ভারতীয় নিউজ প্রিণ্ট শিল্প' দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিবে।

আনন্দের কথা, ইতিমধ্যে বোম্বাই-দিল্লী রেলপথের (জি-আই-পি) বারহামপুর-খাণ্ডোয়া লাইনের চাঁদনী নামক স্থানে প্রথম ভারতীয় 'নিউজপ্রিণ্ট' কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশের সিধার জেলার একশ্রেণীর কাঠ হইতে এই কাগজ উৎপন্ন করা যায় এবং এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বোম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিনিময়ে মূলধন লইয়া এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। (কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।) এই কারখানায় দৈনিক ১০০ টন নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হইতে পারিবে।

এতদিন বিদেশী শাসনের অভিশাপে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য কোন সরকারী সমর্থন দেখা যাইত না; আনন্দের কথা, রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিরও আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। চাঁদনীর নিউজপ্রিণ্ট কারখানা চালু করিতে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট নানা আশাতীত সুবন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা এই কোম্পানীর ১০ লক্ষ টাকা মূলধনে কিনিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কোম্পানীকে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যসম্পদ অবাধে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা তাঁহারা কারখানার জন্য ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন উপযোগী একটি বৈদ্যুতিক কারখানা (Thermal power station) তৈয়ারী করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই কারখানা সংগঠনের জিতর দিয়া ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় নূতন শিল্পের-তো জন্ম হইলই, সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে সরকারী সহানুভূতি ও সহযোগিতার নূতন ইতিহাসের পত্তন হইল।

সেলাইয়ের কল

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক শুল্কনীতি পরিবর্ত্তনের ফলে যে কয়টি ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ সুবিধালাভে সমর্থ হইয়াছে, সেলাই-কল শিল্প তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিদেশী সেলাই কলের প্রতিযোগিতার এদেশে তৈয়ারী কলগুলি এতকাল দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া এই সম্ভাবনাময় শিল্প এ পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। সরকারী সাহায্যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করিয়া এই শিল্প যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতীয় সেলাই-কল শিল্পের পক্ষ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে ট্যারিফ বোর্ড বা শুল্ক নির্দ্ধারক বোর্ডের নিকট সংরক্ষণ সুবিধালাভ সম্পর্কিত আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছিল। সুখের কথা, শিল্পটির ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুসন্ধানে সন্তুষ্ট হইয়া ট্যারিফ বোর্ড শিল্পটিকে সংরক্ষণ-সুবিধা দানে সম্মত হইয়াছেন এবং উপস্থিত বিদেশী সেলাই কলের উপর মূল্যানুযায়ী শতকরা ২৫ ভাগ শুল্ক সংস্থাপন করিয়া বোর্ড দেশীয় সেলাই-কল যাহাতে বাজারে সস্তায় বিক্রীত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বৎসরে ১৫ হাজারের মত সেলাই-কল নির্ম্মিত হয়। সংরক্ষণ সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যন্ত্রপাতির অসুবিধার জন্য আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় এই সংখ্যা একেবারে নগণ্য এবং দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি না হইলে এই শিল্পে সংরক্ষণ সুবিধা দান শেষ পর্য্যন্ত বিফল হইবে। যোগান ব্যবস্থা নিয়মিত হইলে ভারতবর্ষে এখন বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজারের কাছাকাছি সেলাই-কলের চাহিদা আছে বলিয়া শুল্ক নির্দ্ধারক বোর্ড অনুমান করিয়াছেন। সুতরাং এই শিল্পের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অন্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইলে ভারতীয় সেলাই-কলগুলি উন্নত ধরণের হওয়া দরকার। সম্ভাবনাময় শিশুশিল্প হিসাবে সেলাই-কল শিল্প যে সংরক্ষণ সুবিধা পাইয়াছে তাহা একান্ত সাময়িক এবং কিছুদিনের মধ্যে এই শিল্পকে খোলাবাজারে বিদেশী কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। সংরক্ষণ সুবিধা বাতিল হইলে (অর্থাৎ সস্তায় বিক্রীত হইবার সুবিধা হারাইলে) ভারতীয় সেলাই-কল শুধু দেশী জিনিষ বলিয়াই বাজারে কাটিবে না। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবার পর ভারতবাসীর নিকট হইতে সমান পয়সা ব্যয় করিয়া খেলো দেশী জিনিষ কিনিবার আগ্রহ অবশ্যই আশা করা যায় না। এছাড়া শুধু উন্নত ধরণের কল তৈয়ারী করিলেই চলিবে না, খরিদ্দারদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত ধরণের সেলাই-কল সুলভমূল্যে বাজারে ছাড়িতে হইবে। এছাড়া জনসাধারণকে কলে সেলাই শিখাইবার ব্যবস্থায় (বিদেশী কোম্পানীগুলির মত) ভারত তাঁহাদিগকে লইতে হইবে। মোটের উপর সেলাই-কল উৎপাদন, বণ্টন এবং কলে সেলাই শিক্ষাদানের ব্যাপক সুব্যবস্থা হইলে এদেশে একটি সমৃদ্ধ শিল্প গড়িয়া উঠিবে, বহু সহস্র ভারতবাসীর অন্নসংস্থান হইবে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাওয়া বন্ধ হইবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের স্থায়ী আর্থিক স্বার্থের দিক্‌দিয়া সেলাই-কল সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হইল, সংরক্ষণ সুবিধা-প্রাপ্ত প্রায় সর্ব্বপ্রকার ভারতীয় শিশুশিল্পের পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিমায় যাবার জোকবার আগেই হালির হয়া শেষ করে বুকলেন—কালাচাঁদ খুড়ো এসে ডেকেছেন, মাঝিকের সঙ্গে হাসি তামাসা চলছে। চিন্তা অথচই সঙ্গে করে নিয়েছিলেন, তাদের বাইরে রেখে, মুখ হাসি নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকে পড়লেন! "আঃ বাঁচলুম, সাহেব এখনো বলেন—চা খাবে?"

খুড়ো বললেন—"আরে ও তোর জাত সাহেব নয়, মিডিউল ক্লাসের সাহেব। জমটা গেল ওই জন্য চটিয়ে। বিলিতি সাহেব না হলে আবার সাহেব! আসল সাহেব চোখ লাল ক'রে বিঁচিয়ে থাকবে, বাপ বলতে শালা বলবে, yes বলতে No বলবে cloth Carrier জীবের মত সুমসুর আওয়াজ ছেড়ে, ঠিক কাজ করলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেবে,—তবে না সাহেব! কেবল চা খাও। কোনো জিজ্ঞা করেন না—ছুটো রসগোল্লা খাও। তার পয়সা যে আমাদের মরা পাবে, এ দেশেই থাকবে। আমরাও কেন নিশ্চিন্তে আর নিঃস্বার্থে পরের উপকার করে যাচ্ছি—এক পেয়ালা চা বইতো না। তা'তে Lipton-এর কিছু বাড়তো বাড়ুক না। উপরের মেহার দয়া"—

জিজ্ঞাস—"আমরা কি আর কিছুই করছি না খুড়ো! কিছুই কি বাড়াচ্ছি না—বাড়ছে না?"

খুড়ো—"বেইমানী করব না—বাড়াচ্ছি বই কি, বাড়ছে বইকি। সাহিত্য বেশ কোমর কষে কলম পিষছে দেখছি। তার ঘরায় দশ দিক থেকে "পারবীয়া" বেরিয়ে আসছেন—তাদের সংখ্যাও শশী বাড়াচ্ছে, কিন্তু বাড়ছে বইকি। পাতা ওলটালেই পাঁচটা পরিস্থিতি ভীতি

বাড়ায়! পারিপার্শ্বিক তার অগ্রজরূপে পূর্ব্বেই পৌঁছেছেন। 'দৃষ্টিকোণ' জবে কোনঠাসা করছে, প্রায় কুপ্তীর মতই মিষ্টি।"

শুনে সকলে হাসলেন।

খুড়ো বললেন—"এটা বোধহয় বাড়াবাড়ির দিন, কিশোরেরও কিছু ছেড়ে থাকবে—আমাকে বললে—অনেক কথা আছে। কথা থাকবে বইকি—বাঙালীর কথাই বাড়ে। বাসাটি দেখছি খুব সুন্দর অগিল—মোরে ধিল দিতে হয় না।"

কিশোর—"বাড়ীর প্রভাব নাকি—খিল না থাকা? উল্টো কথা হোল যে।"

খুড়ো—"একটুও নয়, খুড়ো উল্টো কথা কয় না। তুমি জান না—সেকালে ব্যাঙ্ক-টাঙ্ক বড় ছিল না, এখন হয়েছে—গলিতে গলিতে—ঘুমাজাবে গোয়ালেও। লাখ্ টাকার লোকেরা অর্থাৎ বড় লোকেরা তখন 'পাকৃ' রাখতেন—যাকে 'লেবেল' বলা হয়। তাদের first condition থাকতো—'বাড়ির সব দরজা খোলা রাখতে হবে, তবে থাকবো. খিল দিতে পারবেন না।'—'সে আবার কি, তোরা থাকবি কোথায়?'—পাকেরা বলতো—যেখানেই থাকি না, তাতে আপনার দরকার কি? সেটা জানার না জানাটাই নিরাপদ। ছেচরেও থাকতে পারি, বাইরেও থাকতে পারি। কেউ না বোঝে—কোথায় আছি। তাতে মাথা গলাতে কেউ সাহস পাবে না। তারাও মানুষ, তাদেরও প্রাণের ভয় আছে।—কিশোরেরও তাই নাকি?"

"আজ্ঞে না। আমার খিল নেই বলেই খোলা থাকে।—ডাক্তারেরা খিল দেবে কেনো, তারা Bill দেয়। খুড়ো বললেন—তবে নির্ভয়ে থাকো। ভরতো মানুষকে যে, তাদের যা আমাদের চেয়ে ভীরু জীব আবার কে? তোমার এ qualified castleএ রাতে কেউ ঢুকবে না, লোকের ঘুমের ভয়ও তো আছে।"

মাণিক চা দিয়ে গেল। খুড়ো বললেন—"আচ্ছা এইবার তোমার বলার কি আছে বলো।"

কিশোর তখন সাহেবের সঙ্গে তার যা যা কথা হ'য়েছিল যথাযথ সব খুড়োকে বললেন। পরে বললেন—আমার যে বিপদটা ছিল তা হয়তো কেটে গিয়েছে বা যাবে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। তার ব্যবহারে মনে হয় সে আমাকে সত্যকার শ্রদ্ধা সম্মান ও ভক্তি করে। আমাকে আশা দিয়ে বলেছিল—"কোনো ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার বন্ধু হ'তে দেব না।"—আমার মাথা দেবার ভার নিয়ে যে এসেছিল, পরে নিজের মাথা দেবার ব্যবস্থা সে করে কেন?—কোন স্বার্থে আশায়? নিজেই যদি গেলুম তার পর তার স্বার্থই বা কোথায় থাকে? আত্মরক্ষার চেয়ে বড় কিছু আছে কি?

খুড়ো বললেন—"ওটা এখন বড় কথা। তার আর Importance কি? নাই বা দিয়ে মাথা বাঁচালে।"

"না খুড়ো। অতবড় দুর্বৃত্তের কথায় বিশ্বাস করা আমার উচিত কি। সাহেবের কথামত এখান থেকে সরে গেলেই যে এর হাত থেকে রেহাই পাব তারই বা ঠিক কি? যুধিষ্ঠিরের আমার প্রতি এ অভিভক্তিই বা কেন?"

খুড়ো বললেন—"জানের কথা আর বাড়িয়ে কাজ নেই, সহজ কথাই ভালো। এখার তার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারাদি দেখে শুনে, তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আমি নিজেও আশ্চর্য্য হয়েছি। সে এখন অনেক কিছু ভাবে, আমলমাও থাকে। তাতে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন বাদ না দেলেও, ঘাঁটাঘাটিটা বন্ধুর হতেও পারে। সে নিজেই আমাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছে, তাতে বুঝলুম—সে তোমাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছে ও বোঝবার চেষ্টা করেছে। অবশ্য ঐ কাজের জন্যে সে তো এসেইছিল, সুতরাং তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাকে তা বলার কারণ আমি ঠিক করতে পারিনি। সম্ভবত তার বিপন্ন অবস্থায় বিশেষ সেবা যত্ন করে' তাকে বাঁচাই, পুলিসের হাতে দিইনি, সে কথা সে তোলেনি স্মরণ রেখেছে। যা তার মত দুর্বৃত্তের কাছে কেউ আশা করতে পারে না। এটা তার বংশের পরিচয় দেয়। তা ছাড়া আর কিছু তো ভেবে পাই না। তার কাছে যে-সব কথা শুনছি তা শুনে দলের লোকের মুখে শোনার কথা নয়—সে সব কথা তাদের কাছে হাসি তামাসার জিনিষ। তোমার কাজকর্ম, কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করে সে কি পেয়েছে—সেই জানে। কিন্তু আমি পেলুম তোমার উপর তার অসীম শ্রদ্ধা; যা মানুষের উপর মানুষের সহজে হয় না। আর সেটি সত্য বলেই আমার বিশ্বাস। যাক্ তোমার যখন কাজ হয়ে গেছে, তখন ও বৃথা চিন্তা মাথায় রেখ না।

কিশোর লজ্জিত ভাবে বললে—"পূর্ব্বে 'বৃথা' ছিল না খুড়ো। এখন আর রাখব না।"

খুড়ো বললেন—"বেশ কথা। কিন্তু আমার নিজের চিন্তা যে হয়ে যাচ্ছে।"

আমার এ কুকাজ হতে রেহাই পাবার উপায় না হলে পেনসনটি যে পা বাড়াবেন, জেলের ফটকও ছাড়াতে পারেন। টুপিস্ কিশোরীকে পড়িয়েছিলুম—এতদিনে সে গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা করলে। সাহেবের ও কুকুটে কাজের জন্যে সে আর লোক পেলে না।

"কাজটা কি আমি তো সঠিক জানি না খুড়ো।"

"ওরা (সাহেবরা) কি উদ্দেশ্যে কখন কি করে তাকি এতদিন সংসর্গ করে আমিই বুঝতে পারলুম! কিশোরী লিখলে—তুমিতো আছো, অনেকদিন দেখিনি—দিন কতক এখানে এসে থাকলে বড় খুশি হব। ভাবলুম এত সহজে আহ্বান, না গেলে দুঃখিত হবে—বাসনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সহজে কিশোরী যে এদিকে আমার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে তা কে জানতো।"

কিশোর—"ওই ফাঁদের কথাটাই তো জানতে চাচ্ছি খুড়ো।"

"শোনো বা। এখানে গিয়ে এসে বললে—সাহেব আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, একজন ভাল লোক খুঁজছেন। যান না, দুএকদিন কিছু শুনিয়ে আসুন। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। বললুম—আমি Government Pensioner যে, যদরং দিয়ে খেলা চলে কি।

তুমি এ গ্রহ ছুটিয়ে রেখেছ জানলে কি এদিকে পা বাড়াই.—আমি আজকের ট্রেণেই পালাব। সে কিছুতেই শুনলে না—সেটা খাস কামরায় ঢুকিয়ে দাড়লে।—

"তোমাদের সাহেব বসেছিলেন। উঠে আপ্যায়ন করে দরজায় হাত মেলালেন। বললেন—আমি শুনেছি তুমি একজন সত্যবাদী লোক। এদেশে নতুন এসেছি, তোমাদের দেশ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক কিছু শোনবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। সেজন্যে তোমাকে তোমার demand মত পারিশ্রমিক দেব, অমনি কষ্ট দেব না।"

মনে মনে ভাবলুম, বুদ্ধিমানের মাত কটে, খরের খবর নিতে চান। মুখে বললুম—'তবে আমার দ্বারা হবে না হুজুর, আপনি ঠিক লোক বেছেননি, ভুল করেছেন। আমি ঠিক সত্যবাদী নই। যা বললে প্রভুরা খুশি হন, তাই বলতে শিখেছি। আর পারিশ্রমিকের কথা তুলছেন কেন, আপনাদের হুকুম শুনতেই তো আমরা অভ্যস্ত। হুকুম করলেই যথেষ্ট।'

সাওয়াল এল—'কাজ করে বিয়ে তার পারিশ্রমিক নেবে না কেন, সেটা তো জানতে পারনা।'

বললুম—'কে বললে আপনাকে। As fathers did, so sons do—ওদের রংয়ের দাম নেই কি। আবার শাদা কালো মিশ্রিত আপনাদের brown আমলার frownএর দাম আরো বেশী। মামলায় ফাঁসাবেন না।'

'কি রকম?'

'এই যেমন সূর্য্যের তাপের চেয়ে, তার তাপে উত্তপ্ত বালুর তাপ অনেক বেশী।"

"আমার টাকা আমি দেবো—say প্রতি প্রশ্নের উত্তর পিছু পাঁচ ডলার করে, তাতে তোমার আপত্তির কারণ কি?"

বললুম—আমরা তিরিশ টাকা মাসের লোক, এত টাকা দেশ ফ্লেচ্ছ চির obargoa সাজা নেবে কে? ছেলেপুলে একদিন মেঠাই খাচ্ছে দেখলে, সেটাই সন্দেহ জাগায় ও জাগাবে।"

'মারবে কে?'

'রাজ্য শুদ্ধাসনের জন্যে দিশী Red army বহৎ ছেয়ে, তারা bed থেকে টেনে নিয়ে যাবে। কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করবে না। ওসব কথা থাক হুজুর। আর মিথ্যে কথা শুনেই বা আপনার লাভ কি? আমায় ছেড়ে দিন।'

সাহেব। 'আচ্ছা যাও, চাকলেই এসো। তোমার পাওনার হিসেব আমি লিখে রাখছি, পরে নিও।'—

"এই পর্য্যন্ত হয়ে মামলা মুলতুবি আছে। সত্যি কথা বলতে হবে, একি পাপ! আমার চোদ্দপুরুষে তা পারে না। ও বস্তু অন্যের কোনো ভদ্রলোকের নেই। আছে কি, তা তো জানি না? এখন বাঁচাও, আমি পালাই। সাহেবকে বলে যাও বাবা—আহা লোকটী ভালো ছিল, পাগল হয়ে গিয়েছে দেখছি—ওকে ছেড়ে দিন। আমি অন্য লোক দেখছি।"

বিনোদ হেসে বললে—"সে হবে, এখন শুনুন বুড়ো—সাহেব বড় ভাল লোক। কোনো ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

'ওই নিশ্চিন্ত থাকাটাই তো বিপদের কথা হে। আচ্ছা, অদৃষ্টে যা আছে হবে—এখন উঠি।'

বুড়ো উঠতে সভা ভঙ্গ হল।

* * * *

অন্ধকার হয়েছে, ডাক্তার মাথা হেঁট করে দ্রুত চলেছেন। হঠাৎ কানে এলো—ডাক্তার দাঁড়াও, কথা আছে। বিনোদ চমকে গেলেন—আপনি এই অন্ধকারে একা?

"তোমাদের দেশে আলো কোথায়?" বলে সাহেব হাসলেন। চারিদিকেই তো অন্ধকার। দেশটা তবু লোকের খনিতে এর সব ফেলেও সবই আছে—থাকবেও। মানুষ আছে, হৃদয় আছে, বুদ্ধি আছে, নাই কেবল নিজেদের মধ্যে একতা। বিরুদ্ধ দল সব দেশেই থাকে। দেশের বিপদের সময় সকলে এক হয়। এখানে তার উলটো দেখছি। দেশের বিপদে এরা রোজগারের পথ পায়। ঠিক সতীনের ঘরকন্না।

এত বড় দেশে বিভিন্ন দল থাকবে না? থাকবে বইকি। এখানে 'দল' নয়, যেন শত্রুপক্ষ। নিজের দেশের টাকা, ধন, সম্পত্তি নিজেরাই লুটে খেতে অভ্যস্ত। তাতেই আনন্দ, তাতেই সুখ, তাতেই জিত! ভাবো—বিদেশী শুধুর অনুগ্রহে যেন আছি, দুর্ভাবনা নেই। দেশটা যেন তাদের নয়। যারা এটাকে নিজের দেশ বলে ভাবে, তারা কেবল ভোগে, কষ্ট পায়, নির্য্যাতন সহ্য করে। যারা লেখাপড়া কিছু জানে, তারা একটা জিনিষ এদের কাছেই শিখেছে—দেশের লোককে মুর্খ করে রাখতে পারলেই নিরাপদে থাকা চলে। করে রেখেছেও তাই। শিক্ষিতেরাই প্রধান শত্রু। আসল কথা দেশকে এরা ভালবাসে না।" যাক এত কথা তোমাকে বললুম কারণ—কিছুদিন থেকে তোমাদের দেশ সম্বন্ধে আমি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি, কেন বিষয় ভাবছিও। আমার উদ্দেশ্য, এতদিন বইলুম একখানা বই লিখি, কিন্তু শুধু official document-এর উপর আমি নির্ভর করতে চাই না। একজন খাঁটি লোকের মুখে কিছু শুনতে চাই—তাই তোমাদের বুড়োকে আনিয়েছি। লোকটি একটু peculiar কিন্তু প্রথম দিনই আমাকে খুব impress করেছেন। বুঝিয়ে ব'লে কাল ওঁকে নিয়ে একবার আসবে?

"আপনি যখন বলছেন—মানব বইকি"

"আচ্ছা, ঐ আমার বাসা দেখা যাচ্ছে। এবার তুমি যাও—Good night."

সাহেবের খাস কামরায় বুড়ো আর বিনোদ বসে আছেন। সাহেব বুড়োকে বললেন—"বিশেষী তুমি নাকি old manদের বুদ্ধির মর্য্যাদা দাও না—I mean youngদেরই ভালবাসো। কেনো?"

"ঠিক তা নয় হুজুর—তাঁদের যা জানবার বা করবার ছিল, তা তাঁরা

৭৮টার অধ্যেই ঘুরিয়ে চলে যাবেন। অবশ্য honourable exception থাকতে পারে।"

"কিন্তু আমাদের দেশে তাখো—যত বড় বড় 'প্রিমিয়ার', প্রেসিডেন্ট ষাটের পর হন, সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন।"

ঘুড়ো—"তার অবশ্যটাই তো পরের রাজা—যা নিয়ে মধ্যস্থতা খেলা চলে। Pitt কিন্তু ২৪ বছরে 'প্রিমিয়ার' হয়েছিলেন এবং ১৭ বছর 'প্রিমিয়ার' ছিলেন, তাঁর মত কজন হয়েছেন জানি না Sir—I mean মহৎ বিরোধক। youngএর হুমরটা নষ্ট হবার (নিদর হবার) সময় পায়নি—অতি বুদ্ধি তাদের অস্ত করেনি। পরমুখপেক্ষা আছে। যাক্ আর কিছু হুকুম আছে কি?"

সাহেব একাগ্র মনে শুনছিলেন, বললেন—"unoleকে হুকুম করা চলে না। দুয়েকটা কথা শুনতে ইচ্ছা করি—"

"বলুন।"

"তোমাদের দেশে সস্তা কি?"

"অনটন, অনাহার, রোগ, আর মৃত্যু—"

"এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা?"

"কেন, ভয়ঙ্কর বলছেন কেন, লোক মরবে না?" আমাদের গরীব দেশ—সস্তা জিনিষই তো লোক খোঁজে। ওর চেয়ে সস্তা কিছু তো দেখতে পাই না।"

সাহেব—"অনাহারে মৃত্যুকে খোঁজে?"

ঘুড়ো—"যারা বাঁচতে চায় তারাই Sir—আমাদের দেশে মরাটাই যে সত্যিকার বাঁচা।"

সাহেব—"কই, কোনো দেশের মানুষেরই মুখে এমন কথা তো শুনিনি—"

ঘুড়ো—"আপনাকে কে বলেছে যে আমরা "মানুষ"। 'ফেমিন' কথাটা বাই বা বললুম, ওটা আমাদের দেশের কথা নয়। হাজার হাজার লোক, নিত্য দেখছেন বাঁচবে বয়ছে। প্রার্থনীয় যা হলে কেউ তা পায়ত কি? আর আমাদের সবার বড় সস্তা জিনিষ হচ্ছেন ভগবান, তাঁর ইচ্ছা পালনে আমাদের পুণ্য আছে যে। তাঁর ইচ্ছাতেই সব-ফল—অনাহারে মৃত্যুও।"

"ও কথা থাক্, বড় depressing লাগছে। আজ Sunday, প্রভুর প্রসাদার। দুটো ধর্মকথা আজ শুনবো।

"কেন, যা শুনেছি বলব। ধর্মকথা কিন্তু সকলে শুনতে পায় না। মায়ের চাবিটে ফেলে এসেছি বলে পরে পড়ে। ওর চেয়ে যাবেকথা নেই কিনা! আপনার চাবি ঠিক আছে তো।"

সাহেব হো হো করে হেসে বললেন—"Bravo Uncle, তোমার চেয়ে ধনী লোক পাব না।"

"তাহলেন না, অনেক আছে—আচ্ছা বলুন—"

Richman কারা?

"যারা অনেক poorকে ফাঁকি দিয়ে ধনিক হয়েছে ও হচ্ছে বিশ্বাস"

"আচ্ছা Truth কি?"

"Master যা শুনলে খুশি হন।"

"সবার চেয়ে শক্তি ধরে কে?

"মিথ্যা। সাহেবের মুখেও ওর চেয়ে বড় অস্ত্র আমি তো দেখতে পাইনা হুজুর। অস্ত্র অস্ত্র হত্যা করে, এ অস্ত্রটি মেরে রাখে। যাক্—ধর্মকথা হচ্ছে কই?"

"Thank you—আমি শুনেছিলুম—ভারতবর্ষ অতিথি সৎকারে অধিতীয়, তার প্রমাণ কি?"

"আপনি history পড়া লোক; নিজেও কিছু কিছু দেখেছেন; তার চেয়ে প্রমাণ আমি কোথায় পাব। পূর্বের কথা এখন সকলেই ভুলে আসছে—যখন এই ভারতের সৈন্যিকেরা অনটনের দিনে লাখা সোলজারদের খেদায় নিজের নিজের ভাতগুলি খাওয়াতো, নিজেরা ফ্যান খেতো। পূর্বপুরুষদের সেই অভ্যাস পেয়েছিল বলে এবার এই দুঃসময়ে তারা ফ্যান খেয়ে ও ছেলেপুলেদের বাইরে, দিনকতক যুঝতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত সবাই প্রাণ দিলে, এ সবই তো অন্যের জন্যে ও অন্য দেশের জন্যে। সত্য কি?"

সাহেব। হতে পারে, কিন্তু আমার কিছু বলবার কথা তো নয়, আমার শোনবার কথা। এখন বলো—সবার চেয়ে তোমাদের বড় বন্ধু কে?

"Death মৃত্যু। Interviewএর উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত আর ঘরিত হওয়াই নাকি নিয়ম, আমিও সেই চেষ্টা পাচ্ছি।"

"তোমার উত্তরে বোধ হয় ভুল নেই। আমাকে কিন্তু ধীরে করে দিচ্ছে।"

"তবে সত্য করে ছেড়ে দিন।"

"না না, আমি তা বলছি না। আমার যখন যা মনে আসে জিজ্ঞাসা করি। পরীক্ষা নেওয়া নয়, শোনাই আমার কাজ। আচ্ছা, ওরকম প্রশ্ন আর করব না।"

"আমি আপনাকে আগেই বলেছি—আমি আপনাদের হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত ও বাধ্য।"

"আচ্ছা আর একটা মাত্র কথা। পূর্বে Truth সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ সেটা তো তোমার নিজের কথা নয়—মন রাখা কথা নয় কি?"

"কি করি বলুন, master's voice বলতেই হয়। আজকাল সকলেই তা সাগ্রহে শুনেছেন ও ভালবেসেছেন; তাই তাঁরা যা শিখিয়েছেন তাই বলি। লাট কর্জন ছিলেন লাটের সেরা। তিনি দেখে গেছেন—"এদের অর্থার্থ আমাদের truth বলে কিছু নেই।" ঐ একটি মাত্র truthfulnessকে বহুযাগ্যে পেয়ে India কৃতার্থ হয়েছিল। তাঁর truth পাছে ব্যর্থ হয় তাই সে অমূল্য সম্পদ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এদেশের লোকে সস্তা করে 'লয়ার' বা Lawyer রাসবিহারী ঘোষের মুখ থেকে তাঁর truth এর খ্যাতি শুনে ও-সম্বন্ধে কিছু কিছু আমদানী সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছেন, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

"Truth সম্বন্ধে তাঁদের কাছেই আমরা কিছু কিছু শিখেছি ও

শিখছি সুতরাং truth সম্বন্ধে আমার যার কল্পা ধারণা। সেইমানী করব না, তার প্রতি অগাধ ভক্তি রাখি এবং হুকুম হ'লেই তদনুরূপ কাজ করি অর্থাৎ সত্য বলে কিছু আমাদের নেই। তাঁরা যা বলেন ও শুনতে ভালবাসেন তাই বলতে জানি। যাঁরা বিদ্বান বা বুদ্ধির দোষে অন্য রকম বলে ফেলেন—তাঁরাই ভয়ঙ্কর লোক, Men of vicious type. তাঁরা মহত্বের ওরূপ বলেন এমনও হতে পারে, কারণ তাতে হাতে হাতে লাভ আছে; জজের অর্থাৎ সরকারের খরচে জজের বাড়ীতে খাওয়া শোয়া চলে। এ গরীব দেশে রেলগুলো কি কম উপকার করে!"

সাহেব। "আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্তই থাক—"

"আজ্ঞে হাঁ, বক্তব্য তেমন কিছু নয়—আগেই বলেছিলুম তো; তবে আপনার অনুমতি নিয়ে এখন আমরা উঠি।"

গুড়ো ও বিনোদ উঠলেন। সাহেব বাইরে পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে বিনোদকে বললেন—"তুমি তো একটিও কথা বললে না ডাক্তার, এখনও মন খারাপ না কি?"

"আজ্ঞে না, সে সব কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলেছি।"

"বেশ করেছ। আমি তোমাদের আপিসে রিপোর্ট পাঠিয়েছি যে, এখানকার control-এর দরকার নেই। বোধ হয় সবরই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। তার পর কি করবে ভাল করে ভেবে ঠিক করে ফেল। তোমার নিজের কোনো Plan আছে কি?"

"আজ্ঞে না, এখনো কিছু ঠিক করিনি। জেলের জন্যেই তৈরী হচ্ছিলুম, আর কিছু ভাবার ছিল না। এবার ভাবতে হবে যদিকিও আছে।

সাহেব। "Uncle-এর পরামর্শ নিও, খাঁটি জিনিস পাবে—"

গুড়ো শুকনিলেন বললেন—"হাঁ, Vagabond অর্থাৎ বাউণ্ডুলে হ'তে হবে, আমার কাছে ভীক্ষা নিতে পারে। আমার পেশা কিনে কিনা।" সকলে হাসলেন।

সাহেব বললেন—"ওখান থেকে ছাড়া পেতে তোমার যাতে দেরী না হয় তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাজ চুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, ভবিষ্যতে যা করবে—তাতে কোনো সাহায্য করতে পারলে আমি আন্তরিক খুশি হবো। এসব আশা করি তোমাকে নতুন করে বলার দরকার নেই। আচ্ছা তোমাদের আর detain করব না—Good day—" বলে গুড়ো ও ডাক্তারকে বিদায় দিলেন।

বিনোদ কিছু বলতে পারলে না, সাহেবের উদার দাক্ষিণ্যে তার চোখ জলে ভরে এসেছিল। গুড়ো বললেন—"আগেই বলেছিলুম বাবাজি—Trade mark লাগান খাঁটি সাহেব নয়। তা হোক্—খুঁটো জোর যার—আগের কাজ কেবে। সাহেব নয়—'ভাল মানুষ' বলতে পারি।"

বহু দূরে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

সবরমতীর আশ্রম আজো পড়িয়া রয়েছে দূরে,
এখনো পথের অনেক যে আছে বাকি!
গুরুর কণ্ঠে বৃথা শুনিতে পাইতে হারায়ো সুরে,
বেদনায় প্রাণ কাঁদি উঠে থাকি থাকি!
সবরমতীর আশ্রম পথে পান্থ ফিরিতে চায়,
শান্ত নদীর সিকতা বেলায় হাসে।
ক্লান্ত পথিক চলিয়ে একাকী সঙ্গী খুঁজি না পায়,
ধূলি-ধূসরিত সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
মুখমুখে রাখিয়া তিমির রাত্রি যাত্রী তবুও চলে,
পথ-কণ্টক পুষ্প বলিয়া মানে,
নয়নে তাহার তপ-সংযম লক্ষ প্রদীপ জ্বলে,
ক্লান্ত তনুতে নব উদ্যম আনে।

দেশের আঁধারে আশার তারকা লুপ্ত হইয়া যায়,
ভেসে আসে কানে বন্দিকার গর্জন
পথিকের পানে তুলিয়া আজিকে কেহ না ফিরিয়া চায়!
বিশ্ব তাহারে করিয়াছে বর্জন!
দুর্যোগ মাঝে জ্বলি উঠে পথে বীণ্ড বহ্নি লেখা,
শোনা যায় শত-মানব-কণ্ঠস্বর
এত দিন পরে চির বাঞ্ছিত দিন কিরে আজ দেখা?
পান্থ কি তবে ফিরিয়া পাইল ঘর?
না, না, এত নহে সবরমতীর আশ্রম-হোম-শিখা,
বিশ্রাম-ভূমি দূরেতে সরিয়া যায়!
এখনো সময় আসেনি ললাটে পরিতে জয়ের টীকা
ডাকে মোরাখালি অঙ্গুলি-ইশারায়!

কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত কয়েকদিন পূর্বেকার কথা। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান দুইটি রাষ্ট্রই স্বাধীনতা সমাগমে আনন্দমত্ত ও উৎসবমুখর। একদিকে রাজনৈতিক চেতনা, অপরদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণে বিরত ভারতের উভয় অংশেই সমাজের অতি নিম্নস্তর পর্যন্তও ইহার আহ্বানে সাড়া দিয়া পৌঁছিয়াছে। পাকিস্থানে বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্থানের হিন্দুরা কেবল এই উৎসব আহ্বানে সাড়া দিতে পারিতেছে না। ১৫ই আগষ্টের আগমনে তাহারা নিরানন্দ, ভীত, সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভাগ ছুরের যোগসাজ শীলের পাকিস্থান দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে, তখন হইতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের সহিত এরূপ আচরণ করিতে থাকে, যাহার ফলে ১৫ই আগষ্ট নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ভয় ও আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা হিন্দু প্রতিবেশীদিগকে পাকিস্থান আসিলে তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হইবে একথা জানাইয়া দিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করিতে যাইয়া কোথাও কোথাও বাধা পাইয়াছে, এবং পাকিস্থান পাকাপাকি হইয়া গেলে হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া কবর দিতে হইবে একথাও কেহ কেহ ঘোষণা করিতেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমান যুবকদের কুদৃষ্টি ইঙ্গিতে বহু হিন্দু ছাত্রীরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গলার দিকে চলিয়া আসিতেছে।

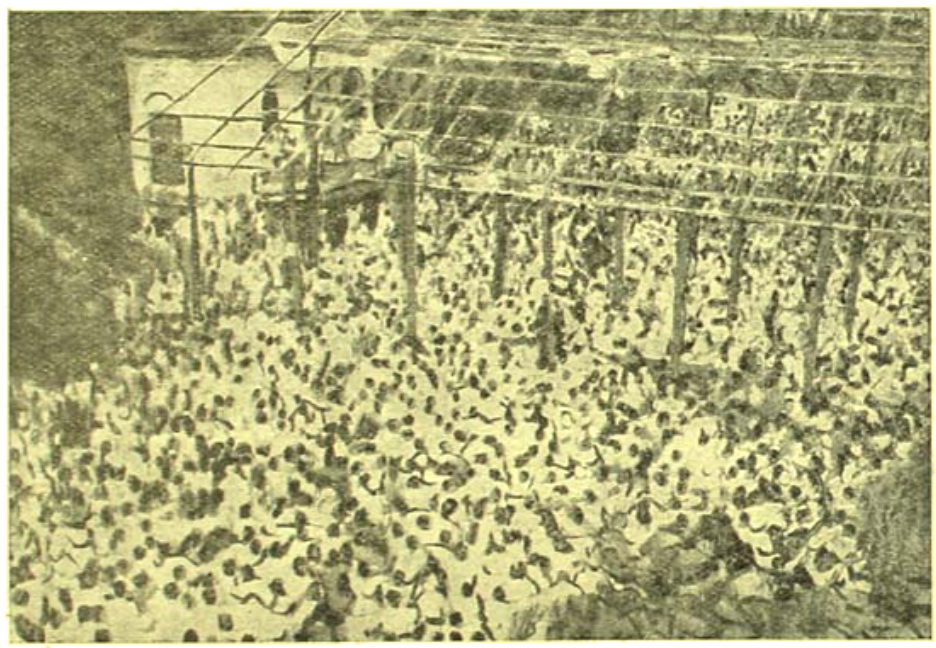

বেলিয়াঘাটা প্রার্থনা সভায় বিপুল জনসমাবেশ ফটো—শ্রীপান্না সেন

পূর্ববঙ্গের যখন এইরূপ অবস্থা, যখন তাহারা নোয়াখালির পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় শঙ্কিত তখন জাতীয় নেতারা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নেতাদের প্রতি জেলায় গিয়া হিন্দুদের অভয় দিবার কথা জানান হইল। কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের সমস্ত প্রবাসী যুবক ও প্রৌঢ়কে ১৫ই আগষ্টের কয়েকদিন পূর্বে ও পরে নিজ নিজ গ্রামে গিয়া বাস করিবার কথাও জানাইলেন। দুর্গত-বন্ধু মহাত্মা গান্ধী এই সময়ে দিল্লী হইতে কাশ্মীরে। মৌলানা আজাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি কাশ্মীর গিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, কাশ্মীর ভ্রমণের পর স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করিবার জন্য দিল্লীতে তাঁহার স্থান নহে, পূর্ব বাঙ্গলার উপদ্রুত অঞ্চলই হইল তাঁহার যোগ্য স্থান। তাই তিনি ভারতের সুদূর একপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে অপরপ্রান্তে নোয়াখালির পথে রওনা হইলেন। ৯ই আগষ্ট প্রাতে তিনি সোদপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মহাত্মাজী স্থির করিয়াছিলেন মাত্র একদিন সোদপুরে অবস্থান করিয়াই তিনি পূর্ব বাঙ্গলায় যাত্রা করিবেন কিন্তু সোদপুরে আসিয়া তাঁহার সে সঙ্কল্প ওলট পালট হইয়া গেল। কলিকাতার এই সময়ে আবার হিন্দু-মুসলমানের যাত্রা চরম আকার ধারণ করিলে, তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। নোয়াখালি যাত্রা তাঁহার স্থগিত হইয়া গেল।

১৩ই আগষ্ট তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি স্থির করিলেন, কলিকাতার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য তিনি আমরণ অনশন করিবেন। ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যায় তিনি বেলিয়াঘাটায় হাজী সোহরাওয়ার্দীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। সেখানে তিনি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং পশ্চিম বঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সহিত এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং ১১ই তারিখে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরিয়া আসিলেন। অবশেষে তিনি এইদিন সন্ধ্যায় মিঃ সুরাবর্দীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন—কলিকাতায় দাঙ্গা নিবারণের জন্য আসুন আমরা উভয়ে একসঙ্গে শান্তি অভিযানে বাহির হই, বিপন্ন অঞ্চলের কোনও একটি পরিত্যক্ত গৃহে আমরা উভয়ে একই কামরায় বাস করিব। দুইজনেই একসঙ্গে দুর্গত হিন্দু-মুসলমানের দুঃখের কাহিনী শুনিব।

প্রস্তাবটি মিঃ সুরাবর্দীর নিকটে এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উহার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে তিনি মহাত্মা

গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও কন্যার সহিত পরামর্শ করিয়া, পরদিন মহাত্মাজীর প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন।

১০ই আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধী সোদপুর ত্যাগ করিয়া বেলিয়াঘাটার একটি পরিত্যক্ত মুসলমানের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দল বল সমস্তই সোদপুরে রাখিয়া আসিলেন, মাত্র তাঁহার সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী ও কুমারী মানু গান্ধীকে সঙ্গে লইলেন। মিঃ সুরাবর্দীও আসিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত একই কামরায় বাস করিতে লাগিলেন। বেলিয়াঘাটার ঐ স্থানটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারাই অধ্যুসিত।

বেলিয়াঘাটার হিন্দু অধিবাসীরা, মিঃ সুরাবর্দীকে লইয়া এইরূপ শান্তি অভিযানে বাহির হওয়ায় মহাত্মা গান্ধীর উপরে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যে সুরাবর্দী কলিকাতা তথা বাঙ্গলার হত্যা-যজ্ঞের প্রধান হোতা, তাহাকে সঙ্গে করিয়া শান্তি অভিযানে বাহির হওয়ায় হিন্দুরা ইহা সহ্য করিতে পারিল না। মিঃ সুরাবর্দীর উপরে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের যে ক্রোধ তাহা স্বাভাবিক, কারণ তাহাদের ধন, ধর্ম, মান, প্রাণ বহুলাংশে নষ্ট হইয়াছে তাহারই হাতে। তাহারা উঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, বহুবার; উহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া বিচার ও চাহিয়াছে অনুসন্ধান।

এ হেন মিঃ সুরাবর্দীকে সঙ্গী করিয়া মহাত্মা গান্ধী বেলিয়াঘাটার বাহির হইলে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ক্রোধে ও বিদ্বেষে প্রদর্শন করিতে লাগিল, এমন কি তাঁহাকে সে স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবার কথাও বলা হইল। এই সময় অবশ্য বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রীসভার প্রতিপক্ষ হিসাবে পশ্চিম বাঙ্গলার একটি দ্বারা মন্ত্রীসভা গড়া করিয়া দেওয়ার হিন্দুরা যেমন একদিকে অনেকটা সাহস পাইয়াছিল, অপরদিকে কলিকাতা পাকিস্থানের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায় কলিকাতার লীগের দাপট ও দুরন্তপনা হইয়া গিয়াছিল।

যাহাই হউক মহাত্মা গান্ধী, যিনি আপন কর্ত্তব্যে স্থির ও অটল, তিনি কাহারও বিদ্বেষে ও ক্রোধ প্রকাশে বিচলিত হইলেন না। "অবিশ্বাসী" "অত্যাচারী" "মহাপাঠ" সুরাবর্দীকেই তিনি কলিকাতার

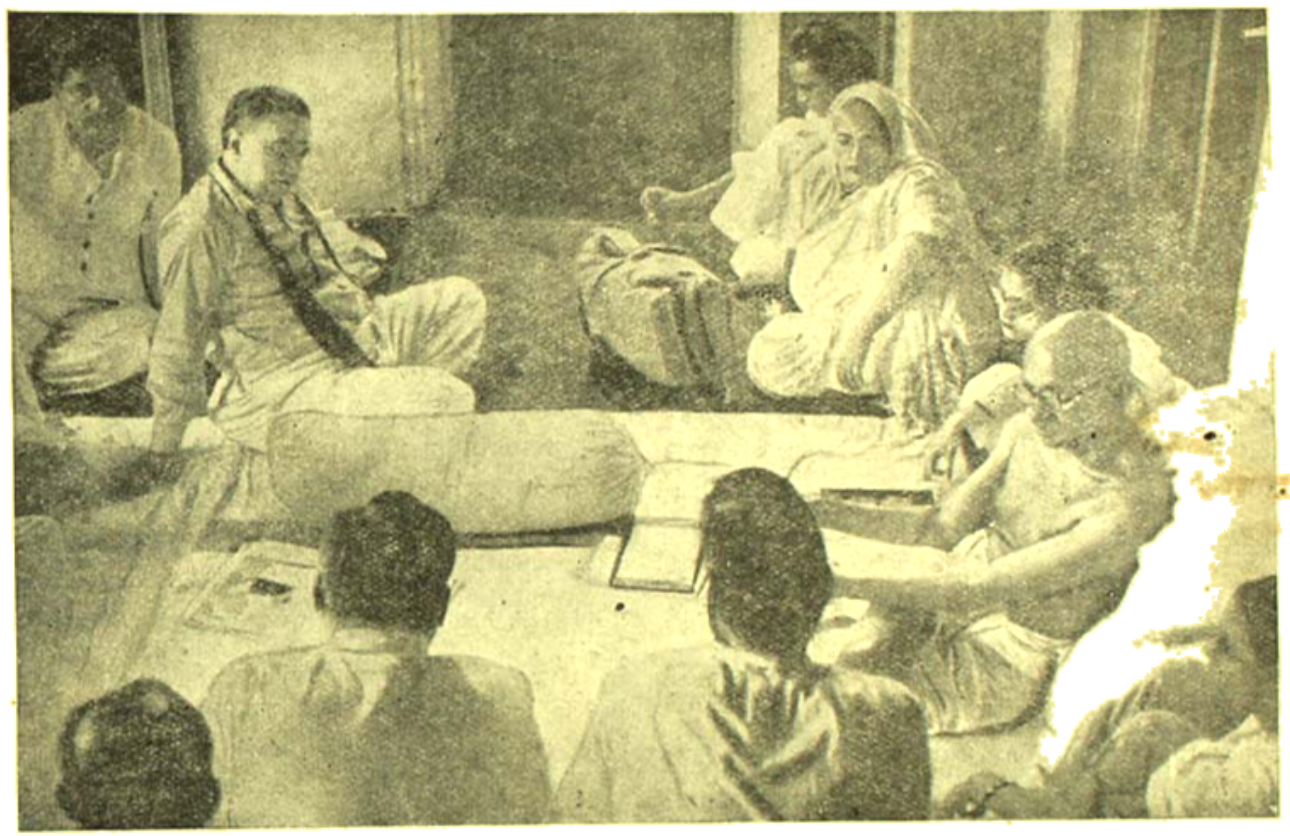

বেলিয়াঘাটা শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজী ও মিঃ সুরাবর্দী ফটো—শ্রীপান্না সেন

শান্তি অভিযানের সঙ্গী করিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকটেই শান্তি ও মিলনের বাণী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

ইতিপূর্বে বাঙ্গলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও কলিকাতা সিটি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, কলিকাতার মুসলমানরা ১৬ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীনতা উৎসব সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া শোক দিবস পালন করিবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই শান্তি অভিযানের ফলে মুহূর্তের মধ্যেই যেন এক যাদু খেলিয়া গেল। যে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়াছে এবং স্বাধীনতা দিবসে শোক প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহার মতি ঘুরিয়া গেল। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, কলিকাতা মুসলিম লীগ ও মিঃ সুরাবর্দী কলিকাতার মুসলমানদের নিকটে

আবেদন করিয়া জানাইলেন যে, তাহারা যেন কলিকাতার হিন্দুদের সহিত সর্বতোভাবে স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে এবং নিজ নিজ বাসভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

এই আবেদনের পর ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্নে দেখা গেল—মুসলমানরা নিজেদের পল্লীতে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য উৎসবের আয়োজন সুরু করিয়া দিয়াছে। কোথাও কোথাও মুসলমানরা সাহসে ভর করিয়া হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া বড় বড় রাস্তার উপরে তোরণ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুসলমানরা আসিলে হিন্দুরা তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিল। এক বর্ষব্যাপী হানাহানির পর হিন্দু-মুসলমান এই প্রথম পাশাপাশি দাঁড়াইল। একটি বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, কেহ কাহারও পাড়ায় যাইতে পারিত না, সুযোগ পাইলেই একে অপরকে হত্যা করিতেছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের শুভমুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, পুলকিত হৃদয়ে পরস্পর মিলিত হইল।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দেশবাসীকে উপবাস ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেন। মিঃ সুরাবর্দী ও কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ ওসমান মহাত্মার উপদেশ মত তাঁহার সহিত উপবাস করিলেন। ইহা দেখিয়া দেশবাসী আরও বিস্মিত হইয়া গেল এবং যে সুরাবর্দী ও ওসমানকে হিন্দুরা কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রধানতঃ দায়ী করে, মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের এই পরিবর্তনে প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গ্রেমের ধারায় যেমন জগাই মাধাইকে জয় করিয়াছিলেন তাহারই কথা মনে করাইয়া দিল। বেলিয়াঘাটার হিন্দুরা, যাহারা মিঃ সুরাবর্দীকে সঙ্গে লওয়ায় মহাত্মার প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করিয়াছিল তাহারাও মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করিল।

স্বাধীনতা উৎসবের পরই এই সময়ে মুসলমানদের ঈদপর্ব ছিল। মুসলমানরা কল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রতিবেশী হিন্দুদের উপহার পাঠাইতে লাগিল। হিন্দুরা সাদরে উহা গ্রহণ করিল এবং তাহারাও মুসলমানদের বাড়ীতে মিষ্টান্নাদি পাঠাইল। কলাবাগান, মেছুয়াবাজার, রাজাবাজার, ইটালী, ধর্মতলা, চীৎপুর প্রভৃতি স্থানে একটি বৎসর ধরিয়া যেখানে হিন্দু হত্যা চলিয়াছে এবং ট্রাম বাস প্রভৃতি যানবাহন যখনই ঐ সকল অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, তখন তাহাদের উপরে এসিড, বোমা ও গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এখন ঐ সকল স্থানে মুসলমানরা পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গোলাপজল প্রভৃতি পিচকারীতে ভরিয়া ট্রাম ও বাসের যাত্রীদের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমগ্র সহরব্যাপী এক অভূতপূর্ব মিলনের সাড়া পড়িয়া গেল। দেশবাসী ইতিপূর্বে বোধহয় আর কোনও দিন এরূপ মিলন দেখে নাই। হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বত্রই শান্তি কমিটি গঠিত হইয়া গেল এবং দীর্ঘ এক বৎসরকাল পরে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মুসলমান-অধ্যুষিত চীৎপুরের যে নাখোদা মসজিদকে ঘিরিয়া সহরে হিন্দুরা মুসলমানদের একটা মস্ত বড় ঘাঁটি ও দুর্গ বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছিল এবং যাহাকে ঘিরিয়া হিন্দুরা কত দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিতে ছিল, তাহা কত বড় ও কিরূপ কৌতূহলবশে তাহা দেখিবার জন্য উহার সময়ে হিন্দুদের ভীড় জমিয়া গেল। এমন কি কলিকাতার বহু মহিলাও উহা দেখিয়া আসিল। মুসলমানরা হিন্দুদের আদর করিয়া মসজিদ দেখাইল, মিষ্টান্ন বিতরণ করিল এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। উভয়েই মুখে বলিল—মহাত্মা গান্ধীর দয়ায় আজ অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল, আর আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নাই। আমরা হিন্দু-মুসলমান আজ এক, আমরা ভাই ভাই।

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর বেলিয়াঘাটার বাসভবন হিন্দু-মুসলমানের এক তীর্থস্থানে পরিণত হইয়া গেল। কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কয়েকদিন ধরিয়া যেন বেলিয়াঘাটায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে লোকে বেলিয়াঘাটার দিকে চলিল এবং প্রভাত হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্তও এই জনস্রোত মোটেই কমিল না। মহাত্মা গান্ধী গৃহের বাহিরে আসিয়া বারে বারে দর্শনার্থীদের দর্শন দিতে থাকিলেন।

সহর, সহরতলী এমন কি কলিকাতা হইতে বহু দূরে দূরে ও মহাত্মার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। নারিকেলডাঙ্গা, মোহমেডান স্পোর্টিং গ্রাউণ্ড, সরকারবাগান, গোলক ষ্ট্রীট ময়দান, পার্কসার্কাস, রেসকোর্স পার্ক, আলিপুর, গড়ের মাঠ, হাওড়া ময়দান, খালিসপুর লেক ময়দান, মেটিয়া বুরুজ, ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ প্রাঙ্গণ, টালিগঞ্জ পুলিশ লাইন, বারাসত, বাগমারী ময়দান এই সকল স্থানে যথাক্রমে ১৭ই আগষ্ট হইতে ৩১শে পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা হইল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার প্রার্থনা সভায় লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দিল। ইহারা কোনদিন প্রখর সূর্যের তাপে পুড়িয়া, আবার কোনদিন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া মহাত্মার উপদেশ শুনিল। মহাত্মা গান্ধী প্রতিদিনই কলিকাতার এই মিলন সৌহার্দকে দৃঢ় ও অটুট করিবার উপদেশ দিতে থাকিলেন। মিঃ সুরাবর্দীও হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে প্রকৃতই মহাত্মা বুঝিতে পারিয়া তিনি যে উঁহার পায়ের নিকটে আশ্রয় লইয়াছেন, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে এক বৎসর পরে কলিকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিল। কলিকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কয়দিন পূর্ব-পর্যন্তও যে কলিকাতার বুকের উপর রক্তসমুদ্র বহিয়া গিয়াছে লোকে যেন তাহা ভুলিয়া গেল। হিন্দু ও মুসলমানের মন হইতে অবিশ্বাসের ভাব একেবারে উড়িয়া গেল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল, ঠিক তেমনটিই ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত

পিয়ারীলাল ও গান্ধি-প্রতিষ্ঠানের কর্মী শ্রীযুক্ত চারুভূষণ চৌধুরী নোয়াখালির সেবাকেন্দ্র হইতে আসিয়া মহাত্মাকে নোয়াখালির অবস্থা জানাইলে, পাঞ্জাব যাওয়ার পূর্বে ২রা সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিনের জন্য একবার নোয়াখালি যাওয়া স্থির করিলেন।

কিন্তু কলিকাতার এই মিলন প্রোতের মধ্যে ১৬ই আগষ্ট তারিখে একদল গুণ্ডা পুনরায় একটা গণ্ডগোল পাকাইবার চেষ্টা করিল। মুসলমানগণ কর্তৃক হরিজনহত হইয়াছে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া (কারণ তাহাদের কথামত তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইলে, তাহারা কোনও ছুরিকাঘাতের চিহ্ন দেখাইতে পারিল না) বহুবাজার বেলিয়াঘাটার বাস ভবনে গিয়া উপদ্রবের সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাত্মার প্রতি প্রোধও যথেষ্ট অসৌজন্য প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

পরদিন মধ্যাহ্ন হইতে সহরে পুনরায় হাঙ্গামা সুরু হইয়া গেল। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়া আসায় মিশ্রিত মনে একে অপরের পাড়ায় গিয়াছিল। ফলে এইদিন অতর্কিত হাঙ্গামার কারণে অনেকেই হতাহত হইল। প্রায় ৪০ জন নিহত ও ২০০ শত আহত হইল।

মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—কলিকাতার মিলন-বুদ্বুদ ফাঁসিয়া গিয়াছে। কলিকাতা তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই তিনি মুখের কথা অপেক্ষা তাঁহার শক্তিশালী অস্ত্র অনশন ধরিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮-১৫ মিঃ হইতে তিনি অনশন আরম্ভ করিলেন এবং জানাইলেন যতদিন না কলিকাতার এই অবস্থার পুনরায় প্রকৃত পরিবর্তন হইতেছে, ততদিন আমি অনশন ত্যাগ করিব না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে এইরূপ হানাহানি দেখা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কলিকাতা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাঙ্গলা সরকারের সহিত, হিন্দু-মুসলমান উভয় দলেরই সকল নেতা, উপনেতা, ছাত্র, শ্রমিক প্রভৃতি সকলেই শান্তি স্থাপনে আগাইয়া আসিলেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই শোভা যাত্রার নেতৃত্ব করিতে গিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী প্রাণও হারাইলেন।

সকলের সমবেত চেষ্টার অবশেষে কলিকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিল। শান্তি ফিরিয়া আসায় এবং এই শান্তিকে বজায় রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিলে, মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় অনশন ভঙ্গ করিলেন।

মহাত্মার অনশন ভঙ্গের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনেকে তাহাদের নিকটে যে সকল বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তাহা তাঁহাকে সমর্পণ করে এবং শান্তি অব্যাহত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসে। পরদিনও অনেকেই আরও অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দেয়। মহাত্মা গান্ধী তাহাদিগকে দেখে শান্তিস্থাপনে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন, এবং তাহারাও তাহাতে সম্মত হয়।

এই ভাবে পুনরায় কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া আসিলে, মহাত্মা গান্ধী ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের দুর্গত জনসাধারণের সেবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

১৩৫৪ সাল

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

১৩৫৪ সাল সম্বন্ধে গত বৈশাখের ভারতবর্ষে আমি জ্যোতিষের মতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, সে সম্বন্ধে আমি বহু চিঠি-পত্র পাচ্ছি ব্যক্তিগত-ভাবে এবং ভারতবর্ষের সম্পাদকের মারফতে। সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছিলুম ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাসে, এবং মাঘ মাসে যখন তা নকল ক'রে ভারতবর্ষে পাঠানো হয় তখন আমি শুরুতর পীড়ায় শয্যাগত, কাজেই সে নকল আমি দেখে দিতে পারি নি। প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হ'ল দেখলুম লিপিকার প্রমাদেই হোক্ বা ছাপাখানার অসাবধানতাতেই হোক্, তাতে দুটি গুরুতর ভুল হ'য়ে গেছে। আমি লিখেছিলুম "১৩৬৮ সালের আগে ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতার কোন আশাই নেই" কিন্তু ১৩৬৮র জায়গায় ছাপা হয়েছে ১৩৪৮। বাঙলা বিভাগের প্রসঙ্গে লিখেছিলুম "এ বছর একটি প্রবল দল গ'ড়ে উঠবে যাঁরা বাঙলাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চাইবেন, কিন্তু বাইরের ও ভিতরের বাধার কোন মতেই তা টিকমত হ'য়ে উঠবে না।" এই টিকমত শব্দটি ছাপা না হওয়াতে এর অর্থ একেবারে উলটে গেছে। এছাড়া আর কোন ভুল প্রবন্ধটিতে নেই।

এইবার পত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের আপত্তির কথা বলি। আমি লিখেছিলুম "স্বাধীনতার কোন সম্ভাবনা এ বছরের রাশিচক্রে পাওয়া যায় না।" আপত্তিকারীরা বলছেন যে, তা ভুল—ভারত স্বাধীন হ'য়ে গেছে। আমি যে লিখেছিলুম "বর্তমান নেতৃত্ব কোন দিনই ভারতকে স্বাধীনতা দিতে পারবে না"—তাঁরা বলতে চান বর্তমান নেতৃত্বই ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

অবশ্য, বর্তমানে ইংরেজের যেওয়া যে ব্যবস্থা আমরা মাথায় পেতে নিয়েছি—ভারতীয় ইউনিয়ন, পাকিস্থান, বহু স্বাধীন রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য—এই বহু খণ্ডে বিভক্ত ভারত এবং তাদের নানা শ্রেণীর শাসন-তন্ত্র, একে যদি কোন ব্যক্তি, সারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে চান, তাহ'লে আমার বলবার কিছু নেই। আমি লিখেছিলুম স্বাধীনতার নাম দিয়ে একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হবে কিন্তু তা প্রহেলিকা পূর্ণ ও ধোঁয়াটে হবে। এখনও আমার সে মত বদলাবার কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি না। আমি এখনও বলছি যে, বর্তমান নেতৃত্ব কোন দিনই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারবে না এবং ১৩৬৮ সালের পূর্বে পূর্ণ স্বাধীনতার কোন আশাই নেই। একমাত্র ভবিষ্যৎই প্রমাণ করতে পারে এর সত্যতা। অধিক লেখা বাহুল্য।

বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি এলো, খোঁপাটা ঠিক করে' নিলে, তারপর সোৎসাহে বললে, "হয়েছে। এক কাজ করুন। আলোটা নিবিয়ে দিন। তারপর কাপড় ছাড়া ছেড়ে সেগুলো শুকুতে দিন চেয়ারের উপর। আমি একটা কম্বল দিচ্ছি সেইটে জড়িয়ে মড়িয়ে শুয়ে থাকুন—ওগুলো শুকুক ততক্ষণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে"

"যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে না যে আমরা ঘুমোবার আয়োজন করছি। মনে হচ্ছে 'মধুচন্দ্রী' বা ওই গোছের কোনও ছাঁবাচিত্রে অবতীর্ণ হবার আয়োজন করছি"

"যা বলছি শুনুন। কোটটা খুলে ফেলুন আগে। কিন্তু তার আগে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিন দয়া করে'। ওটা পেলেন কোথা"

সুশোভন কাতর দৃষ্টিতে বিছানার দিকে চাইলে একবার। তারপর ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কোটটা খুলে ফেললে। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে দেখলে মোজাও ভিজেছে, খুলতে হবে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে খুলতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলে না, পড়ে গেল। হাতের কাছে যা পেলে তাই ধরতে গিয়ে ভীষণ কাণ্ড করে বসল একটা। ড্রেসিং টেবিলের উপর চীনে মাটির প্রকাণ্ড ফুলদানী ছিল, সেইটে ঝনঝন করে' পড়ে' চুরমার হয়ে গেল।

"কি করছেন আপনি সুশোভনবাবু"—চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সান্ত্বনা।

"কিছু না, কিছু না। হাত লেগে কি যেন পড়ে গেল। হয় নি কিছু"

"ভীষণ শব্দ হল যে"

"ভীষণ শোনাল। ভীষণ কিছু হয় নি"

"ভেঙে গেছে ?"

"দেখতে পাচ্ছি না। ভাঙলেও একটু আধটু কোণ টোন হয় তো ভেঙেছে"

"যাক যা হবার হয়েছে এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা জড়িয়ে নিন। খাটের রেলিংয়ে ঝুলছে কম্বলটা। জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন মেঝের উপর। আর মেরি করবেন না"

"চুপ চুপ"—সুশোভন রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—"শুনতে পাচ্ছ ?"

হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বেশ। খড়মের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। অজ্ঞাতসারে সুশোভনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। এই পরিস্থিতিতে এই বেশে এত রাত্রে গোঁসাইজির সম্মুখান হওয়ার 'তাগত' তার আর ছিল না। সে গুঁড়িমেরে সন্তর্পণে বিছানার ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গোঁসাইজি কড়া নাড়লেন। আর দ্বিধা না করে' সুশোভন হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়ল সান্ত্বনার পাশে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে। সান্ত্বনাও চুপ করে' রইল। টুঁ শব্দটি করলে না। গোঁসাইজি আরও দু'বার কড়া নাড়লেন। কোন সাড়া পেলেন না।

"ঘুমের ভান কর" চুপি চুপি বললে সুশোভন। চতুর্থবার কড়া নেড়েও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন গোঁসাইজি কপাটটা একটু ঠেলে মুখটি ঢোকালেন কপাটের ফাঁক দিয়ে। জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়ার

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কপাট আর একটু ফাঁক করে' আর একটু ভিতরে ঢুকে লণ্ঠনটি তুলে দেখলেন। দেখতে পেলেন যে তাঁর অতিথি দু'জন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি মাথা দুটো বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। কংগ্রেসকর্মী ব্রজেশ্বর-বাবু আগাগোড়া ঢাকা দিয়েছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর স্ত্রীর মুখটা বেশ দেখা যাচ্ছে। অধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাসও দেখতে পেলেন মনে হল।

তাঁর পিছু পিছু ফদকাও উঠে এসেছিল। সে-ও উঁকি দিয়ে দেখলে সব। অত্যধিক আগ্রহবশত নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না সে সম্ভবত, কম্বইটা কড়ায় লেগে বেশ শব্দ হল আবার। গোঁসাইজি চাপা-কণ্ঠে তর্জন করে' উঠলেন।

"তুই ফপরদালালি করতে এসি কেন এখানে। শুগে যা। এখানে কিছু হয় নি। ফের যদি আওয়াজ হয় ঠাকুরকে উঠিয়ে নীচেটা দেখতে হবে ভাল করে"

"বোধ হয় বেরাল"

"বেরাল না হাতী! কালিল কোথাকার—"

ফদকা নীচে চলে গেল। গোঁসাইজি কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে' দিলেন। তারপর আলোটা একটু তুলে নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরের বারান্দায়। ও-ধারের যে ঘরটায় তাঁর গুরু-ভগ্নী আছেন সেদিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। না, ও-ধারে কিছু হয় নি। বাইরে থেকেই নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্ত্রীলোকের এত জোরে নাক-ডাকা একটা দুর্লক্ষণ। তাঁর গুরু-ভগ্নী পুণ্যবতী নারী···ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন গোঁসাইজি চিন্তামগ্ন হয়ে। তারপর তাঁর মনে হল ওটা রোগের জন্য সম্ভবত। আরও আধ মিনিট দাঁড়িয়ে ওদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলেন। না, সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না। নিজের শয়ন ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। সিঁড়িতে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিলেন তা-ও শোনা গেল স্পষ্ট।

"সুশোভনবাবু নীচে যান। শিগগির যান বলছি—"

"হায় ভগবান! প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যেতেই হবে?"

"কি যে ছেলেমানুষি করেন, উঠুন, কি করছেন, উঠুন না"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোঁচা মেরোনা দোহাই তোমার"

"কম্বলটা বেশ করে' জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন নীচে"

"বেশ"

"দেরি করছেন কেন"

"যাবছি তো। অত চেঁচিয়ো না, চেঁচামেচি শুনলে ও ব্যাটা এক্ষুণি নেবে আসবে আবার। আঃ, ঠেলছ কেন, পা বুলিয়ে মোজাটা খুঁজছি। ঘুমটা বেশ এসে গিয়েছিল"

"মেজেতেও এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বেন"

"কাল সকালে কি হবে বল দিকি। ভোর না হতে হতেই ওই ফদকা এসে হাজির হবে ঝাড়ু দিতে। ড্রেসিং টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে আমি কখন জড়িয়ে পড়ে আছি দেখলে কি ভাববে বলতো। কি জবাবদিহি করব তার কাছে"

"করবেন যা হোক কিছু। বুদ্ধির তো অভাব নেই আপনার। বলবেন মোজা খুঁজছি ওর তলায়—"

"মোজা তো আমার পায়ে"

"এক পাটি খুলে তাহলে ঢুকিয়ে দিন এখন থেকে"

"কি যে তোমার ইয়ে সাধনা—মানে এরকম—"

"কথা বলে' সময় নষ্ট করছেন কেন বৃথা। আমাকে চেঁচাতে মানা করে' নিজে তো চেঁচিয়ে চলেছেন দিব্যি। বেশ গুটিয়ে সুটিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ুন না। হ্যাঁ, দেখুন—"

"কি আবার—দাঁড়াও—দুত্তোর—এক মিনিট—হ্যাঁ কি বল—"

"ওই ফুলদানী তাকার উপর শোবেন না যেন, হাত দিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিন টুকরোগুলো কেমন?—"

১১

বৃষ্টিটা থেমেছিল কিন্তু মেঘ কাটে নি। মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে সুরু হতে পারে আবার। প্রকৃতি যেন কান্নাটা খামিয়েছেন বটে—সম্ভবত মানবজাতির শোচনীয় অধঃপতনে ব্যথিত হ'য়েই বিগলিত হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু সমস্ত মুখ থম থম করছে এখনও। বিশাল বিশাল মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। সূর্য্য-কিরণের প্রসন্ন হাসি সুদূর-পরাহত মনে হচ্ছে। চতুর্দ্দিকে বেশ ঘন-ঘোর এখনও।

একজন কিন্তু এতেই বেশ পুলকিত হয়ে উঠেছেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন "রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখছি—বাঃ—চমৎকার। দরকার ছিল, রাস্তার ধা ধুলো। বেশ মেঘলা মেঘলা আছে, রাস্তায় বাইক করতে কোনও কষ্ট হবে না। রোদ নেই—খাসা! আজ হনুমানপুরটা সেরে ফেলব তাহলে রামতারণবাবু, বুঝলেন। জলখাবার প্রস্তুত বলছেন? এর মধ্যেই? ছোলা গুড়? খুব ভালবাসি। অতি পুষ্টিকর খাদ্য। নারকোল? বলেন কি! নারকোল নাড়ু? তাহলে তো আরও চমৎকার—তোফা! কোথা! পাশের ঘরে—ও চলুন—ঠিক—"

রামতারণ ত্রিবেদী নরসিংপুর গ্রামের আপার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত। সদারঙ্গবিহারীলাল এ অঞ্চলে এলে এঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিশয় সজ্জন লোক। শুধু তাই নয় খুব নিরীহ। ভদ্রলোকের সদা-সন্ত্রস্ত ভাব অথচ বাস্তবাগীশ। নিজের চারদিকে একটা স্নিগ্ধ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত তিনি। কোন কিছু উগ্র অসংযত এলোমেলো বরদাস্ত করতে পারেন না—তাড়াতাড়ি সমস্ত শান্ত না করা পর্য্যন্ত শান্তি পান না কিছুতে। বেঁটে পুষ্টিপুষ্ট লোকটি সর্ব্বদা সব সামলাতে ব্যস্ত যেন। ছোট ছোট বেঁটে হাত দু'টি দিয়ে হয় কোঁচকানো বিছানার চাদর ঠিক করছেন, না হয় টেবিলে বই গুছিয়ে রাখছেন। অভাবে নিজের কোটের সম্মুখ ভাগটার উপরই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মসৃণতর করবার চেষ্টায় আছেন সেটা। ভারী মিষ্টি স্বভাব। তাছাড়া নিরপেক্ষ নির্ব্বিবাদী লোক। ঝগড়া তর্কের ত্রিসীমানায় থাকেন না কখনও।

সদারঙ্গবিহারীলাল ত্রিবেদী মহাশয়ের আহ্বানে সোৎসাহে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ত্রিবেদী মশায় সরে' দাঁড়িয়ে পথ দিলেন তাঁকে, তারপর সন্তর্পণে গোঁফে হাত বুলতে বুলতে অনুসরণ করলেন। টেবিলের উপর খাবার ছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল চেয়ার টেনে বসলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে করতালি দিলেন একবার।

"বাঃ—তোফা—"

রামতারণ ধীরকণ্ঠে বললেন—"আপনি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি, ছোট একটা বিস্কুটের টিনে পুরে যদি দি—ওখানে খাদ্যদ্রব্য কি পাওয়া যায় তারও স্থিরতা নেই—যদিই বা যায়, কি মূল্যে পাওয়া যাবে স্থিরতা নেই—"

সদারঙ্গবিহারীলাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনবার 'স্থিরতা' শুনে ভাবছিলেন যে পণ্ডিতের শব্দের সঞ্চয় এত কম সে কি করে' ছেলেদের ভাষা শিক্ষা দিতে পারে—ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যত—তাদের যদি ভাষাজ্ঞান ঠিক মতো না হয় তাহলে তো শিক্ষার ভিত্তিই অমজবুত হয়ে যাবে—অথচ লোকটা ভাল—

"কিছু নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন"

"ও—হাঁ—নিশ্চয়ই। এ তো খুবই সুযুক্তি"—নারকোল নাড়ু দাঁতে আটকে গিয়েছিল সেটা ছাড়াতে ছাড়তে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বেশ তো, কি দিচ্ছেন সঙ্গে"

"নারকোল নাড়ু"

"আবার নারকোল নাড়ু! বেশী খেলে আবার—মানে—নারকোল অবশ্য খুবই ভালবাসি আমি, ডাক্তাররা বলেন খুবই পুষ্টিকর—কিন্তু আপনাদের সব নাড়ুগুলো আমিই যদি খেয়ে ফেলি—"

"নারকোল নাড়ু প্রচুর আছে। কলাও দিচ্ছি গোটা চারেক"

"কলা? বলেন কি, খাসা হবে"

"একটু মোহনভোগও করিয়ে দিতে পারি যদি বলেন"

ইতিপূর্ব্বে মোহনভোগ খাইয়েছেন তাঁকে রামতারণ ত্রিবেদী। কালো চটচটে আঠার মতো বস্তুটির ছবি মানসপটে ফুটে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের।

"কি দরকার মোহনভোগের। কলাই যথেষ্ট"

"কটার সময় আপনি বেরুবেন বলুন না"

"বেরুবো? দাঁড়ান তাহলে—সর্ব্বাগ্রে ওই সাইকেল-ওলা মিঠ্ঠুর কাছে যাওয়া দরকার। সে একবার গাড়িটা ঠিক করে' দিয়েছিল। বেরুবার আগে ভাল করে' তেল টেল দিয়ে নিতে হবে আজ। কাল একটু লুব্রিকেটিং তেলের অভাবে—উঁহু! মিঠ্ঠু কারবুরেটার খুলে সাফ করতে চাইবে নিশ্চয়। প্লাগও বদলাতে পারে। হাঁ বলটাই ধরুন—তার আগে বেরোনো যাবে না"

"মৌলভোগ হয়ে যাবে তার মধ্যে"

কোটের সম্মুখভাগে হাত বুলোতে বুলোতে রামতারণ

স্থিরকণ্ঠে বললেন কথা ক'টি। চকিতে রামতারণের দিকে একবার চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ছোলাগুলি চিবোতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ রওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি। সাইকেলের পিছনে স-মোহনভোগ বিস্কুটের টিনটি বেঁধে দিয়েছিলেন ত্রিবেণী মশায়। মিঠুই ও নিখুঁতভাবে ঠিক করে' দিয়েছিল সাইকেলটি। ফট্ ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে চতুর্দ্দিক সচকিত করে' প্রধাবিত হল মোটর-বাইক। যদিও মেঘলা দিন, তবু কোথা থেকে একটু আলো লুকিয়ে এসে ঝিলিক তুলেছিল তাঁর চশমার লেন্সে। হরিমটর পান্থনিবাসের সামনের রাস্তা দিয়েই হনুমানপুরে যেতে হয়। পান্থনিবাসের সামনাসামনি এসে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে হোটেলের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন প্রচুর গলাখাকারি দিয়ে উপরের জানলা থেকে গোসাইঝি নিষ্ঠিবন ত্যাগ করছেন। হোটেলের জানলা কপাট সব খোলা, কিন্তু সান্ত্বনা দেবী বা আর কাউকে দেখা গেল না। সদারঙ্গ-বিহারীলাল ভাবলেন নিশ্চয় তাঁরা চলে গেছেন। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলেন আবার। এই সুখী দম্পতীর কথাই ভাবতে ভাবতে তীব্রবেগে চলেছিলেন তিনি। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। অত বড় অধ্যাপক, অমন নামজাদা কংগ্রেস কর্ম্মী—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই···সান্ত্বনাও তারী লক্ষ্মী মেয়ে। মণি-কাঞ্চন। দেখতে দেখতে এক মাইল পার হয়ে গেল···সান্ত্বনার শুধু রূপ নয় গুণও আছে···অনেক গুণ···সামনে রাস্তাটা বেঁকেছে···ঘুরেই কি কাণ্ড!—সজোরে ব্রেকটা চেপে ধরলেন···গাড়িটা টাল খেয়ে পড়েই যেত হয় তো পাশের খানায়—যদি না বাঁ পা-টা রাস্তার পাশের একটা ঝোপে ঢুকিয়ে সামলে নিতেন তিনি কোন-ক্রমে। ছোঁড়া রাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও দাঁড়িয়ে আছে—দাঁত বার করে' হাসছে আবার।

ঝোপ থেকে পা বার করে' নিলেন তিনি। একটু মচকেছে বোধহয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে' কপালটা মুছলেন, চশমাটা ঠিক করে' নিলেন। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে অনুকম্পা হল একটু—এরা এমনি ভাবেই বেঘোরে মারা যায়—আর একটু হলে গেছল—বেঁটে গোছের ছেলেটা। পরণে ময়লা খাকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার, হলদে রঙের দাঁত। হাসছে—হাসি দেখে মনে হয় বিচ্ছু। শহর থেকে আমদানী সম্ভবত, পাড়াগেঁয়ে ভীতুভাব মোটে নেই।

"এই ছোকরা, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনি চাপা পড়তে যে—"

ছোঁড়া দাঁত বার করে' হাসল আবার।

"হাসছ কি, সাবধান না হলে মারা যাবে একদিন। আরে—"

"ছোঁড়া সরে' পড়বার উপক্রম করছিল। তার ডান হাতে একটা দড়ি ছিল, সেটা আর এক পাক দিয়ে জড়িয়ে নিলে সে ভাল করে'—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিক থেকে আর্ত্ত কেউ কেঁউ ধ্বনিত হয়ে উঠল। কুকুর—হ্যাঁ কুকুরই তো—ছোট কুকুরের বাচ্ছা একটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ছোঁড়াটা তার গলায় দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে সেটাকে। ভ্রূকুঞ্চিত করে' সদারঙ্গবিহারীলাল দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করলেন একটু ঝুঁকে। বাচ্ছাটা কিছুতে যাবেনা, ছোঁড়াও ছাড়বে না, হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"এই থাম থাম"—আদেশের ভঙ্গীতে বললেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল—"আরে এ কুকুর যে চেনা। এ তো তোমার কুকুর নয়। এ তো চেনা কুকুর"

"চীনা নেই, বিলেইতি"

সদারঙ্গবিহারীলাল অবিলম্বে বুঝলেন ছোঁড়া বিহারী। শুধু তাই নয়, কুকুরের জাতও চেনে।

"চীনা নেই বোলতা, চেনা চেনা"

"নেই বিলেইতি"

তারী ডেঁপো তো!

"আরে বাবা তাই সই। কুত্তা কাঁহা পায়া"

ছোঁড়া সদারঙ্গবাবুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে কুকুরটার দিকে চাইলে। কুকুর যেন মানুষের মতো এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টিকে। ভয়ে কাঁপছিল বেচারী।

"ই কুত্তা কো কাল রাত্মেই হাম আদর কিয়া হ্যায়, গায়ে হাত বুলায়া হ্যায়, ইস কো মালিককো সাথ বহুক্ষণ গল্প-সল্প কিয়া হ্যায়। ই কুত্তা কাঁহা মিলা"

'ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"নিশ্চয় কুত্তা হ্যায়। ইসকো ল্যাজ নেহি দেখকে তুম হয়তো ভাবতা হ্যায় ই কুত্তা নেহি হ্যায়। কিন্তু ই কুত্তাই হ্যায়—ল্যাজ কাট দিয়া। কাঁহা পায়া ই কুত্তা—"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে বলে কি! কুত্তা নয় তো কি বিল্লি? বোলো কাঁহা পায়া ই কুত্তা"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে! তুম্ কি হামসা সে বেশী জানতা হ্যায়। বোকাকা মাফিক তর্ক করকে ফল কি। ইস কুত্তাকে হাম চিনতা হ্যায়, ইসকো মালিককো ভি হাম চিনতা হ্যায়, আজ সে নেই, অনেক দিন সে"

"অগর আপ জবরদস্তি ইসকো কুত্তা বানাইয়ে তো ম্যয় নাচার হুঁ। অগর ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে তুমসা মাফিক এইসা ডেঁপো ছোকরাকে পাল্লামে হামিপূর্বে পড়া বোলকে তো ইয়াদ নেহি হোতা হ্যায়! কুত্তা নেহি তো ই কি হ্যায়"

"কুত্তা হ্যায় হুজুর। মেহিয়ে—"

চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে গেল সদারঙ্গবিহারীলালের। এটা প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন—"তা হো সেকতা হ্যায় অবিশ্যি। ভাগ পায়া"

"রহে মে"

"কি করে গা ইস্‌কো রেকে"

"গোবেকে। সিখাওয়েকে—"

"উসকো শিখানে কো কুছ দরকার নেই হ্যায়। যথেষ্ট শিক্ষা হ্যায় উসকো—"

"কুছ নেই জানতি। মেহিয়ে না ঠিক সে চল ভি নেহি সকতি—"

"বাজে বক বক মত্ করো—ই কুত্তা হামকো দেও"

"কির আপ কুত্তীকো কুত্তা কহতে হেঁ"

"সাধারণ কথাবার্তায় হামলোগ ওতনা লিঙ্গ বিচার নেহি করতা হ্যায়। আসল কথা হাম ইসকো লে যায়গা, লে করকে আসল মালিক কো ঘুরায় দেগা, বুঝা?"

"কুছ বখশিশ মিলনা চাহিয়ে"

"বখশিশ? কাঁহে? দোসরা আদমিকো কুত্তা লেকে ভাগতা হ্যায়, থানামে খবর দেনেসে কি হোগা জানতা হ্যায়?"

"মিলিয়ে তব থানে মে খবর"

"আরে—এ তো ভারী ত্যাঁদড় ছোঁড়া দেখছি!"

সদারঙ্গবিহারীলালের মাথায় চকিতের মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—"দেখো, বখশিশ ফখশিশ নেই দেগা, তবে একঠো চিজ দে সেকতা হ্যায়"

"কা—"

"নাড়ু"

"নাড়ু?"

"হাঁ। ঘরকা তৈরি নারকোলকা নাড়ু"

"দেখলাইয়ে তো"

সদারঙ্গবিহারীলাল বাইকের পিছন থেকে বিস্কুটের টিনটি খুলে একটি নাড়ু বার করে' দিলেন তাকে। ছেলেটি একটু কামড়ে আগে পরখ করে দেখলে, তারপর সবটা মুখে পুরে ফেললে।

"আওর একঠো হুজুর"

আর একটি নাড়ু দিলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ছোঁড়াকে উপদেশও দিলেন কিছু। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হয়, যখন তখন অমন দাঁত বার করে' হাসাটা অভদ্রতা, দাঁত মাজাও উচিত প্রত্যহ, অমন ছেতো-পড়া হলদে দাঁত দেখতে বিশ্রী নয় কি? সব শুনে ছোঁড়া দাঁত বের করে' বললে—"আউর একঠো লাড্ডু দিজিয়ে হুজুর—"

তৃতীয় নাড়ুটি দিয়ে কুসুমকে উদ্ধার করলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু। সমস্যা, কি করে' নিয়ে যাওয়া যায় এখন। পরমুহূর্তেই কিন্তু মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হয়েছে! গায়ে একটা ঢিলে গোছের কোট পরেছিলেন তিনি। বুকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং কুসুমের আপত্তি সত্ত্বেও কোটের ভিতর পুরে নিলেন তাকে, পুরে বোতাম এঁটে দিলেন। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। সোৎসাহে মোটর বাইকে সওয়ার হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল এবং সবেগে ধাবিত হতে লাগলেন হরিমটর হোটেলের উদ্দেশে।

(ক্রমশঃ)

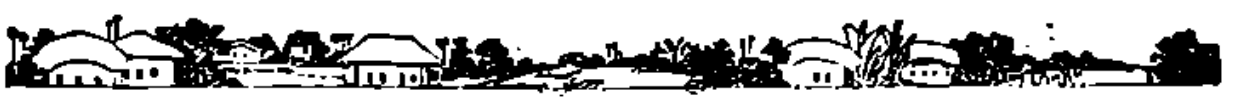

গান ও স্বরলিপি

রাগেশ্রী। আড়াঠেকা

অনন্ত সাগর-মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে সুখ, গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দু'জনে যাত্রী,
সম্মুখে মহান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া॥
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে দুই বাহু প্রসারিয়া॥

কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি ॥ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

II { [র্সর্সণা ধণপা -মা মমা] / সসা -মাঃ মঃ মা | [• ঋসা] } ঋধপাঃ -মঃ -জ্ঞা -রজ্ঞমা | -া -া রা -া | সা -া -া -া ॥ I
অন • ন্ত সা গর • • • • • মা • ঝে • • •

I সা মাঃ মঃ মমা | গমপা -মপধা -পধণা -ধণর্সা | -নর্সনা -র্রর্সা র্সণা -ধণা | -পধা -পধণা -া -ধণর্স } I
[ ]
ভা •ও ত রীভা সা•• ••• ••• ••• ••• ••• •ই রা• •• •• ••• ••• •

I ঋমা মা -া মমা | মগমা -পমা ঋপা -মজ্ঞা | জ্ঞমা -পমা -ঋণা পমপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা I
গেছে সু • খগে ছে•• •• দু •খ গেছে আ• •• শা • ফু রা• ••• ই রা

I { মমা ণধণা -পধণা -র্সর্সা | র্সর্সা র্সনর্সনা র্সা -া | র্সনর্সা র্রর্সা -নাঃ ননঃ |
সমু খে•• •অ নন্ত রা••• ত্রি • আ•ম রা• • ভূজ

| র্সনর্সা -র্রর্সা র্সণধা -পধণা } I ণর্সর্সা র্সণা -ধণপা মমা | ণপমা -জ্ঞা -া -রজ্ঞমা |
নে•• •যা ত্রী•• ••• সমু খে• ••• •শ রা• • • ••ন্

| -া -া রা -া | সা -া -া -া I ণমমা মমা -া মমা | গমপা -মপধা -পধণা -ধণর্সা |
• • শি • ভু • • • দ্বিক বিদি • কহা রা•• ••• ••• •••

| নর্সা -র্রর্সা র্সণধা -পধণা | -া -া -ধণা -ধণর্সা] II
•• ••ই ত্রা•• ••• • • •• •••

II { ণমমা মা -া মমা | মগমা -পমা ণপা -মজ্ঞা | জ্ঞমা পমা -ণধণা পমপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা I
জল বি • রহে ছে•• •• দি •য় ঘুমু ক• ••• রে•সি ভু• ••• ভী ন্

I সসা ণমা -া মমা | মগমা -পমা ণপা -মজ্ঞা | জ্ঞমা পমা -ণধণা পমপা | মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা } I
প্রশা • • স্তম্ভ নী•• •ল না •য় নীল শূ• •• স্তে•মি শা• ••• ই ত্রা

I { মমা ণধণা -পধণা র্সর্সা | র্সর্সা র্সনর্সনা র্সা -া | র্সনর্সা র্রর্সা -নাঃ ননঃ |
নাহি সা•• ••• •ত্রা নাহি শ••• ষ • ষ•ম্রে যে• • নম

| র্সনর্সা -র্রর্সা র্সণধা -পধণা } I ধণা পা -া মা | -া মা মধা পা | -া -মা -জ্ঞা -রজ্ঞমা |
ব•• •স্ত হ•• ••• র• জ • নী • আ সি• ছে • • • •••

| রা -া সা -া I ণমা -া মা মমা | গমপা -মপধা -পধণা -ধণর্সা | -নর্সর্রা -র্সর্রর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞমা র্মমা |
ধি • রে • দুই • বা হপ্র সা•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• স্থিরা

| -র্জ্ঞর্রা -র্সণধা -পধণা -ধণর্সা] II
•• ••• ••• •••

কংগ্রেসকর্ম্মীরা কোন পথে ?

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

ইহা কি হইল ? এই সেইদিন পর্য্যন্ত যে সব কংগ্রেসকর্ম্মীর নিজেদের আপনারজন বলিয়া মনে করিয়াছে গত মেদিনীপুর (বর্দ্ধমান) সম্মেলনের পর হইতে তাঁহাদের মানসিক পরিবর্ত্তন এত সহসা কি করিয়া সম্ভব হইল ? এই কথাই আজ সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীর (বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের) ভাবিতে হইবে। গত মেদিনীপুর সম্মেলনকে পশ্চিমবঙ্গবাসী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের (সবাকার নহে) মানসিক চিন্তাধারায় একটি লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালা দেশে নেতাজীর নেতৃত্ব যেদিন কংগ্রেসের মধ্যে নিজ প্রকাশের সম্ভাবনা খুঁজিয়া পাইল না সেইদিন তাহার অন্য পথ ধরিল। তখন একদল কর্ম্মী কংগ্রেসকে ঝাঁকড়াইয়া ধরিল, বর্ত্তমান বাঙ্গালা কংগ্রেসের জন্ম এই হইতে শুরু হয়। ইতিপূর্ব্বে সুভাষ-সেনগুপ্তের ঝগড়া অনুশীলন ও যুগান্তর দলের গুপ্তসমিতি ঝগড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। যতদূর জানি খাদি কর্ম্মীরা ইহাতে যোগদান করেন নাই। বাঙ্গালার দলাদলিতে তখন ভেদ ছিল। চট্টগ্রামে এক যুবেন্দুবিকাশের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া যাহা রাজনৈতিক খোলযোগ গিয়াছে। সে অধ্যায় গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে।

গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের পর যে সব কর্ম্মী গান্ধীবাদের শিক্ষায় বিশ্বাসী হইল না, তাহারা মার্কসবাদের শিক্ষা লইয়া দল ত্যাগ করিল। যাহারা মার্কসবাদের শিক্ষা লইয়া দল (অর্থাৎ অনুশীলন ও যুগান্তর দল) ত্যাগ করিল তাহারা বাঙ্গালার যুব সম্প্রদায়ের সেরা রাজনৈতিক কর্ম্মী এবং ইহাদেরই শ্রম ও সাধনার ফলে বাঙ্গালায় আজ কম্যুনিষ্ট দল দানা বাঁধিয়াছে। পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখি, কে ভাল করিল কে মন্দ করিল তাহা সমালোচনার স্থান এখানে নয়। শুধু সামান্য কর্ম্মী হিসাবে যেটুকু বুঝিতেছি তাহাই লিখিতেছি। জগৎ সব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, এক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনে করিবার কারণ নাই।

তাহা হইলে হিসাবে দাঁড়াইল মোটামুটিভাবে পুরাতন গুপ্ত সমিতির পুরাতন বয়স্ক কর্ম্মীরা একটা চিন্তাধারার প্রতিনিধি—অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক শ্রেণী। (ইহাদের মধ্যে কাহার জীবনের তিরিশ বছর পর্য্যন্ত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়াছে)। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক নবীন কর্ম্মীরা আর এক শ্রেণীর চিন্তাধারার প্রতিনিধি এবং এই দুইটি চিন্তাধারার মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ বর্ত্তমানে। আর সঙ্গে সঙ্গে থাকিল খাদি দল। যতদূর পর্য্যন্ত জানি, তাতে মনে হয় খাদি কর্ম্মীদের কোন প্রভাব বাঙ্গালার যুব সম্প্রদায়ের উপর তেমন ছিল না, সম্ভবত আজও তেমন নাই। তবে তাহারা গান্ধীবাদের প্রভাবের সুযোগ পাক আর নাই পাক, গান্ধীজীর অসীম প্রভাবের সুযোগ তাহারা পাইয়াছেন এবং সেইদিক হইতে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় তাহারা যুব সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে পাইয়াছেন বা পাইতেছেন।

যেহেতু খাদি কর্ম্মীরা কোন গুপ্ত পন্থায় বিশ্বাস করেন না সেই হেতুই তাঁহারা সরকারের নিকট ততটা অপ্রিয়ভাজন ছিলেন না। কাজেই এক শ্রেণীর জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের মিলিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের উপর প্রভাব ইঁহাদের কোনকালে ছিল না বা আজও নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত হিন্দু জনসাধারণের উপর নেতাজীর প্রভাব ছিল। আর বাঙ্গালী আপামর জনসাধারণ ও আংশিকভাবে মুসলমান জনসাধারণের (শিক্ষিত নহে) উপর গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল, গান্ধীবাদের নহে। বাঙ্গালী এখন জানে, গান্ধীবাদের শিক্ষা তার ধাতে সহ্য হয় নাই। এতদিন আমরা দেশ-স্বাধীনতার নামে যে রাজনৈতিক চেতনা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা প্রধানত দুইটি প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

একটি হিংসার পথ (গান্ধীজীর মতে), অপরটি অহিংসার পথ। গান্ধীজীর মতে এই হিংসার পথ—ভীরুর পথ। অন্যান্য সবার মতে অহিংসা ক্লৈব্যধর্ম্মিতারোধী। গান্ধীবাদের আলোচনার একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহা অনেক ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে বলা হয়। কিন্তু 'হিংসায়' (গান্ধীজী ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে সাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিবে।) বিশ্বাসী যারা তাদের আলোচনায় তেমন কোন সুযোগ নাই। কোরেল সাহেব যেভাবে ইহার দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়াছেন সেভাবে ইহা জানতে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু মার্কসবাদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যতটা বলিয়াছে ততটাই আলোচিত হইয়াছে; ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ অংশ তাহা গ্রহণও করিয়াছে। গান্ধী নেতৃত্বের প্রভাব ভারতের যুবসম্প্রদায়ের উপর যাহাই থাকুক না কেন, গান্ধী-বাদের প্রভাব যে বিশেষ কিছু নাই তাহা বোধহয় বলা যাইতে পারে, নেতৃত্বের প্রভাব ও কোন দর্শনের প্রভাব এক নয়। মার্কস্ তাহার জীবিতকালে গান্ধীজীর মত এত ব্যাপক প্রভাব ছড়াইতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর দর্শনের প্রভাব বাড়িয়াছে। গান্ধীবাদের শিক্ষা ও দার্শনিক প্রভাব একটু সীমাবদ্ধ, কেননা ইহা ভারতের হিন্দু জনসাধারণের কাছে তেমন অপরিচিত বস্তু নহে। ইহার প্রাথমিক ইতিহাস বুদ্ধের আমলে রচিত হইয়াছে। বুদ্ধের তুলনায় ছোট হইলেও বাঙ্গালার চৈতন্য তাহার সামাজিক পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীবাদ এক কথায় ভারতের ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগের পুনরভ্যুত্থান, কিন্তু ইহাতেও ভারতের ইতিহাসে ইসলামের প্রবেশ ও প্রতিপত্তি লাভ।

গান্ধীবাদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করে নাই, বা ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় কিসের যে একটা গঠন আছে তাহা গান্ধীবাদের আলোচনায়,—যতদূর মনে পড়িতেছে—পাওয়া যায় না। গান্ধীবাদ সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক আলোচনা করিয়া একটি সার্বজনীন সমাজ দর্শন গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ ইতিহাসের অর্থনৈতিক শ্রেণী বা জৈব ধর্মের অবস্থিতি, তেমন ভাবে গান্ধিবাদ আলোচনা করে নাই। 'তেমন ভাবে' বলিতেছি এই কারণে যে ধনীর ও স্বচ্ছলোকের কর্তব্য বা তাদের কি করা উচিত তাহার বহু আলোচনা গান্ধিবাদে আছে। কিন্তু তাহা বর্তমান মুরোপবাসী মনস্তত্ত্বের পক্ষে জীর্ণ। তবে পরবর্তী কালে ভারতে মার্কসবাদ খানিকটা প্রসার লাভ করিবার পর গান্ধিবাদ নিজস্ব একটি পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহা ভারতের পক্ষে কতটা কার্যকরী হইবে আজ ও বলা কঠিন।

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের পর হইতে ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের উপর মার্কসবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বাড়িতে থাকে; এই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এক টানা গতিতে চলিয়া আসে। কংগ্রেসের 'Quit India' প্রস্তাব খানিকটা পরিমাণে বাইরের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন প্রভাবিত হইয়াছে তাহা বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বম্বে অধিবেশনের পূর্বে—অর্থাৎ 'Quit India' প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্বে—ভারতের যুব-সম্প্রদায় অনেকটা পরিমাণে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। নেতাজীর কংগ্রেস ত্যাগ, কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী দলের মনোবৃত্তি, বাম দলের মনোবৃত্তি ও কম্যুনিষ্ট দলের মনোবৃত্তি এই সমস্ত লক্ষণগুলি—একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই সুনির্দিষ্ট ঘটনাকে আপনার মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই সুনির্দিষ্ট ঘটনাটি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসের সরকারী নীতি বরাবরই অহিংস, কিন্তু গণ-আন্দোলনের মুখে পড়িয়া সেই নীতি অনেক ক্ষেত্রে পুরাপুরি প্রভাব ছড়াইতে সমর্থ হয় নাই। একমাত্র ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ দ্বারা গান্ধীজীর নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছে তাহাই অহিংস রহিয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলন ভারতের জনসাধারণের মনে কোন কোন ধাঁচা রেখাপাই। তার কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে এই আন্দোলনদ্বারা নিজেকে বিপদগ্রস্ত বোধ করে নাই।

ইংরেজের এদেশে পরাজয় ভারতের পক্ষে শুভ ও অশুভ আশীর্বাদ দুই-ই আনিয়াছে। স্বাধীনতার পর ইংরেজ হতমান, আর ভারতের জনগণ ঘৃণায় বিদ্বেষে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধিবাদের প্রভাব কতখানি জনগণের মনের উপর প্রতিক্রিয়া ছড়াইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলকথা এদে জৈবধর্মের সুড়াই বেশী করিয়া এসব ক্ষেত্রে ছিল। এইখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার, জনগণের মন যদি পুরাপুরিই গান্ধিবাদের শিক্ষা-দ্বারা গঠিত হইত তবে কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের পর তাহারা সেই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করিত। যে নেতৃত্ব কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়াই রাজনৈতিক কর্মীরা ও জনগণ আন্দোলন চালাইয়াছে। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আইন ও শৃঙ্খলা তাহারাও যেমন রক্ষা করেন নাই—জনসাধারণও মানে নাই। ইহার পিছনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কর্মীর জীবনসাধন রহিয়াছে। তাহারা গান্ধি নেতৃত্ব মানিয়া লইলেও তাঁহার দর্শন মানিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসের সরকারী নীতি এই আন্দোলনের গতিরোধ করিয়াছে। প্রস্তাব করিয়া এই আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী নিজস্ব পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাইবার সুযোগ পাইলে এতটা নীতির লোপ হইত না। গান্ধীজী নিজ দায়িত্বে দুইটি আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া চালাইয়াছেন। এক হইল ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ ও আর দুইল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলন—কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে দুইটি আন্দোলন কোনক্রমেই গান্ধিবাদের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নহে। যাহা চাম্পারণ সত্যাগ্রহে সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সম্ভব হয় নাই। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সার্থক করিয়া তুলিতে যে জাতীয় স্থায় ও নীতির প্রয়োজন তাহা কোন রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার কাজে সম্ভব নয়। সত্যাগ্রহের মূল্য নাই এমন কথা বলিতেছিনা। ইহার প্রয়োগ সামাজিক অবিচার বা সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে অধিকার বৈদেশিক কোন শক্তির নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে সেখানে ইহা সম্ভব কিনা তাহা ভাবিবার। কেন সম্ভব নয় তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। যে শক্তির অধিকারী তাহার সামাজিক মন ছোটবেলা হইতে যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সে সেইভাবেই সাড়া দিবে। সে যখনই কোন বাধার সামনে পড়িবে তখনই তাহার ঐতিহাসিক শিক্ষা, সামাজিক মনোবৃত্তি ও জৈবধর্ম অনুযায়ী সাড়া দিবে। ইহা যে কেহ স্বীকার করিবেন যে ইংরেজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক শিক্ষা যুদ্ধ দর্শনদ্বারা প্রভাবিত নয়। আমরা যদি মানুষকে ইতিহাসের উপাদান বলিয়া মানিয়া লই তবে একথা স্বীকার করিতে দ্বিধা হইবে না যে, ইংরেজের ইতিহাসের উপাদানগুলির উপর কোন কালেও ঐ জাতীয় নীতির বা দর্শনের প্রভাব ছিল না; এ দেশে ইংরেজ তার কর্মধারা জনগণকে হিংসার কাজে বাধ্য করিয়াছে, কারণ ইংরেজ জাতির ইতিহাস জৈব-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের পক্ষে এই নব্য নীতি গ্রহণ করিবার সময় আসে নাই। তবে সমাজ-জীবনে হয়ত কোন একটা সময়ে জৈব-ধর্মের হ্রাস আসে, তখন হয়ত গান্ধিবাদের নীতি য়ুরোপের কাছে সমাদৃত হইতে পারে। যুদ্ধ প্রসঙ্গে মহাযুদ্ধের পর তত্ত্বাশ্রিত শান্তির কথা উঠিয়াছিল, আজও আবার শান্তির কথা উঠিতেছে—হয়ত য়ুরোপের সমাজ জীবনে সমষ্টিগতভাবে এই নীতির একটা ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় অন্ধ য়ুরোপের

জনগণ তাহা গ্রহণ করিবে কিনা এখন জোর করিয়া বলা যায় না। ফ্রেজার সাহেব অবশ্য সমাইকেই এই নীতি গ্রহণ করিতে বলিতেছেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে গান্ধিবাদের প্রচার ও শিক্ষা-প্রসার লাভ করিয়াছে। বিদেশেও ইহা নিয়া আলোচনা চলিতেছে—তবে তাহা রাজনৈতিক দিক দিয়া নহে। এই মতবাদের কতটা সম্ভাবনা আছে—তাহারই আলোচনা চলিতেছে। অবশ্য বিবাকর মহাশয় ফ্রান্সে কতটা সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইয়াছে তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু তাহা ফ্রান্সের ইতিহাসে কতটুকু স্থান অধিকার করে? ফ্রান্সের ইতিহাস—ক্রমওয়েল বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব—এই তিনটি বিপ্লবই ফ্রান্সের ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এক-একটি নূতন যুগ সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে বর্তমান ক্ষমতা হস্তান্তরকে ভারতের অহিংস বিপ্লবের বিজয় বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে, মনে হয় একটা আংশিক সত্যকে পুরোপুরি সত্য বলিয়া চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যে বাংলার নীলচাষীদের একটি বিশেষ স্থান আছে এ কথা আজ সবাই ভুলিতে বসিয়াছে, কংগ্রেস জন্মিবার প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে বাংলার চাষীরা সক্রিয় প্রতিরোধ করিয়াছিল—তাহার নেতৃত্ব যাহারা করিয়াছিল তাহাদের প্রতি ঐতিহাসিকদের কি কোন দায়িত্ব নাই? কেবলই Immediate circumstances দ্বারা কি তাহারা প্রভাবিত হইবেন? ইতিপূর্বে 'হিন্দু মেলা' যে রাশিয়া জগতে স্বদেশীয়ানার ও প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল তাহা কি বর্তমান ব্রিটিশ অপসরণ কার্যে কোন সহায়তা করে নাই? ইতিহাসের কোন ক্ষুদ্র অংশ এই বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মনকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে? আর যদি ভারতে কিছু সার্থক হইয়া থাকে তবে তাহা এই সব বিভিন্ন উপর হইয়াছে—অথচ তাহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই।

গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা স্থির করিয়াছিল অটোমান সাম্রাজ্যকে ভাগ করিতে হইবে। আরব জাতিকে স্বাধীনতা দিবার জন্য টি. ই. লরেন্স সাহেবের মনে খুব প্রেরণা জাগিয়াছিল। তিনি আরব বেদুইন সাজিয়া আরব জাতির Self-Determination-এর জন্য লড়াই করিলেন, মোটা আরব জাতির মধ্যে তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়া, এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। তুর্কীর বিজয়ীরা ধরত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই জন্য লড়াই করিতেছিল। কিন্তু ইংরেজের কূটনীতি বিশাল সাম্রাজ্যের ইমারৎ তাজিয়া খণ্ড ছিন্ন করিয়াছিল এবং তুর্কী বিজয়ীদের বিজয়ের মহৎ উদ্দেশ্য আশা, সৃষ্টি ও গোষ্টিগত ভেদের উপর জোর দিয়া ইংরেজ ব্যর্থ করিয়াছিল। ইহা ইংরেজের কূটনীতির খেলা। এই খেলা ইংরেজ রুশ বিপ্লবের বেলায়ও শুরু করিয়াছিল কিন্তু সফলকাম হয় নাই। সফলকাম হইল ভারতের বেলায়। অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে যেমন বহুজাতি ও বহুভাষা ছিল, আর সাম্রাজ্যের মধ্যেও তেমনি বহু জাতি ও বহুভাষা ছিল। কিন্তু ওরা বিজয়ীরা ধর্ম, ভাষা, সৃষ্টি ও গোষ্টিগত স্বাধীনতা এবং স্ব স্ব রাষ্ট্র পরিচালনার দাবির ইত্যাদি স্বীকার করিয়া লইয়া এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। সম্ভবত রাশিয়া ছাড়া বর্তমান ইতিহাসে এক বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন গোষ্টি ও কৃষ্টি একই যুক্তরাষ্ট্রীয় আওতায় আর নাই। তাহারা যে পথে ইহার সমাধান করিয়াছে সে পথে আমাদের সমাধান হইল না। কেন সমাধান হইল না তাহাও ভাবিবার। প্রথমে কংগ্রেসনীতি ধরিয়া লইয়াছে যে ভারত এক ও অবিভাজ্য। কথাটা ভৌগোলিক তত্ত্বের বিচারে সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভারতে বহু জাতি আসিয়াছে, বাস করিয়াছে এবং এইখানেই মিলিয়া গিয়াছে, কাল ধর্মের প্রভাবে একে অন্যের ধর্মাচরণ, সামাজিক ব্যবহার, ভাষা ও কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে এ মনে করিবার কারণ নাই যে, সবাই মূলের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া একেবারে বিলীন হইয়াছে, তবে মূলের সঙ্গে ছিন্ন হইয়া অন্যের মধ্যে যে কেহই একেবারে বিলীন হইয়া যায় নাই তাহা ও মনে করিবার কারণ নাই। তাহাও ভারতের ইতিহাসে ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারতে এমন দুই একটা জাতির প্রবেশ ঘটিয়াছে, যারা তাহাদের গোষ্টিগত ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নিয়া ভারতের ইতিহাসে সক্রিয় ভাবে বিরাজ করিয়াছে, যেমন ইসলাম, যেমন ফ্রাঙ্কো-খৃষ্টান। ইতিহাসের এই সক্রিয় গতিকে যদি কংগ্রেসনীতি পূর্বাহ্নেই মানিয়া লইতেন তবে ভারত বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে পারিত।

যদি কংগ্রেসনীতিকে গান্ধীবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলা যায় তবে বলিতে হয়, যে ইসলামের বিশেষ ঐতিহাসিক অংশ ও সংগঠন পুরোপুরি গান্ধীবাদে স্বীকৃত হয় নাই। খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল আজ তাহা কাহারো নিকট অবিদিত নহে। কংগ্রেস যে রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তার বহু পূর্ব হইতেই ভারতে সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যান্ত্রিক-তান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে মিলিত হইয়া কংগ্রেসের পথ দুর্গম করিয়াছে। সম্ভবত কংগ্রেস বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা ইহার সমাধান খোঁজে নাই। কেন খোঁজে নাই? ইহা জনসাধারণ এখন করিতে সাহসেও আমার মত সামান্য কর্মীর পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব নহে। তবে মনে হয় গান্ধীবাদ ইতিহাসের এই দিকটার প্রতি সুবিচার করে নাই।

এই সব বিভিন্ন মার্গিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে সব কর্মীরা রাজনীতিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহারা এত দিন সম্ভবত একটি বিষয়ের প্রতি মন দেবার সুযোগ পায় নাই। তাহাদের একটা সামাজিক মন যে রহিয়াছে তাহা যেন তাহারা ভুলিতে বসিয়াছিলেন। এই সামাজিক মনটি বিশেষভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পরিস্ফুট। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে যত সব কর্মী কারাগার আছেন, তারা সবাই এই শ্রেণী হইতেই আসিয়াছেন। জেলে দেখিয়াছি বাদি কর্মী ও মোহার বলের মধ্যে সামাজিক টাটা বিরূপ চলিত। সরকার তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা আইনসঙ্গত প্রভেদ

রক্ষা করিতেন। ফলত সাম্প্রদায়িক মনে উভয়ে উভয়কে এড়াইয়া চলিতেন। [এই মনোমালিন্য বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি করিয়াছে; সে-সমস্ত দল বা উপদল বাঙ্গালায় আজ কংগ্রেসের মধ্যে রহিয়াছে তাহার অধিকাংশের অবস্থিতি যে ব্যাপক কোন ধার্ম্মিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এ মনে করিবার কারণ নাই। কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অথবা গোষ্ঠিকে কেন্দ্র করিয়া একটা স্থানীয় রাজনীতি দানা বাঁধিতেছে। এই স্থানীয় রাজনীতি কি পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহা সেদারী প্রস্তাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার লীগ-রাজনীতি পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা কংগ্রেসের ভাঙ্গন ধরাইতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালার লীগ-রাজনীতি মতবিভিন্ন হিন্দু বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাহারা লীগের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য বাঙ্গালাকে ভাগ করিল, এ আন্দোলনে কাহারো কোন ক্ষতি হয় নাই। শুধু টেলিগ্রাম করিতে হইয়াছে, যথাবিহিত হিন্দু টেলিগ্রাম করিয়া জগৎবাসীকে বুঝাইয়া দিল যে তাহারা বাঙ্গালাকে ভাগ করিতে চায়। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে ইহারা কয়জন? যাক সে কথা, এই তাগাতাগির অনোভাব হইতে কংগ্রেস কর্ম্মীরাও রেহাই পায় নাই। তাহারাও রাতারাতি নিজেদের ত্যাগ ও আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছেন। সেই সাম্প্রদায়িক মন—(খাদি বনাম অ-খাদি) (খদ্দর বনাম খাদাল) নানারূপ ধরিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। ইহার পরিণতি কোথায়?

যতীন্দ্র-তর্পণ

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়

বিদ্রোহী বীর, হে মহামানব,—
বিপ্লবী অবতার—
আজি ভারতের দুরন্ত উষায়
লহ গো নমস্কার।
হৃদয়-শোণিত সেচিয়া সেচিয়া
যেই বীজ তুমি দিয়েছ রোপিয়া—
চেয়ে দেখ বীর, আজ তাহা
মহা-মহীরুহ কলবান—
মহাদুঃখ হতে জাগো বীর, শোনো
ওঠে তব জয়-গান।
মুক্তি-লতা কাতরা জননী
নয়নে অশ্রু-জল—
তোমার নয়নে জ্বলেছে বহ্নি,—
জ্বালায়েছে দাবানল;
আহুতি দিয়েছ কত মহাপ্রাণ
সে অনলে বারে বারে—
শ্বেত-শাসন-আসন টলেছে
সুদূর সাগর পারে।
আজি— অধীনতা-পাশ-মুক্ত-চরণে
ফুটে যে রক্ত-রেখা
হে বিপ্লবী বীর, সে রাগ তোমারও
হৃদয়-শোণিতে লেখা।
মিঠা তোমার আকাশে, বাতাসে
ধ্বনিতেছে অবিরাম—
ইতিহাসে লেখা সোনার আখরে
রহিবে তোমার নাম।

পাঁচটি বাঙ্গালী—নায়ক যতীন—
চারা খণ্ডের রণে—
সওয়া-দু'শত যুঝিল পাঁচশ'
পুলিশ-বাহিনী-সনে।
নখিল টেগার্ট পুরুষসিংহে
অগ্র-আসন-শিরে!
অমর-কীর্ত্তি রেখে গেল বীর
বুড়া বালাং-এর তীরে!
দেশ-বৈরীর তুমি ছিলে ত্রাস—
নামের গরুড় সম—
প্রয়োজন তব ফুরায়নি ত শেষ,—
জাগো হে, দ্বিজোত্তম।
দ্বিধেষী-রবির-অস্তে পুণ্য
স্বরাজ-শঙ্খ রব—
বাংলার দেহ আজও শীড়িতেছে
পুঞ্জক্ষণের মত।
সেদিনে তাহারা ছিল না অজানা,
ছিল না দুরবেশ—
পরোমুখ-বিষ-বুদ্বের দলে
ছেয়ে আছে আজ দেশ।
হে যতীন্দ্র তুমি ওঠো জ্যোতিঃ-রূপে
তরুণ হৃদয়ে জ্বলি!
কালের ললাটে—অমর মহীয়ে—
লহ অঞ্জলি।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছবির পরে ছবির শোভাযাত্রা চলে। কিন্তু উনিশ শো তিরিশ সালের সেই গভীর গভীর পরিবেশের মধ্যেও মনে পড়ে, ধনপতি তোনা এবং তার সুযোগ্য পিতৃদেব ভবেন মজুমদারকে—ঝোড়ো মেঘের এককোণে এক ফালি রুপালি রেখার মতো তা ঝলমল করে ওঠে।

আকস্মিক দেশসেবার উত্তেজনায় বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছিল তোনা, কিন্তু ছোট একটা কাঁটার খোঁচা লাগতেই সে বেলুন ফেটে চুপসে গেল।

দুরাত্রি হাজত বাস করেই তোনা টের পেলো কাজটা ভালো হয়নি ; এবং দেশপ্রেম বস্তুটি আর যাই হোক, মনসাতলার মার্বেল কাটানো কিংবা গোটের মেলায় হাত সাফাই করবার মতো সুখের ব্যাপার নয়। ছারপোকা আর কাঁটার মতো খস্‌খসে রোঁয়ার ভরা কম্বলশয্যা তার পুষ্পশয্যা বলে মনে হল না, মশার কামড়ে চোখ মুখ ফুলে উঠল, 'সোনেকি হিন্দুস্তান' গানটা ব্রহ্মতালুতে গিয়ে আটকে রইল, গলা দিয়ে আর বেরুল না। অবশেষে বাপ ভবেন মজুমদার থানা পুলিশে অনেক হাঙ্গাম হজ্জুত করে, ছেলেকে বণ্ড লিখিয়ে দিয়ে, বিদেশীর এবং কংগ্রেসের বাপ-বাপান্ত করতে করতে পুত্ররত্নকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু আদালতের টাউট ভবেন মজুমদারের রাগটা ওইখানেই থামল না। পরের দিন সকাল বেলায় বুক টান করে সে দাঁড়িয়ে গেল মনসাতলার সিমেন্টের বেদীটার ওপরে। না—বক্তৃতা দিয়ে জেলে যাওয়ার জন্যে নয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম উদ্দেশ্যে।

তারপর মুখ ছুটল ভবেন মজুমদারের।

শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষার অবিশ্রান্ত গালাগালি। কংগ্রেস চোর, গান্ধী চোর। স্বদেশী ছোকরারা সব গুণ্ডা আর বদমায়েসের দল। ইংরেজের সঙ্গে চালাকি করতে গেছে সব! ঠেঙিয়ে সোজা করে, ঝুলিয়ে দেবে বাপের নাম। তা দিক—তার জন্যে ভবেন মজুমদারের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তার ছেলেকে—এমন হীরের টুকরো ছেলেকে বিভ্রান্ত করেছে কোন্ শয়তান হতভাগারা? তাদের কাঁচা মাথাগুলো আস্তো আস্তো চিবিয়ে খেলে তবেই রাগ মেটাতে পারে ভবেন মজুমদার।

বক্তৃতাটা হল জমাট—প্রায় ঘাড়া দেড়ঘণ্টা। যারা শুনছিল তারা তখনকার মতো কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা হল তার পরের দিন—ভোরের আলো আকাশে ফুটে ওঠবার আগেই।

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

টিন পিটানোর বিশ্রী বেখাপ্পা আওয়াজে পাড়ার লোক জেগে উঠল। আর জেগে উঠলেন ভবেন মজুমদার—কিন্তু সে জাগরণ আনন্দের নয়। এই যে বৈতালিকেরা তাঁকে প্রভাতী শুনিয়ে জাগাতে এসেছে এদের উদ্দেশ্য যে একেবারেই সাধু নয় এ সম্বন্ধে ভবেন মজুমদারের সন্দেহ রইল না।

—ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

প্রায় পঁচিশ ত্রিশটি পাড়ার ছেলে জড়ো হয়েছে ভবেন মজুমদারের বাড়ির সামনে। আট দশটা ভাঙা ক্যানেস্তারা কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে সব—প্রাণপণে তাই পিটছে তারা। শব্দে যে কোনো লোকের শুধু কান কেন, মাথার পোকা পর্যন্ত বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

টিন পেটানোর দলে আজ রঞ্জুও ছিল।

—এসব কী?—রোষরক্ত লোচনে ভবেন মজুমদার বললেন, অ্যাঁ, কী এসব?

উত্তর এল সমস্বরে।

—বন্দে মাতরম্—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—ভারত মাতা কী জয়—

ক্রোধে ভবেন মজুমদার ডিড্রিং করে লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বললে, শালা সুয়ারকা বাচ্ছা সব। ভাগো, ভাগো এখান থেকে—

এবার জবাব দিলে ক্যানেস্তারা। ভবেন মজুমদারের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে কর্ণপটহবিদারী শব্দ উঠতে লাগল : ক্যান্-ক্যান্-ক্যান্—

—পালা সব, নইলে খুন করে ফেলব বলছি—

ক্যানেস্তারা দ্বিগুণ জোরে প্রত্যুত্তর দিলে।

ভবেন মজুমদার আবার একটা লাফ দিলে শূন্যে। এ অবস্থায় হাই-স্নাপ্ প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে সে বোধ হয় রেকর্ড করে ফেলতে পারত একটা। বললে, এই ভোনা, এই হারামজাদা, হামারা লাঠি লে আও—

উত্তেজনায় ভবেন মজুমদার ভুলে গিয়েছিল তার ছেলে বাঙালী, হিন্দুস্থানী নয়।

কিন্তু বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে ভোনা তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্যানেস্তারা পার্টির দিকে তাকিয়ে আছে। Thou too Brutus—অ্যাঁ! কাল পর্য্যন্ত যাদের ওপর তার একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল, আজ তারাও তার শত্রুপক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। কালী, খাদু, পূর্ণ—তার বিশ্বস্ত অনুচরেরা শেষে তাদেরই বাড়ির সামনে এসে ক্যানেস্তারা বাজাতে সুরু করেছে!

—এই শালা সুয়ারকা বাচ্ছা, শুনা নেই? হামি বোলানা তুনকো লাঠি আনতে?—বলেই ভবেন মজুমদার একখানা ঘুসাখই চাটি হাঁকড়ালো ভোনার কানের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁত্ করে উঠেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ভোনা, আর ভৈরব হুঙ্কার ছেড়ে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো ক্যানেস্তারা পার্টিকে তাড়া করলে ভবেন মজুমদার।

ক্যানেস্তারা পার্টি তৈরীই ছিল, চক্ষের নিমেষে হাওয়া। সমস্ত পাড়াটা নিষ্ফল আক্রোশে দৌড়ে ভবেন মজুমদার যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, তখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তেম্নি ক্যানেস্তারা তার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে বাজতে আসছে।

ভবেন মজুমদার ঝাঁ করে থেমে দাঁড়ালো, আবার তাড়া করল। আবার ফিরল, আবার তাড়া করল। তারপর যখন বেদম হয়ে দাওয়ায় বসে অনর্গল গালিগালাজ সুরু করলে, তখন তার কণ্ঠস্বরকে তলিয়ে দিয়ে দশ দশটি ক্যানেস্তারা তেম্নি পরম পুলকে যথাস্থানে এসে আনন্দ-ধ্বনি করছে।

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা নিচ্ছেদ নিয়মে ক্যানেস্তারা বেজে চলল। ভবেন মজুমদার ঘরে থাকে—বাড়ির চারদিকে ক্যানেস্তারা বাজে; বাজারে যায়, পেছনে ক্যানেস্তারা চলে; উকিলের সেরেস্তায় দিকে হাঁটে, পেছনে ক্যানেস্তারা হেঁটে যায়; রাত্রে শোবার চেষ্টা করে, জানালার বাইরে ক্যানেস্তারা ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে থাকে। সমস্ত সহরের একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠল ভবেন মজুমদার।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ভবেন মজুমদার ভোনার হাত ধরে আবার সেই মনসাতলায় এসে দাঁড়ালো। বললে, ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় করছি। ক্যানেস্তারা বন্ধ হোক—আমার প্রাণ যায়।

ছেলেরা বললে, বলুন, বন্দে মাতরম্—

কাতরস্বরে ভবেন মজুমদার বললেন, বন্দে মাতরম্।

—বলুন, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়—

—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়।—ভবেন মজুমদার প্রায় কেঁদে ফেললে।

ক্যানেস্তারার নিনাদ বন্ধ হল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

ঝড়ের গতিতে উড়ে বেরিয়ে গেল আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনগুলি। চম্পারণে, মেদিনীপুরে জেগে রইল তার মৃত্যুঞ্জয় স্বাক্ষর। কারাগারে, নির্য্যাতনে, রক্তপাতে আরো দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল স্বাধীনতার শপথকে; তবের সন্দেহ রইল না যে এবার যাত্রা সুরু, থেমে দাঁড়াবার উপায় রইল না।

বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তকে রাতের পর রাত জেগে রঙ্গু আবৃত্তি করে যেত :

"বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে সুপ্ত হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
এসেছে আদেশ,
বন্ধনের কাল হল শেষ—"

তার পর এল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। নানা লোকে নানা ভাবে বিচার করলে তাকে। কেউ খুশি হল, কেউ হল না। কেউ এটাকে অপমান মনে করে লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে রইল, আবার কেউ বা একে সম্মানজনক সন্ধি বলে বিশ্বাস করে নিলে। আন্দোলন থামল। তখনকার মতো দাতার আড়ষ্ট রইল অগ্নিগিরির মুক্তিমুখ, কিন্তু 'বন্দরের কাল হল শেষ!'

জানালা দিয়ে আত্রাইয়ের বন্যা দেখেছিল রঙ্কু, অভিভূত দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল অসহযোগ আন্দোলনের রূপটাকে। কিন্তু এইবারে এল তার পালা। আর এক নতুন পথে, আগুন জ্বালা রক্তধারা এক দুর্গমের অভিসারে তাকে হাতছানি দিলে উনিশ শো তিরিশ সাল।

সূত্রপাতটা হল আশ্চর্য রকমে।

খবরের কাগজের পাতায় ভয়ঙ্কর সংবাদ এল একটা। চকল হয়ে উঠল দেশ।—পুরের শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট আততায়ীর রিভলভারের গুলিতে নিহত। সংবাদ ওইখানেই শেষ হল না। একটার পর আর একটা—ডাক লুট, ডাকাতি, হত্যা, বোমা বিস্ফোরণ। ত্রিবর্ণ-পতাকার আলোড়নে চকল শান্তিপূর্ণ অহিংস-বাংলা দেশের বুকের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করলে আগ্নেয়গিরি।

পাড়ার একদল ছেলের সঙ্গে কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে ফিরছিল রঙ্কু। হঠাৎ একজন শ্লেষভরা গলায় বললে, ওই ভাখ, ভালো ছেলে যাচ্ছে।

সকলের দৃষ্টি এক সঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে। একটা সাইকেলে করে চলেছে পরিমল।

শুনিয়ে শুনিয়ে খাঁদু বললে, হ্যাঁ, বড় হয়ে রায়বাহাদুর হবে। এত বড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, ঘর থেকে একবার বেরুল না পর্যন্ত!

পরিমল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বাঁ করে ঘুরিয়ে দিলে সাইকেলটা। তার পর দলটার একেবারে পথরোধ করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

—এই যে দেশপ্রেমিকের দল, ভারতমাতাকে স্বাধীন করে কিরে এলে তো?

অবাক বিস্ময়ে রঙ্কু তাকিয়ে রইল পরিমলের মুখের দিকে। এমন দিনে এই রকম কথা যে কেউ উচ্চারণ করতে পারে এটা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। অল্প পরিচয়, মুখ চেনা বললেই হয়, তবু কেন কে জানে পরিমল সম্পর্কে রঙ্কুর কেমন মোহ ছিল একটা—একটা কৌতূহল ছিল। কিন্তু মিঠুর একটা ঘা দিয়ে যেন পরিমল তার মোহভঙ্গ করে দিলে। পরিমল আর যাই হোক—সে যে ভবেন মজুমদারের দলের লোক এতটা ভাববার জন্যে রঙ্কুর মন তৈরী ছিল না।

জবাব দিলে পূর্ণ: তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

—লজ্জা? কেন?—কৌতুকভরা হাসিতে পরিমলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: তোমরাই তো গান গেয়ে বেড়াও—'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

কানী বললে, ধিক।

কিন্তু পরিমল গায়ে মাখল না। তেমনি উজ্জ্বল স্বরে প্রশ্ন করলে, ব্যাপারটা কী? সবাই মিলে এ ভাবে চাঁদা করে আমায় গাল দিচ্ছ কেন?

খাঁদু ঘৃণামিশ্রিত মুখে বললে, বুঝতে পারছ না?

—একেবারেই না। বোঝালে বড় বাধিত হব।

তোমার অভাবে আজকাল খাঁদুই নেতা। সুতরাং বোঝাতে সুরু করলে।

—আজ দলে দলে দেশের ছেলে জেলে যাচ্ছে। স্বাধীনতা আসছে। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্তে টেরী বাগিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

পরিমল বোঝবার ভাণ করলে: ওঃ, তাই নাকি! খেয়াল করিনি তো। তা কী যেন আসছে বললে?

—স্বাধীনতা।

—স্বাধীনতা? আসছে নাকি? কোন ট্রেণে?

খাঁদুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহী হওয়ার ল্যাঠা অনেক। চটলে চলবে না—তাতে ভারত মাতা ব্যথা পাবেন। সুতরাং অহিংস গলায় জবাব দিলে, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কী দেবার সময় আমাদের নেই। আমরা কাজের লোক। সরো, পথ ছাড়ো।

পূর্ণ বললে, সামনে আসন্ন স্বাধীনতার রূপ দেখেও তুমি এমন করে ইয়ার্কী দিতে পারছ এটাই আশ্চর্য!

—স্বাধীনতার রূপ? সে কী রকম ভাই!—আবদারের সুরে পরিমল বললে, একটা ছাগলের গলায় খদ্দরের দড়ি

আর তার পিঠে একবস্তা স্বদেশী লবণ—এই কি স্বাধীনতার মূর্তি ?

—যা বোঝোনা, তা নিয়ে বাজে কথা বোলোনা—কালী চটে উঠল।

—আহা-হা, ক্ষেপছ কেন ?—পরিমল হাসিমুখে বললে, সত্যাগ্রহীর যে চটতে নেই। আচ্ছা, তোমরা তো সবাই অহিংস, আমি যদি তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে রাম চাঁটি লাগিয়ে দিই, তোমরা নিশ্চয় তাতে আপত্তি করবে না ?

মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কিড়মিড় করে উঠল ঝাঁদুর, কিন্তু ব্যর্থ আক্রোশ। পরিমলের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে সে পাশ কাটিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই।

পেছন থেকে ডাক দিলে পরিমল : চললে ? হে দেশপ্রেমিকেরা, নিতান্তই যদি যাবে তা হলে যাওয়ার আগে কেউ আমাকে চার আনা পয়সা ধার দিয়ে যাও।

মুখ ফিরিয়ে কালী বললে, কী করবে চার আনা পয়সা দিয়ে ?

—গলায় দেবার জন্যে দড়ি কিনব।

এর পর আর কথা চলে না। মুখ গোঁজ করে নিরুপায় স্বেচ্ছাসেবকেরা হাঁটতে সুরু করলে। পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল পরিমলের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

দু পা এগিয়ে ঝাঁদু বললে, বিশ্বাসঘাতক !

পূর্ণ বললে, সেন্সলেস !

কালী বললে, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু।

রঞ্জু কিছুই বললে না। রাগ নয়, অনুযোগ নয়, একটা গভীর বেদনাবোধে সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পরিমলের ভেতরে অসাধারণ কিছু একটা কামনা করেছিল সে—আবিষ্কার করতে চেয়েছিল কোনো একটা আশ্চর্য কিছুকে। নির্জন কাঞ্চন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কী একটা দুর্বোধ সম্ভাবনা তার চেতনাকে দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো কাঁচের বাসন ভেঙে পড়বার মতো বিশ্রী শব্দ করে মনের ভেতরে কী যেন চুরমার হয়ে গেল তার।

কিন্তু পৃথিবী অনেক বড়—মানুষ অনেক বড়। রঞ্জু সেটা জানল এরই দিন করেক পরে। উনিশ শো তিরিশ সাল তার মনের সামনে খুলে দিলে আর একটা মণিকোঠার দরজা। (ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধীর ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

একথা আজ সর্বজনীনসম্মত যে, মহাত্মা গান্ধী বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত যে সকল শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পবিত্র জীবন-যাপন প্রণালী, সত্যাগ্রহ, অহিংসানীতি, মানবপ্রেম, রাজনীতিবোধ, ধর্মমত প্রভৃতিই তাঁহাকে এই সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। ভারতের সর্বজনীন "সত্য" ও "অহিংসা"কে তিনি তাঁহার রাজনীতি ও ধর্মজীবনে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন যে, তাহা অপূর্ব ও অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। পরাধীন ভারতের মুক্তিকামনাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইলেও ধর্মের ক্ষেত্র হইতে তিনি সামান্য মাত্রও দূরে থাকেন নাই। রাজনৈতিক জগতে তিনি যেমন একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মের জগতেও তিনি তেমনি কোনও ধর্মপ্রচারক বা ধর্মগুরু হইতে কম নহেন। তবে সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী বা ঋষির ন্যায় তিনি তাঁহার ধর্মসাধনার জন্য জগৎসংসার ত্যাগ করিয়া পর্বতের গুহা, নদীর তীর, বন, জঙ্গল, কি অন্য কোথাও কোন নির্জন স্থান বাছিয়া লন নাই। সমগ্র ভারতই তাঁহার কর্ম ও সাধনার স্থান। ভারতের ৩০ কোটি নরনারীর সুখ দুঃখের সহিতই তাঁহার সাধনজীবন জড়িত। তাই রাজনীতি ও ধর্মনীতি তাঁহার নিকটে দুইটি পৃথক জিনিষ নহে। তিনি বলেন—ধর্ম ছাড়া রাজনীতি নাই। রাজনীতি হইল ধর্মেরই সহকারী। ধর্মবর্জিত রাজনীতি একটি মরণের ফাঁদ বিশেষ, কারণ ইহা আত্মার মৃত্যু ঘটায়।

এক সময়ে কয়েকজন খৃষ্টান তীর্থযাত্রী ওয়ার্ধায় আসিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ভারতে তাঁহার মূল কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—আমার কর্মপ্রণালী সম্পূর্ণ ধর্মবিষয়ক। সকল মানুষের সহিত আমি নিজেকে পরিচিত করিতে না পারিলে, আমি ধর্ম জীবন পরিচালন করিতে পারিব না এবং ইহা করিবার জন্যই আমি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছি। আজিকার দিনে মানুষের সকল কর্ম ধারাই এমন ভাবে এক সঙ্গে জড়িত যে উহাদিগকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্মবিষয়ক বলিয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না। মানুষের কাজ ছাড়া যে, কোন ধর্ম থাকিতে পারে ইহা আমার জানা নাই।

মহাত্মা গান্ধী তাই মানুষের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া তাহারই মাধ্যমে তাঁহার সত্য ও অহিংসা ধর্মের প্রচার করিতেছেন।

তাঁহার রাজনীতি ও ধর্মনীতি পাশাপাশি চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—বাহিরে আমি রাজনীতির আবরণ পরিধান করিলেও অন্তরে কিন্তু আমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও নিজের জীবনে সকল ধর্মেরই সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। তিনি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম জীবনে হিন্দুর বেদ-বহির্ভূত জগতের অপরাপর ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জগতের সকল ধর্মকেই তিনি সমান শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি নিজেকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্সী সকল সম্প্রদায়েরই লোক বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন—পৃথিবীতে যত ধর্মমত থাকিলেও প্রত্যেক ধর্মেই আধ্যাত্মিক বহু কথা রহিয়াছে এবং সকল ধর্মেই এই আধ্যাত্মিক কথাগুলি প্রায় অভিন্ন। এই দিক দিয়া এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে প্রত্যেক ধর্মেই বর্তমানে বহু দোষ জুটিয়াছে। এগুলি সকল ধর্মেরই মূল শিক্ষার বিরোধী।

মহাত্মা গান্ধী নিজে পৌত্তলিক নহেন বটে, কিন্তু পৌত্তলিকদের প্রতি তাঁহার কোনরূপ অশ্রদ্ধাও নাই। তিনি বলেন—জগতের যাহা কিছু, সকলের মধ্যেই ভগবান ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। সামান্য ধূলিকণাতেও তিনি রহিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মূর্তিপূজা করেন, তাঁহারা সেই ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকেন। কারণ যাহা কিছু আরাধনা করা যাইবে তাঁহারই আরাধনা হইবে। যে অবর্ণনীয়, রহস্যময় ও সর্বব্যাপী-শক্তি সদাপরিবর্তনশীল ও মরণশীল জগতের মূলে থাকিয়া নিজে অপরিবর্তিত রহিয়াছেন এবং জগতের সকলকেই ধারণ করিয়া সৃষ্টি, ধ্বংস ও পুনর্সৃষ্টি করিতেছেন, সেই শক্তিই হইল ভগবান।

ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য—ভগবানের অসংখ্য নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে নামেই তাঁহাকে ডাকুন না কেন, সেই এক ভগবানকেই ডাকা হইবে। ঈশ্বর, আল্লা, গড্ প্রভৃতি নাম বিভিন্ন ধর্ম দিয়াছে মাত্র। ভগবানকে আমি রাম নামেও ভজনা করিয়া থাকি। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি অজ, বান্ধব। মহাত্মাজী এই ভগবানকেই কেবল ভয় করিতে বলেন, এবং ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, গীতার কথামত ফলে আশা না করিয়া ভগবানে আমাদের সমস্ত কাজ অর্পণ করা উচিত। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হইল তাঁহার নৈমিত্তিক প্রার্থনা। তাঁহার প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেন—ভগবানে আমার বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে, আমার প্রার্থনার আগ্রহও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। প্রার্থনা ব্যতীত জীবন নিরানন্দ ও ফাঁকা বলিয়া মনে হয়। শরীরের জন্য খাদ্যের যেমন প্রয়োজন, আত্মার জন্য তেমনি প্রার্থনাও একান্ত আবশ্যক। বরং আত্মার জন্য প্রার্থনার যতটা প্রয়োজন শরীরের জন্য খাদ্যের ততটা প্রয়োজন নাই। কারণ শরীর ঠিক রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে উপবাসের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রার্থনায় এরকম কোনও ব্যবস্থার কথা নাই।

মহাত্মা গান্ধী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রার্থনা করিতেন, প্রতিবার আহার গ্রহণ কালেও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রার্থনা-পদ্ধতিকে কোন এক সম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মের বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ইহাতে সকল ধর্মেরই সমন্বয় থাকায়, যে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার সহিত প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন।

তাঁহার প্রার্থনার প্রথমেই বৌদ্ধধর্মের জাপানী মন্ত্র "নম্যো হো রেঙ্গে ক্যো" এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করা হয়। ইহার অর্থ হইল—সদ্ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই মন্ত্রটি মাত্র অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে মহাত্মার প্রার্থনার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। একজন জাপানী-হিন্দু এই মন্ত্রটি প্রবর্তন করেন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের জন্মস্থান ভারত ভ্রমণে আসিয়া সেবাগ্রামে ২।৩ বৎসর অবস্থান করেন। মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় উক্ত বৌদ্ধ-হিন্দু ইহা আবৃত্তি করিতেন। পরে জাপানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে, ইংরাজ সরকারেরা তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যান। কিন্তু গান্ধীজীর প্রার্থনায় তাঁহার প্রবর্তিত মন্ত্রটি আজও চলিয়া আসিতেছে।

জাপানী মন্ত্রটি উচ্চারিত হইবার পরই গান্ধীজীর প্রার্থনায় ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক,—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করা হয়। ইহার অর্থ—জগতে যাহা কিছু বিষয় আছে, সেই সমুদয়কে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরময় এরূপ জানিয়া বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; অথবা ঈশ্বরপ্রদত্ত বিষয় দ্বারা ভোগ নির্বাহ কর। কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

মহাত্মাগান্ধী ত্রিবান্দ্রমে হরিজন সেবাকার্য লইয়া যখন ভ্রমণ করেন, তখন হইতে তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে এই শ্লোকটি যোগ করা হয়। ঈশোপনিষদের এই মন্ত্র ও জাপানী মন্ত্র এই দুইটিই গান্ধীজীর প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যকালীন উভয় প্রার্থনারই প্রারম্ভে উচ্চারণ করা হয়।

প্রভাতকালীন প্রার্থনায়, আরতির সময়কার শ্লোক, সুপ্রভাতা, সরস্বতী, গণেশ, গুরু, বিষ্ণু, ব্রহ্মেশ্বর প্রভৃতি আবৃত্তি করা হয় এবং সান্ধ্য প্রার্থনায় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫-৭১ এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হয়। প্রভাত ও সন্ধ্যার প্রার্থনায় এইটুকু পার্থক্য থাকিলেও উভয় প্রার্থনায়ই সেবাগ্রামে একাদশব্রত, কোরাণের শ্লোক ও জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম-শাস্ত্রের অংশ যথাক্রমে উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। এই একাদশব্রত হইল—

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ।
শরীর-শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয় বর্জন।
সর্ব ধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শ ভাবনা।
হী একাদশ সেবাবী নম্রত্বে ব্রত নিশ্চয়ে॥

অর্থাৎ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ,

অপরিগ্রহ, সর্বধর্ম সমানত্ব, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা বর্জন এই একাদশ ব্রত। এই ব্রত সমূহ পালন দ্বারা মুক্তির লাভ হয়।

আব্বাস তোয়েবজীর কন্যা রাজিয়া তোয়েবজীর প্রস্তাব অনুযায়ী মহাত্মাজী তাঁহার প্রার্থনায় কোরাণের অংশটুকু যুক্ত করেন। কোরাণের শ্লোকটির বাঙ্গলা অনুবাদ এইরূপ—আমি পাপাত্মা শয়তান হইতে বাঁচার জন্য পরমাত্মার শরণ লইতেছি।

হে প্রভু, তোমার নামেই সমস্ত আর্ঘ আরম্ভ করি। তুমি দয়ার সাগর, তুমি কৃপাময়, তুমি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা, তুমিই মালিক। আমি তোমারই আরাধনা করি—তোমারই সাহায্য চাই। অন্তকালে তুমিই ত্রাণ করিবে। তুমি আমাকে সরল পথ দেখাও, তাঁহাদেরই চলার পথ দেখাও। যাঁহারা তোমার কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার পাত্র হইয়াছেন, যাঁহারা তোমার অপ্রসন্নতার পাত্র, যাহারা ভুল পথে চলিয়াছে তাহাদের পথ আমাকে দেখাইও না।

ঈশ্বর এক, তিনি সনাতন, তিনি নিরাময়, তিনি অজ, অদ্বিতীয়। তিনি সমস্ত সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই।

আগা খাঁ প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী কস্তুরবার মৃত্যু হইলে, ডাক্তার দিলভার জরথুষ্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্র হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোকটি সেই সময় হইতেই গান্ধীজীর প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জরথুষ্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্রের শ্লোকটির অর্থ হইল—হে জ্যোতির্ময়, সর্বোত্তম ধর্ম ও সত্য এবং তাহার ক্রিয়া আমাকে বল। যাহাতে আমি সৎপথে থাকিয়া তোমার মহিমাকীর্তন করিতে পারি। তুমি যেমন ইচ্ছা আমাকে পরিচালিত কর। আমার জীবন চিরনবীন থাকুক ও আমাকে স্বর্গসুখ দান করুক।

প্রাতে এবং সন্ধ্যার উভয় প্রার্থনাতেই শ্লোক উচ্চারণ শেষ হইলে ভারতীয় কোন ভাষার একটি ভজন অথবা একটি ইংরাজী স্তোত্র গীত হয়। ভারতীয় ভাষার ৩৪টি ভজন ঠিক করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের রচিত বাঙ্গলা গান। ভজনের পর করতালি দিয়া রামধুন গান হয়। ১৮টি রামধুন গানের মধ্যে যে কোনও একটি লইয়া করতালিসহযোগে পাঁচ মিনিট ধরিয়া গাওয়া হয়।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় রামধুন গানের পর গীতা পাঠ হয়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ভাগ করিয়া ১৮ দিনে পাঠ শেষ করা হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠের পর,

বিপদো নৈব বিপদঃ সম্পদো নৈব সম্পদঃ।
বিপদ্বিস্মরণং বিষ্ণোঃ সম্পন্নারায়ণ স্মৃতিঃ॥

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করা হয়। ইহার অর্থ—

বিপদ বিপদ নহে এবং সাংসারিক সম্পদ সম্পদ নহে, বিষ্ণুকে ভুলিয়া যাওয়াই বিপদ, আর নারায়ণকে স্মরণ করাই সম্পদ।

সান্ধ্য প্রার্থনায় রামধুন গানের পর রামায়ণ পাঠ করা হয়, তবে একাধিক স্থানে প্রার্থনা সভার আয়োজন হইলে সেখানে রামায়ণ পাঠ সম্ভব হইয়া উঠে না। এইসব সভায় গান্ধীজী সাধারণতঃ প্রার্থনার শেষে সমবেত নরনারীদের উদ্দেশ্য করিয়া সামান্য উপদেশ দিয়া থাকেন এবং কেহ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দেন।

প্রভাত ও সন্ধ্যার প্রার্থনা ছাড়া মহাত্মা গান্ধী যখনই আহার গ্রহণ করেন তখনও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আহার কালীন প্রার্থনায় তিনি, ওঁ সহনাববতু। সহনৌভুনক্তু। সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইহার অর্থ হইল—তিনি আমাদের দুই জনকে একসাথে রক্ষা করুন। তিনি একসাথে আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন একত্র মিলিত হইয়া পুরুষার্থ করি। আমাদের অধ্যয়ন যেন তেজস্বী হয়। আমরা যেন একে অন্যকে দ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সেবাগ্রাম ভিন্ন মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবান্বিত সকল গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানেই যথা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত খাদি প্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানেই এই প্রথায় প্রার্থনা হইয়া থাকে। এই প্রার্থনায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভগবানের নিকটে "দেহি" বলিয়া কিছুও চাওয়া হয় না। সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া শুধু এই বলা হয় যে, আমাকে নির্মল কর, পরিশুদ্ধ কর ইত্যাদি। মহাত্মার এই প্রার্থনাপদ্ধতি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দু ধর্মের সারাৎসার গীতার নিষ্কাম ধর্মকেই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হইতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবেরও সেবক হইতে হইবে। তাই তিনি এই সেবাকার্যেই নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের জন্য ভগবানের নিকটে তিনি কি বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রাতঃকালীন প্রার্থনা হইতে উদ্ধৃত নিম্নের শ্লোক দুইটিতে তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। তিনি প্রার্থনা করেন—

নত্বহং কামরে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কামরে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

আমি রাজ্য অথবা স্বর্গ অথবা অপুনর্ভব বা মোক্ষ চাই না। আমি কেবল এই চাই যে, দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখের অন্ত হউক।

অস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালনন্তাং
ন্যায়েন মার্গেন মহীং মহীশাঃ
গোব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু॥

প্রজার কল্যাণ হউক। নরপতিগণ ন্যায়পথে পৃথিবী পালন করুন। গো ব্রাহ্মণের শুভ হউক ও সমস্ত লোক সুখী হউক।*

* সংস্কৃত, জরথুষ্ট্রীয় ও কোরানের শ্লোকগুলির বাঙ্গলা অনুবাদ খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত 'আশ্রম ভজনাবলী' হইতে গৃহীত।

শকুন্তলা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শকুন্তলা, আজ সহসা বসন্তোদার সমীরণে
স্মৃতির খাতার প্রীতির পাতার তোমার কথাই পড়্‌ছে মনে।
মূর্ত্তি তোমার নিত্য-লোকের চিত্তে জাগে যে রূপ ধরি',
ব্যথার মতন ভুলতে তারেই ব্যথার মতোই স্মরণ করি।
ক্ষণে-ক্ষণে ভাব্‌ছি তাই আজ, দুষ্মন্তকে হারিয়ে দিয়ে,
নাই-বা হ'লাম রাজাধিরাজ, তোমায় ভালোবাসব প্রিয়ে,—
বাস্‌ব ভালো মনে-প্রাণে শুধু চোখের নেশাতে নয়,
রূপের মোহের ক্ষণিক খেলার নয় অভিনয় আমার প্রণয়;
যে প্রেম তাহার প্রিয়ার চেনায় আপন-দেওয়া অভিজ্ঞানে,
চপল চোখের খেয়াল সে তো, প্রাণ কোথা তার প্রণয়-দানে।
শকুন্তলা, হায় অবলা! তপোবনের তড়িল্লিখা,
এ নয় সখের আতপ-বাহ্নি, সাগ্নিকের এ অগ্নিশিখা!

শকুন্তলা, আমি জানি তোমার গভীর গোপন ব্যথা,
শাপ দিয়ে যা' নষ্ট করে ঋষির মুখের কথা!
তন্ময়তাই সত্য পূজা, ভগবানেও মিলায় যা'তে,
গুণ হয়ে তাই দুষ্ট হ'ল ভ্রষ্ট নীতির সংহিতাতে।
প্রেমের পূজায় যে মন বাঁধা, চায় কি সে ধন অন্য পানে,
সকল ধর্ম্ম ভুলায় যে তার প্রাণের ধর্ম্ম-অভিধানে।
সুদুঃসহ বিরহ যার জীবন-মরণ সমান গণে,
কিসের 'অয়মহং ভোঃ' কা'র, নাই যদি তার যায় শ্রবণে।
এতই কি সে অপরাধী,—পাতকী সে এম্‌নি পাপে,
ধর্ম্ম তাহার হান্‌তে হবে মর্ম্মঘাতন অভিশাপে?
শ্লোকীবধের যে বেদনা বিঁধল ঋষি বাল্মীকিরে,
নারীবধে দুর্ব্বাসা যে, শোধ কি তারই দিল ফিরে'?

শৈলবালার স্বয়ম্বরা যোগীন্দ্র সেই শিবের কাছে,—
ব্যর্থতা তার বুঝতে পারি, তপের বিঘ্ন ঘটায় পাছে!
দুষ্মন্ত নয় তপস্বীরাজ, সমাজ-ধর্ম্মে শুধু রাজা,—
নারী বলে'ই তাই সে দিল কাপুরুষের যোগ্য সাজা!
রাজাই বা সে কেমন করে' বনাশ্রমের গহন-তলে
মন-হরিণীর হৃদয় হানে বন-হরিণীর শিকার-ছলে!

বনের মৃগী, সেও যে ভরে পালায় আপন প্রাণের লাগি',
মনের মৃগী—দেয় সে ধরা মরণ-ব্যাধের শরণ মাগি'!
যে অজানায় যায় না চেনা রাজার সজ্জা-অন্তরালে,
তার হাতে, হায়, এমন লজ্জা লেখা ছিল তোমার ভালে।
তপোবনের মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা! তোমার তরে
সতার শিরোমণি হয়েও মিললো না ঠাঁই রাজার ঘরে।

হায় সরলা শকুন্তলা, কণ্ব মুনির তপোবনে
ভালই ছিলে অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা সখার সনে।
হরিণ-পাতী-পুষ্প-পাখী সখী-সাথী সকল ছাড়ি'
গুরুর আদেশ ভিন্ন কেন অন্য পথে চললে নারি?
খুললে কেন মনের দুয়ার অজানারে প্রণয়-দানে,
ভুললে কেন কপট কথায়, ভুললে মনোভবের বাণে?
জানি তরুণ মনের ধর্ম্ম, মানি দেহের দুর্ব্বলতা,
কৃচ্ছ্র কঠোর সংযম-ডোর সেও শোনে না যুক্তি-কথা;
বনে যখন বকুল ফোটে, মনে তখন কোকিল ডাকে,
হায় অবলা, মুগ্ধ হিয়ার প্রাণের তৃষ্ণা মানবে না কে?
তবু জানি, প্রণয়-ফাঁদে অপরাধে কে কার বেশী,
স্বভাব-কোমল বালিকা, না প্রভাব-প্রবল রাজ-বিদেশী!

কার কাছে কে প্রবঞ্চিত, অপরাধী কে কার কাছে?
প্রত্যাখ্যানের অপমানে কে কার হৃদয় বিঁধিয়াছে!
রাজার ধর্ম্ম জানেন রাজা, প্রেমের মর্ম্মে কোথায় ক্ষমা?
তোমার প্রেমের বিত্তে প্রিয়ে, তুমি নিখিল-চিত্তরমা!
কাহার শাস্তি কে লয় শিরে, যতই তোলাও তপস্যাতে,
তোমার অসম্মানের লজ্জা ধরছেনাক এই ধরাতে!
উপেক্ষিতার মূর্ত্তি তোমার কাঁদছে আমার চিত্ত ভরি',
ব্যথার মতোই ভুলতে গিয়েও ব্যথার মতোই স্মরণ করি।
ক্ষণে-ক্ষণে তাই তো ভাবি, দুষ্মন্তকে হারিয়ে দিয়ে
তোমার প্রেমের যোগ্য হয়ে তোমায় ভালোবাসবো প্রিয়ে।
বাস্‌বো ভালো মনে-প্রাণে, সর্ব্বস্ব মোর বিলিয়ে পায়ে
প্রেমের আলো জ্বালবো তোমার, ধূপের মতোই আত্মদাহে।

শকুন্তলা, শকুন্তলা, এ সত্য মোর, ধর্ম জানে,
নিখিল নারীর নিখিল প্রেমের লও সেবা এই প্রেমের দানে।
সারা তপোবনের মূর্ত প্রতীক তুমি আঁখির আগে,
তড়িল্লতা ঐ তমুতে চাঁদের চোখেও চমক লাগে!
অপ্সরা ও ঋষির মিলন দেখেছি ঐ মেঘ মনে,
রতির পুণ্যারতি যেন মহেশ্বরের শ্রীচরণে।

মহুয়-মৃগ তোমার সেবায় বৎসলতায় প্রাণে বাঁচে,
বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-পাতা নিত্য তারি প্রসাদ যাচে;
বনাশ্রমের মুখশ্রীতে অতিথ ছুই সখার সাথে
তোমার উদার দৃষ্টি বাঁধা মাতৃস্নেহের মমতাতে।
ভাব্‌ছি মনে, দেখ্‌ছি যত চপল রাজার প্রেম-অভিনয়,
তোমার প্রেমের অপমানে প্রেমের রাজ্যে মানুষ সে নয়।

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ

(২)

যুদ্ধবিরতির ফলে যখন ফ্যাসীবিরোধীগণ স্বাধীনতা লীগের পতাকা তলে একত্র হয়ে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে সেই সময় দলের অধিনায়ক নেতা ঃ: আউঙ্গ-সান তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে যে ভাবে নিহত হয়েছেন তাতে ব্রহ্মদেশের দুর্ভাগ্যই সূচিত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ব্রহ্মের রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বিতীয়ানীয় সকল নেতাই স্থানচ্যুত হয়ে পড়লেন। উ-ন এবং থাকিন-বা-সীন হলেন বন্দী, ডাঃ বা-ম'র কোন উদ্দেশ নেই। নূতন গভর্ণরেন্ট পরিচালনার ভার নিয়েছেন আউঙ্গ-সানের জুযোগ্য সহচর থাকিন-নু। থাকিন-নু একজন চতুর রাজনীতিক সন্দেহ নেই, কিন্তু আউঙ্গ সানের মত ব্যক্তিত্ব বা জনপ্রিয়তা এখনও তিনি অর্জন করতে পারেন নি। এদিক দিয়ে ডাঃ বা-ম কিংবা থাকিন-বা-সীন যে বেশী ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর পশ্চাতে রয়েছে ফ্যাসী-বিরোধী লীগের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া মহাবাবা, বারোচিত বা মোহাবা দলের শক্তিকেও উপেক্ষা করা চলে না। ব্রহ্মের রাজনীতিক আকাশের এক কোণে যে মেঘ জমেছে যে-কোন মুহূর্তে তা সারা দেশকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। এর কারণ ফ্যাসিবিরোধী লীগ সমগ্র ব্রহ্মকে একমাত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে সমবেত করলেও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান। গণ-পরিষদের নির্বাচনে ফ্যাসীবিরোধী লীগ কর্তৃক অধিকাংশ আসন দখল করার প্রস্তুত রহস্য হচ্ছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি নির্বাচন বয়কট করেছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে ব্রহ্মদেশের রাজনীতিতে যে বিশৃঙ্খলতা এসেছে প্রথম-মহাসমর ও দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যবর্তীকালে রাজনীতিক আন্দোলনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের প্রাক্কালে ব্রহ্মদেশে তিনটি রাজনৈতিকদল আন্দোলন চালাতে থাকে। ডাঃ বা-ম'র সিনেন্না, উ-ন'র বারোচিত এবং থাকিন সম্প্রদায়ের দোবামা। এই তিন দলের মধ্যে দোবামা দলে সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট নেতারা কাজ করতে থাকেন। বর্তমান ফ্যাসীবিরোধী দলের নেতা আউঙ্গ সান, সোস্যালিষ্ট দলের নেতা থাকিন নিয়া, বর্তমান ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী থাকিন-নু, রেডফ্লাগ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা থাকিন বাদুন, রেডফ্ল্যাগ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা থাকিন-সো প্রভৃতি আধুনিক ব্রহ্মের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ দোবামা দলভুক্ত ছিলেন। থাকিন-বা-সীনও এই সময় থেকেই দোবামা দলে যোগ দেন এবং ১৯৪৯ সালে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে স্বতন্ত্র ব্রহ্মের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন ডাঃ বা-ম। টীন-জ্বর রোচের নির্মাণ ব্যাপারে বৃটীশ গভর্ণরের সঙ্গে মতভেদের ফলে ১৯৩৯ সালে তিনি মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলে উ-ন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভাই দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ পর্যন্ত শাসন কার্য চালান। ডাঃ বা-ম'র আমলে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলে প্রধানতঃ তিনটী নেতাকে কেন্দ্র করে ডাঃ বা-ম, উ-ন ও উ-আউঙ্গ-সান। জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াসে উ-ন দেশব্যাপী ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলন সুরু করে দেন এবং তার ফলে ব্রহ্মে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। উ-ন ব্রহ্মে ভারতীয়দের আগমন বা ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দিতে চাইলেন। ডাঃ বা-ম এতটা গোঁড়ামীর নীতি সমর্থন করলেন না, তিনি ভারতীয়দের আগমন নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী হলেও তাদের চিরতে অসম্মত হতে চান। আউঙ্গ-সান তখন নিখিল-ব্রহ্ম ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। ব্রহ্মদেশের সমস্ত ছাত্র এই ইউনিয়নের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সংক্রান্ত কতকগুলি দাবী নিয়ে। ডাঃ বা-ম'র প্রতিপক্ষ ছাত্র আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন এবং একস্থানে সোভাযাত্রাকারী একটী ছাত্র পুলিসের লাঠিতে নিহত হলে তাঁরা যথা যৈ চৈ জুড়ে দিলেন।

থাকিন-নু ও থাকিন বা-সীনের নেতৃত্বে মোবাসা দল ঘোর শ্রমিক আন্দোলন চালাতে থাকেন। ডাঃ বা-ম শ্রমিকদের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। এই ভাবে তিনি ক্রমশঃ জনসাধারণের আস্থা হারাতে লাগলেন। উ-স এই সুযোগে থাকিন ও মোবাসা দলকে নিজের দলে টেনে ডাঃ বা-ম'র মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে সমর্থ হন।

উ-স যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন তখন ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। বর্ম্মার রাজনীতিকরা দেশের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। উ-স ডোমিনিয়ান শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ডাঃ বা-ম তখন জোর বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে আন্দোলন সুরু করলেন। মোবাসা দলের থাকিনরাও তাঁকে সমর্থন করতে লাগলেন এবং ক্রীড়ক-চক্রের সৃষ্টি হল। বা-সীন, আউঙ্গসান, থাকিনমু প্রভৃতির নেতৃত্বে মোবাসা দল ডাঃ বা-মকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। উ-স বড়ই বিপন্ন বোধ করলেন। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করতে চাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি অর্ডিনান্সও জারী করলেন। এদিকে বা-ম প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন দেখে নানা অর্ডিনান্স জারী করা হতে লাগল এবং ১৯৪০ সালে বা-মকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হল। মোবাসা দলের অন্যান্য বহু নেতাও ধৃত হলেন। আউঙ্গসান, বা-সীন প্রভৃতি অনেকে বর্ম্মা থেকে সরে পড়লেন, আবার কোন কোন নেতা আত্মগোপন করে কাল কাটাতে লাগলেন। ১৯৪২ সালে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপ অভিযান সুরু হবার পূর্ব্বাহ্নে উ-স ইংলণ্ডে বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং ফেরবার পথে ইংরাজদের হাতে বন্দী হন।

জাপ আমলে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি বর্ম্মার শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য জাপানীরা ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বে এক শাসন পরিষদ গঠন করেন। আউঙ্গসান, থাকিনমিয়া, থাকিন-নু প্রভৃতি জনসাধারণ এই পরিষদে যোগ দেন। এক বৎসর পর ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে জাপানীরা ব্রহ্মকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। ডাঃ বা-ম এই স্বাধীন ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী হন, আউঙ্গসান হলেন দেশরক্ষা সচিব, থাকিনমিয়া হলেন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং থাকিন নু হলেন পররাষ্ট্র সচিব। কম্যুনিষ্ট রেডপার্ট দলের নেতা থান-টুন কৃষিমন্ত্রীর এবং থাকিনমুন-বা সরবরাহ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন।

এমনিভাবে আপাতঃ দৃষ্টিতে অবস্থা ভাল মনে হলেও বর্ম্মার রাজনীতি-ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে থাকে। উ-বা-সীন নিজের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টায় ডাঃ বা-মর বিরোধিতা করতে লাগলেন। বীর মন্ত্রিসভার শ্রম ও যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করে ডাঃ বা-ম তাঁকে শান্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। বা-ম'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে জাপানীরা তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলেন। এদিকে মিত্রশক্তির দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে অবস্থা তাদের অনুকূলে আসতে লাগল। আউঙ্গ-সান এই পরিবর্ত্তনের সুযোগ নিয়ে দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটাতে চাইলেন। ডাঃ বা-ম তাতে রাজী হলেন না, তিনি ধীরে সুস্থে অগ্রসর হতে চাইলেন। কিন্তু রণ-বিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে চরমপন্থীরা তাঁর কথা শুনতে চাইলেন না। জনসাধারণ আউঙ্গসানের নেতৃত্ব কামনা করতে লাগল। এই নেতৃত্ব নিয়ে আবার আউঙ্গসান ও মোবাসা দলের নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। শ্রমিক মজুরদের নেতৃত্ব নিয়ে ওদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই দলের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা সুরু হয়—রেড ফ্লাগ ও রেড ফ্লাগ দলের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে যায়। এদের মধ্যে রেড ফ্লাগ দল আউঙ্গসানের সঙ্গে যোগ দেয়। দেখতে দেখতে মিত্রশক্তির জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠে। ডাঃ বা-ম প্রকৃতপক্ষে জাপানীদের বন্দী হন। এইভাবে উ-স, বা-ম ও বা-সীন বর্জ্জিত বর্ম্মায় আউঙ্গসানের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে ডাঃ বা-ম, উ-স ও বা-সীন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং বর্ম্মার রাজনীতিতে আবার সুরু হয় নানা জটিলতা। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ম্মার রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান জানান হয় একটী অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করে' শাসন কাজ চালানোর জন্য। আউঙ্গসান, বা-সীন ও উ-স এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু ডাঃ বা-ম এতে সাড়া দিলেন না, তিনি দেশে বিপ্লবের লক্ষণ দেখতে পেলেন। রেডপার্ট কম্যুনিষ্ট দলের নেতা থাকিন থান-টুন ও এই গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন জানালেন। থাকিন-সো'র নেতৃত্বাধীন রেডফ্লাগ দলও গভর্ণমেণ্টে যোগ দিলেন না। এইভাবে ফ্যাসীবিরোধী লীগ (নেতা আউঙ্গসান), সোস্যালিষ্ট (নেতা থাকিননিয়া), রেডপার্ট (নেতা থানটুন), মোবাসা (নেতা বা-সীন), ও মায়োচিত পার্টির (নেতা উ-স) এক কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল। কেবলমাত্র ডাঃ বা-ম'র সিনেথা পার্টি এবং থাকিন সো'র রেডফ্লাগ কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কোয়ালিশানে যোগদানে বিরত থাকে। কিছুদিন যেতে না যেতে ফ্যাসিবিরোধী লীগের সঙ্গে রেডপার্ট কম্যুনিষ্ট দলেরও মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসে। রেডপার্ট ও রেডফ্লাগ এই উভয় কম্যুনিষ্টদল একযোগে সারা বর্ম্মায় ধর্ম্মঘটের ধুম লাগিয়ে দেয়। রেডফ্লাগ দল বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং দলের নেতা থাকিন সো কিছুকালের জন্য বন্দী হন।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বর্ম্মার রাজনীতিকদের লণ্ডনে এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বাধীন সিনেথা দল এই সময় মহাবামা নাম নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যের আন্দোলন সুরু করেছেন। এই দলটি ছাড়া আর সকল দলই কুটনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। লণ্ডনে আলোচনার ফেরের দিকে কি ভাবে উ-স ও থাকিন বা-সীন আউঙ্গসানের সঙ্গে একমত না হয়ে কুটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তা পূর্ব্বের প্রবন্ধেই বলা হয়েছে।

দেশে ফিরে এসে উ-স ও বা-সীন হাত মিলিয়ে ডাঃ বা-ম'র সাহায্যপ্রার্থী হলেন। ডাঃ বা-মও তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং মোবাসা, মহাবামা ও মায়োচিৎ পার্টি একত্র হয়ে 'সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতা'

(ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি) নাম দিয়ে এক সম্মিলিত দল গঠন করলেন। এতে হতোদ্যম না হয়ে আউঙ্গসান মন্ত্রিসভা গঠন করে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হলেন। রেডস্টার কম্যুনিষ্ট দল তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হল।

আউঙ্গসানের বিরোধী দলগুলি তখন দেশের শাসনকার্য্যে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। রেডফ্ল্যাগ কম্যুনিষ্টরা পল্লী-অঞ্চলে বাসকর্ত্তা-মূলক কাজে লেগে গেলেন। তাঁরা চারিদিকে ধর্ম্মঘট করাতে লাগলেন. তন্মধ্যে রেঙ্গুনের পুলিশ ধর্ম্মঘটই খুব মোয়ালো হয়। আরাকানে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। সুযোগ বুঝে কারেন সম্প্রদায় সরকারের বিরোধিতা সুরু করলে। আরাকানের বিদ্রোহী ও কারেনদের দাবী ছিল তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রশাসিত অঞ্চলের ব্যবস্থা করতে হবে। পার্ব্বত্য উপজাতি কাচিনরাও অনুরূপ আন্দোলন করতে আরম্ভ করলে।

এইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই গণ-পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফ্যাসীবিরোধী লীগই পরিষদের প্রায় সমস্ত আসন অধিকার করে। বৃটেন্ও আউঙ্গসান বিমুখ না হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে দেশের শাসন কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তলে তলে যে রাজনৈতিক বিষের এতখানি সঞ্চয় ঘড়যন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে আউঙ্গসানের মত দেশ-প্রেমিককে হত্যা করবে তা কেউ ভাবতেও পারে নি। এর পরিণতিই বা কোথায় তাও কেউ বলতে পারে না।

কথা যারে বলিবার ছিল আয়োজন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কথা যারে বলিবার ছিল আয়োজন
সময় পাই নি তারে কাছে ডাকিবার.
যৌবন চলিয়া যায়, আঁখি উন্মন
রচি নাহি প্রণয়ের ছবি আঁকিবার।

কি জানি কি বাধা ছিল তার কালো চোখে
অভিমান করে গেছে মোর দ্বারে এসে,
শরতের ফুলবনে প্রভাতী আলোকে
মন তার হারাইছে অজানা আবেশে।

চপল চেতনা সম তারে ধরবার
বেদনা আকাশে যেন রেখেছি চপলা !
যাচাইনে কাছেছিনু তারি ভরসায়
অবলা হোলেও তারে ভেবেছি সবলা।

কুসুম-ফোটানো গানে ছিল হালিবাগ
ফাগুনের রঙে রঙে সেই মুখখানি.
চৈত্র দিনের শেষে পাইব পাখা
তারে হেরি করিত যে কত কানাকানি।

প্রথম প্রেমের মত মধুময় দিন
পেয়েছিনু ক্ষণতরে বকুল তলায়.
তার পদচারণার চিহ্ন বিহীন
ধূলি 'পরে ঝরা ফুল কাঁদে নিরালায়।

ভাবনা মেঘের মত বেদনার সুরে
নয়নে বাদল এনে দিয়ে গেল সাড়া.
মানস-বলাকা উড়ে গেছে বহুদূরে
সন্ধ্যা-ধূসর পথে পরিচয় হারা।

জীবনের ছায়াতলে গীতি গুঞ্জরি
জনতার পারে একা রহি নিয়তনে.
চলে-যাওয়া দিবসের স্মৃতি-মঞ্জরী
দিয়েলি ছাওয়ায় ধরে মোর মনো বনে।

এই চেনা ধরণীরে করিয়া অচেনা
যে জন চলিয়া যায়—আলোকে ফিরে.
তার লাগি কিছে কোটে বেলা যুঁথি চেনা,
কিছে ঢেউ ছুটে আসে হৃদয়ের তীরে।

তবুও অযুত প্রাণ গোপনে কি সে কথা ?
স্মরণের জোছনায় খোঁজে অনুরাগে,
পৃথিবীর সব পথে যার নীরবতা
বিদায়ের সভায় বাণী তার কিগো জাগে ?

সংসার অবাধাসে যে পথিক ভুলে
উষর তীর্থ পানে গেল অগোচরে
বিরহের নীল যবনিকা দুলে
যাত্রা শেষের সিঁড়ে আলো কণা ঝরে।

লিলি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মনের অলিগলি হইতে সদর রাস্তা পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরিতে ঘুরিতে মনঃসমীক্ষক ডাক্তার থমেস মল্লিক আজ বার্ধক্যের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ; পাশের মিলিয়াছে বেশ-জোড়া খ্যাতি ও বিপুল অর্থ। সম্প্রতি তিনি রোগী মহলে ঘোরা ফেরার মাত্রা কমাইয়া নূতন উদ্যমে প্রচুর গবেষণামূলক মনোবিজ্ঞানের আর একখানি বই লেখা সুরু করিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁহার খাস কামরায় বসিয়া সকালের লেখা অধ্যায়টি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন এমন সময় কোন খবর না দিয়াই একজন অপরিচিত যুবক সরাসরি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল।

হাতের কাগজগুলি ড্রয়ারের মধ্যে পুরিয়া ডাঃ মল্লিক যুবকের মুখের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন : "আপনার উদ্দেশ্য ?"

নির্বিকার চিত্তে যুবকটি জবাব দিল : "ঐ একই—মানে, আপনার মনের খবর—"

ডাঃ মল্লিক একটা চুরুট ধরাইয়া দীর্ঘ একটা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "কতদিন হলো বিয়ে করেছেন ?"

—"বিয়ে !"

—"হ্যাঁ, আকাশ থেকে পড়লেন না কি ?"

—"না স্যার, বিয়ে টিয়ের মত ব্যাপার কিছু গড়াবে না—"

ঈষৎ হাসিয়া ডাঃ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন : "কেন, সামাজিক বাধা আছে না কি ?"

—"কি আশ্চর্য !"

—"আপনি আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে খোলাখুলি সব না বললে—"

—"আহা, খোলা খুলিই তো সব বলতে চাই—"

—"বেশ, তা হলে বলুন—আপনার নাম ?"

কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিয়া যুবক উত্তর দিল : "নাম—সুবিমল দত্ত।" পেন্সিল দিয়া নামটি লিখিতে লিখিতে ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন : "পেশা ?" যুবকটি ঘরের পূর্বদিকের দেওয়ালে একটা ফটোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া বলিল : "জনগণকে প্রবুদ্ধ করা—"

পেশাটি মৌলিক বলিয়া মনে হইল। ডাঃ মল্লিক কৌতুক বোধ করিয়া বলিলেন : "বর্তমান যুগে তাদের Pro-গান্ধী না করে, Pro-বুদ্ধ করে আড়াই হাজার বছর পেছিয়ে যেতে বলেন ?"

সুবিমল ডাঃ মল্লিকের দিকে চোখ ফিরাইয়া—বলিল : "কি মুস্কিল ! Pro-বুদ্ধ নয়, প্রবুদ্ধ ; অর্থাৎ সচেতন করা ; মানে, যারা জানে না কিসে তাদের ভালো, আর কিসে মন্দ, তাদের সেটা বুঝিয়ে দেওয়া।"

একটু চিন্তা করিয়া ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন : "উত্তরাধিকারী-সূত্রে ব্যাঙ্কের খাতায় একটা মোটা অঙ্ক নিশ্চয় পেয়েছেন ?"

—"আমি বড় লোকের ছেলে কি না, জিজ্ঞাসা করছেন ?"

—"হ্যাঁ। ঘরে টাকা না থাকলে নিশ্চিন্ত মনে পরের ভালো করার জন্যে দৌড় ঝাঁপ করাটা যার তার পোষায় না কি না—"

—"আমি বড়লোক নই, ডাঃ মল্লিক ; আর খালি পেটে দৌড়-ঝাঁপ করাটা আমারও পোষায় না বলে সামান্য কলেজে মাষ্টারিও করি—"

—"কলেজে মাষ্টারি ?"

—"ঐ যা বলেন—" বলিয়া সুবিমল সোজা হইয়া বসিল।

—"কটে ! তা আমার কাছে আসবার হেতুটা কি ?" হেতুটি জানিবার জন্য ডাঃ মল্লিকের আগ্রহ কম নয়, বিশেষতঃ সামান্য কলেজের প্রফেসার সুবিমল দত্তের মুখ থেকে।

সুবিমল আর একটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়া বলিল "সে তো গোড়াতেই বলেছি—লোকের মনের খবর জানবার জন্যে—"

ভ্রূ দুটা কুঁচকাইয়া ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন : "কাদের মনের ? যাদের আপনি প্রবুদ্ধ করতে চান, তাদের ?"

—"আজ্ঞে না স্যার ; ওদের প্রবুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যাদের বিশেষ সাহায্যের দরকার তাদের—"

ডাঃ মল্লিক হঠাৎ ধৈর্য হারাইয়া বলিলেন : "মেপুন প্রফেসর দত্ত, সময় আমার হাতে বেশী নেই ; হেঁয়ালি ছেড়ে সোজাসুজি আপনার—উদ্দেশ্যটা কি, তা জানালে ভালো হয় না কি ?"

সুবিমল সন্ত্রস্তিত হইয়া বলিল : "হেঁয়ালির দিক দিয়েই আমি যেতে চাইনে। আপনি জানেন যে পাবলিক কাজে দরকার টাকা, তবে টাকাগুলো যাদের ঘরে আটকে আছে সেই টাকা-মালিকদের মনে যতগুলো দরজা আছে তার কোনটাতে ঘা দিলে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া সহজ হবে, সেই কথাটা মনঃসমীক্ষক ডাঃ মল্লিকের কাছে জানতে এসেছি।"

ডাঃ মল্লিক সম্মুখে চেয়ারটা ঘুরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"অসম্ভব ! আপনি নিজেকে প্রফেসার বলে পরিচয় দিয়েছেন ; আশা করি, এটুকু বোঝেন যে আপনার ওসব বাজে ব্যঙ্গ রহস্য শোনবার মত সময় বা ধৈর্য আমার নেই।"

সুবিমল একটুও না টলিয়া উত্তর দিল : "আপনি ভুল বুঝছেন, ডাঃ মল্লিক ; ব্যঙ্গ রহস্য করবার জন্যে আপনার কাছে আসি নি। একটা নাইট স্কুল খোলবার জন্যে মোটা কিছু টাকা চাই। ধনকুবেরদের দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষাপাত্রে যা পড়েছে—"

দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া ডাঃ মল্লিক বলিলেন : "থাক্ সুবিমল-

বাবু, আমার কাছে নিছক কিছু টাকার জন্যেই এসেছেন, এই কথাটা সংক্ষেপে বললেই পারতেন—"

সুবিমল হাসিয়া বলিল : "না সার, আপনার কাছ থেকে টাকা চাওয়াটাই আমার আসল উদ্দেশ্য নয়—"

ডাঃ মল্লিক চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন : "তবে ?"

সুবিমল এতক্ষণে আসল কথাটা পাড়িল : "আপনার বিশেষ সাহায্য চাই অন্য দিক দিয়ে ; আপনার একটা প্রবন্ধ কাজে লাগাতে চাই।"

—"প্রবন্ধ ?"

—"আপনার 'সুখী অসুখীর মনঃ সম্প্রসারণের তারতম্য' প্রবন্ধটা আমার কাগজে হুবহু পুনর্মুদ্রিত করতে চাই—"

—"আপনার কাগজে ?"

—"গণবাণী' কাগজের নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

সাপ দেখিলে মানুষ যেমন হঠাৎ চমকাইয়া ওঠে, কাগজের নাম শুনিয়া ডাঃ মল্লিক তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন। পরে কতকটা আহত হইয়া ছোট করিয়া বলিলেন : "Obnoxious !"

'গণবাণী' সম্পাদক অধ্যাপক সুবিমল দত্ত মাঝে মাঝে এরূপ মন্তব্য শুনিতে অভ্যস্ত ; তবু ইচ্ছা করিয়াই যেন ডাঃ মল্লিককে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল : "obnoxious ? বলেন কি ডাঃ মল্লিক ? সারা দেশ খুঁজলে এমন একখানা কূটনীতিবর্জিত—কাগজ আর পাবেন না।"

ডাঃ মল্লিক ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন : "লজ্জা করে না আপনার ? বাজে তলিতা না করে গেরোতেই কেন যান না যে আপনি সেই সুবিমল দত্ত, গণতন্ত্রী নাম দিয়ে একটা বর্বরদেশে দল পড়ে নিরীহ কতকগুলো লোকের মাথা খাওয়া, আর একটা বোগাস কাগজের মারফৎ দেশের প্রাতঃস্মরণীয় বেতাদের সম্বন্ধে কুৎসিত সমালোচনা করা যার পেশা ?"

—"কুৎসিত সমালোচনা করা ?"

—"মা মা, আপনার কোন কথাই শুনবো না। আপনি এখুনি—এখুনি চলে যান, নইলে—" ডাঃ মল্লিক উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিলেন।

সুবিমল একটা আশা করে নাই। অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল ; কয়েক পা পিছাইয়া একটা তির্যক ভঙ্গী করিয়া বলিল : "বেশ নমস্কার। ভালো কথা—আপনার সম্বন্ধে আজকের এই ইন্টারভিউটার একটা নরম বর্ণনা যদি কালকের কাগজে বার করি, বিশেষ আপত্তি করবেন না, আশা করি।"

—"তার মানে ?"

—"মানে, সুখী অসুখীর মনঃ সম্প্রসারণের তারতম্যের ফেলুর একটা বিশদ ব্যাখ্যা, শুধু আমার ইকনমিক্সের ছাত্রদের জন্যে, আর কিছু নয়ে করে দেয়।"

ডাঃ মল্লিক লক্ষ্য অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বলিলেন : "মানহানির মামলাকে ভয় করেন না বুঝি ?"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সুবিমল বলিল : "মামলার আনুষঙ্গিক হাঙ্গামাটাই ভয় করি, ফলটা ভয় করিনে। আমি ফেলে গেলে আমার কাজ ও কাগজ চালাবার জন্যে চেলাচামুণ্ডার অভাব হবে বলে মনে করি না। আচ্ছা, নমস্কার।"

সুবিমল দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিলে ডাঃ মল্লিক ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন : "একটু দাঁড়ান, প্রফেসার দত্ত ; আপনার মাইট স্কুলের চাঁদাটা নিয়ে যান।" বাবু এতক্ষণে সুবিমলকে আয়ত্তে রাখিবার উপায়টি ডাঃ মল্লিক আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

এতগুলি শিষ্ট সম্ভাষণের পর বাবের উপর দক্ষিণাস্বরূপ দুইশত টাকার চেকখানি হাতে লইয়া সুবিমল ডাঃ মল্লিককে বহুবার আনাইয়া বিদায় লইল।

ডাঃ মল্লিক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রেণ্ডলেটারের কাঁটা ঘুরাইয়া পাখার গতি বাড়াইয়া দিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। বিবাহ যাওয়ার আর কিছুক্ষণ থাকিলে তাঁহার মন বন্ধ হইয়া যাইত।

কী আপদ ! সুবিমল নামধারী এই লোকটা হঠাৎ জুটিল কোথা হইতে ? তাহার এতখানি বুঝিয়া ডাঃ মল্লিক দঙ্গ করিলেন কি করিয়া তাহা ভাবিলেই অবাক হইতে হয়। ঐ তথাকথিত গণতন্ত্রীদলের কীর্তি-কলাপ কাহারও অবিদিত নাই। যাহাদের নাম শুনিলে আপামর সাধারণে নাক সিঁটকায় সেই দলেরই একটা দুষ্ট চাই ডাঃ মল্লিকের খাস-কামরায় তাঁহার সহিত মুখোমুখি বসিয়া জরুরী কাজে বিল খটাইয়া গেল, কিছু টাকাও হস্তগত করিল ; কিন্তু কি আশ্চর্য ! এককালে ইউনিভার্সিটির রত্ন বলিয়া যাহার খ্যাতি ছিল, সেই সুবিমল দত্ত আজ এমন করিয়া উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে !

—"একি বাবু, এখনো বেড়াতে যাওনি যে—"বলিতে বলিতে একমাত্র পৌত্রী লিলি আসিয়া ডাঃ মল্লিকের চিন্তা সূত্রটা ছিঁড়িয়া দিল।

পিতৃমাতৃহীনা লিলিই আজকাল পারিবারিক ব্যাপারে ডাঃ মল্লিকের অভিভাবকত্ব করিতেছে, একথা ডাঃ মল্লিক স্বীকার না করিলেও বাড়ির বেয়ারা বারোবার সকলেই জানে। তাই লিলির তত্ত্বাবধানের নিয়ম-কানুনগুলা মানিয়া না চলিলে অবশ্য ডাঃ বুড়ো বয়সে মল্লিকের শারীরিক উপসর্গগুলি দূর করিতে মেয়ের ডাক্তারদের কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হয়।

লিলি আসিয়াই প্রথমে ডাঃ মল্লিকের হাত হইতে মোটা নীল পেন্সিলটা কাড়িয়া লইয়া ড্রয়ারে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল : "শিগ্‌গির ওঠো, গাড়ি তৈরী ; বেড় ঘণ্টার আগে ফিরতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।"

যে অত্যন্তিকর চিন্তাটা ডাঃ মল্লিকের মনে চাপিয়া বসিয়াছিল, লিলিকে দেখিয়া তাহা যেন কাটিয়া গেল। বলিলেন : "কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে ?"

—"অলকাদের বাড়ি—"

ডাঃ মল্লিক একটা চুরুট ধরাইয়া বলিলেন : "বোস লিলি, কথা আছে।" লিলি ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল : "কথা ? বেশ, তাড়াতাড়ি শেষ করে বেড়াতে যেতে হবে কিন্তু—"

বেড়াইতে যাইবার বাসনায় কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন : "তোদের কলেজের ইকনমিক্সের প্রফেসার সুবিমল দত্ত কেমন পড়ায় রে ?"

লিলি চেয়ারের উপরকার কুশনটা হাতে লইয়া কোমলগুলি নরম করিতে লাগিল ; দাদুর কথা বোধ হয় শুনিতে পায় নাই।

—"কি দিদি, জবাব দিচ্ছিস না যে ?"

লিলিকে উত্তর দিতে হইল : "সুবিমল বক্সর কথা বলছো ? কেমন আবার পড়ায় ! এই একেবারে যা তা—"

ডাঃ মল্লিক এতক্ষণে একটা উপায় খুঁজিয়া পাইতে চেষ্টা করিলেন ; বলিলেন : "একে বারে যা তা ? তবে তো তোকে ও কলেজে রেখে ভুল করেছি।"

লিলি আসল ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল : "কেন ?"

ডাঃ মল্লিক লিলির প্রশ্নে কান না দিয়া বলিলেন : "আচ্ছা বলতে পারিস লিলি—সুবিমল বক্সকে কলেজের আর সব ছেলে মেয়ে কি রকম চোখে দেখে ?"

লিলি ঠোঁট উল্টাইয়া উত্তর দিল : "তা বাপু আমি জানবো কি করে ? সে দাদু—তুমি বেশ লোক দাদু, যত সব বাজে কথা বলে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিয়ে শেষে বলবে—'তাইতো দিদি, দেরী হয়ে গেল, আজ আর বেরুবো না'—তখন কিন্তু শুনবো না, তা তোমায় আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।"

অন্য সময় হইলে কারণে অকারণে লিলির উল্টানো ঠোঁট দেখিলে ডাঃ মল্লিক ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু বর্তমানে ব্যস্ততার কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যে বি-এ পরীক্ষা দিলে সাধারণ কলেজের সহিত লিলির সম্পর্ক চুকিয়া যাইবে ; তবু কয়েক বছরে যদি কিছু না ঘটিয়া থাকে, সুবিমল-সম্বন্ধে সাবধান করিয়া না দিলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কিছু যে একটা ঘটিবে না, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি আছে ? তাই মনে মনে সুসাবিধা করিয়া শেষে বলিতে সুরু করিলেন : "তোদের ঐ সুবিমল একটা বাজে ছেলে বিশে এতটা উত্তেজিত হবে, ধারণা করি নি। তাই তোকে বলে দিচ্ছি, লিলি—"

ডাঃ মল্লিকের মুখে হাত চাপা দিয়া লিলি বলিল : "তোমার আজ হয়েছে কি তা বলবে দাদু ? সেই থেকে কোন্ এক সুবিমল বক্স ছাড়া মুখে আর কারুর কথা নেই ! বলেছি তো, লোকটা ভারী বিশ্রী ; সেই জন্যে আমাদের ক্লাসে নতুন একজন প্রফেসার দিয়েছে। ব্যস্—ওর কথা আর শুনবো না।"

ডাঃ মল্লিক এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন : "আর একটু শুনতে হবে দিদি। লোকটা আজ আমার কাছে এসেছিল—"

লিলির মুখটা হঠাৎ কালো হইয়া গেল ; বলিল : "তোমার কাছে এসেছিল ? কখন ? কেন ?"

—"একটু আগেই—আমার সেই সুখী অসুখীর মনঃ সম্প্রদায়ের তারতম্য' প্রবন্ধটা ওদের বলের কাগজে ছাপাবার জন্যে ; আর—"

লিলি ভ্রূ জোড়া কপালে তুলিয়া বলিল : "আশ্চর্য মজা নয় ! তা ভালোমানুষী করে প্রবন্ধটা দিয়ে ফেলেছো তো ? টাকা ? কিছু দাও নি নিশ্চয় ?"

—"দুশো টাকা দিতে হলো।"

—"দু-শো-টা-কা !" লিলি মস্ত বড় হাঁ করিল।

—"লোকটা চলে যেতেই ভাবতে সুরু করেছি—টাকাটা জলে ফেলাম কি না—"

—"যাক আর ভেবে কাজ নেই। আমার দরকারে চাইলে একটা পয়সা পাইবে, আর কত সব বাজে লোক এসে হাত পাতলেই দুশো চারশো দিয়ে যাও। বেশ লোক তুমি দাদু !"

লিলির কথাগুলি হাঁ করিয়া ডাঃ মল্লিকের বুকে গিয়া বিঁধিল। বলিলেন : "টাকা পয়সা তোর পাগনি কবে, শুনি ?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লিলি বলিল : "যারে ! চাইলেই যাও না কি ? 'কি হবে', 'কেন দরকার', 'যা চাইছিস তাতে কুলোবে না কি'—এই সব কত রকমের জেরা করে, কত ভুগিয়ে, শেষে যখন আমার দেবার ইচ্ছেতে দেরা ধরে যায় তখন—'নে লিলি, লক্ষ্মী দিদি' আরও কত কি বলে, তার পর চেকখানা রেখে যাও আমার মুঠো-করা হাতের ওপর।"

লিলির মুখ ফিরাইয়া ডাঃ মল্লিক হাসিয়া ফেলিলেন। লিলি কিন্তু সে হাসিতে তুলিবার পাত্রী নয়। বলিল : "বেশ তো, তোমার কাছে টাকা পয়সা আর চাইবো না। এই তো সেদিন বেলার বিয়েতে গিয়েছিলাম ; মেয়েরা সবাই বলে—'ইস্ লিলি, একটা ভালো শাড়িও কি তোর জোটে না ? আমি চুপ করে রইলাম।"

—"তাই না কি ? কিন্তু—" ডাঃ মল্লিক কি যেন স্মরণ করিয়া বলিলেন—"সেবার সাতশো টাকা দিয়ে যেগুলো কিনে আনলি—"

কথাটা লুফিয়া লইয়া লিলি বলিল : "তারপর পনেরো বার—ক্যালেন বলে গেছে।"

—"পনেরো বার !" ডাঃ মল্লিক আবার হাসিয়া বলিলেন : "তাই ভাবি—আমার যে প্রজাপতিটির রূপে রূপে সারা বাড়িতে এত ঝৌলুস ছিল, আর চারদিকে বন্ধুর হাওয়া বইতো, সেই প্রজাপতিটির আজকাল হলো কি ! কেন !"

—"আঃ দাদু—"

—"কোন কথা নয় লিলি। কাল তোর পাশ বইটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিস ; একটা চেক দেবো, জমা দিয়ে দিবি। আজকাল আমার কাছে চাইতে দেরা করে বলে—আগের মত যখন ইচ্ছে টাকা তুলিস—কেমন ?"

—"চাইতে দেরা করে তা বলাম কখন ? তোমার জেরাগুলো শুনতে ভালো লাগে না, তাইতো বলাম।"

—"বেশ আর জেরা শুনতে হবে না। চল এখন বেড়িয়ে আসি।"

—"ক'টা বেজেছে, সে খেয়াল আছে ? চট্ করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে। রাত জেগে আবার যদি শিগতে বসো তা হলে কিন্তু—"

—"ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস, দিদি। সকালের লেখাটায় একটু রদবদল না করে রাখলে ঘুম আসবে না যে !"

—"ঘুম কেমন না আসে তা আমি দেখবো ; খাবে চলো তো এখন।"

অগত্যা ডাঃ মল্লিককে উঠিতে হইল। লিলিও উহাদের আহারের জন্য পাচকের উদ্দেশে হাঁক ডাক সুরু করিল।

দুই দিন পরের ঘটনা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বেণপ্রিয় পার্কের খুব দক্ষিণ কোনের একটা বেঞ্চে বসিয়া গভীর উৎকণ্ঠার সহিত সুবিমল লিলির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দুই দিন ধরিয়া তাহার নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। কলেজে এক ফাঁকে আজ সে জানাইয়াছিল, বিকালে হাত ঘড়িটার উপর চোখ বুলাইয়া মুখ তুলিতেই সুবিমল দেখিল, লিলি আসিতেছে।

অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল বলিয়া লিলিকে খুব ক্লান্ত দেখাইতেছে। কপালের উপর কয়েক গুচ্ছ চুল ঘামে আঁটিয়া গিয়াছে। শাড়ির আঁচল দিয়া মুখটা মুছিয়া লিলি সুবিমলের পাশে বসিল। ঘৃণা ও ঘামের স্পষ্ট একটা ঝাপ আঁচলের প্রান্তে লাগিয়া গেল।

ডাঃ মল্লিকের ঘরে কয়েক বছর আগের তোলা ফটোতে লিলির প্রথম যৌবনের যে কমনীয় মুখ সুবিমল সেদিন দেখিয়াছিল তাহার সহিত লিলির অদ্যকের প্রবৃদ্ধিষ্ণু রেখাঙ্কিত মুখের তুলনা করিয়া সে যেন বোধ না করিয়া পারিল না।

সুবিমলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া লিলিই প্রথমে কথা কহিল: "কি গো, ভাবনা চিন্তা গুলো যে একেবারে করে ফেললে দেখ ছাড়ে।"

সুবিমল অন্যমনস্ক হইয়া বলিল: "এত দেরী করলে যে?"

—"দেরী?—কত দিক আমাকে সামলাতে হয় তাতো জানো। সে যাক—কেমন রয়েছে তো! ফলেছিলাম ঠাকুরঝির কাছে যেও না—কথাটা যেমন শুনলে না, ফলটা তেমনি হলো তো! পেয়েছ প্রবন্ধটা?"

—"খারাপ এমন কি হয়েছে? দুশো টাকা এক সঙ্গে ক'জনই বা দিয়েছে? ভালো কথা—সুলতার কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিয়েছো?"

লিলি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল: "চার্জ তো নিলাম, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারবো বলে ভরসা হয় না।"

—"কেন?"

—"সুলতাদির কাছে শুনলাম, বোট একাশি টাকা সাত আনা চাঁদা পেয়েছেন মনীরাদের কাছ থেকে।"

—"তাতে হতাশ হবার কি আছে, লিলি?"

—"যাদের ঘরে এক বেলারও খাবার উদ্বৃত্ত থাকে না তাদের কাছ থেকে এমনি করে চাঁদা আদায় করতে তোমাদের মায়া হয় না?"

—"ভুল করছো লিলি। যারা দিতে পারে, অনুনয় বিনয় করে একমাত্র তাদেরই কাছ থেকে আমরা করে এই সব নিঃস্বদের জন্যে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তাতে এদের প্রাণের যোগাযোগ বেশী হয়, না এদের স্বচ্ছলদের কঠোর প্রচলন অর্থ থেকে প্রত্যেকের যৎসামান্য চাঁদা দিয়ে গড়া প্রতিষ্ঠানে এদের অন্তরের টান বেশী হবে, সে কথা আমায় বুঝিয়ে দেবে, লিলি?"

লিলি চুপ করিয়া রহিল; পরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল: "এক হাজার টাকা আমি জোগাড় করেছি, সুবিমল—"

—"এক হাজার টাকা? কোত্থেকে?"

লিলি সংক্ষেপে বলিল: "আমিই দিচ্ছি।"

—"তুমি দিচ্ছ?"

—"দোষ কি তাতে?"

—"দোষের তা বলছিনে; তবে বারে বারে তোমার কাছ থেকে আর কত নেব?"

—"ইস্ ভারী নিয়েছো আমার কাছ থেকে!"

—"এই তো সেদিন 'গণবাণীর' ওপর দিয়ে যে ঝড়টা বয়ে গেল, তুমি না থাকলে কাগজটা উঠেই যেতো। আমি তো কারেন্সীতাবে যেতাম, তাতো জানো; তুমিও যদি হাতখালি করে বসে থাকো, তা হলে ভবিষ্যতের গড়গুলো সামলাবে কে লিলি?"

লিলি হাসিয়া বলিল: "কেন, তোমাদের বহুজনের বৎসামান্যগুলো কি করতে থাকবে?"

—"আহা, সে তো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। তার আগে—বৎসামান্যগুলো কত হকম কায়ে লাগানো যায়ে সেটা শিখতেই তো ওদের লাইফ স্কুলে অনেকদিন কাটাতে হবে।"

লিলি একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "তোমার আসল মনের কথাটা কি, বলবে?"

সুবিমল বলিল: "তাতো আগেই বলেছি—দুর্গতির কাণ্ডারী যারা তাদের ভাণ্ডারের পুঁজি আগে থেকেই যদি উজাড় হয়ে যায়, তা হলে দুর্দিনে দুর্গতের গতি হবে কোথা দিয়ে?"

মুখে আর এক ঝলক হাসি আনিয়া লিলি বলিল: "কিন্তু আজকের কাণ্ডারীরা যদি পুঁজীগুলো উজাড় করে ফেলে মনীরামদের ঘরে এসে হাত না বেড়ায়, তাহলে তোমাদের কল্পলোকের শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে কি করে?"

সুবিমল গম্ভীর হইয়া বলিল: "তুমি জানো লিলি, ধার-করা কথার আমি ধার ধারি না।"

—"তা না হয় জানলুম, কিন্তু আমার টাকা সম্বন্ধে দুঃখাগীটা তুমি যে আজও পার হওনি, তা জানতাম না।"

সুবিমল এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল: "দুঃখাগীটাই যদি থাকবে তা হলে এক ছুটে গিয়ে তোমার ঠাকুরঝির কাছ থেকে দুশো টাকা আনলাম কি করে?"

লিলির মুখে কৌতূহলের ছায়া পড়িল; বলিল: "তবে অতো ভনিতা কিসের?

সুবিমলের মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল: "ওটা হচ্ছে আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপার—"

লিলি ভ্রূকুঞ্চি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "আর কারুর সঙ্গে নয় তো?"

সুবিমল কোন উত্তর দিল না। পার্কের ভিতরের আলোগুলি

ফলিয়া উঠিতেই সান্ধ্যভ্রমণকারীদের ভীড় বাড়িতে লাগিল। তাহার ঘড়ি দেখিয়া ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিল বুঝিয়া লিলি উঠিয়া পড়িল। তবু সুবিমলের মুখ থেকে যোগাপড়ার কথাগুলি না শুনিয়া তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিল না।

লিলির একখানি হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে সুবিমল বলিল: "মুলতার কাছ থেকে যে খাতাগুলো আনিয়েছো, ওসব কাল আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও—"

—"বারে! তা হলে চার্জটা আমায় নেওয়া হলো কি করে?

—"তোমার এই আসন্ন পরীক্ষার মুখে এদিককার কাজ কিছু না হয় আমিই করলে—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না—"

—"কিন্তু যোগাপড়ার কথাটা না বলে মহাভারত রামায়ণ সবই অশুদ্ধ হবে, তা বুঝি জানো না?"

—"তাই না কি? আচ্ছা, কাল বলবো।"

—"কাল? কিন্তু মনে থাকে যেন।"

—"নিশ্চয়" বলিয়া সুবিমল উঠিয়া পড়িল। লিলিও বাড়ির পথে পা বাড়াইল।

কয়েক বছর আগের কথা। সাদার্ণ কলেজে লিলি তখন প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্রী, সুবিমল তৃতীয় বার্ষিকীর। কলেজে তৌখন ছেলে বলিয়া সুবিমলের খ্যাতি যখন কায়েমী হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময় হঠাৎ একদিন কলেজের সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর বিশেষ বিতর্ক সভায় নূতন ছাত্রী সতের বছরের লিলি বাকযুদ্ধে সকলকে অবাক করিয়া দিল। সুবিমল জানিত না যে তাহাকে কাৎ করিয়া আসর মাৎ করিয়াছিল যে লিলি, সেই লিলি সেদিন সকালেই তাহার ঠাকুরমার উপর শুশ্রূষার বিভাটুকু প্রয়োগ করিতে না পারিয়া পাখানো বানগুলি অনুকূল বায়ু বুঝিয়া সুবিমলের উপরেই ছাড়িয়া দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিল। কিন্তু সেইদিনই লিলি ও সুবিমল কলেজের শ্রেণীগত পার্থক্য তুলিয়া পরিচয়ের সূত্র খুঁজিয়া পাইল। সুবিমল দেখিল, মেয়েটি শুধু তার্কিক নয়, কোথা হইতে যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া আসিয়া তাবতজ্ঞী সভ্যযোগে সভার মাঝে অনর্গল বলিবার ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু ধানু তার্কিক সুবিমল আত্মরক্ষার পথগুলি শক্ত করিয়া বাঁধাইল, অতর্কিতে আক্রমণের পথও একটা একটা করিয়া আবিষ্কার করিতে লাগিল। শেষে বাকোর ছুরিতার উপর যোলআনা প্রলেপ লাগাইতে লাগাইতে তাহাদের পরিচয় ঘন হইতে ঘনিষ্ঠ হইল। কিন্তু কলেজের কমনরুম ছাড়াইয়া সুবিধামত কোন না কোন পার্কের মধ্যেই তাহাদের আলাপের স্থান সীমাবদ্ধ ছিল।

কলেজে আসিবার পূর্বে ঘরে বাহিরে একমাত্র ঠাকুরমা ছাড়া লিলির বন্ধু বলিয়া আর কেহ ছিল না; তাই সেই ঠাকুরমার সহিত পরিচয় করাইবার উদ্দেশ্যে সুবিমলকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিবার লোভ যে তাহার কখনও হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সে লোভ সে যখন করিয়াছিল; পরে ক্ষেত্র বিশেষে অপ্রিয়কারী সুবিমলের আবির্ভাবে রক্ষণশীল ঠাকুরমার সহজ জীবনযাত্রার অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার সৃষ্টি হয় সেই আশঙ্কায়। কাজেই লিলিদের কলেজে প্রথম শ্রেণীর ফলারশিপধারী একটি ভালো ছেলে আছে, ইহা ছাড়া সুবিমল সম্বন্ধে তিনি আর কিছুই জানিতে পারেন নাই।

সুবিমলের সহিত লিলির অন্তরঙ্গতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। লিলিও নূতন চোখে পৃথিবীটা দেখিতে শিখিল। পরে লিলি বেদির আবিষ্কার করিল, সুবিমল ও তাহার মতামতের মধ্যে পার্থক্য বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই, সেদিন সে স্বিধাহীন চিত্তে গণতন্ত্রী বলে নাম লিখাইল।

দুই বছর পরে লিলি ও সুবিমল যখন আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রায় প্রস্তুত এমন সময় পৃথিবীর মহত্তম যুদ্ধ পূর্বাচলের দ্বারে আসিয়া হানা দিল। বুড়া ঠাকুরমাকে লইয়া লিলি তাহার পিতার তৎকালীন কর্মস্থল পশ্চিম ভারতের একটা সহরে চলিয়া গেল, পরীক্ষা দেওয়া সে বছরের মত স্থগিত রাখিয়া। দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমের সেই সহরের বহু নাগরিক সেবার মেগে মারা পড়িয়াছিলেন, লিলির পিতা-মাতা ও একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাও রেহাই পাইল না। তারপর শোক-বিহ্বল ঠাকুরমাকে লইয়া দুই বছর ধরিয়া লিলি ভারতের বন্ধুরান ঘুরিয়া শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিল, ঠাকুরমা তাহার মনোবিজ্ঞানের অসমাপ্ত বইখানি লিখিয়া শেষ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন লিলি তখন নিশ্চিন্ত মনে আবার কলেজে ভর্তি হইল এবং কয়েক মাসের মধ্যে ঘরি বাঁটি করিয়া আই-এ পরীক্ষা দিয়া ফেলিল।

সুবিমল কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া এক পাও না নড়িয়া বি-এ ও এম-এ পরীক্ষা দিয়াছে। লিলির সহিত প্রায় আড়াই বছর তাহার দেখা সাক্ষাতের উপায় ছিল না। তবে সরকারি ডাকযোগে যোগা-যোগটা তাহারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

সুবিমল এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—জানিয়া লিলি আনন্দ প্রকাশ করিয়া ও নিজে এখনও যোগাযোগ চালাইয়া যাবে সেজন্য হতাশা জানাইয়া সুবিমলকে ছোট একখানা চিঠি লিখিল। উত্তরে সুবিমল লিখিল: "মা কেতকম্। বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করে ঢিল এক ঘায়ের রওনা না হলেও আওপাছু দু'পাখা এরোপ্লেন আমরা ছেড়ে ছিলাম। যাক পথে তোমার এরোপ্লেনের ইঞ্জিন যদি খারাপ হয়ে থাকে সেজন্যে দায়ী তুমি নও, টিকিটের দামটা তো পুরাই দিয়েছিলে। ভালো কথা—সাদার্ণ কলেজে একটা চাকরি পেয়েছি। বি-এটা যদি ওখানেই পড়ো তা হলে শুধু খুশীই হবো না, তোমার দু'বছরের ক্ষতিটাও সুদে আসলে উশুল করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আর একটা কথা—সাধারণের মতে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আমাকে দিয়েছে একটা মোটা সেজ, তেমনি সাধারণ থেকে সরকার পর্যন্ত সকলের রোষ কুড়িয়েও শৈশবেই বৈকল্য ঘটা ঘোষণা করে দি আমাদের যে পার্টি, সেই পার্টি দিয়েছে বন্ধ দুটো শিঙ। আমার ক্ষেত্র ও শিঙ দেখে থাকড়ে যাবে না, আশা করি।"

সাদার্ণ কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়া লিলি অনেক খবরই পাইল। নূতন পাওয়া শিঙ দুটির জন্য সুবিমলকে মূল্য দিতে হইয়াছে

অনেক খানি। সুবিমলের পৈত্রিক বাড়িটাই আজকাল 'গবর্ণমেণ্ট' অফিস না, 'গবর্ণমেণ্ট'র অফিস বাড়িটাই সুবিমল ও সমাজ যাহাদের জমজমা দান দিয়া সম্মানিত করে তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান তাহা ধারণা করা সহজ হইল না।

কয়েকদিন পরে সকালের দিকে লিলি গবর্ণমেণ্ট তথা পার্টি অফিসে গিয়া দেখিল, দরজার সম্মুখে ঝোলাঝুলি হাতে লইয়া লারিবদ্ধ এক বিরাট জনতা। ভীড় ঠেলিয়া লিলি ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় তাহারই কাছে সুবিমলের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল। হাঁ, তাহাকেই ডাকিতেছে—"সামনে দিয়ে পারবে না লিলি, ওপাশের দরজা দিয়ে এসো।"

লিলি ভিতরে আসিতেই সুবিমল তাহাকে উপরতলার ঘরে লইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে লিলি জিজ্ঞাসা করিল: "বাড়িতে একটা রেস্ট্যুরেণ্টের দোকান খুলে বেচে নাকি?"

সুবিমল হাসিয়া জবাব দিল: "উঁহু, বরং দিনের আলোয় কালো-বাজারের মুরাকা বুদ্ধি বলতে পারো। অর্থাৎ কাটকেই ক্যাশ মেমো দেবো না, বিক্রীর হিসেবও কাউকে দেখাবো না।"

—"সে কি?" লিলির মুখ পাণ্ডা হইয়া গেল।

—"আহা, ভয়ই যদি পেয়ে থাকো তা হলে আর একরকম ব্যাখ্যা শুনবে?"

—"কি?"

সুবিমল বলিল: "এটা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধদেব বিদ্যোরণ—"

—"বুদ্ধদেব বিস্ফোরণ?"

—"হ্যাঁ। তুমি গত বছর এমন দিনে এখানে ছিলে না, কথাটা তুলেই দিয়েছিলাম। শোনো তা হলে—লোকমুখে অবশ্য অন্যরকম শুনে থাকবে। গত বছর এমন দিনে দেখা গেল কতগুলো বিদেশী লোক হঠাৎ সহরে ঢুকে পড়ে—"

—"বিদেশী লোক?" লিলিকে আশ্চর্য হইতে হইল।

সুবিমল বলিয়া চলিল: "পোষাক পরিচ্ছদে আচার ব্যবহারে সহরের কায়দা কানুনগুলো যারা জানে না। তারা বিদেশী ছাড়া আর কি হতে পারে?"

—"তারপর?"

—"তারপর দেখা গেল, সেই বিদেশী লোকগুলো পাড়ায় পাড়ায় এক নূতন ধরণের রসিকতা করে বেড়াতে লাগলো। ভাল্‌গারিটি বর্জিত সহরেরা সে রসিকতা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, একটা কিছু করতে হবে, এই সব যখন ভাবছে, এমন সময় বিদেশী রসিকগুলো—হাতে রুমাল দিয়ে প্যান্টের পতন নিবারণ করতে পারতো এমন অতগুলো লোক—হঠাৎ ফুটপাতে শুয়ে পড়লো—"

অতদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের উপর রুমালটা একবার বুলাইয়া লিলি বলিতে সুরু করিল—"তারপর ওরা সেই যে শুলো আর উঠলো না। তারপর ভাল্‌গারিটি বর্জিত সহরেরা চালে ডালে খিচুড়ি জমজমাবার সমারোহ দেখিয়ে যারা শোবে না বলে পণ করেছিল তাদের তাক লাগিয়ে দিলে। আর বর্তমানে সহরের দক্ষিণের ফটক দিয়ে যে সব সমাগত বিদেশী ভীড় জমাবার চেষ্টা করছে তাদেরই একটা দলের জন্যে এই দুটি ডিনার ব্যবস্থা করেছো—তাইতো বলবে? কিন্তু জোগাড় করলে কি করে?"

—"কতকটা সরকারি, কতকটা বেসরকারি সাহায্যে কিছু চাল জোগাড় করেছি; যতক্ষণ না ফুরিয়ে যায়, দিতে পারবো। তবে সরকারি যোগাড়ে আর জায়গা নেই বলে বিদেশীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গভর্ণমেণ্টের চালের ঘরেই যদি রসিকতা করবার একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে তোমাদের তা হলে বাপুরা, তোমাদের নিজেদের যেন গাঁয়ে ফিরে গিয়ে যা হয় করো গে, এখানে ওসব চলবে না। কাজেই তোমার আমার করবার কিছু থাকবে না।"

—"কেন, আমাদের কো-অপারেটিভ ষ্টোর গুলো কি করতে রয়েছে।"

সুবিমল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল। বলিল: "সহরের গুদামগুলো তো এক রকম চলছে, কিন্তু মফঃস্বলের ষ্টোরগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। গ্রামের নানা রকম লোকের দলাদলির জন্যে কতকগুলো দু'এক মাসের মধ্যে উঠে যেতে পারে। তাই ভাবছি, যেমন করেই হোক সেগুলোকে বাঁচাতে হবে, আর বিশেষ বিশেষ জেলায় বড় রকমের কতকগুলো ষ্টোর নতুন করে খুলতে হবে। কিন্তু ষোলো টাকা মণ উঠলে তো পঁয়ষট্টি মাটি হয়ে যাবে। থাক ও সব আলোচনা আর একদিন করবো। উপস্থিত তোমার পাঠ্যবিষয়ের একটা চার্ট করে রেখেছি, সেটা নিয়ে যেও। ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নম্ হি তপঃ—এই মহাজন বাক্যটা সর্বদা মনে রাখবে। ও কি আমার কথা শুনছো না?"

লিলি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল: "সুবিমল-দা, পার্টির জন্যে কিছু টাকা এনেছি—"

—"টাকা? তুমি এনেছো?"

—"এই যে—" বলিয়া লিলি সুবিমলের হাতে একখানি চেক দিল। চেকে টাকার অঙ্কটা দেখিয়া সুবিমল প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল: I must kiss your feet, my darling। ওঃ এত টাকা পার্টি এক সঙ্গে অনেকদিন পায় নি—"

—"আঃ, কি ছেলেমানুষী করছো সুবিমল-দা!" লিলি জানিত না যে চেক পাইয়া সুবিমল এতটা উদ্বেলিত হইয়া পড়িবে।

উদ্বেলনের বেগ কাটিলে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল: "ডাঃ মল্লিক জামেন নিশ্চয়?"

—"মাতুলদা? জানলে কি আর রক্ষে থাকতো? এটা আমার নিজের টাকা।"

—"তোমার টাকা?"

—"কেন, আমার টাকা থাকতে পারে না, না কি?"

—"থাকতে পারে না, তা বলছি নে, তবে—"

—"তবে নেই, সুবিমল-দা। আমার বাবা যে লাইফ-ইন্সিওর করেছিলেন, সেই টাকা এবার পেয়েছি। আমার টাকা আমি যে ভাবেই

খরচ করি না কেন, ঠাকুরদার কাছে তার কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, তা জেনো।"

লিলির উপরোক্ত আশ্বাসের কথাতেও সুবিমলের মনের খিধা কাটিল না; বলিল: "জানি লিলি, তোমাদের অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমাদের মত ভিখিরীর বন্ধুকে যদি তার সন্ধান যাও তা হলে চারদিকের পাতা জাল-গুলোতে ঢালতে ঢালতে তোমাদের তিন পুরুষের সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ হতে বেশী দিন লাগবে না। তাই বলি, কাগজখানা এখনো আমার হাতেই আছে, ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে নিতে পারো।"

সুবিমলের মুখে একথা শুনিবার জন্ত লিলি সকল আট পাট বাঁধিয়া আজ এখানে আসে নাই। আহত হইয়া বলিল: "পারো তুমি সুবিমল-দা, তোমার বাড়িতে ঘরের আশ্রয় দিয়েছো, তাদের তাড়িয়ে দিতে?"

—"আহা, তারা যে পার্টির লোক, কত আপনার জন তারা—"

—"তারা পার্টির কাজ করে তাই তারা তোমার আপনার, আর আমি দু'বছর এখানে ছিলাম না বলে আমিই বুঝি—" কথাটা লিলি শেষ করিতে পারিল না। যে আত্মাভিমান সে এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছিল, মুখের উপরকার রুমালখানা তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

টেবিলের উপর প্রসারিত লিলির কমনীয় হাতখানি দেখিতে দেখিতে গাঢ়স্বরে সুবিমল বলিল: "মাপ করো লিলি। আমাদের শ্রীই বলটিকে তুমি যে আজও এত খানি ভালোবাসো তা ধারণা করতে পারি নি। আর আড়াই বছর ধরে যতগুলো চিঠি লিখেছিলে তার প্রতি ছত্রে যে কথাটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলে—" কথাটা শেষ না করিয়া সুবিমল চেকটা ড্রয়ারে রাখিয়া দিল।

—"ও কি, চুপ করলে কেন? বলো, কি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম, আর কি তুমি জানতে পেরেছো?"

—"থাক, লিলি, আর একদিন বলবো। একটা কথা বলি আজ—তোমার ঠাকুরদার মনে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন সঙ্কল্প করে বোসো না। তিনিই সংসারে তোমার শ্রেষ্ঠ আপনার জন, যতদিন বেঁচে আছেন তিনি, এই কথাটাই যেন জানতে পারেন।"

লিলি অবাক হইয়া সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল: "তোমার আমার সম্পর্কটা ঠাকুরদার কাছে খোলা মনে আজও ব্যক্ত করতে পারছিনে, এটাই সব চেয়ে পীড়াদায়ক, তা কি বোঝো না, তুমি?"

ঈষৎ হাসিয়া সুবিমল বলিল: "তাই বা ব্যক্ত করলে লিলি। জানি তিনি জ্ঞানী, বিচারবুদ্ধি তাঁর অগাধ; কিন্তু যে আদর্শ তাঁর মনে দৃঢ় ভিত গেড়ে বসে আছে, তোমার আমার সম্পর্কের খাতিরের এক ধাক্কায় সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, এটা আশা করা যেমন বাতুলতা, তেমনি তাঁর এই বয়সে মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দেবার ইচ্ছাটাও পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।"

—"কিন্তু—"

—"জানি লিলি, আপনার জনের কাছেই আর এক আপনার জনের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্তে মন ব্যাকুল হয়—"

লিলি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল: "শুধু ব্যাকুল নয়, এতদিন পরিচয় করিয়ে দিতে পারি নি বলে জীবনটাই ব্যর্থ মনে হয় না কি?"

সুবিমল উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তারপর ফিরিয়া আসিয়া প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিল: "তুমি এখনো খুব ছেলে মানুষ, লিলি—"

লিলি কোঁস করিয়া উত্তর দিল: "আমি ছেলে মানুষ, তাতো বলবেই; নিজে বুঝি একেবারে ঘরেই বুড়োমানুষ হয়ে গেছো?"

লিলির কথায় সুবিমল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল: "নিশ্চয়, আমি এখন মাষ্টার, একথা সদাসর্বদা মনে রাখি।"

—"তাই বুঝি মাষ্টারিটা আমার ওপরেই এখন থেকে সুরু করছো?"

—"পাগল! তোমার ওপর মাষ্টারি! বরং যদি কারেমীভাবে এ-বাড়ি আলোকিত কর, তুমিই করবে আমার ওপর মাষ্টারি; বলবে: "আর যা খুশী করো কিন্তু বলবো না, সময়ে খাওয়া খাওয়াটাও যে একটা দরকারি কাজ সেটা মনে রাখো না কেন?"

লিলিও ছুটামি করিয়া বলিল: "আর তুমি বুঝি বলতে ছাড়বে—'ফিরেছো যাও আর যেখানেই যাও, বর্ষাকালে ছোট ছাতাটা সঙ্গে নিতে ভুলে যাও কেন?"

—"বর্ষাকালে ছোট ছাতা?" সুবিমল আকাশ হইতে পড়িল।

—"ভুলে গেলে না কি এর মধ্যে?"

—"তিন বছর আগেকার সেই কথাটা এখনো মনে রেখে দিয়েছো দেখছি" বলিয়া সুবিমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেওয়ালের ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া সুবিমলের হাসির প্রতিধ্বনি করিল। লিলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল: "তাই তো, এগারোটা বাজলো। ঠাকুরদাকে নিয়ে এক জায়গায় যাবার কথা আছে। আচ্ছা, আসি তা হলে।"

লিলি দরজার দিকে পা বাড়াইতেই সুবিমল বলিল: "এক সেকেণ্ড—"

লিলি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল: "আবার কি?"

সুবিমল তাহার হাতে একখানি কাগজ দিয়া বলিল: "এই চাটটা। যাত্রীনাথ অধ্যয়নম্ হি তপঃ।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল: "বেশী যদি মাষ্টারি করো তা হলে এক কলমে চলে যাবো, তা জেনে রেখো।"

—"পারো তারতে যেমন কয়েক লোকের পার্টি, তেমনি পারো কলকাতায় এই নামার কলেজ, সেটাও জেনে রেখো।"

—"আচ্ছা গো, আচ্ছা" বলিয়া লিলি সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া পৌঁছিল। সুবিমল তাহাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

সুবিমলকে সেদিন কেহ আর বাহির নামিতে দেখে নাই। আড়াই বছর পরে লিলি আজ আসিয়াছিল, অথচ পার্টির নূতন সভ্যদের মধ্যে যাহারা সকালে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত লিলির পরিচয় করাইয়া দিবার কথাটা সুবিমল ভুলিয়া গিয়াছিল।

দীর্ঘ অদর্শনের পর সুবিমলের সহিত আজকের সাক্ষাতে লিলির মন

অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল, কিংবা করিয়া পার্টির জন্ত একটা তাহাকে দিতে পারিয়াছে বলিয়া।

ট্রামে উঠিয়া লিলি মন স্থির করিয়া ফেলিল। এক দিকে ঠাকুরদা ও পাঠোবিংহ, অন্তদিকে সুবিমল ও তাহাদের পার্টি—এই দুই দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাকে চলিতে হইবে।

আরও দুইটি বছর কাটিয়াছে। দুই দিকে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত লিলি যে সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহা সে পালন করিয়া আসিয়াছে। বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইবার পর এই দুই বছরে লিলিকে যে কঠোর শ্রম করিতে হইয়াছে তাহা লিলি ও সুবিমল ছাড়া আর কেহ জানে না। আর কয়েক মাস পরে সে, পরীক্ষা দিবে, সসম্মানে উৎরাইবে—আশা করা যায়। ঠাকুরদার কাছে সে কোন ত্রুটি রাখিতেছে, এ বদনাম কেহ দিবে না। সুবিমলের প্রতি তাহার ভালোবাসা যেমন আরও অটুট আছে, তেমনি পার্টির জন্ত হাতে কলমে কাজ যতটা করিতে পারিয়াছে তার চেয়ে বেশী করিয়াছে তাহার নিজের নামে যেখানে যত টাকা ছিল সবই, তুলিয়া দিয়াছে—এক একটি বিপদ হইতে পার্টি ও তাহার কর্মিকাগুলির মুখপত্র 'স্বরাজ'কে বাঁচাইবার জন্ত। কয়েকখানা অলঙ্কার ছাড়া লিলির নিজস্ব বলিয়া আর কিছুই নাই। ঠাকুরদার নামে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা থাকিতে পারে, কিন্তু ঠাকুরদার কাছ থেকে মোটা টাকা লইতে হইলে লিলিকে যে ছলনা, যে অভিনয় করিতে হয় সেজন্ত তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। তবে সুবিমলের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে একটু হাসি ফুটিবার জন্ত ও যাহাদের জন্ত সুবিমল জীবনপাত করিতেছে তাহাদেরই মুক্তি সংগ্রামের টাকাটা লাগিবে জানিয়া তাহার সব ছলনা সব অভিনয় সার্থক হয়।

সুবিমলের এ বাড়িতে আসা ও লিলির সহিত তাহার সম্পর্কটুকু ঠাকুরদার কাছে উপভোগ্য করা—এই বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঠেকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল অনুকূল ভবিষ্যতের আশায়। কিন্তু কয়েকদিন নিরোগ হইয়া থুকিয়াও নাইটস্কুলের জন্ত আশানুরূপ টাকা উঠিতেছে না দেখিয়া মনোবৈজ্ঞানিক ঠাকুরদার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার কিছু সহানুভূতি পাইবে এই ধারণার বশে লিলির অজ্ঞাতে সুবিমল গত সপ্তাহে হঠাৎ এ বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরদা তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা কোন দিক থেকেই লিলি জানিতে পারে নাই। ঠাকুরদা মনস্থ করিয়া তাহাকে দুইশত টাকা দিয়াছেন, তবু প্রয়োজনের অনুপাতে তাহা নাকচ জানিয়া লিলিকেই আবার সেই নাইটস্কুলের জন্ত ঠাকুরদার কাছ থেকে বিদ্যা ভণিতা করিয়া আরও অনেক বেশী টাকা আদায় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে বসিয়া সেই টাকা প্রসঙ্গে সুবিমল যে তাহার নিজের সঙ্গে যোগাপড়ার কথাটা বলিয়াছিল কি মনে করিয়া, সারাদিন চিন্তা করিয়াও লিলি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সুবিমল তো এ ধরণের কথা আগে বলিত না। লিলির সহিত যোগাপড়া করিবার কিছু নাই একথা লিলিও জানে, সেও জানে; তবু লিলির ব্যাপার লইয়া তাহার নিজেরই সঙ্গে যোগাপড়া করিবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে? তাহা ভালো করিয়া জানিবার জন্ত আজও লিলিকে দেশপ্রিয় পার্কের নির্দিষ্ট কোনটিতে গিয়া বসিতে হইয়াছিল। এরই মধ্যে ঘটনাটা বাদ দিয়া লিলি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "আমার জন্ত আজকাল তুমি ভারী ভাবনায় পড়েছো, না?"

"—ভাবনায়?" বলিয়া সুবিমল লিলির একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। কথা যেন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে।

লিলিকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল: "কি গো কথা কইছো না যে?"

আরও একটু ভাবিয়া সুবিমল বলিল: "পাঁচ বছর আগে জুন মাসের এক বেয়াল্লা দিনে পদ্মার ওপর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আকাশটা ছিল ঘোর লাল, আর পদ্মার বুক থেকে যে বড় বড় ঢেউ উঠছিল তার কণাগুলোও ছিল জলন্ত শিখার মত টক্‌টকে লাল। তারপর আকাশের মেঘ আর জলের তরঙ্গের জন্তে যে মাতামাতিটা সুরু হলো তার কাছে কোথায় লাগে তোমাদের উদয়শঙ্করি নাচ! দেড়বছর পরে জানুয়ারী মাসে পদ্মার ওপর দিয়ে আর একবার গিয়েছিলাম; দেখলাম, একেবারে লক্ষ্মী মেয়েটির মত বীর গতিতে একটানা বয়ে যাচ্ছে, শুধু কলহাসির ছলছলানি শোনাচ্ছে শোনাচ্ছে। বলতে পারো লিলি, পদ্মার কোন রূপটা ভালো?"

উত্তরে লিলি একরূপা বলিতে চাহিয়াছিল: "দুটোই ভালো; তার এক রূপ তোমাকে আকৃষ্ট করেছিল, আর এক রূপ দেখে তাকে ভালো-বেসেছিল"—কিন্তু ভুল করিয়া অন্তকথা বলিয়া বলিল: "জানি না। তবে আজকাল তুমি কলেজে ইকনমিক্সের বদলে পদ্মার মাতামাতির কথা পড়াও নাকি?"

সুবিমল যেন কথাটা বুঝিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল: "ভালো কথা, কাল যে নোটগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো তৈরী করছো তো?"

ব্যস্! কোথাকার কথা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল!

আগে সুবিমলকে পার্টির জন্ত অহর্নিশি চিন্তা করিতে হইত; বর্তমানে কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রধান নেতা কয়েক জোর সুরক্ষার বিষয়গুলি মীমাংসা করিয়া যেন; সুবিমলকে শুধু আকস্মিক সমস্যার সমাধান করিতে হয়, যে-সব ব্যাপারে লিলিও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। কাজেই যে ভাবপ্রবণতাকে সুবিমল এতদিন আমল দেয় নাই, আজকাল একটু অবসর পাইলেই, সে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ফলে লিলির প্রশ্নটার জবাব দিতে গিয়া তাহাকে দেশপ্রিয় পার্ক হইতে পদ্মার কোল পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেল। যাক্ সুবিমল যাহা খোলসা করিয়া বলে না তাহা লইয়া লিলির মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই।

লিলি তবু মাথা না ঘামাইয়া পারে না। সুবিমলের পথ সরল ও মুক্ত, কিন্তু লিলি আর দুই বছর পরে কি করিবে? বি-এ পরীক্ষা দিবার পর মাত্র দুইটা বছরেই এম-এ পরীক্ষা দিবার কোন বাধা থাকিবে না। যত দিন সে কলেজে যাইতে পারিবে ততদিন পথ ঘাট চষিয়া বেড়াইলেও ঠাকুরদার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, কিন্তু

এম-এ পরীক্ষা হইয়া গেলে সে ইচ্ছামত না পারিবে যখন তখন সুবিমলের কাছে যাইতে না পারিবে পার্টির কাজে যতত্র ছুটাছুটি করিতে। এমন নয় যে লিলি যাইতে পারিবে না বলিয়া সুবিমল সটান এ-বাড়িতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুরমাকে বলিবে : "মহাশয়া, আমাকে বোধহয় চিনিতে পারেন ; আমি সেই সুবিমল বসু, পশমশ্রী মিলের কলিকাতা শাখার সম্পাদক আর আমি আপনার আজ্ঞাবহা পৌত্রী লিলিকে ভালোবাসিয়া থাকি ; অতএব—" এবং সুবিমলের কথাগুলি শুনিয়াই ঠাকুরমা সে সংবাদ আনিবার জন্য মিষ্টান্নের দোকানে লোক পাঠাইবেন, এ ভরসা করা যায় না।

একটা কথা মনে করিয়া লিলি কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। সেদিন কি একটা কাজে ঠাকুরমা তাহাকে বলিয়াছিলেন : "না দিদি, তুই ছেলেমানুষ, তুই পারবি নে।" উত্তরে লিলি দুষ্টামি করিয়া বলিয়াছিল : "যা রে! কুড়ি বছর আমার বয়েস হলো, তবু বলবে ছেলেমানুষ?"

ঠাকুরমা শাখা নাড়ি নাড়িতে নাড়িতে একগাল হাসিয়া বলিয়াছিলেন : "না না না, খবরদার ও কথা বলবে না।" তারপর ছড়া কাটিয়া বলিয়াছিলেন—

"বাপমা ছেড়ে পরলে বুড়ি শাড়ি,
বালিকা সে কিশোরী হয়,
হয় না তবু নারী।"

ছড়া শেষ করিয়া ঠাকুরমা আর একবার সাবধান করিয়া দিলেন : "খবরদার, ফের যদি বয়েস বাড়িয়ে বলবি তো—" ইত্যাদি।

কিন্তু বয়স বাড়ানো দূরের কথা, ইচ্ছা করিয়া লিলি চার বছর কমাইয়াই বলিয়াছিল ; কিন্তু আপন ভোলা ঠাকুরমার খেয়াল হয় নাই যে আর কয় দিন পরে লিলি বি-এ পরীক্ষা দিবে—চব্বিশ বছর বয়সে, আর এম-এ পরীক্ষা দিবে ছাব্বিশে। 'ছাব্বিশ' শুনিলেই ঠাকুরমার টনক নড়িয়া যাইবে।

ছাব্বিশ বছর! কথাটা ভাবিয়া লিলিরই যেন টনকটা নড়িয়া উঠিল।

তবে ছাব্বিশে পদার্পণ করিবার, এম-এ পাশ করিয়া বেকার হইয়া পড়িবার এবং সুবিমলের সহিত তাহার দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ইতিহাসখানা ঠাকুরমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিবার সময় হইয়াছে কিনা ভাবিবার পূর্বে অনায়াসে দুইটা বছর সে হাতে পাইবে। দুইটা বছর নেহাৎ কম সময় নয়। দুই বছরে দেশ বিদেশে কত কি ঘটিতে পারে। আর এই দুই বছরে কমরেড বোস ও সুবিমল প্রমুখ তাঁহার বিপ্লব অনুগামীরা তাহাদের এই মুক্তি সংগ্রামে জয়ের পথে নিশ্চয় অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিবেন। তখন যদি সুবিমল ও লিলি এক সঙ্গে, সহজ প্রকাশে, সুমতা, ইরিনা, বনীরাম, ইয়াসিন, জেসেফ, ইসমাইল, রাবেয়া, সাকিনা, উপেন, শঙ্কর ও হাজার হাজার লোকের জনতা ভেদ করিয়া সরাসরি ঠাকুরমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাঁহার পাশে ঐ জোড়াটী কপালে উঠিয়া যাইবে না বোধহয়। তবে সংগ্রামের পথ যদি সরল না হইয়া বন্ধুর ও দুর্গম হইয়া পড়ে তখন যদি তাহাকে জনতার মধ্যে নিজেকে পুরাপুরি বিলাইয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করে তাহা হইলে ঠাকুরমা কি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তাঁহার মনোবিজ্ঞানের বইগুলির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিবেন না?

আর একটা কথা মনে করিয়া লিলি কৌতুক বোধ করিল। তাহার মনঃসমীক্ষক ঠাকুরমা হাজার হাজার লোকের মনের অন্ধকার গহ্বরের লুকান বস্তুগুলির সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যাহাকে শৈশব হইতে চব্বিশ বছরের করিয়া মানুষ করিয়াছেন ও যাহার এক বেলার অবর্ণনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন, তাহার সেই আদরের পৌত্রী লিলির মনের একটি কথাও জানিতে পারেন নাই। যে জন্যে লিলি আজ নিজেকে আহুতি দিতে বসিয়াছে তার একটু আঁচও যদি মনঃসমীক্ষকের মনে লাগিত তাহা হইলে কি হইতে পারিত তাহা ভাবিয়া লিলি খিল খিল করিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

আধুনিক কৃষি ও চিকিৎসা বিভ্রাট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মানুষের বেলায় খাদ্য ও ঔষধে অনেক তফাৎ। উদ্ভিদের বেলায় রাসায়নিক কৃত্রিম সার কি খাদ্য না ঔষধ? এই বিষয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ ও আলোচনা সুরু হইয়াছে। আলোচনার ফলে নিত্যনূতন রাসায়নিক সারের সৃষ্টিও হইতেছে। কোন কোনও ক্ষেত্রে রাসায়নিক সাহায্য, বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য সমস্যার সমাধানে সাহায্য না করিয়া চিকিৎসার সঙ্কট উপস্থিত করিয়াছে। পশ্চিমের চাকচিক্যময় দ্রুত ও চঞ্চল প্রকৃতির সংঘাতে প্রাচ্যের ধীর সমাহিত জীবনে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। অনাহার, দারিদ্র্য ও শ্রেণীসংগ্রামে প্রাচ্যের চিরপ্রোথিত জীবন-দর্শন ও ভাবধারা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পরানুকরণ প্রবৃত্তির আবেগে এক শ্রেণীর লোক পশ্চিমের সকল কিছুই অনুসরণ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি পরিহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ফলের লাঙ্গল ও কৃত্রিম সারের প্রয়োগ এই শ্রেণীর লোকের স্বপ্নবিলাস। অপরদিকে সাম্রাজ্যতন্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ভাবধারা উন্নত করিবার জন্য যাঁহারা সচেষ্ট তাঁহাদের কথাও উপেক্ষণীয় নহে। চিন্তার এই বিধারায় অবগাহন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে। গান্ধিজীর চিন্তাধারা তাঁহার প্রাণোদ্যোগ

সংঘের ভিতর দিয়া আংশিক প্রবাহিত। তাঁহার স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত পিয়ারী লাল, জিনোবা, কুমারাপ্পা প্রভৃতি অনেকেই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ত্যাগী ও কর্মী কাজেই তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত মন্তব্যের অনেক দাম। হরিজন পত্রিকার ফাইল হইতে কতিপয় উদাহরণ এখানে পরিবেশন করিলে আলোচনার সুবিধা হইবে মনে হয়। ইঁহাদের অনেকেই জমির খাদ্য হিসাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিরোধী। পিয়ারীলাল বলেন রাসায়নিক সার উষর হইতে পারে কথাপি শস্য নহে। শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা আরও অগ্রসর হইয়া সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে—"Ill advised central Government"কে, সিন্ধ্রি পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। বড়লাটের executive councillors ১৯৪৩-৪৪ সালে সিংহভূম জেলার সিন্ধ্রি নামক স্থানে ২২ কোটী টাকা ব্যয়ে ৩৫০০০০ টন Ammon Sulphate তৈরী হইতে পারে এইরূপ একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জহরলালের অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘসূত্রী নীতি পরিহার করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন মাত্র। এই ২২ কোটী টাকার নব্বই ভৈরবিক অন্তর্পাতি ধরিলেই ১২ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে। সিন্ধ্রির কারখানায় ও ভারতীয় অন্যান্য কারখানায় উৎপন্ন হিসাবে ধরিলে মোট ছয় লক্ষ টন পর্য্যন্ত Ammon Sulphate উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে ৬৩০০০ টন ammon sulphate খরচের হিসাব পাওয়া যায়। এই বৎসরে আমেরিকায় ৮০,৯০,০০০ টন এবং গ্রেট ব্রিটেনে ১২,২১,৩০০ টন (শতকরা ১০০ ভাগ সালফেট হিসাবে) খরচ হইয়াছে। কৃষি ব্যতীত কোন কোনও রাসায়নিক শিল্পেও ammon sulphate প্রয়োজন হয়। যুদ্ধের জন্যই মাল পাওয়া মুস্কিল ছিল নচেৎ ভারতের প্রয়োজন এখনই অনেক বেশী। U. S. A. এবং U. K.-তে একভাগ ammon sulphate-এর সহিত দেড় হইতে দুই ভাগ সুপার ফসফেট মিশাইয়া সার হিসাবে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্রিত সারে ধান, ইক্ষু, চা, কফি, তুলার উৎপন্ন পরিমান শতকরা ৫০ হইতে ১০০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সিন্ধ্রির কারখানা চালু হইলেও ভারতের মতন বিরাট দেশে এই পরিমান বেশী মারাত্মক নহে। পশ্চিমের তুলনায় এখানে উষর হিসাবে ব্যবহার করিলেও উষর হইবার সঙ্গত কারণ নাই। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনাকে হীন পরামর্শপ্রসূত বলা সঙ্গত কি?

আদর্শ খাদ্য কি? শরীর রক্ষার জন্য কম বেশী সকল গুণই যে খাদ্যে উপস্থিত তাহাকেই আদর্শ খাদ্য বলা যায়। দুধে ছানা, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, লবণ, শর্করা ও স্নেহোত্তীর্ণ খাদ্য বর্ত্তমান থাকায় দুধ একটী প্রয়োজনীয় আদর্শ খাদ্য। এমন হয়ত সম্ভব যে কোনও রোগীর শরীরে ভিটামিন "এ" ও "ডি"র ভাগ কমিয়া গিয়াছে। সচরাচর খাদ্যে এই ভিটামিন সংগ্রহ করা অসম্ভব মনে হইলে দুধের সহিত পরিমিত 'কড্‌লিভার' কিম্বা 'শার্কলিভার' তেল খাওয়াইলে রোগীর উপকার সম্ভাবনা; চিকিৎসকরা তখনই উক্ত যে কোন তেল দুধের সহিত পথ্য দিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে ঔষধের পরিমান রোগীর বয়স ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া একমাত্র চিকিৎসকই স্থির করিতে পারেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিকূল আবহাওয়ায় যাহাদের জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয় কিম্বা সাধারণ জীবনযাত্রার অনিয়মাচার ও অপরাধ যাহাদের অভ্যাস তাহাদিগকে অনেক সময় উত্তেজক ঔষধের সাহায্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। অধিকাংশ উত্তেজক ঔষধেই মদ, আফিং, গাঁজা কিম্বা এই ধরণের যে কোনও নেশার দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। কাজেই এই ধরণের ঔষধ সেবনের পরে ক্ষণিক উত্তেজনা কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে অতিরিক্ত ক্রিয়া করিয়া তুলিলেও ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইবার অব্যবহিত পরে অবসাদ আসিয়া তাহার শরীর ও মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ক্রমাগতঃ এইরূপ উত্তেজক ঔষধ ব্যবহারে মাংসপেশী শিথিল ও অবশ হইতে হইতে অবশেষে নীরব ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে। একমাত্র মিতাচার ও সুখাদ্য গ্রহণে মাংসপেশী, শিরা, উপশিরা দীর্ঘকাল ধরিয়া সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাখা সম্ভব। মিতাচারী ব্যক্তি দুর্ব্বল এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলে মফঃ চিকিৎসকের পরামর্শে মাত্রানুযায়ী দুই পয়সা সেবন করিয়াও সঞ্জিবনী শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারেন। নিষ্প্রয়োজনে সুস্বাদেহে সঞ্জিবনী সুধাও অকাল-পক্কতা আনিয়া দেয়। কাজেই দেখা যায় পৃথক কারণে, বিভিন্ন সময়ে মানুষের পক্ষেও খাদ্য, ঔষধ ও মাদক দ্রব্যের প্রয়োজন আলাদা। খেয়াল মাফিক এক জিনিষ দিয়া অপর কাজ চালাইয়া লওয়া যায় না। উদ্ভিজ্জ-জগৎ সম্পর্কেও এই কথা কি সত্য? মানুষ, পশু এবং পাখীর মতন গাছপালারও খাদ্য দরকার। উদ্ভিজ্জ-জগৎ প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী আলো, বাতাস ও মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। মাটির বুকে নিহিত জৈব ও খনিজ পদার্থ জলে দ্রব হইলে গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে। একপ্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু মাটীর অভ্যন্তরে থাকিয়া এই খাদ্যকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য সারে পরিণত করে। মানুষের পাকাশয় যন্ত্র তাহার খাদ্যের কিয়দংশ হজমযোগ্য আহার্য্যে পরিণত করিয়া বাকী অংশকে মল মূত্রাকারে বাহির করিয়া দেয়। উক্ত সূক্ষ্ম জীবাণু (micro-organism) মানুষের পরিত্যক্ত মল মূত্রকেও গাছপালার উৎকৃষ্ট খাদ্যে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। এই অদ্ভুত নিয়মে প্রকৃতির ভারসাম্য ও নির্ব্বাটচক্র নিষ্পন্ন হয়। মানুষের দুর্বুদ্ধি ও অনাচার এই ভারসাম্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে প্রকৃতি স্বয়ং তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে দ্বিধা করে না। মানুষের মল মূত্রের ন্যায় গোশালার মল মূত্র ও পচা লতাপাতা কৃষির উৎকৃষ্ট সার। এই সংমিশ্রিত জৈব সারকে compost আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য যেমন মানুষের একাধারে আহার্য্য ও ঔষধ উদ্ভিদের বেলায় কম্পোষ্ট সারে বর্ত্তমান "auxin" ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয়।

প্রবল বন্যা ও বর্ষার জল ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে বালি পড়িয়া কিম্বা সার ধৌত হওয়ায় জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। এইরূপ যোহতর চাষন পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে কালে, জমি চাষের অযোগ্য হইয়া যায়। রোগীকে ঔষধ দেওয়ার ন্যায় এইরূপ অনুর্ব্বর কিম্বা

নাভিউর্ব্বর জমির শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ দিয়ে। এই সকল ক্ষেত্রে স্বল্পপরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগে শীঘ্র 'হৃত উর্ব্বরতা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু চিকিৎসক যাতীত যেমন রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নহে তেমনি মৃত্তিকারাসায়নিক যাতীত সার প্রয়োগ অনিষ্টের, মৃত্তিকা রাসায়নিক জমির গুণাগুণ বিশ্লেষণ না করিয়া সারের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না। সুস্থ ও সবল মানুষ "মদিরা" খাওয়া অভ্যাস করিয়া যেমন কিছুকালের জন্য অতিরিক্ত শক্তিসঞ্চয় করিয়া থাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃত্রিম সার প্রয়োগ করিয়াও কয়েক বৎসর অধিক ফসল ফলান সম্ভব। তারপরে মৃত্তিকার অম্লভাব বৃদ্ধিজনিত সূক্ষ্ম জীবাণুর মৃত্যুতে জমি কৃষির অনুপযুক্ত হইয়া যায়। যে দেশের কৃষক মৃত্যুর পূর্ব্বে এক কোঁটা উষধ সংগ্রহ করিতে হিমসিম খাইয়া যায় সে দেশে মৃত্তিকা চিকিৎসকের কথা রূপকথা নয় কি? জমির লাঙ্গলে ৯।১০ ইঞ্চি নীচের মৃত্তিকা উপরে উঠিয়া আসে, সেইজন্য প্রায় ৩।৪ ইঞ্চির নীচে সারজনের সীতা মাটীতে প্রবেশ করে না। এই সূক্ষ্ম-জীবাণু পলিমাটী কিম্বা দোয়াশ মাটীর ৩।৪ ইঞ্চির ভিতরেই থাকে। কাজেই ফসলের লাঙ্গলে চাষ করিলে নাইট্রোজেন ঘটিত কৃত্রিম সার ও জীবাণু তৈয়ীর জন্য Compost বিলাইয়া দিলে জমির উর্ব্বরতা বহুদিন থাকে বরং তলদেশের অজৈব সার পদার্থ উপরে আসায় উর্ব্বরতা বাড়িবারই কথা। কিন্তু বাস্তিক কৃষির যেখানে সহজলভ্য প্রাণীজ জৈব সার সহজলভ্য থাকে না। কাজেই মৃত্তিকার humus or auxin ক্রমেই ক্ষীয়মান হইতে সুরু করে। বিলাতের একজন বৈজ্ঞানিক কৃষক Former Sykes বলেন যে কৃত্রিম সারে সভ্যতার সর্ব্বনাশ টেনে আনছে। কেবলমাত্র কৃত্রিমসার ব্যবহারে এমন দিন আসবে যে দিন মাটীর শস্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা একেবারে হ্রাস হয়ে যাবে। Sykesএর মতনই স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড বলেন যে কৃত্রিম সারে মানুষ ও গবাদি প্রাণীর মধ্যে ব্যারাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাঁহার মতে অবস্থার এত খারাপ পরিণতি যে সাধারণ লোকে কিছু জানে না। তিনি বলিয়াছেন They are not encouraging and certainly not impressive. Artificial manures were born out of the abuse of Liebig's discoveris of the chemical properties of the soil and out of the imperative demands made on the farmer by the invention of machinery. *

Friend Sykes (Wiltshire এর বিখ্যাত চাষী) "Humus and Farmer" কাগজে লিখিয়াছেন—ইয়োসিড মাংসল ও মোটা মানুষ মাত্রেই কি শক্তিধর? যে মানুষের হাড় ও মাংসপেশী স্বাভাবিক, দৃঢ় ও উন্নত তিনি ফুলকায় না হইলেও বেশী স্বাস্থ্যসম্পন্ন। তেমনি বড় বড় ফলফুলে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় ভিটামিন আছে কি নাই বলা যায় না। কৃত্রিম সারে উৎপন্ন, লাবণ্যময় ফলফুলে কেবলমাত্র লবণজাত স্বাস্থ্যের উপাদানের অভাব নহে তাহা মৃত্যুর (Virus) বীজ সুপ্তাবস্থায় আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গরু, শুকর ও Race এর ঘোড়া প্রদর্শনীতে বরাবর পুরস্কার পাইত। হঠাৎ পর পর ২ দুই বৎসর ফসলের বিপর্য্যয় ঘটায় তিনি পশুগুলিকে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানে ইউবারকুলীশ্ রোগে সকল-গুলিই আক্রান্ত বলিয়া জানিতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রোগা-ক্রান্ত গরুগুলি তখনও সবচেয়ে বেশী দুধ দিতেছিল। হতাশায় তিনি বাগানবাড়ী ও পশুপাল সমস্তই বেচিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে দেখিলেন কয়েকবছর থেকে তিনি কৃত্রিম সার ব্যবহার করিতেছিলেন, ইহার পরে ১৯৩৬ সালে তিনি স্যালিসবারীর উপত্যকার একখানা অনুর্ব্বর জমি নিয়া চাষবাস আরম্ভ করিলেন। দশ বছরের পরিশ্রমে, বন্ধুবান্ধবের নানা ঠাট্টাবিদ্রূপ ও অনুযোগ অভিযোগ করিয়া সাফল্যলাভ করিলেন. এই কথাগুলি কাগজে লিখিত হইয়াছে। Farmer Sykes এর পশুগুলি পুনরায় প্রদর্শনীক্ষেত্রে পুরস্কার পাইতেছে। তিনি মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন কৃষিক্ষেত্রে যাইতে হইবে প্রাণীতত্ত্ববিদ্যার মন নিয়া ডাক্তার হয়ে এই প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যার কাজে সহায়ক হইবে মাত্র। তিনি আরও বলেন যে, রাসায়নিকের মতলবী প্রচারে কৃষিক্ষেত্রে আজ ভাঙ্গন ধরিয়াছে। নির্ব্বিচারে কৃত্রিম সার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁরী জগৎকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন। নিউজিল্যাণ্ডেও অত্যন্ত কৃত্রিম সার ব্যবহার প্রচলন। গত মহাযুদ্ধে ব্রাঙ্কটনের শতকরা ৯০ জনকে যক্ষ-রোগে আক্রান্ত এবং Catarrah এবং Septic tonsil ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাবল্য দেখিয়া ডাঃ চাপমেন নাইট এলবার্ট প্রাবার স্কুলের ৬০ জন ছাত্র লইয়া কৃত্রিম ও অকৃত্রিম খাদ্যের ফলাফল গবেষণা করেন। তাঁহার বক্তব্য—অকৃত্রিম খাদ্যে যক্ষরোগ, catarrah এবং Septic tonsil প্রভৃতির প্রাবল্য অত্যধিক পরিমাণে কম, ভারতের মতন দরিদ্র দেশে বর্ষণ দেবতার উপর নির্ভরশীল কৃষিক্ষেত্রে বহিস্তরের কৃষকের পক্ষে কৃত্রিম সার প্রয়োগ কতকটা জুয়াখেলার ন্যায়, রাসায়নিক সার প্রয়োগের পূর্ব্বে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন।

প্রাচ্যদেশে সহজলভ্য পচা লতাপাতা, গোবর ও গোমূত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তাহাদের নাগরিক সভ্যতার যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় আবর্জ্জনাকে সারে পরিণত করা হইতেছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষার ফেরে জল যাহাতে সমান ভাবে পাওয়া যায় তাহার জন্য খাল খনন এবং নদীর জল বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিস্তৃত জলাধার নির্ম্মিত হইতেছে, বহু সময়ের ভিতরে রাশিয়া তাহার এশিয়া ভূখণ্ডের অধ্যাত জাতির মধ্যেও সভ্যতার মানদণ্ড আমাদের চেয়ে উঁচু করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ও গোড়া ঠিক না করিয়া কেবলমাত্র কৃত্রিম সারের আস্ফোলন করিলে কৃষক তাহার ভাঙ্গা হাল ও চিরকর্ম্ম বলদ লইয়া ভগবান ও অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কৃত্রিম সারের ব্যাপারে ডুবিয়া যাইবে মাত্র। পাশ্চাত্য শিব গড়িতে গিয়া যা হনুমান্ গড়িয়া বসিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ না লইয়াই "উজ্জ্বল আলোক যেমি পতঙ্গ যেমতি ধায়" তেমনি ছুটিব কিনা এখনই তাহা স্থির করিয়া লওয়া দরকার। *

১৯৪৭ সালের ২০শে এপ্রিলের 'হরিজনে' প্রকাশ অষ্ট্রেলিয়ার সম্প্রতি "জীবন্ত কৃষি উত্থান সমিতি" আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। যে সমস্ত উদ্যানের মৃত্তিকায় "Humus" যুক্ত সেই সকল জমিতে কম্পোষ্ট্ সার প্রয়োগ পদ্ধতিতে পুনরায় Humus সৃষ্টি ও মৃত্তিকার ইহার যথাযথ সংরক্ষণ ব্যাপারে সাধারণ্যে আন্দোলন ও শিক্ষাদানে এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির মতে কম্পোষ্ট্ সারে জমি চাষ করা হইলে উৎপন্ন খাদ্যে জীবন্ত ও মানুষের মধ্যে অসুখ কম হয় এবং সাধারণের অরোগ হইতে আয়ুরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি হয়।

---

* হরিজন পত্রিকা ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ সাল, ১০ই নভেম্বর ১৯৪৩

* ১৯৪৩ সালের ২৯শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সেণ্ট্রাল ইরিগেশন বিভাগের সপ্তদশ বার্ষিক সভার সভাপতি রায় বাহাদুর এ. এন. খোসলার বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। উক্ত বক্তৃতায় ভারতীয় জন সাধারণের জীবনধারা উন্নত করিতে হইলে প্রথমেই নদ-নদীশাসন প্রয়োজন, তাঁহার মতে ভারতীয় নদ-নদীর বিপুল জলরাশির শতকরা মাত্র ১ ভাগ মানুষের কাজে লাগে, বাকী ৯৯ ভাগ মানুষের উপকারও দূরের কথা, বন্যা, প্লাবন ও মৃত্যুরূপেই ভারতীয় নরনারীর জীবনে দুর্দ্দৈব সৃষ্টি করে।

গান্ধীজী

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুগ সঞ্চিত নিবিড় আঁধার
ভেদিয়া তুমি হে মহা অবতার
করিতে লাঘব মানবের ভার
এসেছ ধরণীতলে।
হিংসার মাঝে শান্তির দূত,
ঘন মেঘ মাঝে তুমি বিদ্যুৎ,
অজ্ঞতা মাঝে যেন অপরূপ
জ্ঞানালোক শিখা জ্বলে॥

তুমি ধার্মিক, তুমি রাজিক,
তুমি ঋষিক, তুমি সাত্ত্বিক,
জগতের তুমি মহান মানব,
তুমি যে গো মহামানী।
তুমি রাজর্ষি, তুমি দেবর্ষি,
সারা এশিয়ার তুমি মহর্ষি,
তুমসা আবৃত এই ভারতের
তুমি যে মন্ত্রবাণী॥

কঠিন তোমার তপশ্চর্য্যা,
মানব প্রেমের করিছ চর্চ্চা,
ভ্রান্তির বশে আঘাত যে হানে
তারেও লভিছ টানি।
অজ্ঞান, মূঢ় দেশবাসীগণে
আলোকের পথে চলে তব সনে,
প্রেমের পরশে চলিছ মিটায়ে
তারে তারে হানাহানি॥

মানবতার শ্রেষ্ঠ পূজারী
অন্তর খুলি দিতেছ উজাড়ি
মানবের কানে দিব্য-মন্ত্র
হে বিশ্বের গুরুদেব।
জগতের যত বিষ করি পান
অমৃতেরে তুমি করিতেছ দান,
নব ভারতের নব নারায়ণ,
তুমি যে গো মহাদেব॥

তোমার পুণ্য হস্ত পরশে
মানব হৃদয় ভাসিছে হরষে,
তোমার শান্ত করুণা বাণীতে
নাশিয়াছ সব দ্বন্দ্ব।
ম্লান করি তব অভয় সঙ্গ
রক্ষা করেছ নিখিল বঙ্গ,
দ্বিধা শঙ্কিত হৃদয় হইতে
ঘুচায়েছ সব সন্দ॥

অন্তর গ্লানি গ্লানি করি ক্ষয়
যোষিতেছ তুমি সত্যের জয়,
আহ্বান করি সারা ভারতের
ধ্বনিছে তোমার শঙ্খ।
মাতা বসুমতী ক্ষতবিক্ষতা
চাহিছে তোমারে ভুলিবারে ব্যথা,
মানুষে আজিকে মানুষ করিয়া
বাজাও বিজয়ডঙ্ক॥

ভয়াল সুর

শিল্পী—শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়চৌধুরী

কংগ্রেসের কার্য্যসূচী—

২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যসূচী স্থির হইয়াছে—"ভারতের সমাজতন্ত্রবাদ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ নহে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব চিন্তাধারা ও সমস্যা আছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের নিকট যে সামাজিক ও অর্থনীতিক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজতন্ত্রবাদ এবং উহা ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের পক্ষে উপযোগী। সেজন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—(১) প্রত্যেক কৃষি-ভূমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। চাষীরা মালিক থাকিলে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপক কৃষিকার্য্য পরিচালনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও তজ্জন্য সে ব্যবস্থায় উৎসাহ দেওয়া উচিত হইবে না। জমিকে যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড করা হইতেছে উহা বন্ধ করিতে হইবে এবং সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। (২) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও ছোট ছোট কারখানার সাহায্যে সমবায় ভিত্তিতে কুটির শিল্প পুনর্গঠন করিতে হইবে। (৩) বৃহৎ শিল্প ও বড় বড় কলকারখানাকে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (৪) নাগরিকদের ধর্ম্মাচরণের সহিত রাষ্ট্রের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিবে না। (৫) কেবলমাত্র অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই চলিবে না—সর্ব্বপ্রকার বর্ণ-বৈষম্যও দূর করিতে হইবে। (৬) পল্লীগুলিকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, পল্লী পঞ্চায়েৎকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। ভারতের পল্লী পঞ্চায়েৎগুলি স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন।

শ্রীভূপতি মজুমদার—

শ্রীভূপতি মজুমদার গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি হুগলীর উকীল নীলমাধব মজুমদারের পুত্র। ১৮৯১ সালের ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৪ সাল হইতে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। জার্ম্মাণী হইতে অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে ধৃত হইয়া গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে বন্দী ছিলেন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নাগপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন—১৯২৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হন। আরামবাগে চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন, জমীদারদের অত্যাচার নিবারণ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতিতে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২৩ হইতে ৫ বৎসর, ১৯৩০ হইতে ৯ বৎসর ও ১৯৪২ হইতে কয়েক বৎসর আবার তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। বহুদিন হইতে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় সিভিল প্রোটেক্‌সন কমিটীর সাধারণ সম্পাদকরূপে দেশসেবা করিতেছেন। তিনি অবিবাহিত। তাঁহার ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের দ্বারা নূতন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই সমৃদ্ধ হইবে।

গভর্ণর কর্ত্তৃক দেবস্থানাদি দর্শন—

বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির ও বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন। গভর্ণর এইভাবে বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও জনগণের সহিত সংযোগ সাধন করিলে দেশ উপকৃত হইবে। মহাত্মা গান্ধী গভর্ণরকে বাঙ্গালা শিখিয়া বাঙ্গালীদের সহিত বাঙ্গলায় কথা বলিতে উপদেশ দিয়াছেন। গভর্ণরের দর্শনের ফলে বাঙ্গালার দেবস্থানগুলির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হইলে দেবস্থানগুলির অর্থে দেশের বহু জনহিতকর অনুষ্ঠান চলিতে পারিবে।

জয়প্রকাশজীকে পৌর সম্বর্দ্ধনা—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে খ্যাতনামা সমাজতান্ত্রিক নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জয়প্রকাশ সভায় জানাইয়াছেন যে, ২।৩

সপ্তাহের মধ্যে তিনি দেশবাসীর সম্মুখে গণতন্ত্র-সম্মত এক সমাজ তান্ত্রিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিবেন। তিনি ৭ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া সমাজতান্ত্রিক দলের সেক্রেটারী ছিলেন ও ভারতে ১৯৪২ সালের আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে ২৩০০ স্কুল ছিল—উহার মধ্যে ১৩০০ স্কুল পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে ও ২২০টি স্কুল আসামে যাইবে। পশ্চিম বাঙ্গালায় ৭৭৯টি স্কুল থাকিবে। কলেজ ছিল ১২১টি—এমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে ৪০টি ও আসামে ১৭টি কলেজ গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে ৬৩টি কলেজ থাকিবে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্ষতি হইবে ১০ লক্ষ টাকা। সেজন্য যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা হয়, তবে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিবে। সেজন্য পশ্চিম বঙ্গের সকলকে এখন অর্থদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করিতে বলা হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসব—

কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট আগামী এক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও মৎস্য চাষের পরিমাণ শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। চাষীদের বিনামূল্যে সার ও নামমাত্র মূল্যে উৎকৃষ্টতর বীজ দেওয়া হইতেছে। সরকারের খাস জমি ও যে সব পতিত জমি বর্ত্তমানে কৃষির অনুপযোগী হইয়া রহিয়াছে, সেগুলিতে সমবায় প্রথার ভিত্তিতে চাষ ও লোক বসতি করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। তবে কোন জমি জাতীয়করণ করা হইবে না। বহু দেশীয় শিল্পকে সমবায়ের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হইবে। দেশের কৃষি পদ্ধতি উন্নত করার জন্য কৃষি যন্ত্রাদি আমদানী করা হইতেছে।

শান্তি মিশনের বিপুল শোভাযাত্রার অগ্রভাগে নেতৃত্ব রেনাউল্লা খাঁ নওয়াব মাউং—তারক বা

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ—

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেজন্য কলিকাতা হইতে বিমানযোগে তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু পরদিন দিল্লী গমন করেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু ক্রমে সুস্থ হইয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার সুস্থ ও শান্তিময় সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবন প্রার্থনা করি।

পুলিস কর্ত্তৃক বিপ্লববাদ প্রদর্শনী—

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে পুলিস ট্রেনিং স্কুলে এক নূতন প্রদর্শনী হইয়াছিল। পুলিসের নিকট বিপ্লববাদীদের যে সকল চিত্র, অস্ত্র ও

অন্যান্য সরঞ্জাম ছিল, সেগুলি তথায় দেখান হইয়াছে। এই সকল জিনিষ কলিকাতা পুলিসের কাছে ছিল। বাঙ্গালা পুলিসের কাছে যে সকল চিত্রাদি ছিল—তাহার কতকাংশ পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যাওয়ায় দেখান যায় নাই। পুলিস ক্লাবের এই কার্য্য প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে ইতিহাস জানিবার সুবিধা দান করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতার পথ

ফটো—তারক দাস

আবার খাদ্য বরাদ্দ হ্রাস—

রেশন অঞ্চলে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে আবার খাদ্য বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে এখন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ সের চাউল ও তিন পোয়া আটা পাইবে। এই ৭ পোয়া খাদ্যে কোন মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেশে খাদ্যাভাব। কোথাও খাদ্য নাই। পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই প্রায় চাউলের মণ ৪০ টাকা, কোথাও বা তদপেক্ষা বেশী। পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় ঘুরিয়া চাউল সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন—তাহাও পারিতেছেন না। বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে না। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও ঘোষণা করিয়াছেন যে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব থাকিবে। মানুষ কৃষিবিমুখ হইয়াছে। দেশে কৃষির ব্যবস্থা উন্নত করিয়া অধিক ফসল উৎপাদন করিতে না পারিলে লোককে রক্ষা করা যাইবে না। রেশনের দোকানে অধিকাংশ দিন চাউল বা আটা থাকে না—কাজেই খরিদ্দারকে ফিরিয়া আসিতে হয়। সরকারী চেষ্টার ত্রুটি না থাকিলেও একথা বলা যায় যে এখনও দেশ চোরাবাজারে পূর্ণ। সে চোরাবাজার বন্ধের আরও কঠোর ব্যবস্থা না করা হইলে এই খাদ্যাভাব দূর করা যাইবে না। নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী যদি চোরাবাজার বন্ধ করিতে সমর্থ না হন, তবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে। সাহসের সহিত শক্তিমান হইয়া মন্ত্রীদিগকে সকলের অপ্রিয় হইয়াও কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে—দেশবাসী তবেই তাঁহাদিগকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে অগ্রসর হইবেন।

খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ড—

২২শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গে সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী পশ্চিম বঙ্গ পরিষদের সকল সদস্য ও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের লইয়া ৪ ঘণ্টা ব্যাপী এক খাদ্য সম্মিলন করিয়াছিলেন—তাহাতে একটি খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। দুর্নীতি নিবারণে সকলের সহযোগিতা লাভ, জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য চোরাকারবার বন্ধ প্রভৃতির কথা সভায় আলোচিত হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয় খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা—

পশ্চিম বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ২০০টি ইউনিয়ন বোর্ডে একটি করিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি দাতব্য ঔষধালয় ও ৪টি স্থানযুক্ত এক হাসপাতাল হইবে—২টি স্থান প্রসূতীদের জন্য ও দুটি আকস্মিক রোগের জন্য রাখা হইবে। সেজন্য এককালীন ১৫ হাজার ও বার্ষিক ৭ হাজার টাকা করিয়া প্রত্যেক স্থানে ব্যয়িত হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অমৃল্যপ্রসাদ চৌধুরী ঘোষণা করেন যে ঐ কার্য্যের জন্য ঘাটালের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর ৫০ হাজার টাকা ও উমেশচন্দ্র নায়েক ৩০ হাজার টাকা তাঁহাকে দিয়াছেন। তিনি ঐ কার্য্যের জন্য সর্ব্বসাধারণের অর্থ সাহায্য ও প্রার্থনা করিয়াছেন।

নাথ মিত্র ও পরদিন সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ বাগবাজারের এটর্ণী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র। ১৯২৯ সাল হইতে তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও ১৯৩২ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়াও তিনি দেশসেবায় ব্রতী ছিলেন ও বহুবার সে জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন ও 'সংগঠন' নামক মাসিকের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। সতীশ হাওড়া জেলার খ্যাতনামা কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও ১৯৩০ সাল হইতে কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস চিত্রে রূপায়িত

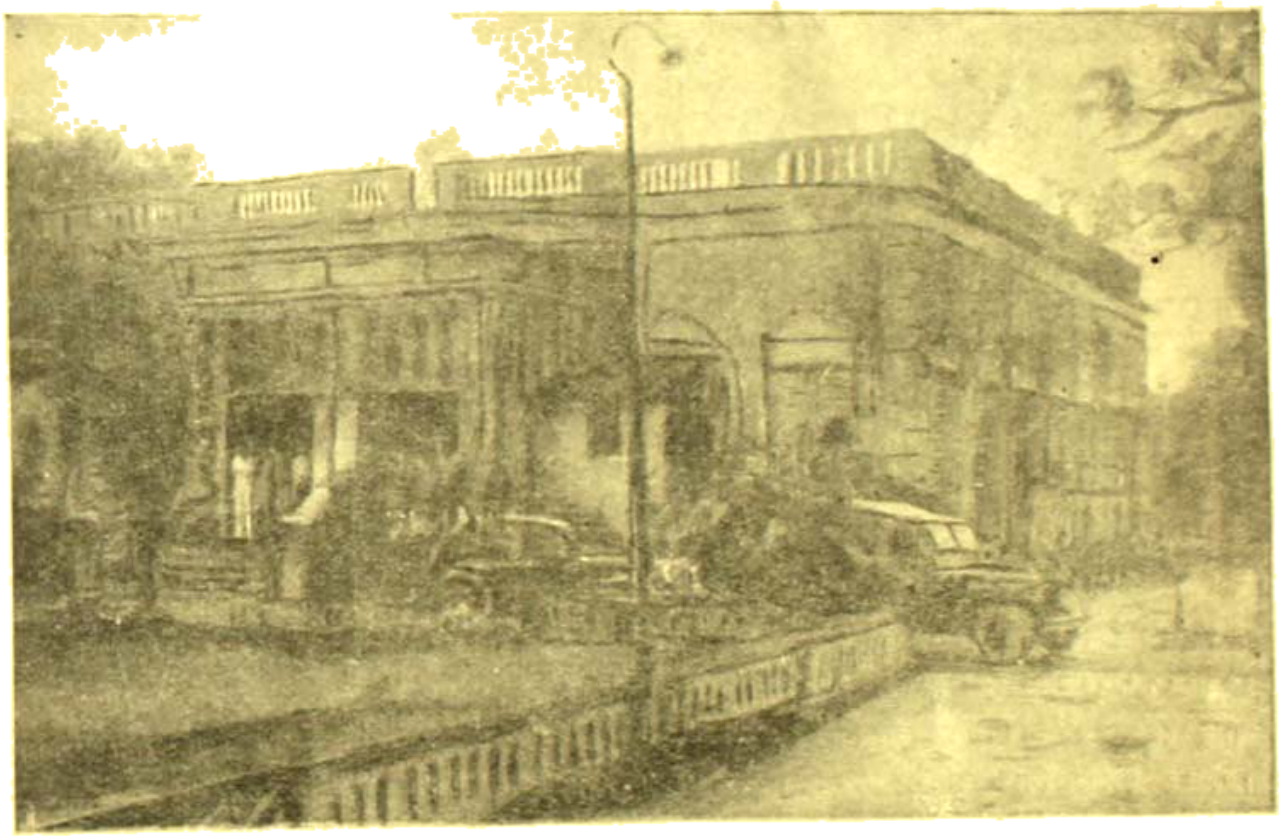

ঝেলিয়াঘাটায় গান্ধীজীর আবাস ভবন ফটো—শ্রীপান্না সেন

শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মবলিদান—

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হইলে সকল সম্প্রদায়ের কর্ম্মীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর শান্তি-প্রতিষ্ঠা কল্পে মিছিল বাহির করিয়া খ্যাতনামা কর্ম্মী শচীন্দ্র করিয়া তিনি বহু স্থানে সেই চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর সিনেটহলেও তিনি এক অভিনব চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। শচীন্দ্র ও সতীশ উভয়েই গান্ধীজির আদর্শে গঠনমূলক কার্য্যে অনুরাগী ও সেই বিষয়ে নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ছিলেন। উভয়েরই

বয়স ৪০ বৎসরের কম ছিল। তাঁহাদের শান্তি কামনায় এই আত্মদান ভারতের ইতিহাসে তাঁহাদের অমরত্ব দান করিয়াছে।

আসামে প্রাদেশিকতা বর্জ্জন—

গত ২রা সেপ্টেম্বর আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় সভাপতি মৌলানা তাহেরুল্লা ঘোষণা করেন—আসামে আসামীদের ন্যায় বাঙ্গালীর পূর্ণ অধিকার থাকিবে—কিন্তু আসামের সমস্ত অবস্থার সহিত বাঙ্গালীদের খাপ খাওয়াইয়া থাকিতে হইবে। কংগ্রেস সরকারের হাতে ভিন্ন প্রদেশবাসীদেরও এখন আসামকে নিজ প্রদেশ স্বীকার করিতে হইবে।

মাদ্রাজের সেক্রেটারী প্রফেসর ইনির্মল বসু ও বেহরুনী ইংরেজ মেয়ে ফটো—ইপাল্লা সেন

বিহারে বাঙ্গালী সদস্য—

৩রা সেপ্টেম্বর বিহারের ৬ জন মন্ত্রী একত্র হইয়া সাংবাদিকদের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলিয়াছেন—বিহার সরকার বাঙ্গালী ও বিহারীদের সমান চোখেই দেখিয়া থাকেন। বাঙ্গালী-বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ও ইহা লইয়া কাহারও বাদানুবাদ করা উচিত নহে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিহারকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করা উচিত।

বাঙ্গালী চিকিৎসকের কৃতিত্ব—

হুগলী জেলার মাহেশের ডাক্তার শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ডাঃ জ্যোৎস্নারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪ মাস বিলাতে থাকিয়া লণ্ডনের এম-আর-সি-পি সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩৯ সালে এম-বি পাশ করেন; বর্ত্তমানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজ করিতেছেন। ক্রীড়ামোদী বলিয়া তিনি ছাত্রমহলে সুপরিচিত।

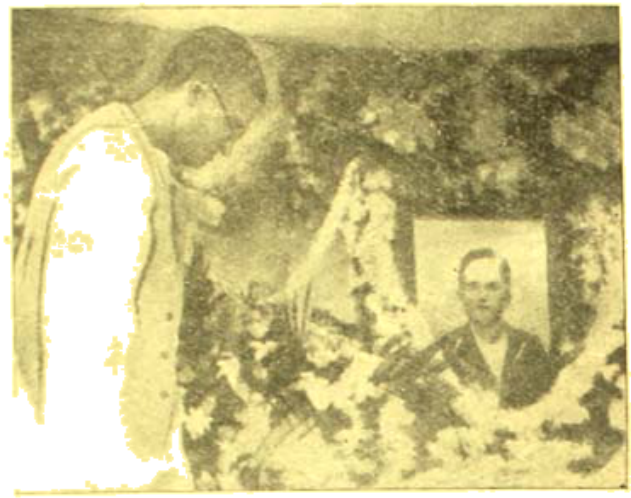

ঘটনার স্মৃতি বার্ষিকী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ফটো—শ্রীপান্না সেন

পূর্ব্ববঙ্গের কলেজ—

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া ঘোষণা করেন—পূর্ব্ববঙ্গের এলাকার মধ্যে যে সকল কলেজ অবস্থিত সেগুলির পরিচালনা কার্য্যে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য সেগুলিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করিয়া লওয়া হইবে। তাহাদের আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ঐ অঞ্চলের স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য অস্থায়ী সেকেণ্ডারী বোর্ড গঠন করা হইবে।

চট্টগ্রাম বন্যার ক্ষতি—

চট্টগ্রামের বন্যায় ঐ জেলার সকল থানা ও নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমার মোট ১০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় খাজা নাজিমুদ্দীন একথা প্রকাশ করিয়াছেন। সকল আউস ধান ও আমন ধানের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল পুকুর ও কুয়ার জল অপবিত্র হওয়ায় জলাভাবে চারিদিকে ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে।

কলিকাতার রাজপথে নেতাজীর বিরাট প্রতিকৃতিসহ শান্তি মিছিলের বিশাল শোভাযাত্রা—প্রতিকৃতির পার্শ্বদেশে মেয়র জেনারেল শাহ নওয়াজ

ফটো—তারক দাস

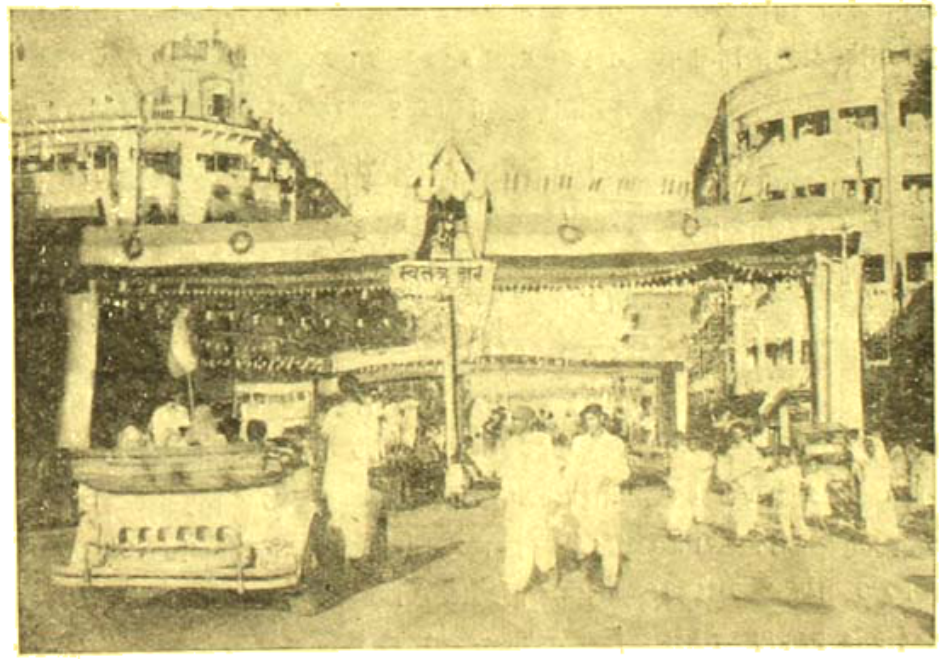

স্বাধীনতা দিবসে সুসজ্জিত কলিকাতার একটি প্রধান রাজপথ

ফটো—তারক দাস

ভারতে খাদ্যাভাব ও ব্যবস্থা—

৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত ভি-কৃষ্ণ মেনন ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য ধার স্বরূপ পাইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটেন ও অন্যান্য দেশের নিকট পত্র দিয়াছেন। ভারতে কি করিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় ও ভাল করিয়া খাদ্য বণ্টন করা যায়, বিদেশ হইতে আমদানী করা খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করা যায় কিনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য ৭ই সেপ্টেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৩জন সদস্য লইয়া কমিটী গঠন করিয়াছেন। কমিটী আগামী ৫ বৎসর কাজ করিবেন। সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, সার শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়া, ঠাকুরলাল সিং, ঠাকুর দীপনারায়ণ সিং প্রভৃতি কমিটীর সদস্য ও মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত আর-এ-গোপালস্বামী কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর শপথ গ্রহণ ফটো—তারক দাস

বোম্বাইয়ের নূতন গভর্ণর—

বোম্বাইয়ের গভর্ণর সার জন কলভিল পারিবারিক কারণে ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করায় সার এচ-পি-মোদী তাঁহার স্থানে বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া ৭ই সেপ্টেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দু রক্ষা—

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার দুর্গত হিন্দুদিগকে সাহায্য দান ও তাহাদের পুনর্বসতি কার্য্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ও খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত চারুভূষণ চৌধুরী গত ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় যাইয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ নাজিমুদ্দীনের নামে গান্ধীজির লিখিত এক পত্র লইয়াছিলেন। ঢাকায় অন্যতম মন্ত্রী মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীর সহিতও তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন নির্ব্বাচন—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের সদস্যগণের এক সভায় ৪৯জন সদস্যের মধ্যে ৪৭জন উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বর দাস জালানকে স্পীকার ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিককে ডেপুটী স্পীকার পদে মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুবের হালদার ও দামোদরসি গুরুং নামক ২জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। দলের নেতা ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন ও রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী সভায় বক্তৃতা করেন।

মিঃ এম-এ-হাসান ইস্পাহানি—

পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট মিঃ এম-এ-এচ্ ইস্পাহানিকে আমেরিকায় তাঁহাদের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ ইস্পাহানি আমেরিকার পথে গত ৬ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন।

বিহার ও বাঙ্গলা—

গত ১৯শে আগষ্ট হইতে ২ দিন জামসেদপুরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের সভাপতিত্বে বিহার—বেঙ্গলী

এসোসিয়েসনের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত প্রস্তাব তথায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—এই সম্মেলন বিহারের বাঙ্গলা ভাষাভাষী অঞ্চল—মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা এবং ভাগলপুর জেলার বাঙ্কা মহকুমা পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী জানাইতেছে। এই অঞ্চলগুলি ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে বাঙ্গলারই প্রাপ্য ও উহার সন্নিকটে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থানগুলি বিহার প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল।

লীলা পুরস্কার প্রদান—

গত ২৩শে আগষ্ট নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলা রচনার জন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে নগদ ১০০ টাকা ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামীকে একটি স্বর্ণপদক 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সভায় মেয়র জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গলা ভাষাকে সামান্য রূপান্তরিত করিয়া উহাকে সকল প্রদেশের বোধগম্য ভাষায় পরিণত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা—

গত ২৬শে আগষ্ট মঙ্গলবার নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্রতী সংঘের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নূতন মন্ত্রিসভার শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মাধ্যমে অল্প ব্যয়ে যাহাতে সাধারণ শিক্ষা হয়, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়ে, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা হয়—সকল বিষয়েই মন্ত্রীরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বঙ্গ হাইকোর্ট—

ইতিপূর্ব্বে বিচারপতি আক্রামকে পূর্ব্ব বঙ্গ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ৩রা সেপ্টেম্বর মিঃ টি-এচ-এসিন, আমিরুদ্দীন আমেদ ও আমান আমেদকে হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সৈয়দ আলি জাহীর—

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ভূতপূর্ব্ব সদস্য সৈয়দ আলি জাহীর পারস্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আজীবন দেশহিতব্রতী।

স্যাটম চরকা—

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বলগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক স্যাটম চরকা নামে এক অভিনব চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক

দৈর্ঘ্যে মাত্র সাত ইঞ্চি ও প্রস্থে দেড় ইঞ্চি। ইহাতে ঘণ্টায় ৪০০ গজ পর্য্যন্ত সূতা কাটা যায় এবং সূতা ৬০ নম্বর পর্য্যন্ত সরু হয়। ইহার কলকব্জা বিশেষ কিছুই নাই। দীর্ঘকাল ব্যবহারেও ইহা অটুট থাকে। এই চরকার সুবিধা এই যে, যে কোনও স্থানে বসিয়া সূতা কাটা চলে। ঈশ্বর বাবু এই চরকার সমস্ত আর কৃষ্ণনগর (পোঃ হেঁড়্যা জেঃ মেদিনীপুর) গান্ধীভবনের জন্য রাখিয়া থাকেন।

সীমান্ত নেতৃবৃন্দ—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুলগফুর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান সাহেব সরদারিয়া লালকোর্ত্তা শিক্ষা শিবিরে বাস করিতেছেন। তথায় গত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কয়েকদিন লালকোর্ত্তা ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক যুক্ত সম্মিলন হইয়াছিল।

সুখের সংসার

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বিপ্লবী-বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

বিপ্লবী-বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সপ্তাহ অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ৬নং রাজা বসন্ত রায় রোডে, শহীদপল্লে শহীদ স্মৃতি প্রদর্শনীতে এক বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গলার বিপ্লববাদের ধারাবাহিক কাহিনী সঙ্গীতে কথায় রূপায়িত করেন বিখ্যাত বেতারশিল্পী অনিল ভট্টাচার্য ও তারা লাহিড়ী সম্প্রদায়। বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলার গৌরবময় অগ্নি যুগের অনেক্য সাহিত্যিক অনিলকুমার ভট্টাচার্য আবেগময়ী ভাষায় বিবৃত করেন।

আগমনী

ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

ঐ বুঝি উমা এল, ছড়িয়ে দিয়ে রূপের আলো।
মুখখানি ঢল ঢল শতদল হ'তে ভালো।
　　ষড়ানন গণপতি
　　লক্ষ্মী আর সরস্বতী
সিংহবাহিনী মায়ের সাথে এসে ঐ দাঁড়ালো।
　　তনয়ায় নিয়ে বুকে
　　মা'র প্রাণ তাকুলো সুখে ;
ভবানীর হাসিখানি, সুধাবাণী প্রাণ জুড়ালো।
　　আজ কত দিন পরে
　　মুখখানি হাতে ধ'রে
দেখিতে পরাণ ভ'রে আঁখিবারি বাঁধ মানালো।

নবমী তিথি

উমারে নিয়ে সবাই তোরা আনন্দে আজ রইবি মাতি।
গানের সুরে সুরে মা বিরতি উজল ক'রে সকল রাতি।
　　হাসির উৎসে উৎসব রাণী
　　থাক নিরবধি আমার শিবানী,
ঘুমিতে ঘিরিতে চাঁদমুখখানি হেরিয়া কাটাবো রাতি।
　　দেখিস্ যদি রে মায়ের ক্লান্ত
　　প্রান্তি-মলিন বদন কান্ত
দিব রে তখনি বক্ষোপ্রান্ত শয়নের তরে পাতি।
　　কতদিন পরে জননী বুকেতে
　　মা আমার এবে ঘুমায়ে সুখেতে
দিব না নবমী-নিশি পোহাইতে, উষিতে অরুণ ভাতি।

দশমী প্রভাত

গিরিরাজ ! ওগো গিরিরাজ !
আঁধারে লুকালো শশী পোহাইয়া এল নিশি,
আসিছে দশমী ওগো ! হাসিতে মাথার বাজ।
এসেছিল মা আমার তিনটি দিবস তরে,
আছিল ভুবন মোর পুলক হাসিতে ভরে ;
(আজি) সে লবে বিদায়—ঐ বেদনার গান
　　তপোবনে তাপস সবাকু !
নিভে যায় শুকতারা ম্লান গগন গায়—
এসেছিল প্রবোধিতে স্নানমুখী কাতরা মায়—
প্রবোধ কোথায় ? প্রভাতে যে যাবে হায় !
　　মা আমার কৈলাস-নাথ।

বিজয়া—বিদায়ের পর

উমা আমার চলে গেল, এ পুরী আঁধার হ'ল।
ফিরে কতদিন পরে দেখিব মুখ-কমল।
　　সিঁদুর পরায়ে ভালে
　　চুমা খাব দিনু গালে,
দেখেছি বিদায় কালে, আঁখি ছিল ছল ছল।
　　কৈলাস যে শূন্য ক'রে
　　এলো তিন দিন তরে,
কেমনে রাখি ধ'রে নয়ন হবে উতল।
　　ব'লে গেল আঁখি-নীরে
　　দুখিনী এ জননীরে
'ফেরোনো আসবো ফিরে, মুছ মা নয়ন জল।

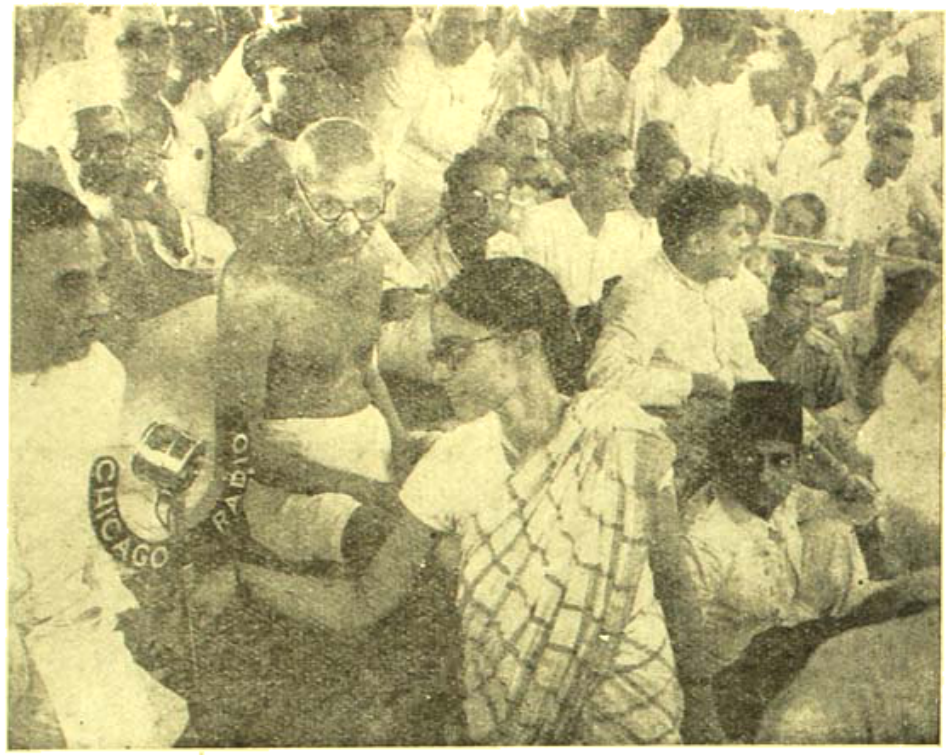

মহাত্মার প্রার্থনা সভায়
মহাত্মাজী
ফটো—পান্না সেন

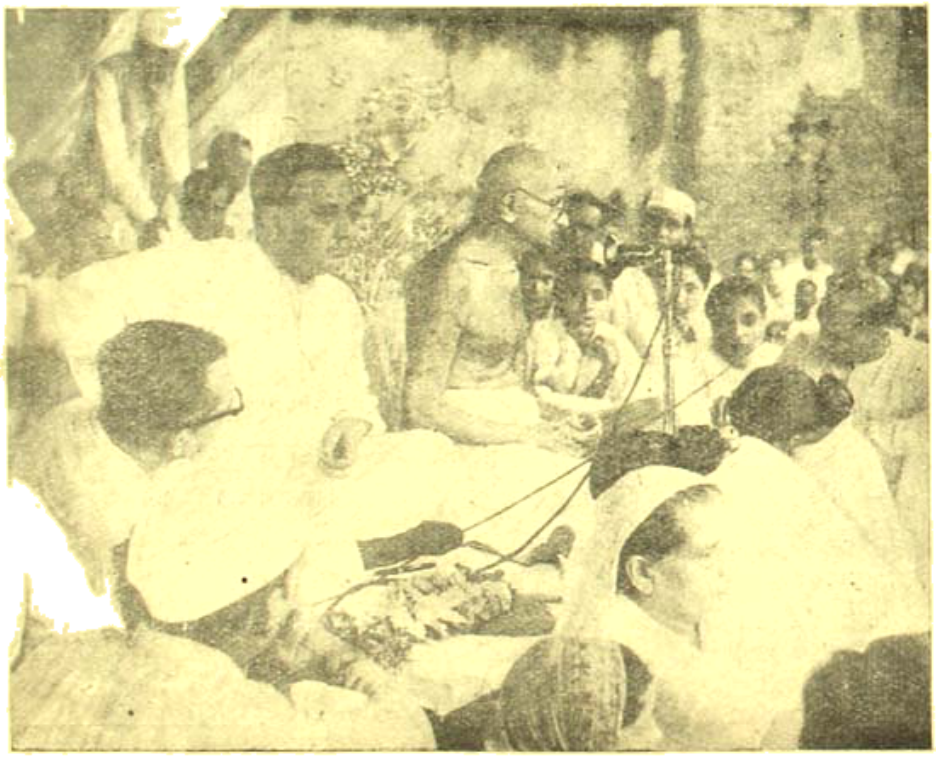

বিদ্যাসাগর কলেজে মহাত্মা গান্ধী
ও মিঃ সুরাবর্দী
ফটো—পান্না সেন

জাতিস্মর

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্‌সি

জীবনের সাথীরূপে বিহঙ্গমাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে যেদিন ঘরে আনলাম—সেদিনে সকলের মুখের মিস্রড-ফিলিং (মিশ্রভাব)এর জন্য আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে। আমার পুত্র সুব্রত তখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। ছোট ভায়েদের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল। একজন ভ্রাতুষ্পুত্রী বিবাহযোগ্যা। এমত অবস্থায় আমাকে দিয়ে একাজ ক'রিয়ে নিয়েছিল—আমার বন্ধু সোমেশ চক্রান্ত ক'রে। তার চেয়ে বড় চক্রান্ত ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চক্রীর। তাই বন্ধুর চায়ের নিমন্ত্রণে সেদিন গিয়েছিলাম। সোমেশ চায়ের টেবিলে তার বোনকে ইন্‌ট্রডিউস্ ক'রে দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বিহঙ্গমাকে বিয়ে ক'রতে বাক্যবদ্ধ হ'য়ে গেলাম। একটা 'হাই ভোল্টেজে চার্জ্জ' করা বৈদ্যুতিক শক্তির মত আমার মন তার প্রতি যেন আকৃষ্ট হ'য়ে গেল। সেদিন বাড়ী ফিরে এসে মাকে ব'লেছিলাম—মা, তোমার কথাটাই ঠিক, পরে ভেবে দেখেছিলাম, সেই জন্যই আমি—ইত্যাদি। মা কিন্তু আমাকে শেষবার এজন্য অনুরোধ ক'রেছিলেন—দশ বৎসর পূর্ব্বে। বলা বাহুল্য, প্রথমা পত্নী সরমার কাছে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম—সে যদি আমাকে অসময়ে ছেড়ে যায়—আমি আর দার-পরিগ্রহ ক'রবো না। তাকে বিয়ে করার পর আমার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিন সুখ-পূর্ণ হ'য়েছিল। বিশ্বনিয়ন্তার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পলকে সব ওলট পালট হ'য়ে গেল। একমাত্র সন্তান সুব্রতকে রেখে সূতিকাগারে 'এক্ল্যামসিয়া' হওয়ায় সরমার জীবন প্রদীপ অকস্মাৎ নিবে যায়।

সুব্রত বালক অবস্থা থেকেই তার সঙ্গ দিয়ে আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিল—বিশেষ চেষ্টা ক'রে। বিহঙ্গমা যত তাকে ছোট পুতুলের মত সম্পূর্ণ করায়ত্তভাবে পেতে চায় এবং আদর ক'রতে চায়—সুব্রত তত তাকে এড়িয়ে চলে। 'উনি' ব'লে সে তার বিমাতার উল্লেখ ক'রে সকলের কাছে। বিহঙ্গমা তাকে প্রথম দেখে অবধি 'বাপ' ব'লে ডাকে। শৈশবে সে নিজের বাপ মাকে হারিয়েছিল। এত স্নেহ ও ভালবাসা—সপত্নী পুত্রকে কেউ ক'রতে পারে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না—যে চোখে না দেখেছে। প্রথম প্রথম সকলেই "মায়ের চেয়ে বেশী" ইত্যাদি বচন অনুযায়ী সন্দেহ প্রকাশ করেছিল—বিহঙ্গমার বাড়াবাড়ি দেখে। বিহঙ্গমা ক্রমশঃ সকলকে কিন্তু স্নিগ্ধ ক'রে নিল অল্প সময় মধ্যে।

এ বাড়ীর কুড়ি বছর পূর্ব্বেকার অবস্থা আর ঘটনা সম্বন্ধে বিহঙ্গমার অনেক ধারণাও জ্ঞান—আশ্চর্য্যজনকভাবে সঠিক কি ক'রে হ'য়েছিল—সেটা দুর্বোধ্য ছিল তার। ছাতের কুঠুরি ঘরের মধ্যে একটা কেউটে সাপ মারা হ'য়েছিল। আমার ছোট ভায়ের হাতের দাগটা গরম ঘিয়ে ছাঁকা লাগার দাগ, কুঁয়াতলায় যেখানে গোবর হ'য়েছে—সেখানে অনেক আগে কলাবাগান ছিল, আমার সেজভাই ছেলেবেলায় খুব আল খেত—প্রভৃতি কি ক'রে তার পক্ষে জানা সম্ভব তা' আমরা সমাধান ক'রতে পারতাম না। কোন সূত্রে সে এসব জেনেছিল, তা সে নিজেও মনে ক'রে ব'লতে পারত' না। আমার পৌরাণিক ও আধুনিক পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে অনেক খুঁটি নাটি তথ্য বিহঙ্গমার নখদর্পণে ছিল। সে আমাকে একদিন চিন্তোত্থিতভাবে প্রশ্ন ক'রলে, দিদির কাছে তুমি কথা দিয়েছিলে আর বিয়ে ক'রবে না—তবে আবার কেন বিয়ে ক'রলে? কথা দেওয়ার কথা—তাকে আমি বলি নি, সে কি ক'রে জান্‌লো? সে কথার আলোচনা এড়িয়ে আমি ব'ললাম—তোমাকে দেখে। সে উত্তরে সে খুসী না হয়ে ব'ললে—পুরুষেরা ওই রকমই। একদিন বিহঙ্গমা আমাকে ব'ললে—হাজারীবাগ সহরে বড়মুখাজ্জীর আগের জন্মে তাদের বাড়ী ছিল। তার এক ছোট ভাইয়ের নাম ছিল মুক্তো। নেংড়ি ব'লে এক ঝি তাদের দুভাইবোনকে মানুষ ক'রেছিল। মুক্তো ছিল সরমার ভাইয়ের নাম। সে সরমার মৃত্যুর পর মারা যায়। এসকল সংবাদ বিহঙ্গমার জানার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বিহঙ্গমা আগের জন্মে

সহসা ছিল এবং পূর্ব্বজন্মের কথা তার মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে মনে প'ড়ে যায়—এ বিষয় আমার আর কোনও সন্দেহ থাকলো না। তাকে একথা কিছু জানতে দিলাম না। সুব্রতকে তার গর্ভধারিণীর হাতে সঁপে দিতে পারার সম্ভাবনায় আমার মন পুলকে ভ'রে গেল। বিহঙ্গমা কিছু বুঝলো না। আমিও কাকেও কিছু ব'ললাম না।

বিহঙ্গমা আমার সকল প্রয়োজনের ভার নিয়েছে দেখে সুব্রত স'রে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশঃ সে যেন দূরে দূরে স'রে যাচ্ছে। বিহঙ্গমা কিন্তু তার সকল ভাবিক্রিপনা তুড়িতে উড়িয়ে দেয়। কোনও আমল দেয় না তার গৌরব বা গাম্ভীর্য্যকে। সে মা—সুব্রত তার ছেলে। কোনও ব্যবধান তাদের মাঝখানে সে থাকতে দেবে না—থাকার কথা ভাবতে পারে না। তার উষ্ণ বুকে ওকে চেপে শিশুর মত চট্‌কাতে পেলে সে তিনদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রতে রাজী আছে, এ কথা 'গ্যারাণ্টি' দিয়ে বলা যায়। স্নেহের শাসন, ধমক প্রভৃতি সে তার ওপর দরকার মত চালায়, কিন্তু সুব্রতর বিমাতার সঙ্গে সম্পর্ক 'উনি'র চেয়ে আর অগ্রসর হয় নি। আর ঠাকুমা ও কাকিমারা মজা দেখেন এবং ছেলের বুড়োমি ও গাম্ভীর্য্য দেখে হাসেন। ওকে শাসন করার খুব প্রয়োজন হ'ত না, আসকেরও অভাব ছিল না। ঠাকুমা, কাকা ও কাকীমাদের যথেষ্ট সম্মান ও ভয় সে ক'রত। বিমাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে বিহঙ্গমাকে সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল না। আমি সেজন্য ওর বিষয়ে নানা কারণে নির্লিপ্ত থাকতাম।

'ইণ্টার্ মিডিয়েট্' পাশ ক'রে, সুব্রত কাকেও কিছু না ব'লে 'আর্-আই-এন্-এ 'ক্যাডেট্‌শিপ্ ট্রেনিং'এর জন্য 'ওপ্'সই ক'রে বাড়ীতে জানাতে যেদিন এল—সেদিন হঠাৎ বুঝলাম—ওর প্রতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ত্রুটি হ'য়ে গেছে। বিহঙ্গমা অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে তাকে হুকুম ক'রলে—ঠাকুমা, কাকা ও কাকীমাদের কাছ থেকে অন্যায় কাজ করার জন্য ক্ষমা চেয়ে এসো আমার কাছে—আমি কাণ ছিঁড়বো তোমার। তার ছোট কাকা রাগের মাথায় তাকে উত্তম মধ্যম দু'ঘা দিয়ে দিলো—এবং বিহঙ্গমার আদেশ পালন ক'রতে কঠিনভাবে আদেশ দিলে। সুব্রত সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিমাতার কাছে গেল। বিহঙ্গমা তাকে ব'ললে—আমার এ বাড়ীর ভাত বন্ধ হ'য়ে গেল। আমি এখানে আর কুটো মুখে দিতে পারবো না। আজই চ'লে যাচ্ছি। তুমি 'বও' ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো। তার জন্য যা খেসারৎ লাগে, কাকারা ব্যবস্থা ক'রবে।

আপনি চলে গেলে বাবাকে কে দেখবে?—সুব্রত ব'ললে। বিহঙ্গমা কঠিন স্বরে ব'ললে—তুমি আগে যেমন-ভাবে দেখতে, তেম্‌নিভাবে।

তা কি ক'রে হয়, মা—সুব্রত ব'ললে। বিহঙ্গমার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় সুব্রতর মুখে 'মা' ডাক শুনে বিভ্রান্ত হ'য়ে গেল। সে ব'লল—কি ব'ললে? সুব্রত কিছু না বুঝে আরও কোমল স্বরে ব'লল—আপনি চলে গেলে বাবার বড় কষ্ট হবে যে মা।

বিহঙ্গমা মাতৃ সম্বোধনে সুখের আবেগে বিহ্বল হ'য়ে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে গেল। গোলমালের শব্দে কাছে গিয়ে দেখি সুব্রতর কোলে বিহঙ্গমা মাথা রেখে অচৈতন্য অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে এবং সকলে তার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা ক'রছে। তার মুখ দেখে মনে হ'ল—অবচেতন অবস্থার মধ্যে সে যেন কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছে—হয় ত' পূর্ব্বজন্মের আরও কোনও স্মৃতি তার মানসপটে প্রতিফলিত হচ্ছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেট ঃ

ভারতীয় ক্রিকেটের জন্মকাল খুব বেশী দিনের নয়। জানা যায়, ১৭৯৩ সালে প্রথম কলকাতায় যে ক্রিকেট খেলাটি হয়েছিল তাই নাকি ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ। তাহলেও বোম্বাইকে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্মভূমি বলা হয়। প্রথমে পার্শিরা ক্রিকেট খেলায় বিশেষ উৎসাহ দেখায় এবং দক্ষতা লাভ করে। ১৮৭৮ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পার্শি ক্রিকেট দলই হ'ল প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল। হিন্দুর মধ্যে প্রথম ক্রিকেট খেলেছিলেন রামচন্দ্র নাভালকার ১৮৬১ সালে। এর পাঁচ বছর পর ১৮৬৬ সালে বোম্বাইয়ে হিন্দু ইউনিয়ন নামে একটি ক্রিকেট দল গড়ে উঠে। ভারতীয় দলের মধ্যে পার্শি দলই ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম ক্রিকেট খেলবার দুঃসাহস দেখায়। ১৮৮৬ সালে ইংলণ্ডগামী প্রথম পার্শি দল মোট ২৮টি ম্যাচ খেলে মাত্র একটি খেলায় জয়লাভ করে—ব্যাটসফিল্ডের নরম্যানহার্স টের দলে। প্রথম দলের হার হয় উনিশটী ম্যাচে, ড্র হয় আটটা ম্যাচ। ১৮৮৮ সালে, দ্বিতীয় পার্শি দল খ্যাতনামা বোলার ডক্টর প্যাভরির অধিনায়কত্বে পুনরায় ইংলণ্ডে খেলতে যায়। এবারের ফলাফল অনেক ভাল হ'ল। মোট ৩১টী খেলায় ৮টা জয়, ১১টা হার, ড্র ১২টা খেলায়। ইংলণ্ড থেকে প্রথম ইংরেজ দল ভারতবর্ষে খেলতে আসে ১৮৮৯-৯৯ সালে জি এফ ভার্ণোনয়ের (G. F. Vernon) অধিনায়কত্বে। এই দলটি মোট ১৩টা ম্যাচ খেলে ১০টায় জয়লাভ করে, ২টো খেলা ড্র করে এবং দ্বিতীয় পার্শি দলের কাছে তারা একটী ম্যাচে ৪ উইকেটে হেরে যায়। পার্শিদের বিজয় গৌরবে ভারতবাসী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করলো।

১৮৯২-৯৩ সালে দ্বিতীয় ইংরেজ দলকে ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন লর্ড হক। মোট ২৩টা খেলায় তাদের জয় ১৫টায়, ড্র ৬টায় হ'ল, হার হ'ল দুটো খেলায়—পার্শিদের কাছে ১০৯ রানে ও বিজয়-ওয়াণ্ডারার্স দলের কাছে সাত রানে। এদিকে ঐ বছরেই ভারতবর্ষের কুমার রণজিৎ সিংজী ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট খেলায় 'কেম্ব্রিজ ব্লু' পেলেন। এ সংবাদে ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ দারুণ উৎসাহিত হ'ল।

১৯০২-৩ সালে কে জে কি-র (K. J. Key) তত্ত্বাবধানে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি অথেনটিক্স্ নাম নিয়ে তৃতীয় ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড় দল ভারতবর্ষে খেলে গেল। ইংরেজদের হার হ'ল পুনরায় পার্শিদের হাতে আর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাছে। বাকি ১২টা খেলায় জয় এবং ৫টা খেলা ড্র গেল।

সর্ব্বদল সম্মিলিত প্রথম ভারতীয় দল ইংলণ্ডে খেলতে যায় ১৯১১ সালে পাতিয়ালা মহারাজার অধিনায়কত্বে। মোট ২৩টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দলের জয় হ'ল ৬টায়, হার ১৫টায় আর ড্র গেল ২টো খেলা। এই সময়েই ভারতবর্ষে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলার অভ্যুদয় হ'ল। সজ্ঞবদ্ধভাবে ক্রিকেট খেলার অনুশীলন আরম্ভ হ'ল এই সময় থেকেই।

তারপর দীর্ঘ পনের বছর পর ১৯২৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব, পৃথিবীর লোকের কাছে যে ক্লাব এম সি-সি নামে পরিচিত, ভারতবর্ষে সরকারীভাবে

ক্রিকেট খেলতে এসে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাস পৃষ্ঠায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। এ দলের ক্যাপটেন ছিলেন A. E. R. Gilligan। মোট ৩৪টি ম্যাচের মধ্যে এম-সি-সি জয়ী হয় ১১টা খেলায়, কোন ম্যাচ হার হয়না, ড্র যায় ১১টা। বোম্বাইয়ের বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ খেলাটি ড্র যায়।

১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং খেলার প্রসারকল্পে একটি শক্তিশালী Central Bord of Control প্রতিষ্ঠা। হ'ল এই ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনায় ১৯৩২ সালে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব ভারতীয় বাছাই দল ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলতে যায়। পোরবন্দরের মহারাজা ক্যাপটেন হয়ে গেলেন। দলে ছিল আঠারোজন খেলোয়াড়। তারা মোট ২৬টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ খেলে ৯টা খেলায় জয়ী হয়, হারে ৮টায়, ড্র যায় ৯টা খেলা। এছাড়া আরও ১২টা ম্যাচ খেলেছিল। মোট ৩৮টা খেলার মধ্যে জয় ১৩টায়, হার ৯টায়, ড্র যায় ১৬টা ম্যাচ। শেষ পর্য্যন্ত ২টো খেলা হয় নি। ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের পারদর্শিতার বহর দেখে ইংলণ্ড ভারতীয় দলকে ঐ বছর প্রথম টেষ্ট ম্যাচে নিমন্ত্রণ করলো। নাইডু ক্যাপটেন হ'লেন ভারতীয় দলের, ওদিকে ইংলণ্ডের ক্যাপটেন হ'লেন জার্ডিন। ইংলণ্ড ১৫৮ রানে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করলো।

১৯৩৩-৩৪ সালে ডি আর জার্ডিনের নেতৃত্বে শক্তিশালী খেলোয়াড় নিয়ে দ্বিতীয়বার এম-সি-সি দল ভারতে খেলতে এল। মোট ৩৪টি খেলায় এম-সি-সি জয়ী হ'ল ১৭টায়, ১টা ম্যাচ হেরে ড্র করলো ১৬টা ম্যাচ। এম-সি-সি বেনারসে ভিজিয়ান গ্রাম একাদশ দলের কাছে ১৪ রানে হেরে যায়। এম-সি-সি বনাম ভারতীয় দলের মোট তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ক'লকাতায়। প্রথম দুটী খেলায় এম-সি-সি জয়ী হয় যথাক্রমে ৯ উইকেট এবং ২০২ রানে। কলকাতার টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়। বোম্বাইয়ে টেষ্ট খেলায় লালা অমরনাথ ১১৮ রান ক'রে ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় নতুন রেকর্ড করলেন। এর পূর্ব্বে ইম-ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় কোন ভারতীয় খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

১৯৩৬ সালে দ্বিতীয় সর্ব্বদলীয় ভারতীয় দল ইংলণ্ডে খেলে আসে। ক্যাপটেন হ'য়েছিলেন ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা। ২৮টি প্রথম শ্রেণীর খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ জয়ী হয় ৪টি খেলায় আর ড্র ও হার হয় যথাক্রমে ১২টি খেলায়। ইংলণ্ডের সঙ্গে তিনটি টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ হয়। লর্ডসের প্রথম টেষ্টে এবং ওভালের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড উভয় ক্ষেত্রেই ৯ উইকেটে জয়ী হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ড্র যায়। ভারতীয় দলের পক্ষে এই অভিযানে সেঞ্চুরী করেন—মান্তাক আলি ৪, অমরনাথ ৩; ভি এম মার্চ্চেণ্ট—৩; এস ওয়াজির আলি এবং দিলওয়ার হোসেন—২, বাকাজিলানী, সি রামস্বামী এবং এস পি জয় যথাক্রমে—১। টেষ্ট খেলায় মাত্র দু'জন ভারতীয় সেঞ্চুরী করেন—মান্তাক আলি ১১২ রান এবং ভি এম মার্চ্চেণ্ট ১১৪ রান দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায়।

১৯৩৪-৩৬ সালে প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে খেলতে আসে। এই দলটির ক্যাপটেন ছিলেন জে রাইডার। মোট ২৩টি খেলায় তারা ১১টায় জয়ী হয়, হারে ৩টে খেলায়, ৯টা খেলা ড্র যায়। অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে ৪টি বে-সরকারী টেষ্ট ম্যাচ খেলেছিল। প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ৯ উইকেট এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ান দল জয়লাভ করে। ভারতীয় দল তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট খেলায় যথাক্রমে ৬৮ রান এবং ৩২ রানে জয়ী হয়।

১৯৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল এ এল হ্যাসেটের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল। অষ্ট্রেলিয়ান দল মোট ৯টি খেলায় জয়ী হয় ১টিতে, হারে ২টো খেলায় আর বাকি ৬টি খেলা ড্র যায়। এই মোট খেলার মধ্যে তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়। বোম্বাই এবং ক'লকাতায় প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়। মাদ্রাজের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে 'রবার' পায়।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সম্পাদকের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৭ই অক্টোবর ক'লকাতা থেকে বিমানপথে অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের পার্থের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু

তা সম্ভব হয়নি। রওনা হ'তে দু'দিন দেরী হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া অভিযান শেষ হবে। সর্ব্বসমেত ভারতীয় দল পাঁচটি 'টেষ্ট ম্যাচ' খেলায় যোগদান করবে। এই দলের সঙ্গে বিখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রিন্স দিলীপ সিংজী রয়টার সংবাদ পরিবেষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে ভ্রমণ করে খেলার বিবরণ এবং সমালোচনা পরিবেষণ করবেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট অসুস্থতার জন্য এ দলের খেলায় যোগদান করতে সক্ষম হবেন না, তার স্থানে অমরনাথ ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছেন। ভি এম মার্চ্চেণ্ট যে অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে যোগদান করতে পারবেন না তা ইতিপূর্ব্বেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু যাত্রার শেষ সময়ে মুস্তাক আলি, আর এস মোদী এবং কমল ভাদুড় এই তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে যোগদানের অক্ষমতা জানান। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ আশা পোষণ ক'রছিলেন তাঁরা খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন। এই চারজন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পরিবর্ত্তে সাবতাতে, ক্যাপ্টেন রায় সিংহ, রঙ্গচারী এবং রণবীর সিংহজীকে দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তারযোগে তাঁদের এই নির্ব্বাচন ফলাফল জানানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই চারজন খেলোয়াড় এডিলডে ভারতীয় দলের সঙ্গে দশদিন পর মিলিত হবেন। উপস্থিত এগারজন খেলোয়াড়, ম্যানেজার এবং প্রিন্স দিলীপ সিংহজী সমেত এই ভারতীয় ক্রিকেট দলটি আকাশপথে অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। দলের মধ্যে কালীঘাট ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড় পি সেনই একমাত্র বাঙ্গালী। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি তিনি বিদেশে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের সম্মান বর্দ্ধিত করবেন। এই সঙ্গে আমরা সমগ্র দলকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

গত ৪ঠা অক্টোবর ক্যালকাটা মাঠে আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনাল খেলার কথা ছিল কিন্তু এক অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য শেষ পর্য্যন্ত আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ খেলাটি ঐদিন বন্ধ রাখাই উচিত মনে করেন। ঘটনার প্রকাশ, আই-এফ-এ অফিস কর্ত্তৃক সংবাদপত্রে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জনসাধারণ জানতে পারে যে, এবছর আই-এফ-এ অফিসে ঐদিনের খেলার কোন টিকিট সাধারণকে বিক্রী করা হবে না। ফলে বেশী টিকিটের আশা ক'রে সকাল ১০টা ১১টা থেকেই মাঠে জনসমাগম হয়। বেলা ২টার সময় নাকি টিকিট ঘর খোলার কথা ছিল। কিন্তু তা আড়াইটায় খোলা হয় এবং তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গেট বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘোষণা করা হয় আর জায়গা নেই সুতরাং টিকিট বিক্রী বন্ধ। পূর্ব্বাহ্নেই টিকিট বিক্রী ক'রে মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের জন্য যে সমুদ্র গ্যালারীর আসন রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। সেই শূন্য স্থানের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি পড়ে এবং টিকিট বিক্রেতা ও গেট রক্ষকদের কথায় বিশ্বাস না ক'রে এক শ্রেণীর দর্শক জোর ক'রে গেট খুলে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে ময়দানে মানুষের যে লম্বা সারিগুলি সুশৃঙ্খলভাবে তৈরী হয়েছিল বিশৃঙ্খল অবস্থায় মাঠে ঢুকে পড়ে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের শূন্য আসনগুলি দখল করে নেয়। উল্লিখিত দুই দলের সভ্যদের অগ্রিম টিকিট বিক্রী করার ফলে আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সভ্যদের খেলা দেখবার স্থান দিতে বাধ্য ছিলেন কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ খেলাটি স্থগিত রাখাই উচিত বিবেচনা করেন এবং যাঁরা টিকিট ক্রয় করেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করেন যে, পরে ফাইনাল খেলা পরিচালনা সম্ভব হ'লে ঐ টিকিটেই তাঁরা খেলার ময়দানে প্রবেশ করতে পারবেন আর একান্তই খেলা না হলে টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেবেন। এই ঘোষণা এক শ্রেণীর দর্শকদের মনঃপূত না হওয়ায় ঐ দিনই ফাইনাল খেলায় বাধা ক'রে তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করে ও খেলার মাঠের চেয়ার টেবল ভেঙ্গে ফেলে, ক্যালকাটা মাঠের তাঁবু লুটো ক'রে দেয়। গোলমালের শুরু থেকেই পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ করজোড়ে ঐ শ্রেণীর জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে প্রহৃত হ'ন। শেষে অবস্থা চরমে পৌছলে কাঁদুনে গোঁয়া এবং গুলি চালানোর আদেশ দেন। এ ঘটনায় পুলিস এবং জনতার মধ্যে কয়েকজনকে অল্পবিস্তর আহত হ'তে দেখা যায়। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটির সমস্ত দিক বিচার ক'রে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ এবং মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যাঁরা সেদিন লজ্জাকর ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন তাঁরাও লজ্জাবোধ করবেন এবং শঙ্কিত হবেন। প্রখর রৌদ্র এবং বৃষ্টি মাথায় পেতে নিয়ে যে দর্শকমণ্ডলী ফুটবল খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলার জনপ্রিয়তা প্রচার করেন এবং খেলোয়াড়দের খেলায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন তাঁদের চরম দুর্গতির প্রতি আমরা সর্ব্বদাই সহানুভূতিশীল। একথা খুবই সত্য, দর্শক ব্যতিরেকে খেলার সার্থকতা বজায় থাকে না। কিন্তু সকল শান্তিকামীর বক্তব্য, আই-এফ-এর কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধে দর্শকশ্রেণীর যে অভাব অভিযোগের কথা সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়েছে তার প্রতিকার পদ্ধতি কি অন্যভাবে করা যেত না? দর্শকশ্রেণী যদি এইটুকু অনুভব করতে পেরে থাকেন যে, দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে অন্যায়, অত্যাচার এবং অবিচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে তাহ'লে স্বাধীন দেশের জনসাধারণ যেভাবে অন্যায়

অত্যাচার দূরীকরণে অগ্রসর হয় ঠিক সেই পন্থা অনুসরণ করাই কি এক্ষেত্রে শ্রেয় ছিল না? অন্যায় কার্য্য দ্বারা কখনও অন্যায়ের প্রতিকার যে হয় না পৃথিবীর ঘটনাপঞ্জিকা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমাদের সমাজ দেহে যদি এই ভুল-নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে ঐ দিন মাঠে যে এক শ্রেণীর দর্শক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা তাদের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের দাবী জানিয়েছিলো ঘটনাচক্রে তাদেরই অপর এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতার সম্মুখীন হতে হবে। আজ যাঁদের উপর দেশের শাসন ভার অর্পিত হয়েছে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি সজাগ আছে। জনসাধারণ যদি তাঁদের অভাব অভিযোগগুলি শাসন কর্ত্তাদের গোচরীভূত না ক'রে নিজেরাই অপর আর এক বে-আইনী কাজ দ্বারা তার প্রতিকার করতে অগ্রসর হন তাহ'লে শাসন ব্যবস্থায় এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ফাইনাল খেলার দিন এক শ্রেণীর জনসাধারণ যদি অন্যায়-ভাবে সভ্যদের বিশাল আসনগুলি অধিকার না করতো তাহলে খেলা না হওয়ার পক্ষে কোন বাধা সেদিন ছিল না।

সব কাজেরই একটা সীমা আছে। মাঠের যা আয়তন তাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের স্থান দেওয়া যেতে পারে, তার বেশী সম্ভব নয়। ঐ দিন দর্শকশ্রেণীর যে এক অংশ অন্যায়ভাবে অপর দর্শকদের স্থান জুড়ে বসে একদলের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল তাদের স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে বলি যদি তারাই ঐ দিন টিকিট কিনে মাঠে ঢুকতে পেত আর মাঠ ভর্ত্তি হওয়ার দরুন যে অবশিষ্ট দর্শক মাঠে প্রবেশ করতে পারতো না তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কি তারা মাঠ ত্যাগ ক'রে আসতো? ফাইনালে এ বছর দুটী প্রবল শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় দল উঠেছিল বলেই টিকিটের এত চাহিদা, বিরাট জনসমাগম। কিন্তু দর্শকদের চাহিদা মিটানোর মত মাঠের আয়তন ছিল না। আই এফ এ-র খেলা পরিচালনা ব্যাপারে যদি জন-সাধারণের অভিযোগ থাকে তাহলে সংঘের পুলিস কমিশনার এবং প্রধান মন্ত্রীর নিকট তা জানিয়ে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করাই শোভন হবে। জনসাধারণের হতাশ হবার কারণ নেই, কারণ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই বহু সমাজবিরোধী কাজের মূলোৎপাটন ক'রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। গভর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের সহযোগিতা করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আই-এফ-এর কর্তৃপক্ষ মহলকে আমাদের কিছু বলবার আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে সমস্ত অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে আমরা আশা করি তাঁরা নিজেরাই তার প্রতিকার করবেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলা ঃ

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক পরিচালিত আন্তঃ-প্রাদেশিক ফুটবল টুর্ণামেণ্টের মোট এগারটি দল এই এবছর যোগদান করেছে। প্রথম রাউণ্ডের খেলা: (১) আসাম বনাম হায়দ্রাবাদ; (২) বিহার বনাম উড়িষ্যা; (৩) মাদ্রাজ বনাম দিল্লী।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে: ১নং বিজয়ী বনাম মহীশূর; ২নং বিজয়ী বনাম ডবলউ আই এফ আই (বোম্বাই); ৩নং বিজয়ী বনাম আই এফ এ (ক্যালকাটা); যুক্তপ্রদেশ বনাম ত্রিবাঙ্কুর।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনিরুপমা দেবী প্রণীত উপন্যাস "ছায়ার আলো" (২য় খণ্ড)—৩৲

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "নূতন আলো"—১৲

শ্রীহেমেন্দ্রবিহার সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বিচিত্রাও ব্যাঙ্ক মিষ্টি"—১৷৹

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "উপনিষদ" (২য় খণ্ড)—২৲

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "যাত্রী"—১৷৹

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হিন্দু মুসলমান" (১ম পর্ব্ব)—৩৲

বন্ধে আলি মিঞা প্রণীত উপন্যাস "ঘূর্ণি হাওয়া"—২৲

স্বামী বিবেকানন্দ গিরি প্রণীত "উপনিষদের কথা"—৩৷৹

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "জীবনের জয়গান"—২৲

শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত প্রণীত "অজানা দেশে"—৸৹

রেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত রাষ্ট্রভাষা প্রচার পুস্তকমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ "প্রাথমিক অনুবাদ-শিক্ষা"—৷৵৹

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তিলিসিয়াম"—৷৹

কবিরাজ হেমচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত "Voice of Ayurveda"—১৲

সুভাষচন্দ্র বসু প্রণীত "Dreams of a Youth"—৷৵

"In Quest of the New"—৷৵

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মহাকাব্যে উপেক্ষিতা—উর্ম্মিলা।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নীহারঞ্জন সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষ

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শহিদ্-স্মরণে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(স্বাধীনতা-দিবসে)

বহু সাধনায় বহু বেদনার ধন
স্বাধীনতা, তোমা যৌবনে বরি এ অঙ্গে।
এসেছ মূর্ত্ত জীবন-মরণ-পণ,
এখনো রক্ত ঝরিছে তোমার অঙ্গে।
বন্দিতে তোমারে স্মরি আজি তাহাদেরে
স্মরি সেই সব শহিদ যবেশ-ভক্তে,
যাহারা তোমার উষসের গগনেরে
অরুণ করিয়া দিয়াছে হৃদয়-রক্তে।
তাদের আত্মা নীহারিকাগুলি মিলে
শুকতারা হ'য়ে জাগিল গগন প্রান্তে,
অরুণোদয়ের আগেই যা তিলে তিলে
তরল করিল অমানিশীথের ধ্বান্তে।
তোর না হ'তেই তোদের সাথীরা আসি'
তোদের খবর জানাল কাকলী ছন্দে,
প্রথম অর্ঘ্য আজি তাহাদের লাগি'
মুক্ত যারা ক্রূর কিরাতের শরবন্ধে।

কত বিদ্রূপ কত নিগ্রহ জ্বালা
শত লাঞ্ছনা করিল যা তারা গণ্য,
কণ্ঠে পরিল ঘৃণের জবার মালা
আজিকার জয়মাল্য তাদেরি জন্য।
সেই মালিকাটি দুহাতে তুলিয়া ধরি
ঊর্দ্ধে চাহিয়া স্মরি সেই বীরবর্গে,
এই শুভদিনে অশ্রু পড়িছে ঝরি'
জানি না তাহারা আছে কোন সুর স্বর্গে!
যদি ত ও কেশ তাদেরি চিতার ভূমে
অঙ্গে তোমার তাদেরি অস্থি-চূর্ণ,
স্বাধীনতা, তোমা বরি এ বসুধূমে
তাদের কামনা আশা কর তুমি পূর্ণ।
জীবনের চেয়ে মরণের মানিল বড়
ব্রতের খাতিরে যাহারা আছে ব্রতী যীশু,
সে ব্রত তাদের পূর্ণ সফল কর
তাতেই তাদের আত্মাও হবে দ্রুত।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব যেমন এক অসাধারণ ঘটনা, দার্শনিক জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের উদ্ঘাটনও তেমনি এক অনন্যসাধারণ ব্যাপার। ইহা আমাদের বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে দার্শনিক সমাজে আখ্যায়িত করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্দ্ধ সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই রমণীয় দর্শনশাস্ত্রটির আশানুরূপ অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থাই হইল না। এতদিন যেখানে যতটুকু বা ছিল, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাহাও শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

অথচ, অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ লইয়া পশ্চিম ভারতবর্ষে যতদূর আলোচনা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে তদনুপাতে কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ, বৈষ্ণব সাহিত্য, প্রেমধর্ম, লীলাপ্রসঙ্গ ও নাম-মহিমা সম্বন্ধে আলোচনার বরং দিন দিন প্রসারই হইতেছে; ইহা খুবই উৎসাহ ও আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই; কিন্তু যে দার্শনিক ভিত্তির উপর এই ব্রহ্মাণ্ডেও দুর্লভ শ্রীরসলীলাটি বিলসিত হইয়া ভক্তকবিকে কৃতার্থ করিয়াছে, সে বিষয়ে তাদৃশ আলোচনা হইতেছে বলিয়া তো মনে হয় না।

রসজ্ঞশ্রী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ বলিয়া বুঝিলেই কবিরাজের এই আগ্রহময়ী কৃপার ধরিধারী যাইতে হয়। কারণ এই দার্শনিকসিদ্ধান্তটি না বুঝিলে, বৈষ্ণবের সাহিত্য বল, কীর্তন বল, আর নাম প্রচারই বল,—তাহার মূল উৎসটির সন্ধান অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। সুতরাং একথা আমাদিগকে মানিয়া লইতেই হইবে যে, কি সাহিত্য, কি পদাবলী, কি রসকীর্তন—পাঠ-কথকতা ব্যাখ্যা-বক্তৃতার তো কথাই নাই,—এ সব কিছুরই মূল হইল—আমাদের প্রাণপ্রিয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন।

এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে বাঙ্গা কিছু লিখিব, যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে যাইব,—এমন কি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস যে কোন পদকর্ত্তার কোন একটি পদে একটি অক্ষরও 'আখর' বসাইতে যাইব, অমনি হয়ত বা তাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধই হইয়া পড়িবে। বড় বড় কীর্তন-গায়কেরা পূর্ব্বে তাই রসশাস্ত্রটি ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিতেন। রসশাস্ত্রে প্রবীণতা লাভ না করিয়া শুধু কণ্ঠরাগুরোর পুঁজি লইয়া তখন কেহই রসজ্ঞ সমাজে পদকীর্তন করিতে সাহসী হইতেন না। কীর্তন শুনিবার শ্রোতাই কি আবার সাধারণ থাকি? শ্রীহরিস্মরণে যদি যাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ রসবিভাবিত, যুবরাজ ও প্রাণেশ্বরীর বিলাসকলায় যাঁহারা নিত্য কুতূহলী, মধুরকোমলকান্তপদাবলী শ্রবণে তাঁহারা ব্যতীত অন্য যা কাহার অধিকার থাকিতে পারে? সংসার তাপনাবর্ত্তাড়িত কামাদিরিপুবশম্বদ অন্ধবাধিবদ্ধ জীবনিচয়ের প্রতি করুণাময় ঠাকুর জয়দেব তাই না সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।

একটি দিনের পঞ্জিকা চিত্র উপস্থাপিত করিব।

প্রভু সীতানাথের আবির্ভাব মহোৎসব। শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীশ্রীমদন-গোপালের মাটামন্দিরে সারাদিন আনন্দের বন্যা বহিতেছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের গান হইবে। সারা শান্তিপুরে উৎসবমুখরতার সীমা নাই। সন্ধ্যারতির পর স্বয়ং প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী মহোদয় সকলে কীর্ত্তন শুনিতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শনের পরমাচার্য্য মদনগোপাল প্রমুখ প্রবীণ প্রভুসন্তানগণ শ্রোতা, আর রসশাস্ত্রপ্রবীণ পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনীয়া। মৃদঙ্গ বশিয়ার মধুর নিক্কণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনীয়ার সুরব্রহ্ম এক মাধুর্য্যময়ী পটভূমিকা রচনা করিতেছেন। গৌরচন্দ্রিকার আকুল আহ্বানে প্রভু সীতানাথের সাধনকুঞ্জে মদনগোপালকে প্রকটান্বিত করিবার প্রাচীন স্মৃতি আর একবার ভক্তচিত্তে সমুদ্ভাসিত হইল। ভক্ত ভাবুক শ্রোতার প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত নয়নপ্রান্ত হইতে প্রেমবন্যাকিনীর মূলধারা ক্ষরিত হইয়া শত শত অন্তরঙ্গ হৃদয়কেও যেন সরস করিয়া তুলিল। মানবজীবন যেন কৃতার্থ হইল।

অন্য লোকে দেখিল—একজন কীর্ত্তনীয়া উচ্চৈঃস্বরে অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, আর বৃদ্ধ গোস্বামী 'ভাবকালি' করিতেছেন; কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবান্, যাঁহারা ভাগবত সঙ্গে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি দেখিলেন? ভাববিভাবিত মানসনয়নে তাঁহারা দেখিলেন—কীর্ত্তনীয়ার চিত্ত যেন ভূলোক দ্যুলোক ছাড়াইয়া—এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উদ্ভেদ করিয়া ভাবদেহে গুরুরূপা সখীর অনুগা হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। যেন অপ্রাকৃত নবঘনে সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে অপ্রাকৃত নবীন-মদনের নিরন্তর কামকলীবিলসতা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। যেন মুরলীরন্ধ্রের মধুর অধরে মুখিমনোহারি মধুর মুরলী নিষ্কম্পিত হইতেছে। যমুনা উজান বহিতেছে। মধুর মধুরী নয়নাভিরামে মূর্ত্তা করিতেছে। শুক সারিকা কদম্বশাখায় রাধামাধবের গুণগান গাহিতেছে! গোপবধূদারী অভিসারচঞ্চলা। কতক্ষণে কুঞ্জে তাদৃশ মিলন করিবেন—উৎকণ্ঠায় আর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—সঙ্কেত

যাদী ঐ—ঐ বুঝি আসিয়া যাইল উটিল! মূলপর্ব্ব পর্ব্বতের গুহায় রাধা অপসারিত করিয়া রাধারাণীর মানভঞ্জনিনী প্রার্থনিসমক্ষে যাইব-চলনা। সংকেতবংশী বাজিয়াই চলিয়াছে। শ্রবণ যেন মুগ্ধই মান করিয়াই রাখিয়াছে—মাঝে মাঝে! মুখাম্বুজ মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিফলিত হইতেছে—মাঝে মাঝে! আর কি মরীনা কিশোরীর ঘরের ভিতরে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব। বলী তাই—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।

সে এক অপূর্ব্ব সুন্দর অপ্রাকৃত চিত্রদর্শনে প্রেমপুলকাধিষ্ঠ ভক্ত-ভাবুকের রসানুভূতি বাঙ্ময়রূপ পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছিল, আজ তাহাই আর এক ভক্তিসাধকের ভাষার্দ্র কণ্ঠবিগলিত হইয়া সহস্র হৃদয়ে রূপায়িত হইল—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।

ইহাই বৈষ্ণব পদাবলী। ইহাকে কবির অপূর্ব্ব কবিত্বনৈপুণ্য বলিলে ঠিক বলা হইল না। পদকর্ত্তা ভাবদেহে নিখুঁ-নিকুঞ্জে সৌন্দর্য্যমাধুরী প্রত্যক্ষ করিতেন—প্রেমরাজ্যের লীলাবৈচিত্র্য দর্শনে কখনও বা বিরহ-বিধুরা রাধারাণীকে সান্ত্বনা দান করিতেন; কখনও বা খণ্ডিতার ভর্ৎসনাহাড়িত বিদগ্ধ মাধবকে সঙ্গে লইয়া মানময়ীর মানবন্ধির দ্বারে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসী মিলনের মঙ্গল সূচনায় ভক্তচিত্তচকোরকে আনন্দোৎফুল্ল পরিপ্লুত করিয়া তুলিতেন।

পদাবলী তাই সাময়িক কবিতা নয়, উহা রসের ভজন। উহাই সাধারণত্বলাভের পরম সাধন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন এই সাধারণত্বলাভেরই তত্ত্ব সন্ধান দান করিয়াছেন। মানবাত্মার চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রাণপ্রিয়তমের অনন্তসুখলাভের সৃষ্টিই ভাগবত করিয়া দিয়া সমগ্র বিশ্বের এক বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন।

ইহার আবির্ভাবের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক চিন্ত ঐকান্তিক অদ্বৈত অথবা ঐকান্তিক দ্বৈতের তর্ক পরম্পরায় বেষ্টনী মধ্যেই সীমায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যখন অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন সে দুরন্ত যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে? জগৎ স্তম্ভিত হইল। হরি হরি, জীব কি তবে সত্যসত্যই নিত্য সত্তা হারাইয়া অনাদি বিরহের চির-সমাধি রচনা করিল? আর কি সে তাহাকে দেখিতে পাইবে না? যাহাকে দেখিবার জন্য জন্মে জন্মের কত কামনা! সংসার দুঃখময় জানিয়াও চিরনির্ব্বাণ কামনা করিতে প্রাণ চাহে নাই—যাহাকে পাইবার প্রলোভনে মনে হইয়াছিল—কোন দিন কোন জন্মে জন্ম-জন্মান্তরেও যদি যা তোমায় পাই—এই ক্ষীণ আশাটুকুও থাকে—তবে তোমায় পাইবার প্রলোভনে মরিতে বাঁচিতে—কোটি কোটি স্বর্গ নরক ভোগ করিতেও আমার দুঃখ কিসের? কিন্তু হে আচার্য্য! আপনি একি সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলেন—সবই মায়া! ইহার কি কোন পারমার্থিক সত্তা নাই—এ কি শুধু ছিন্ন মায়া ছলনা? ইহার কি শুধুই ব্যবহারিক সত্তা। তবে আর ইহাকে লইয়া কি করিব—আমার ভাগ্যে বুঝি আর অমৃতের আস্বাদন ঘটিল না! উপনিষদের ভাষায় তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

তেনাহং কিমকুর্য্যাম্
যেনাহং নামৃতং স্যাম্?

আচার্য্য শঙ্কর মানবের বুদ্ধি-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। জীবের বড় অহংকার—সে তত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিয়াছে—শঙ্করের কুঠারাঘাতে সে অহংকার চিরচূর্ণ হইল; মায়িকবাদ ধূলায় লুটাইল। লোকায়ত মত টিকিতে পারিল না। বৌদ্ধের বুদ্ধি বিস্রান্ত হইল; শূন্যবাদের সৌধের ভিত্তি ধসিয়া গেল, আর তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইল সনাতনধর্ম্মের অটল অট্টালিকা, বিশ্বে তাহার উত্থান হইল—ব্রহ্মবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী; আর বিস্মিত বিশ্ব দেখিল—সেই পতপতায়মান পতাকার ভিতর আঁকা রহিয়াছে—ওঁ তৎ সৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক ব্রহ্ম—বৃহৎ ব্রহ্ম—ব্যাপক ব্রহ্ম—সবই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। একমাত্র ব্রহ্মই রহিয়াছেন—নিত্য সত্তায় চিরবিরাজমান। ইঁহা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টিধারা অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, তাই জীবিত রহিয়াছে ইহারই ধারা—তারপর তাহাতেই সব কিছু বিলীন হইতেছে—পরিবৃত্তমানতার চিরবিশ্রান্তি ইঁহাতেই।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

মায়িকবাদ ত নিরস্ত হইল; কিন্তু হায় হায়! আত্মিকের জগবন্ধুকে যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ তবে আমাদের কি হইল? তুমি নাই, আমি নাই; তোমার আমার মাঝে যে অনাদিকালের সম্বন্ধ তাহাও নাই; আমি হয়ত সে সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইতেও পারি, তোমার মায়া তার জন্য না হয় আমায় গলায় ফাঁসি পরাইতেও পারে, হয়ত বা কখনও স্বর্গে উঠাইয়া কখনও বা নরকে ডুবাইয়া গভীরতর দুঃখ দিতে পারে; সে দুঃখকে তো আর দুঃখ বলিয়াই মনে করিব না—কারণ তখনো তো তোমায় পাইবার সম্ভাবনায় ফুলাচ্ছেদ হয় নাই। কিন্তু তোমাতে চিরবিলীন হইয়া আমার এত সাধের এত দুঃখের এত জন্ম-জন্মান্তরের তোপান্তি-সওয়া জীবসত্তাটি এক কথায় চিরতরে হারাইয়া ফেলিব?

প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। না কখনই নয়, সত্য নয় ও কথা। উহা একান্তই মায়াবাদ? তোমায় আমি ভুলিয়াছিলাম—তুমি কিন্তু ভুলিতে পার নাই, তাই নিজ চরণে টানিয়া লইবার ছলে এত তোমারই এক অপূর্ব্ব ছলনা। তর্ক বুদ্ধিকে তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বিরাট সাধক সম্প্রদায় চারিদিক্ হইতে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

ফলে ভারতীয় দর্শনক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী বিভিন্ন আচার্য্যের আবির্ভাব সম্ভাবিত হইল। অদ্বৈতবাদকে বিদারিত করিয়া

স্ব স্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন ব্যাপারে ইহারা যে সকল অপূর্ব্ব যুক্তি শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে যে শুধু অপূর্ব্ব মনীষাই অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, ভক্তিভাবাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবানের উপর যে কতখানা ভালবাসা লীলায়িত, তাহারও অপূর্ব্ব পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব, আচার্য্য নিম্বার্কাদিত্য এবং পরমাচার্য্য শঙ্করমুনি প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। ইঁহারা কৃপা করিয়া স্বপরমতকে লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন। সত্যবা জগতের চক্ষু অদ্বৈত-বিদ্যুচ্ছটায় যেরূপ ধাঁধিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আর যে কোনদিন তাহার দর্শনশক্তি ফিরিয়া আসিবে কেহ তাহা মনেই করিতে পারিত না। এই সকল দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহতী মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। অথচ যে "তত্ত্বমসি" বিরাট দুর্গ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে তাহার "তত্ত্ব ত্বং" এই প্রকার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়া শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য মহাপ্রভুর মনোমোহন করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রভু আমার পরে এই দুই ঐকান্তিক বিরোধের অপূর্ব্ব সমন্বয় সমাধান করিয়া লক্ষাধিক মধ্ব সন্ন্যাসীর মধ্যেই মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে ইচ্ছা করিলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের ক্রমবিকাশের কথা তুলিতে পারা যায়। কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া লাভ নাই। এ সম্বন্ধে বহু আলোচনাই হইয়াছে। একরূপ সিদ্ধান্তিতই হইয়াছে যে, একমাত্র বেদান্ত দর্শনই ঈশ্বরকে অকুণ্ঠকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ঈশ্বরকেই মূল প্রতিপাদ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং বেদের চরমভাগ জ্ঞানকাণ্ড হইতে ঈশ্বর প্রতিপাদিকা শ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ স্থাপনে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই বেদান্ত দর্শন অন্যান্য দর্শনের মত সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছেন এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানকেই দুঃখনাশ ও সুখ সাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভ বিষয়ে বেদান্ত যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অতুলনীয় ও অপূর্ব্ব। শ্রীগৌরসুন্দর এই বেদান্তদর্শনকেই নিজ অলৌকিক লীলাবিলাসের ভিতর দিয়া বেদান্তে প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত পরিকরগণ সেই ভাবটিকেই অবলম্বন করিয়া এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রাণ বর্দ্ধন করেন। শ্রীপাদ জীব, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির কথা তাই আমরা আজ সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। তাঁহারাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশাবলী অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাসহিত তাহা রচনাপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বালোকসমুজ্জ্বল করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তদর্শনকেই যদি এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রধান, উপজীব্য বলি, তবে বোধ অসমীচীন হইবে না।

প্রধান উপজীব্য বলিয়াছি, কিন্তু একমাত্র উপজীব্য বলিতে পারি নাই। তাহার কারণ, কৃপাপ্রাপ্ত যে সকল মহাপুরুষের অন্তরে তত্ত্বস্বরূপ অহরহ উদ্ভাসিত হওয়ায় অষ্টকালীন লীলা বিলসিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট বটষট্পটের আলোচনা যদি 'এহো বাহ্য' বলিয়াই গণ্য হয়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কত শত অত্যাগত মহাত্মা ভক্তকণ্ঠের মুখে অহরহ যা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব্যতীত আর কোন কথাই শুনিতে পাই নাই। ষাড়ষত্তের ঘনসন্নিবেশ আরতোলো সৌর আমার শুধু তো ঐ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়াই স্থাবর জঙ্গমকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ভক্তকুলের প্রাণে প্রাণে আজও যেন সেই অমিয়মাখা বাণী মূর্ত্ত হইতেছে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

অতিকৃষ্ণ গৌরসুন্দর যাহাঁর অমন করিয়া কৃষ্ণমহিমা আর কে শুনাইতে পারে? রসিকশেখর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, বেদ-বেদান্তের চরমতত্ত্ব কৃষ্ণ—এ সব কথা গৌর না আসিলে কে বা জানাইত। রাধারাণীর ভাবে ভোরা গৌর আমার শতমুখেও কৃষ্ণ কথা বলিয়া যেন শেষ করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণমহীর ভাবাবেশে গৌরকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ীর মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেই পারিতেছেন না। দর্শনের গহন কাননে প্রবেশের পূর্ব্বে একবার শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণাশ্রয়ে সেই অমৃত সরোবরের বারি প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লই—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতী
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।

'কৃষ্ণ'—এই দুইটি বর্ণাত্মক বস্তুটি বুঝিতে পারিলেই সমগ্র বৈষ্ণবদর্শন বুঝা হইয়া যায়।

বেদের সেই গুহাহিত চরম তত্ত্বটিকে এতদিন শুধু অন্বয়জ্ঞান-রূপেই লোকে ধরিতে পারিয়াছিল, কিন্তু করুণাময় গৌরের কৃপায় জগতে সর্ব্বপ্রথম বেদের মুখ্যার্থ প্রচারিত হইল—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"

বেদান্তকৃৎ ব্যাস স্বয়ং ভক্তরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, সুতরাং গ্রন্থকারকৃত ভাষ্যের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবার তো উপায় নাই। গ্রন্থকারকে স্বয়ং ভাষ্য করিতেই বা হইল কেন; সে রহস্যটিও উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন—পূজনীয় শ্রীধর স্বামী মহোদয়—

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবৃদ্ধৈশ্চিত্তপ্রক্ষিপ্তমলমান্তরং তত্রাপরিচ্ছন্নান্ত-রমোপদেশতঃ শ্রীভগবদ্গুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদ ব্যাসঃ।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এতকাল জগতে সুপ্রচারিত থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ-কারের সম্বন্ধ কেহই বুঝাইতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর না আসিলে তত্ত্বটী রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইত। বেদান্তপ্রচারিত ব্রহ্মই সে নির্ব্বিশেষ ধারণার দ্বারা আবিয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তিবিলাসে ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বরূপে নিত্যবৃন্দাবনে ঘুরিয়াছেন, আর তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি সে মূর্ত্তিমতী হইয়া সুধারসরাজকে স্বাধরসমধু পান করাইতেছেন—এই জ্ঞান সম্পদ্ হইতে জগৎ চিরবিচ্ছেদ জন্যই বঞ্চিত

হইত। আজ তাই গৌড়ীয়দর্শন কথা বলিতে গেলেই বার বার সেই-কথাই মনে হয়—

যদি গৌর না হৈত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে'
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাতো কে ?

তাইতো ভাই—গোরাগুণ বহুমন না যায়।
কত শত আগম কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়।

যেন বড় বরণন পড়িয়াও শেষ নাহি
আমার গৌরায় নাহি জানে ;
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন জন
দরপণে কিবা তার কাজে ?

পদকর্তার আনুগত্যে 'গৌরচন্দ্র' গাহিয়া—

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ।

ধার্শনিক সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের বিশিষ্ট স্থান হইল—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। পরে সেই সম্বন্ধে দু'একটি কথা নিবেদন করিব।

(আগামীবারে সমাপ্য)

নিশাস্বপ্ন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

প্রেমের মধ্যে আমি আর নেই।

অবশ্য আমি যে প্রেমে পড়েছিলাম তা নয়। অথবা আমার প্রেমে যে কেউ পড়েছিল তাও নয়।

যে নিষ্টিথের কাহিনী এটা, সেটা প্রেমের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটি দুর্লভ দুর্বার রাত্রি। পূর্ণিমার আলো মনে হচ্ছিল যেন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবার জন্য আকাশ থেকে নেমে এসেছে। চিত্রাঙ্গদা বর চেয়েছিলেন যে তার এক বৎসর ছলনার শেষ রাত্রিটী যেন সব চেয়ে বেশী মাধুরী ও মাদকতা দিয়ে বসন্তের পুষ্পাভরণ দিয়ে তাকে সাজিয়ে যেন। অর্জুনের হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে শেষবারের জন্য তিনি হরণ করতে পারেন। আজ রাত্রিতে মনে হচ্ছে যে যত আধুনিক অর্জুনের হৃদয় ভেনিসের চিত্রাঙ্গদারা—আহা, চল-লিপষ্টিক-পাউডারে চিত্রিত অঙ্গ তাদের—যেন হরণ করবে।

আমার হোটেলের বারান্দা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সারি সারি সাইপ্রেস গাছের আড়ালে আলোছায়ার মত মায়াজাল রচিত হয়েছে। রূপোর তাম্বার শাদা ও কালোতে যে ছবি তৈরী হয় সে ছবিই সব চেয়ে সুন্দর, তার প্রমাণ দক্ষিণ ইটালীর সুন্দরীদের কালো আঁখি। যেন বর্ষার প্রস্তরে গঠিত মূর্তির মধ্যে যদি কৃষ্ণ আঁখিই সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। সে জন্যে যে আমাদের দেশের কৃষ্ণকলিদের কালো কাজল চোখের সৌন্দর্য্য তেমন খোলে না তার ইটালিয়ান মেজেদের রূপ পায় নি বলে। রূপো পৃথিবীর কোথায় যে না ঘুরছে তার ঠিক নেই।

মোটকথা এই মায়াজাল আমার মনকে সাদরের আলোয় উদ্ভাসিত পথে টেনে আনছিল, ঘরে থাকতে দিচ্ছিল না। এমন চাঁদনী রাত্রি শুধু কবি, প্রেমিক ও পাগলদেরই পথে টেনে আনে। তা ছাড়া আর যাদের টেনে আনে তাদেরও এই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীতে পরিণত করে দেয়।

এমন রাত্রিতে হোটেলের রেস্তোরাঁ ঘরে বসে সুদৃশ্য টুরিষ্টের মত আমার কামরা মাফিক শুপে শুপে ঠিক মত ছুরী কাঁটা চামচ চালিয়ে "অল্প রজনীর ফরাসী স্পেশিয়ালিটী" নামক খাবারগুলির সদ্গতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পথ আমায় ডেকেছে। উদ্যানপথে জাইপ্রেসের পাশে পাশে মর্মরের প্রস্তরমূর্তিগুলিও আমায় ডেকেছে।

ওই পথ আমায় কাইকে রোমে ফিরে যেতে পারবে না—যদিও ওদেশে একটা কথা আছে যে সব রাস্তাই রোমে ফিরে যায়। সুধারে লাগান ও পুরানো ইতিহাসের গন্ধমাখানো বাড়ী; তার মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যেতে যেতে হাজির হলাম ভেনিসের জল পথে। এই "গ্রাণ্ড ক্যানালেই" এই পথের পরিসমাপ্তি এবং আমার সফরও এখানে প্রায়ত।

সারাটা দিন আমার খুব সন্ত্রান্তভাবে কেটেছে অর্থাৎ আমি যদিও সম্ভ্রান্ত নই, অতীতের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী 'ডোজের' প্রাসাদের অতুলনীয় চিত্রগুলির সামনে আমার সারা দিন কেটে গেছে। আমার চারপাশে দ্রুতিতে ঘোরা ফেরা করে গেছে কোটিপতি আমেরিকান টুরিষ্টরা; তাদের যে একদিনের মাত্র ভেরোনা ভেনিসে। একমাসে ইউরোপ পরিক্রমা করে ফেলতে হবে তাদেরকে। আমার বইয়ে লিখেছে যে "টু সি ভেনিস এণ্ড ডাই"—অর্থাৎ ভেনিস না দেখে মরলে সেটা আমেরিকান টুরিষ্ট পায় অনুশোচনা মরাই হবে না।

আমি কিন্তু মজে গেলাম ইটালিয়ান ছবিগুলির বর্ণপ্রয়োগে। এমন বর্ণবিন্যাসের সুষমা শুধু ছবিতেই নয়, ইটালীর অপরূপ আকাশে—ভেনিসের সাগরস্নানের সৈকতে—'লিডো'র স্বচ্ছ জলরাশিতে ও নীলাকাশ ইটালীয়ান আঁখিতে ছড়িয়ে পড়েছে ছবিগুলি ছাপিয়ে। তার রঙের পরশ প্রলেপ দিয়েছে আমার মনে। সেই রঙই আমায় হাতছানি দিয়ে পথে টেনে এনেছে আজ রাত্রিতে।

ভেনিসের সুসজ্জিত নৌকাগুলিকে গণ্ডোলা বলে। গানে গোলা খেতে খেতে ভেসে যায় বলেই বোধ হয় নাম হয়েছে গণ্ডোলা। ইঞ্জিনে-চালান গণ্ডোলায় আমি কোন দিন চড়তে পারলাম না, কারণ সোনার পাথর বাটিতে খেলে আমার তৃপ্তি হয় না। হাতে-বাওয়া ছোট আমার পান্সী (ক্যান্সি-ও বলতে পারা যায়) তাইখানি ভেকে 'রিয়াল্টো' সাঁকোর তলায় এসে নামলাম।

আমি চুরিই হ'লেও ওই বলটাকে পছন্দ করি না। তাই ছোট একটি পথপ্রান্তের রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকলাম। আমি যে বিদেশী, আমার বিদেশী বন্ধুকে যথেষ্ট আবহাওয়ায় প্রকৃতরূপে ছেড়ে দিতে চাই, তার সঠিক পরিচয় চাই। এ সব জায়গায় এলে খাঁটি ইটালিয়ানকে পাওয়া যাবে। সে আমার আমেরিকান টুরিষ্টের উদ্ধত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে নীরবে প্রশ্ন করবে না—"তুমি কে বট হে ?

ধীরে ধীরে খেতে খেতে চোখ প্রায় বুজে এসেছিল। কারণ মন ঘুরে গিয়েছিল একটি ভিন্নু কশিওর 'মাণ্ডোলিন' বাজনাতে। সে খুব পুরানো একটি ভক্তিগীতির সুর বাজাচ্ছিল। সে সুর যেন আমার সারা দিন ও সারা সন্ধ্যার ঘটনাগুলিকে চিত্রিরূপ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হলো পাশেই কেউ নেই। সে সার্থকতা এই সব সাধারণ ইটালিয়ানের জীবনে নেই ; যে অতিরেকের কথা এরা ভাবে না, অথচ সেই গৌরবে এরা নহিমান্বিত মনে হতে লাগল। চোখ বুজে বেঁচে থাকার আরাম উপভোগ করছি এমন সময়ে খুব মৃদু একটা শব্দে চোখ মেলে দেখলাম—সামনে এসে হাসছে একটি প্রৌঢ় ইটালিয়ান। চোখে সহানুভূতি, মুখে প্রসন্নতা ও সর্ব্বাঙ্গে পরিণত যৌবন এক সুপুরুষের কমনীয়তার অনুমান আভাস।

"সিনর, উদ্ধতা ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার বন্ধুভাবে নিয়ে আমার দোষ মার্জনা করবেন। আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় কিছু ভাবছেন। কারো কথা বোধ হয় ভাবছেন।"

এ লোকটি বলে কি ? বড় অপ্রস্তুত বোধ করলাম। সত্যিই ত সাধারণ সস্তা একটা রেস্তোরাঁয় বসে খেতে খেতে চোখ বুজে এলে লোকে কি ভাবতে পারে ? মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন—ঠিকই বুঝেছি, সিনর, আপনি কারো কথা ভাবছেন। এমন রাতে সেটা খুবই স্বাভাবিক। সহানুভূতিতে তার মন একটু আর্দ্র, চোখ একটু কোমল হয়ে এল। তিনি বললেন—আপনি যার কথা ভাবছেন তিনিও নিশ্চয়ই আপনার কথা এখন এই মুহূর্ত্তেই ভাবছেন।

কি সর্ব্বনাশ ! অর্থাৎ এ বলতে চায় যে আমি প্রেমে পড়েছি ! অবশ্য আমার মাথার চুল একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে তরুণ কবিদের মত সারা দিন ঘোরাঘুরির ফলে ; ভেনিসের আকাশের ও 'লিডো'র সুনীল জলে আঁকাবাঁকা খেলার সঙ্গে 'ম্যাচ' করে অর্থাৎ মানানসই রেখে একটা টাই আমার গলায় পরা রয়েছে। কিন্তু তাতেই কি প্রেমে পড়ার কোন বিশ্বাস পাওয়া যায় ? বিব্রত হয়ে আবার একটু হাসলাম। সামনের প্লেটটাতে পরম সুখাদ্য 'এস্কালপ' (অনেকটা কাটলেট গোছের) ও ম্যাকারোনি স্যাল পোমাদোরো (টোমাটো রসে মাখান ম্যাকারোনি) এখনো বাকী রয়েছে। অনেকখানি প্লেটটা একটু সরিয়ে রাখলাম।

ভদ্রলোক বোধহয় এতে একটু সমর্থন বোধ করলেন। চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনে নীচু স্বরে বললেন—আমি দুঃখিত যে আপনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলাম ; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ভেবেছিলাম যে আমি একজন সমব্যথীর সন্ধান পেয়েছি। কেন এমন মনে হল জানি না, কিন্তু জানেন তো একই কথা যারা ভাবে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। অবশ্য আপনার স্বপ্ন গড়ে উঠছে, আর আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আজই, এইখানে, এই রেস্তোরাঁতে।

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। আমি ত কোন স্বপ্ন এখনো দেখতে সুরু করি নি। অবশ্য যদি করতাম, আমার বাইশ বছর বয়সকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু এর অনুমানকে ভেঙ্গে দাও নেই। এর জীবনে যা ভেঙ্গেছে আমার সম্বন্ধে একটা কল্পিত অনুমান তার তুলনায় অতি সামান্য। তাই আমার মন কোমল হয়ে এল ; গাঢ় কণ্ঠে বললাম—ভেঙ্গে গেল ? আপনার আশা-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ? আহা—

ভাবাবেগে আর কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু আমার নীরবতাকে অতিক্রম করে চোখ সজল হয়ে উঠল।

ভ—সত্যি। কেন যে দেশে ফিরে এলাম এত বছর পরে আমি জানি না। আর দেশের চেনা লোকদের মধ্যে আমার ফিরে আসা যেন জানাজানি না হয়ে যায়, তাই আমি স্থিরই আবার চলে যাব।

আ—ফিরে চলে যাবেন ? কিসে ? আবার প্রবাসী হবেন ! কথাটা জিজ্ঞাসা করেই মনে পড়ে গেল যে তিন বছর ধরে আমিও প্রবাসী।

ভ—কেন যাব না ? দেশে আমার রইল কি ? যাকে নিয়ে আমার দেশ, আমার দেশের স্বপ্ন, সে ত আর সে নেই। শুধু আমিই একা সে-ই আছি।

এই রেস্তোরাঁতে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে বলেছিলেন তাই একবার ঘরটার চারদিকে চকিতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। শুধু একটি নারী আছে সেখানে ; এই রেস্তোরাঁরই মালিক, সদ্য অতিক্রান্তযৌবনা, কিন্তু সুন্দরী যে ছিল একদা তা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য ইটালীতে কেই বা সুন্দর নয়, এ প্রশ্ন একবার মনে যে না উঠল তা নয়।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রৌঢ়ও চারদিকে তাকিয়ে যাচ্ছিলেন ; তারও দৃষ্টির গতি ওই নারীতে এসে সমাপ্ত হল ; আঁখির ক্ষুদ্র দুটি প্রশ্নের একটু হাসির আভাস দিয়ে ধনুকের মত বেঁকে খেলে গেল। তিনিও মৃদু ক্রকুঞ্চী করলেন। দুজনে যে পরিচিত তা বুঝতে পারা গেল সহজেই। ভাবলাম হায়, কত নিকটে এরা, অথচ কত দূরে।

ভ—জান বন্ধু—ওই হচ্ছে আমার অতীতের প্রিয়া, যে অতীত আমার কাছে এই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল সত্য হ'য়ে। আমার আর এখানে মন টিকছে না, চল আমরা বাইরে কোথাও চলে যাই।

আমার সেই নারীর দিকে তাকালাম। তার অন্তরে—যে অন্তর

এই ভদ্রলোকের জন্ম যাহাতে স্বর্গ রচনা করেছিল সে অধরেই এখনো একটু হাসি লেগে আছে। আমরা দুজনে বাইরে চলে এলাম। গণ্ডোলা ঘাটেই বাঁধা ছিল।

ততক্ষণে 'সান মার্কো' গির্জার সুন্দর চত্বর খালি হয়ে গেছে। কিন্তু ওপরে আকাশে সে জায়গাটা জ্যোৎস্নায়, প্রায় সমুদ্রের মত বিপুল জল-রাশিতে সে জ্যোৎস্না পুরুষে ফুটি ফুটি হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। জলের ধারে এসে দুজনে বসলাম।

রুপো বলে যেতে লাগল তার কাহিনী। আমরা তখনো 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পৌঁছিনি। সে বলে যেতে লাগল—এক ধনিক প্রেমিকের অবরোধ রাজপুত্রের কথা। সঙ্গে ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী।

রু—ফ্লারেট্টা করালী 'ফ্লারেট' হবার মতই আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যে ব্রাণ্ডাগুলি থেকে ফ্লারেট নিষ্কাশন করা হয় সে গুলো গুলো ব্রাণ্ডার মত কোঁকড়ানো অলকগুচ্ছ ঘিরে থাকত তার মুখখানাকে। সে মুখ যেন আঙুরের মত নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে পান করতে ইচ্ছা হত, কিন্তু আমরা ছিলি রোম্যান ক্যাথলিক।

আ—তাতে লোকসান কি? সে ব্রাণ্ডাগুলি পরাণ ত তোমার ছিল "অল্প বয়সী"; পানই যে করতে হবে তার কি কোন মানে আছে?

রু—নেই? তুমি বলছ নেই? তোমার বয়স কত?

আমি তার বাহুতে মৃদু একটু টোকা দিয়ে হেসে বললাম—সে কথা থাক: তার পর বল?

রু—তার পর! আমি ফ্লারেট্টাকে বাস দিয়েছিলাম 'তাজ'। তোমাদের দেশে যে মেয়ে পাথরের তাজমহল আছে তার মত শুভ্র সুন্দর ছিল সে।

আ—আমার ও মনে হয় যে জীবন্ত তার প্রতীকীভূত তাজের চেয়ে বেশীই সুন্দর ছিল তোমার কাছে।

রু। ঠিক বলেছ। এই দেখ না আজো ফ্লারেট্টার সেই শুভ্র বর্ণ আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। আজ সে প্রস্তরীভূতা; শুধু প্রস্তর, কিন্তু প্রাণ পেলাম না তাতে।

আ। কেন? সে কি তোমায় আর ভালবাসে না?

রু। সে কথা আজ নৌণ। যদি সে আজো ভালবাসতে চায় তাতেই বা কি হবে?

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। 'জনমে জনমে যুগে যুগে অবিচার' অমর প্রেমের কথা শুনে এসেছি কাব্যে, অমর অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা লেখে উপন্যাসে। আর বাস্তব জীবনে যে লোকটী একটি চলনাময়ীর ধাক্কা খেয়ে যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রবাসী হয়ে ফিরে এল সে এ কি কথা বলছে? বিস্ময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

রুপো। জান, আমার যখন তোমার মত বয়স ছিল তখন তাদের জন্য কি তাই না করতে পারতাম? আমার অর্থের অভাবকে পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি অর্থহীন প্রেমগুঞ্জন দিয়ে, গজল দিয়ে, সেরা দিয়ে। উপহারের অভাবকে লঘু করে দিতে চেষ্টা করেছি ফুল হাতে সারিয়ে। গণ্ডোলায় চড়িয়ে তাকে নৌকা বিহারে নিয়ে গিয়েছি। সে আমায় ছ'তে রাজী ছিল কিন্তু তাকে আমি পাই নি।

আ। কেন? তুমি ইংরেজীতে যাকে বলে 'সিনিক' তাই হয়ে গিয়েছিলে?

রু। না, কেনিসে 'সিনিক' হওয়া সহজ বা স্বাভাবিক নয়। আঙুর ফল টক হলে লোকে সিনিক সাজে, কিন্তু প্রেম কুকের ওই ফলটি মাটকীর ভঙ্গিতে করে এনে মুখে পুরে করে পড়বে তার প্রতীক্ষায় মৃতাকুলা নটীর মত মন তাদের মুহূর্তে পরে মুহূর্ত করে মেঘে বেড়ায় সেই মুক্তাঙ্গনে।

আ। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের সহ-পাঠিরা অনেকেই প্রেমের কবিতা পড়ে সিনিক হয়ে উঠেছে এবং সে ভাবটা তাদের কাজে যাবে না প্রেমে সত্যি না পড়া পর্য্যন্ত।

রু। সাবাস, বন্ধু। তোমার বিশ্লেষণ খুব ঠিক হয়েছে। কাজেই দেখ আমি সিনিক হ'তে যাব কেন? আর তা-ই যদি হব তবে আমার এ কাহিনীর কেনই বা হবে?

আ। কিন্তু তার দোষে এমন হল?

রু। দোষ কারো ছিল না। দোষ যদি কারো থাকে তবে আমাদের মেদের ধূসর নির্মল আকাশের—যার ওই রকম সুন্দর রঙ হয়েছে আমাদের তরুণীদের চোখের রঙের প্রলেপ পেয়ে। দোষ এই কেনিসের জলরাশির যারা আঁকা বাঁকা খালগুলির মধ্যে সারাদিন সারারাত্রি প্রত্যেক রূপসীর বাতায়ন তলে গান করে করে খেলে বেড়ায়। জান, কেনিসের জলের এই লীলা চঞ্চলতা হচ্ছে ইটালিয়ান মেয়েদের হৃদয়-মাধুরীর সজল সংস্করণ।

রুপোর বর্ণিবার ধারণা আমার প্রায় বিশেহারা করে ফেলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে প্রেমে পড়লে মানুষ এমনভাবেই প্রলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে নিজেকে। আর পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ প্রেমের ইতিকথাই ত প্রলাপ ও বিলাপের সংগীত সংলাপ। অবশ্য রুপোর অনেক কথা ও অনেক উপমা ব্যাকরণ-বিলাসী বা সাহিত্যের ব্যাপারীকুলের মতে সুবোধ বা সুশীল হবে না; কিন্তু সে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলে উঠবে যে তার জন্য দোষ যাও ওই কেনিসের বাসি বাসিতে ভাসমান বদ্ধ ধরণীকে, আমাকে নয়।

আ। তার পর?

রু। তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত—যদিও দীর্ঘ জীবন যে কি ভাবেই কাটিয়েছি। ফ্লারেট্টার বাবা একদিন এইখানে এই রকম চাঁদের আলোর মধ্যে আমাদের আবিষ্কার করলেন। আমি তখন বাঁড়ের রূপ রূপ সবের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে মেয়ে ওকে নিয়ে গণ্ডোলায় চলেছি; ওর বাবা ফিরছিলেন আর একটা গণ্ডোলায়; আমার বাঁড়ের ধাক্কায় তার নৌকা ওল্টাবার যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। সামলিয়ে নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন আমাদের দুজনকে। তার পরের কথা বুঝে নিতে তোমার কষ্ট হবে না।

আ। তুমি কেন তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলে না যৌবনের দাবীতে, প্রেমের দাবীতে, ফ্লারেট্টার দাবীতে?

ক্র। তার কি পথ ছিল, বন্ধু? তার সামনেই ত তার বন্ধুলোক বাধা আমার অকরুণতাকে বাঙ্ময় করে বললেন—আগে স্বর্গখনি আবিষ্কার করে এস, তারপর আমার সোনাদির কথা ভেবো। আমিও সেই পথ ধরে হাতের বাঁড় ছলে হাসিয়ে নিয়ে, ভাগ্যবান পানবীরেই ক্ল্যারেটাকে রেখে দাঁড়িয়ে ভ্যালাস পার হয়ে প্রবাসী হয়ে গেলাম।

তার পরের কাহিনী রূপা নিজে থেকেই বলে যেতে লাগল। কত দেশে সে তাপাদেবের করে বেড়িয়েছে তার হিসাব নেই। তারতবর্ষেও সে এসেছিল তাঁর দেখবার জন্ম; তাদের বনাধি পার্শ্বে অক্ষয় বে ইয়োরোপির মূর্তি নিত্য দেখা যেত বলে পাইডরা বলে—সে মূর্তি হচ্ছে রূপার। তার পর আমেরিকার জঙ্গলে রবারের ব্যবসায় ভটকায় বন্ধুলোক হয়ে সে মাত্র দেশে ফিরে এসেছে। আজ সকালেই সে তার ঠাকুরকে খুঁজে বের করেছে এই নানান হিজিবিজি মালিকের মধ্যে। ক্ল্যারেটার বাবা মারা যাবার পর দেখা গেল যে টাকাকড়ি কিছুই রেখে যান নি। তার ধনী পাণিপ্রার্থীরা সরে গেল দূরে দূরান্তে। অভিমানে সে নিজে উপার্জনের চেষ্টায় দেশে গেল; বিয়ে করা তার আর হল না।

প্রায় অশোভন একটা উল্লাসে বলে উঠলাম—বেশ ত, এখন ত তুমি তোমার তাজে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে পার।

মলিন একটু হাসি হেসে সে বলল—সেইখানেই ত হ'ল আমার পরাভব।

বুঝতে পারলাম না। ঘুরে পাওয়ার মাঝিটা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত কম্পমান ছোট ডঙ্গীটির উপর স্থিরদৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রূপার কাহিনী সন্ধ্যা-তারার মত আমার মনের আকাশে ঘন ঘন করে বিরাজ করছে; কি যে তার শেষ বক্তব্য তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

আ। সে যখন অবিবাহিতা, পিতা যখন সেই পথে বাধা দিতে, তুমি যখন ধনী হয়ে ফিরে এসেছ, তখন তোমার জন্মের মুহূর্ত ত সামনেই অপেক্ষা করছে।

ক্র। তুমি তা বুঝবে না বন্ধু, তোমার বয়স অল্প; তুমি এখনো রচনা করতে পার। আমি আর পারি না।

আ। অর্থাৎ?

ক্র। অর্থাৎ আমি সেই আমিই আছি, সেই মন, সেই অন্বেষণ, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা। এই পঁচিশ বছর আমি যাকে মনে মনে বসন্ত-পুষ্পাভরণা তরুণী রূপেই শুধু কল্পনা করে এসেছি সে যে আমার মনের সীমা ছাড়িয়ে কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়া হয়ে গেছে তা আমি কখনো ভাবি নি। আজ সকালে যে প্রতিমা দেখব বলে ছুটে এসেছিলাম শুধু তার প্রেতাত্মাকে পেলাম। হায়! এর জন্ম ত আমি সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াই নি।

আ। কিন্তু তুমি নিজেও ত আর কিশোর কোঠায় নেই; তুমি ও ক্ল্যারেটা দুজনেই ক্রমে যৌবন পার হয়ে এসেছ। তা ছাড়া সেও ত জানতে পারে যে রূপোও ত আর তরুণ নেই।

ক্র। সে ঠিক তা ভাববে না। সে ত আমার জন্ম সব কিছু ছেড়ে মনের দ্বার রুদ্ধ করে পরিবর্তনের স্রোতের গতি প্রতিরোধ করে বসে ছিল না। তার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে সে গড়ে উঠেছে। আমার ত সে অবস্থা ছিল না।

আ। তুমি কি আয়নাতেও কখনো নিজের বয়স বেড়ে যাওয়া লক্ষ্য কর নি? অনুভব কর নি যে তুমি আপনার অজ্ঞাতসারে বদলিয়ে যাচ্ছ ক্রমে ক্রমে?

ক্র। তা কখনো করি নি; যদি করতাম তাহলে হয়ত এখন করে ছুটে আসতাম না। যদি বা আসতাম নির্নিমেষে অনুষ্ঠিতচিত্তে যাকে পাচ্ছি তাকেই গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠতাম।

আ। আশ্চর্য! তুমি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসতে?

ক্র। ভাল—ভালবাসা না? ভালবাসতাম না? তাহলে এতদিন কাকে নিয়ে দিন কাটিয়েছি, দুঃখ দৈন্য দুরদৃষ্ট জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি? কার স্বপ্ন মনে আলো ফেলে ছিল তাহলে? কার মূর্তি চোখের মণিতে আসন নিয়েছিল?

আ। ঠিক সে-ই ত আছে। তুমি আর সে দুজনেই বেঁচে বদলিয়েছ তা শুধু প্রকৃতির জৈব পরিবর্তন। তাকে তুমি স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছ না কেন?

ক্র। যে নিখিল তর্কের বাইরে তাকে তর্ক দিয়ে হারাতে পার, কিন্তু গড়তে পার না। সেদিন যে ব্রাহ্মমুহূর্ত রূপে সোনার আমার স্বপ্ন দিক করে তুলত, সেই মুহূর্ত এতদিন পরে শুধু সেই গুণ বলেই কি আকর্ষণ করতে পারবে? কোথায় তার যাদু, তার মুখাসার? তুমি বইপড়া বালক, তাই বুঝছ না যে আমি পঁচিশ বছর ধরে এসে ঠেকে শিখেছি এবং সে শুরুই আজ ঠকে গিয়েছি। কিসেসে ছিলাম যতদিন ঠিক ছিলাম; বেহিসাবী হয়ে গেছে এসে বেঠিক কাজ করে ফেলেছি।

এর পর আর কথা চলে না। চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ তার হিসেব নেই। শুধু চাঁদ মাথার উপর দিয়ে উঠে অন্যদিকে হেলে যেতে লাগল; জ্যোৎস্নার যান আশেপাশে জলরাশিতে নূতন নূতন আল্পনা কাটতে লাগল, আর যে চত্বরে বসে অতীতে বিখ্যাত প্রেমিক ক্যাসানোভা তার অসংখ্য প্রণয়িনীদের প্রেমপত্র লিখত এবং তার চারদিকে বাজনোতী পায়রার দল অশ্রান্ত গলগুঞ্জনে কলস বিপ্রহর-গুলিকে চঞ্চল করে তুলত—সেই চত্বরের এক পাশে জলের ধারে আমি বেদনায় বিবশ হয়ে বসে রইলাম।

ধীরে ধীরে রূপার মতটার জন্ম একটা ব্যাথাভরা করুণতা অনুভব করতে লাগলাম। সত্যই ত। জীবনের উষায় যে অফুরাট রক্তগোলাপের পাঁপড়ীর মত নরম নোলক ছিল, মধ্যাহ্নতাপের পর অপরাহ্নের রৌদ্রদীপ্তিতে সে পাঁপড়ীতে যে উষাই ধরা রেখে চলেছে সে এখনো সার্থকতা খুঁজে পাবে কি করে? হায়! প্রেমিকপ্রেমিকারা সবর সাগরতীরে বসে বালুকৌধ গড়তে ভালবাসে, কিন্তু সে সাগর ত সে দিনের জলরাশিকে সেখানেই রেখে যায় না। ইহলোকে কারো প্রেমের অপেক্ষা করবার অবসর নেই। আজ হচ্ছে সত্য, বর্তমান সত্য;

আসাবী স্বামীই সে হয়ে যাবে অতীত ও মিথ্যা। কবি গেয়ে গেছেন অনন্ত প্রেমের মহিমা, কিন্তু মানুষ চেয়ে সায় আজকের সান্ত প্রেমের মধুরতা। মিষ্টারই ত প্রথমটার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম সত্য নয়।

হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি রুপো নেই। অধীর ছরন্তপনায় লাগব করে কখন বোধ হয় সে অলক্ষিতে উঠে গেছে। অন্তরকে খুলে মেলবার সংকোচে সে বোধ হয় আর আমার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করতে চায় নি। এ কথা ভেবে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলাম যে সহানুভূতির মায়াকাঠিতে এক জনের মনের দুয়ার খুলতে পেরেছিলাম। এই প্রৌঢ়েরই মত কতজন নীড় বাঁধবার সাধটাপ করে প্রিয় পুর ও প্রিয়া সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তরে বা আফ্রিকার মত উষর অরণ্যানীর মধ্যে। তারপর কতজনেরই যৌবন বয় হয়ত এই মত করুণভাবে সমাপ্ত হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনার অজ্ঞাতসারেই বের হয়ে এল। তেমিসের জলরাশি সে নিঃশ্বাসে দুলে উঠল। সমগ্র মধুরজনী সে দীর্ঘশ্বাসে সাড়া দিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠেই সেই কথাগুলি আবার হৃদয় মথিত করে উঠতে লাগল। রুপোর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এ ভুলের জন্য তার অবশিষ্ট জীবন সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হবে; ক্লারেটাও কম কষ্ট পাবে না। যেমনই আমি শেলী রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, যদি তার এই ভুলটা তাকে না বুঝিয়ে দিতে পারি। তাকে এখনই খুঁজে বের করতে হবে। জ্যোৎস্নার আলোকে লোকে অবাস্তব ও সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে একটু বেশী করেই, দিনের আলোয় বাস্তব দৃষ্টিপথ বের করে নিতে পারে। তাই তাকে আজ সকালেই বোঝাতে হবে তার ভুলের কথা।

ভুল, নিশ্চয়ই ভুল। আমার সে বাইশবছরের বই-পড়া বালক মনে করে, কিন্তু সে জানে না বইয়ে কত সময় সত্যের আলো দেখতে পাওয়া যায়। কোনরকমে প্রাতরাশ শেষ করে ছুটলাম খালের ধারে। এবারে আর সোনার পাখরবাটী ইঞ্জিনে চালান নৌকায় কোন আপত্তি বোধ করলাম না। রিয়াল্টো সেতুর পাশে সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে রুপোর ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি বের করতে হবে। কি জানি যদি সে এতক্ষণে আবার ঘুরদেশে পাড়ি দিয়ে থাকে। বলা যায় না।

রিয়াল্টোর ঘাটে নেমে ক্লারেটার রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটু ইতস্তত বোধ করলাম। ওকে কি করে জিজ্ঞেস করব রুপোর কথা? কি না জানি ভাববে। অথবা হয়ত লজ্জা পাবে। বুঝতে কি আর পারবে না যে আমিও তাদের কাহিনী একটা মোহিনী রাতের মায়ার সুযোগ নিয়ে জেনে ফেলেছি?

সন্তর্পণে ঘাটের পাশে একটা ছোট কেক বিস্কুটের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম—জান কি ওই রেস্তোরাঁর যে প্রৌঢ় অংশীদার রুপো কাল এসেছিল সে কোথায় থাকে? যে রুপো যার কাল বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে এখানে, সেই রুপো?

দোকানী অবাক্ হয়ে গেল। বলল—রুপো ত মশায়, এখানে একজনই আছে, ওই রেস্তোরাঁর বুড়ীর সঙ্গে খুব ভাব। রোজই আসে আর যা জুয়ো খেলতে পারে,মশায়। যেমন জুয়ো খেলে,তেমনই 'কিয়াস্তি' খায়। ওস্তার, পাঁড় ওস্তার। এ কথা শুনেই পাশ ইটালীর নটবর ভঙ্গিতে দুই ঠোঁটের ফাঁকখানে স্মিত রেখে ঘনিকতা সূচক একটা শব্দ করল।

আমি একটু মরীয়া হয়ে বললাম—না, না সে নয়। সে কালই রাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছে তার কথা বলছি।

দোকানী বলল—ও তো একই লোক, সিনর। যদিও পড়ুয়া লোক, পেটে ভাল ভাবে 'কিয়াস্তি' পড়লে সে অবশ্য বেশই ঘুরে আসে। কাল বুঝি সে আপনার খরচায় খেয়েছিল?

সত্যিই ত। কাল তার কাহিনী শুনবার প্রলোভনে তাড়াতাড়িতে তার বিলটা আমিই মিটিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিছু শুনতে ভাল লাগল না। ধীরে ধীরে সরে গেলাম।

আস্তে আস্তে সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠতে লাগল। কিছুই ভাল লাগছে না। এলোমেলো মন নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শেষে ক্লান্ত হয়ে লিডোর সমুদ্র স্নানের সৈকত ছাড়িয়ে একটা উদ্যানকুঞ্জে এসে ঘাট পাথের ছায়ায় বসলাম। নীল আকাশ, নীল জল, মনে যেমনার নীল আভাস। স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে ধীরে আমার মানসিক ও দৈহিক অবসাদ মুছে দিতে লাগল। ক্রমে নিজেকে আবার খুঁজে নিলাম।

সেই খুঁজে নেবার ক্ষমতাটাই সত্য বলে মনে হল। রুপো আমায় ঠকিয়েছে; তেমিসের পূর্ণিমা রজনীর বিহ্বলতা আমায় ঠকিয়েছে। কিন্তু, কিন্তু যাক্ সে প্রবঞ্চনা। না হয় লোকে মনে করুক যে অভিজ্ঞের উপর বাহ্যির প্রভাবেই এমন একটা মোহময় সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞ ও কাজের লোকরা অনুকম্পা করে একটু মৃদু হেসে আমার আদর্শের রাসিটিকে লঘুমান মেনে। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যে স্যিডেকারের ভ্রমণ গ্রন্থে লেখা 'প্রাসাদের রাজপুত্রী' বা 'দুর্গম দুর্গের অন্ধকার গুহ্য পথ' প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী বিশ্বাস করে লোকে তাকে বোকাই বলবে। ও সব কাজ অভ্রান্তচিত অর্থাৎ "রেসপেক্টেবল" নয়।

না হোক্। তবু আমি সেই গল্পে এখনো বিশ্বাস করি। না করে উপায় কি? রুপো ও তার তাজের প্রেম কাহিনী শুনে রাত্রিতে ঘুম আসছিল না মোটেই। অধীরভাবে পাইচারী করতে করতে আমি একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম রুপোর তাজকে উপহার দিব বলে।

রমণীর ধূলি প্রেম
নরপেরে দিল অমরতা
নিরুপায় নিরুদ্যমে
রাখি গেল তোমার বারতা;
মর্মরের মর্ম মাঝে
দিয়ে গেনু জোছনা আখরে
অনন্ত কালের পাতে
লাভ মোর জীবন খাজরে।

সে কবিতার পিছনে যে অনুভব ছিল তা ও মিথ্যা নয়।

সে গল্প বিশ্বাস না করে উপায় কি? তেমনিতে যে মদির চাঁদিনী রাতে সুনীল জলরাশি এখনো পতঙ্গদের আগে পাশে মায়া জাল বুনতে বুনতে চলে। সে সব স্মৃতি সব সময় মনে আসবে না। যদি বা আসে, দিবা স্বপ্নের মত অলীক বলে তাদের মনে হবে। প্রেমকে যে সর্ব্বদা পরিহার করে চলা উচিত সে কথা বহুবার নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েছি। হয়ত আর কখনো কোন বিমুগ্ধ নিশীথে চোখে স্বপ্নের অঞ্জন ও হৃদয়ে সহানুভূতির কাতরতা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসব না। কাজের ভিড় ঠেলে কোন প্রেমকাহিনীর অস্ফুট আবেদন মনের গহন স্তরে উঁকি দেবে না। সম্ভবত তেমনিতর রাত্রিগুলি শুধু স্বপ্নই। কিন্তু সে রাত্রিটি ত স্বপ্ন নয়।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

শ্রীঊর্ম্মিলা দাশ এম-এ

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মেয়েদের ভালোমন্দ, সুখ দুঃখ, অন্তর্দ্বন্দ্বকেই আপনার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখনীতে তাই ফুটে উঠেছে আমাদেরই ব্যক্তিগত ঘরোয়া সাধারণ জীবনের নানা বৈচিত্র্য।

নারী হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ, বেদনা, প্রেম ও মাতৃত্ব, আত্মবলিদান যাঁর তুলিতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে তাঁকে স্মরণ করেই আজ আমি আপনাদের কাছে দুএকটি কথা বলতে চাই। আমাদের বাস্তব জীবনে শরৎ-প্রতিভাকে আমরা কতটুকু মূল্য দিয়েছি কিংবা দেওয়া সম্ভবপর, সেকথাটি আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রের অসাধারণত্ব সম্বন্ধেই আমি কিছু বলতে চেষ্টা করব।

তাঁর অঙ্কিত নারী-চিত্র গুলিকে সম্ভবত মোটামুটি ৩ ভাগে ফেলা যেতে পারে। প্রথম আমাদের সামাজিক পরিবেষ্টনে, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যাঁদের পরিচয় আমরা পাই। যেমন পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, দত্তা প্রভৃতি। যত স্তরে পাই তাঁদের ছবি যাঁরা অন্যায় বা করে, সামাজিক রীতিনীতি পালন করেও আমাদের ভুলের জন্যই চির-নিন্দিত হয়েছেন। যেমন বড়দিদি, বিরাজ-বৌ, অন্নদা, ষোড়শী, রমা, সরযূ। সর্ব্বশেষে আমি তাঁদেরই উল্লেখ করছি যাঁরা মানব ধর্ম্মের, নারী ধর্ম্মের সত্যিকারের সীমা লঙ্ঘন না করেও কুলত্যাগিনী, অপ্সরা বলে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অভয়া, তারপর রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলা, কমল, বাসুনের মেয়ে জাহ্নবী ও সন্ধ্যা।

প্রথম স্তরের সাধারণ পারিবারিক জীবনে যাঁরা চরিত্রের সরলতায় ও মাধুর্যে আপনাদের ব্যক্তিত্বকে সাধারণের চেয়ে অনেকখানি উঁচুতে তুলে ধরেছেন যেমন বিন্দু, কাদম্বিনী, পোড়াকাঠ, শৈল, আমাদের বাস্তব জীবনে তাঁদের দেখা আমরা অনেক জায়গায় পেয়ে থাকি। স্নেহে, কোমলতায়, ধৈর্য্যশিলতায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁরা আমাদের চির-নমস্য। সেই প্রাচীন যুগ থেকে এঁদেরই করুণা-গান ধ্বনিত হচ্ছে। কাজেই এঁদের কথা আর বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

তারপরে যাঁদের উল্লেখ করছি তাঁরা আমাদের অজ্ঞতা ও ভুলের জন্য, দুঃখ, লাঞ্ছনা, সমাজের দণ্ড বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেছেন। উদারতায়, বলিষ্ঠ সাহসিকতায়, আপন হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে নিবিবাদে তাঁরা তিলে তিলে আত্মবিসর্জ্জন করেছেন। যেমন রাধারী, রমা, অন্নদা। এই অন্নদা দিদির চরিত্রের একনিষ্ঠতা ও মাধুর্য্যের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে বৈষ্ণব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিব্রতা সাধ্বীর সঙ্গেই এঁকে শ্রদ্ধা জানানো যায়। তিনি ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বললেন "কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সুখবর্ত্তিনী বই ত নয়। স্বামীর সুখ যে আমার নিজেরই সুখ। একদিন গভীর রাতে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই পুরত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই জানিল, সবাই শুনিল, "অন্নদা কুলত্যাগ করিয়াছে" আমাদের সমাজে এঁদের মত চরিত্র বিরল নয়। রীতিনীতির খুঁটিনাটি অনেক অন্নদা, রাধারী, রমা, হেম নিজেদের নীরবে বলি দিয়ে থাকেন। সে আদর্শ ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্নের উত্তর আশা করি শরৎচন্দ্র একদিন আপনাদের কাছ থেকেই পাবেন।

তৃতীয় পর্য্যায়ে যাঁদের নাম করছি তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি সমস্যা। সামাজিক জীবনের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছাড়িয়ে মেয়েদের কোন সার্থক সন্ধানে লাভ হতে পারে কিনা, আজকের দিনে এ প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে ভেবেছেন তারই আভাস দিতে চেষ্টা করব। তাঁর নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, একথা বলা চলে না। অভয়ার জীবনের জটিলতা যে কত কঠিন কত গভীর সেটা তার দুএকটা উক্তি থেকেই বোঝা যাবে। অনাথা, অসহায়া, কপর্দ্দকশূন্য অভয়া, বহুদিন—ব্রহ্মদৈত্যক স্বামীর নিকট উপস্থিত হয়ে লাভ করল মোহাঘাত। এ সম্বন্ধে স্বীকারের সঙ্গে তার যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে দুএকটি কথা আপনাদের বলছি। স্বামীর কর্ত্তব্য জ্ঞানের উল্লেখ করে অভয়া বলল "অর্দ্ধহীন মন্ত্র আবৃত্তি তার মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল—কিন্তু সেকি সমস্ত শুনল, সবও হাসির রেখে গেল শুধু স্নেহমাখা বলে আমারই উপরে? একদিন আমাকে ঘিরে বিয়ের মন্ত্র পড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই পড়িয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা? একজন মিথ্যাবাদী, কপাচারী, স্বামী বিশ্বা মেয়ে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে তখনই কি তার সমস্ত স্বামীত্ব

যার পক্ষ হওয়া চাই? সব জাতে সব ধর্মে এ অধিকারের প্রতিষেধ আছে—বিষ্ণুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হয়ে গেছে? অতএব এই প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরই একদিন দিতে হবে।

তারপর রাজলক্ষ্মী একনিষ্ঠতায়, আত্মত্যাগে, কোমলতায় আমাদের অন্তরে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। সমাজের অত্যাচারে একান্তে এক কুলীন পাচক ব্রাহ্মণের হাতে রাজলক্ষ্মী ও তার বোনকে সমর্পণ করা হ'ল, মন্ত্র পড়ে। কিন্তু তার সত্যিকারের মর্যাদা যে কার ওপরে নির্ভর করছিল সেকথা রাজলক্ষ্মীর মুখ থেকেই শুনুন। শ্রীকান্তকে সে লিখেছে "পেরেছিলুম তোমাকে অনেক ওপস্যায়, অনেক আরাধনায়, আমাকে ত্যাগ করার অধিকার তোমার হাতে নেই। ফুলের মালা গেঁথে কোন শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম। বালিকার পূজার অর্ঘ সেদিন তোমার গলায়, তোমার বুকের পরে রক্ত-রেখায় যে লেখা এঁকে দিতো, সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছেছিল। তারপরে এলো আমার দুর্দিনের রাত্রি, কলঙ্ক দিয়ে দুচোখের সকল আলো নিভিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?" শ্রীকান্তের জন্য এই সীমাহীন একনিষ্ঠ ভালোবাসা সামাজিক কষ্টিপাথরে যাচাই করে এর ভালোমন্দ বিচারের ভার শরৎচন্দ্র আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

কমললতার বিচার লেখক একটুখানি মিস্রেই করেছেন বলে মনে হয়, কারণ বিদ্যা অপবাদে কমললতার আশ্রম ছেড়ে যাবার সময় আশ্রমের বড় গোঁসাইএর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, তিনি বললেন "নির্দোষীকে ঘর করে যদি জিনে থাকি তবে মিথ্যে তাঁর নাম দেওয়া, মিথ্যে আমার এ পথে আসা।" সেই বিশ্বাসের জোরে কমললতার কথা থেকেও তার কিছু পরিচয় পাই। শ্রীকান্তকে সে বলল "আমি জানি আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও—এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।" ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাও কমললতার কম ছিল না, সে রাজলক্ষ্মীকে চিঠিতে লেখেছে "সুখেই আছি বোন্, যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার ভার যে তাঁদের ভাই।" বৈষ্ণব কবির নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণের ভাবটিই এখানে সুন্দর, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সাবিত্রী চরিত্রের শুচিতাই কি কম? সতীশের একাগ্র ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে সে বলল "না আর একটি কথাও না, তোমার দেহটাকে ও তুমি পূর্বেই নষ্ট করেছ, সে না হয় একদিন পুড়েও ছাই হতে পারবে, কিন্তু একটা অপবিত্র কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালী মাখিয়ো না।" সাবিত্রীর এই আত্ম-বিসর্জন ও নিষ্ঠাই ওকে একটি মহত্ত্ব দান করেছে। এই চরিত্রের ভালো মন্দ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু যেটুকু বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে আমি সেটুকুই আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি।

শরৎচন্দ্রের শেষ-প্রশ্নের কমলকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এই প্রশ্নে তিনি যে একটা সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন সেটা খুবই সত্যি। তাঁর মনোগত একটা বিশেষ আদর্শকেই তিনি কমলের মধ্য দিয়ে মূর্তি দিয়েছেন। কমল কারো কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে না। নীতি নিয়মের, সমাজের অনুশাসনের বাইরে ও যে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকতে পারে, চিরন্তন প্রশ্ন অবমাননা করলেই মানুষ ছোট হ'য়ে যায় না, মানুষে মানুষে একটি সহজ সত্যিকারের বন্ধন থাকতে পারে এ দেখাই ইঙ্গিত তিনি কমলের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কমলের মনে আত্মসম্মান, মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধারও যে অভাব ছিল না তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকার ও সীমা যে কোথায় পৌঁছুতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি একটু আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। নীলিমার উক্তি থেকে আমরা কমলের একটু পরিচয় পাই। বেলার পরিত্যক্ত স্বামীর অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে নীলিমা বলল "ওঁর অবস্থায় কমল কি করত, তা সেই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী মজুরের ভাষা শেখাই করে আহার সংগ্রহ করতে হোত—তাও হয়ত সবদিন জুটত না। কমল যার যাই করুক, যে স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্র লজ্জানিবারণ করে বাঁচতে চাইত না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরত।" মেয়েদের সম্মানিত সম্বন্ধ কিরূপ হ'তে পারে সেটাও থেকে আমরা খানিকটা বুঝতে পারি।

আমাদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে শরৎচন্দ্র কতদিক থেকে যে ভেবেছেন কমলের কথায় তা ধরা পড়ে। শিবনাথ সম্পর্কে অভিজ্ঞের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কমল বলেছে "নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর পরেই থাক্। সে বিচারের বাহির পুরুষের নিজে কাজ নেই—মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন স্ত্রী বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ, কলুষিত হ'য়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে মামলার আর নিষ্পত্তি হ'তে পেলে না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অভিজ্ঞবাবু, দু'পক্ষের সর্বনাশ করে।" সামাজিক রীতি নীতির বিরুদ্ধে কমলের কিছোহ নীলিমার মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—"ওর মত বেপরোয়া হ'য়ে উঠতে আমরা পারিনে। কারণ জগৎ সংসার যে কালী গায়ে ছেলে মেয়ে, সে ভুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই। সমাজের অত্যাচারে জ্বলে মরেছি কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা ও আজকাল নরনারীর মুখে মুখে—কিন্তু ঐ মুখের বেশী আর এক পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েছি স্বাধীনতা তত্ত্ব বিচারে মেলে না—কেউ কাউকে দিতে পারে না, দেনা পাওনার বস্তুই এ নয়; কমলকে দেখলেই বোঝা যায়—এ নিজের পূর্ণতার, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে।"

শরৎচন্দ্র নারীর ও মানুষ নিয়েই তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই যে কয়েকটি ছবি আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি তা নীতির মাপ কাঠিতে, মনুষ্যত্বের বিচারে ভালো কি মন্দ—তার বিচার আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৬

পরদিন প্রাতে, যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন প্রভাতের অরুণিমা আমার কক্ষে ও আমার শয্যার উপর তাহার অমল স্নিগ্ধ স্বর্ণাভা অনেকটা ছড়াইয়া দিয়া একটা মুগ্ধ সৌন্দর্য্যের সূচনা করিতেছে। বাহিরে উচ্ছল জীবন প্রবাহ জাগিয়া উঠিয়াছে—সর্ব্বত্র মুখর সজীবতা—ব্যাকুল চাঞ্চল্য। আলোকে, বর্ণে, শব্দে, সেই তরুণ চেতনার স্পন্দন আমার এই নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া আঘাত করিতেছে। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দে দাঁড়াইলাম। গৃহপ্রাঙ্গণের উপবনের অপর পারে, রাজপথে, জনস্রোতের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, সকলই সজীব, সচেতন, সচঞ্চল। প্রভাতের অরুণালোকে একটি ক্ষুদ্র বিহঙ্গম তাহার কলকাকলীতে নীলিমা প্লাবিত করিয়া দুইটি ক্ষুদ্র পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক অনন্তের বক্ষে অভিযান করিয়াছে। অসীমের বক্ষে এই ক্ষুদ্রের অভিযান, অনন্ত কলস্রোতে ক্ষুদ্র মানবজীবনের মত, সমুদ্র বক্ষে বুদ্বুদের মত—অনন্ত পথের যাত্রী, আকস্মিক, উদ্দেশ্য-বিহীন, অনিশ্চিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্রের চাঞ্চল্য, সুবিশাল শুভ্র প্রভাতের আকাশকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষণিক স্পন্দন, এই মুহূর্ত্তের উদ্বেলন যাহা অনন্তের স্তব্ধতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, যাহা মৌন ও মূককে মুখর করে, সে রহস্যময়ী শক্তি কি?—কে বলিয়া দিবে? তমসার অন্ধ জন্তুটীর উপর এই আলোক সম্পাত কোথা হইতে হয়? এই জীবনরশ্মির রেখা জড়কণায় সঞ্চার করা মানবের সাধনার এখনও বহু দূরে। কিন্তু এই রহস্যময়ী দীপ্তিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে এই ক্ষুদ্র মানবের সামান্য শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

গত রাত্রে আমরা দুইটি জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছি। ভগবান্ তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধের উপদেশ আমাদের ক্ষণিক জল্পনা কল্পনার ফলে ভঙ্গ করিতে হইল। প্রাণহনন হইতে বিরত হইতে ভগবান্ তথাগত যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা কি গত রাত্রের চর-ধারণ বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারিত?—গুপ্তচরদিগের প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর কোনও উপায়ে কি ইহাদের এই সাধারণের অনিষ্টকর বৃত্তি হইতে নিরস্ত করিবার উপায় ছিল না?—কিন্তু তাহাদের এই ঘৃণ্য ও হীন এবং জন-সমাজের অমঙ্গলজনক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিবার অন্য পন্থা আর কি ছিল?—যদি কেহ সাধারণের উৎপীড়নে দৃঢ়ব্রতী হয় এবং তাহার প্রচেষ্টায় যদি বহু নিরপরাধ ব্যক্তির জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে, কিংবা তাহার প্রয়াসের ব্যর্থতাসাধনে জনসমাজকে একটা অবশ্যম্ভাবী ও সমধিক অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে যে কোনও প্রকারে উহা সম্পাদন আবশ্যক। আর, যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মানবের হিতকল্পে ব্রতচারিণ করিয়াছে, সেই সর্ব্বহারার দলকে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে দুই একজন ঘৃণ্য, নীচ, স্বার্থপর মনুষ্য নামধেয় জীবের জীবনস্পন্দন যদি চিরতরে রোধ হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ।—ইহা হত্যা নহে—ইহা একটা বৃহত্তর পাপানুষ্ঠানের প্রতিরোধ।—জনসাধারণের উপর একটা ব্যাপক অত্যাচার ও উৎপীড়নের নিরাকরণ—একটা ভাবী ভীষণ ও সাধারণ রক্তপাতের প্রতিবিধান—বিষ বৃক্ষের অঙ্কুর বিনাশসাধন। কিন্তু প্রাণাতিপাত—না, ইহা প্রাণাতিপাত হইতেই পারে না—মানবের হিতকল্পে ইহা চরম উৎসর্গ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুর মত এই সকল ক্ষুদ্রতর হীন মনুষ্য নামধেয় পশুর বধসাধন বিধেয়—সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠেয়।

কিন্তু প্রাণাতিপাত—হত্যা—চিরকালই হত্যা। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া—একটা মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যপদেশে ইহার ঔচিত্য প্রদর্শন করা কি হত্যাকারীর আত্মপ্রবঞ্চনা নহে? হত্যা যে জন্যই সম্পাদিত হউক, উহা হত্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে।—দীপ নির্ব্বাণ

সংযোজিত হইল—সে দীপ ইঙ্গুদী তৈল দীপই হউক, বা এরণ্ড তৈলে সে দীপ প্রজ্বলিত থাকুক, অথবা রাজপ্রাসাদ কক্ষ উদ্ভাসিত করিবার জন্য বহুমূল্য গন্ধ তৈলে সুসজ্জিত দীপই হউক, কিংবা মৃৎপ্রদীপ বা সুবর্ণ বর্ত্তিকাধারই হউক।

কিন্তু, আজ আমার চিত্ত এত চঞ্চল হইবার কারণ কি? যাহাদের জীবনে যবনিকাপাত হইল, তাহারা যদি আজ কোনও প্রকারে মুক্তি পাইয়া সংসারে সক্রিয় থাকিত, তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রচেষ্টা হইতে কখনই বিরত হইত না; কারণ ইহাই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল এবং ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠেয় ছিল। তাহাদের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে কত নির্দ্দোষ, নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক নরনারী বিপর্য্যস্ত হইয়া ইহলোকের হইতে অপসারিত হইয়াছে।—তাহাদের গণনা কে করিয়াছে? না—ইহাদের দণ্ডবিধান ঠিকই হইয়াছে—ইহাতে অনুশোচনার কিছুই নাই।

আর ধর্ম্ম ও সংঘের রক্ষাকল্পে, আর্ত্তের ত্রাণের জন্য এবং জনসাধারণের মাৎস্যন্যায়ের কবল হইতে মুক্তকল্পিতে যে ব্রত আমরা ধারণ করিয়াছি তাহাতে দণ্ডনীতি অনুসারে অত্যাচারীকে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারণ করা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। নিরপরাধ ও নিরীহ আর্ত্তকে ত্রাণ করিতে যদি আমরা বিরত থাকি তবে আমাদের এইব্রত-গ্রহণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ। দুষ্কৃতদিগের দণ্ডবিধান না করিলে উৎপীড়িত আর্ত্তের ত্রাণ সম্ভব নহে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডনীতিতে চরম দণ্ড প্রধানের ব্যবস্থা আছে। গত কল্য চরগণের দণ্ডবিধান তদনুসারেই হইয়াছিল।

যাহা করিয়াছি ভাল ঠিকই করিয়াছি। ইহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ ন্যায়বিচারেই হইয়াছে। আমাদের ব্রতের সাফল্যের জন্য দণ্ডনীতি প্রয়োগ অনেক বিষয়ে ও অনেক সময়ে আবশ্যক।

ঠিকই হইয়াছে।—দণ্ডনীতির প্রয়োগ যথা নিয়মেই হইয়াছে। ইহারা মানবের শত্রু। সমাজকে বিপর্য্যস্ত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। নীতিজ্ঞগণ মন্ত্ররক্ষা সম্বন্ধে যে বিধান করিয়াছেন তাহা যে অত্যন্ত সুচিন্তিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর মন্ত্রভেদ প্রচেষ্টার যে প্রতিবিধান করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ সমীচীন। এই চরগণ অত্যাচারের অভিনব উপায় উদ্ভাবনের পথপ্রদর্শক। ইহাদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা মাৎস্য-ন্যায়ের বীজ বপন করে; বিদ্রোহের সৃষ্টি ইহাদের দ্বারাই হয়; অবাঞ্ছিত বিপ্লবের অকাল-প্লাবনের পথ পরিমুক্ত করা ইহাদেরই কার্য্য।

আর ইহা ত আমার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আমি শপথ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—যদি আবশ্যক হয় আর্ত্তের ত্রাণকল্পে উৎপীড়িতকে বিধ্বস্ত করিব।—এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—আমি আমার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সুসংযতভাবে এবং দণ্ডনীতির অনুজ্ঞা ও বিধান অনুসারে পালন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি; তবে আমার আজ এই চাঞ্চল্য কেন? বোধ হয় ইহা দুর্ব্বলতা, প্রাচীন এবং আধুনিকের শিক্ষার ও চিন্তাধারার সহিত অভিনব নির্দ্দেশের সংঘাত। যাহা করিয়াছি তাহা ভ্রান্ত অনুষ্ঠান নহে—স্বার্থান্ধ কর্ম্মবিচ্যুতি নহে।

আমি অলিন্দ হইতে নিম্নে অবতরণ করিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক গৃহ-প্রাঙ্গণের একটি প্রস্তর বেদিকায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, এমন সময়ে প্রজ্ঞা ও শেখর আসিল। তাহারা আসিয়া বেদিকায় আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। শেখর প্রত্যহ প্রাতে কপিশায় স্নান করিতে গিয়া থাকে এবং আমাদের ঘাটেই সে স্নান করে; অদ্যও সে তেমনিই গিয়াছিল এবং নদীতীরে তাহার প্রাত্যহিক সূর্য্যোপাসনা সমাপন করিয়া, সঙ্কর্ষণ বাসুদেব মন্দিরে বাসুদেব পূজা সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। পথে আমার সহিত তাহার দেখা করিবার ইচ্ছা হইল এবং আসিবার সময়ে বাটীর দ্বার সন্নিকটে প্রজ্ঞার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। প্রজ্ঞাও আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল। আমরা তিনজনে বহির্বাটীর একটি কক্ষে একত্রে বসিলাম।

শেখর বলিল, "অদ্য প্রাতে নগরে একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে! প্রত্যূষে নগর কোটাল ঘোষকের দ্বারা নগরের পথে পথে প্রচার করিয়াছে যে নগর হইতে দুইজন যবন অদৃশ্য হইয়াছে এবং একদল বিজাতীয় বেশধারী ও অজ্ঞাত ভাষাভাষী—সম্ভবতঃ একদল পার্ব্বত্য দস্যু আসিয়া তাহাদের গৃহের তৈজসপত্র ও অপর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি কেহ তাহাদের সন্ধান বলিয়া

দিতে পারে বা তাহাদের সন্ধানের সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে সে পঞ্চশত স্বর্ণ দীনার বা বিবেচনানুসারে ততোধিক পুরস্কার পাইবে। এ ঘোষণা তুমি শুনিয়াছ কি ?"

আমি বলিলাম, "না শুনি নাই।—অদ্য প্রত্যূষে উঠিতে পারি নাই—বিলম্ব হইয়াছে—কিংবা, হয়ত ঘোষক এখনও এ পথে আসে নাই।"

ঠিক এমনই সময়ে একটা তূর্য্যধ্বনি শ্রুত হইল এবং তৎপরে ক্ষত্রপের এই অভিনব অনুশাসন যাবনিক ও গান্ধারের সাধারণ প্রচলিত উভয়বিধ ভাষায় বিঘোষিত হইল। এই উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত ঘোষণা আমরা সকলে শুনিলাম।

আমি বলিলাম, "এইরূপ একটা গোলযোগ যে উঠিবে তাহা ত আমরা সকলেই জানি—তাহার জন্য চঞ্চল ও অধীর হইয়া কি হইবে ?"

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষণাটা লিপিবদ্ধ করিলে হয় না ?"

আমি বলিলাম, "তাহার ত আমি কোনও আবশ্যকবোধ করিতেছি না।"

প্রজ্ঞা বলিল, "ভবিষ্যৎ কার্য্য সূচনায় আমাদের ইহা আবশ্যক হইতে পারে না কি ?"

আমি বলিলাম, "আমাদের কার্য্যসূচনার সহিত ইহা কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট নহে। এই সকল বাধা বিঘ্ন আকস্মিক এবং গত কল্যের মত সেই সকল বিঘ্ন নির্ম্মূল ও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। আর গত কল্যের ঘটনার পর এইরূপ ঘোষণা ত স্বাভাবিক। ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে আমাদের ত কোনও লাভই নাই—এবং বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ বিপদ ?"

আমি বলিলাম, "এই লিপি যদি কোনও প্রকারে হস্তান্তরিত হয় ও অবশেষে যদি ক্ষত্রপের কোনও গুপ্তচরের হস্তগত হয়, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া লেখকের উদ্দেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যায় মিশ্রিত করিয়া সংঘের কর্ম্মপন্থায় নূতন বাধা সৃজন করিতে পারে। কেমন ?—ইহা সম্ভব নয় কি ?"

প্রজ্ঞা বলিল "হাঁ, নূতন বিঘ্নের সৃষ্টি ইহা হইতে অসম্ভব নহে।"

শেখর বলিল, "কিন্তু যদি আমাদের সংঘের ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য এই ঘোষণার আবশ্যক হয় তখন আমরা কি করিব ?"

আমি বলিলাম, "এই ঘোষণা আমাদের কর্ম্মপন্থায় কখনও কোনও প্রয়োজন হইবে না। ইহার মূল আমরা উচ্ছেদ ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছি।—গত কল্যের ঘটনা একটা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া যাও।—আর যদি ইহার আবশ্যক হয় ত ইহা আমার সম্পূর্ণ স্মরণ থাকিবে।"

প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিল, "সমগ্র অনুশাসন উভয়বিধ ভাষায় তুমি স্মরণ রাখিতে পারিবে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, পারিব। পরীক্ষা কর; শুন তবে আমি বলিয়া যাইতেছি ?"

আমি সমগ্র ঘোষণা আদ্যোপান্ত উভয়বিধ ভাষায় আবৃত্তি করিলাম। শেখর ও প্রজ্ঞা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শেখর বলিল, "তুমি শ্রুতিধর—আর তুমি ঠিকই বলিয়াছ। যখন অনুশাসনের মূল আমরা উচ্ছেদ করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়াছি, তখন তাহাতে আর আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহার কোনও প্রয়োজন হইবে না।"

কিন্তু প্রজ্ঞা এই ঘোষণা লিখিয়া রাখিবার পক্ষে তর্ক উত্থাপন করিল। সে বলিল, "ইহার প্রয়োজন হইবে না এরূপ কথা ত বলিতে পার না—ভবিষ্যতে ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হইবে তাহা এখন বলিতে পারা যায় না। হয় ত, আবশ্যক হইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "আমি ত বলিতেছি আমার স্মরণ থাকিবে—আর তাহার প্রমাণও ত আমি দিলাম।"

—তাহা ত তুমি দিয়াছ। কিন্তু যদি তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়, তখন যদি সংঘের এই ঘোষণা প্রয়োজন হয়, কোথায় পাওয়া যাইবে ?

—তবে লিখিয়া রাখ—কিন্তু, ঐ লিপি তোমাদের আপনার নিকট রাখিবে—দেখিও, যেন কোনওরূপে উহা অপর কাহারও হস্তে গিয়া না পড়ে।—তবে লিখিয়া লও!"

আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, "রাজাধিরাজ ভ্রাতা হেরময়াত্মপুত্রীত গান্ধার-পুরুষপুরাধিষ্ঠানের ক্ষত্রপ মহাবলাধিকৃত অমাত্যপদে—"

এমনঃ সময়ে শেখর বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু প্রজ্ঞা,

আমার মনে হয় দেবদত্ত যথার্থ-ই বলিয়াছে—ক্ষত্রপের এই ঘোষণা আমাদের লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোনও সার্থকতা নাই। আর এই লিখন রক্ষা কার্য্যে আমাদের সামান্ত অনবধানতায় একটা মহা অনর্থের সূচনা হইতে পারে। লিখিয়া রাখিয়া কাজ নাই।"

প্রজ্ঞা বলিল, "বেশ তবে থাক, ইহা আর লিখিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই।"

প্রজ্ঞা ক্ষত্রপ-প্রচারিত ঘোষণা আর লিপিবদ্ধ করিল না, আমিও উহা আবৃত্তি করিতে নিরস্ত হইলাম।

আমরা আমাদের কথাবার্ত্তা সমাপ্ত করিয়া পরস্পরের নিকট তখনকার মত বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় নায়ক পুষ্টপাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে আসিয়া বলিল, "এই যে। তিন জনেই এখানে আছ। নগরে কি হইতেছে তাহার সংবাদ বোধহয়, ইতিপূর্ব্বেই তোমরা পাইয়া থাকিবে?"

আমি বলিলাম, "ক্ষত্রপের ঘোষণা ত শুনিলাম—আর কোনও সংবাদ ত পাই নাই—আরও কিছু আছে না কি?"

পুষ্টপাল বলিল, "আছে। নগরের যে অংশে পার্ব্বত্য প্রদেশের এবং তক্ষশিলার বণিক ও সার্থবাহগণ বাস করে সেখানে তাহাদের উপর ভীষণ উৎপীড়ন হইতেছে। নগরপাল ও চৌরদ্ধরনিকের বাহিনী তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—নগরপালের ও চৌরদ্ধরনিকের ধারণা যে, দুইজন যবন এই সকল বিদেশী বণিক ও সার্থবাহগণের দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্ত নগর হইতে অপসৃত হইয়াছে এবং তাহাদের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে।—অন্ততঃ ইহাদের জ্ঞাতসারেই হইয়াছে ও ইহারা হয়ত তাহাদের অনুসন্ধানে সহায়তা করিতে সক্ষম, এইরূপ অনুমান করিয়া নগরপাল এই পীড়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন হইতে ইহাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল? তুমি কখন এবং কাহার নিকট হইতে এ সংবাদ পাইলে?"

পুষ্টপাল বলিল, "ইহাদের পল্লীতে কল্যরাত্রি হইতে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে; কয়জনকে ধরিয়া নগরপালের নিকট লইয়া গিয়াছে।"

—এই সকল সার্থবাহ ও বিদেশী বণিকগণের একটা নিগম আছে না?

হাঁ আছে।—ঐ নিগমে আমাদেরও একটা বিপণী আছে।

—উহাদের অনেকের সহিত তোমরা বোধ হয় বিশেষভাবে পরিচিত।

—হাঁ, উহাদের অনেকের সহিত আমার পিতার এবং আমার পরিচয় আছে। সকলেই প্রায় আমাদের বিপণীতে পণ্য বিনিময়ের জন্ত আসিয়া থাকে। কেহ কেহ তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্ত আমাদের বিপণীতে রাখিয়া যায়।

—তাহা হইলে তুমি ইহাদিগকে বলিও যেন ইহারা এখন কোনও প্রকার বিক্ষোভ প্রদর্শন না করে এবং ধৃত ব্যক্তিগণ যে নিরপরাধ তাহা তাহারা ক্ষত্রপের গোচরে যেন আনয়ন করে। শেষর, আর্য্য জ্যেষ্ঠতাত ইহাদের মুক্তির জন্ত কি চেষ্টা করিবেন?

শেষর বলিল, "ক্ষত্রপ বিচারকার্য্যের সময়ে পিতাকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্ত অনুরোধ করেন। ধৃত ব্যক্তিগণের বিচারের জন্ত অন্ত অপরাহ্ণেই হয়ত সভা আহূত হইবে। এতক্ষণে হয়ত ক্ষত্রপের সভায় উপস্থিতির জন্ত অনুরোধপত্র পিতার নিকট আসিয়া পঁহুছিয়াছে। পুষ্টপাল, মণ্ডপীর নেতৃস্থানীয় জনকয়েককে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে বলিবে।

পুষ্টপাল বলিল, "আমি এখনই বিপণীতে গমন করিয়া সার্থবাহ নিগমের কয়েকজন নেতাকে ডাকিয়া আনাইয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া দিতেছি।"

শেষর বলিল, "তাহাদের নিজের ভাষায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে বলিবে। পিতা তাহাদের ভাষা অতি উত্তমরূপেই জানেন।—গান্ধারের ভাষায় তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে হয়ত এই সার্থবাহগণ ততটা সক্ষম হইবে না।"

আমি বলিলাম, "শেষর ভাই, তুমিও এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিও! জ্যেষ্ঠতাতকে বুঝাইয়া বলিবে যে ধৃত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ, বিনা প্রমাণে ও ভিত্তিহীন সন্দেহে এই সকল বিদেশী বণিকগণ ধৃত হইয়াছে।"

—আমি এখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি।—পুষ্টপাল, এই বণিক নেতৃমণ্ডলীকে পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্ত মধ্যাহ্নে আমাদের গৃহে যাইতে বলিবে।

আমি বলিলাম, "তবে, তাহাই হউক—বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন।"

শেষর ও পুষ্টপাল উঠিল। আমরা তখনকার মত পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে সার্থবাহ পীড়ন নামক ষোড়শ বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

মিশোশেপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছয়

রংলা বাগানটায় অজস্র ভাঁট ফুল ফুটেছে। বেগুনি রঙের হালকা একটুখানি ছোঁয়া-লাগা রাশি রাশি শাদা ফুলে যেন চারদিক আলো করে দিয়েছে, মধুর একটা বুনো গন্ধ যেন সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রেল লাইনের ওপারে একটা ন্যাড়া মুড়ো মাদার গাছ—এখান থেকে মনে হয় তার সারা গায়ে রঙের ছিটে। আমের মুকুল থেকে শুকনো পাতার ওপরে টপ টপ করে মধু পড়বার শব্দ। বসন্ত।

রহু চুপ করে ছাই গাদাটার পেছনে বসে ছিল। উড়তে উড়তে হঠাৎ এল হলদে রঙের একটা বড় প্রজাপতি, সেরাকুল কাঁটার হলদে ফুলের গুটো উড়ন্ত পাপড়ি যেন। কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল নীলাভ কালো রঙের মস্ত বড় একটা ভ্রমর। গোটা তিনেক শালিক পাখি নাচতে নাচতে এগিয়ে এল, কিচ্ কিচ্ করে রহুকে যেন জিজ্ঞাসা করলে, কী ভায়া, এমন চুপচাপ যে? ব্যাপারটা কী? আমাদের দুটো চারটে টিল পাটকেল মারবার মতলব নাকি? কোথা থেকে তীব্র মিহি গলায় একটা চিল চেঁচিয়ে উঠল—যথাকালে বোধ হয় মরা ইঁদুর-টিঁদুর কিছু জোটেনি, খুব সম্ভব ওর খিদে পেয়েছে। বাতাবী লেবু গাছটার কালো কোটরের ভেতরে এক জোড়া কাঁটার মতো উজ্জ্বল গোল চোখ দেখা যাচ্ছে—ওখানে দুটো প্যাঁচা থাকে। চোখ বড় বড় করে বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করছে—বেলা ডুবতে আর দেরী কত।

বেশ লাগে। বেশ লাগে এখানে নিরিবিলিতে এম্নি করে বসে থাকা! কেমন যেন হয়ে গেছে, পাড়ার কারুর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, ভালোও লাগে না। স্বদেশী আন্দোলনের ঝাঁঝটা মরে গেছে, আবার ফিরে আসছে সেই পুরোণো, সেই স্বাভাবিক দিনযাত্রা। আজ রবিবার—মনসাতলায় তেম্নি পরমোৎসাহে মার্বেল খেলা চলছে, তেমনি আনন্দ ভরে উঠেছে বাগবন্দীর কোলাহল। শুধু রহুর মনের সুর কেটে গেছে। কী একটা চাই, কিছু একটা একান্ত দরকার। যখন সমস্ত দেশটা এক সঙ্গে ত্রিবর্ণ পতাকার শপথ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তখন দূরে দাঁড়িয়েছিল রহু, দেখেছিল দর্শকের অভিভূত একটা দৃষ্টি নিয়ে, ভাবতে চেষ্টা করেছিল—বুঝতে চেয়েছিল সমস্তটাকে! আজ ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে সব কিছু। ঘরের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে উঠেছে এখন। কিন্তু এখন আন্দোলন থেমে গেছে—এখন সন্ধি, এখন শান্তি। এখন তার কিছু করবার নেই।

কিন্তু কিছু করা চাই। ভোনা, কালী, পূর্ণ, যাদু যত সহজে এগিয়ে গিয়েছিল, তত সহজেই আবার নিজেদের জায়গাতে ফিরে এসেছে—ভুলে গেছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু রহুর তো তা নয়। ঝড় যখন থামল তখন তার ঘা এসে লাগল তার বুকের মধ্যে। দেরী করে এসেছে বলেই যেতে চাইছে না।

কি করবে? কিছু জানে না। আজকাল তার আজগুবি খেয়াল জেগেছে একটা—লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে। মিষ্টি কোমল কবিতা নয়। জীবনে যাকে সে রূপ দিতে পারল না, কবিতার ভেতর দিয়ে ধরতে চায় তাকে। বলাতে চেষ্টা করে ভালো ভালো শব্দ: রুদ্র, নটরাজ, ঈশ্বর, বিষাণ, শৃঙ্খল, বহ্নি, শোণিত, আহব।

লেখার চাইতে আরো ভালো লাগে কবিতার বই। সেদিন একটা বই এনেছিল পাশের যতীনবাবুর বাড়ি থেকে: "সর্বহারাদের গান।" আশ্চর্য লেগেছে তার কতগুলো লাইন:

"বাহিরিয়া এসো বন্ধু, আসিয়াছে মুক্তির আহ্বান,
সাগরের কূলে কূলে দুলে দুলে অরুণ নিশান
ডাকিছে তোমারে সখে, দেশে দেশে সাজে বীরদল,
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তরবারি রণ কোলাহল—"

শুধু ওইগুলো নয়। আরো অনেকগুলি কথা আছে, অপরিচিত নাম আছে। তাদের অর্থ রঞ্জুর কাছে পরিস্ফুট নয়। কিন্তু পরিস্ফুট না হোক, সমুদ্র-ঢেউয়ের গম্ভীর গর্জনের মতো বিশাল দুর্বোধ্য কণ্ঠে কিছু একটা যেন তারা বলবার চেষ্টা করে। ভয় করে, ভালো লাগে :

"মিশরের জগলুল, সাথে যায় বীর ডি-ভ্যালেরা,
সানিয়াৎ সেন-মন্ত্রে চলে নব দীক্ষিত চীনেরা।
সব আগে ওই চলে গুর্জরের তাপস-নির্ভর,
মৃদুতায় মেষশিশু, পরাক্রমে কেশরী দুর্জয়!
সত্যাগ্রহ-ধ্বজা ধরে পিছে চলে কোটি নর-নারী,
জেগেছে ভারতবর্ষ—সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী—"

সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী। বার বার আওড়াতে ইচ্ছে করে পংক্তিগুলোকে। এলোমেলোভাবে খবরের কাগজে চাকল্য কর বিবরণ মনে পড়ে : ম্যাজিস্ট্রেট নিহত। বোমা বিস্ফোরণ। বিদ্যুৎচমকের মতো ফিরে আসে শৈশব-স্মৃতি—বেড়ে ছেলে অশ্বিনীর সেই গবেষণা। এরাই কি নিখিলিষ্ট!' মাটির তলায় এদেরই কি বন্দুক-পিস্তলের কারখানা। ক্ষুদিরামের কামানের কি গর্জে ওঠবার সময় হল এতদিনে?

একদিন বৈরাগী এসেছিল বাড়িতে। একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল ননীচোরা যশোদা দুলালের গান। চমৎকার মিষ্টি গোকটির গলা। রঞ্জু তাকে এক মুঠো চালের সঙ্গে দুটো পয়সাও দিয়েছিল।

খুশি হয়ে বৈরাগী বলেছিল, আরো গান শুনবে খোকাবাবু! স্বদেশী গান?

স্বদেশী যুগ। আগ্রহভরে রঞ্জু বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বদেশী গান শোনাও।

একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে বৈরাগী গান ধরেছিল :

"একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।"
অভয়রামের দ্বীপান্তর যা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
লাট সায়েবকে মারতে গিয়ে মারলেম ভারতবাসী।
বারো বছর পরে
জনম নেব মাসীর ঘরে মাগো,
চিনতে যদি না পারো মা, দেখবে গলায় ফাঁসি—"

বৈরাগীর অজ্ঞতা আর কল্পনার বহর মনে করলে আজকে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের হাসি পায়, কিন্তু রঞ্জু—সেদিনের ছোট রঞ্জুর হাসি পায়নি। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল তার—বুকের ভেতরে যেন দ্রুত পায়ের শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বড় বড় চোখ মেলে আগ্রহ-ব্যাকুল রঞ্জু জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা বৈরাগী, তুমি জানো অভয়রাম কে, ক্ষুদিরামই বা কে?

বৈরাগী বলেছিল, ওই গানেই তো আছে।

—না, না, তুমি বলো।—রঞ্জুর স্বরে আকুলতা প্রকাশ পেল : আচ্ছা, সত্যি বলো তো, ক্ষুদিরামের কি ফাঁসি হয়েছে?

ছেলেমানুষি প্রশ্নে বৈরাগী কৌতুক বোধ করেছিল : ফাঁসি না হলে তো গানই হত না খোকাবাবু।

—কক্ষণো নয়, কিছু জানো না তুমি। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়নি। মাটির নীচে তার বোমার কারখানা আছে।

হঠাৎ ভয় পেয়েছিল বৈরাগী। চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে মেপে নিয়েছিল একবার—এই সাংঘাতিক ছেলেটির ভয়ঙ্কর কথা কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে কি না। তার পর তাড়াতাড়ি বলেছিল, গান গানই খোকাবাবু, আমরা গরীব দুখ্যুসুখ্যু মানুষ—অত আমরা জানব কোত্থেকে?

গোপীযন্ত্রে দ্রুত ঝঙ্কার তুলে বৈরাগী চলে গিয়েছিল :

"নাচে আমার মাখনচোরা ননী লয়ে হাতে"—

একটা অতৃপ্ত হতাশায় ভরে গিয়েছিল রঞ্জুর মনটা। বিশ্বাস হয় না—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়নি, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে মাটির তলায় নিঃশব্দে তার কারখানার কাজ চলেছে। একদিন উঠে আসবে তার কামান—একদিন ভেঙে-চুরে শেষ করে দেবে সমস্ত, একদিন—

একা একা ছাইগাদাটার পাশে বসে এসব ভেবেছে রঞ্জু, ভেবেছে নির্জন কাকন নদীর ধারে, বৈচিবনের নীচে বিছানো মখমলের মতো নরম কুয়ো-বালির ওপরে বসে। এখন আর ভয় করে না কাকন নদীকে, লোহার পুলের তলা থেকে কালীমূর্তি উঠে আসবে খেটক-খর্পর নিয়ে—এটাকে একটা ছেলেমানুষি আতঙ্ক বলেই মনে হয় এখন। নদীর নীল নির্মল জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ভেতরে এই সব কথা নিজেই আলোচনা করেছে রঞ্জু—ভেবেছে ক্ষুদিরামের কথা, তার কারখানার কথা।

আজও এলোমেলোভাবে এই সমস্তই মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল। 'জেগেছে ভারতবর্ষ, সাবধান, ওরে স্বেচ্ছাচারী।' কিন্তু একটা ক্ষোভ তাকে পীড়ন করছে, কাঁটার মতো ফুটছে একটা বিশ্রী অস্বস্তি। সত্যিই কি জেগেছে ভারতবর্ষ? যদি জাগলই, তবে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল কেন? এখনো কি ঘুমিয়ানের উঠে আসবার সময় হয়নি, শেষ হয়নি তার নির্জন নিস্তব্ধ তপস্যার?

—রঙ্গু?

কে ডাকে? চকিত হয়ে রঙ্গু ঘাড় ফেরালো। এখানে, এই নিরিবিলি বিড়কির বাগানে আবার কে এসে হানা দিয়েছে? ভারী বিরক্তি বোধ হল।

কিন্তু যে ডাকছিল তার দিকে চোখ পড়তেই সে বিরক্তি আর রইল না—কপালের মেঘ কেটে গিয়ে আলো হয়ে উঠল সমস্ত মুখ—বিস্ময়ে এবং আনন্দে।

একটু দূরে পরিমল দাঁড়িয়ে।

—পরিমল? আয় আয়—

হাসিমুখে পরিমল এগিয়ে এল।

—অনেক খুঁজে তোকে আবিষ্কার করা গেল। বাপরে, যা জংলা বাগান—গোরু হারালে পাত্তা মেলে না। বেশ চমৎকার জায়গাটা বার করেছিস তো?

রঙ্গু শুধু হাসল।

—নির্জনতার ওপরে তোর খুব ঝোঁক আছে দেখছি!—একটা গাছের ছায়ার যেখানে রোদের তাপ না পেয়ে খানিকটা হলদে রঙের বিবর্ণ ঘাস উঠেছে, সেইখানে পা ছড়িয়ে বসল পরিমল।—সেদিন দেখলুম একা একা নদীর ধারে ঘুরছিস, আজ দেখছি চুপচাপ করে বসে আছিস বাগানে। ব্যাপার কি রে? একেবারে ভাবুকের মতো চাল-চলন, কবিতা-টবিতা লিখিস নাকি?

রঙ্গু চমকে উঠল, মুখের ওপরে খেলা করে গেল রক্তের উচ্ছ্বাস। অন্তর্যামী নাকি পরিমল? তার কবিতার খাতা এখনো একান্তভাবে তারই নিজস্ব জিনিস—পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো মানুষকে সে খাতা দেখানোর উৎসাহ তার নেই, সাহসও না। একটা গোপন অপরাধের মতো—গোটের মেলায় চুরি করে আনা সেই সাবান আর স্নোর শুদ্ধির মতো এ তার মনের ভেতরেই লুকিয়ে রাখবার জিনিস।

রঙ্গু কী জবাব দেবে, সেটা ভেবে ঠিক করবার আগেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে পরিমল। মনের ওপর থেকে নেমে গেল একটা অস্বস্তির বোঝা।

পরিমল বললে, তোকে একটা কথা বলবার জন্যে খুঁজছিলাম রঙ্গু।

—কী কথা?—বিস্মিত কৌতুকে রঙ্গু চোখ তুলল। একবার আপাদমস্তক দেখে নিলে পরিমলের। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে চেহারা—সে যে বড়লোকের ছেলে এ কথা কাউকে না বলে দিলেও চলে। নিখুঁত সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল, গায়ে একটা সিল্কের হাফসার্ট, পায়ে হরিণের চামড়ার চটিজুতো। একটা ব্যবধান আছে—সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে; শুধু রঙ্গুর সঙ্গে নয়—পাড়ার সকলের সঙ্গেই। ওকে কাছে পাওয়ার কথা, জেঠ্রা কিম্বা খাঁদুর মতো ওর সঙ্গে মার্বেল খেলার কথা মনেও পড়ে না। তবু ওর ভেতরে কিছু একটা আছে—যা মনকে টানে, ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী একটা আশ্চর্য ইঙ্গিতের দ্যোতনা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাদের ভেতরে। কিন্তু একটা ব্যথা বোধ আছে—সূক্ষ্ম একটা অনুযোগ জেগে আছে কোনোখানে। যেন আশা করেছিল ঠিক সেটা পায়নি—কোথাও মোহভঙ্গ হয়ে গেছে তার।

মনে পড়েছে। সেই কংগ্রেস ময়দান থেকে প্যারেড করে আসবার দিন—

কিন্তু আজ রঙ্গু কোনো কথা ভাববার আগেই পরিমল ভাবছে। বললে, আমার ওপর খুব চটেছিস, নারে?

—কেন? চটব কেন?

—বাঃ সেদিন! তোরা সব প্যারেড করে আসছিলি, আমি ঠাট্টা করেছিলাম?

ক্ষুণ্ণ গম্ভীর গলায় রঙ্গু বললে, তাতে চটবার কী আছে? তুমি এসব পছন্দ করো না, তোমার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না। সেজন্যে রাগ করে তো লাভ নেই?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করছিল পরিমল—কিছু একটা ভাবছিল। রঙ্গুর কথাটা শুনেছে অথচ যেন তার মানে বুঝতে পারেনি, এমনি একটা ফাঁকা দৃষ্টিতে খানিকটা সে তাকিয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে বললে, তোদের বিশ্বাস আছে, স্বাধীনতা আসবে?

—কেন আসবে না?—রঞ্জু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল: তিরিশ কোটি লোক জেগে উঠেছে। তারা আর পড়ে পড়ে পরাধীনতার অপমান সইবে না।

পরিমল মৃদু হাসল।

—তা হলে এই তিরিশ কোটি জেগে-ওঠা লোক কী করবে এখন?

—লড়াই করবে ইংরেজের সঙ্গে।

—লড়াই করবে? বেশ, খুব ভালো কথা—এর চেয়ে ভালো কথা আর কিছুই হতে পারে না। আমি শুধু জানতে চাইছি—এই লড়াইটা হবে কী উপায়ে?

—কেন?—মুখস্থ করা কথাগুলো রঞ্জু আউড়ে যেতে লাগল: অহিংস আত্মত্যাগে। আইন-অমান্য আন্দোলনে। বিদেশী বয়কট করে।

পরিমল বললে, কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়—পুথ্যি হয়। কিন্তু ওরা যদি গুলি চালায়? মারে?

—মরব। কত আর মারবে? মরতে মরতেই স্বাধীনতা আসবে।

পরিমল এবার খিল খিল করে হেসে উঠল: তা হলে পাঁটা আর মুরগীর স্বাধীনতা আজ পর্যন্ত এল না কেন? পৃথিবীর প্রথম দিনটি থেকে এ অবধি ওরাই তো মরেছে সব চাইতে বেশি!

—কিন্তু ওরা খাদ্য—পরিমলের জেরার ধরণে রঞ্জু ক্রমশ বিব্রত হয়ে উঠছিল: মানুষ তো আর খাবার জিনিস নয়। তা ছাড়া ওরা প্রতিবাদ করতে পারে না, মানুষে প্রতিবাদ করতে পারে।

পরিমল বললে, সে প্রতিবাদ কি সহিংস?

—না, অহিংস।

—তা হলে বলির পাঁটা কাঠগড়ায় ফেলবার সময় যে ব্যাঁ ব্যাঁ করে ডাকে, সেটাও তো অহিংস প্রতিবাদ?

—কী মুশকিল! মানুষ আর পশুকে তুমি একভাবে দেখছ কেন?

পরিমল রঞ্জুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অপলক-দৃষ্টিতে: তোমার কি বিশ্বাস ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে কখনো?

—করে না?

নিশ্চয় না—কথাটার ওপরে অস্বাভাবিক একটা জোর দিয়ে পরিমল করে না। তাই কথায় কথায় ওরা আমাদের লাথি মারে, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পোষা কুকুরকে রুটি খাওয়ায়। দুনিয়ার কালো জাতিদের ওপরে ওদের কোনো সহানুভূতি নেই। শিকার করার আনন্দে ওরা আফ্রিকায় গিয়ে কালো মানুষগুলোকে গুলি করে মারে, আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপরে চালায় অকথ্য অত্যাচার, অষ্ট্রেলিয়ায় সুখের রাজত্ব গড়তে গিয়ে ওরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়েছে।

রঞ্জুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে চলে গেল। এ কে কথা কইছে? এ কোন্ পরিমল?

পরিমল বলে চলল, তুই বলছিলি, মানুষ খাদ্য নয়। কে বললে নয়? মানুষের চাইতে ভালো খাদ্য কী আর কিছু আছে? কালো মানুষের সর্বস্ব গ্রাস ক'রে ওরা রাঙ্গার চালে কাস কাটাল, আমাদের সব কিছু লুটে-পুটে নিয়ে ওদের লণ্ডন ঝলমল করে ওঠে। ওরা বলে, আফ্রিকার লোকে নর মাংস খায়। দু' দশটা মানুষকে তারা খায়—আর এরা খাচ্ছে কোটি কোটি মানুষকে। তারা যদি বর্বর নরখাদক হয়, তা হলে এদের সভ্যতাটা কী রকমের?

বদলে গেছে পরিমল—এ নতুন পরিমল। গলার স্বর অল্প অল্প কাঁপছে, চকচক করছে চোখ দুটো, প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন কথায় কথায় ঠিকরে পড়ছে আগুন: অহিংসা দিয়ে এদের রুখতে পারবি রঞ্জু? একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে এসে তুই কি হাত জোড় করে বলতে পারবি, আপো বাপু, হিংসেটা বড় খারাপ, তুমি এই তুলসীপাতাটা খেয়ে বেঁচে ওঠ, তার-পরে ঘরে গিয়ে বিনয়াত 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' বলে কেত্তন গাইতে থাকো?

—কিন্তু ওরা তো সাপ নয়।

—না। সাপের চাইতেও ওরা সাংঘাতিক। আমরা মানুষ নই—পশু; ওরা মানুষ নয়—নরখাদক। আমরা যদি মানুষ হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারি তবে ওরাও মানুষ হবে—নইলে নয়।

—সেটা কি অহিংসা দিয়ে সম্ভব হতে পারে না?

—না। কোনোকালে পৃথিবীর কোনোদেশ তা পারেনি। আজও পারবে না।

—তা হলে ?

—তা হলে মার খেয়ে পড়ে থাকাই সার হবে। যা এবারেও চল।

রঙ্কু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল : তোর কথা আমি মানি না।

—বেশ তো, মানা না মানা সে তো তোরই হাত। কিন্তু দুঃখ কী জানিস রঙ্কু ? চোখ বুজে যারা যুক্তিকে অস্বীকার করে, তাদের দুর্গতি কোনোকালে ঘোচে না।

পরিমল চুপ করল, রঙ্কু চুপ করে রইল। বাগানটা নির্জন। শেফালির কাঁটার হলদে ফুলের পাতলা পাপড়ির মতো পাখনা মেলে সেই প্রজাপতিটা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমের গাছে শিস্ দিচ্ছে দোয়েল, মুকুলের টাটকা ভাঙা মধু খেয়ে তার আনন্দের যেন সীমা নেই। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুতরো ফুলের গন্ধ, ভাঁট ফুলের গন্ধ। ওদিকের ডাঙা আমগাছটায় বেয়ে বেয়ে উঠেছে বুনো কাঁকরোলের মস্ত একটা লতা, দু' তিনটে মস্ত কাঁকরোল সেখান থেকে টুকটুকে লাল চাওয়ার দুলছে রঙীন বেলুনের মতো। বহুদূর থেকে গুম্ গুম্ করে একটা চাপা অস্পষ্ট শব্দ আসছে—একটু আগেই যে মাল গাড়িটা সামনের রেল লাইন দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা এখন কাঞ্চনজঙ্ঘার পুলটা পার হচ্ছে বোধ হয়।

কয়েক মিনিট কেটে গেল চুপ চাপ। হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁট ফুলের মঞ্জরী ছিঁড়ে আনল পরিমল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, তুই বই পড়তে ভালোবাসিস রঙ্কু ?

রঙ্কু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। কথার সুরটা নতুন ঠেকছে।

পরিমল আবার বললে, পড়ার বই ছাড়া আর কিছু তোর ভালো লাগে ?

রঙ্কু হাসল : পড়ার বই ছাড়া আর সব বই পড়তেই ভালো লাগে।

—উপন্যাস পড়িস ?

—পড়ি বই কি। বাবার আলমারী থেকে চুরি করে আনি।

—শরৎচন্দ্রের বই পড়েছিস ?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো ? অনেক বই পড়েছি তার। দত্তা, শ্রীকান্ত, বিন্দুর ছেলে—

ভাঁটফুলের মঞ্জরীটা নিজের মুখের ওপরে বুলোতে লাগল পরিমল : বেশ লেখে লোকটা, তাই না ?

—চমৎকার।

পরিমল আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে, শরৎচন্দ্রের একখানা বই আছে, নাম শুনেছিস কখনো ? 'পথের দাবী' ?

—'পথের দাবী ?' না শুনিনি তো।

—পড়বি বইটা ?

—দেবে ?—রঙ্কু লোলুপ হয়ে উঠল।

—দেব, কিন্তু এখন নয়।—পরিমল বললে, তার আগে তোকে আরো খানকয়েক বই পড়তে হবে, নইলে সে বইটার মানে ঠিক বুঝতে পারবি না।

—বেশ তো, দাওনা বই। সাগ্রহে রঙ্কু বললে, আজই দেবে ?

—আজই ?—পরিমল আবার একটু চুপ করে রইল : আচ্ছা, আয় তবে আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—কেন ?—পরিমল উজ্জ্বল ভাবে হাসল : আমাদের বাড়িতে ? বই তো আর আমি সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি না। তা ছাড়া—পরিমলের কথার ভেতরে একটা অস্পষ্ট গোপনতার ইঙ্গিত ফুটে বেরুল : সঙ্গে করে নিয়ে বেরুনোর মতো বইও সেগুলো নয়। একটু লুকিয়েই পড়তে হবে—ধরা পড়লে একেবারে সর্বনাশ।

—সর্বনাশ ? কেন ?

—সেটা পরে বুঝতে পারবি—পরিমলের কথার ইঙ্গিতটা যেন চোখের চাউনিতেও এবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল : আয় রঙ্কু আমার সঙ্গে।

—তোদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। কেন, তোর লজ্জা করছে নাকি ?

—যেৎ, লজ্জা আবার কিসের ?—লজ্জিত মুখে রঙ্কু উঠে দাঁড়ালো।

* * * *

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মমত আছে, তার প্রায় সব কটাতেই উপবাস বা অনশনের বিধান রয়েছে। এই উপবাস ব্যবস্থা প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গেই একটা সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম হিন্দু ধর্মে মনে হয় অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা উপবাস সবচেয়ে বেশী। হিন্দুর মানা পূজাপার্বণে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন তিথিতে উপবাস করার প্রথা বর্তমান। মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় পর্ব যেটা ঈদ্, তাতে তারা একটানা একমাস ধরে দিনে উপবাস করে। এ ছাড়া মহরম মাসে ১০ দিন এবং ঈদের উপবাসের সাক্ষী হিসাবে আরও ৩ দিন উপবাস করে। এই উপবাসের ব্যবস্থা তাদেরও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং পার্শী ধর্মেও উপবাসের প্রথা আছে। বৌদ্ধরা প্রতি ৮মী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে বিহারে (বৌদ্ধমঠ) যাইয়া উপাসথ (উপবাস) পালন করেন এবং বুদ্ধের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ও আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই এইরূপ ব্যবস্থা। বুদ্ধ, যীশু, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ধর্মগুরুই ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য উপবাস করেছেন। এই সেদিন ১৯৪০ সালের শেষভাগে সারা ইউরোপ জুড়ে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, তখন ইউরোপে যাতে আবার শান্তি ফিরে আসে এবং ইউরোপবাসীরা যাতে ভগবানের সাক্ষাৎ পায়, তার জন্য খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপও সাতদিনের জন্য উপবাস করেছিলেন।

ধর্মের কথা বাদ দিলে শারীরিক প্রয়োজনেও মাঝে-মাঝে উপবাসের প্রয়োজন হয়। শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে অনেক সময়ে উপবাস একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

উপবাসের সঙ্গে ধর্ম ও স্বাস্থ্যের যে একটা সম্পর্ক আছে এটা আদিমকাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এই উপবাসকে যে আমার একটা নির্দোষ অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, একথা বোধহয় মহাত্মা গান্ধীর আগে কেহ জানতেন না। গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, এই উপবাস বা অনশন হোল তার শেষ চরম অস্ত্র। এ যেন মহাস্ত্রী অর্জুনের ঠিক পাশুপত অস্ত্র। এর প্রয়োগও যেমন অদ্ভুত নয়, ফলও তেমনি অব্যর্থ। যুক্তি ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে (অবশ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনই হোল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত) যদি এই অনশনের প্রয়োগ হয়, তা হোলে প্রতিপক্ষ, সে যত বড়ই শত্রু, নিষ্ঠুর বা কঠোর হউক না কেন, তাকে পরিবর্তিত করবেই এবং অনশনকারী সত্যাগ্রহীর জয় নিশ্চিত হবেই। নিজের উপবাসের দ্বারা অপরকে যে এত সহজে জব্দ করা যেতে পারে, এরূপ অস্ত্র এর আগে কোন দিন কেহ দেয় নি। সাধারণ কলকারখানার শ্রমিকদের অনশন ধর্মঘট, জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন প্রভৃতি সেখানেই এই অনশন ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে রয়েছে, সেখানেই তারা কৃতকার্য হয়েছে। এ উদাহরণ আজ আমাদের চোখের সামনেই ঘটে চলেছে।

এই অনশন অস্ত্রের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী কখন কোন অবস্থায় পড়ে তিনি নিজে এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের নিকটে তার কিরূপই বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, এবার তারই আলোচনা করা যাক্।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অতি বাল্যকাল থেকেই আত্মশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য মাঝে মাঝে উপবাস করে আসছেন। তিনি সর্বপ্রথম একটানা কয়েকদিন উপবাস করেন, তাঁর এক বিলাসপ্রিয় পুত্রের সংশোধনের জন্য। এরপরে তিনি তাঁর এক বন্ধুর কল্যাণ কামনায় কয়েকদিন উপবাস করেছিলেন। কিন্তু এই সব উপবাস তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে সাধারণের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি সর্বপ্রথম সাধারণ উপবাস আরম্ভ করেন, দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স আশ্রমের দুইজন কর্মী অন্যায় কাজ করলে, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি প্রথমে সাত দিনের উপবাস ও সাড়ে চার মাস একবেলা আহারের ব্রত গ্রহণ করেন। এই উপবাসের কিছুদিন পরে আর একবার ১৪ দিন উপবাস করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেও এর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই তিনি পুরাপুরি ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ভারতবর্ষে এসে তাঁর প্রথম সাধারণ উপবাস হোল, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এই সময়ে আমেদাবাদ মিলের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে গান্ধীজী একটা মিটমাটের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। মিলমালিকদের তরফ থেকে যিনি বেকুব হয়েছিলেন তিনি ছিলেন, অম্বালাল সরাভাই। এই সরাভাই আবার গান্ধীজীর বিশেষ বন্ধুস্থানীয়। গান্ধীজী অম্বালাল সরাভাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে শ্রমিক-মালিক বিরোধের বিষয়টি সালিশীতে দেবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সরাভাই তা প্রত্যাখ্যান করলেন। গান্ধীজী উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন, একদিকে সরাভাই তাঁর বন্ধু, অপর দিকে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী।

গান্ধীজী অবশেষে ন্যায়ের পক্ষই অবলম্বন করলেন। শ্রমিকদের বললেন—ধর্মঘট সুরু কর। কেহ কাজে যোগ দিও না। আর তিনি শ্রমিকদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে, শ্রমিকরা সর্বথাই অহিংস থাকবে এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী থেকে বিচ্যুত হবে না।

অম্বালাল সরাভাইএর ভগ্নী অনুসূয়া বেন ভাইএর বিরুদ্ধে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

বেশ শান্তভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রমিকরা দু সপ্তাহ ধর্মঘট চালিয়ে

দেন। কিন্তু এর পর থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। কেহ কেহ ধর্মঘট ছেড়ে কাজে যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। মালিকরাও এই সুযোগ পেয়ে আরও শক্ত হোল।

শ্রমিকদের মধ্যে এইরূপ ভাঙন দেখে গান্ধীজী নিজেকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত বলে মনে করলেন। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। এমনি সময়ে তিনি হঠাৎ যেন একটা আলোর সন্ধান পেলেন। তিনি স্থির করলেন—একটা সম্মানজনক মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে শ্রমিকরা যদি ঠিক না থাকে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় না করে, তা হোলে আমি আর কোনরূপ খাদ্য স্পর্শ করব না।

গান্ধীজীর মুখ থেকে কথাটা বেরোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্তা অনুসূয়া বেনের চোখে জল গড়িয়ে পড়ল এবং এই কথাটায় শ্রমিকদের মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। শ্রমিকরা গান্ধীজীকে বলল—উপবাস আমরাই করব, আপনি নয়। আপনি যদি উপবাস করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে সেটা বড় কষ্টকর হবে। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পুনরায় আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের দাবীতে আমরা এবার নিশ্চয়ই দৃঢ় থাকব।

গান্ধীজী কিন্তু অনশন ভাঙলেন না। তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। গান্ধীজীর এই অনশনের ফলে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে পুনরায় একতা এসে গেল এবং গান্ধীজীর এই অনশন মিল-মালিকদেরও হৃদয় নিয়ে স্পর্শ করল। শ্রীযুক্তা অনুসূয়া বেনের মুখে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের মিটমাটের জন্য সভা বসল এবং তাড়াতাড়ি একটা মিটমাটও হয়ে গেল। তখন গান্ধীজী তিনদিন পরে অনশন ভঙ্গ করলেন।

গান্ধীজী আত্মশুদ্ধির জন্য জনসাধারণকে সর্বপ্রথম উপবাসের নির্দেশ দেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতরক্ষা আইনে যে সকল বিধান প্রয়োগকরা হয়েছিল, যুদ্ধান্তে সেইগুলিকেই আবার স্থায়ী করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে রাউলাট কমিটি বিল রচনা করে আইনে পরিণত করার জন্য বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিলেন যে, রাউলাট বিল যদি আইনে পরিণত করা হয়, তাহলে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কথা উপেক্ষা করে ১৯১৯ সালের ৬ষ্ঠা মার্চ বিলটী আইনে পরিণত করলেন।

এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ আরম্ভের দিন ধার্য করলেন। এটাই হোল ভারতে তাঁর প্রথম সত্যাগ্রহ। ঐ দিন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য তিনি যে নির্দেশ দেন, তাতে হরতাল পালন, জনসভা করে রাউলাট আইনের প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে আত্মশুদ্ধির জন্য দেশবাসীকে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী উপবাস করারও কথা বলেন। মহাত্মা গান্ধীর এই আহ্বানে আদমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত সেদিন সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এই নিয়ে বহুস্থানেই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়ের পক্ষ থেকেই হাঙ্গামা ও খুন জখমের সৃষ্টি হয়েছিল। জনসাধারণের পক্ষ থেকে অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এই সময়ে এক সভায় বলেছিলেন—সত্যাগ্রহ খেলা করার খেলা। লোকে যদি শান্তি না রাখে, তবে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চালান আমার দ্বারা কখনও সম্ভব হবে না।

এর কয়দিন পরেই মহাত্মা জনসাধারণের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজে তিনদিন উপবাস করেন এবং সাধারণকে একদিনের উপবাসের পরামর্শ দেন ও যারা খুন ইত্যাদির সহিত জড়িত ছিল, তাদের দোষ স্বীকার করতে বলেন।

১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজরা ভারতীয়দের উপরে এক নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এই ১৩ই এপ্রিলের উল্লেখ করে, পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে "ইয়ং ইণ্ডিয়াতে" তিনি লিখেছিলেন—The day of the days should be devoted to fasting and prayer—এই দিনের মত দিনটিকে উপবাস ও প্রার্থনায় অতিবাহিত করা উচিত। সেই থেকে গান্ধীজী প্রতিবৎসরই ঐ দিনটিতে উপবাস করে আসছেন এবং দেশবাসীর অনেকেও তাঁর উপদেশ পালন করেন।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এক বেসরকারী জনতা গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামের থানা লুঠ করে এবং পুলিসের লোকদের নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারে। এ সম্পর্কে তখন যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় যে, পুলিসের ২১ জন এবং জনতার মধ্যে ২ থেকে ২৫ জন মারা গিয়েছিল। এই বেসরকারী জনতার মধ্যে অসহযোগী সত্যাগ্রহীও থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে ইহা এক দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কংগ্রেস-অহিংসায় বিশ্বাসী এবং অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকরাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তারা সর্বদা অহিংস থাকবে। অসহযোগীদের দ্বারায় এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটায় চৌরী চৌরার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে পাঁচদিনের জন্য উপবাস করেন।

ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর সর্বপ্রথম দীর্ঘ অনশন হোল ১৯২৪ সালে। এই সময়ে ভারতের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। গান্ধীজী হিন্দুমুসলমানের এই বিবাদ বন্ধ করে উভয়ের মধ্যে মিলন আনবার জন্য ১৯২৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১ দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করেন। ঐ দিন তিনি তাঁর অনশন সম্পর্কে এক বিবৃতিতে জানালেন—

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আবার নিকটে অনুভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ধর্ম আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, যখন দুঃখ বন্যার আসে এবং একজন যখন তাকে কিছুতেই দূর করতে পারে না, তখন সে অবশ্যই উপবাস ও উপাসনা করবে।...আমার কোন কথা বা লেখা দুটো বিবদমান সম্প্রদায়কে কিছুতেই এক করতে পারবে না। তাই

আমি আজ থেকে ২১ দিনের জন্য অনশন করা স্থির করেছি। এটা একদিকে প্রায়শ্চিত্ত এবং সেই সঙ্গে উপাসনা।...আমি সমস্তরে উচ্চ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে, এমন কি ইংরাজদেরও আমন্ত্রণ করছি যে, তাঁরা যত শীঘ্র সম্ভব এই ঘৃণ্য ও অমানুষিক পাপের প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

গান্ধীজী দীর্ঘদিনের জন্য অনশন আরম্ভ করতেই সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লী সহরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্সী, ভারতীয় খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজদের এক সম্মিলন বসল। এর পর থেকেই বাধা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসতে লাগল। বাধার অবসান হোলে ৮ই অক্টোবর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। ঐদিন ভারতের সর্বত্রই মিলন দিবস পালিত হোল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেখানে যুক্তি ও আবেদনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূর করতে অকৃতকার্য হয়েছিলেন, মহাত্মা গান্ধী অনশনের দ্বারায় তা সম্ভব করলেন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩১ সালের ৮ই আগষ্ট যে কমিউন্যাল এওয়ার্ড বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন, তার প্রতিবাদ হিসাবে পরদিনই মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়ে ছিলেন—আমি আমরণ অনশন ভিন্ন এই এওয়ার্ড রদ করার আর কোন পথ দেখছি না।

২০শে সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধীজী কমিউন্যাল এওয়ার্ডের প্রতিবাদ হিসাবে অনশন সুরু করলেন। গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করলে অনুন্নত ও বর্ণহিন্দু নেতারা যারবেদার একটা চুক্তিবদ্ধ হলেন। এদিকে গান্ধীজীর অবস্থার অবনতি দেখে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাও তাড়াতাড়ি মিলিত হোল এবং তাঁরাও অনুন্নত ও বর্ণহিন্দুদের চুক্তি মেনে নিতে স্বীকৃত হলেন। অবশেষে গান্ধীজী ২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অনশন ভঙ্গ করলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে বরা অক্টোবর পর্যন্ত সমস্ত দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা বর্জন দিবস পালিত হোল এবং পুণায় অস্পৃশ্যতা বর্জন উপলক্ষে যে বিরাট সভা হোল তাতে সভাপতিত্ব করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

মহাত্মা গান্ধী আত্মশুদ্ধি ও সহকর্মীদের শুদ্ধির জন্য ১৯৩৩ সালের মে মাসে যারবেদা জেলে একবার ২১ দিন অনশন করেন। ৮ই মে বেলা ১২টা থেকে এই অনশন আরম্ভ হয় এবং ২৯শে মে পর্যন্ত অনশন চলে। এই অনশন সম্পর্কে তিনি তখন বলেছিলেন—

আমার মরার ইচ্ছা নাই। আমি মানুষের সেবার জন্যই বাঁচতে চাই। তবে আমি এবং আমার সহকর্মীরা, আমরা সকলেই যাতে আরও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারি এবং প্রকৃত দোষ হবার উপযুক্ত হতে পারি, তারই চেষ্টা করছি। আমার কয়েকজন সহকর্মীর কয়েকটা অন্যায় কাজের কথা আমার কাণে আসে, আশা করি আমার এই অনশন তাদের কাছে একটা জরুরী আহ্বান হিসাবে গিয়ে পৌঁছবে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট থেকে গান্ধীজী সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করার নির্দেশ দেন এবং গান্ধীজী নিজে ১লা আগষ্ট তারিখেই গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজী জেল থেকে হরিজন সেবার কাজ চালাতে চাইলে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি সর্ত দেন। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে ১৭ই আগষ্ট থেকে অনশন আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন অনশনের পর তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। তখন গবর্ণমেণ্ট ২৩শে আগষ্ট তারিখে বিনা সর্তে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলেন এবং কারাগার থেকে পুণায় সেহুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলেন। গান্ধীজীর এই অনশন তাঁর মুক্তির দিন ২৩শে তারিখ পর্যন্ত চলেছিল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী তাঁর সহকর্মী সত্যাগ্রহীদের অন্যায় কাজের জন্য আর একবার নিজে অনশন করেছিলেন। এই সময়ে হরিজন সেবার কাজে গান্ধীজী যখন দেশভ্রমণ করছিলেন, তখন একজন স্বেচ্ছাসেবক আন্দামানে একজন দণ্ডিতকে প্রহার করে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওয়ার্ধা সত্যাগ্রহ আশ্রমে গান্ধীজী ৭ই আগষ্ট থেকে এক সপ্তাহের জন্য অনশন করেন।

এরপরে গান্ধীজী যে অনশন করেন, সেটা হইল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজকোট দেশীয় রাজ্যের শাসনসংস্কার ব্যাপার নিয়ে। রাজকোটের রাজা ঠাকুরসাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যে শাসন সংস্কার না করায় রাজ্যের প্রজারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করে। গান্ধীজীর সহধর্মিণী কস্তুরবাঈ গান্ধী ছিলেন রাজকোটের মেয়ে। তিনিও এই সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজী ঠাকুর সাহেবকে দিয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করাবার জন্য রাজকোটে গিয়ে ৭ই মার্চ থেকে সেখানে অনশন আরম্ভ করলেন এবং বললেন—রাজা যদি না তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, তাহা হলে আমার এই অনশন মৃত্যু-দিন পর্যন্ত থাকবে।

বড়লাট এই সময়ে রাজপুতানা-সফর করছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দিল্লীতে ফিরে এলেন এবং রাজকোটের ব্যাপারটা মেটাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ারের উপর মীমাংসার ভার দেওয়া হোল। গান্ধীজী বড়লাটের কাছ থেকে মীমাংসার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ৭ই মার্চ অনশন ভঙ্গ করলেন।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ইংরাজের বিরুদ্ধে "কুইট ইণ্ডিয়া" বা "ভারত ছাড়ো"র প্রস্তাব গ্রহণ করলে, ঐদিন রাত্রেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে সমস্ত দেশব্যাপী এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেখা দেয় এবং এই আন্দোলন বহু স্থানেই বৃটিশের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানে। বালিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে জাতীয় গবর্ণমেণ্টও গঠিত হয়। ইংরাজ এই আন্দোলনকে দৃঢ়হস্তে নির্মমভাবে দমন করতে থাকে এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রচারও করতে সুরু করে। মহাত্মা গান্ধী ইংরাজ সরকারের এই মিথ্যা প্রচার কার্য ও দমননীতির প্রতিবাদ-কল্পে ১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে পুণা বন্দীশালায় আগা খাঁ প্রাসাদে ২১ দিনব্যাপী অনশন করেন। এইবারের অনশনে তাঁর শরীর

বিশেষভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আশ্চর্যজনক-ভাবে এইবার তাঁর জীবন রক্ষা হয়।

এ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী যতবার অনশন করেছেন, তার মধ্যে শেষ সাধারণ অনশন হোল, কিছুদিন পূর্বে তাঁর কলকাতায় অনশন।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ যে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করে, বছরদিন পর্যন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে তার জের চলে। কলকাতা সহরেও একটা বছর ধরে এই সংগ্রাম লেগে থাকে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগষ্ট থেকে কলকাতায় এই হানাহানিকে একেবারে বন্ধীভূত করবার জন্য কলকাতায় শান্তি অভিযানে বেরোলেন। তাঁর শান্তি অভিযানের ফলে ১৩ই আগষ্ট থেকেই যেন এক যন্ত্রের প্রভাবের মত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত মিলনসম্ভব হইল। কিন্তু কিছুদিন যাবার পর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে একদল গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে এই মিলন আবার হঠাৎ কেঁপে গেল এবং জোর দাঙ্গা সুরু হোল। উক্ত গুণ্ডারদল মহাত্মার বাসভবনে গিয়ে তাঁর প্রতি ক্রোধ এবং অসৌজন্যও প্রকাশ করল।

মহাত্মা দেখলেন—কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান তাঁর উপর বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। পুনরায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের আর কোনও উপায় না পেয়ে, অবশেষে ঐদিন রাত্রি ৮:১৫ মিঃ থেকে তিনি তাঁহার শেষ ব্রত অনশন আরম্ভ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কলকাতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বাঙ্গলার নবনিযুক্ত গবর্ণর, কয়েকটি মন্ত্রিসভা ও হিন্দুমুসলমান নেতৃবৃন্দ মহাত্মার অনশন ভঙ্গ করবার জন্য এগিয়ে এলেন। কলকাতার জনসাধারণ, ছাত্র, শ্রমিক, কেরাণী সকলেই হিন্দুমুসলমান মিলনের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। এই মিলন ঘটাতে গিয়ে কেহ কেহ জীবন পর্যন্ত দিলেন। ফলে অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরে এল এবং কলকাতার হিন্দু মুসলমান নেতারা এই শান্তি অব্যাহত রাখার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯:১৫ মিনিটে অনশন ভঙ্গ করলেন।

কলকাতার এই অনশনটাই হইল মহাত্মার শেষ সাধারণ অনশন। মহাত্মা গান্ধীর সবকটা সাধারণ অনশন নিয়েই আলোচনা করে দেখা গেল যে তাঁর প্রত্যেক অনশনটার পিছনেই একটা ক'রে সুমহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাত্মা যখন অন্য কোন উপায় ঠিক করতে না পেরেছেন, তখনই তিনি তাঁর অহিংস সংগ্রামের এই শেষ অস্ত্র ছেড়েছেন এবং প্রতিবারেই তিনি অভাবনীয়রূপে জয় লাভ করেছেন।

অনেকদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী তাঁর উপবাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে একবার বলেছিলেন—

উপবাসপ্রথা ঠিক আমাদের জাতির মতই সুপ্রাচীন। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ভগবানকে সামনা সামনি দেখার জন্য উপবাস করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর বানর সৈন্যদের জন্য পথ করে দেবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের কাছে অনশন করে ছিলেন। মহাদেবকে স্বামী ও প্রভু হিসাবে লাভ করবার জন্য পার্বতীও উপবাস করেছিলেন। আমার উপবাস সমূহে এই সকল মহৎ দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছি এবং আমি নিঃসন্দেহ আমার উদ্দেশ্য তাদের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

মহাত্মা গান্ধী হোলেন সত্য ও ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক। তিনি তাঁর জীবনে যখনই যেখানে অসত্য ও অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যখন আবশ্যক বোধ করেছেন, তখন তাঁর শেষ অস্ত্র অনশনেরও প্রয়োগ করেছেন। এর জন্য কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নি।

মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তাহার শক্তি, গুণ ও অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে অগণিত নর-নারী সত্যাগ্রহী হন। কিন্তু এই অহিংস সত্যাগ্রহের পথ এমনি কঠিন যে, বহু সত্যাগ্রহী এ পথে চলার কালে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী এই সব পথভ্রষ্ট সত্যাগ্রহীদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনশন করেছেন নিজে এবং এই অনশনের অমোঘ আবেদন গিয়ে পৌঁছেছে ঔদ্ধত্যকারী সত্যাগ্রহীদের বিবেকে। তাই আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণ আফ্রিকা, চৌরীচৌরা, আজমীর প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহীদের অন্যায় কাজের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনশন।

গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস—প্রত্যেক মানুষই মূলতঃ সৎ। তবে মানুষের মধ্যে যে অসৎ কাজের প্রকাশ, তা হোল তার উপর স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতি প্রভাবে। তা হোলেও দেখা যায়, ঐসকল অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যেও তাদের বিবেক দাবা চাড়া দেয়। মহাত্মা গান্ধী তাই বলেন —যে ব্যক্তি অবিমৃষ্যকারী বা পরমশত্রু বলে মনে হচ্ছে, তার মধ্যেও ইষ্ট করার বা বন্ধুত্বের সন্ধান রয়েছে। তার কিন্তুর সেই সদ্‌গুণটাকেই টেনে আকৃষ্ট হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন প্রতিশোধ নয়, যেমনকে তেমন নয়, প্রয়োজন হোল অহিংসা, প্রেম বা ভালবাসার। এই অহিংসার শেষ অস্ত্রই অনশন। এর মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা নেই, ক্রোধেরও লেশ নেই।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, মৃত্যু হোল ভগবানের আশীর্বাদ, তবে মৃত্যুটা কার কিভাবে হোল সেইটাই বা লক্ষ্যণীয়।

অনশনের মধ্য দিয়ে এই যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা, এর মূল সূত্রটা হোচ্ছে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানের শক্তি এত বেশী যে, অন্যায় এর কাছে মাথা নত করবেই। তাই এই অনশন সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই, অনশন কারী তাঁর সকল শারীরিক কষ্ট ও যন্ত্রণাকে হাসতে হাসতে বরণ করেন, এবং তাঁর সমস্ত দুঃখই সহনীয় ও মধুময় হয়ে ওঠে সত্যের প্রভাবে। কারণ সত্যই ঈশ্বর।

বনফুল

১২

শার্দ্দূল সিংহের ম্যানেজার প্রীতম্ সিং ফোন ধরেছিলেন। পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারেন ভদ্রলোক। গণেশের টুকরো টুকরো কথা থেকে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা খাড়া করেছিলেন—গণেশ ছিপসরকারী থেকে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পরে পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে কথা করে বুঝলেন, ছিপসরকারি নয় ছিপছরয়ামারি। লাইনটা কোথায় যেন লাক করছে। সুশোভনবাবুরা রাত্রে যে হোটেলে ছিলেন তার নাম—প্রীতম্ সিং প্রথমে শুনলেন হয়মোটন্ পাথনিবাস।

"জায়গাটার নামগুলো একটু অদ্ভুত গোছের, নয়?"—প্রীতম্ সিং বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ অদ্ভুতই। মান্ধাতার আমলের ব্যাপার" গণেশ তখন পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এল তার নাম কি।

পোষ্টমাষ্টার প্রবীণ লোক। মাথার একটি চুল কালো নেই। তার উপর এক-চক্ষু। অনেকদিন চাকরি করে ঘাগি হয়েছেন, চট করে কথার জবাব যেন না, বেফাঁস বা বেমক্কা হয়ে যেতে পারে। যা বলেন—ভেবে-চিন্তে ধীরে সুস্থে বলেন। এই যে সব মোটরে চড়ে' শহর থেকে বাবুরা আসেন, ফড়ফড় করে' যা' তা জিগ্যেস করেন, এদের উপর মনে মনে হাড়ে-চটা তিনি। যত সব ফড়ফড় দালাল আপাতে আসে খালি। সকালে ওই ভদ্রমহিলাটি বেশ জালিয়েছেন এক চোট। টেলিফোন ডাইরেকটারিখানাকে তচনচ করে তবে ঠিক করলেন যে, দিগ্বিজয় সিংহরায়ের ফোন নেই। তিনি গেছেন, এবার ইনি এসেছেন!

"যেখান থেকে আপনারা এলেন সে জায়গাটার নাম জিগ্যেস করছেন?"—সংযতকণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন।

"হ্যাঁ"—মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিলে গণেশ।

"কোন রাস্তা দিয়ে এলেন আপনারা?"

"এই যে এই রাস্তায় এক্ষুণি এলাম।"

পোষ্টমাষ্টারের একচক্ষুর দৃষ্টিটি নিবদ্ধ হল গণেশের মুখের উপর।

"এই রাস্তায় মেলা গ্রাম আছে, একটা নয় মেলা। আপনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি কি করে' বলব? যেখান থেকে এলেন সে জায়গার নাম আপনি যদি না জানেন আমি কি করে জানব? একটা নয় মেলা গ্রাম আছে এ রাস্তায়, মেলা—মেলার চেয়েও বেশী—"

"ধরে থাকুন", গণেশ বললে প্রীতম সিংকে—"আমি মান্ধাতাকে জিগ্যেস করেছি। দেখছি স্বয়ং তিনিই এখানে আছেন।"

"লোকে আপিসে ঢুকে ক্রমাগত জিগ্যেস করে আমি এই রাস্তা দিয়ে যেখান থেকে এলাম তার নাম কি—তাহলে কি করে' জবাব দিই বলুন। লেখা তাদের নিজেদেরই তো জানা উচিত। তারাই সেখান থেকে এসেছে, আমি আসি নি। আপনি যেখান থেকে এলেন কি রকম সে জায়গাটা—"

পোষ্টমাষ্টার বলে' চলেছিলেন।

অনেক ধস্তাধস্তির পর প্রীতম্ সিং যে সংবাদটী সংগ্রহ করলেন তা এই যে, সুশোভনবাবুরা যে হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন তার নাম হরিনাটি এবং হোটেলটি যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম ফতিমারঙ্গপুর। এর পর তাঁরা কোথা যাবেন তা গণেশ কিছুতে বলতে পারলে না। ঘুচকুন্দ—কুরুলেশ্বরীর নাম কিছুতেই মনে এল না তার।

"আমাদের আপিসে যে ম্যাপটা আছে সেটা দেখলে জায়গাটা পাবেন বোধহয়। চমৎকারকুণ্ডু বা ওই গোছের কিছু একটা—মচকানকাণ্ডও হতে পারে। দেখবেন, ম্যাপে থাকা সম্ভব। ম্যাপেই ওই ধরণের নাম থাকে। এখান থেকে খুব দূর নয় এইটুকুই শুনেছি—এর বেশী কিছু জানি না। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না। ফোন কি করে পেলাম? এ রকম অজ পাড়াগাঁয়ে ফোন পাব আশাই করি নি। শুনলুম এদিকে মিলিটারির একটা ছাউনি ছিল, তারাই নাকি পোষ্টাফিসে ফোনটা বসিয়েছিল। হ্যাঁ, আপনারা ভাববেন তাই ফোনটা করে দিলাম—"

"ভাবনা অবশ্য ঘুচল না"—উত্তর দিলেন প্রীতম সিং।

"তা কি করব বলুন স্যার। ভাল বুঝলাম তাই করলাম—"

একদিকে পোষ্টমাষ্টার, অন্য দিকে ম্যানেজার—গণেশের মেজাজ ক্রমেই চড়ে' উঠছিল।

"মিছিমিছি ফোন করে অতগুলো পয়সা নষ্ট না করলেও পারতে—"

"খবর না দিলে বলতেন, ফোন করবার যখন সুবিধে ছিল একটু খবর দিলেই পারতে। ফোন করেছি—এখন বলছেন অনর্থক পয়সা খরচ করছ কেন। আপনাদের অন্ত পাওয়া ভার"

"থাক্ তাড়াতাড়ি ফিরে এস"

ফোনে কথাবার্ত্তা শেষ হল।

এক হিসেবে এই অবশ্য যথেষ্ট হল। যতটুকু খবর পেলেন প্রীতম্ সিং, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং সোয়াছ ঘণ্টা পর মিস্টার মিত্র সরকার লোহলক্কার ব্যাপারে যদিও ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ভয়ঙ্করতা বাধাপ্রাপ্ত হল। একটি কেরাণী এসে চুপি চুপি খবর দিয়ে গেল যে মিসেস সরকার ফোনে ডাকছেন।

"ডাকছেন? আমাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আচ্ছা, যাচ্ছি যাও—না শোন—"

মিত্রবাবুর মুখের বিপন্ন ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। "ওঁকে ফোনটা ধরে থাকতে হল। আর ওই টেলিগ্রামের কর্ম্মগুলো দাও তো—"

কর্ম্ম দিয়ে কেরাণী চলে গেল।

মিত্রবাবুর মাথায় চুল বেশী ছিল না, যা ছিল তাই তিনি মুঠো করে' ধরে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর মরীয়া হয়ে সুরু করে' দিলে—"সুশোভন কট্ ট্রেন, বাট মিস্ড্ ওয়াইফ, কট বাট রিটার্ণড্"

কেরাণী পুনঃপ্রবেশ করে বলে গেল মিসেস সরকার আপনার ফোনেই কথা বলছেন। মিত্রবাবুর নিজের প্রাইভেট ফোনটা পাশেই ছিল, পরমুহূর্ত্তেই ঝনঝন করে' বেজে উঠল সেটা। মিত্রবাবু ধীরে সুস্থে রিসিভারটা তুলেই বুঝলেন স্বয়ম্প্রভা ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন। "তুমি শুনছো?"—হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"শুনছি বই কি"

"সাড়া দিচ্ছ না কেন তাহলে। টেলিগ্রাফ করেছ?"

"নিশ্চয়"

"তাহলে বেকুবি করেছ। তখনই তোমাকে পই পই করে' মানা করলাম যে টেলিগ্রাফ কোরোনা, কথা শুনি—"

"বল ত এখনও বন্ধ করে' দিতে পারি"

"ও, পাঠাও নি এখনও। বহুক্ষণ আগেই ত পাঠাবার কথা—"

"তোমার ইচ্ছেটা কি তা-ই বল না। টেলিগ্রাফ করব, কি করব না"

"কি—"

"করব, না করব না"

"কি—"

"টেলিগ্রাফ গো"

"টেলিগ্রাফ করে' আর কি হবে। এখনও কর নি তাহলে?"

"মানে যদি চাও, বন্ধ করে দিতে পারি এখনও"

"বন্ধ করবে কি করে। কখন পাঠিয়েছ ?"

"চেষ্টা করে' দেখতে পারি। টেলিগ্রাফ করতে মানা করছ কেন"

"কেন ? কারণ, আমি বলছি সে সেখানে নেই। কোথায় আছে তাও জেনেছি আমি। বুঝলে ? শুনছ ?"

"কোথায় আছে, বল না"

"সে সেই মাগীকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"বল কি। হোটেলে ? বাস করছে ? বাস করছে মানে কি—মোটে কালই তো গেছে—"

"মানে, কাল রাত্রে তারা দুজনে সেখানে বাস করেছিল"

"কি বলছ যা তা"

"কি ?"

"কি বলছ যা তা"

"জাঁতা কি ? শুনতে পাচ্ছি না কিছু। ব্যাপারটা বোঝ একবার ! হোটেলে গিয়ে বাস করছে !"

"কি যা তা বলছ, সম্পূ—"

"অসম্পূ ? অসম্পূ কি। অসম্ভব বলছ ? কি অসম্ভব ?

"এই হোটেলে বাস করা। মানে, সম্পূ—"

"যা বলছ, স্পষ্ট করে' উচ্চারণ কর না। মুখটা ফোনের কাছে এগিয়ে আন—"

"আমি বলছি সম্পূর্ণ বাজে কথা এটা"

"খোকামি না করে বাড়ি চলে এস। বেরুতে হবে এক্ষুণি—"

"যাব না। একটি কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার"

"মুখে কিছু পুরেছ না কি, সুপুরি টুপুরি ?"

"না। শোন—"

"শুনব কি করে' যা কোন তোমার। আপিসের ফোনটাও ঠিক করে' রাখতে পার না ? কিছু শোনা যাচ্ছে না ; বানান কর—বানান করে' বল—"

"কি"

"বাড়ি চলে এস"

"এখন যাওয়া অসম্ভব। কেন ঘাবড়াচ্ছ, আমি বলছি তেমন কিছু হয় নি। সে হোটেল কোথায়—"

"মফঃস্বলে। হরিকোটর না কোথা—"

"তার মানে অনীতার খোঁজেই গেছে। বলিনি আমি ?"

"অনীতার খোঁজে ? কি বুদ্ধি তোমার মরি মরি। অনীতাকে ফেলে পালিয়েছে সে কথাটা বুঝে যাচ্ছ—"

"ইচ্ছে করে' তো পালায় নি। ট্রেণ ছেড়ে গেল, কি করবে বেচারা—"

"খুব হয়েছে ! লোহার ব্যবসা ছেড়ে ওকালতি কর গিয়ে।"

"না না, জিনিসটা ভেবে দেখ আগে"

আমি বলছি ওই মাগীর খপ্পরে ও পড়েছে। ওরকম লোক পড়েই থাকে"

"না পড়ে নি। যেটুকু শোনা গেছে, তার থেকে ও কথা বলা যায় না"

"যায় খুব যায়। আমি চিনি ওদের। আমি যা বলছি ভদ্রভাষায় এর চেয়ে বেশী আর বলা যায় না"

"কি প্রমাণ আছে তোমার ?"

"ওরা দুজনে মফঃস্বলের একটা হোটেলে কাল একসঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এ প্রমাণ আমার আছে। এই যথেষ্ট মনে করি আমি। পুরুষদের চিনতে আর বাকী নেই। তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না ওর হয়ে। বাড়ি চলে এস। ওই মাগীর সঙ্গে ও যে বাস করছে, তাতে আর সন্দেহ নেই—"

"কিন্তু ছি ছি সম্পূ—এমনভাবে একজন ভদ্রসন্তানের নামে"—এখানে বলা প্রয়োজন, স্বয়ম্ভাকে কিছু সরকার আদরকরে' 'সম্পূ' বলে ডাকেন।

"কি ? স্পষ্ট করে' বল না, কি বলছ"

"বলছি সুশোভন অনীতার উদ্দেশেই বেরিয়েছে ট্যাকসি করে'। সে তো আর জানে না যে অনীতা পরের ষ্টেশনে নেবে ফিরে এসেছে। তাছাড়া অনীতার সঙ্গে ওর সব জিনিস রয়েছে যে"

"জিনিস ?"

"হ্যাঁ"

"কি জিনিস"

"কাপড় চোপড়, এই সব জিনিস"

"কি ?"

"কাপড় চোপড় এই সব জিনিস। জিনিস—জিনিস। সুশোভনের জিনিস। বুঝতে পারছ না ?"

"কি কি জিনিস"

"আরে, কি বিপদ, তার সমস্ত জিনিস। যা যা নিয়ে সে বেরিয়েছিল। হোটেলটা কি সিংহরায়েদের বাড়ির কাছাকাছি ?"

"তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে যা বলছি ভাল করে' শোন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে সুশোভন ওই মাগীর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

ছি—ছি—সম্পূ—যা বলছ তা ভদ্রতাবিরুদ্ধ—ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। ভুল হচ্ছে তোমাদের। সে অনীতাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। সে মনে করেছে যে অনীতা সিংহরায়বাবুদের ওখানেই গেছে—"

"তাহলে সিংহরায়বাবুদের ওখানে না গিয়ে হোটেলে গেল কেন"

"হয়তো কিছু—"

"এবং একটি যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে ?"

"মানে হয়ত কিছু—"

"বাড়ি চলে এস। অপিস বন্ধ করে দাও"

পোষ্টাফিসে টেলিফোন-গাইডটি রেখে সান্ত্বনা সেলুনের দিকে অগ্রসর হ'ল। ভিতরে ঢোকবার আগেই কানে এল অনেকগুলি লোক একসঙ্গে কথা কইছে। দ্বারের কাছে গিয়ে দেখতে পেল সুশোভনের দাড়ি অর্দ্ধেক কামানো হয়েছে, বাকি অর্দ্ধেকটায় এখনও সাবানের ফ্যানা লেগে রয়েছে, নাপিতটি ক্ষুর হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। পিলে-রোগা একটি ছোকরা এক হাতে কাঁচি এবং আর এক হাতে আয়না নিয়ে নিকটস্থ টুলটির উপর বসে নিজেই তার হিটলারি গোঁফ জোড়াকে আরও হিটলারি করবার চেষ্টা করছে, কোণের দিকে টেবিলে আর একটি নাপিত ঝুঁড়ি-ওলা এক মুলকার ব্যক্তির বগল কামাচ্ছে—এবং সকলে মিলে যুগপৎ কথা কইছে। সুশোভনও। বস্তুত সুশোভনই আলোচনাটা সুরু করেছিল। অন্য কিছু নয়—মচুকুন্দ কুণ্ডলেশ্বরী যাবার কোন শর্টকাট আছে কি না—।

সান্ত্বনা বুঝলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। তার চেয়ে ইতিমধ্যে বরং আর একটা কাজ সেরে ফেলা যাক। সদারঙ্গবিহারিবাবু নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে থাকেন কোথাও, তাঁর সঙ্গে দেখা করে' কালকের রাত্রির ঘটনাটা খুলে বলা যাক। সান্ত্বনার মনে হতে লাগল অবিলম্বে এটা করা দরকার। আর এই ফাঁকেই সেটা সেরে ফেলা ভাল। সদারঙ্গবিহারীলালের ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। মোটরবাইকবিহারী সদারঙ্গবিহারীকে এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই চেনে। খোঁজ করতেই একজন বললে যে আজ সকালে তিনি ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়িতে এসেছেন। ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়ি বেশী দূরে নয়—সোজা কিছুদূর গিয়েই বাঁ-হাতি।

বড় রাস্তাটা ধরেই সোজা হাঁটতে লাগল সে এবং ঘনাবাঘনা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ একটি দৃশ্য হয়ে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় একটি লম্বা করসা যুবতী জুতো পরে' কার-কোট গায়ে দিয়ে অসঙ্কোচে খটখটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—এ অতি চমকপ্রদ দৃশ্য। সান্ত্বনা নিজেও সেটা বুঝতে পারছিল। তার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল যেন। দরিদ্রনারায়ণ, পল্লী উন্নয়ন, নৈশ বিদ্যালয়, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহ তার—কিন্তু এখন রাস্তার দুধারে সারি সারি দণ্ডায়মান ব্যগ্রত আনন দরিদ্রনারায়ণদের দেখে মনে মনে বেশ একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল বেচারী। তাকে দেখে কি ভাবছে এরা কে জানে।

জনমতকে চিরকালই ভয় তার। জনমত তীমরুলের দংশন একবার সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অবশ্য কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার কৌতুকজনক বিবরণ জনসাধারণের গোচর হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, কে আর অত খোঁজ করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনক্রমে এটা যদি প্রচার হয়ে যায় যে, কালরাত্রে সে সুশোভনবাবুকে স্বামী বলে' চালিয়েছে এবং হরিমটর পাদনিবাসে একঘরে রাত্রিবাস করেছে—তাহলে যা হবে তা আর কহতব্য নয়। তা ছাড়া অপরে যা-ই বলুক, তার নিজের মনের ভিতরই খচ খচ করছিল যে! কি যে কাণ্ড হল।

অবশ্য স্বামীর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। উদার গম্ভীর শান্ত মিতভাষী ব্রজেশ্বরের মুখখানা মনের উপর ভেসে উঠল—না, ও কিছু মনে করবে না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবার মতো নীচতা ওর নেই। কিন্তু তা না থাকলেও উনি একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী, জন-নায়ক। সেদিক থেকে

ভেবে দেখলে জনমতকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা যদি রটে' যায় যে কংগ্রেস-কর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের যুবতী পত্নী সুশোভন সরকারকে স্বামী বলে' পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছিল, তাহলে তো টি টি পড়ে' যাবে। এমনিতেই তো কংগ্রেস পার্টিতে শত্রুর অভাব নেই, এ খবর পেলে তো নেচে উঠবে তারা। কাল এই হতভাগা হোটেলটা দেখে প্রথমে কি আনন্দই হয়েছিল তার। না এলেই হ'ত। বেশ কেটে যেত মোটরে। মোটর ড্রাইভার ছিল, সন্দেহের কোন কারণই ঘটত না। তারা অন্যায় হয়ে গেছে। ছি, ছি—

সদারঙ্গবিহারীলালের (অর্থাৎ ত্রিবেদী মশায়ের) বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল সে। ওই ঝড়বড়ে বাক্যবাগীশ লোকটার মুখ বন্ধ করতে পারলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তার স্বামীর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরীর চরিমটর হোটেলে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর যদিই বা আসেন কেউ, গোঁসাইজির কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আরও কম। গোঁসাইজির কাছে আমোল পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সান্ত্বনার ভয় এই অদূরদর্শিতার ফলে তার অমন স্বামীর সুনাম পাছে নষ্ট হয়। মিতবাক খদ্দরধারী ব্যক্তিটির মূর্ত্তি আর একবার ফুটে উঠল মনে।

বেশ সপ্রতিভভাবেই সে বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়তে লাগল। ভাবটা যেন যাবার আগে দেখা করতে এসেছে, প্রসঙ্গত শুধু বলে যাবে—কাল রাত্রে কি বিপদেই পড়েছিল তারা। অতদূর হেঁটে ওই হোটেলে এসে তারা গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে বুঝল যে স্বামী-স্ত্রী বলে' নিজেদের পরিচয় না দিলে নিষ্ঠাবান গোঁসাইজি নির্ঘাত বলে' বসবেন—'সৎকার করতে অক্ষম'। সুতরাং তাই পরিচয় দিতে হয়েছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল এসে অজ্ঞাতসারে তাতে বাস্তবতার এক পোঁচ রং চড়িয়ে দেওয়াতে তাদের সুবিধেই হয়ে গেল—সেজন্যও ধন্যবাদ দেবে সে। আর বেশী কিছু বলবার দরকার নেই। ওইটুকুতেই যথেষ্ট হবে।

ত্রিবেদী মশায় গামছা পরে' সর্ষপ তৈল যোগে নিজের অঙ্গমর্দ্দন করছিলেন। নিজের গাল দুটিতে হাত বুলতে বুলতে এসে ধীরে সুস্থে কপাট খুললেন এবং খুলেই সান্ত্বনাকে দেখে একটু চমকিয়ে গেলেন। বুঝলেন সাবধানে কথা বলতে হবে। হাঁা, সদারঙ্গবিহারীবাবু ছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে গেছেন। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

সান্ত্বনা ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। "কখন ফিরবেন বলতে পারেন"

"সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না"

হাতের চেটো দুটো উভয় গণ্ডে আর একবার বুলিয়ে নিয়ে ত্রিবেদী মশায় যে সান্ত্বনার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

ধীরে ধীরেই ফিরে এল বেচারী। ফিরে এসে মোটরে বসে' সুশোভনের অপেক্ষা করতে লাগল। মনটা কেমন যেন খারাপ লাগছিল। নানা কথা মনে হচ্ছিল। কাল রাত্রে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা ভেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে। এখন নানারকম বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা মনে হতে লাগল। যা বাক্যবাগীশ লোক, কি বলতে কোথায় যে কি বলে' বসবে! কোলকাতায় কারও যদি কানে ওঠে, তবেই তো হয়েছে!

সুশোভনের মেজাজও ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছিল। সেলুনে মৃচুকুন্দ-কুন্তলেশ্বরী সম্পর্কে যে ভৌগোলিক আলোচনা চলছিল, তা শুনে ক্রমেই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিল সে। ভাবছিল, সান্ত্বনার মুখও গোমড়া হয়ে আসছে ক্রমশ। কাল যখন মোটরে উঠল কি হাসি-হাসি মুখ, ভাসাভাসা চোখে কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি। এখন যেন একেবারে আলাদা লোক। নারী চরিত্র। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা। কিন্তু তার অনীতা এ রকম ভেতর-বুঝে' নয়, আর যাই হোক। এ রকম ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না সে। তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল যে সুশোভন এক চুল টলে নি, টলতে পারে না, বাস্ তাহলেই মিটে যাবে। এ বিষয়ে সুশোভনের সন্দেহ ছিল না। আর তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। আগে থাকতে ভেবে লাভই বা কি। তার বিশ্বাস অনীতা বুঝবে। নাপিত গলায় তোয়ালে জড়িয়ে গালে ক্ষুর চালাতে লাগল। সুশোভন ভাবতে লাগল। অনীতার সঙ্গে দেখা হলে কি বলে' সুরু করবে। (ক্রমশঃ)

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

Preparations for war have passed propaganda stage—যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রচারের স্তর অতিক্রম করিয়াছে। মিটইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে রুশ প্রতিনিধি মঃ লিসিনিস্কি এই উক্তি করিয়াছেন। কোটী মানুষের টক পোশিতস্রোতের দাগ এখনও শুকায় নাই; হিনট নরাক্ষেশে জাপানীদের বীভৎস চিহ্নগুলি এখনও মানুষের দানবীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার মধ্যেই আবার পরবর্তী নরমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি!

দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি

এই আয়োজন কেন? কাহার স্বার্থে আবার কোটী মানুষকে বলি দিবার এই প্রয়াস? বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায়ে না. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকাণ্ডের বর্তমান্তিক দৃষ্টি তাহার মনে গভীরভাবে জাগিয়া আছে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য এই, ঘটনাস্রোত তাহার আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জগতে প্রভুত্বকামী শক্তির চরম পরাভব ঘটিবে ইহাই ছিল সাধারণ মানুষের আশা। কিন্তু মাত্র দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই যে সন্দিগ্ধে দেখিতেছে—প্রতিক্রিয়া-শক্তি আবার বিশ্বব্যাপী ত্রাসসৃষ্টি প্রচেষ্টায় করিবার আয়োজন করিতেছে।

ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের ত্রাস সাধন ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিঘোষিত উদ্দেশ্য। বিশ্বের জনসাধারণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার জন্য এই যুদ্ধ সমর্থন করিয়াছিল; আর সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া-শক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের ত্রাস চাহিয়াছিল। যুদ্ধের অবসানে এই প্রতিক্রিয়া শক্তি আর এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন। প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের পরাজয় ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসাধারণ প্রতিক্রিয়া-শক্তির নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা তাহাদের সুস্পষ্ট দাবী। এই জাগ্রত জনগণকে—নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এই প্রগতিশক্তিকে দাবাইয়া প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যেই এই রণসজ্জা। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রশক্তি ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের রণসজ্জা নহে—ইহা বিশ্বের দুইটি শক্তির চরম সংঘর্ষের আয়োজন। যে শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণমূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া এবং শ্রমিকের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী, সেই শক্তিই মার্কিণ ভূমির বাহিরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া পূর্ব-ইউরোপের গণ-রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কলকা ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হরণ, আর রাষ্ট্র হিসাবে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার ত্রাস সাধন—এই দুইটি প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য অভিন্ন। ত্রাসের যে উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগপন্থী দলটিকে বাদ দিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলিতেছে।

এই বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য ভাগে মিটইয়র্কে জাতি সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন; প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় গত বৎসর অক্টোবর মাসে এবং চলে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। জাতি-সঙ্ঘের গত সাধারণ অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের সহিত মীমাংসা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সে নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে; এই প্রসঙ্গ এবার পরিষদে আলোচিত হইবে। ইহা ছাড়া, প্যালেষ্টাইনের ও গ্রীসের প্রসঙ্গ, ঘড়ি পরিষদের "ভিটো" সংক্রান্ত প্রশ্ন, ঔপনিবেশিক সমস্যা প্রভৃতি জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন ৫৫টি রাষ্ট্রের প্রতি-নিধি এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধিমণ্ডলও উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতের প্রতিনিধিদের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিউ ইয়র্কে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনও দলকে সমর্থন করিবেন না; নীতিগত দিক হইতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঔদ্ধত্য

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের নির্দেশ লঙ্ঘনের কৈফিয়ৎ হিসাবে মিঃ মার্শাল স্মাট্স্ ভারতের প্রতিই দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে ছাই অধিবাসীর পুনর্নিয়োগে আপত্তি উঠাতেই এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে স্মাট্স্-নেহরু সম্মেলনে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট জাতি-সঙ্ঘের নির্দেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন—তাঁহারা ঐ নির্দেশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্শাল স্মাট্স ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধকে তাঁহার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দক্ষিণ সংবাদপত্রগুলিও সাম্প্রদায়িক বিরোধের অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাকে সহায়তা করিতেছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টই সেখানে বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সব অপ্রাসঙ্গিক কথা কিন্তু মার্শাল স্মাট্স গতবারও উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কাজ হয় নাই। বস্তুতঃ, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গে এবার জাতি-সঙ্ঘের পরীক্ষা। জাতি-সঙ্ঘ যদি এই যুদ্ধে বৃটিশ ডোমিনিয়নটিকে তাহাদের নির্দেশ পালনে

বাধ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই বুঝিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রথম মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম আফ্রিকার উপর ম্যাণ্ডেটারী অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা ঐ রাজ্যটি কুক্ষীগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। জাতি-সঙ্ঘের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ঐ রাজ্যটিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না; উহার সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের ট্রাষ্টিসিপের ব্যবস্থা হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই নির্দেশও লঙ্ঘন করিয়াছে এবং কৌশিয়ৎ স্বরূপ আইনসভা গ্রহণের অবতারণা করিয়াছে।

"ভিটো" প্রসঙ্গ

ষষ্ঠি পরিষদে "ভিটো" সংক্রান্ত প্রশ্ন জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ষষ্ঠি পরিষদ জাতি-সঙ্ঘ কর্ম পরিষদ; ইহার ১১জন সভ্যের মধ্যে বৃহৎ পাঁচটি শক্তি (বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া) স্থায়ী সদস্য; আর ৬ জন নির্বাচিত হইয়া থাকেন, পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যের সর্বসম্মতি ব্যতিরেকে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে না। স্থায়ী সভ্যের আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিবার যে অধিকার, তাহাই "ভিটোর" অধিকার বলিয়া পরিচিত। সোভিয়েট রুশিয়া এই অধিকার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ায় মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রব উঠিয়াছে—"ভিটোর" প্রয়োগ সঙ্কুচিত না হইলে জাতি-সঙ্ঘ অচল হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—বৃহৎ ৫টি শক্তির মধ্যে ৪টি মার্কিণ ডলারের আশ্রয়প্রার্থী। বৃটেন আমেরিকার ২৭৫ কোটি ডলার এক বৎসরের মধ্যে উড়াইয়া দিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে ওয়াশিংটনে ধর্না দিয়াছে; চীন ৩ কোটি ডলার হজম করিয়া আরও ৫০ কোটি ডলারের জন্য হা করিয়েছে; ফ্রান্স সম্প্রতি ২৫ কোটি ডলার ভিক্ষা লইয়াছে। ইহা ছাড়া, ষষ্ঠি পরিষদের নির্বাচিত সভ্য রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই বৃটেন অথবা আমেরিকার প্রভাবাধীন; তাহাদের ভোট স্বাধীন ভোট নহে। কাজেই, ভোটাধিক্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি ষষ্ঠি পরিষদের কাজ চলে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ঐ পরিষদে একচ্ছত্র মার্কিণ প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর নীতির দিক হইতে বলা চলে—গণতান্ত্রিক আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ভোটের জোরে জগতে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব নহে—বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যদি শান্তিমূলক কার্যে একমত হয়, তাহা হইলে বিশ্বে শান্তি অব্যাহত থাকা সম্ভব।

জাতি-সঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে ৫টি শক্তির সম্মতি ব্যতীত গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংস্কার হইতে পারে না। ৫টি শক্তি সহ সাধারণ পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সভ্যরাষ্ট্র যদি সংস্কারের পক্ষে ভোট দেয়, তাহা হইলেই গঠনতন্ত্রের সংস্কার সম্ভব। কাজেই, সাধারণ পরিষদে "ভিটো"র অধিকার সঙ্কুচিত করিবার জন্য কোনরূপ প্রস্তাব আনয়ন হইতে পারে। অর্থাৎ "ভিটোর" অধিকার সঙ্কোচের সিদ্ধান্তেও সে ভিটো করিতে পারে। এই আইনগত অসুবিধা এড়াইবার জন্য আমেরিকার পক্ষ হইতে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের সকল সভ্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া একটী স্থায়ী কমিটী গঠিত হউক। সোভিয়েট রুশিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলিয়াছে।

এই সম্পর্কে পরিষদে কিরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। তবে, ইহা সত্য—বৃহৎ ৫টি শক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে জাতি সঙ্ঘে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা যদি হয়, তাহা হইলে সঙ্ঘের নৈতিক মৃত্যু ঘটিবে। ইহাতে প্রতিক্রিয়া-শক্তির সমরপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে। জাতি সঙ্ঘকে উপেক্ষা করিয়া গ্রীস ও তুরস্কের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমেরিকা তৎপর হইয়াছে; মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকার অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার আয়োজন চলিতেছে; কোরিয়ার মার্কিণ প্রতিনিধিরা সেখানকার গণ প্রতিষ্ঠান—পিপ্‌ল্‌স্ রিপাবলিককে উপেক্ষা করিয়া জাপানের সহযোগীদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; [illegible] রক্ষা তাহারে নিজের শতাধিক আণবিক বোমা ধ্বংস করিতে অস্বীকার করিয়া সমগ্র জগতের আণবিক গবেষণার কর্তৃত্ব করিতে চাহিতেছে। এই সব ঐতিক তৎপরতা বন্ধ করিয়া জাতিসঙ্ঘকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই প্রকৃত কাজ। কিন্তু তাহার পরিবর্তে সঙ্ঘে আমেরিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টাই চলিতেছে। সর্বসম্মতিমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ, আর আমেরিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব একই কথা।

ইরাণ-সোভিয়েট বিরোধ

জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে বৈদেশিক সাংবাদিকরা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল যে, সোভিয়েট রুশিয়া কর্তৃক ইরাণ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নিকটবর্তী। বলা বাহুল্য, এই প্রকার কার্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ইরাণের বিরোধ ঘটিয়াছে সত্য; কিন্তু উহাকে উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনাই ঘটে নাই।

গত বৎসর এপ্রিল মাসে উত্তর [illegible] সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তৈল নিষ্কাষণের অধিকার সম্পর্কে ইরাণের সুলতান-মন্ত্রিপরিষদের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এক চুক্তি হয়। কথা ছিল—৭ মাসের মধ্যে মজলিস্ (পার্লামেণ্ট) কর্তৃক ঐ চুক্তি অনুমোদনের ব্যবস্থা হইবে। সুলতান-মন্ত্রিসভা এতদিন ঐচুক্তি অনুমোদনের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। ইতিমধ্যে ইরাণে গণতান্ত্রিক "তুদে" দলটিকে কঠোরভাবে দমন করা হইয়াছে; কৌশলে সুলতানের নিজস্ব দলটিকে নির্বাচনে জয়ী করা হইয়াছে। এদিকে ইরাণের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইরাণের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে তখন মার্কিণ কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠিত; বিভিন্ন স্থানে আমেরিকা বিমানঘাঁটী স্থাপন করিতেছে; আমেরিকা তুরস্ককে যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিবে, ইরাণকেও সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র প্রদানের

ভার লইয়াছে। ইরাণের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই ক্রমবর্দ্ধমান মার্কিণ প্রভাব দেখিয়া সোভিয়েট রুশিয়া মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়াছে এবং তৈল সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করাইবার জন্য ইরাণ গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিতেছে।

এই তৈল চুক্তি সম্পর্কে রুশিয়ার বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার বক্তব্য—উত্তর ইরাণে (সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে) কোনও বৈদেশিক শক্তিকে তৈল নিষ্কাষণের অধিকার যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াকেই সে অধিকার দিতে হইবে। ইরাণ নিজে তৈল নিষ্কাষণ করুক, তাহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি নাই। কিন্তু তৈল আহরণের নামে আমেরিকা অথবা কুটনকে সোভিয়েট সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত করা চলিবে না। কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার এই দাবী অসঙ্গত মনে করিবেন না। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে কোনও শত্রু রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন—সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চলে যে—সে ইরাণে তাহার সৈন্য রাখিয়া চাপ দিয়া তৈল-চুক্তি আদায় করিয়াছিল। কিন্তু ইরাণ হইতে শাল ফৌজ চলিয়া যাইবার পরও ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ঘাটান্-মুলতানে সোভিয়েট রুশিয়াকে জানান যে, তিনি ঐ চুক্তি মানিয়া লইবেন। তবে, ঐ তৈল অঞ্চলে শান্তি রক্ষার ভার ইরাণের উপর থাকিবে। সোভিয়েট রুশিয়া তাঁহার এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই—আমেরিকার প্রভাবে ইরাণ গভর্ণমেণ্টের হৃদয় এখন বদলাইতেছে। আমেরিকা এখন ঐদ হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের মধ্য দিয়া ইরাণ পর্য্যন্ত সোভিয়েট-বিরোধী দুর্গশ্রেণী রচনায় আগ্রহান্বিত। সুলতান-মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করিয়া এই সামরিক চক্রান্ত সে সফল করিতেছে।

সেবাগ্রামে বনিয়াদী বিদ্যালয়

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

বনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জ্জন করবার জন্য আমি ছয়মাস সেবাগ্রামে থেকে এসেছি, সেখে এখন ওখানকার ছেলেমেয়েদের হাতেকলমে দুঘণ্টা প্রতিদিনের প্রতিটি কাজের কথা, তারা নিজের কাজ নিজে করতে কোন লজ্জা পায় না, তারা ভোরে সাড়ে পাঁচটায় উঠেই প্রার্থনা করে। এর পর কোন দল কঠিন পরিশ্রমের পরিচ্ছন্নতার কাজ, কোন দল কুটির তরকারী, কেউ কেউ প্রস্তুত করিত প্রাতরাশ—কাজ করিত আর সকাল বেলাকার আকাশটাকে ওরা ভরে দিত গানে। তখন কি যে ভালো লাগতো, প্রাণে কি যে আশা জাগত, তা আমার প্রকাশ করা শক্ত। মাঘের সেই দারুণ শীতে বালতি ভিরে জল তুলে স্নান করিত, আর গান করিত সুন্দর সুন্দর মারাঠী সঙ্গীত। আনাদির পর ওরা অনাবৃত দেহে ব্যায়াম করিত—অভ্যাস করিত নানা যৌগিক আসনের ও "সূর্য্য প্রণাম"। এতেই ওদের দেহ সুন্দররূপে বিকশিত হয়েছে। শীতের ভয়ে কোনদিন ওদের কাবু হতে দেখি নি। শীতেও ওরা অনাবৃত দেহেই থাকবার অভ্যাস সাধন করেছে। কদাচিত ওদের গায়ে জামা দেখতুম। আমরা যখন জামার ওপর জামা দিয়ে ঠক্ ঠক্

সেবাগ্রামে শিশুকর্ম্মী (খুব নির্ব্বাণে রত)

মিঃ সি·এফ্·-এণ্ড্রুজ, আর্য্যনায়কম্ ও আশা দেবী

করে কাঁপছি, তখনও তাদের বিনা জামায় সেই দারুণ শীতের কনকনে বাতাসে স্বাভাবিক ভাবে চলা ফিরা করতে দেখতুম। ওরা ভোরে ৪টা থেকে ৭-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত ওরকারী কুটা, গম পেষা, ঝাড়াঝাড়ি করা, ঘুঁটে ও প্রাঙ্গণ, পথ, ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ব্যায়াম প্রভৃতি কাজ নানা দলে ভাগ হয়ে করিত। এর পর আটটায় সকলের প্রার্থনা করে

সাড়ে এগারটা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজে ব্যাপৃত থাকত। ঘরটায় ঘণ্টা ছোঁয়ার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা যার যার থালা বাসন হাতে নিয়ে রান্না ঘরে সারিবেঁধে খেতে বেত। সবার পাতে পরিবেশন হয়ে গেলে পর সবাই প্রার্থনা-মন্ত্রীর আদেশ ক্রমে মিনিট খানেক নীরব থেকে এই মন্ত্রটি পাঠ করে ভোজন সুরু করত। ওঁ সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওদের কণ্ঠে এই মন্ত্র যখন শুনতুম তখন মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতুম। আবহাওয়া কি সুন্দর হয়ে যেত।

ভোজনের পর ওরা ওদের নিজ নিজ থালা মাসন মেজে ঘসে ঝক-ঝকে তকতকে করে নিত। তার পর কোন দল করত আনাজ পরিষ্কার, কোন দল বিকালের জন্য কুটতে বসত তরকারী। খেয়ে দেয়ে যে

রাজস্রোহী ফকির

বিশ্রাম করবে তার উপায়টি নেই, যতদিন পর্য্যন্ত না এই কাজের পালা শেষ হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত ওদেরি পড়া নিয়ে ওরা এই কাজগুলো সুশৃঙ্খলরূপে সমাপন করতে বাধ্য। এসব কাজ যাদের ওপর থাকত তাদের প্রায়ই দুপুরে বিশ্রাম করা হয়ে ওঠত না। কিছুদিন আগে শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় এই শিক্ষার জন্মভূমি সেবাগ্রাম গিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন "স্কুল বাড়ীতে ঢুকে প্রথমে ছেলেদের শোবার ঘর গুলিতে পৌঁছলাম। পরিষ্কার ঝকঝকে ঘরগুলি, বিছানা, বই সব গুছানো; কিন্তু ঘরে কেউ ছিল না। তখন ছাত্রছাত্রীদের খোঁজে গেলাম রান্না ঘরে। সেখানেও নজরে ছিল না বটে, কিন্তু নানা বয়সের যে কয়টি ছাত্রী বসেছিল, তারা খুবই ব্যস্ত। ৭।৮ বছরের গুলি হবে সেঁকছে। আমাদের সঙ্গে ২।১টা কথা বলেই তারা আবার কাজে মন দিল, কারণ এ ত লঘু ব্যাপার নয়, রুটি পুড়িয়ে ফেললে, যাদের নিজেদেরই তো সেই পোড়ারুটি খেতে হবে। তা' ছাড়া সেদিন আবার বিশেষ খাওয়া বলতে হবে, আটার রুটি হচ্ছে—অন্যদিন তো জোয়ারের রুটিতেই চালাতে হয়। যে সময় এরা ব্যস্ত ছিল রান্না নিয়ে, সে সময় ছেলেমেয়েরা জীবনযাত্রার জন্য অন্য নানা কাজ করছিল। তার মানে এই যে, শিক্ষা বলতে এখানে শুধু লিখতে, পড়তে শেখা নয়, এখন থেকেই ছাত্রছাত্রীরা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে।" *

আড়াইটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত আবার বিদ্যালয়ের কাজে ছুটতে হোত ওদের। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা কাজে একপা করলা করার সাথে সাথেই চোখের সামনে যে ছবিখানি ভেসে ওঠে ঠিক সেই ছবিখানার সাথে সেবাগ্রামের বিদ্যালয়ের পথের ছেলেমেয়েদের কিন্তু

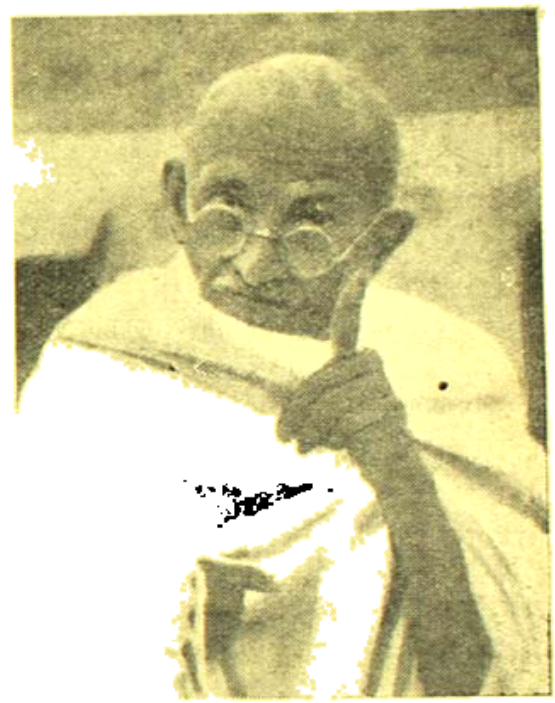

মহাত্মা গান্ধী কটো—গোপাল কৃষ্ণ

একটুও মিল নেই। ওখানকার ছাত্রদের বগলে পুথির বদলে কাঁধে কিষাণ চরকা, হাতে দুরন্ত একখানা ধুনকী না হয় একখানা খলে। ওরা সারি বেঁধে স্কুলে যাবার সময় মনে হয় যাত্রী সৈনিকদের কথা মনে জেগে ওঠে—এমন তাদের পথে চলার ভাব ভঙ্গী।

বিদ্যালয়ে গিয়েও ওদের হাত পায়ের বিশ্রাম নেই। কেউ কেউ তুলো ধুনছে, কারো পড়েছে কার্পাসের বীজ ছাড়াবার পালা, আবার কোন কোন দল হয়ত একজনে পাঁজই করে যাচ্ছে—এসব কাজ করতে করতেই ওদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়—শিক্ষক মহাশয় ওদের প্রশ্নের জবাব দেন—এই প্রশ্ন ও উত্তরের ভেতর দিয়েই ওরা প্রায় সমস্ত

* "শিক্ষকের কথা" চৈত্র ১৩৪১ সাল বনিয়াদী শিক্ষা—শ্রীযুক্তা সুজাতা রায়।

জগতের ইতিহাস—ধুয়োপ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ধরর ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করে নেয়। এটাই হোল বর্মিয়ানী শিক্ষার সমবায়। কাজ করতে করতে যদি ওদের মনে কোন প্রশ্ন বা জাগে তবে কাজের ফেরতেই সময় মেটে যায়—শিক্ষক মহাশয় থাকবেন না যে আজ কিছু তাদের শিখানো হোলো না। জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের একটুও আগ্রহ থাকে না। তাই ওখানকার ছেলেমেয়েরা নিজে রবীন্দ্রনাথের মত পাঠশালা

সেবাগ্রামে শিক্ষকগণ (ফল উপোষণ)

থেকে পালিয়ে আসবার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করে না। ছুটির ঘণ্টা বেজে যায় তবু তারা আরো একটু কথা শুনবার জন্য বসে থাকে শিক্ষকের মিষ্টি আদরমাখা বিদায়ের ভেতরটার।

ছয়টার পর ছুটি। সাড়ে ছয়টায় ভোজন। রাত্রের খাওয়া এ সময়েই শেষ হয়ে যায়। ভোজনান্তে সাড়ে সাতটায় সমবেত প্রার্থনা। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া গান্ধীজীর প্রার্থনায় যায় না। ওরা ওদেরই প্রাঙ্গণে বসে প্রার্থনা করে নেয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য-যোগের ৫৫ শ্লোক অর্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।

থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত ও কোরাণ শরিফের একটা শ্লোক। এই শ্লোকগুলি সংস্কৃত বিনোবা ভাবেজীর মারাঠা অনুবাদ। এগুলোই ওরা তখন সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করে। উপাসনার পর রাত আটটায় আর পাউণ্ড (এক সের) দুধ পান করে খবরের কাগজ নিয়ে বসত বৃক্ষ প্রাঙ্গণের মাঝখানে আলো জ্বালিয়ে—খুব্বের খবর পড়ত, আর নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করত। কেউ কেউ আবার লাইব্রেরী থেকে বই এনে এ সুযোগে পড়ে নিত। কোন কোন দিন উপাসনার শেষে বিশেষভাবে ওরা ভজনের আয়োজন করত, তখন কত সুন্দর সুন্দর মারাঠী ভজন ওদের মিষ্টি কণ্ঠে শুনতুম। নিজেরাই খঞ্জনী বাজিয়ে মাথা নেড়ে হাত তুলে অতি স্বাভাবিক ভাবে ওরা যখন গান শুরু করত, তখন নিজের ভেতরের মানুষটি আর নেতে—গায়ত না। রাত্রে সাড়ে নটা বেজে গেলে পর ছোটদের শোবার ঘণ্টা পড়ত—আর তখন দেখতুম টু শব্দটি না করে শুয়ের ওরে পড়তে। এমন ভাবে প্রতিদিন ওরা নিজের সঙ্গে নিজের কাজগুলো পালন করবার অভ্যাস লাভ করছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছে একটা সুন্দর মানব-সমাজ রচনা করবার কর্মকুশলতা। যে সমাজের স্বপ্ন আজ মহাত্মা গান্ধী দিচ্ছেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ কর্মী যে সমাজের ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত করে চলেছেন নিজের প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে—সেই আদর্শ মানব সমাজের আদর্শ পুরুষ ও নারী যাতে ওরা হতে পারে এরই সাধনা চলেছে সেবাগ্রামের বর্মিয়ানী বিদ্যালয়ের মধ্যে।

তপশিলী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তপশিলী মোরা—খাঁটি শিলীমুখ জেনো,
তোর ঘরে আমি ঘুরি মাস দশ পনে,
এই গুঞ্জন শুনালে কে আছে হেন ?
ঘুন ধোটানেরা, ঘুন ছুটাইতে জানে।

২

আমরা নিম্ন ওই এক পরিচয়
কাহার লাগি করে কেন ছাড়াছাড়ি ?
চূড়া থেকে গোড়া সমটুকু হিমালয়।
গোমুখী গঙ্গাসাগরেতে একই বারি।

৩

ছোট বড় সই, আমরা পক্ষ ভাই—
বহুতে মিলিতে—নাশিতে রোগের নাই
শত ছেদ থাক—তবু ছেদাছের নাই
এক পরিবার একই বসত বাড়ী।

৪

অতি মজা লুটেছে যদি নাম,
উহেল প্রাণ সদা চঞ্চল হবে।
মধু কর্জা দিয়ে রাবণারি রাম
আমাদিকে কোন অর্থের কথা কবে ?

৫

লোভ দেখাইয়া ভুলাইবে তুমি কারে ?
স্বপ্নবিলাসিনী আশা যে মোদের মা,
পরমার্থ কি অর্থেতে কিনে পাবে ?
অর্থের কথা শুনে জ্বলে যায় গা।

৬

ভরত যুগের চারণী আমরা চিমি
সিন্ধু আমরা সব সাধনার শ্রেষ্ঠ,
চিরদিন মোরা বিধুরের কাছে ঋণী
এড়াইতে পারি লোভন মধুপুর।

যোধপুর

পূর্বেই বলেছি যোধপুরের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল।

প্রাচীন রাজধানী 'মাণ্ডোর' পরিত্যাগ করে রাও যোধাজী যখন এই যোধপুর নগর-প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় তিনি এই দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন।

কাজেই রাও যোধাজী নগর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ নির্ম্মাণেও হস্ত করেন।

তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দুর্গের মধ্যেই মহারাজা বাস করতেন। সুতরাং দুর্গের মধ্যেই সেনা-নিবাস, অস্ত্রাগার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সামরিক ব্যবস্থা ছাড়াও, রাজপ্রাসাদ, রাজবংশের অন্যান্য পরিবারবর্গের আবাস প্রভৃতি সবই নিরাপত্তার জন্য দুর্গের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট হত।

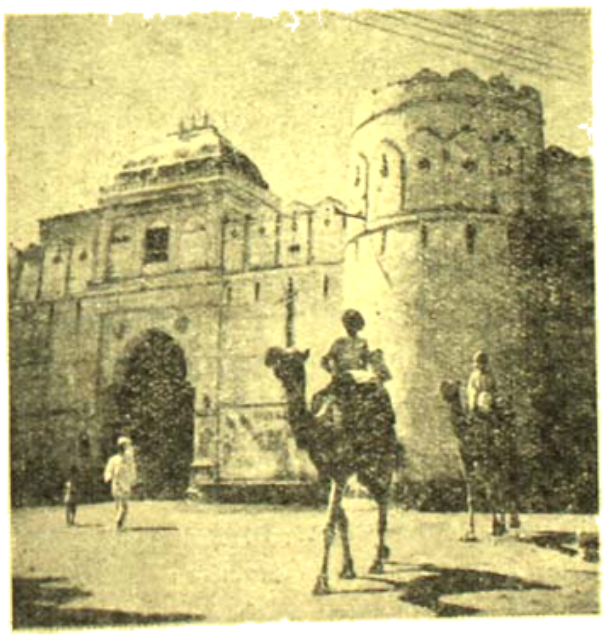

যোধপুরের প্রাচীন নগরের প্রাকারবেষ্টিত তোরণ দ্বার

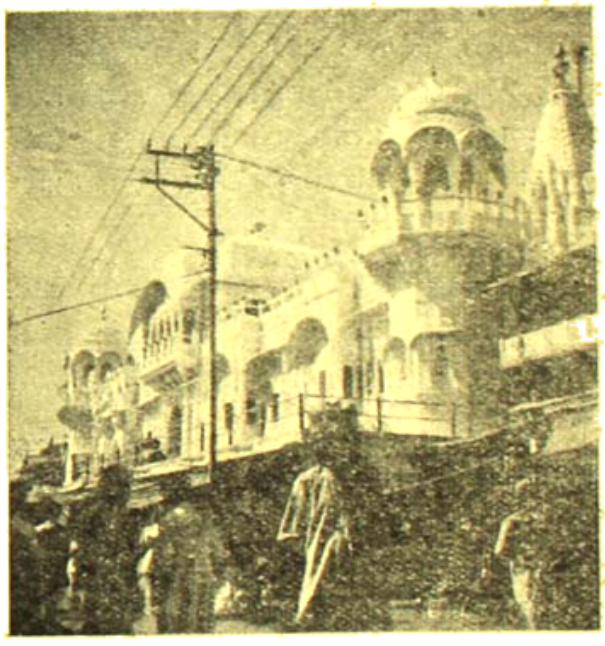

প্রাচীন যোধপুরের বাজার

নূতন রাজধানী পত্তনের কারণই হল রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান। রাজা নিরাপদ রাখতে হলে সেকালে প্রয়োজন ছিল সুদৃঢ় দুর্গের। যোধপুর দুর্গের মধ্যেও এ সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু মহারাজারা এখন আর বন্দীর মতো দুর্গের মধ্যে বাস করেন না। তাঁরা দুর্গের

বাইরে বেরিয়ে এসে এক একজন নিজের ইচ্ছা রুচি ও পছন্দ মতো স্থানে বসবাসের জন্য এক একটি পৃথক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।

আমরা যখন যোধপুরে যাই, তখন যিনি যোধপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরই ইচ্ছানুসারে পূর্ব্ববর্ণিত 'চিতোরপ্রাসাদ' নির্ম্মিত হয়েছিল। সম্প্রতি আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হ'তেই তিনি তাঁর এই নবনির্ম্মিত প্রাসাদে এসে বসবাস করছিলেন। তাঁর অভিলাষ তিনি পূর্ণ ক'রে যেতে পেরেছেন।

স্বর্গগত মহারাজ অত্যন্ত অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁর চরিত্র রাজপুত নৃপতিদের মধ্যে আদর্শ স্বরূপ ছিল। একমাত্র পত্নীকে নিয়েই তিনি পরিতুষ্ট ছিলেন। অন্যান্য রাজাদের ন্যায় তাঁর একাধিক রাণী ছিল না। তাঁর পাঁচটি ছেলে মেয়ে। বড় দুটি ছেলে সাবালক। যুবরাজ সিংহাসন ও রাজ্যের অধিকারী। ইনি বিবাহিত এবং পত্নী-নিষ্ঠ। মহারাণী একজন আদর্শ ভারত মহিলা। তিনি প্রাসাদে তাঁর ঠাকুরঘর নির্ম্মাণ ক'রে নিয়েছেন। ভোরে উঠে স্নান করে তিনি নিত্যপূজায় বসেন। পূজান্তে তিনি সাংসারিক কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। স্বামী পুত্রকন্যা ও নাতিনাতনীদের সুস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি। কোনো ছেলে মেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়লে তিনি নিজে তাদের সেবা-শুশ্রূষার ভার নেন। ডাক্তার ও নার্সদের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন না। রাজপুতানার অধিকাংশ রাজারাণীরা অঙ্গুলী হেলনে চলে থাকেন। পার্টি, সোয়াল, রেসিং, প্যারিস ও লণ্ডনের ড্যাসান, দামী শাড়ী, বহুমূল্য জহরত, তার সঙ্গে চকোলেট, সিগারেট, টেনিস্, মটোরড্রাইভ, শিকার, বিমান-বিহার এই সব নিয়েই আছেন। বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কন্টিনেন্টে কাটিয়ে আসেন তাঁরা। তাঁদের বিলাতী সেক্রেটারী ও গভর্নেসরা এই সব রাজারাণীদের পুরোদস্তুর দুরোস্তীর করে তোলার সাধনায় অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন।

কেতাদুরস্ত State Function অর্থাৎ রাজ্যের কতকগুলি প্রচলিত প্রাচীন উৎসব উপলক্ষে ও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমারোহে যে দরবার বা রাজসভা, মিছিল বা শোভাযাত্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়, সেগুলি সম্পূর্ণ মেদীয় প্রথায় অনুষ্ঠিত হ'তে দেখা যায়। আবার, পোলো, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্ ও বিলিয়ার্ড টুর্ণামেণ্ট, এবং বিলাতী কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির অভ্যর্থনা উপলক্ষে বা লাট বেলাটের সম্বর্দ্ধনায় যে ডিনার পার্টি, ডান্স্, বা টি-পার্টির ব্যবস্থা হয় তা' সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বিলাতী আদব-কায়দায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

যোধপুরের মহারাজা পোলো খেলায় অদ্বিতীয় ছিলেন একথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর নেতৃত্বে যোধপুর পোলো টীম বিশ্বজয়ীর খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বৈমানিক হিসাবে যোধপুরের মহারাজার তুল্য দক্ষতা আর কেউ দাবী করতে পারতেন না। শিকারেও তাঁর মত দুঃসাহসী রাজা খুব কম ছিল। এসব তো গেল খেলাধূলা ইত্যাদি সখের ব্যাপার। যুদ্ধের মধ্যে সামরিক কৃতিত্ব অর্জ্জনের দিক দিয়েও যোধপুর কারও পশ্চাৎপদ নয়। বিকানীর মহারাজের "ক্যামেল কোর" বা উষ্ট্রবাহিনী যেমন আফ্রিকার

যোধপুরের মহারাজা বাহাদুর

মরুযুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বীর যশ অর্জ্জন করেছে, তেমনি সম্মুখযুদ্ধে সঙ্গীন বাগিয়ে ও বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হবার দুঃসাহস দেখিয়ে "যোধপুর লান্সার্স" আজ বিশ্ববিখ্যাত। যোধপুরী পাইজামার বিশেষত্বের জন্য ঘটনা না হোক, যোধপুরী যোদ্ধাদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েই আজ য়ুরোপের অভিজাত ও সামরিক মহলেও "যোধপুর ব্রীচেস্" সম্বন্ধে পরিধান করেন। রাজপুতের দেশে যোধপুরের প্রাধান্য যোধপুরি উমরসুর ও জয়পুরের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।

মহারাজ উচ্চশিক্ষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালীরা ভারতে সকলের অগ্রসর বলে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজে তিনি বাঙালীদের নিয়োগ করেছেন। যোধপুরে বাঙালীর প্রতিপত্তি তাঁর নৈতৃক আমল থেকে চলে আসছে, কিন্তু ভবিষ্যতে বাঙালী তার এ সম্মানের আসন রক্ষা করতে পারবে কিনা

সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, দেশীয় লোকেরাই আজকাল উচ্চশিক্ষা লাভ করে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার বেশীর ভাগই অধিকার করছে এবং একে একে নানা বিভাগে উচ্চ রাজকীয় পদ অধিকার করছে। রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্য সম্বন্ধেও এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যেই একদিন বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী। কিন্তু কিছুদিন থেকে মাদ্রাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙালী হটে আসছে বা আসতে বাধ্য হয়েছে।

রাজ্যের উচ্চ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মহারাজ ও রাজপরিবারের ব্যবহার এত সুন্দর যে চোখে দেখে না এলে হয়ত আমরা তা বিশ্বাস করতে পারতুম না। রাজপরিবারের যিনি প্রধান চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মজুমদার মহাশয়কে দেখেছি যেন রাজপরিবারেরই একজন আত্মীয়ের মতন। আমাদের বন্ধু স্থাপত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে দেখেছি যেন যুবরাজদেরই একজন সমবয়সী বন্ধুর মতো। যোধপুরে তাঁদের বিশেষ খাতির ও মর্য্যাদা দেখে এসেছি। রাজ্যে তাঁদের সম্মান রাজপরিবারের অন্যান্য কারুর চেয়েই কম নয়। মহারাজ ও যুবরাজেরা তাঁদের শুধু ভালবাসেন না, তাঁদের চরিত্রগুণে শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন।

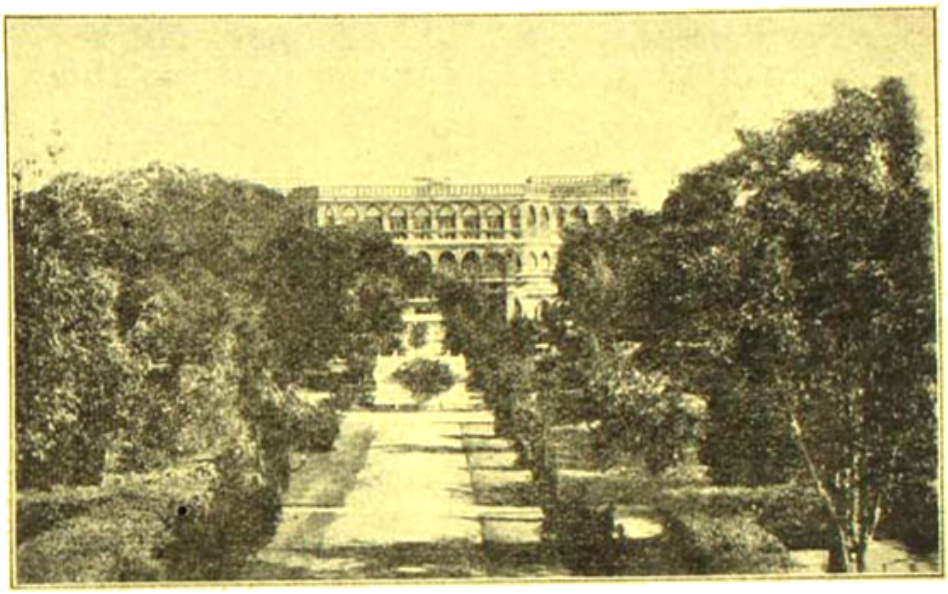

প্রতাপ প্রাসাদ

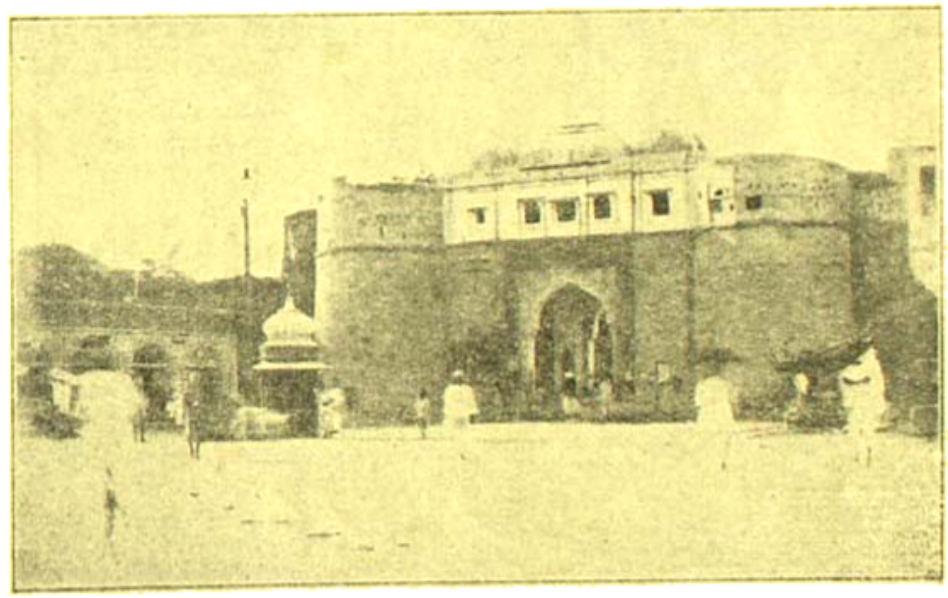

"লোহাগীর" তোরণ

জয়পুরের দুর্গ যেমন সেকালে দুর্ভেদ্যতার গুণে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, মানসিংহের অম্বর-দুর্গ যেমন ঐশ্বর্য্য সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ, যোধপুরের এই গিরিদুর্গ তেমনি বিশালতার জন্য বিখ্যাত। এর মধ্যে সব কিছুই আছে। এই দুর্গ যেন সতর্ক প্রহরীর মত বিশালাকার পর্ব্বত চূড়ায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যোধপুর রাজধানীকে পাহারা দিচ্ছে। দূর থেকে এই বিশাল সুউচ্চ দুর্গটি দেখলে মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব আপনি জেগে ওঠে! যোধপুর রাজ্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও যোধপুরী যোদ্ধাদের সমস্ত বীর্য্য যেন এই গৈরিশিখরস্থ দুর্গটিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই দুর্গের প্রতি পাষাণ ফলকে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কত বীরত্বের ঐতিহাসিক কাহিনী—কত লজ্জা—কত বেদনা। অতীত আমলের বিস্মৃতপ্রায় গৌরবের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত এর বুকে। যোধপুর দুর্গের অস্ত্রাগারে সঞ্চিত হয়ে আছে যে সব প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, অসি, ধনুঃশর, ভল্ল, শেল, শূল, কাটা, খড়্গ, বল্লম, দীর্ঘ বর্শাফলক, বর্ম্মচর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, নানা আকারের ছোট বড় বন্দুক, কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য বহু সামরিক দ্রব্যাদি। রাজা মহারাজাদের নিত্য ব্যবহারের বন্দুকগুলি প্রায়ই স্বর্ণ মণ্ডিত এবং চুণী পান্নাও হীরা জহরৎ

সংযুক্ত উহার প্রবাদিত খাপ ও হাতলগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত ও বহুমূল্য মণিরত্নখচিত। পুরোহিতের দিক দিয়ে এগুলিকে এক অমূল্য সম্পদ বলা চলে।

যে শৈল শিখরে এই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল তার চূড়া ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই শিবেরেশ্বরীকে সমতল করে নিতে হয়েছিল। দুর্গের

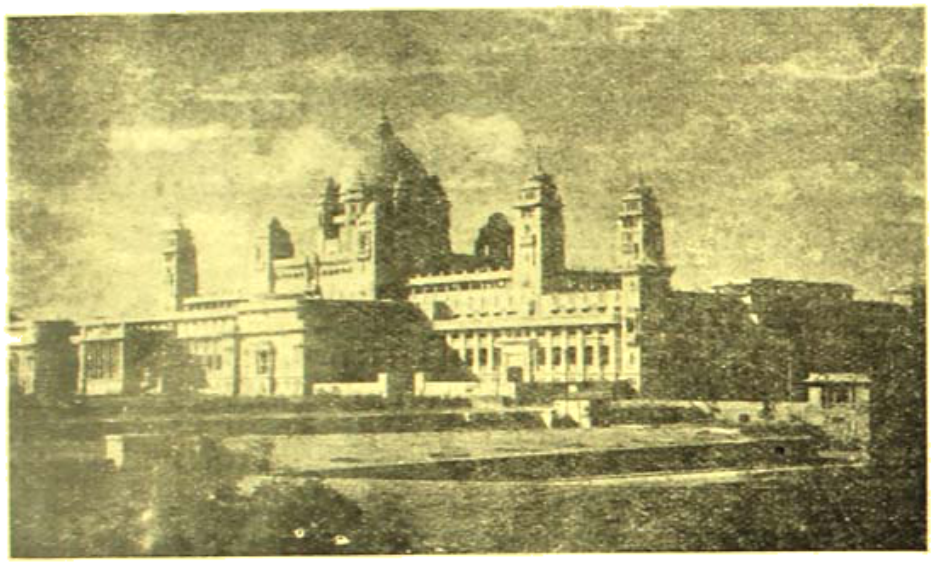

সিংহের প্রবেশ

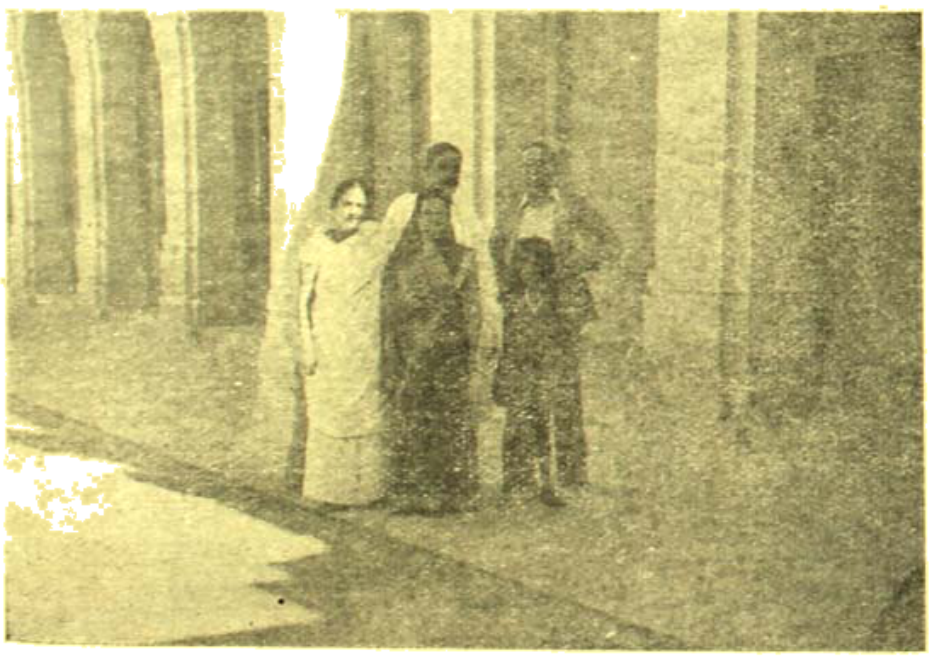

প্রাসাদের আঙিনায়। (দক্ষিণে নবনীতার পিছনে বাঁড়িয়ে গুরুসাহেব)

চারু পথ সমতল ক্ষেত্রের উপর নির্মিত প্রধান তোরণ থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ের উপর দুর্গের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত উঠে গেছে। পর পর সাতটি ফটক পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রত্যেক ফটকে সশস্ত্র দারোয়ান প্রহরীরা দুর্গ প্রবেশকে দুর্গম করে রেখেছে।

ধীরেন ভায়া যেদিন আমাদের এই দুর্গ দেখাতে নিয়ে গেলেন সেদিন বিনীতভাবে দুটি অনুরোধ জানালেন। বললেন, এখানে পায়জামা ও পাগড়ি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ! তবে আপনারা বাঙালী মেয়ের অতি ক্ষি. আপনাদের পায়জামার পরিবর্তে কাপড়খানাই মাল-কোচা বেঁধে পরে গেলেই চলবে।

বললুম—পায়জামার মাপ থেকে গেছে উদ্ধার করলে, কিন্তু পাগড়ি পাই কোথা?

ধীরেন বললে—রুমাল থাকে যদি পকেটে, মাথায় বেঁধে নিন। তাতেই মিনি রক্ষা হবে। একেবারে মেহাৎ 'নাস্যা-শির' না হলেই হল।

যাত্রাদলী ঢঙে মালকোচা বেঁধে ফেললেন এবং পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মাথায় চড়ালেন!

আমিও মল্লদের মতো কাপড়ের কোঁচা কাছার দিকে গুঁজিয়ে নিলুম বটে, কিন্তু, আমার সবকটা পকেট হাতড়েও একখানা রুমাল খুঁজে পেলুম না! বেরুবার সময় ভুল হয়ে গেছে জানতে।

শ্রীমতী হেসে ওঁর হাতব্যাগ থেকে বার করে দিলেন—রুমাল নয়, ছোট টুপী! আমারই টুপী। একটি প্রাচীন কাশ্মিরী শালের পৈতৃক টুপী, আর একটি গান্ধীক্যাপ!

টুপী পরার বিশেষ পক্ষপাতী আমি নই। ১৯৩১ সালে মাথা মুণ্ডানো, বা পার্শ্বভাগ-ভিত্তি মিহিভূমি থেকে প্রায় ১২০ ফুট উঁচু। এই ১২০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর দুর্গটির চতুর্দিক যুড়ে উচ্চ মুক্তাভ পাষাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বর্ষাকালে দর্শকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি বিয়োগের পর মুণ্ডিত মস্তক আবৃত করবার জন্যই একটি গান্ধী টুপী কিনেছিলুম। আজকাল অনেক বাঙালীকেই এই উপায় অবলম্বন করতে দেখি। অনেকে আবার মাথার টাকটি ঢাকবার জন্য টুপী ব্যবহার করেন।

আমাদের কবি-বন্ধু স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কেন্দবিরন বন্ধুদের এই টুপী পরার গুরুত্ব আমাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তিনি একে টুপী না বলে, বলতেন—'টাকের সেলাপ'! আমাদের আর এক সৌদীন কাব্যরসিক সুপুরুষ বন্ধু মাথায় কিছু রাখতে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুন্দরী পত্নী ছিলেন মেঘদূতে বর্ণিত তরুর মতো দীর্ঘশ্রী ও তন্বী। বন্ধুবর শেষে অনেক যুক্তি ক'রে তাঁর এই সুবৃহৎটুকু লোকচক্ষুর আড়াল করতে পেরেছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘাবয়ব টুপী মাথায় দিয়ে তাঁর উচ্চতা প্রায় পত্নীর সমান ক'রে এনেছিলেন! আমরা যদি কেউ তাঁকে অপ্রতিভ করবার জন্য সভার মধ্যে জিজ্ঞাসা করতুম—"একি! মাথায় আপনার এত বড় এক টুপী কিসের?"

তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়েই চোখ টিপে একবার পত্নীর দিকে চেয়ে চাপা কণ্ঠে বলতেন—"চুপ! এটা মাথার টুপী!"

শ্রীমতী আমার পূর্বে বহু বার আসবার পূর্বে একবার রাজপুতানা বেড়িয়ে এসেছিলেন। এদেশের আবহ-অবস্থা অনুসারে টুপী মাথায় দেবার যে দরকার হবেই এটা তিনি জানতেন। তাই আমার দুটি টুপীই তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। টুপীর দেশে অর্থাৎ উত্তর ভারত ভ্রমণকালে আমি যতবার এই টুপী ও পাগড়ীকাপ পরেই ঘুরেছি। পাগড়ির বেশে এসে তা' খুলে রেখেছিলুম। উপস্থিত সেই টুপী দুটি খুব কাজে লেগে গেল। মহীষের মতো মাথায় রুমাল বেঁধে চলাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন একটু পেছিয়ে পড়া ভাবের পরিচয় যেন মনে হয়। যাবারীকে তাই লালের টুপীটা দিয়ে বললুম রুমালখানা খুলে এই টুপীটা পরো।

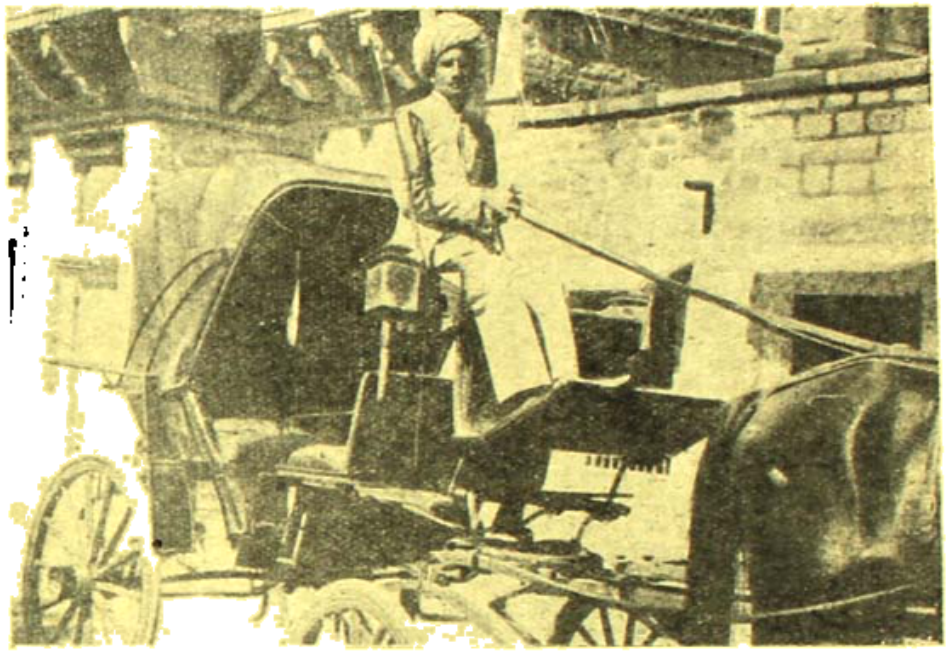

অতিথিদের জন্য ষ্টেট বাস্

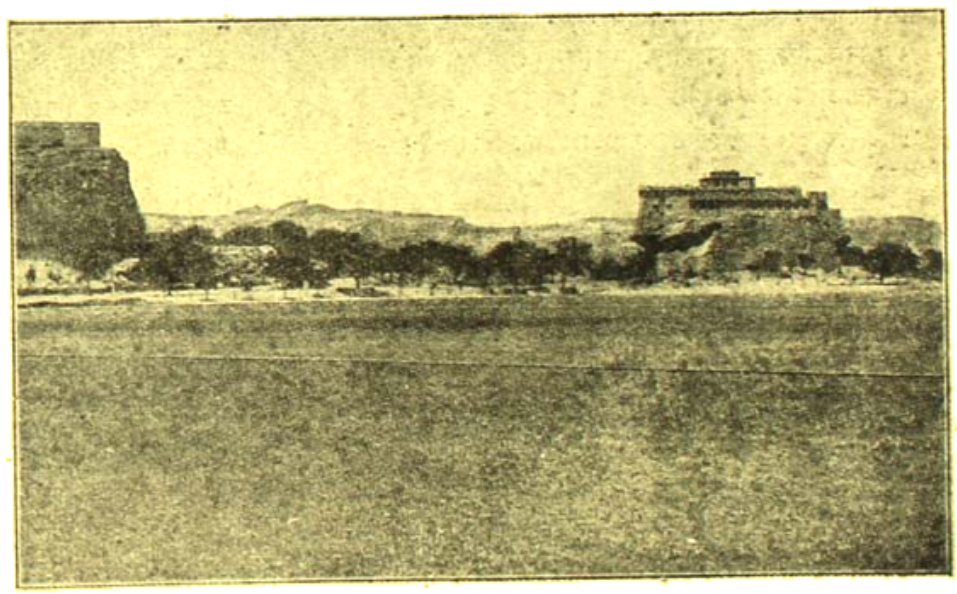

গোলো গ্রাউণ্ড (দক্ষিণ কোণে আমার কুটী)

ঘেরের সম্বন্ধে কিছু বিধি নিষেধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বীরেন তাহার দ্বিতীয় অনুরোধ ছিল কেল্লার মধ্যে যাবার সময় আপনারা কেউ অনুগ্রহ করে ছাতা মাথায় দেবেন না! এ অনুশাসন শুনে আমরা বুড়ো জাইপো দু'জনেই বেশ একটু দমে গেলুম। কারণ,

আমাদের দু'জনেরই যৌতুকস্বরূপ কিনে দিলে দিলে ছাতার পর ছাতা এতবারেই অভাব নেই। তাই আমাদের দু'জনের হাতেই দুটি ছাতিদের ইতি কথা ছাতা ছিল। ছাতাকাতেট থেকে ছাতা গেল কেনা। কারণ দুটোর ছাতারে আর সকল জিনিসের মতো ছাতাও কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। কাজেই আমরা সবসময় এক কাণ্ড—এ রকম এক জোড়া নিজেদের মধ্যে কি? সাপে কি লোকে বলে—মেড়োর ফের!"

ঈশেন হাসা একটু হেসে বললেন—"একমাত্র বরং মহারাণী ছাড়া দুটো মধ্যে ছাতা নাথায় দিয়ে যাবার রাজকীয় সম্মানে আর কাউকে দেওয়া হয় না।"

আমাদের দু'জনেরই ছত্র নিবারণ আইনমাফা সম্বন্ধে একটু ইতস্তত দৃষ্টিভাব ও মুখের সকরুণ অবস্থা দেখেই বোধ করি গুপ্তসাহেব বললেন, "ভয় নেই। একটু এধার ওধার চেয়ে দেখে মাথায় দেবেন মশাই।"

আমরা মুখে বললুম বটে—না না, সেকি কথা! কিন্তু মা তা মানতেই হবে। "যদ্দিন দেশে যথাচারঃ" কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারিনি। (ক্রমশঃ)

স্বাধীনতা

শ্রীকৃষ্ণাবতী দেবী

জানিয়াছি ভাই, ওনেছি সত্য—স্বাধীন হয়েছে অন্ধ বঙ্গ,
আছেক অন্ধ আলোক পেয়েছ—আঁধারে ঢাকিল আছেক অঙ্গ।
আমি কি করেছি অপরাধ বল, তুমি কি ধরিবে তারকা চাঁদ?
দিব নাগপাশে—জগতে নিজেরে—সবে মিলে তাই হচিনু কাঁদ।
বিশাল নদীর দু'দিকে আমরা, ভাঙাগড়াহীন তরী খানি,
দয়া দিয়ে, দয়া মরীচিকা, যদি তোমারে না দেয় নিকটে আনি।
বিদেশে প্রদীপ জ্বালাইব ভাই, কোন সে ভাঙা ইট্টার আজ?
মাথা নীচু কর—নয়ন নামাও, ঢাকো ভারতের লজ্জার লাজ।
বিদেশীরা কেহ অন্তরালে কেহবা পরম কৌতূহলে—
গোপন হর্ষে করে কানাকানি, মিথ্যার নব বেসাতি চলে।
যে মহাভারত নিজ মহিমায় ছিল ধরণীর মুকুট সুধা,
চারিদিকে তার শত্রু হাসিছে সেই ভারতের দেখিয়া দশা!

যেন স্বাধীনতা চাহিনি আমরা চাহেনি কখনো দেশের কেহ,
যে স্বাধীনতায় পর হয়ে যায় নিজ ভাই বোন নিজের গেহ।
অয়ি দেবমাতা, পরাধীনতায় ছিলাম সকলে তোমার কোলে,
আবেক সন্তানে দিয়ে বিসর্জন—আজ কি তুমি মা স্বাধীন হলে?

যাদের শৌর্য সাহসের বলে পেয়েছে বাঙালী এ স্বাধীনতা,
পশ্চিমে বসি বিপদ এড়ায়ে ভুলিল কি আজ তাদের কথা?
নিজ ঘর বল ভুলেছ কি ভাই, কেন রহিয়াছ পরের বেশে?
তব অজিত স্বাধীন হয়ে কেন না আসিছ বিজয়ী বেশে?
কার দয়া কার করুণা আশায় অপরাধী সম রহিলে বসি?
তোমার অভাবে পশ্চিম আজ আঁধার আকুল বিধীন শশী।

ভাই বোন সখা পুতেক স্বজন পরদেশে যদি রহিয়া যায়,
আধ পণ্ডিত ছিন্ন অঙ্গে কি কাজ হবে এ স্বাধীনতায়?
প্রভু হে বিধাতা! অঙ্গের ভালে কি বাঙ্গল লিপি লিখিয়াছিলে!
শত বরষের দুঃখ ও তাপ সাধনার এই বিধান দিলে?

সাধের পথা হারায়েছে আজ আঁধারে না পাই পথের দিশা
অশ্রু আকুল নয়নে পুরবে চাহিয়া কাটাই দিবস নিশা।
স্বাধীন কি আমি? কোথায় আমার প্রাণাধিক প্রিয় জনম ভূমি?
কোথায় রাখি মা প্রণাম আমার, হে বেশ জননী কোথায় তুমি?
করতোয়া হতে ইতল লঙ্কা, ছিল এক বেশ একটি ঘর,
তরবারি হাতে স্বাধীনতা এসে দু'ভাগে কাটিয়া করিল পর।
আমি নিরাপদ দূর ব্যবধানে—নিরুপায় আজ আমারি ভাই,
কি কারণে এই অবিচার হবে এই কথা আজ জানিতে চাই।
জানাইতে চাই উচ্চকণ্ঠে এ স্বাধীনতায় নাহিক কাজ
দেহ হতে প্রাণ তফাৎ রাখিয়া চাহি না পরিতে নকল সাজ।
পশ্চিমে যার প্রাণহীন কায় পূরব উত্তরে জীবন তার,
সকল আশায় সমাধি রচিল স্বাধীন দেশের এ সুবিচার।
কোথা আত্রেয়ী পদ্মা যমুনা মায়ের সমান করুণাবতী,
ধলেশ্বরী বা ব্রহ্মপুত্র ইচ্ছামতী।
প্রিয়তম বেশ প্রিয় নদ নদী কোন পাপে আজ আমার নহে,
স্বাধীনতা নামে অবমাননার অগ্নি দহনে অঙ্গ দহে!

স্বাধীনতা নামে সর্বনাশের বিষাণ আজ পড়িল শিরে
জাগে বিস্ময় ওঠে অভিশাপ পাঞ্জাব আর বাংলা ঘিরে।

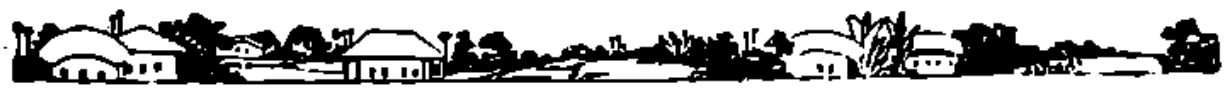

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের নবযুগ

ভারতবর্ষ কাঁচা মালে সমৃদ্ধ দেশ। এই বিরাট দেশের শিল্প-ভবিষ্যতও অফুরান সন্দেহ নাই। কাঁচা মাল রপ্তানীকারক ও তৈরী পণ্য আমদানীকারক দেশ হিসাবে এতদিন ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এখন সাধারণভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের পণ্য আমদানী-রপ্তানী বা বহির্বাণিজ্য অবশ্যই দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষের কিছুটা সহায় থাকিলেও এতকাল জাহাজী ব্যবসায় দিক হইতে ভারতের অবস্থা শোচনীয় ছিল। ভারতের উপকূলভাগের আয়তন সাড়ে চার হাজার মাইলের মত। বিরাট বহির্বাণিজ্য ছাড়া এই উপকূল বাণিজ্যেও ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা এতকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মাল চলাচলে নিযুক্ত জাহাজ কোম্পানী-গুলির মোট আয় হয় ৫১ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির মাত্র ৭ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ টন। এই সময় সারা পৃথিবীতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন বাণিজ্য জাহাজ ছিল এবং শুধু মাত্র ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ শতকরা মাত্র ২০ ভাগ অংশ গ্রহণ করিত।

প্রথমতঃ ব্রিটিশ জাহাজী ব্যবসায়ের স্বার্থরক্ষার জন্যই যে বিদেশী আধিপত্যতান্ত্রিক সরকার ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়কে এভাবে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া এখন আর আলোচনা না করিলেও চলে। সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে এবং শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির নানা বিভাগে এখন যে পরিবর্তন ঘটিতেছে, ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের পরিকল্পনা হইতেই তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি (Shipping Policy sub-committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের বিরাট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টে প্রদত্ত পরামর্শগুলি মূল্যবান এবং আগের মত রিপোর্ট বন্ধের ধামা চাপা না পড়িলে (বর্তমান জাতীয় সরকারের আমলে তাহা আশা করা যায় না) ইহাতে অবশ্যই অনেক কাজ হইবে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর ভারত সরকারকে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয় জাহাজ প্রয়োজন উপকূল বাণিজ্যের শতকরা ১০০ ভাগ, ভারতের সহিত সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্তী দেশের বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ভারতের সহিত দূরবর্তী দেশগুলির বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পরিচালনা করিতে পারে। প্রাচ্য খণ্ডের আগে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্য জাহাজ যে বাণিজ্য পরিচালনা করিত, কমিটি এখন ভারতীয় জাহাজ দ্বারা তাহার শতকরা ৩০ ভাগ পরিচালনা করাইবার সুপারিশ করিয়াছেন।

রিপোর্ট অনুসারে কোন একটি কোম্পানীকে ভারতীয় কোম্পানী বলা হইবে তখনই, যখন :—(১) ইহা ভারতের কোন বন্দরে রেজিষ্ট্রিকৃত হইবে ;

(২) ভারতীয়েরা নিজেদের টাকায় ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ মূলধন যোগাইবে ;

(৩) সমস্ত পরিচালক ভারতীয় হইবেন ;

(৪) কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ থাকিলে তাহারিগকে ভারতীয় হইতে হইবে।

ভারত সরকার ভারতের জাহাজী ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও যে এ বিষয়ে কার্যকরী উৎসাহ দেখাইতেছেন, ইহা সত্যই আশার কথা। সম্প্রতি কয়েকটি ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠান বিদেশ হইতে জাহাজ সংগ্রহ করিয়া কাজ-কারবার বাড়াইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন' ও 'ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫০ হাজার টন মাল বহনের উপযোগী পাঁচখানি বাণিজ্য জাহাজ কিনিয়াছেন। এই জাহাজগুলি এখন ভারতবর্ষ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বন্দরসমূহ পর্যন্ত যাতায়াত করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই জাহাজগুলি ভারতে আসিবার সময় ৪৮ হাজার টন খাদ্যশস্য বহন করিয়া আনিয়াছে। ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানীও সম্প্রতি আটখানি 'লিবার্টি সিপ' ক্রয় করিয়াছেন; এই জাহাজগুলি ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। সিন্ধিয়া-ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই পশ্চিম আমেরিকার বন্দরগুলির এবং সমুদ্রপথে সারা পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানীও শুধু উপকূল বাণিজ্য ছাড়া ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশীয় কোম্পানীগুলির কার্যালয় বাড়াইবার এই চেষ্টা জাতীয় স্বার্থের হিসাবে মূল্যবান সন্দেহ নাই।

আশা করা যায় এইবার ভারতে জাতীয় জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায়ও দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে। বিভাগাপত্তনের কারখানা সম্প্রসারণের চেষ্টা এই উন্নতির অনুপূরক; তাহাড়া চেষ্টা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এখন ভারতীয় কোম্পানীসমূহ অনেক উদ্বৃত্ত যুদ্ধ জাহাজ কিনিয়া লইয়া সুবিধামত সেগুলিকে বাণিজ্য জাহাজে রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারেন। অবশ্য বর্তমান চলার সঙ্কটের দিনে এইভাবে মার্কিন জাহাজ কেনার প্রত্যক্ষ অসুবিধা আছে; তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারত সরকারের পূর্ণ সংযোগিতা আশা করা যায় বলিয়া ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির এই ধরণের আন্তরিক চেষ্টা কিছুটা ফলপ্রসূ না হইয়া পারে না।

মিউনিসিপালিটি প্রসঙ্গ

বাঙলা দেশের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটির অবস্থাই শোচনীয়। বেশীর ভাগ মিউনিসিপাল এলাকাতেই রাস্তায় আলোর, নিয়মিতভাবে রাস্তা পরিষ্কারের বা রাস্তাঘাট মেরামতের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না। অধিবাসীদের এই অব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় ক্ষেত্রেই উত্তর আসে—'ওরে বলেবেন না, ঘরো চোরের কারবার, এসব দিকে নজর দিলে কর্তাদের পকেটে যে টান পড়বে।' বলা নিষ্প্রয়োজন, করদাতাদের পক্ষ হইতে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের সততা সম্পর্কে এই ধরণের সন্দেহ প্রকাশ অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। এই কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ; নির্বাচকদের মনোরঞ্জন হওয়ার মত লজ্জার বিষয় তাহাদের আর কিছুই নাই।

মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের এই ধরণের কোন দুর্নীতিপরায়ণতা প্রমাণিত হইলে সে সম্বন্ধে কঠোর শাস্তিবিধান (কারাবাস, বেত্রদণ্ড, অর্থদণ্ড ইত্যাদি) অবশ্যই আবশ্যক। এইরূপ সমাজ-শত্রুদের শিক্ষা দেওয়া ভারতের জাতীয় সরকারের একটি বড় কর্তব্য। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু পরিচালকবৃন্দ অপব্যয় বা চুরি করেন বলিয়াই মিউনিসিপালিটি পরিচালনায় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না। মিউনিসিপালিটিগুলির কাজ যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, বর্তমানে সেরূপ অর্থাগমেরও কোন সুযোগ নাই। যে সব মিউনিসিপালিটিতে কলকাতাবাসীর সংখ্যা বেশী তাহাদের কথা বলত, কিন্তু বসত বাড়ীর সংখ্যা যে সব মিউনিসিপালিটিতে বেশী, সেগুলির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের সময় হইতে মিউনিসিপাল সহর গুলিতে লোকজন বাড়িয়াছে, রাস্তা দিয়া অবিরাম ভারী ভারী গাড়ী যাতায়াত করিতেছে, পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া একই সঙ্গে মিউনিসিপালিটিগুলিকে জনস্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাট রক্ষার বাড়তি ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। তহবিলের বর্তমান অবস্থায় এইভাবে কাজ চালানো অসম্ভব। মিউনিসিপাল এলাকাগুলিতে ট্যাক্সের হার একরকম স্থির আছে, অথচ নানাভাবে মিউনিসিপালিটিগুলির কার্য পরিচালনার ব্যয় আগের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে পরিচালকবৃন্দের হইয়াছে উভয় সঙ্কট। লোকসংখ্যা এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণ এখন খানিকটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, পরিচালনা ব্যবস্থায় ত্রুটি ঘটিলে তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নিন্দাভাজন হইতে হয়, অথচ কর-নীতি সংশোধন করিবার দায়িত্বও তাঁহারা লইতে সাহস করেন না। ইহার কারণ, এক্ষেত্রে যাঁহাদের স্বার্থ আহত হইবে বলিয়া করদাতাদের (যাঁহাদের ভোটে তাঁহারা নির্বাচিত হন) নিকট তাঁহাদের অনপ্রিয়তা নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির কথা উল্লেখ করা যাক। এই মিউনিসিপালিটির ৮নং ওয়ার্ড একেবারে অরক্ষিত, অন্যান্য ওয়ার্ডেও বিধিব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণীর। যুদ্ধের জন্য এই মিউনিসিপালিটির কাজ এবং খরচ বহু বাড়িয়াছে, আয় সে হিসাবে বলিতে গেলে কিছুই বাড়ে নাই। চুঁচুড়ার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা নির্বাহের সব কিছুর হিসাবেই খরচ বাড়িয়াছে, সহরের গুরুত্বও এখন অনেক বাড়িয়াছে, এক্ষেত্রে বাড়ীর জন্য কিছু বেশী ট্যাক্স দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন হিসাবেই বড় কথা নয়। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়—জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ মিউনিসিপালিটির চরম আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও কর-নীতির সংশোধন করিতেছেন না। রাস্তায় আলো, মেথরের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতির হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের তুলনায় চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির দাবির কিছু কম নয়, কিন্তু বাড়ীর ট্যাক্সের হিসাবে তাঁহাদের সুবিধা অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে চুঁচুড়ার যে ধরণের বাড়ীর জন্য মালিককে তিন মাসে ১৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়, কলিকাতায় তদ্রূপ কমপক্ষে দিতে হয় ৭৫ টাকা। ট্যাক্সের এই বৈষম্য সংশোধিত হইলে মিউনিসিপালিটি পরিচালনা ত্রুটিমুক্ত করা কার্যতঃ অসম্ভব। পতিত জমির উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ট্যাক্স লাগে না। ইহাতে একদিকে 'জমিকে খাইতে দিতে হয় না' এই অজুহাতে মালিক জমি ফেলিয়া রাখিয়া চোরাবাজারী মুনাফা বৃদ্ধির যেমন ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে তেমনি মিউনিসিপালিটি ন্যায্য আয় হইতে বঞ্চিত হয়। এইরূপ জমির উপর ট্যাক্স বসিলে বর্তমানে তাঁর গৃহ-সমস্যারও আংশিক সমাধান হইবে এবং মিউনিসিপালিটিগুলিরও আয় বাড়িবে। মিথিলা এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য হইতে কর হিসাবে যে টাকা আদায় হয়, সরকার তাহার একাংশ নিয়মিতভাবে মিউনিসিপালিটিগুলিকে দিবার ব্যবস্থা করিলেও কার্য পরিচালনার প্রভূত সুবিধা হয়। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের সাইনবোর্ড, দেয়াল বিজ্ঞাপন প্রভৃতি হইতেও মিউনিসিপালিটির আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। যে সব অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীর দরজায় নাম লিখিবার মোহ আছে, তাঁহাদের উপর নামফলক ট্যাক্স বসাইলে ধনী গৃহস্থের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ ইহাতে মিউনিসিপালিটির আয় অনেক বাড়িয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে দরজায় 'নেমপ্লেট' লাগানো এ দেশের বিত্তবান শ্রেণীর একটি বড় ব্যসন।

মোটের উপর সব মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষই চোর নন এবং যেখানে দুর্নীতি দেখা যায়, সেই দুর্নীতিও সমগ্র অব্যবস্থার একমাত্র কারণ নয়। আসল কারণ হইল অর্থাভাব এবং জনসাধারণের সহযোগিতা

না থাকিলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সমন্বিত এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের পক্ষে আয় বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করাও খুবই কঠিন। রাজনৈতিক পট-ভূমিকার পরিবর্তনের পর এখন এ দেশের মিউনিসিপাল অর্থনীতি লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে। মিউনিসিপালিটি-সমূহের কর্তৃপক্ষ, জনসাধারণ, অর্থনীতিবিদগণ এবং দেশের শাসক সম্প্রদায় অবহিত হইলে এদিক হইতে অনতিবিলম্বে বহু সমৃদ্ধি আশা করা যায়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাট চাষ

পাট ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থকরী ফসল এবং সারা পৃথিবীতে ভারতীয় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা আছে। বহির্বাণিজ্যের গতি যে ভারতের অনুকূলে থাকে, এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীই তাহার প্রধান কারণ। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাবেই নয়, ভারতে পাটের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও কম নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির সহিত ভারতীয় পাট চাষ ও পাট শিল্পের উন্নতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান।

ভারত বিভাগের পর যে সব এলাকা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ভারতের অধিকাংশ পাটই কিন্তু সেই সব এলাকায় উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে ভারত বিভাগের পর পাটের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে নিঃসন্দেহে কতকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। এখনও ভারতের ১০৮ পাট কলের সব কয়টি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বলিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হয়তো পাকিস্থান হইতে অধিক পরিমাণ কাঁচা পাট সংগ্রহ করার অসুবিধা হইবে না, কিন্তু পূর্ববঙ্গে কয়েকটি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইলেই (শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এখন খুবই আগ্রহ দেখাইতেছেন বলিয়া শীঘ্র এইরূপ কল-কারখানা গড়িয়া উঠার বিশেষ সম্ভাবনা আছে) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্দেশীয় চাহিদার হিসাবে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং সময় থাকিতে এখনই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাট চাষ বাড়াইবার কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য।

ভারতের ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পাট চাষের হিসাব হইতেই পাকিস্থানের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অসহায়তা উপলব্ধি করা যাইবে। এই বৎসর সারা ভারতে যে ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়, তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমি ছিল পাকীস্থানের এবং মোট উৎপন্ন ৫৫ লক্ষ ৪০ হাজার বেলের (প্রতি বেল ৪০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৫ মণ) মধ্যে পাকীস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪০ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল পাট।

দিনাজপুর, যশোহর, মালদহ, নদীয়া, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার যে সব অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে সেগুলিতে পাট চাষ বর্তমানের তুলনায় অনেক বাড়ানো চলে। এ ছাড়া পশ্চিম বাঙ্গলার হুগলী, দার্জিলিং, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায়, উড়িষ্যায়, আসামে এবং বিহারে পাটচাষ বাড়াইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরা রাজ্য, কুচবিহার ও নেপাল রাজ্যে পাট চাষ বাড়ানো মোটেই কঠিন নয়। মোটের উপর কাঁচা পাটের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিয়া চাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয় এবং ফসল উৎপন্ন হয় ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার বেল। বিভিন্ন এলাকায় কতখানি জমিতে চাষ হয় এবং কিরূপ ফসল উৎপন্ন হয় তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

এলাকা	পাটচাষের জমি (একর-জমি)	ফসল (বেল হিসাবে)
পশ্চিম বঙ্গ	১,৫৪,১২৪	৪,৭৯,৮৭৫
মুর্শিদাবাদ	২৩,৩৫০	৮৫,২৮০
২৪পরগণা	২৪,০৭৫	৭৭,০৪০
জলপাইগুড়ি	১৯,৩১১	৫০,৪০২
হুগলী	১৯,০৩৫	৬৩১,০১০
মালদহ	১৭,৩৬১	৫৬,৪১৭
নদীয়া	১৬,৭৩৬	৪০,২০৯
দিনাজপুর	১০,৮৭৫	৩২,৩২৬
মেদিনীপুর	৬,৭১৪	২১,৪৯০
যশোহর	৫,৯২৭	১৮,২৩১
বর্দ্ধমান	৩,২৪০	১১,৩৪০
হাওড়া	৩,০৩৪	১০,৩২০
দার্জিলিং	১,২৭০	৪,১৪০
বাঁকুড়া	২০০	৬৪০
বীরভূম	৬৫	২১০
কুচবিহার রাজ্য	২৬,৮২৫	৪৬,৪২৫
ত্রিপুরা রাজ্য	১০,০০০	২৯,০০০
বিহার	১,৪৫,৯০০	২,৪০,৭১০
উড়িষ্যা	২৩,৮০০	৪৮,০২০
আসাম	১,৪১,২০০	৪,০৭,৩০০
নেপাল	—	২,০০,০০০

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পরেশ—এই গল্পটির নাম গুরুচরণ না হইয়া পরেশ কেন হইল বুঝা যায় না। পরেশ চরিত্রটি গল্পে ফুট নাই। সে গুরুচরণের হাতে গড়া, তাঁহারই মানুষ-করা কৃতবিদ্য যুবক। মজুমদার-পরিবারের ঘরকোলাহলে সে নীরব নিষ্ক্রিয়। বোধহয় বিমাতার সংসারে তাহার ব্যক্তিত্বপ্রকাশের সুযোগই ছিল না। শেষ পর্যন্ত পরেশই তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের অবলম্বন হইল অর্থাৎ সে তাঁহার কাশীবাসের ব্যবস্থা করিল। গুরুচরণের পক্ষে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্র গল্পটির নাম দিয়াছেন 'পরেশ'।

গুরুচরণ একজন সাধুচরিত্রের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি—চিরদিন শিক্ষা-ব্রতী থাকিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা ও চরিত্রে উন্নত করিয়াছেন। "তাঁহার অপরিসীম স্বধর্মনিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতার সম্মুখে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করিত।" শরৎচন্দ্র এই গল্পে বলিতে চাহিয়াছেন—এই শ্রেণীর লোক যতই বেপরোয়া, চরিত্রবান্ ও মহৎ হউন—নিজের পরিবারের লোকেরা তাঁহাদের চরিত্রের মূল্যমর্যাদা উপলব্ধি করে না—তাঁহাদের অসামান্যতা স্বীকারও করে না। নিজ পরিবারের লোকেরা এইরূপ চরিত্রের অনুসরণও করে না—অন্ততঃ আমাদের এই বাঙ্গালী সমাজে। পুত্র বিদ্রোহী হইল—তাহার চরিত্র হইল গুরুচরণের বিপরীত। সে বহুদুঃখ দিল তাহার দৃঢ়চরিত্রতার নিত্য নূতন উপদ্রবে। সহোদর ভাই এবং সংসার অভ্রভেদী অগ্রজের মর্যাদা বুঝিল না। সে শুধু সম্পত্তি হইতেই বঞ্চিত করিতে চাহিল না—নানা ভাবে বিড়ম্বিত করিল। ভ্রাতৃবধূ বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে লাগিল। পুত্রের চেয়েও অধিক যে, সে ও নৈতিক সাহস দেখাইতে পারিল না।

শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজের একটি পরম সত্য কথা এখানে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা নিত্যই দেখিতেপাই, দেশের বড় বড় সাহিত্যিকদের আপন পরিবারের লোকদের দ্বারা অনাদৃত—এমনকি বিড়ম্বিত হইতে। দেশবিদেশে বিখ্যাত বিদ্‌গ্ধ পণ্ডিতকে ও দেখিয়াছি আপন পত্নী, পুত্র, কন্যাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে। যিনি নিজের শক্তি ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজ পরিবারকে ধনে মানে প্রতিষ্ঠার সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বহুজনকে প্রতিপালন করিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার দুর্গতি দেখিয়াছি নিজেরই আত্মীয়বন্ধু প্রতিপালিতবর্গের হাতে। পুত্রের পক্ষে সাধু পিতার বিপরীত চরিত্রের লোক হওয়া এবং পণ্ডিত পিতার মূর্খ পুত্র হওয়া যেন সমাজে প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছে। আর নিষ্কলঙ্ক সরল ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রের লোকও নিজ পরিজনের কাছে পাগল কিংবা ভণ্ড। তাঁহাদের দশা হয় রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থের 'রামকানাইএর' মত। অতএব বলিতে পারা যায়—শরৎচন্দ্র একটি অপ্রিয় কঠোর সত্যকে বাঙ্ময়রূপ দান করিয়াছেন এই গল্পে।

আমাদের বর্তমান সমাজের পারিবারিক জীবনের সহিত যাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সে গুরুচরণের প্রতি পরিজনের যে আচরণের কথা শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—তাহা একটুও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের শ্রদ্ধা সম্মানের মধ্যেও নিষ্ক্রিয়তা আছে। নতুবা গুরুচরণ যখন সমাজে নানা ভাবে বিড়ম্বিত হইতেছেন—তখন গুরুচরণের ভক্তস্থানীয় গ্রাম-বাসীদের দ্বারা হইতেও কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকারের চেষ্টা দেখা যায় না কেন? শ্রদ্ধার এই নিষ্ক্রিয়তাও পরম সত্য।

শরৎচন্দ্রের একটা ধারণা (সম্ভবতঃ বহুকথিতা হইতেই তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল)—প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ যাহা সর্বপ্রযত্নে বর্জন করিয়া চলে, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মনের বল কমিয়া গেলে সুযোগ পাইয়া ছিদ্রান্বেষী শত্রুর মত তাহাই তাহাকে আক্রমণ করে। বিবাহ-যৌবনের পরিণাম স্মরণ করিতে বলি। গুরুচরণের পক্ষে নারীর গায়ে হাত তোলা ও খ্যামটা নাচের আসরে রাত্রিযাপন—ঐ ধারণারই দৃষ্টান্ত। তাঁহার চির জীবনব্যাপী শুচিতার অনুশীলনের মর্যাদা কেহ রাখিল না বলিয়া রাগ অভিমানভরে তিনি শুচিতার বিষয় লঙ্ঘন করিয়াছেন—একথা কেহ যেন মনে না করেন।

ভৃত্যচরিত্র ও বাস্তবানুভূতি—পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন পরিজন-সম্পর্ক লইয়াই সামাজিক গল্প রচিত হয়। ভৃত্যও আমাদের সংসারে পরিজন; বিশেষতঃ অনেক ভৃত্যের প্রভুগৃহই আপন গৃহ—নিজের কোন পৃথক্ গৃহই নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ভৃত্য অবলম্বনে একাধিক কবিতা ও গল্প রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের সংসারে ভৃত্যের প্রতি অবিচার কম হয় না—বর্তমান যুগে যুগধর্মের গুণে ভৃত্যের মর্যাদা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে—তাহাদের প্রতি অবিচার হইবার উপায় আর নাই। ভৃত্য অবলম্বনে গল্প কবিতার সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছে। আগে ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার অবিচার লেখাই হইত। দরদী কবি বা সাহিত্যিকের দৃষ্টি ইহা এড়াইত না। শরৎচন্দ্র এই দুটি ছোট গল্পে লাঞ্ছিত ভৃত্যের প্রতি দরদকে বাণীরূপ দিয়াছেন।

ভৃত্যদের সবচেয়ে বিপদ চুরির অপবাদ। বহু ভৃত্যই চোর—চুরি করিয়া বহু ভৃত্যই পলায় একথাও সত্য। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য, বাড়ীতে কোন কিছু চুরি গেলেই ভৃত্যের অপবাদ হয়। "যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।" অনেক সময় এ অপবাদ মিথ্যা। যেখানে অপবাদ মিথ্যা, সেখানেই সাহিত্যিকের দরদ। ভৃত্যের যে শারীরিক বা মানসিক বেদনা থাকিতে পারে, তাহার শরীরও অত্যন্ত অসুস্থ হইতে পারে প্রভুরা একথা ভুলিয়া যায়—কখনও চিন্তাও করে না। এই হৃদয়হীনতা সাহিত্যিকদের মর্মস্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে' কবিতাটি স্মরণ করিতে বলি। 'খোকাবাবুর

অত্যাবর্তন' গল্পে কৃতী রাইচরণের বৈধবিড়ম্বনার কাহিনী কৃতীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর দরদের চূড়ান্ত নিদর্শন। হরিচরণ গল্পে অধিকারী প্রভুর পক্ষ হইতে চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার একটি চিত্র আঁকিয়াছেন দরদী শরৎচন্দ্র। গল্পটি একটি লিরিকের মত মর্মস্পর্শী।

বোষ্টমী—বোষ্টমী শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা। ইহা একটি যুবকের তিনটি পর পর বিবাহের কাহিনী। এক পত্নী সত্ত্বেও অন্য পত্নী গ্রহণ এ সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। তবু ব্যাপারটিকে অধিকতর স্বাভাবিক করিয়া দেখানোর জন্য যুবক সতোন্দ্রনাথকে ধনীর সন্তান করা হইয়াছে। সতোন্দ্রকে ডেপুটি না করিলেও চলিত। সাধারণতঃ ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া যে ডেপুটি হয়, তাহার সুবিচারবোধ ও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। তবে শরৎচন্দ্রের আগেই রবীন্দ্রনাথ বেনাপাওনা গল্পে দেখাইয়াছেন ইংরাজি বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী ডেপুটিবাবুদেরও পত্নী সম্বন্ধে সুবিচার-বোধ সেকালে ছিল না।

নারীজাতি নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইবার পর হইতেই আমাদের সমাজে পুরুষজাতি নারীর নারীত্ব ও তাহার হৃদয়ের মর্য্যাদা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্র যে সময়ের সমাজের কথা 'বোষ্টমী' লিখিয়াছেন—সে সময়ের নারিগতি আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাই পুরুষেরই অত্যাচার চলিতেছে। বেশীর ভাগ নারী নিজের নারীত্বের মর্য্যাদা সম্বন্ধে একটু সচেতনতা দেখাইয়াছে—সেখানে দুর্ঘটনা নারীর জীবনে Tragedyই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমর-চরিত্র আঁকিয়া পূর্ব্বসূচনা দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের ভ্রমর-চরিত্র সেকালের সমাজের পাঠকের কাছে একটা অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। শরৎচন্দ্র তাঁহার অল্পবয়সের এই রচনায় বঙ্কিমের দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিলেন—তিনিও নলিনীর মধ্যে একটু ভ্রমরত্ব আরোপ করিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে সতোন্দ্রের মনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইয়াছে ইহা দেখাইতে পারেন নাই—নলিনীর জীবনে Tragedyই দেখাইয়াছেন।

এই গল্পটিতে বঙ্কিমের প্রভাব আরো একাধিক ব্যাপারে দৃষ্ট হয়। নলিনী তাহার সপত্নীকে বরণডালার উপহার পাঠাইয়া চির বিদায় লইয়াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বঙ্কিমী ধরণের শিরোনামাই ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন—'কপাল ভাঙ্গিয়াছে কি?' 'ভাঙ্গিয়াছে।' ধনী লোকের অন্তঃপুরের কথা লইয়া পাড়াপড়শীদের মধ্যে কুৎসা-প্রচার বঙ্কিমী ধরণেই বিন্যাসিত হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে পাঠককে আহ্বান করিয়া লেখকের মন্তব্য প্রকাশ একালে আর চলে না। উহা সম্পূর্ণ বঙ্কিমী ব্যাপার।

শরৎচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন—"সতোন্দ্রনাথ! তুমি একা নও। অনেকেরই কপাল তোমার মত অল্প বয়সে পুড়িয়া যায়। সকলেই কি তোমার মত পাগল হয়? সাবধান, সত্য। সকলেরই একটা সীমা আছে। স্বর্গীয় ভালবাসারও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি সীমা ছাড়াইয়া যাও, কষ্ট পাইবে। কেহ রাখিতে পারিবে না।"

আর এক স্থলে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সতোন্দ্রনাথ! তোমায় দোষ দিই না, তাহারও দোষ দিই না। দুই জনেই ভুল করিয়াছ, দোষ কর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্মগ্লানি কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরাত বুঝিতে পারিতাম না। তোমরাও বুঝিতে পারিতে না। বুঝিতে পারি না, কি আকাঙ্ক্ষায় কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এটা করিলে।"

যৌবনে পদার্পণ করিয়াই শরৎচন্দ্র প্রবীণ বিজ্ঞ লোকের মত বলিয়াছেন—"সতোন্দ্রনাথ! তুমি দুঃখ সইয়া খেলা করিয়াছ শাস্তি পাইবে আর হয় কি?

তোমরা যুবা, সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন; কিন্তু বল দেখি তোমাদের কাহারও কি এমন একটা সময় আসে নাই—যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভারবোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিগুলি শ্লথ হইয়া ক্রমান্বয়ে চলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না হইয়া থাকে একবার সতোন্দ্রনাথকে দেখ। ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় অন্তরে ঘৃণা কর। ঘৃণা কর, সহানুভূতি প্রকাশ করিও না। ঘৃণা-কর, কিছু বলিবে না। ঘৃণা করিও না মরিয়া যাইবে।"

এই সমস্ত বঙ্কিমী ধরণের প্রাঞ্জলতার অভিনয় মাত্র। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী রচনায় এই ঢঙ আর ছিল না।

বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও শরৎচন্দ্রের রচনায় এই সময়েই পরিলক্ষিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত অংশে রবীন্দ্রনাথের বাচনভঙ্গীর ছায়াপাত দেখা যায়—

"তাড়াতাড়িতে দুই হাতে দুই রকমের বোতাম কিংবা আচার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেছে, কলেজের একঘণ্টা যাই-যাই সময়ে এক পায় কার্পেটের অপর পায় বার্নিশ করা জুতা সে না পরিয়া ফেলে, কর্ত্তা জামার উপর রঙ্গক-ওয়ন গুরুগম্ভীর জন্য প্রস্তুত চাদরের জুলুম না হয়, সেইসব কাজগুলা সরলাই দেখিত।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নারীরই প্রাধান্য, পুরুষ সাধারণতঃ পরিচালিত অথবা উদাসীন। 'বোষ্টমী' গল্পে নারীর প্রাধান্য ঘটে নাই—নারী এখানে খেলার পুতুল মাত্র অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই গল্পে অনুপস্থিত অবস্থাতেও নাই। শরৎচন্দ্র তখনও তাঁহার শক্তিমত্তা লাভ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী রচনায় নারী বহুভাষিণী, বোষ্টমী নারী মিত-ভাষিণী। কথাবস্তুর এক অংশ বা চিত্র হইতে অন্য অংশ বা চিত্রে প্রত্যাবর্তনের (Transition) স্বাভাবিকতা ও যথাযথতা এই গল্পে নাই। প্রথম পরিচ্ছেদেই এই দোষের দৃষ্টান্ত মিলিবে। নানা ত্রুটী সত্ত্বেও এই গল্পে শরৎচন্দ্রের, বৈশিষ্ট্যের না হউক, প্রতিভার অঙ্কুর যে একেবারে নাই, তাহা নয়।

পাকিস্থানে বাঙ্গালার স্থান

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাঁহারা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মপ্রসাদ ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র পৃথিবীর যে ক্ষতি তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার হিসাব করা কঠিন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার জন্য ভারত বিভাগের দাবী যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী এবং পৃথিবীর ইতিহাসে যে অধ্যায়ে ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকিবে, তখন এই সকল লোকের নাম কলঙ্কমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু সে ত বহুদিনের কথা। যাঁহারা ভারতবিভাগের চেষ্টায় সমগ্র ভারতে লুট, অগ্নিকাণ্ড, খুনোখুনি, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া সমগ্র অমুসলমান নরনারীর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জগতে প্রাধান্য লাভ করিবার আশা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হিসাব যে কত বড় ভুল তাহা প্রকৃত ঘটনা বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষ পাকিস্থান ও ইণ্ডিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাকিস্থানে নিরঙ্কুশ মুসলমান বাস করে না এবং ইণ্ডিয়াতে মুসলমান সংস্পর্শ-বিহীন হয় নাই। পাকিস্থানে আড়াই কোটী হিন্দু এবং ইণ্ডিয়ায় চার কোটী মুসলমান থাকিয়া গেল। কায়েদে আজমের শান্তি নাই, তিনি সমস্ত হিন্দুকে পাকিস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া ইণ্ডিয়ার মুসলমান আমদানী করিতেছেন। সত্য সত্যই লোকে তাহা চায় কিনা, সে বিচার তিনি কোনও দিনই করেন নাই। এখন তাঁহার হিন্দু-মুসলমান "লেন-দেন"-এর কারবার চলিতেছে, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, কত লোকের অপঘাত, জীবননাশ ঘটিতেছে, দুর্দ্দশা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব লইবার সময় তাঁহার নাই।

[redacted]কি এই অস্বাভাবিক জাতি বা শ্রেণী বিভাগ থাকিয়া যাইবে? কায়েদে আজম চিরজীবী নহেন, তাঁহার অন্ধ ভক্তবৃন্দের বল চিরকাল ধরিয়া ভারতে "রক্তগঙ্গা" বহাইবার শক্তিযোগান করিয়া যে থাকিবে, তাহা সম্ভব নহে। বাঙ্গালা উড়িষ্যার মুসলিম লীগ সভাপতিরা প্রকাশ্যভাবে লীগ মতবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন এবং আশা করা যায়, ক্রমশঃ সাধারণের মধ্যে এ জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিবে।

এ-দিন বোধ হয় বেশী দূরে অপেক্ষা করিয়া নাই। যদি পাকিস্থান বাঁচিতে চায় তাহা হইলে, এ সম্বিৎ যত শীঘ্র করিয়া আসে ততই মঙ্গল। যখন পাকিস্থান এক সত্তায় বাঁচিতে চাহিবে, তখন জনাব জিন্নাহ সাহেবের এক-কর্ত্তৃত্বের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা একবার ভাবিবার কথা।

"প্রাদেশিক সত্তা একদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে যাবে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সহিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের যোগাযোগ অন্ততঃ আটশত মাইল ব্যবধান বাঁচাইয়া চলিবে। সুতরাং বাঙ্গালী আপনাকে চিনিয়া লইবে, এইরূপ আশা করা ভুল হইবে না। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে রাষ্ট্রিক যোগসূত্র থাকিলেও ব্যক্তিগত, এমন কি সমাজগত যোগাযোগ না থাকিলে রাষ্ট্রের একত্ব সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান জন্মিতে বিলম্ব হইবে। হয়ত সেই সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালা আপনাকে চিনিয়া লইয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের অধিবাসী বঙ্গভাষাভাষীসমস্ত হিন্দু মুসলমান, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষার স্বার্থে মিলিত হইয়া এক যোগে কাজ করিতে থাকিলে পাকিস্থান রাষ্ট্রে বাঙ্গালীর প্রাধান্য গড়িয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী মিলিবে কিনা, একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর নিকট ইহা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে। গত ১৫ই আগষ্ট ডোমিনিয়ন শাসনলাভ উপলক্ষে পূর্ব্বঘাট হিন্দু মুসলমান যে মিলনের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী নির্ব্বিশেষে মিলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইংরাজ চলিয়া যাইবার পর, কিছু কালের মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষের আওতা ছাড়িয়া অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দল গড়িয়া উঠিতে বাধ্য এবং প্রাদেশিক স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গালী এক হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই আশা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কতদিন বাদে এই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পাকিস্থান রাষ্ট্রে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের বাস দাঁড়াইয়াছে। জানিনা কত লক্ষ লোক প্রাণভয়ে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যদি উভয় সংখ্যা সমান হয়, তাহা হইলে মোটামুটী একই অবস্থায় দাঁড়ায়। এই ৩ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রদেশ হিসাবে লোক সংখ্যা—

পঞ্জাব	১ কোটী ৫৭ লক্ষ
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০'৪ "
সিন্ধু	৪৫'৩ "
বালুচিস্থান	৪ "
বাঙ্গালা ও আসাম-সিলেট	৪ " ১৮ "
	৩ কোটী ৫০'৭ লক্ষ

আজকাল সংখ্যা হিসাবে রাষ্ট্র শাসন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই হিসাবে পাকিস্থান-কেন্দ্রীয়-পরিষদে বাঙ্গালীর স্থান দ্বাদশাংশ। এখনও কায়েদে আজম অথবা মুসলিম লীগ কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে বাঙ্গালার প্রতিনিধি করিয়া বাঙ্গালার বাহিরের পাকিস্থানী নেতৃবর্গকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হয়; কিন্তু বাঙ্গালী আপনার

দাবী মূলতবী উত্থাপন করিলে, শীঘ্রই এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটিবে।

পাকিস্থান রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক হিসাবে বাঙ্গালার স্থান প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা। অবিভক্ত ভারতে রাজশাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে বাৎসরিক এক কোটী এবং বালুচিস্থানকে এক কোটী তিরাশী লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া প্রদেশ হিসাবে ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই দুইটী পাকিস্থানের অংশ। সুতরাং পাকিস্থান রাষ্ট্রভুক্ত হইলেই রাতারাতি ইহারা আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে করা ভুল।

লোক সংখ্যা ও অর্থ-নৈতিক প্রাধান্য ছাড়া বাঙ্গালার আরও দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। সারা পাকিস্থানে সাড়ে ছয় কোটী লোকের মধ্যে সওয়া চার কোটী লোকের এক ভাষা—অর্থাৎ বাঙ্গালা। আর দুই কোটী লোকের দুইটী ভাষা। অর্থাৎ হিন্দী, উর্দ্দু, গুরুমুখী, পুস্তো বা পুস্তু, বালুচি ও সিন্ধী। সেই হিসাবে বাঙ্গলা ভাষাই পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়াগৃহীত হওয়া উচিত। আজ হঠাৎ যদি উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা হইলে পাকিস্থানের অধিবাসীর শতকরা নিরানব্বই জন "নিরক্ষর" হইয়া যাইবে; জগতের মধ্যে পরিচয়ে ইহা মোটেই গৌরবের বস্তু নহে।

সিন্ধু ও পঞ্চনদ খাদ্যশস্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম পঞ্চনদে দাঙ্গার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এই হিসাবে প্রকৃত অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। করাচী বন্দর এবং পশ্চাৎ পাট উৎপাদন ক্ষেত্রে পাকিস্থানের গর্ব্ব করিবার বিষয়, কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালার অবস্থা শীঘ্রই উন্নত হইবার কথা। চট্টগ্রাম বন্দর, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে নব মূর্ত্তি ধারণ করিবার আশা রাখে। বিস্তীর্ণ পাট ক্ষেত্রের উন্নতি হওয়া সম্ভব। তাহার উপর আছে পাট, যাহা কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব্ব-বাঙ্গলা প্রায় এক-সত্ব দাবী করিয়া থাকে।

পাটের আয়, ভূমিরাজস্ব, বিক্রয় শুল্ক, আবগারী ও আয়কর প্রভৃতি সমস্তই অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে পড়ে, সুতরাং প্রত্যেকটী স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। সেখানে পূর্ব্ব পাকিস্থান, সমগ্র পাকিস্থান রাষ্ট্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে।

সকল দিক দিয়াই বাঙ্গালা পাকিস্থানে একটী অতীব গুরু স্থান অধিকার করিবার কথা। কিন্তু হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া বাঙ্গালী পরিচয় দিতে হইবে। এই মিলন সমগ্র ভারতের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার বাঙ্গালী জগতে আপনার পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে এই আশা পোষণ করি। জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, নবীন সেন, আনন্দমোহন, অশ্বিনীকুমার, মনোরঞ্জন, চন্দ্রমাধব, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, অম্বিকা মজুমদার প্রভৃতি বহু দেশসেবক্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ যে পূর্ব্ব-বঙ্গের সন্তান, সেই পূর্ব্ববঙ্গ আবার নূতন পরিবার মণ্ডিত হইয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, দেশসেবক, রাষ্ট্রনায়ক প্রসব করিয়া পাকিস্থানে প্রাধান্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাতিগঠন ও জনকল্যাণ প্রচেষ্টা

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনাধীনে এতকাল আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত দিন কাটিয়েছি। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিশিল্প, শিক্ষাদীক্ষা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে এতকাল আমাদের বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। জাতিগঠন, জনকল্যাণকর প্রচেষ্টা—এমন কি নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের অতি সাধারণ অধিকারটুকু থেকে পর্যন্ত আমরা বঞ্চিত ছিলাম। ইংরেজরা এদেশে রাজ্যশাসনের নামে এতদিন আমাদের নির্মমভাবে শোষণ করেছে, আমাদের ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য অকাতরে লুট করে নিয়ে গিয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম রাখা হয়েছে, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার নামে দেশের শিল্প বাণিজ্যকে গলা টিপে মেরে বিদেশী শিল্প বাণিজ্যের বনিয়াদ পাকা করার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম থেকেই একদিকে হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে আমাদের যাবতীয় কল্যাণ প্রচেষ্টা ও প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নীতির অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের নিজস্ব কুটীরশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে তা থেকে তৈরী মাল আমাদের দেশে এনে বিক্রী করে অজস্র টাকা লুটে নিয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষ প্রচুর লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা আজ দীন দরিদ্র, বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আমাদের আজও তাই বিদেশীর মুখ চেয়ে থাকতে হয়। দীর্ঘদিনের বৃটিশ শাসনের ফলে আমাদের অশেষ দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, রোগ ও দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি নরনারী প্রাণ দিয়েছে, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, মহামারী, অনাহার, অশিক্ষা

আমাদের নিত্য সহচর। কৃষিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা—কোন দিক দিয়েই জনকল্যাণকর বা জাতিগঠনমূলক কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা এতকাল আন্তরিকভাবে কার্যকরী করার কোন চেষ্টা হয় নি। এর প্রধান কারণ, ইংরেজরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতের ভারতত্বকে চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই চেষ্টা করেছে, ভারতের উন্নতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হয়েছে। এইজন্য কোনদিনই জনকল্যাণতান্ত্রিক বৃটিশ শাসনের সঙ্গে জনকল্যাণ বা জাতি গঠনের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে আরম্ভ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে বৃটিশ শাসন ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার ইতিহাসের ধারাটি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি সহজেই ধরা পড়ে।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে ১৯২৯-৩৩এর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য মন্দার পর এদেশে সরকারী এবং বে-সরকারীভাবে জাতিগঠন-মূলক কয়েকটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু সব পরিকল্পনাই কল্পনার স্তরে থেকে গেছে, কোনটাই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির ও আন্তরিকতার অভাবে এবং 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'বোম্বাই পরিকল্পনা', 'গান্ধী পরিকল্পনা', 'পিপলস্ প্ল্যান' প্রভৃতি সর্বজন পরিচিত বে-সরকারী পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এই কারণে যে, এই ধরণের জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে দেশবাসীর হাতে যে ক্ষমতা, অধিকার ও অর্থবল থাকা প্রয়োজন আমাদের তা ছিল না। কিন্তু আজ প্রকৃত ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে এসেছে। আমরা আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার পূর্ণ অধিকার লাভ করেছি। কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে প্রকৃত জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার জনকল্যাণের আদর্শকে লক্ষ্য করে সুপরিকল্পিত উপায়ে জাতিগঠনের কার্যে ব্রতী হবেন এবং কৃষিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা—সমস্ত কিছু বিষয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার কার্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার গ্লানি ও লাঞ্ছনা ভোগের পর, অনাহারক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত, রোগ দারিদ্র্যে জর্জরিত, অশিক্ষার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বেদনাহত জাতি আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অনুরাগরক্ত ভবিষ্যতের আশার আলোক। জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী যাঁরা তাঁরাই আজ এই নির্দিষ্ট জাতির দুঃখ বিমোচনের ভার নিয়েছেন, কাজেই সমস্ত ভারতবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে ইংরেজ যে আবর্জনার বোঝা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেল, সেই আবর্জনা পরিষ্কার করে জাতিকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে বহু সময়ের প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা, প্রচুর অর্থ ও সুপরিকল্পিত উদ্যমের আবশ্যক। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা যেমন উদ্যোগী হবেন, জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতাও তেমনি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন হবে।

আমাদের জাতির সামনে আজ বহু সমস্যা। এই সব সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্যমের প্রয়োজন, তাকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা (১) স্বল্প মেয়াদী এবং (২) দীর্ঘ মেয়াদী। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে অন্ন বস্ত্র ও চাকরী সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের আশু সমাধান এবং তদ্ভিন্ন অবিলম্বে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, বাঙ্গলা দেশে—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে চাউলের দর মণ পিছু ২০৲ টাকা থেকে ৩০৲ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। বস্ত্রাভাবেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ কিরূপ কষ্ট পাচ্ছে সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতালাভের পর প্রথম থেকেই দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। ব্যাপকভাবে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও কানাডা থেকে ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিদেশে যাঁরা আমাদের রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক খাদ্যভাণ্ডার থেকে ভারতের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহেরও বিশেষ চেষ্টা করছেন। ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি শক্তিশালী খাদ্য-কমিটি নিযুক্ত করেছেন। আমেদাবাদ, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের কাপড়ের কলগুলিতে শ্রমিক-বিরোধ প্রভৃতি এড়িয়ে বস্ত্র উৎপাদন কার্য যাতে পূর্ণগতিতে চালু থাকে তার জন্যও বিশেষ চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে যেটুকু খাদ্য এবং বস্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে তার সুবণ্টনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারী পরিচালনাধীনে বড় বড় শহর ও মিল এলাকাগুলিতে রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে বটে, কিন্তু পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশক্ষেত্রে চোরা-কারবারীদের অসঙ্গত মুনাফা লাভের চেষ্টার ফলে জনসাধারণের দুর্গতির শেষ নেই, অধিকাংশ স্থানে পণ্য-মূল্য এত উঁচু যে তা জনসাধারণের নাগালের বাইরে। অত্যাবশ্যকীয় নিত্যবিষয় নিয়ে চোরাকারবারীদের এই অসঙ্গত মুনাফাবৃত্তিকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সুখের বিষয়, কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারও অবিলম্বে এ বিষয়ে উদ্যোগী হবেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছু আগে ভারতের বিদেশী সরকার ভারতবর্ষের জন্য যে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন তাতে স্বল্পমেয়াদী কার্যসূচীর একটি প্রধান বিষয় ছিল এই যে, যে সমস্ত লোক যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং যে সমস্ত লোক যুদ্ধ-

শিল্পে ও অন্যান্য সামরিক কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান জাতীয় সরকারকেও এ বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগ দিতে হবেছে। কারণ যুদ্ধের সময়কার কৃত্রিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য কারণে জিনিষপত্রের দাম যখন বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সরকারী নিয়োগের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন। তার ফলে বহু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবার পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়লেও, পরিবারে চাকুরীজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থাৎ পরিবারে নিয়মিত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা কোন রকমে সংসার নির্বাহ করে যাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-শিল্পকে শান্তিকালীন শিল্পে পরিণত করার সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মী ছাঁটাই নীতির ফলে এবং বহু সমরবিভাগের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য কর্মীকে বরখাস্ত করতে হয়েছে। অথচ দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ হওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী হয়ে চলেছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের দুর্গতির আর শেষ নেই। কাজেই লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরীর সংস্থান, মধ্যবিত্ত পরিবার ও দরিদ্র পরিবারগুলিকে বাঁচানর দায়িত্ব জাতীয় সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ নতুন নতুন বিভাগ ও কাজের সৃষ্টি করে যুদ্ধ ফেরৎ লোকদের নিযুক্ত করার কাজে ইতিমধ্যেই ব্রতী হয়েছেন, এর বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। জাতি গঠন ও উন্নয়নের কাজ যখন প্রকৃতভাবে আরম্ভ হবে, তখন এদিকে যিরে সরকারী প্রচেষ্টা আরও সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বলতে প্রধানতঃ জনসাধারণের আয় উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ কৃষি শিল্পের উন্নয়ন, যান বাহন ও জনসাধারণের উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি এই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও, আমাদের দেশে একর পিছু শস্য উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর প্রধান কারণ, চাষাবাদের ব্যাপারে এখনও আমরা সেই মধ্যযুগীয় অবস্থায় পড়ে আছি। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে অবিলম্বে আধুনিকতম কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, জমি কর্ষণে ট্রাক্টর প্রচলন, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, বীজের উন্নয়ন প্রভৃতির ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রের সাহায্য দরকার। প্রথমতঃ মূল শিল্প বা ভারী শিল্পগুলি জাতীয় শিল্পে পরিণত করতে হবে। তারপর দেশের সুরক্ষার শিল্পগুলি বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে যাতে অকালে মারা না যায় তার জন্য প্রয়োজনমত সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বা সাবসিডির ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন হবে। আমাদের নিজস্ব কুটীর-শিল্পগুলিকে আমার বাঁচিয়ে তুলতে হবে। শিল্পীরা নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও যাতে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সমস্ত সুবিধা আছে, সরকারী উদ্যোগে এ বিষয়ে অনায়াসে তার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। রেলপথ, ষ্টীমারপথ, জলপথ ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব বাণিজ্যপোত, বিমান, মোটর-গাড়ী, ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈরী করারও ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃটিশ শাসনাধীনে জনসাধারণ দীর্ঘকাল রোগ, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে। কিন্তু আজ আমাদের যখন সাধারণ মানুষ যাতে খেয়ে পরে সুস্থ সবল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে, আমাদের জীবনযাত্রা যাতে সহজ হয়ে ওঠে, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ-সামগ্রী যাতে আমাদের পক্ষে সহজলভ্য হয়, রোগের বিরুদ্ধে যাতে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি, তারজন্য জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই সে বিষয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেবেন। রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান, সহরাঞ্চলে বসতবাটী ও বস্তি উন্নয়ন, গ্রামাঞ্চলে আদর্শ পল্লী গঠন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কীয় যে সমস্ত পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে সেগুলিকে অবিলম্বে কার্যকরী করে তুলতে হবে। ব্যাপকভাবে সমবায়প্রথা চালু করে ও অন্যান্য উপায়ে দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীদের অর্থসংস্থানেরও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। তারপর দরিদ্র লোকদের বাঁচিয়ে তুলে ও অপেক্ষাকৃত সমস্থিতিসম্পন্ন লোকদের ওপর সরকারী ট্যাক্সের চাপ বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের জীবনে সামাজিক অসাম্য ও ধন-বৈষম্যের পাপ এতকাল যে ভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে, তাতে করে সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি বা আয় উন্নয়নের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় সরকার দুর্বিষহের কাছেও স্বার্থ, সুবিধা ও বিলাসবৈভবকে সর্বপ্রকারে খর্ব করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সর্ববিধ কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

দুর্নীতি, অপচয় ও অনিয়ন্ত্রিতা বন্ধ করে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জাতিগঠনমূলক কাজে কিভাবে সমস্ত সরকারী শক্তি নিযুক্ত হচ্ছে এবং জাতিগঠন ও জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও বিশেষ করে লক্ষ্যবস্তু সরকার সুপরিকল্পিত উপায়ে জাতীয় উন্নতির কাজে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

৮।১১।৭৭

নববঙ্গের সমস্যা ও তাহার পশ্চিম সীমান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভারত আজ স্বাধীন, কোন দেশ কোন কালেই বিনামূল্যে স্বাধীনতা পায় নাই ; ভারতের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন ? অর্ধশতাব্দীর রক্তের মূল্যে খণ্ডিত ভারত আজ স্বাধীন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচেষ্টায় অবশ্য সোনার বাংলা দেশ ও আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

মুসলীম লীগের ধর্মকেন্দ্রিক দাবীর মুখে বাঙ্গালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; অবস্থা এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে বাঙ্গালী হিন্দু তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে হয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পুরুষানুক্রমে হিন্দুত্ব এই আবাসভূমে সক্রিয় যোগদান করিল, অথচ এই বাঙ্গালীই কার্জনী অপরাধ জোড়া দেওয়ার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিল ; বেদিনের নবীন প্রজন্মও যেই উপেক্ষা করিতে পারে নাই, এবারও তাহাই হইল। পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া নিজস্ব আবাসভূমি রচনা করিবার প্রচেষ্টা আজ আমাদের আসিয়াছে। আঘাতে আঘাতে নূতন বাংলা আমাদের ক্ষীণ ক্ষীণ হইয়াছে, পুরাতন শাসকেরা যাওয়ার সময় ভেদি খেলিয়া আমাদেরও এই নূতন প্রদেশকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে। তবুও ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া এই খণ্ডিত দেশকে যথাস্থানে পূর্ববীরত্বে বাঁচাইতে হইবে। আজ এক মুষ্টি অন্ন ও একখণ্ড বস্ত্র সংস্থানের জন্য জাতির সমস্ত মনুষ্যত্বটুকু নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, এই সময় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন, যার মানের-ভেদ-পাকলের আনন্দ, হাসি ও সঙ্গীত,—মানসিক ভাব বিলাস ও জাতির চারমুখে ব্যঙ্গ প্রকাশ মনে হওয়া স্বাভাবিক ; তথাচ পরম ধৈর্য্যের সহিত, সাহসের বহ্নি লইয়া আজ বাঁচিবার মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। অস্ত্র শস্ত্রের প্রাচুর্য্যের সহিত মনুষ্যত্ববিকাশের সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজ-চেতনার বিকাশ সম্ভব না হইলে যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা রক্ষা করা দুরূহ হইবে। যে বীরত্ব মহামৃত্যুকে বরণ করিবার শিক্ষা দিয়াছে, সেই তেজ বক্ষে লইয়াই আজ সম্মুখে যাত্রা করিতে হইবে, এই সময় পশ্চাতের দিকে তাকাইলে আমাদের ক্ষয় ক্ষতি, ভুল ভ্রান্তির, লাভ লোকসানের হিসাব বিচার করিয়া যা দেখিবে লাভের চেয়ে পথ রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।

ভূগোল ও ইতিহাস পড়িবার সময় বড় বড় নগরী, রাজা মহারাজার কাহিনী মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা কেতাবাৎ করি, ছোট ছোট গিরিনদী, ঝোরার প্রস্রবণ কিম্বা অগণিত পল্লীনারী, শৈবালেরাবে অবরুদ্ধ দীর্ঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, ডোবা কিম্বা ম্যালেরিয়ায় প্রকম্পিত কুটীরের কথা খেয়াল করি না, অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সকলই মিলিত হইয়া অতীতময় নগরী কিম্বা বিলাস ও লাস্যে আকণ্ঠমগ্ন কথেচ্ছাচারী রাজা মহারাজার কাহিনী রচনা করিয়া চলে। কাজেই সময় থাকিতে যাহাতে বর্তমান কিম্বা অতীত, নবরঙ্গের সকল সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণ প্রসারিত হয় তাহার প্রচেষ্টা সুরু হওয়া দরকার। অতীত সমস্যা আলোচনার কারণ অতীত না বুঝিলে বর্তমান ও ধারণা করা সম্ভব নয়।

পূর্ব পাকিস্তানে সওয়া কোটি হিন্দুর বাস। পুরুষপরম্পরায় বাঙ্গালী হিন্দু সেখানে বিরাট ধনৈশ্বর্য্যের মালিক। পশ্চিম পাঞ্জাবে পঞ্চাশ লক্ষ শিখও হিন্দুর হাতে ৩০,০০০ একর চাষ যোগ্য জমিই ছিল, ইহার পরিবর্তে পূর্ব পাঞ্জাবে ৫৫ লক্ষ মুসলমানের হাতে মাত্র ছিল ২০০০০ একর জমি। পশ্চিম পাঞ্জাবে মহারাজা রণজিৎসিংহের আমল হইতে সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি ও চাষ যোগ্য জমি পাকিস্তানী কারেম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ বাটীতে কবুল দখল খতম্ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তানের অসম অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। এই ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির হইবার পূর্বেই আমাদের ঘর সামলান দরকার।

প্রথমেই দেখা যাউক পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের চাষযোগ্য জমি এবং তাহার জন সংখ্যা। এই হিসাবে দেখা যাইবে পশ্চিমবঙ্গে জমির উপরে চাপ কত বেশী। ল্যাণ্ড, ফমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, সমপরিমাণ আবাদযোগ্য জমিতে পশ্চিম বঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গের অন্নোৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশী। এই কারণেই ফুরিয়া যেলার একবিঘা জমির মূল্য বীরভূম, বাঁকুড়ার পাঁচবিঘা কিম্বা আরও বেশী পরিমাণ জমি পাওয়া সম্ভব। কাজেই অনুর্বর ও অনাবাদী জমির উপরে চাপ অত্যধিক বেশী পড়ায় খাদ্যসংস্থান অভাব অনটন এই নূতন প্রদেশে হ্রাস পাওয়ার সঙ্গত কারণের অভাব।

	নূতন পশ্চিম বঙ্গ (নব বঙ্গ)	নূতন পূর্ববঙ্গ (জিন্নাহ বাঙ্গাল)
লোক সংখ্যা	২১১৯৪৬১৩	৩৯১১৯১৬
আয়তন (বর্গ মাইলে)	২৮০৩৪	৪৯৪০৮
প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা	৭৫৬	৭৯২
মোট আবাদী জমি (বর্গ মাইলে)	১৬১৩০	২৪১০৩
প্রতি বর্গ মাইল আবাদী জমিতে লোক সংখ্যা—	১৩১৪	১৩৪৪
গ্রোস আবাদী জমি (বর্গ মাইল হিঃ)	১৭৯৮০	৩৮৮৫১
গ্রোস আবাদী জমির বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা	১১৮০	১০৩২
আবাদযোগ্য পতিত জমি (বর্গ মাইলে)	২৩১১	৩২১০
গ্রোস আবাদযোগ্য জমি (বর্গ মাইল হিঃ)	১০৫৭৪	৪০০৩১
গ্রোস আবাদযোগ্য জমির প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা	১০৩০	৯৭৭

উক্ত হিসাবে যে জমিতে ফসল জন্মে সেই জমিকে নীট আবাদী জমি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহার যে অংশে দুই বা তিনবার ফসল হয়, সেই সমস্ত অংশের জমিকে ২।৩বার ধরা হইয়াছে। এই জন্য নীট আবাদী জমির পরিমাণ অপেক্ষা গ্রোস আবাদী জমির পরিমাণ বেশী, গ্রোস আবাদী জমি এবং আবাদযোগ্য পতিত জমির যোগফলকে গ্রোস আবাদযোগ্য জমি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (ক্রপ্‌ট কমিশনের রিপোর্ট হইতে সংখ্যা সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে) ভূভাগের পশ্চিমবঙ্গের জমি কেবল অনুর্ব্বর নহে, দক্ষিণ পশ্চিম ভূভাগের কতকাংশ কঙ্কালসার বালুকাস্তীর্ণ প্রান্তর। গত কয়েক বৎসরে বন্যা ও দাহনে আবাদযোগ্য জমিও অনাবাদী হইয়া পড়িয়াছে।

সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও আবাদী জমির মধ্যে একটী ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। পশ্চিম বঙ্গের অস্বাস্থ্যকর ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত ভূভাগের সহিত জনসংখ্যা হ্রাস ও অনাবাদী জমি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক মৈকট্য বিদ্যমান, আদমসুমারীর তালিকা হইতে সঙ্কলিত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের লোক-সমাজের ক্রতক্ষয়, রোগ-বৃদ্ধি এবং কর্ষিত জমি হ্রাসের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের তুলনামূলক লোকবৃদ্ধি, কর্ষিত জমির বৃদ্ধি এবং পরিসরের লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে এই বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধ হইবে।

১৯০১—১৯৩১

	কর্ষিত ভূমির হ্রাস (শতকরা)	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি
বর্দ্ধমান	৪০	৫০'৪	+৩'৭
নদীয়া	৭	৫৭'৫	+৮'১
মুর্শিদাবাদ	১৪	৪১'৭	+২২'৯
যশোহর	৩১	৪৮'২	—৭'২
হুগলী	৪৫	৪৯'৩	+৩'২

	কর্ষিত ভূমির বৃদ্ধি	ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	লোকসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি
ঢাকা	+৪৭	৯'৭	+২৮'৯
ফরিদপুর	+১৩	২৮'৩	+২১'৮
ময়মনসিংহ	+১৯	১১'১০	+২৮'৩
বাখরগঞ্জ	+২১	৮'৩০	+২৭'১

সাধারণভাবে দেখা যায় পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া কম, আবাদী জমি বৃদ্ধি, লোকসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি সত্ত্বেও লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই পার্থক্য গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে দ্বিতীয় এক নূতন প্রশ্নের সামনে দাঁড়াইতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় মৃত ভাগীরথীর দুইধারে আবাদী জমি হ্রাসের সহিত ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি হওয়ায় লোকসংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে কিন্তু চরাঞ্চলে নূতন আবাদী জমি বৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যা এত প্রচুর বাড়িয়াছে যে মোট লোকসংখ্যা তিন বৎসরে প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ বাড়িয়াছে। পদ্মা কিম্বা ভৈরবের চরাঞ্চলে মুসলমান কৃষকই উপনিবেশ গাড়িয়াছে; ফলে গত ৩০ বৎসরে হিন্দুসমাজ এই জেলা মুসলমানপ্রধান জেলায় পরিণত হইয়াছে। সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা আরও দেখিয়াছেন হিন্দুর অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্ব্বত্রই অনেক বেশী। গত একশত বৎসরে মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমান জনসংখ্যার বাড়তি এত বেশী হইয়াছে যে সমানে সংখ্যক হিন্দু মুসলমান জেলা দুইটীতে আজ এক তৃতীয়াংশ হিন্দুও নাই। সর্ব্বত্রই দেখা যায় একদিকে ভূমিহীন শিল্পী জাতির লোকসংখ্যা হ্রাস, অন্যদিকে ভূমিহীন বাস্তুত্যাগী মুসলমান, জঙ্গলাবৃত চরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্রুতহারে বাড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন হিন্দু শিল্পী-জাতির বাস্তুর উপরে অত্যধিক মাত্রা অনেকটা আর্থিক দুর্গতির কারণ কিন্তু লোকসংখ্যার তাহাদের হ্রাস ও ক্রমিক মৃত্যুর কারণ জৈবনিক (Biological)

আদমসুমারীর সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনা করিলে আর এক নূতন দিকে আলোকসম্পাত হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী! অথচ বঙ্গের তিন দিকেই আদিবাসী পাহাড়িয়া জাতির বাস। ছোটনাগপুর, ছোটনে, আসামের গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড় হইতে যে সকল আদিম জাতি সোনার বাংলায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাদের অস্থির এখনও পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চুপ ভাবে রহিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কয়েক জেলায় ইহাদের বিলুপ্তি হইল কবে এবং কেমন করিয়া? বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই অনার্য্য জাতি "আর্য্যকরণ" প্রথার ক্রমে ক্রমে হিন্দু জাতির শতেক সিঁড়ির নীচে কিম্বা আশে পাশে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতেছিল, বৌদ্ধ কিম্বা ঐরূপ ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে দিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল। ঠিক এমনই সময় মুসলিম বিজয় আসিল প্রচণ্ড বাধা, সময় পাইলে অনার্য্যদের মতন সমস্ত আদিম জাতিই হিন্দুর বীভার করিয়া লইত; কিন্তু বাংলা বিজয়ের পরে ইসলামের সৌভাগ্য এবং রাজধর্ম্মগ্রহণের প্রলোভন, পৌরহিত্যবাদের কড়া শাসন এই উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের উদার আহ্বান বিজয়ী হইল। গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের অনুকূল প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গের আদিম জাতিসমূহকে বাঙ্গালাইতে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের আদিম জাতি ও সিঁড়ির নীচে অবস্থিত পতিত হিন্দু, মুসলমান হইয়া গেল, "আর্য্যকরণ" প্রথায় বর্ণশঙ্করের মত অনুলোম্যাত "তপসিলী" দল সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ইসলাম বিভিন্ন শ্রেণীকে সম্মিলিত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক নূতন হলিষ্ট জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। যুগ যুগব্যাপী হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির মসলা উচ্চশ্রেণী হিন্দু ও "তপসিলী" সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করিলেও ঘরে ঘরে সাজান বিশাল হিন্দুসমাজের সোপান স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে যাই। তাই আজও আমাদের কত সমস্যা, সমাজের এক অঙ্গে আঘাত পাইলে অপর অঙ্গ সেই বেদনা বুঝিতে পারে না। আমাদের অবস্থা ঠিক উপদেশমালার "একজাত বিভিন্ন ঢঙ্গ" পক্ষী। বাংলা শক্তিশালী হইবে তখনই যখন এই হিন্দু সমাজের heterogeneous element নূতন জাতীয়তার আদর্শে, ধনসাম্যের ভিত্তিতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সুসংগঠিত

হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের আদিম জাতির সংখ্যা দেখিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ

জলপাইগুড়ী	২৭৮,১৭১
দুমকা সাবডিভিসন	৪১,৪৯১
রাজমহল সাবডিভিসন	৪১,০৮৫
মেদিনীপুর	২৪৩,৪২৫
দার্জিলিং	১৪১,৩০১
বীরভূম	৭৪০৮৬
বর্দ্ধমান	১৪১৩৪৪
দুমকা বিভাগপুর	৯৮৩৪২
মুর্শিদাবাদ	২৪১৩৮
হুগলী	৬৯৫০০
ইত্যাদি	

এক কোটি ৬২ লক্ষ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মোট ১৩৮৭৮৪০ জন আদিম অধিবাসী। মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৯ জন।

পূর্ব্ববঙ্গ

খুলনা	২৬৭৫
বরিশাল	৪৯৭৮
রংপুর	১৮১০০
বগুড়া	১৪৩৮৭
পাবনা	৬৯০৬
ঢাকা	৪০২৮
ফরিদপুর	১৩৬৩
বাখরগঞ্জ	২৮৪
ত্রিপুরা	১৪২৪
নোয়াখালী	৩৪
চট্টগ্রাম	৩৩৪৮
ময়মনসিংহ	৫৮৭২২
ইত্যাদি	

এই চট্টগ্রাম বাতীত পূর্ব্ববঙ্গে মোট ২৭৩ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ২৯০০০ জন আদিম অধিবাসী, মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগের কিছু বেশী মাত্র।

বাংলা মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সাধারণভাবে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে বলিলেই চলে। অথচ হিন্দুর অধিকসংখ্যক লোকই গ্রামে বাস করে। কৃষির উপর বিতৃষ্ণা নিতান্তই, অথচ কৃষিকর্ম্মে হিন্দু জাতির ধারণা "লাঙ্গল ছুঁইলে অশুচি হয়"। এই ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় কৃষি সম্পর্কীয় অন্যান্য কাজকর্ম করিলেও নিজে লাঙ্গলের মুঠা ধরিয়া লাঙ্গল চাষ করে না। মুসলমানদের মধ্যে "কাজকর্ম্মে" কোনরূপ বাছবিচার নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু কিম্বা মুসলমান চাষী হিন্দুর জমি চাষ করিয়া দেয়। এই জন্য আগে আগে হইলেও হিন্দুর জমি জনসাধারণের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়া চাষীকে দিয়া জমি চাষ করাইতে গিয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অনেকেই মাটির সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালী যদি "ধরিত্রী অন্নদা" শ্রেষ্ঠীস্থানীয় হয় তবে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে কেমন করিয়া? হিন্দুর মধ্যে যাহারা সম্ভ্রান্তবংশের কৃষক, যাহারা আজও হুমায়ুনের জমিতে, তাহাদের উদর ক্ষেত্রে কিম্বা নিজ অঙ্গের বৈকুণ্ঠ ভূমিতে সাপ ও ভূতীদের সঙ্গে লড়াই করিয়া, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, ওলাউঠার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যাঁহারা আজ প্রধানতঃ তাহারাই উপনিবেশীভূক্ত। হিন্দু সমাজের প্রবাসী সাধারণতঃ আদিম জাতি ও এই উপনিবেশের দল হইতে আসিয়া থাকে। পুরাতন হিন্দু-সমাজব্যবস্থার শিল্পীসমাজকে "অবনাশ" বলা হয়। এই অবনাশ সমাজ প্রায় মৃতকল্প। অত্যন্তকাল হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থায় কায়েমী আসন জমিয়া পড়িয়াছে। বৃৎপত্তিজী, কামার, কুমোর, সূত্রধর, মহাশঙ্খ, সদ্গোপ আজ একুনিবিষ্টের সত্তা যাদব, তাঁতীর কুবিন্দ, তীব্র মধুর কিম্বা বিহারী খোপা নাপিতের প্রতিযোগিতায় কুণ্ঠাকাৎ হইয়াছে। তারপরে, সকলেই উচ্চশ্রেণীর দেখাদেখি আবেষ্টনী মেয়ে ওকালতি লাভিবার প্রলোভনে সহরে ভীড় জমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহেই হিন্দুর গ্রামটুকু প্রায় খালিই ফোপরাদে আসুর এঁরো পুকুর ও ঢোবা পরিপূর্ণ বিরাবন অবাস্থ্যকর গ্রামের ছবিই সাধারণে আসিয়া উঠে।

পূর্ব্ববঙ্গে "তপশিলী" জাতির লোকসংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ, মোট হিন্দু শতকরা ১০ ভাগ, ঠিক সেখানে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী ও আদি জাতির সংখ্যা ৪৭ লক্ষ, (মোট) হিন্দুর শতকরা ৩০ ভাগ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী সম্প্রদায় শিক্ষা দীক্ষায়, আর্থিক সঙ্গতি কিম্বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ।

পূর্ব্ববঙ্গে, তপশিলী বহু জাতির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ববঙ্গের রাজবংশী ও মহাষঙ্গের নমশূদ্র জাতি সংখ্যায় গুরুত্বসম্পন্ন। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের বসতি এবঞ্চলে থাকায় রাজনৈতিক সংহতি খুব বেশী। কৃষিজীবী সম্প্রদায় বলিয়া ভাইসহিষ্ণু, সাহসী ও মোটামুটি চেতনা-সম্পন্ন। রাজবংশী সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিরীহ, নমশূদ্র জাতির মতন মোটামুটি চেতনা সম্পন্ন না হওয়ায় এবং বাসভূমি সমস্ত উত্তর বঙ্গে ছড়াইয়া থাকায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অধিবাস ও সংখ্যানুষ্ঠিত প্রতিবাসী মুসলমান কর্তৃক প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ থাকিতে হইতেছে। ধর্ম্মবন্ধন ও সংস্কৃতি খুব গভীর ও সজীব না থাকায় রাজবংশী সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত মুসলমান হইয়াছে খুব বেশী। পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে কোনও তপশিলী সম্প্রদায় নাই। এখানকার গোপ, বাগ্দী, তিয়র, চাষার, মুচী, খোপা, পাটনী, সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষায়, আর্থিক সঙ্গতিতে নগণ্য, অনেকেই ভূমিহীন এবং দ্রুত বিলুপ্তির মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যাহাদের হাতে মাটি আছে তাহাদের অবস্থা কতকটা সচ্ছল। মুসলমানদের মতন দ্রুত বর্দ্ধনশীল না হইলেও কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য ও নমশূদ্রজাতি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরশীল।

পশ্চিমবঙ্গের পতিত মাটিকে রক্ষা দুর্গম হইতে রক্ষা করিতে হইলে বা-চীন সন্তানকেও বাঁচাইতে হইবে। ভূমিহীন, বৃত্তিহীন সম্প্রদায়কে ভূমি, বৃত্তি, আশ্রয়, আয় ও আত্মোপলব্ধির প্রেরণা দিতে হইবে। সামাজিক অসাম্য, শ্রেষ্ঠীত্বের, শিরিত্বের প্রভৃতি অন্তরায় প্রতিবন্ধক উঠাইয়া দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও শ্রমিক যদি ঐ গাছে

হবে সহরের ক্ষিপ্ত মুখে অন্ন দিবে কে? সহরের বিপুল জনসংখ্যার বিরাট উদর, পল্লীগ্রামই এই উদরপূর্ত্তির সহায়তাকারক।

পশ্চিমবঙ্গের মোট লোকসংখ্যা দুই কোটী বলিলেও, ইহার মধ্যে কলিকাতা, হাওড়া এবং পার্শ্ববর্তী কলকারখানা অঞ্চলে মোট ৫০ লক্ষ লোকের বাস; এই পঞ্চাশ লক্ষ লোক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে না বরং সাধারণ দেশবাসীর চেয়ে গড়পড়তা আয় বেশী বলিয়া ক্রয়শক্তি ইহাদের বেশী, কাজেই দেশের সকল স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য—চাউল,তরিতরকারী, মাছ ডিম ও দুধ সহরেই চলিয়া আসে। কলিকাতা ব্যতীত নূতন এই প্রদেশে ছোট বড় ও মাঝারী আরও অনেকগুলি সহর আছে। খুব কম করিয়া ধরিলেও আরও ৫০ লাখ লোক কেবলমাত্র "রুপেয়ার" বিনিময়ে ধরিত্র জনসাধারণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। ঠিক যেন বিটশীটকর রস রোধাইতে গিয়া সমস্ত মাঠ অনুর্ব্বর প্রান্তরে পরিণত হওয়ার মত। অথচ বাংলার শতকরা ৭০ জন লোক চাষের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া সকলের মুখে অন্ন জোটাইতে পারিত না, সেখানে নূতন বাংলার শতকরা ত্রিশজন লোকেরাও কৃষিয়া সকলের মুখে অন্ন দিবে কেমন করিয়া? তাহার উপরে আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা অতি পুরাতন, লাঙ্গলী বলদের। ফলতঃ, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষি ব্যবস্থা, পশু-প্রজনন, ডেয়ারী,ব্যাপার প্রভৃতি আমাদের দেশে থাকিলে নগরের বাহিরে যে জনসমাজ ও অবারিত মাঠ পড়িয়া আছে, খাদ্যোৎপাদনে ইহাই আমাদের পক্ষে প্রচুর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অনেক জেলায় দেখা যায় শ্রমিকের অভাবে মাঠের পরে মাঠ পড়িয়া আছে। এতদঞ্চলের মাটী এমনি শক্ত, তাহাতে জলের অভাব, কারখানার শ্রমিকের হারে আমদানী শ্রমিকের বেতন দিয়া কৃষকের কিছুই থাকে না। দরিদ্র দেশের দরিদ্রকৃষক বরুণদেবতার কৃপার উপরে নির্ভরশীল। কৃষিতে আগে থেকেই টাকা ফেলিয়া "রাই কুড়াইয়া বেল" বাঁধিবে এমন দুরাশা ও আর্থিক সঙ্গতি তাহাদের নাই। কাজেই যেখানে পূর্ব্ববঙ্গের হরিৎক্ষেত্রে সোনার ফসলে মন ও চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়,সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কাঁটাতারের সবুজ ফুলে প্রাণের আরাম কাঁপিয়া উঠে। ইহার পরিত্রাণ এতদিন সম্ভাবনার অতীত ছিল। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এবার "সামন্ত-চক্রের" আস্ফালনে নহে, জনসাধারণের নির্ব্বাচনে দেশের মুসলমান, ত্যাগী ও দরদী "গোপালদের" বল দেশের "রাজদণ্ড" অভিষিক্ত হইয়াছে। যাদোদয় পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের এক প্রধান অংশের নদনদী, খাল-বিল-ডোবাগুলির সংস্কার হইয়া পুনরায় জলে-স্থলে পরিপূর্ণ হইবে, ক্রমেই দেশ হইতে বন্যা, হাজামজা, শুখা, জৈব প্রভৃতি বিপত্তির অতলান্তে ডুবিয়া যাইবে, টুকরা টুকরা জমির পরিবর্ত্তে সস্তা বিদ্যুতে বহু লাঙ্গল জমি চাষ করিবে, যন্ত্রবিজ্ঞানী আশ্বাস দূর করিবে; আমেরিকার মতন আমাদের দেশেও শতকরা ১৫।১৬ জনের বেশী লোক কৃষিক্ষেত্রে কেন আটকাইয়া থাকিবে? বেহারের সে দেশে অল্পলোকে অপ্রার্থিক জমিতে বেশী উৎপন্ন করিয়া বেশী রোজগার করে, বেশী খাইয়া সুখ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন উপভোগ করিতেছে আমাদের দেশেও তাহা শুধু অসম্ভব গল্প গাথায় লিখিত থাকিবে কেন?

সমস্ত পার্শ্ববর্তী প্রদেশে মধ্যসংগঠনের জন্যযাত্রার সহিত নবরঙ্গের শ্রমিক সমস্যা আরও গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা। আমদ মুজাহীর হিসাবে প্রকাশ, কলিকাতা ও কারখানা অঞ্চলে আশ্বার দলনক অবাঙ্গালীর বাস। বাগানের মালী, রাস্তার ঝাড়ুদার, কিরিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, পাইপলিস্তি, বৃন্দাবাড়ী ও হোটেলের ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান প্রভৃতি কায় উৎকলদেশীয় শ্রমিকের একচেটিয়া। গোয়ালা, খাটোয়াল, দারোয়ান, কলকারখানার শ্রমিক সাধারণতঃ বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উঃ পিঃ, প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে। মুদি, দরজী ও টাকী ও পাঞ্জাবীদের একচেটিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংগঠনের প্রতি-যোগিতায় এই সকল শ্রমিকের হাতবাধী বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং নবজাত প্রদেশের রোজগারী অর্থের প্রধান অংশ এই পথেই চলিয়া যাইতেছে। কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার জন্য কিম্বা রাস্তাঘাটের যানবাহন চালু রাখিবার তাগিদে, ধন ভাণ্ডারের উপরে এই চাপ প্রতিনিয়ত বাড়িয়াই যাওয়ার আশঙ্কা। বাংলা ও বাঙ্গালীর বিপন্ন অর্থসম্ভারকে ওরাওঁভূমি হইতে আহরণ করাইতে হইলে যথেষ্ট লোকশক্তির অভাব অনুভব করিবেন। একজনে জার্ম্মানীতে পুরুষের বেকার সমস্যার সমাধান করিবার জন্য হিটলারকে বলিতে হইয়াছিল, "পুরুষের বেকারজীবনের সমস্যা তীব্রতর না করিয়া সিমন্তনীর মূলের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত হউন।" আমাদের দেশের কল্যাণীরা, একমাত্র কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে বিদেশী ২।৩ লক্ষ রাঁধুনী, ভৃত্য ও খানসামাকে বিদায় করিতে সমর্থ হইলে ন্যূনপক্ষে বাংলার মাসিক এককোটী টাকা দেশেই থাকিয়া যাইত! অথচ প্রতি ঘরেই অন্নসমস্যার তীব্রতা কত কঠিন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় চাষের উপযুক্ত জমি না পাইয়া কিম্বা লোকবলের ঘাটতি সত্ত্বেও দেশকে দাঁড় করান যায়। জার্ম্মানী তাহার বিপুল শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়াছিল কেবলমাত্র দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে কাজে লাগাইয়া। কলাবিদ্যায় প্রকৃতিকে বশে আনিয়া লোকবল সমস্যাও তাহারা বিদূরিত করিয়াছিল। নবরঙ্গের সীমানায় প্রকৃতির অফুরন্ত দান ছড়াইয়া আছে। উদ্যম ও রাজকীয় শক্তির যোগাযোগের অভাবে বিধাতার এই দান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কয়লার উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক যন্ত্রকলা ও কারু শিল্পের উৎকর্ষসাধন করিয়া জার্ম্মানী অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। আমাদের বিদ্যুৎ ও যন্ত্রশক্তি ঐ লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে বহু দেরী, যন্ত্রবিজ্ঞান এখানে মধ্যযুগীয় অবস্থায়। তারপর বাংলার স্বাভাবিক সীমানা এখানে যে ভাবে সঙ্কুচিত তাহাতে প্রকৃতির বিপুল দান ও সম্ভাবনাগুলি, বাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি এইদিকেও আকৃষ্ট হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। পশ্চিম সীমান্তের ন্যায়সঙ্গত সমাধানের উপরে বাংলার বহু সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলা অবস্থিত। এই বিপুল জনসংখ্যার সামান্য ভাগ বাংলার সহিত একত্রীভূত হইলে বাংলার লোকসংখ্যা ও ভূভাগ শুধু বর্দ্ধিত

হইবে না, পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত করদ, লৌহমাঝিক, তাম্রমাঝিক, ভূগাপাথর, মাইকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত ভাগলপুরের যাতা বহুকুমা, পূর্ণিয়া-মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া জেলার সব সম্পদ ও জন সম্পদে বহুলের অসামান্য উন্নতিলাভ ঘটিবে। রাষ্ট্রনিকের ত্রিপুরা বিহার বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া অখণ্ড বয়ঃসম্পূর্ণ নবরঙ্গ গঠনে সাহায্য করিবে।

একভাষাভাষী লোকবিধিকে একই প্রদেশে যুক্ত না করিলে অন্য ভাষাভাষী প্রদেশে অল্পসংখ্যক লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতিক বহুতি বাহত হয়। সরকারী কাজকর্মে, ব্যবসাবাণিজ্যে, এমন কি সরকারী টিকা ডাকমাইল্ পাওয়ার অসুবিধা হয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি না থাকায় তাহাদের অভাব অভিযোগের ও নিষ্পত্তি হয় না। ১৯১১ সালের পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের যে সকল অংশ বিহার কিম্বা উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে তাহাদের সংস্কৃতির অবনতি এই কারণেই ঘটিতেছে। ১৯২১ সালের লোকগণনায় বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে ১৭ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী লোকের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৯৩১ সালের লোকগণনায় এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে বাংলা ভাষাভাষীদের হিসাব পৃথকভাবে না লেখায় এই সংখ্যা আরও হ্রাস পাইয়াছে অনুমান করা যায়। বরং উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তীয় প্রদেশে যে ভাবে উড়িয়া কিম্বা হিন্দীর প্রসার হইতেছে তাহাতে উদ্বেগ বুঝিতে কষ্ট হয় না।

পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমায় ভাষাকে "কিষণগঞ্জিয়া" বলা হইত। ১৯১১ সালের লোকগণনায় এই ভাষায় ৬০৩১৩ জন কথা বলিত। অন্য কোনও উপদেশ না থাকায় এবং বাংলাভাষার সহিত অত্যধিক ঐক্য থাকায় ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই উপভাষার যাহারা কথা বলিত তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া লিখিত হইত। ১৯৩১ সাল হইতে এই উপভাষাকে "হিন্দী" বলিয়া লিখিত হইয়া আসিতেছে। মহানন্দা নদীর পূর্ব প্রান্তীয় প্রদেশে, সকলেই এখনও এই আধাবাংলা ভাষায় কথা বলে। সুতরাং বিশুদ্ধ বিচার করিলে স্থানীয় রাজবংশী ও কেবটসম্প্রদায় অধ্যুষিত ময়নাগুরী সহিত জলপাইগুড়ী ও উত্তর দিনাজপুরের সাদৃশ্য সমধিক। সম্প্রতি উত্তরাধিকারীত্বের দিক হইতে মিতাক্ষরার চেয়ে এখনও এখানে "দায়ভাগ" বেশী প্রচলিত। "আইন আকবরীর" আমলেও মহানন্দার পূর্বধারে অবস্থিত সরকার "লক্ষ্মণাবতী" সুবা বাংলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই একই কারণে ভাগলপুর জেলার যাতা বহুকুমা ও বাংলার পশ্চিম সীমানার অন্তর্গত। এমনকি "মাঝিয়ুরা" অঞ্চলেও বহু বাঙ্গালীর বাস। সাঁওতাল পরগণার রাজমহল, পাকুড়, জামতাড়া, দুমকা প্রভৃতি স্থান, হাজারীবাগ জেলার গিরিডি মহকুমা, মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা, সম্পূর্ণ বাঙ্গালী অধ্যুষিত স্থান। বালেশ্বর জেলার অনেকের মত সিংহভূম জেলায় উড়িয়া এবং হিন্দী প্রচারের প্রবল উদ্যম চলিতেছে। ইহা সত্ত্বেও ১৯৩১ সালে একমাত্র সিংহভূম জেলায় ১৪৭৪১৭ জন লোক বাঙ্গালী বলিয়া লিখাইয়াছে। ১৯২১ সালে এই জেলায় অর্দ্ধেক লোক বাংলা ভাষায় কথা বলিত। স্থানীয় সাঁওতাল, হো এবং ভূমিজ সম্প্রদায় বৃহত্তর বাংলারই অধিবাসী। কিন্তু দশবৎসর ধরিয়া উড়িয়া প্রচারের ফলে উড়িয়া ভাষীর সংখ্যা বিপুল ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ উক্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায় ব্যতীত ৮৫৫৩০ জন লোক বাংলা ও উড়িয়া উভয় ভাষার কথা বলিতে পারে বলিয়া আদমসুমারীর কর্তৃপক্ষ কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে ফেলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এরকম বাংলার আধা একান্ত ও অবিলম্বে প্রয়োজন। আশা করি, অপর কোনও তথ্যের দরকার নাই। মানভূম জেলা প্রকৃতই বাংলার অংশ হিন্দী ও উড়িয়া অভিযানের যন্ত্রতা ব্যর্থ করিয়া ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে ৪২০০০ জন বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধিতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় কমফারেন্সে নেহরু রিপোর্ট আলোচনার সময় রৌগলিক, অর্থ-নৈতিক এবং সুতত্ত্ব সম্পর্কে ঐক্য থাকিলে, একভাষাভাষী অঞ্চলকে একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। লাহোর কংগ্রেসে একভাষাভাষী অঞ্চলকে একই শাসনে আনয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্প্রতি গণপরিষদের একভাষাভাষী সকল অঞ্চলকে এক শাসনাধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার সকল এই প্রান্তীয় ভূভাগকে বাংলার শাসনাধীনে আনায় বিরোধিতা করিয়া সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শের নামে মিথ্যা যুক্তির প্রচার করা হইতেছে। ক্ষমতাশালী প্রাদেশিক নেতৃবর্গের প্রবল আপত্তি উত্থিত হইয়াছে। এই সঙ্কটে বাংলার নেতৃবর্গের বিমুখ থাকা আশঙ্কাজনক। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ধর্ম চক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকার নিম্নে একত্রিত জাতিই গড়িয়া উঠুক, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, স্থান কাল পাত্র ও সম্প্রদায়রহিত ভারতীয় জাতির নব অভ্যুদয়ে—ইহাই হউক আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

আজ

শ্রীবীণা দেবী

জীবনে যে গান হয়নিকো গাওয়া
আজ গাও সেই গান,
জীবনে যে প্রাণ হয়নিকো পাওয়া
আজ পাও সেই প্রাণ।
জীবনে যে দান হয়নিকো দেওয়া
আজ তাই দান কর,
জীবনে যে ধন হয়নিকো নেওয়া
সেই ধনে হাত ধর।
জীবনে সে সুধা হয়নিকো ঢালা
আজ সেই সুধা ঢালো,
জীবনে যে আলো হয়নিকো জ্বালা
আজ আলো সেই আলো।

সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ,পিএচ্-ডি

আমরা সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষার কথা মনে করিতেছি না। আমরা চতুষ্পাঠীর কথা বলিতেছি। কারণ চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত আত্মত্যাগী, তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বিদ্যালয় জাতির পুণ্যতীর্থ। বিধর্মী রাজাদের রাজত্বকালে তাঁহারা শাস্ত্রসমূহকে আপনার প্রাণের মত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অপ্রতিকূল আবহাওয়ায় শাস্ত্র প্রসার লাভও করিয়াছিল। তাঁহাদের চতুষ্পাঠী হিন্দুজিগের সংস্কৃতির উৎস। সেই উৎস আজ শুষ্কপ্রায়। এই চতুষ্পাঠীর অতীত স্মৃতি যতই মধুর হউক্, বর্ত্তমানের শিথিল অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তেই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে প্রাচীন হিন্দুর সংস্কৃতির শেষদিন অদূর ভবিষ্যতে শুরু হইবে কি?

এই দুশ্চিন্তার কারণ কি? চতুষ্পাঠীর আত্মপরীক্ষা ও এখন বহু ক্ষেত্রে বিস্তারী দিতেছে। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ত নগণ্য নয়। উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।

পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার সহিত জাতির সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রে স্থান লাভে অসুবিধা ছিল না। সমাজের নিয়ামক ছিলেন এই সংস্কৃতজ্ঞরা। তাহাতে মুসলমান যুগে বস্তুতঃ দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমানদের অধিকারে ছিল রাষ্ট্র। তবু হিন্দুরও সেই রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি ছিল এবং এই সব হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। এমন কি মুসলমান সম্রাটরাও সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। আর দ্বিতীয় কথা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন অব্যাহত ছিল। হিন্দুসমাজের শিক্ষাগুরু ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এইজন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অনুদার ও অত্যাচারী সম্রাট অথবা অবাধেরা মধ্যে মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির শত্রুতা করিলেও স্বাধীন হিন্দুসমাজ সেই বর্ব্বর আঘাত সহ্য করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং তাহাতে মুহ্যমান হয় নাই।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসকদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের আধিপত্যে ঘুণ ধরে। এই মারাত্মক ব্যাধিটি তখন তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর ছিল। এখনও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই ব্যাধিটাকে ব্যাধিরূপে বুঝিতে পারেন না। হিন্দু রাজাদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ছিল এবং থাকাও স্বাভাবিক। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসকদের রাজত্বকালে রাজধর্ম্মাবলম্বীদের সমাজ প্রতিপত্তিশালী হয়। বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে জনসাধারণের ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অধিক সুযোগ থাকায় ইহা বহু লোকের চিত্তাকর্ষক হয়। ধনী মুসলমানগণ ছিলেন ভোগীশ্রেষ্ঠ এবং রুচি শিক্ষার গুরু। মানুষের ভোগের প্রতি স্বাভাবিক টান আছে। হিন্দু সমাজে যাঁহারা অতি নিরক্ষর ছিলেন, মনুষ্যোচিত শিক্ষার এবং সকল ভোগে বঞ্চিত হইতেন তাঁহারা রাষ্ট্রভাষা ধর্ম্মগ্রহণ করিলে যদি ঐহিক ভোগ ও অন্নের মত শিক্ষা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ এবং স্বর্গসুখের আশ্বাস পান তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন। একদিকে ধর্ম্মত্যাগে নরকের ভয় অপরদিকে ঐহিকসুখের ও স্বর্গের আকর্ষণ। শুধু বিশ্বাস মানুষকে কতদিন স্বধর্ম্মে অটল রাখিতে পারে। বেশ বড়, না কোরাণ বড়—এই প্রশ্ন উঠে নাই। অথবা জনসাধারণকে সন্তোষজনকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে। মুসলমান ভক্তিদের মধ্যে যে সবাই সাধু ও মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অস্তিত্বই মুসলমানধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম্মের আকর্ষণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ইহার উপরে রাজশক্তি যদি ধর্ম্মপ্রচারে সৎ ও অসদুপায়ে সহায়তা করে এবং সমাজরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সম্প্রদায় এবং উচ্চ ধর্ম্মে সমাজপতিরা যদি নিষ্ক্রিয় অবলম্বন না করেন তাহা হইলে সমাজের ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যাঁহারা ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবন অতিশপ্ত হয় নাই, বরং তাঁহাদের অনেকেরই আপাতিক সুখ অনেক অধিক হইয়াছিল। একমাত্র পরলোকের যুক্তি এই শিক্ষাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারে না। জনসাধারণের বুদ্ধির ক্রমবিকাশে এই শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বহুপূর্ব্বে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা যে অযৌক্তিক, সেই ধারণা জনমনের গভীরতলে সঞ্চিত হইতে লাগিল।

সংস্কৃতি শিক্ষার মূলে চরমাঘাত হানিল ইংরাজ আমল। স্কুল ও কলেজ শহরে শহরে প্রতিষ্ঠিত হইল। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইল। অল্পের জন্য ইংরাজি শিক্ষার আদর হইল। আর এক কথা, জড়বিজ্ঞান জনসাধারণের সংস্কার ও বিশ্বাসের মূল প্রাচীর অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। যেহু জাতি তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির যে পরিচয় দিতে লাগিল তাহাতে লোকের মনে হইল যে কোন বিদ্যাই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। মার্শ্মানীতে ও অন্য দেশে দেশে পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতীয় পণ্ডিত সমাজও বিস্মিত না হইয়া পারেন না। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিলেন না। জ্যোতিষে ও অঙ্কশাস্ত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে অনেক বেশী অগ্রসর হইয়া গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে, রসায়নে, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া চিন্তাজগতে একটা বিরাট পাশ্চাত্য সমাজ

আসিয়াছেন। বিজ্ঞানে উন্নতির ফলে যানবাহন, যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে পাশ্চাত্য জগৎ একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে জগতের ব্যবসা বাণিজ্য তাঁহাদের করতলগত হইয়াছে। বস্তু তৈয়ার অপব্যবহারে শোষণের সুবিধাও হইয়াছে অপরিসীম। এই শোষণের ফলে ভারতের ধনভাণ্ডার ও শস্যসম্পদ বিধ্বংসিত হইয়াছে। আর্থিক অবস্থার শোচনীয় পরিণাম ভারতীয়দের চিত্তবিকারের ও রুচি পরিবর্তনের কারণ হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা আর্থিক শোষণের কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। এই শাসনকালে সংস্কৃত শিক্ষার উৎকর্ষ জনসাধারণের নিকটে অপ্রমাণিত হইয়াছে।

ইংরাজ শাসকেরা জনসাধারণকে শিক্ষার অনুমতি মাত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ দেন নাই। ইংরাজের শিক্ষাপদ্ধতি এতই ব্যয়বহুল যে ভারতের শোষিত জনসাধারণের পক্ষে এই শিক্ষা আয়ত্তের মত চিরদিন স্বপ্নের বাহিরেই রহিল। চতুষ্পাঠীর শিক্ষার সুযোগ আছে প্রচুর, কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণও বিদ্যমান। উচ্চবর্ণের লোকেরা ইংরাজের শিক্ষার দিকে ঝুঁকিলেন। ফলে দরিদ্র ও অশিক্ষিত উচ্চবর্ণের বালকদের জন্য উন্মুক্ত রহিল চতুষ্পাঠী। এর ফলে চতুষ্পাঠী আকর্ষণ শক্তি হারাইতে লাগিল। দরিদ্র হইলেই অমেধাবী হয় না। সুতরাং এই অবস্থাতেও মনীষী দেখা গেল। তাঁহারাই এখন চতুষ্পাঠীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। চতুষ্পাঠীর কর্ণধারেরা শিক্ষার নিম্নস্তরের প্রতীর ভাঙিয়া ফেলিলেন না। তাহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা বিকৃতির কোন সম্ভাবনাই হইল না।

ইংরাজ শাসনকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমাজের উপর প্রভাব ক্ষীণ হইতে লাগিল। ইংরাজের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রভাবের ফলে সামাজিক মর্য্যাদার বৈষম্য চলিয়া গেল। ইহার ফলে ব্রাহ্মণদের নানা ধরণ শাসন শিথিলমূল হইল। বস্তুতঃ সামাজিক শাসন রহিল বিবাহে, পংক্তি ভোজনে, ধর্মানুষ্ঠানে ও বেষ্টনে। বহু ইংরাজিশিক্ষিত উচ্চবর্ণের বালক ও যুবকেরা পঞ্চদশ বীচবর্ণের বালক ও যুবকদের সহিত মেলামেশা করিয়া ভাবাভিমান শিথিল করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে একাংশও পরাজিত হইয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের বিবেক বিক্রয় করিয়া সমাজসংস্কারে সম্মতি দিলেন। সাধারণ লোক বুঝিল ঠিক বিপরীত। তাহারা মনে করিল যে সংস্কৃত পড়িলে মানুষ হয় অমানুষ। এই ভাবে সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ ছিলেন সমাজের শাসক। উৎপন্নদ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণের দায়ী হওয়া উচিত, কারণ এইটি সামাজিক ব্যবস্থা। যে বণ্টন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা এতই বিকৃত হইল যে তাহার দ্বারা সমাজ রক্ষা করা যায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রকৃত প্রতিকারের পথের দিকে দৃষ্টি পড়িল না। তাঁহারা অদৃষ্ট ও অদৃষ্টের দোহাই দিয়া জনসমাজকে দায়িত্বের দিক হইতে টানিয়া নিলেন। ইংরাজের যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসায় অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোন আন্দোলন অথবা বিপ্লব করিলেন না। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দুঃখের প্রয়োজন ধরা পড়িল না। তাঁহারা শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন। অদৃষ্টবাদ দুঃখের মত তাঁহাদের অন্ধে চাপিয়া বসিল—সৃষ্টি প্রেরণা প্রাপ্ত হইল না। অথচ প্রকৃত কর্মবাদের তাঁহারা যদি আলোচনা করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা সত্যপথের সন্ধান পাইতেন। ইংরাজের শোষণের প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ আপনাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এই আন্দোলনের দ্রষ্টা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের দল। বহুখ্যাতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা অথবা রাণীর অভিষেকের সময় প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন এবং রাজানুগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন এবং ধর্মের নামে অনুন্নত প্রজাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াও দাঁড়াইয়াছিলেন। অধিকাংশ সাধারণ লোক এই সব কুকার্যের জন্য সংস্কৃত শিক্ষাকেই দায়ী করিল। এই ভাবে সংস্কৃত শিক্ষার আসন হীন হইল।

যুগের পরিবর্তনে সমাজে আভিজাত্যের মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিল অর্থকৌলীন্য। সংস্কৃত শিক্ষার অর্থাগমের পথ অতি অল্পতর। বড় বড় পণ্ডিতদের প্রায়ই ধনীর মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কালের প্রভাবে ধনীদের চিত্ত হরণ করিল বিজ্ঞান। ধনীরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্যে বিমুখ হইলেন। আশ্রয়হীন লতার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ বিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বিদ্যার গৌরব ও মলিন হইয়াছে এবং অর্থাগমের পথও রুদ্ধ হইল। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের অস্তিত্ব লোপোন্মুখ হওয়া বিচিত্র নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের নূতন নূতন সমস্যাগুলি উঠিল না। সুতরাং ইহাদের সমাধান ও সম্ভবপর হইল না। এক কথায় সংস্কৃত সাহিত্য জাতির জীবনের সহিত সম্পর্ক হারাইল। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের আদর বর্ণ-হিন্দুর কাছে থাকিলেও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিকট স্থান প্রাপ্ত হইল। এই কারণেই অনেক সংস্কৃত অধ্যাপক মৃতভাষা বলিয়া উপহাসও করিতে শিখিল, যদিও ভারতের ধর্ম জীবনে সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ জীবন্ত রহিয়াছে। এই সব কারণের সমবায়ে সংস্কৃত সাহিত্য বর্তমানে জনসমাজে অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার পাত্র হইয়াছে। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার যে ধারা প্রচলিত ছিল সে ধারা এখন অচল হওয়া উচিত। পূর্বে ছিল এক বর্ণ। ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণ শাসনের অনুকূল প্রভাব। বর্তমানে সেই স্থানে কত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাবলম্বী সম্প্রদায় স্থান করিয়াছে। ব্যক্তির উপর সমাজের যে অধিকার ছিল এখন আর তাহা নাই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে। এখন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন রকমের হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বাঁচিবার অধিকার আছে এবং বৈধভাবে সম্প্রদায়ের সুযোগও আছে। অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দুসমাজকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে, কারণ হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার রীতি গ্রহণ করিয়াই রহিয়াছে। হিন্দু সমাজকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করিতে হইবে। সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনক চুক্তি করিতে হইবে। আর একথা, হিন্দু

সমাজের মধ্যে সকল ব্যক্তিকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। তাহা না হইলে সমাজরক্ষা অসম্ভবপর। এই প্রেম শুধু মুখের কথা নয়। ব্যবহারিক জগতে এই প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিতে হইবে। সকলকে মানুষ হইবার সুযোগ দিতে হইবে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে; অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইবে; ব্যাধি শিশুমৃত্যু প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে; সকলের বাসোপযোগী বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রত্যেকের নিরাপত্তার বিধান করিতে হইবে। এরই নাম প্রকৃতপক্ষে ধর্ম। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চতুষ্পাঠীর সংস্কার সাধন করিলে সংস্কৃত শিক্ষা আবার জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংস্কৃত শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই, বরং নূতন করিয়া শিক্ষার প্রবর্তন করা যাক। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব যে সংস্কৃত শিক্ষা আমাদের প্রগতির পথে অন্তরায় নহে বরং সহায়ক। আমরা কি চাই—নূতন ধরণের শিক্ষা, না দেশের উপযোগী শিক্ষা। নূতনত্বের মোহ মানুষের বেশী দিন থাকে না। যাহার কার্যকারিতা আছে তাহাই শেষ পর্যন্ত আদৃত হয়। এখন দেখিতে হইবে বর্তমান ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার কোন উপযোগিতা আছে কি না? সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে দুইটী অংশ আছে। (১) সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে এমন কিছু আছে কি—যাহা বর্তমান কালে উপযোগী। (২) সংস্কৃত-ভাষার এখনও নিজস্ব কোন প্রয়োজন আছে কি? এই প্রশ্ন দুইটীর সদুত্তর পাইলে আমরা বুঝিব যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

সংস্কৃত শিক্ষার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, বর্তমান অতীতের সন্তান এবং ভবিষ্যতের জনক। বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যতের মিলনস্থল। আমাদের বর্তমান সমাজ প্রাচীন সমাজ বৃক্ষের ফল এবং ভবিষ্যৎ সমাজ বৃক্ষের বীজ। অতএব প্রাচীন সমাজ বর্তমান সমাজকে রূপ এবং জীবনীশক্তি দিয়াছে। বর্তমান সমাজ ইচ্ছাপূর্বক অতীতের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে না। সকল ঐতিহ্য ত্যাগ করিয়া যদি কোন সমাজ বাঁচিতে চায় তাহা হইলে সে সমাজ হইবে সম্পূর্ণ নূতন সমাজ। এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্রপন্থীরা যেমন মনে করেন যে তাঁহারা আরব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে বিচার করিয়া দেখুন যে তাঁহারা কি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছেন। ভিন্ন সংস্কারাপন্ন দুইটী জাতির রক্তের সম্বন্ধ ঘটিলে এদেশের সমাজের বিকৃত রূপ দেখা দেয়। এই জন্য প্রাচীন হিন্দুরা বিবাহ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। য়ুরেশিয়ান সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদের মনে হয় জাতির সামিশ্রণে সুফল প্রমাণিত হয় নাই। একই সংস্কারে সংস্কৃত দুইটী পৃথক্ জাতি যদি মিলিত হয় তাহা হইলে ফল বোধ হয় মন্দ হয় না। এই জন্য শক, হূণ প্রভৃতি জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত অংশ হইতে পারিয়াছিল। বর্তমান সমাজ প্রাচীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নয়। প্রাচীন সমাজ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকে। কতক প্রাচীন প্রবৃত্তি মৃত হইয়া পড়ে এবং কতক প্রবৃত্তি অধিক জাগ্রত হয়। জাগ্রত প্রবৃত্তির মধ্যে কোনটি হইয়া উঠে সক্রিয় এবং কোনটি হয় নিষ্ক্রিয়। বাহ্যরূপ দেখিলে মনে হয় যেন দুইটী সমাজ পৃথক্ এবং ইহাদের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। ভারতের হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মনে হয় যেন দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ দুইটীর মধ্যে ভেদ আত্যন্তিক ছিল না। একই আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ দুই সমাজেরই কাম্য। সুতরাং দুই সমাজের লক্ষ্য এক। এই জন্য পরের যুগে দুই সমাজের মিলনও ঘটিল। এখন কোন বৌদ্ধ নিজেকে হিন্দু বলিতে আপত্তি করেন না। কিন্তু এমন একদা দিন ছিল, যখন বৌদ্ধ নিজকে হিন্দু ভাবিলে অপরাধী হইত। বর্তমান হিন্দুসমাজ প্রাচীন সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ নয়। এই সমাজ প্রাচীন সংস্কৃতির আংশিক প্রকাশ মাত্র। সংস্কৃত-শিক্ষা প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। বর্তমান সংস্কৃতশিক্ষিত সমাজ সংস্কৃতশিক্ষার প্রতিমূর্তি নয়। বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষায় জগতে যত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার জন্য বিজ্ঞান দায়ী হয় না; যে সমাজ বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে সেই সমাজই দায়ী। বর্তমান পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যদি অনুধাবন করা হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা দায়ী হইতে পারে না।

সংস্কৃত শিক্ষার যে সব অমূল্য উপাদান রহিয়াছে সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যদি আমরা আমাদের পৈতৃক ধন নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা অবিবেচনার ফলে নিঃস্ব হইব—সংস্কৃত শিক্ষার তাহাতে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীর নিম্নস্তরে স্বর্ণ প্রোথিত রহিয়াছে, অজ্ঞানী তাহার সন্ধান পায় না। যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বলে এই মহামূল্য খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিবেন তাঁহারাই উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন। কালের অতল তলে প্রাচীন ভারতের চিন্তারত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার পূর্ণ আলোচনা করিলে সেই রত্নসমূহের আবিষ্কার হইতে পারে। প্রাচীন অমুদ্রিত পুঁথিসমূহের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে। এখনও এমন অনেক প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতিতে প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন আছে যাহাদের সন্ধান আমরা পাই নাই। সে সকল গ্রন্থের সন্ধান আবিষ্কার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা কত কত রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিব। ইতিহাস আমরা পড়ি কেন? ইতিহাস যে জন্য পড়ি, সেই জন্যই আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িব। ভারতের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। এই অসমাপ্ত কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে।

অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনপথের প্রদীপ। প্রাচীন সাহিত্যেই এই প্রদীপটী সংরক্ষিত রহিয়াছে। অজ্ঞতার দ্বারা প্রদীপটী আবৃত রহিয়াছে। আবরণ দূর করিতে না পারিলে সংসার যাত্রার বন্ধুর পথে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের আশঙ্কা রহিয়াছে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার করিতেও আদর্শের প্রয়োজন এবং উপায়ও আমা চাই। অতীতে কি কি সংস্কার হইয়াছে এবং আমরা কি যে ফল লাভ করিয়াছি তাহা আলোচ্য হইবে। অন্ধকারে হাত

পরক্ষেত্রের অপেক্ষা আলোচক দৃঢ় ও স্থির পদবিক্ষেপ অধিক কাম্য নয় কি? আমরা অন্য দেশের অভিজ্ঞতা দ্বারা চক্ষুষ্মান্ হইতে পারি সত্য, কিন্তু আমাদের জীবনের সন্ধান পাইতে পারি না। আমরা চাই, সমাজে মৈত্রী, রাষ্ট্রে শান্তি, শিক্ষায় সত্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে আদর্শের দিকে অগ্রগতি। জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধিকে আমরা তুচ্ছ মনে করি নাই। আমরা কিন্তু আন্তর সুখ ও প্রসন্নতার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়াছি। আমরা চাহিয়াছি যে সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি আমরা মিত্রের মত আচরণ করিব এবং নিখিল বিশ্ববাসী আমাদের প্রতি মিত্রের মত আচরণ করুন। চিন্তায় ও কার্যে আমরা এই আদর্শকে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের চেষ্টার পথে অন্তরের ও বাহিরের কত বাধা আসিয়াছে। আমরা সেই বাধাসমূহ কত সব অতিক্রম করিতে পারিয়াছি—আমাদের অসাফল্য কোথায় হইয়াছে—এই সব ব্যবহারিক গুণ দোষের পরিচয় হইবে প্রাচীন সাহিত্য হইতে। আমাদের জীবনপথের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাথী প্রাচীন সাহিত্য। এখন একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমরা যদি সংস্কৃত সাহিত্যের সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া লই, তাহা হইলে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার আর কোন আবশ্যকতা থাকিবে না। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে অনূদিত গ্রন্থগুলির আমরা আলোচনা করিব কিনা। যদি করি—তাহা হইলে প্রাচীন সাহিত্যেরই আলোচনা করা হইল—শুধু ভাষার ব্যবধান দূর হইল। অনুবাদের দ্বারা অপর ভাষার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। ছবি দেখিলে যেমন ব্যক্তিকে দেখার জ্ঞান হয় না তেমন অনুবাদ পড়িলে মূল গ্রন্থের সম্যক্ আস্বাদ পাওয়া যায় না। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল—' এই ন্যায়ানুসারে অনুবাদ চলিতে পারে। (ক্রমশঃ)

দ্রৌপদী

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

একটী প্রচলিত শ্লোক আছে—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

অনেকে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বে এই শ্লোক পাঠ করেন। কিন্তু রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে এই শ্লোক পাঠের কথা লিখেন নাই—অন্য শ্লোকের কথা লিখিয়াছেন। এই শ্লোকটি কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা কাহার রচনা তাহা বলা কঠিন। ইহাকে শাস্ত্রবাক্য বা ঋষিবাক্য বলা যায় না।

কেহ কেহ এই বাক্য উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রাচীন ভারতে রমণীর সতীত্ব বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। প্রথমতঃ এই বাক্য আর্ষ নহে। দ্বিতীয়তঃ এই বাক্য গ্রহণ করিলেও এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সতীত্বের মূল্য নাই। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া বোধহয় যে, এই পাঁচটি রমণীর একাধিক পতিসংযোগ হইলেও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা ইঁহাদের চরিত্র পবিত্র হইয়াছিল। সাধারণতঃ একাধিক পতিসংযোগ পাপজনক। এই শ্লোকে ইহাকে "মহাপাতক" বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা মহাপাতকও নষ্ট হইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই ঈশ্বরে ভক্তি দ্বারা ইঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আমরাও ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা আমাদের পাপ নষ্ট করিতে পারি ইহাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

ইঁহাদের মধ্যে তারা ও মন্দোদরী স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তারা বানরী এবং মন্দোদরী রাক্ষসী ছিলেন। উভয়েই অনার্য্যা। অনার্য্য-সমাজে পাতিব্রত্যের আদর আর্য্য-সমাজ অপেক্ষা কম ছিল। অনার্য্য সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং তারা ও মন্দোদরী প্রচলিত আচারেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখা যায় যে ইন্দ্র যখন গৌতমের মূর্ত্তিধারণ করিয়া অহল্যার নিকট গিয়াছিলেন তখন অহল্যা তাঁহাকে প্রকৃতই গৌতম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এজন্য অহল্যার দোষ ছিল না। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে, অহল্যা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইন্দ্রই ঋষির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, অতএব অহল্যার পাপ হইয়াছিল। সেই পাপের ফলে অহল্যাকে দীর্ঘকাল অদৃশ্যা হইয়া বায়ুমাত্র আহার করিয়া ভস্মে শয়ন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল তপস্যার পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে অহল্যা পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ভগবৎকৃপায় মহাপাতক হইতে মুক্তি হইয়াছিল।

কুন্তী কুমারী অবস্থায় দুর্বাসার সেবা করিয়া একটী মন্ত্র পাইয়াছিলেন, ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া যে দেবতার আহ্বান করিবেন, ঐ দেবতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং দেবতার প্রভাবে তাঁহার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে। কৌতূহলবশতঃ কুন্তী কুমারী অবস্থায় মন্ত্রপাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন, সূর্য্যদেব উপস্থিত হইলে কুন্তী প্রথমে সহবাসে সম্মত হন নাই, পরে সূর্য্যদেবের অনুরোধে সম্মত হন। সাধারণ চরিত্র-স্খলনের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য। পরে স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে শাস্ত্রবিধিতে নিয়োগপ্রথায় যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জন্ম হয়। কুমারী অবস্থায় কুন্তীর যে পাপ হইয়াছিল, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল ইহাই শ্লোকের উদ্দেশ্য। ফলা বাহুল্য, কেহ যদি মনে করে

আমি এখন পাপ করিতে পারি পরে ভক্তির দ্বারা বিনষ্ট করিব—তাহা হইলে তাহার পাপ নষ্ট হয় না। বাইবেলে দেখা যায় মেরী ম্যাগ্‌ডেলিন দুশ্চরিত্রা রমণী ছিল, কিন্তু ঈশা ভক্তির দ্বারা তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থের অনুরূপ ধারণা অন্য ধর্মেও আছে।

অতঃপর দ্রৌপদীর চরিত্র। কেহ কেহ বলেন মহাভারতের যুগে রমণী একাধিক স্বামী গ্রহণ করিত। এই মত যে সম্পূর্ণ অলীক, তাহা দ্রৌপদীর বিবাহের বিবরণ পড়িলেই জানা যায়। সেখানে দেখা যায় যে, দ্রুপদ বলিতেছেন "হে কুরুনন্দন, এক পুরুষের বহু পত্নী বিধিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই।" বস্তুতঃ দ্রুপদ এই প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হন নাই। পরে ব্যাসদেবের কথায় রাজি হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন যে পঞ্চপাণ্ডব এক ইন্দ্রেরই বিভিন্ন রূপ এবং দ্রৌপদী স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিনী। দ্রৌপদী যে সাধারণ রমণী ছিলেন না, ইহা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতেই দেখা যায়। কারণ দ্রৌপদী কোনও রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যজ্ঞের অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

দ্রৌপদী যদি স্ব-ইচ্ছায় একাধিক পতি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পাতিব্রত্যের লোপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কুন্তী, যুধিষ্ঠির এবং স্বয়ং ব্যাসদেবের আগ্রহে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পঞ্চপাণ্ডবের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইঁহারা পাঁচজনেই তোমার স্বামী।" দ্রৌপদী এই সকল গুরুজনের নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন। পাঁচজনকেই তিনি সমানভাবে পতিরূপে সেবা করিয়াছিলেন, কখনও স্বেচ্ছাচারিণী হন নাই। এজন্য পতিগণ কর্তৃক তিনি সতীরূপেই পূজিত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ পতিব্রতা ছিলেন সেইরূপ তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হারিয়া যাইবার পর প্রতিকামী দুর্যোধনের আদেশে যখন তাঁহাকে আনিতে যায়, তখন তাঁহার বুদ্ধি ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রৌপদী দুইবার সেই দূত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময় দ্রৌপদী অতিশয় বুদ্ধির সহিত যে সব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সভায় কেহই তাহার উত্তর দিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে দ্রৌপদী কহিয়াছিলেন—"পৃথিবীতলে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা ধর্মকে রক্ষা করিব, ধর্ম আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" প্রতিকামী অসমর্থ হওয়াতে দুর্যোধন দুঃশাসনকে প্রেরণ করিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী তাহাকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তাহা একাধারে বীর রস এবং করুণ রসের অলৌকিক সম্মিশ্রণ। অবশেষে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিল তখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "হে গোবিন্দ, হে দ্বারকাবাসী কৃষ্ণ, হে গোপীজনবল্লভ, কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে দুঃখবিনাশন, আমি কৌরব-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে জনার্দন, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন, হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বভাবন, আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ, এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর।" শ্রীকৃষ্ণ বিপন্ন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শয্যা ও লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করিয়া আসিতে লাগিলেন। ধর্মের অনির্বচনীয় প্রভাবে নানা রাগরঞ্জিত বিবিধ বস্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিল। দ্রৌপদীর চরিত্র যে কত মহৎ তাহা এই ঘটনার বিবরণ হইতেই স্পষ্ট হয়।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে দ্রৌপদী চরিত্রের বিশিষ্টতা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "দ্রৌপদীর ধর্মজ্ঞান অসামান্য। যখন তিনি ধর্মিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জগন্মণ্ডলে তাদৃশী ধর্মানুরাগিণী আছে বলিয়া বোধ হয় না। ... দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাদৃত ধর্মের মূর্তিস্বরূপিণী। তাই পঞ্চপুরুষের সংসর্গযুক্ত হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট একপতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু এবং ধর্মাচরণের একমাত্র অতিথ উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট একমাত্র অতিথ উপাস্য, তেমনি পঞ্চস্বামী অনাদরযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট একমাত্র ধর্মাচরণের স্থল।"

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি (ইরাণ)

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

ইরাণের তেল লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। দুর্বলের অধিকারে যেমন রূপ থাকিতে নাই তেমন সম্পদও—সে প্রাকৃতিক হউক না কেন—থাকিতে নাই। যাহা সমাজ জীবনে সত্য, তাহা রাষ্ট্রিক জীবনে কোন কোন সময় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইরাণের নিজের তেল থাকিলেও তাহা নিজের ভোগে তেমন কোনদিনই লাগে নাই। এ অনেকটা পরের নৈবেদ্যে চাল-কলা সাজাইবার মত। ভাল করিয়া নৈবেদ্য রচনা হইল, তারপর দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ সবই আত্মসাৎ করিলেন—পূজক ব্রাহ্মণ নিজের দুবিধাজনক কাজটুকুও প্রসাদ দিবার কথাটা পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। ইরাণের ভাগ্যেও প্রায় অনুরূপই ঘটিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইন্দ্র-রূপ শক্তিবর্গ ইরাণের রূপে মজিল। একজন উত্তর সীমান্ত হইতে আর একজন দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আসিয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিল। এখন বিপদ হইল ইরাণের—সে কোন দূল রাখে, কাহু কলঙ্কী করে। উভয়েই দুর্দম যৌবন, উভয়েই পিয়াসী মাটির কেন্দ্রিতে চায় ইরাণকে। আপাততঃ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে স্থির হইল যে, ইরাণকে

আকস্মিক প্রভাবে পরিণত করা হউক, মস্কো রুশ জমুক ও ব্রিটিশ সিংহ কামড়া-কামড়ি শুরু করিয়া দিবে। কিন্তু যে সন্দেহ একবার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে তাহাকে একেবারে তাড়িয়া দেওয়া মুস্কিল। সেই ব্রিটিশ সিংহ ভারত সীমান্তে একবারে ওত পাতিয়া বসিয়া রহিল—অন্ত পক্ষ অর্থাৎ রাশিয়া কাশিয়া হুয়ের তীর হইতে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে পারস্যের দিকে আগাইতে শুরু করিল।

রুশজনুকের পারস্যের প্রতি লোভ থাকিবার বিশেষ একটি কারণ আছে। উত্তর পারস্যে সে অনেক টাকাকড়ি ঢালিয়াছে। এমন কি রেল পথ হইতে শুরু করিয়া বড় বড় রাস্তাও সে তৈরী করিয়াছে। কাজেই জার-শাসিত রাশিয়া পারস্যকে নিজের পকেটের করায়ত্ত বস্তু বলিয়া ভাবিত। জার-সাম্রাজ্য পতনের পর ইহার অবশ্য আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেদিন নিজে পারস্যের সঙ্গে বন্ধুতাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই আকস্মিক নীতি পরিবর্ত্তনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পারস্যে সিংহের ভাবি বিপদগ্রস্ত বোধ করিতে লাগিল এবং সেখানেই রুশ-জুজুর ভয় দেখাইবার কাজে লাগিয়া গেল। রেজা শা পহলবীকে পারস্যের সিংহাসনে বসাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজে একটু সোয়াস্তি বোধ করিল। যাই হোক, মোটামুটি পারস্যের ইতিহাস রুশ বিপ্লবের পর এইভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে পারস্য, ব্রিটিশ ও রুশ কেহই "রাজনৈতিক সন্দেহবাদ" নামক ব্যাধিটি হইতে মুক্ত হইলেন না। ইহার মধ্যে মার্কিন আবির্ভাবের ইতিহাসটিও জানিয়া রাখা ভাল। মার্কিনরা শুধু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে সূত্র করিয়া পারস্যে আনাগোনা শুরু করে নাই। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই যথাস্থানে টোপ ফেলিয়াছিল এবং আজ যেমন পারস্য মার্কিনদের টোপ গিলিয়াছে সেদিনও তেমনি করিয়া গিলিয়াছিল। অবশ্য অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন আঁতাত রাশিয়াকে হটাইবার জন্য করা হইয়াছিল, সেদিন তাহা ঘটে নাই। সেদিন ইঙ্গ-মার্কিন মন-কষাকষি চলিতেছিল। সেদিন মার্কিনরা ব্রিটিশকে বেশী ঘাঁটায় নাই—যা আজকার মত যখন তখন নাকখানে মার্কিনরা এমন করিয়া বাঁধিতে পারে নাই।

রুশিয়ার খোঁটারিয়া কনসেসন লইয়া পারস্য ব্রিটিশের মতবিরোধ দেখা দেয়। পারস্যের ইচ্ছা ছিল না যে, খোঁটারিয়া তৈল কনসেসন ব্রিটিশ-হাতে পড়ুক। তাই তারা স্থির করিল যে, আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে এই তৈল কনসেসনটি দেওয়া হইবে, অবশ্য কোন রহস্যজনক কারণেই বোধ হয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ব্রিটিশদের হটাইতে রাজি ছিল না। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি এই তৈল কনসেসনের কর্ত্তৃত্ব নিয়া যাদামুখায় করিয়াছে, এই সব বাদানুবাদের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী শেষাশেষি ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা করিতে রাজি ছিল। পারস্য সরকার এই খবর পাইবামাত্রই মজলিসে (পারস্য পার্লামেন্টে) অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইল এবং যাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী তৈল কনসেসনের কোন সুযোগ না পায় তার জন্য পারস্য সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিল।

ইহাই মার্কিনদের পারস্যে প্রবেশের একমাত্র কারণ তাহা নহে। পারস্যের আর্থিক বিশৃঙ্খলা দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রভু মার্কিন বহুবার মহৎ বুলি আওড়াইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত যেন খানিকটা বিশৃঙ্খলা কাটাইয়া শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে যাই হউক বর্ত্তমানে আমরা মার্কিনদের পারস্যের তৈল সম্পর্কে যে কৌতূহল তাহা স্বার্থ-বিবর্জ্জিত নির্জ্জলা-সততা বলিয়া বিশ্বাস করি না। কেন বিশ্বাস করি না, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর জে. এম. ব্যালফোর এই রকম মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে মার্কিনরা নিজেদের স্বার্থ বাঁচাইয়া যুদ্ধে নিরত হইয়াছে তাহাদের ওপর নিয়া উসুল করিতে চায়। একথা অবশ্য ব্যালফোর সাহেব কিছুতেই বলিতেন না, যদি পারস্যের উত্তর অঞ্চলের তৈল কনসেসনটি ব্রিটিশ বেনেদের তিলমাত্র পাইবার সম্ভাবনা থাকিত। তিনি গত প্রথম মহাযুদ্ধের পরই এই মতামত প্রকাশ করেন যে—মার্কিনরা পারস্যের উত্তরাঞ্চলের তৈল কনসেসন্ পাইলে আমাদের (অর্থাৎ ব্রিটিশদের) আপত্তি নাই। কেন না রাশিয়া উত্তরে রহিয়াছে—মাঝে মার্কিনরা রহিল, আমরা (ব্রিটিশরা) রহিলাম একেবারে দক্ষিণে। কাজেই তেলের মামলা যখন রক্তপাতে পরিণত হইবে তখন মার্কিন-রুশ যুদ্ধ অনিবার্য্য; কথাটা এখন সত্য সত্যই বলিতে শুরু করিয়াছে।

ঐ জাগে নবযুগ-সূর্য্য

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কত শত প্রাণ ছিল ফাঁসির মঞ্চে যারা
ইতিহাস তাহাদের বন্দে;
ভেসে আসে নিশুতে সেই গীতি-ঝঙ্কার
রক্ত পাগল করা ছন্দে!
রচিয়াছে শহীদের চিতা-নিশার বেদী
তুষার্ত্ত ধরণীর বক্ষে—
বলায়ে উঠিল তাই পুলীস ব্যথা যত
অন্ধ সে কারাগার কক্ষে!
মরণের বেদীমূলে ক'রে যায় আঁখিজল—
—শুধু কাকলী গুঞ্জরণ—
চকিতে থামিয়া যায় বিহগের কলতান,
বিরহীর মরমিয়া ছন্দ!
যত তাদের ছিল সততায় রঞ্জিত
উজল অন্তর-নীর—
অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ
অতীতের মহিমার গর্ব্ব!
মুক্ত ক'রেছে যারা চরণের শৃঙ্খল,
আনিয়াছে আগরণ-মন্ত্র,
সর্ব্বহারার বুকে সুগভীর সাধনা
সর্ব্বহারার গণতন্ত্র।

বিশ্ব কাঁপায়ে জাগে সেই মহামন্ত্রীত
ধীর ধ্বনিত তার শঙ্খ—
মৃত্যুপথের জয়যাত্রীর রক্তে
বেতাজীর জয় হিন্দ্, চন্দ্র!
ঐ জাগে নবযুগ-সূর্য্য—
আকাশ বাতাস আর উদ্বেলিয়া দিগন্তর
মুদ্রিত স্বাধীনতা-সূর্য্য!

কবিতার অপমৃত্যু

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

রাতটা অভাবনীয়।

শ্রাবণ মাস। কোথায় ধারাশ্রাবণ দিনরাত কদম-ফুলের রেণুর মত ঝির ঝির ক'রে ঝ'রতে থাকবে, এলো-মেলো পুবালী বাতাসে তা হবে আন্দোলিত, বাতায়ন ফাঁক দিয়ে হবে বিচ্ছুরিত, তা না হ'য়ে আজ কৌতুকময়ী চঞ্চলা কিশোরীর মতই নীল আকাশখানা দশমীর চাঁদটাকে বুকে ধ'রে হাসছে! সত্যই এ রাত অভাবনীয়—নিঃসঙ্গ পথে চঠাৎ সঙ্গী পাওয়ার মত, বাঞ্ছিত প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মতই।

বিকেলের রান্না সেরে রোয়াকে এসে ব'সল বিজয়া। শাশুড়ী গেছেন রায়েদের বাড়ী কথকথা শুনতে। নইলে তাঁকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প'ড়ে শোনাতে হত। রোজ রোজ একঘেয়ে একটানা কাজ সত্যিই ভাল লাগে না বিজয়ার। কিন্তু উপায় কি? তাই তাকে করতে হয়। সে যে বধূ! স্বামী অফিস থেকে এসে টিউশন্ ক'রতে গেছেন। আসতে প্রায় রাত দশটা হবে। বড় মেয়ে ও কচি ছেলেটা ঘুমিয়েছে। জ্বালাতন করবার মত কেউ নেই। বিজয়ার এখন অখণ্ড অবসর।

আজকের রাতটা বিজয়ার ভারী ভালো লাগলো।

বিজয়া পা ছড়িয়ে বসে। উঠানের সজনা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদখানা দেখা যাচ্ছে। মৃদু বাতাসের আন্দোলনে গাছের হাল্কা ঝিরঝিরে পাতাগুলো দুলছে। পেলব, কোমল, চাঁপা ফুলের তোড়ার মত হাল্কা চাঁদখানাও যেন দুলে দুলে উঠছে। গাছের ছায়া উঠানে আলোছায়ার আল্পনা এঁকে দিয়েছে। বিজয়া চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। পৃথিবী আজ যেন তার কাছে বড় হাল্কা, বড় নূতন, বড় রঙীণ। ভাব-সমারোহে পূর্ণা প্রকৃতি।

এমন নির্জ্জনে ব'সে থাকলে মনে পড়ে অতীতকে। অতীতের স্মৃতি পেছনের ইতিহাসটার পাতা উল্টে চোখের সামনে তুলে ধরে। দেখতে পাই বর্ত্তমান আর অতীতের লাভ লোকসান, আশা-নিরাশার খতিয়ান।

বিজয়ার মনে পড়ে কুমারী-জীবনের পুরাণ ডায়েরী-খানাকে। যেটা আছে তার পিতৃগৃহে, মা বাবা, ভাই-বোনদের স্নেহ, প্রীতি, মমতার সঙ্গে জড়িয়ে। বিজয়া বুঝতে পারে না এ বাড়ীতে সে কেমন ক'রে এল। এখানে তার আসবার কথা নয়—তার সংসার, তার চিন্তা, তার ভাবধারা কোথাও খাপ খায়না এ বাড়ীর সঙ্গে। সব সময়েই বেসুরো বাজে। তবু সেই বেসুরোকেই সুরেলা ক'রে তুলতে হবে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের সে যে বধূ।

পিতা শান্তিপ্রসন্নবাবু কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। মেয়ের কালচারের দিকটা তিনি বিশেষ ক'রেই লক্ষ্য রেখে-ছিলেন। বিজয়াকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন, সূচী কর্ম্ম নিপুণা ক'রে তুলেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। অসুখের জন্য বিজয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে নি। পাড়াগাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর কোনদিনই ছিল না। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যেন হ'য়ে গেল। বন্ধু হরিপদবাবু বল্লেন—"কাঞ্চনপুর এমনই বা কি পাড়াগাঁ ভাই? কলকাতা থেকে আঠার মাইল বইত নয়? চল্লিশ মিনিট লাগে ট্রেণে যেতে। ছেলেটী গ্র্যাজুয়েট, গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস্, বাপের একটু জমিদারী আছে। নিন্দের কি? মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে।"

কত সুখেই বিজয়া আছে! বিজয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে।

বিজয়ার মনে পড়'ল তা'র রবিদা'কে। রবিদা ছিল কবি। বিজয়াকে রোজ বিকেলে পড়াতে আসত। শান্তিপ্রসন্নবাবুর সে ছিল প্রিয় ছাত্র। এম-এ পাশ ক'রে ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ্চ করত। রবিদা তাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে। ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, চয়নিকা, শিশু, চিত্রা, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি থেকে নিখুঁতভাবে ছন্দের মিল শিখিয়েছে। ভাল ভাল কথা বেছে নিতে শিখিয়েছে। বিজয়ার কত কাঁচা কবিতা

রবিদা' কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিয়েছে। বিজয়ার কী দুঃখু হোত কবিতা কাটা দেখে। বলত "তোমাকে আর কবিতা দেখাবো না রবিদা, তুমি বড় কেটে দাও। আমার ক্লাশের মেয়েরা বলে বেশ হয়েছে, আর তোমার কাছে একেবারে যাচ্ছে তাই। ট্রান্সলেশন লিখি ইস্কুলে কারেক্ট হয়, আর তুমি কেটে দাও।"

রবি বলে "হয় তোর মাষ্টার ঠিকমত দেখেনা—না হয় জানে না। এই দেখ এ সেন্টেন্সটা একবারে ভুল। একেবারে কিচ্ছু হয় নি। প্রথমে সাজানো হয় নি, তারপরে অতীত কালের জায়গায় বর্ত্তমান কাল, আবার কর্ত্তা সিঙ্গুলার, ক্রিয়া প্লুর‍্যাল। স্কুলের মাষ্টার এতগুলো ঠিক দেখে দেয় ত?"

বিজয়া অভিমানভরা মুখে একটুখানি ফিক্ ক'রে হেসে ওঠে।

'কাটব? না, কাটব না? রবি জিগেস্ করে।'

'কাটো'—অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে নেহাৎ অনিচ্ছায় বলে বিজয়া।

"আরে আমার কি ইচ্ছে যে তোর যেগুলো রাইট হ'য়েছে সেগুলোও কেটে দিই। আমাকে ভুলগুলোত কাটতেই হবে। তুই যাতে ভালো ক'রে শিখিস সেত আমারও ইচ্ছে। কবিতা লিখছিস্, ভালো ক'রে না শিখলে লেখবার দরকার কি বল? তোর যে কবিতা প্রথম পারফেক্ট হবে, সেই কবিতাটা আমি কাগজে প্রকাশ ক'রে দেবো।"

বিজয়া 'যেৎ' ব'লে অবিশ্বাসের হাসি হাসলে। কিন্তু আনন্দে তার বুকখানা দুলে উঠল।

'দেখিস'—রবি বলে।

"বোস রবিদা' তোমার খাবারটা নিয়ে আসি" বলে বিজয়া ঘর থেকে চলে যায়।

সত্যিই বিজয়ার কবিতা যেদিন 'ঝরণা'য় আত্মপ্রকাশ করলে সেদিন বিজয়ার কী আনন্দ! নিজহাতে কচুরী ভেজে রবিদা'কে খাইয়েছিল সে।

রবি ছিল গুণীও। সে ভাল সেতার বাজাতে পারত। বিজয়াকেও সে শিখিয়েছিল সেতার। শান্তিপ্রসন্নবাবু বিজয়াকে একটা সেতার কিনে দিয়েছিলেন। রবি আসত বিকেলে, বেত মাষ্টারের সেতার শিখিয়ে। জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রে, নীল আকাশের নীচে, বেলা, মালতী, যুথীসুরভিত ছাদে মাদুর বিছিয়ে তারা বসত দুজনে। বিজয়া সেতার খানাকে বুকে রেখে যখন কোমল আঙুলের ছন্দিত চালনায় সেতারের বুক থেকে জয়-জয়ন্তী, কাফি, ইমনকল্যাণ, ভূপালী প্রভৃতি সুরের তান বুনে যেত তার মূর্চ্ছনায় নীরব চাঁদিনী থেকে থেকে কেঁপে উঠত, প্রকৃতি সম্মোহিতা হয়ে অপলক চেয়ে থাকত, তখন বিজয়ার মনে কি এক অব্যক্ত স্বপ্ন ভেসে উঠত যে তা সে এখন বলতে পারে না। তার কিশোরী প্রাণে অনুভব ক'রত অব্যক্ত চাঞ্চল্য। সে বাজাত, দরদ দিয়ে বাজাত—শুধু রবিদার মুখ থেকে একটা কথা শুনবার জন্ত "চমৎকার"। রবিদাকে সেতার বাজিয়ে আনন্দ দিতে পারলেই সে নিজেকে ধন্ত মনে ক'রত। বিজয়া এখন একথা অস্বীকার ক'রতে পারে না যে, তার মনে হ'ত—সে এমনি সেতার বাজিয়ে চলুক রাতের পর রাত। নীরব জোছনায়, ফুলের সুবাসে, সুপ্ত ধরণীতে। শুধু রবিদা' তার পাশে থাক্। রবিদা' তার কোনদিন যাবে না। সে রবিদা'কে যেতে দেবে না। তার জগৎ রবিদা'কে নিয়ে—রবিদার বিদ্যা, রবিদার প্রতিভা, রবিদার কাল্‌চার—সেখানে সে আর রবিদা, রবিদা আর সে।

শেষ ঝংকার তুলে সেতার থেমে যেত। রবিদা বলত "অপূর্ব্ব"

"আমি কি ভাবছিলুম জানিস্ বিনু?"

"কী রবিদা?" বিজয়া উৎসুক হ'য়ে ওঠে।

"ভাবছিলুম আমরা যেন নিরুদ্দেশের পথে চ'লেছি সুরের তরী বেয়ে। কত নদী, পাহাড়, মরু পার হ'য়ে চ'লেছি। চ'লতে চ'লতে শেষে পৌঁছলুম এক আলোর দেশে। সেখানে শুধু আলো আর আলো। রাত নেই—শিশির নেই—কুয়াসা নেই। সেখানে এক শাদা পাহাড়ের কোলে রঙ্গনী নদীর তীরে আমরা বাঁধব কুটীর। তুমি বাজাবে সেতার, আমি তুলে আনব ফুল।"

বিজয়ার চোখ দুটী ভরা-নদীর মত ছল ছল ক'রে উঠত। রবিদা'র আঙুলের আংটীটা ঘোরাতে ঘোরাতে বিজয়া বলত "তোমার কল্পনা অপূর্ব্ব রবিদা। তুমি এটাকে কবিতার রূপ দাও। কবিতা হিসেবে এটা হবে অনবদ্য।"

রবি যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ শেষ ক'রে লক্ষ্ণৌ কলেজের প্রফেসারী নিয়ে চ'লে গেল, সেদিন বিজয়া যে রাত্রে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছিল একথা সে ভুলবে না কোনদিন। যাবার সময় রবিদা বলেছিল "বিজু, এখন থেকে তোমার আর আমার মধ্যে উঠল সময় আর পথের ব্যবধানের পাঁচিল। এই পাঁচিল টপ্‌কে আমাদের দেখা হবে বছরে দুবার কি একবার। তখন আমরা পরস্পর নতুন। কিন্তু সেই নতুনের মাঝখান থেকে খুঁজে বার করব আমাদের পুরাণকে।" বিজুর একখানা হাত ধরে একথা বলেছিল রবি। বিজয়া চোখের জল চাপা দিতে তাড়াতাড়ি ঘরে চ'লে গিছল।

বাবার কাছ থেকে বিজয়া রবিদার খবর পায়। সে নাকি প্রফেসার হিসেবে নাম ক'রেছে বিস্তর। বিয়ে এখনও করেনি, ব্যাচিলর থাকবে নাকি বলেছে।

বিজয়া উদ্গত অশ্রু রোধ করে।

কী পরিবেশ থেকে কী পরিবেশেই না এসে প'ড়েছে বিজয়া। সহর আর পাড়াগাঁ—অনেক তফাৎ। আচারে, ব্যবহারে, সভ্যতায়। পাড়াগাঁয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের—এমন কি অপেক্ষাকৃত ধনীর ঘরের বউকেও অবশ্যই কাজ ক'রতে হবে। কাজ না জানা যেন তার মহা অপরাধ। না জানার জন্য শুধু যে সেই দোষী তা নয়—মাতা পিতাকেও দোষ দেতে হয়। এ অভিজ্ঞতা বিজয়ার ছিল না, এখন হ'য়েছে।

বিজয়া যেবার প্রথম ঘর ক'রতে এল শ্বশুর উমানাথবাবু সান্ধ্যাহ্নিক আহারের পর বিজয়াকে ডেকে বল্লেন "তামাকটা সেজে কাঠের উনুন থেকে আগুনটা নিয়ে এসত মা।' বিজয়া তামাক কখনও সাজেনি, তামাক সাজার স্বপ্নও সে কখনও দেখেনি। শ্বশুরের কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। যেন একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। যা হোক ক'রে সে তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে দিলে। উমানাথবাবু দু' একবার টেনে গুড়গুড়ির নলটা রেখে দিয়ে বল্লেন "নাঃ পারলে না মা, একটুও ধোঁয়া বেরুল না। বৌমার বাবা ত আর তামাক খান না, কিন্তু তাঁর খাওয়া উচিত।" বিজয়া বুঝতে পারে না, যদিও বা তার বাবা খেতেন তবু তাঁকে কেন তামাক সাজতে হবে!

ননদ কল্যাণী বলে "তোমার বরু ঐ সব বাবা, বৌদিকে বলবে তামাক সাজতে, পান সাজতে বল্লেও বা কথা থাকত। তোমার বাকী খাজনা, হাল-বকেয়া ক'রে ক'রে মাথাটা বিগড়েছে দেখছি। চল বৌদি খাবে চল। বাবা যেন কী।"

শাশুড়ী বৌ ক'রেছেন তাঁর কষ্টের লাঘব হবার জন্য। হাঁড়ি হেঁসেলের ভার বৌয়ের গলায় তুলে দিতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এতদিন হাঁড়ি হেঁসেল ঠেলে তিনি ক্লান্ত। এখন বৌকে সেখানে বসিয়ে পানদোক্তা খেয়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্পগুজব করাতেই তাঁর বেশী আনন্দ। নাতি-নাতনীকে কোলে নিয়ে পাড়া বেড়ান তাঁর কাম্য।

কিন্তু বিজয়া ত কখনও রাঁধে নি। মায়ের সংসারে তাকে ত বিশেষ কোন কাজ ক'রতে হ'ত না, রান্না ত দূরের কথা। মা খেয়ে উঠলে মাকে পান সেজে দিত। বাবাকে স্কুল যাবার সময় কৌটোয় মশলা ভরে দিত। এখানে সে রাঁধবে কেমন ক'রে!

দ্বিতীয়বার ঘর ক'রতে এসে বিজয়ার এ অভিজ্ঞতা হ'ল।

শাশুড়ী হরসুন্দরী একদিন বল্লেন—"বৌমা আমি ঠাকুরঘর থেকে আস্‌ছি, তুমি ভাতটা দেখো। কিন্তু বিজয়া জল কমবেশী বুঝতে না পেরে ভাতটাকে গলিয়ে থরিয়ে ফেলেছিল। কেন্ গালতে কিছু কেন ভাতের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল!

রায়েদের বড় গিন্নী বিকেলে বেড়াতে এলে হরসুন্দরী ঠেঙ্ ছড়িয়ে ব'সে বলতে লাগলেন—"কী বউই হ'য়েছে ভাই, ভাত চাপিয়ে ঠাকুর ঘরে গেছি—এসে দেখিনা পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে আঙার ক'রেছে। ওর মা কী ভাতটাও রাঁধতে শেখায় নি গা। লেখাপড়া নিয়ে আমি যেন ধুয়ে খাবো!"

একটু থেমে বললেন, "আমাদের যে সময় বিয়ে হ'য়েছে সে সময় বিয়ে হ'লে অমন মেয়ের তিনটে ছেলে হ'ত!"

কল্যাণীর তখন বিয়ে হ'য়ে গেছে। বিজয়ার পক্ষে কেউ তখন বলবার নেই। উকীলবিহীন আসামীর মত সে নিরুপায়।

স্বামী ভোলানাথকে নিয়ে বিজয়া সুখী হ'তে পারে নি। ভোলানাথের বিদ্যে আছে বটে, কিন্তু কাল্‌চার মোটে নেই। মানসিক রুচির কিছুমাত্র-পরিচয় পাওয়া যায় না। সুন্দরের শিল্পের প্রতি কোন রকম অনুরাগ নেই। অনুরাগ

শুধু আপনার শরীরের দিকে। কবিরাজী চিকিৎসাই তার মতে সবচেয়ে ভাল। ওষুধ যদি খেতেই হয় তবে গাছগাছড়ার ওষুধই একমাত্র বিধেয়। বাড়ীর অসুখ-বিসুখের প্রতি তার কোন লক্ষ্য নেই। গাছগাছড়ার ওষুধ যদি খেতে চায় তবে সে রুগীকে দেখবে নইলে নয়। পোষাকের প্রতি লক্ষ্য নেই, কালো কালোই সই। রবীন্দ্র সঙ্গীত ভাল লাগে না, ভালো লাগে খেয়াল। কাব্য ভালো লাগে না, ভালো লাগে গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা। তাই বিজয়ার কাছে সে যেন একটা ভারী পাথর, যার গুরুত্ব আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই।

বিজয়া কাব্য ভালবাসে। কবি সে। সে আশা করে—ভোলানাথ প'ড়বে রবীন্দ্রনাথ, শোনাবে তাকে—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে সেকথা কি গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে তোলেনি,
তারই স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী।

কিংবা—বিজয়াকে বুকে টেনে নিয়ে ব'লবে—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার
কতরূপ ধ'রে পরেছ গলায় নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে বিজয়া ভোলানাথের কাছে কারণে অকারণে কতবার গেছে, অফিসের খাতাপত্র দেখতে দেখতে তার কি একবারও মনে হয় নি এত সুবাস কোথা হ'তে এল! বিজয়ার অলক্ষ্যে চুপি চুপি গিয়ে মাথার কাপড়খানি খুলে দেখতে পারত না কবরীজড়িত বেলফুলের মালাটী। আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে বলতে পারত না—

অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিও।

ভোলানাথ একটা নিরেট ভারী পাথর।

বিজয়া শ্বশুরবাড়ীতেও তার প্রিয় সেতারটা নিয়ে এসেছিল। সেতারটা না বাজিয়ে বাজিয়ে ধুলোবালি প'ড়ে বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছিল। তারে মরচে ধরছিল। একদিন ছুটীর দিনে বিজয়া সেতারটাকে ঝেড়ে মুছে তারগুলো টেনেটুনে ঠিকঠাক করল। একটা তারে ঝঙ্কার দিলে। সেতারের যেন বেদনাতুর মনের গোপন বাণী প্রকাশ পেল। সে যেন বলতে চায়—"আজি কত কথা বলতে চাই, কিন্তু তুমি ত আমাকে বলাও নি। আমি যে পাষাণ হয়ে গেলুম।"

ভোলানাথ বললে—'সেতারটা কি শুধু দেখাতেই আনলে, একদিনও ত বাজালে না'।

"বাজাতে ত কোনদিন বলনি।"

"আজ বাজিয়ো"

বিজয়া আজ ভেবে পেলে না—কেমন ক'রে ভোলানাথের নীরস নিরুদ্যম উদাসীন ভেবে এসেছে তা কি সে নয়? বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রণয়লেখার কলকল্লোল তা হ'লে ভোলানাথের এখনও আছে। তবে কি তা ক্ষুদ্র?

বিজয়া বলে 'আচ্ছা।'

দীপ্ত চাঁদিনী পৃথিবীর বুকে প্লাবন এনে দিয়েছে। আকাশ ও মাটীর মাঝে শুভ্র জ্যোৎস্না রচনা ক'রেছে আলোকের জ্যোতির্ম্ময় সেতু। নীরব প্রকৃতি—নিঝুম বিশ্ব—নিরালা ছাদ। 'যৌ কথা কও' পাখীর অশ্রান্ত ডাকে বিজয়ার বুকের বীণা কথা ক'য়ে উঠল। সেতারের তারে পড়ল ঝঙ্কার। বিজয়া বাজালে বেহাগ।

বিজয়া ডাকলে—'শুনলে'

নিদ্রিত ভোলানাথ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বিজয়া।

নাঃ, বিজয়া আর ভাববে না। সজনাগাছের আড়াল থেকে চাঁদখানা এসে প'ড়েছে সুপুরিগাছের মাথায়। অনেক ভেবেছে সে। আজকের রাত্তিরটা তাকে জাগিয়েছে। অতীত আজ ফিরে এসেছে তার কাছে, তাতে বেদনার জড়তা নেই, আছে শুভ্রতার পরশ। সে আজ লিখবে, কবিতা সে বহুদিন লেখেনি—আজ সে লিখবে।

বিছানায় স্বামী নিদ্রিত। কচি ছেলেটী ঘুমোচ্ছে। বিজয়া বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়ীর পেছনটায় কলাগাছের বাগান। একটা গাছের মধ্যে কচি পাতাটার পরে জ্যোৎস্না পড়ে রুপালী বধূর মত দেখাচ্ছে। মৃদু বাতাসে কলাগাছের পাতাগুলো দুলছে। তাদের ছায়া কাঁপছে মাটীতে দুরাশার স্বপ্নের মত। একটা কোণে হ'য়েছে দুতরো ফুলের গাছ। ফুল ফুটেছে অনেকগুলো। গন্ধে ভরপুর ক'রেছে জায়গাটা। ভারী মিষ্টি লাগলো গন্ধটা বিজয়ার। সে খাতা পেনসিল নিয়ে বসলো। লিখে চ'ললো—

ভুলে যাওয়া মোর স্মৃতিখানি আজ কেমনে জাগিল মনে
জোছনাধবল, বর্ষাসজল শ্রাবণের তীক্ষ্ণ ক্ষণে,
নীরব চাঁদিনী পৃথিবী ছড়ায়ে অসীমে দিতেছে পাড়ি
বেদনা বিধুর প্রকৃতি আজিকে—

খোকা ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল। কলম বন্ধ করলে বিজয়া। চেয়ে রইল সাদা আকাশের দিকে। নীল তারকার আলোটা কেঁপে উঠেছে থর্—থর্।

সাময়িকী

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিবৃতি—

গত ৩১শে অক্টোবর একই দিনে দিল্লীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের এসিয়া সম্মিলনে সরবরাহ মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতার পূর্ত ও শক্তি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত গ্যাডগিল ভারতীয় তুলা সমিতির বার্ষিক সভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয়গণকে বিবিধ শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা এবং অধিক-পরিমাণে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা এবং সে বিষয়ে সরকারী চেষ্টার কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুত গ্যাডগিলও সকলকে অধিক পরিমাণে জিনিষ উৎপাদনের দ্বারা দেশের অভাব পূরণে উৎসাহী হইতে উপদেশ দেন। উৎপাদন কম বলিয়াই আজ দেশের সর্ব্বত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা যদি লাভের পরিমাণ কমাইয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তবে দেশে অভাবও থাকিবে না, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইবে না। শ্রীযুত গ্যাডগিল দেশের সকল বড় বড় শিল্প জাতীয়-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সত্বর দেশকে উন্নত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদও বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কর্ম্মী আমদানী করিয়া এ দেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

কাশ্মীরের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান—

'কাশ্মীর রাজ্য যাহাতে পাকিস্থানে যোগদান করে, সে জন্য পাকিস্থানের নেতারা প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের মহারাজাকে সে বিষয়ে সম্মত করাইতে না পারিয়া তাঁহারা কাশ্মীর আক্রমণ করেন। মহারাজা পূর্ব্ব হইতে উহার সম্ভাবনা বুঝিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাকিস্থানী সৈন্যরা কাশ্মীর আক্রমণ করিলে মহারাজা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাহায্যপ্রার্থী হন ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা যাইয়া পাকিস্থানী আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এখন কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে ও মহারাজা যোগদানের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কাশ্মীরে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠনে মহারাজা উদ্যোগী হইয়াছেন ও সেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর সহযোগিতায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। সেখ আবদুল্লা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন—কাশ্মীর বিপন্ন। মাতৃভূমি রক্ষা করা প্রত্যেক কাশ্মীরবাসীর প্রথম কর্ত্তব্য। কাশ্মীর আক্রমণের অর্থ কাশ্মীরের জনগণকে পাকিস্থানে যোগদানে বাধ্য করা। কোন কাশ্মীরীই এই জবরদস্তি সহ্য করিবে না।

সেণ্ট্রাল হুইপিং ক্লাবের স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা। উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল গোপালাচারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত ফটো—ডি-রতন

ভারতে বাণিজ্য জাহাজের উন্নতি—

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ গত ১৮ই অক্টোবর বোম্বায়ে এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে বাণিজ্য জাহাজ-সমূহের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির আয়োজন চলিতেছে। ভারত এই ব্যাপারে পিছনে পড়িয়া আছে। ভারতের বাণিজ্য-জাহাজের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, জাতীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটানও উহাদের পক্ষে অসম্ভব। বৃটিশের সহিত এ বিষয়ে বৃথা আলোচনায় কালক্ষেপ না করিয়া নিজ বাণিজ্য-জাহাজ বৃদ্ধির জন্য ভারতের অবিলম্বে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ভারতকে তাহার অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে দেশরক্ষার জন্য শক্তিশালী দৌবহর ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক বাণিজ্য-জাহাজ থাকা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকার চেষ্টিত হইলে টাকার অভাব মোটেই হইবে না।" শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ জাহাজ ব্যবসায়ী। তাঁর এই সকল কথা সকল প্রদেশের ব্যবসায়ীদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পঞ্জাব-সরকারের নূতন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যেবচন্দ্র বক্সর

নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিত প্রস্তাব—

১৮ই অক্টোবর দিল্লীতে অধ্যাপক এন্-জি-রঙ্গের সভাপতিত্বে গ্রামাঞ্চল অধিবাসীদের এক সম্মিলনে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানে দেশের খাদ্যের অবস্থা এবং একদিকে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও অপরদিকে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে লোভী-ব্যবসায়ী, কারখানা-মালিকদের ব্যাপক ও নির্লজ্জ চোরাকারবার প্রভৃতির জন্য সমগ্র সমাজ যে নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিতেছে তাহা ঘুচাইয়া নিয়ন্ত্রণকারী আমলাদের দুর্নীতি বন্ধ করা প্রয়োজন। সে জন্য বর্ত্তমানে যে ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে তাহা রহিত করিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্য ব্যবস্থা মারফত খাদ্য ও বস্ত্রের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি ও নিখিল ভারত কুটীর শিল্প সম্মেলন আহ্বান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বৃহৎ শিল্পের সহিত কুটীর শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। প্রস্তাবটি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নূতন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অমরাপ্রসাদ চৌধুরী

ফটো—ডি-রতন

গোরক্ষা ও স্বামী করপাত্রীজি—

স্বামী করপাত্রীজি গোবধ নিবারণ আন্দোলন উপলক্ষে মথুরাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গোবধ বন্ধের দাবী লইয়া গত ২৮শে এপ্রিল হইতে দিল্লীতে ধর্ম্মযুদ্ধ চলিতেছে। তাহাদের দাবী ৫টি—(১) অখণ্ড ভারত (২) গোবধ নিবারণ (৩) ধর্ম্মবিরোধী আইন প্রত্যাহার (৪) মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা (৫) বিধান পরিষদে হিন্দুশাস্ত্রবিশ্বাসী প্রতিনিধি প্রেরণ।

এই দাবী জানাইতে যাইয়া বহুলোক কারাবরণ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে হিন্দুদিগের এই সকল দাবী রক্ষার জন্য হিন্দুমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী
ফটো—ইউনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

লোকাপসারণ—

গত ২০শে অক্টোবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ঘোষণা করিয়াছেন—পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে প্রায় পৌণে ২৩ লক্ষ লোক এবং পাকিস্থানে সাড়ে ২৪ লক্ষ লোক স্থানান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের ৫ লক্ষাধিক লোক এখনও আশ্রয় শিবিরে আছে। এখনও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে ১৮ লক্ষ লোক ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব হইতে ২৪ লক্ষ লোক স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সিন্ধু হইতে প্রতি সপ্তাহে ১০ হাজার লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। দিল্লী হইতে ৫০ হাজার মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। উহার পরিণাম কি তাহা চিন্তা করাও কঠিন।

কলিকাতায় ডাকাতি—

কলিকাতায় প্রায়ই দিবালোকে ডাকাতি হইতেছে। গত ২০শে অক্টোবর বাণীগঞ্জের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পে-অফিস হইতে ৯৭ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীধাণি বাজারের নিকট একটি কাপড়ের দোকান হইতে ২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ
প্রফেসর কে-এন সেনগুপ্ত ফটো—জ্ঞানবিহারী মুখোপাধ্যায়

গভর্ণরদের বেতন—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রাদেশিক গভর্ণরের বেতন ৬৬ হাজার টাকা হইবে স্থির হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের লাট প্রাসাদের বার্ষিক খরচ ৮৪ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরদের বেতন বার্ষিক ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ও বিহারে ১লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ৭২ হাজার টাকা এবং আসাম, সীমান্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও সিন্ধুতে বার্ষিক ৬৬ হাজার টাকা ছিল।

কলিকাতায় করলা সমস্যা—

কিছুদিন হইতে কলিকাতায় করলা ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলীর জন্য প্রত্যহ ৮৮ গাড়ী

করলা প্রয়োজন ; মালগাড়ী ও এঞ্জিন চালকের অভাবে প্রত্যহ মাত্র ২৬ গাড়ী করলা আসিতেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হইতে ৪৪ গাড়ী করলার ব্যবস্থা হইয়াছে। চোরা-কারবার বন্ধ করার জন্য সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রত্যেক পরিবারকে রেশন কার্ড দেখাইয়া করলা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

মহীশূরের জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা—

মহীশূরের মহারাজা রাজ্যের জনগণের মতানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন —(১) কে-সি-রেড্ডী প্রধান মন্ত্রী (কংগ্রেস-সভাপতি) (২) এচ-সি দাসাপ্পা—রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী ও ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-সভাপতি (৩) কে-টি-বি আয়েঙ্গার, ভূতপূর্ব্ব

সিনেট হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রদর্শনীর শহীদ-বেদী ফটো—ডি-রতন

এশিয়া শ্রমিক সম্মিলন—

২৭শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে গণপরিষদ ভবনে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের এশিয়া সম্মিলন আরম্ভ হয়। এশিয়ার এই ধরণের সম্মিলন এই প্রথম। এশিয়ার ২০টি দেশের ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগদান করেন। ভারত সরকারের শ্রম-সচিব শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সম্মেলনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন। এশিয়ার শ্রমিকদের সমস্যার কথাই বিশেষ ভাবে সম্মিলনে আলোচিত হইয়াছে।

কংগ্রেস-সভাপতি (৪) এচ-সিদ্ধবা—ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি (৫) টি-সারিয়াপ্পা—কংগ্রেস কর্ম্মী (৬) আর-চেন্না গিরাদিয়া কংগ্রেস কর্ম্মী (৭) মহম্মদ সেরিফ—দীর্ঘনেতা (৮) ডি-এচ চন্দ্রশেখরিয়া—ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (৯) সুব্রহ্মণ্য চেট্টি—বণিক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ২৪শে অক্টোবর তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা—

গত ২০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রিতে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলের উপর আড়াই ঘণ্টা ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে। স্মরণীয় কালের মধ্যে ঐ অঞ্চলে ঐরূপ ঘূর্ণিবাত্যা কখনও দেখা যায় নাই। প্রায় ঐ সময় বর্ম্মি

মাইল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বন্যার ক্ষতি অপেক্ষা এবারের ক্ষতি অনেক বেশী।

আমেদাবাদে কাপড় মজুত—

যানবাহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আমেদাবাদে ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫০ হাজার গাঁট কাপড় মজুত রহিয়াছে। অথচ পূজার সময় বাঙ্গালা দেশে বহু দোকানে কাপড় আসে নাই, ফলে স্থানীয় ব্যক্তিগণও কাপড় পায় নাই।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল
ফটো—জগদ্বিরতন মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় সমিতি ও গণপরিষদ—

১৫ই নভেম্বর হইতে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা এবং ১৭ই নভেম্বর হইতে ভারতীয় গণপরিষদের সভা বসিয়াছে। গণপরিষদ এবার ব্যবস্থা পরিষদের কাজ করিতেছে। প্রথমেই পরিষদের স্পীকার নির্ব্বাচিত হইবে এবং ২০শে নভেম্বর রেলবাজেট ও ৬ দিন পরে সংশোধিত সাধারণ বাজেট পেশ করা হইবে। স্বাধীন ভারতে আয়ব্যয় স্থির করা কঠিন সমস্যা হইয়াছে।

নূতন পাবলিক সার্ভিস কমিশন—

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ৩ জন সদস্য লইয়া নূতন পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করিয়াছেন—(১) অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস বীরেন্দ্রকুমার বসু (২) ডাক্তার নীলরতন ধর ও (৩) অধ্যাপক জে-পি নিয়োগী।

বাঙ্গালায় আলু আমদানী—

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিসভা ব্রহ্মদেশ ও সিমলা হইতে ১লক্ষ ৫২ হাজার মণ এবং দার্জ্জিলিং হইতে ৮০ হাজার মণ আলু আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন নূতন আলু উঠিবে—গত ২ মাস বাঙ্গালার লোক সের দরে আলু কিনিতে বাধ্য হইয়াছে—এ সময়ের মধ্যে আলু আমদানী হইলে লোক উপকৃত হইত।

খ্যাতমান কংগ্রেস নেতা ও গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

কংগ্রেস ও মুসলমান নেতা—

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নিম্নলিখিত ১০জন মুসলমান নেতা গত ১৯শে অক্টোবর এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—কংগ্রেসই ভারতের সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আজ মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করিয়া একযোগে কংগ্রেসে যোগদান করাই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র কর্ত্তব্য। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিলেই সাধারণভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ সম্ভব। স্বাক্ষরকারীদের নাম—(১) সৈয়দ নৌসের আলী (২) আবু আমেদ (৩) জাহাঙ্গীর কবীর (৪) চৌধুরী আসফ আলি বেগ (৫) আবদুল মালেক (৬) সিরাজুদ্দীন আমেদ (৭) এ-কে-কাসিম চৌধুরী (৮) অস্তিয়ার রসিদ (৯) মৌলনা আহমদ আলি (১০) আতওয়ার রহমন।

দেশরক্ষা বাহিনী গঠন—

সৈন্যদল ছাড়াও বিলাতের হোমগার্ডের মত এ দেশে যাহাতে সর্ব্বত্র দেশরক্ষা বাহিনী গঠিত হয়, সে জন্য ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ নীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এ ভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করিলে কম অর্থব্যয় হইবে ও দেশবাসী সকলে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনের সময়ে দেশরক্ষা কার্য্যে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে। অধিক সৈন্য বাহিনী রাখিয়া ব্যয় না বাড়াইয়া এইভাবে দেশের সকলকে সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আজ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

১লা নভেম্বরের বাজার মিছিল বহুদিন বাদওস্ত
ফটো—ইণ্ডিয়ান আর্ট গ্যালারী

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৩১শে মে তারিখে ভারত ত্যাগ করিয়া ৫ মাস কাল লণ্ডন, আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া গত ১লা নভেম্বর সকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে পদে যোগদান করিবেন কি না, তাহার এখনও স্থিরতা নাই। তিনি ৩রা নভেম্বর দিল্লী গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। আমেরিকায় ভারত-কথা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সুভাষ বসুর্লাট—

ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন বিলাতে রাজকুমারীর বিবাহ উৎসবে যোগদানের জন্য ১২ই নভেম্বর ১৫ দিনের ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রী চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী অস্থায়ী বড়লাট হইয়াছেন এবং সার বি-এল-মিত্র শ্রীযুত রাজা-গোপালাচারীর অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালার গভর্ণরের কাজ করিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমারী ইন্দিরা সরকার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের কন্যা কুমারী ইন্দিরা সম্প্রতি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সরকারী বৃত্তি পাইয়া প্যারিসে গিয়াছেন। তিনি তথায় সমাজ, সাহিত্য ও লোকমঙ্গল বিষয়ে লেখাপড়া করিবেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ফরাসী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁহার অন্যতম কার্য্য হইবে। ইতালী দেশের রোমনগরে সংঘে তাহার জন্ম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফরাসী সাহিত্যে তিনি এম-এ পাশ করেন—বাঙ্গালা, ইংরাজি ও জার্ম্মাণ সাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসাল ওয়ার্ক ডিপ্লোমা ক্লাসেও অধ্যয়ন করিয়াছেন।

তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হউক, আমরা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—

খ্যাতনামা কোবিদ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের দৌহিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাশ করিয়া

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগের অধীনে প্রাচীন ভারত ও সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি শ্যাম দেশের 'থাই ভারত সংস্কৃতি সমিতি'র নিমন্ত্রণে ব্যাঙ্কক গিয়াছেন। তথায় তিনি চুড়াসংকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে অধ্যাপনা করিবেন ও 'অহিংসা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা বিষয়ে স্থানীয় কর্ম্মীদিগকে সাহায্য করিবেন। ভারত ও শ্যামদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রচার কার্য্যই তাঁহার তথায় প্রধান কার্য্য হইবে। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

জুনাগড় সমস্যা—

জুনাগড় কয়েকটি হিন্দুরাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হইলেও উহার নবাব পাকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত করায় জুনাগড় রাজ্যের প্রজারা একযোগে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে প্রজাগণই নবাবের প্রাসাদ ও তাহার চারিদিকের বহু গ্রাম দখল করিয়া তথায় একজন নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছে। নবাব সপরিবারে করাচীতে পলায়ন করিয়াছে। পাকিস্থানী সৈন্যরা এখনও সিন্ধু সীমান্তে আসিয়া জুনাগড়ে অশান্তি সৃষ্টির হুমকী দিতেছে। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় প্রভৃতি রাজ্যের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সমস্যা লইয়া পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে ও উহা ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী—

এই নভেম্বর মাসেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়া এক বৎসর কাল চলিবে। আজ স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতার কথা দেশের সর্ব্বত্র আলোচিত হওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস, গ্রামে গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি-আন্দোলনের কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল—

গত ৩১শে অক্টোবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার পেটেলের ৭২তম জন্মদিনের উৎসব ভারতের সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছে। সর্দ্দারজীর মত কর্ম্মীর সংখ্যা ভারতে খুবই কম। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার পেটেল যে ভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত করিতেছেন, তাহা অভিনব ও অসাধারণ।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি ডক্টর মেঘনাদ সাহা ফরাসী দেশে আন্তর্জ্জাতিক আণবিক সম্মিলনে যোগদানের জন্য গত ৩রা নভেম্বর প্যারিস গিয়াছেন। অধ্যাপক আইনষ্টাইন সেই সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবেন। অধ্যাপক সাহা সম্মিলনের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিদর্শন করিয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন

দুর্নীতি দমন চেষ্টা—

পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে দুর্নীতি দূর করিবার উপায় নির্ণয়ের জন্য মিঃ আর-এস-কৃষ্ণস্বামী আই-সি-এসকে এক বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ কৃষ্ণস্বামী এ বিষয়ে অনুসন্ধান

করিয়া প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। দেশ হইতে দুর্নীতি দূর না হইলে দেশবাসীকে রক্ষার এখন আর অন্য উপায় নাই।

ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা জেলার খ্যাতনামা দেশসেবক ডাঃ শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই নভেম্বর ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি নিখিল ভারত মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট এসোসিয়েসনেরও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার দ্বারা ২৪ পরগণা জেলাবাসীরা উপকৃত হইবেন।

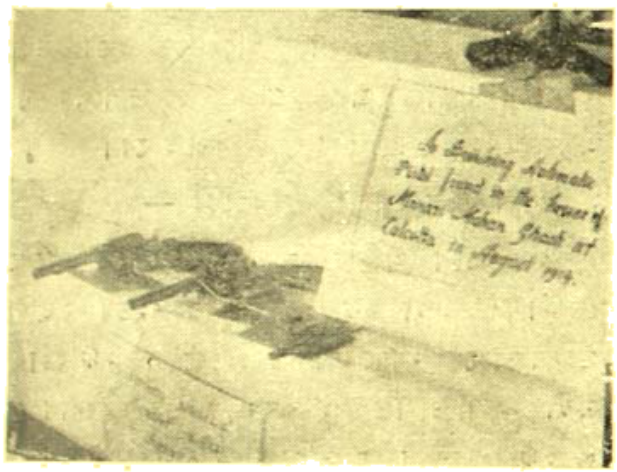

১৯২৪ সালে কলিকাতায় মুরারীমোহন ঘোষের গৃহে প্রাপ্ত কয়েকটি অটোমেটিক পিস্তল ফটো—ইণ্ডিয়া সেন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

২রা অক্টোবর এলাহাবাদের বিচারপতি বিভূতিভূষণ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আগামী বড়দিনের ছুটীতে ২৬শে ডিসেম্বর হইতে তিনদিন ধরিয়া এই সম্মিলনের ২৫ বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাইতে অনুষ্ঠান হইবে স্থির হয়। এসে-মাষ্টার শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মিত্র ও ব্যবসায়ী শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা) এর প্রস্তাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিবার জন্য ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ তারাচাঁদকে অনুরোধ করা হয় এবং এই অধ্যাপক পদের ব্যবস্থার জন্য বিচারপতি মল্লিক মহাশয় ও ইণ্ডিয়া প্রেসের শ্রীযুক্ত হরিকেশব ঘোষ মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

বিস্কুটের অভাব—

গত কয়েক মাস যাবৎ কলিকাতায় বিস্কুটের দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় যে বিস্কুটের পাউণ্ড এক টাকা ছিল, এখন চোরা বাজারে তাহা তিন টাকা পাউণ্ড দরে বিক্রীত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের বহু বিস্কুটের কারখানা আটার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে বহু সহস্র শ্রমিক বেকার হইয়াছে। দরিদ্র শ্রমিকগণ চায়ের সহিত বিস্কুট খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিত, তাহার কোন উপায় নাই। যে ভাবে সরকার আটা সরবরাহ করেন, তাহারও প্রশংসা করা যায় না। আমরা এ বিষয়ে সরকারী সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, এখন বাজারে আটা আসিয়াছে, কাজেই কর্ত্তৃপক্ষ বিস্কুটের জন্য বাঙ্গালা দেশে উপযুক্ত আটা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া বাজার হইতে বিস্কুটের অভাব দূর করিবেন ও যাহাতে বিস্কুটের ব্যবসায়ে চোরাবাজার না চলে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

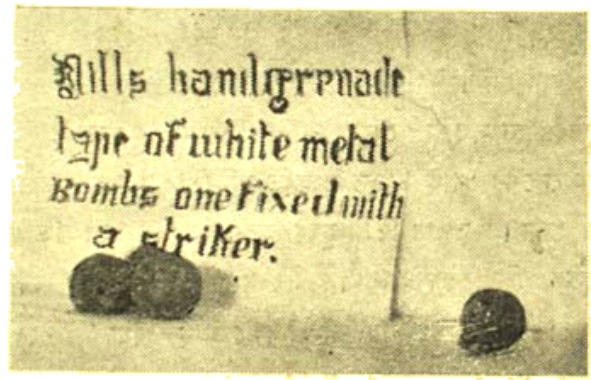

পুলিসের হেপাজাতে স্থিত কয়েকটি হাত বোমা ফটো—ইণ্ডিয়া সেন

ত্রিপুরা ছাত্র ও সংস্কৃতি সম্মিলন—

গত ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট কুমিল্লা মহেশ প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা জেলা ছাত্রসম্মিলন ও সংস্কৃতি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ছাত্রসম্মিলনে এবং খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল সংস্কৃতি সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্ত্তী ছাত্রসম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও ছাত্র-নেতা শ্রীনীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন

গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক বিমলরঞ্জন গুহ তাঁহার ভাষণে ছাত্রগণকে মাতৃভূমির সেবায় ও গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য সংবদ্ধ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কলিকাতার অতিথিদিগকে নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

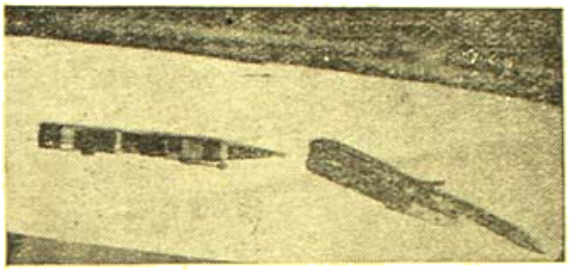

পুলিশের নিকট লক্ষিত দুই প্রকারের রিভলবার ফটো—শ্রীপান্থ সেন

রেশনে খাদ্য পরিমাণ বৃদ্ধি—

পশ্চিম বঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে আগামী ২৪শে নভেম্বর হইতে সাপ্তাহিক রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৪ সের ৩ ছটাকের স্থানে ২ সের ১০ ছটাক করিবেন। মধ্যে রেশন খাদ্য কমাইয়া ১ সের ১২ ছটাক করার লোকের অসুবিধার শেষ ছিল না। যাহাতে ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য স্থায়ীভাবে প্রদত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে লোক উপকৃত হইবে।

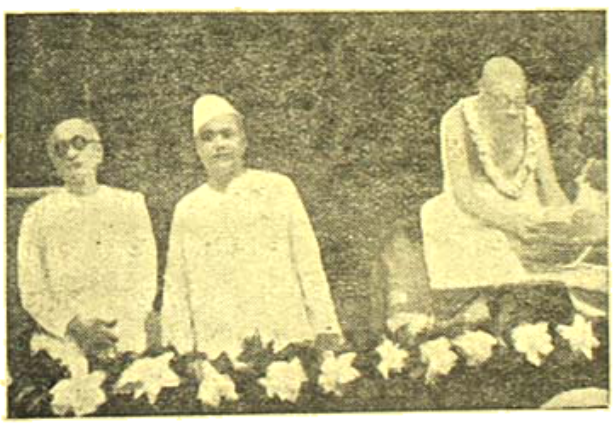

পড়ের মাঠে শান্তি সেনাবাহিনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শান্তিসভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী ফটো—শ্রীপান্থ সেন

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ সৃষ্টি—

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাশীতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ বাঙ্গালীর বাস। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম-এ পর্য্যন্ত পাঠ ও পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি বহুদিন যাবত চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার রাধাকিষণ স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা যদি এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন তাহা হইলে স্যার রাধাকিষণ আর এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিয়া ৪০০-৭০০৲ মাসিক মাহিনার একটি বাঙ্গালার অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করিবেন। যদি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার হইতে লক্ষ টাকা প্রদান করেন উক্ত অধ্যাপক পদটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে "রবীন্দ্র অধ্যাপক" রাখা হইবে। এই পদটির জন্য লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালার মর্য্যাদাই বৃদ্ধি পাইবে।

আরিয়াদহে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—

আরিয়াদহ (২৪পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের উদ্যোগে সম্প্রতি ভাণ্ডার ভবনেই একটি মাতৃ মঙ্গল প্রতিষ্ঠান

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার মাতৃমঙ্গলের ভিত্তিস্থাপন

নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিমুক্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন ও মেয়র জেনারেল ডাঃ অমিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে মাতৃ-

মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের অভাব অত্যন্ত অধিক এবং অনাথ ভাণ্ডারের প্রাণস্বরূপ খ্যাতনামা কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া সে অভাব দূর করার ব্যবস্থা করায় গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যারম্ভ হইবে। অনাথ ভাণ্ডারের বিবিধ

যদি তাহা করিতে পারি—নিরন্ন দেশবাসীর দুঃখ যদি মোচন করিতে পারি তবেই স্বামীজীর আদর্শ পালন করা হইবে। অশিক্ষিতদিগকে যদি শিক্ষিত করিতে পারি, চিকিৎসার অভাবে যাহারা মরিয়া যাইতেছে তাহাদিগকে যদি বাঁচাইতে পারি তবে তাহাই হইবে স্বামী বিবেকানন্দের বড় স্মৃতি-মন্দির। স্বামীজীর আদর্শ পালন করিলে তবে দেশে প্রকৃত

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার মাতৃমঙ্গলের ভিত্তিস্থাপন উৎসব উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণ

কার্য্যের কথা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সুবিদিত। এ বিষয়ে সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে কালে অনাথ ভাণ্ডার ঐ অঞ্চলের বহু অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী—

স্বামী বিবেকানন্দের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হ'লে এক বিরাট জন-সভায় পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন—দৈনিক এক পোয়া চাউল ও আটা যাহারা পায় তাহাদের কষ্ট আমার অজানা নয়। তাহাদের মুখে অন্ন পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আজই ব্রহ্ম একথা বলার সময় আজ আসিয়াছে। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ২ শত বৎসরের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল হইতে দেশ এখনো মুক্ত হয় নাই। তাহা করিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের পদাংক অনুসরণ করিতে হইবে। মানুষের জন্য সত্যকার দরদ যদি আমাদের হৃদয়কে সিক্ত করে তাহা হইলে স্বামীজীর জন্মদিনে এখানে উপস্থিতি সার্থক হইবে।

আলিপুর আদালতে নেতাজীর প্রতিকৃতি—

আলিপুর জেলা জজের আদালত কক্ষে 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। প্রতিকৃতির দুই পার্শ্বে ভারতীয় ইউনিয়নের দুটি পতাকা শোভা পাইতেছিল।

জেলা জজ শ্রীযুক্ত এস্-এন-গুহরায় আই-সি-এস প্রতিকৃতির আবরণ মোচন করেন। প্রতিকৃতিটি বার এসোসিয়েশনের স্থনিয়ার সদস্যগণের সমিতি 'দ ইয়ার্স বর্ণার' কর্তৃক প্রদত্ত হয়। আলিপুর বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত পি-এন ব্রহ্ম বক্তৃতা প্রসঙ্গে আলিপুরে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ ও স্বাধীনতার অন্যান্য পূজারীগণের বিচারের উল্লেখ করেন।

আর-ডব্লিউ-এ-সি—

গত বৎসর আগষ্ট কলিকাতায় যখন নরহত্যার বিভীষিকা চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিতেছিল তখন মানুষের সেই অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার পরিত্রাণের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য এম্বুলেন্স বাহিনী ছিল না। একদিকে লোকের পৈশাচিক উন্মাদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে সরকারী সাহায্যের ব্যর্থতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই সময় অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া দুর্দ্দমনীয় বাধার মাঝে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই বিভীষিকাময় দিনের মাঝেই রিলিফ ওয়েলফেয়ার এম্বুলেন্স কোর এর অভ্যুদয়। ক্রমে ইহা একটি অতি কার্য্যকরী এম্বুলেন্স বাহিনীতে পরিণত হয়। আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠে একদল আত্মত্যাগী কর্ম্মী, যাহাদের নাম সমভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাই যখন নোয়াখালী হইতে আর্ত্তনাদ আসিল তখন সেই বধ্যভূমিতে আর-ডব্লিউ-এ-সির প্রথম সরঞ্জাম ঔষধ ও পথ্য লইয়া দাঁড়াইল। সেখানে আর-ডব্লিউ-এ-সি স্বয়ং মহাত্মাজীর নির্দ্দেশেই কাজ করিয়াছিল এবং শুধুই সাতশত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান করে নাই, পলায়মান অজস্র আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে নানাভাবে সাহায্য করে। নোয়াখালী হইতে এই বাহিনী সুদূর অগম্য দ্বীপ সম্বীপেও তাহার সাহায্য কেন্দ্রে দুঃস্থজনগণের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। তারপর যখন বিহারের শুভ্রাকাশ ভ্রাতৃবিরোধের কৃষ্ণ ছায়ায় পরিব্যাপ্ত হইল, তখন আর-ডব্লিউ-এ-সি কাল বিলম্ব না করিয়া দুঃস্থ প্রবেশের সাহায্যে একটা দল পাঠায়। এই দল অজস্র বাধা অগ্রাহ্য করিয়া যে সেবা কার্য্যের পরিচয় দেয় তাহার প্রশংসা করেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্ণেল মেহবুব। গত বৎসর অক্টোবরে ও এ বৎসরের মার্চ্চ মাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়ে আর-ডব্লিউ-এ-সি যথাযথ কার্য্য করে; তখন সঙ্গে ছিল সুগঠিত শক্তিশালী বাহিনী ও জনসাধারণের প্রভূত সাহায্য। হাঙ্গামা কালে যখন নানা প্রকার ব্যাধি ভীষণাকারে দেখা দেয় তখন আর-ডব্লিউ-এ-সি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তার প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকসন দিবার ব্যবস্থা করে। চট্টগ্রামের ও চব্বিশ পরগণার বন্যায় আর-ডব্লিউ-এ-সির

অধ্যাপক ইন্দুভূষণ বসু—মহাত্মাজীর সেক্রেটরী, মাই ব্যানার্জ্জি—বেলিয়াঘাটায় ইঁহার গৃহে মহাত্মাজী ছিলেন, ডাঃ মিনশা মেহতা—গান্ধীজীর চিকিৎসক ঘটে—তারক হাজরা ও পান্না সেন

সাহায্য দানের ত্রুটি হয় নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনগণের সাহায্যে এই বাহিনী সুদূর পাঞ্জাবে একটি দল পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠানে সকলের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

কুমারী চিত্রা ঘোষ—

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর এস-কে-ঘোষ

মধ্যস্থলে কুমারী চিত্রা ঘোষ

মহাশয়ের কন্যা কুমারী চিত্রা ঘোষ এ বৎসর ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সকলের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ১৯৪৬ সালে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করিয়া এক বৎসরে ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—

বেঙ্গল কেমিক্যালের চীফ কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল ডিগ্রী

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এম-এস-সি পাশ করিবার কুড়ি বৎসর পরে ডক্টরেট উপাধি পাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে কারখানার নিত্যকর্মের অবসরে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণা করিয়া ইহা ডিগ্রী লাভ এই প্রথম উদাহরণ। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়। ইনি জার্ম্মানীতে না গিয়াই জার্ম্মাণ ভাষায় এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যে, ইহার লিখিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'জার্মাণ প্রাইমার' সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও সুপরিচিত। ইনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক। আমরা শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নিবাসী রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ সুরের পুত্র শ্রীমান বিনয়কুমার সুর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবিনয়কুমার সুর

হইতে কৃতিত্বের সহিত রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস্‌সি পাশ করিয়া কে-ই-এম বৃত্তি লাভ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালোর ইনিষ্টিটিউটের বায়ো-কেমিষ্ট্রি বিভাগে গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

শোক-সংবাদ

অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৯শে অক্টোবর রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল। মুদ্রাতত্ত্বের সম্পর্কে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা ও ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপি তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া গ্রীক, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। জনহিতকর বহু কার্য্য ও বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা ও নোয়াখালী দাঙ্গার সময় তিনি আই-এন্-এ-

সি. ও হিন্দুমহাসভার হইয়া দুর্গতি নিবারণের জন্য অনেক কাজ করিয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতার নাসা অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ছিলেন।

অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমূল্যনাথ মজঃফরপুরের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখিকা স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৪০ বৎসর যাবৎ ইউরোপে বাস করিতেছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি রুশিয়ায় ছিলেন। ১৯৪১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তথায় তিনি পরলোকগমন করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট বহু অনুসন্ধানের পর এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ সারা জীবন বিপ্লবী দেশ সেবক ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা—

স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা জননায়ক মনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতার পুত্র প্রসিদ্ধ দেশকর্মী চিত্তরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা গত ৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার ৬১ বৎসর বয়সে ২৪ পরগণা আরিয়াদহ গ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের সময় তিনি পুলিস কর্ত্তৃক ভীষণভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ বসু—

কলিকাতার খেলাধূলা জগতে সর্ব্বজনপরিচিত ক্রীড়াশিল্পী বৈদ্যনাথবসু সম্প্রতি মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থায় তিনি ১৯০৬ সালে কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাবের অধিনায়কে বাঙ্গালা ফুটবল প্রতিনিধিত্ব করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পর

বৈদ্যনাথ বসু

বোম্বাই, পাতিয়ালা, বাঙ্গালোর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথ বাঙ্গালার মানের নায়কত্ব করিয়া ও অনেক করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—

বাঙ্গালার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গত ৮ই কার্ত্তিক রবিবার ৪৪ বৎসর বয়সে তাঁহার হুগলী শ্রীরামপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি

প্রায় ৩০ বৎসর কাল দেশ-সেবা করিয়াছেন ও বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। কিছুদিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মৃত্যুকালে বাঙ্গালার মন্ত্রী শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ রায়ের প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন।

পরলোকে মৃণালকান্তি ঘোষ—

অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ভক্তিভূষণ মৃণালকান্তি ঘোষ গত ২৪শে আশ্বিন শনিবার তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মৃণালকান্তি যৌবনের প্রারম্ভেই অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল উক্ত পত্রিকার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের সূচনা হইতেই তিনি উহার অংশীদার ও ডিরেক্টর হন। ১৯৩৭ সালে তিনি আনন্দবাজারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবক মৃণালকান্তি শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী সম্পাদনা করিয়া অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ 'পরলোকের কথা' হিন্দি ও ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া বৃহত্তর সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোকপ্রিয় হইয়া আছে।

মণিকা মহলানবীশ—

প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের পত্নী মণিকা মহলানবীশ ৭০ বৎসর বয়সে কলিকাতা ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গত ২৮শে

মণিকা মহলানবীশ

অক্টোবর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্থ কন্যা ছিলেন ও বহু লোকহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

স্বপ্ন

শ্রীআরতি সেন

আমরা ইতর, আমরা চাষী
আমরা কামার, আমরা ছুতোর
আমরা মেথর, আমরা মুচী
জোগা শুধুই তোমার জুতোর।
তোমার ঘরে আছে পাত্রা
এ দুনিয়ার জোগা যত,
আমার ঘরে আছে গাঁথা
জীবনভরা দুঃখশত।
তোমার আছে সুখ,
জোগাড় আছে টাকা
অভাবের চিত্র কেবল
আমার ঘরে আঁকা,
নাই অন্ন, নাই বস্ত্র, নাই সুখ, নাই স্বাস্থ্য
সকলি মিলেছি আমি তোমারে,
দেওয়ার চেয়ে নেওয়া বড়
সে কথাই তুমি বুঝাও আমারে।
জমিদারের জমি আর মহাজনের অর্থ
ধনীর আছে ধন তাই আমার জীবন ব্যর্থ,
তোমার বিদ্যা তোমার মান
সবই যে গো আমার দান—
তোলো তোমরা কেমন করে
নিয়েছ সব হরণ করে,
আক্ষেপটা থাই, তবু সান্ত্বনা পাই
স্বপ্নে দেখি এদিনের শেষ অবুরে।
তুমি যদি নাই কিছু করো
ভাঙতে পারবেনা বিধাতার বিধিরে।
ধৈর্য্য ধরি, সঙ্ঘ করি
ন্যায়ের কাছে অন্যায় হার মানবেই—
দীন দুনিয়ার মালিক সেদিন
আমার ব্যথা জানবেই।

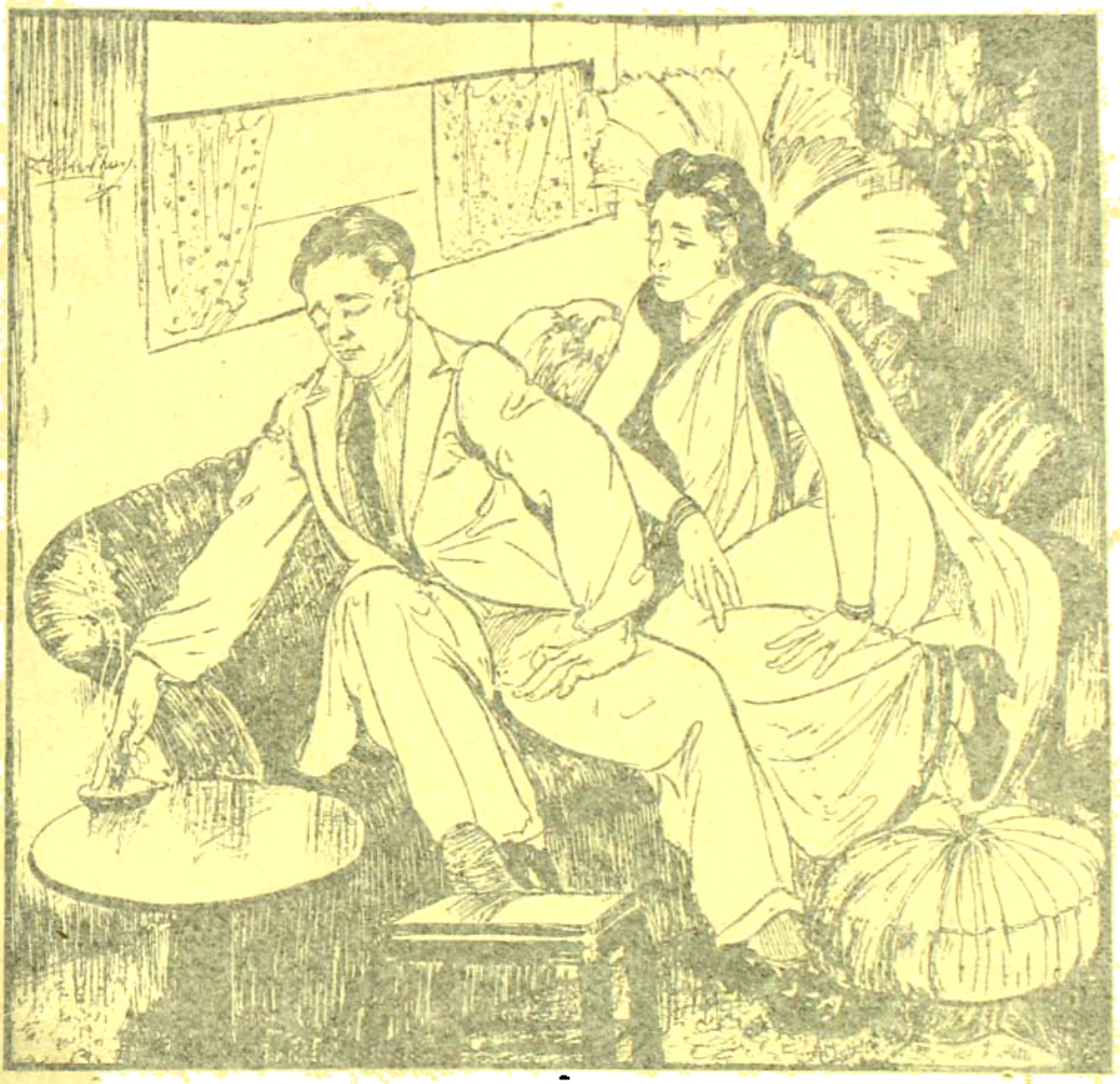

স্বামী—সেই বাচাল শিল্পী আমার ছবি দেখতে অনুরোধ করেছে। তুমি আমার হ'য়ে শিল্পপ্রদর্শনীতে যেও, আমি যেতে পারি।
আজ আমার সব কটাই হট কেলাবিট।

স্ত্রী—যেন যে সব মেয়ারিটেরা-দেখতে চাও, তারা তো কিছুতি ছুটে প্রদর্শনীতেই হাজির হবে। ওদের জন্যে সুসিজ খুঁজে বেড়ান কি তোমার নতুন কাজ?

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের নূতন সরকার গঠনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ফটো—শ্রীযুক্ত সুধীরপ্রসাদ সরকারিকারী ও শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে

খেলা ধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

প্রথম খেলা :

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া : ১৭১ (মানকাদ ৬— রানে ৫ উইকেট) ও ৭০ (৪ উইঃ)

ভারতীয় দল : ১২৭ (মানকাদ ৫৭)

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটখেলোয়ত ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের প্রথম খেলা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'ড্র' করেছে। এ খেলা হয়েছিল পার্থে। খেলাটি ১৭ই অক্টোবর থেকে ২০শে অক্টোবর এই চারদিন হ'বার কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টির জন্য খেলাটি বাধা পায় এবং নির্দ্ধারিত সময়ে খেলা শেষ না হয়ে মাত্র দেড় দিনের খেলার ফলাফলের উপরই অমীমাংসিত-ভাবে খেলা শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় খেলা : (২৪শে অক্টোবর—২৮শে অক্টোবর)

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া : ৫১৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ২১১ (৮ উইঃ ডিক্লে)

ভারতীয় দল : ৪৫১ ও ২৩২ (৫ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া একমাত্র বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড় পি-সেন

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের ১০০ মিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী আরতী প্রথম, শ্রীমতী রেবা দ্বিতীয় এবং শ্রীমতী পৌলা তৃতীয়

ফটো—জে-কে-সান্যাল

ভারতীয় ক্রিকেট দল [illegible] দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এডিলেডে

১৭ই অক্টোবর খেলা আরম্ভ হয়। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যান। টসে জিতে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলার শেষে ৩ উইকেটে ৩৭৯ রান উঠে। সেদিন তিনজন খেলোয়াড় আর নিহাল, আর কেণ্ট ব্রাকেন ১৩৭ ও ১০০ রান করেন। ডন্ ব্র্যাডম্যান ১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ব্র্যাডম্যানের বারত সাহের নূতন খেলার মাঠে ক্রিকেটার মেয়র

দ্বিতীয় দিনে ডন্ ব্র্যাডম্যানের ছুটি খেলতে নামে। চতুর্থ উইকেট পড়ে গেল পূর্ব্বদিনের রানে মাত্র এক রান যোগ হবার পর। ব্র্যাডম্যানের ছুটী হলেন রাইট্সিস। দ্বিতীয় দিনের ১৮ মিনিট খেলায় ৪০০ রান হয়। ব্র্যাডম্যানের ছুটী বেশ জোর রান তুলতে লাগলো। এই সময়ে বানকাডের প্রথম ওভারের বলে ব্র্যাডম্যান ঘটে সাউথারী, ১টা ওভার কাট, ২টো ড্রাইভ এবং ১টা পুল ক'রে ১৪০ রান পূর্ণ করলো। ব্র্যাডম্যান খুব জোর ব্যাট চালিয়ে খেলতে থাকেন এবং তাঁর ১৫০ রান পূর্ণ হওয়ার দু' মিনিট পর ১৫৬ রানে বানকাডের বলে সারডাতের হাতে ধরা পড়লেন। তিনি ২২টা বাউণ্ডারী করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ব্র্যাডম্যান দলের ৮ উইকেটে ৫১৮ রানের উপর প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। বানকাড ২৬ ওভার বলে ১২৭ রান দিয়ে ৪টে এবং সারডাতে ১৬ ওভারবলে ৮৩ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই ভাল হ'ল না। মাত্র ১ রানে ১ম উইঃ এবং ২ রানে ২য় উইকেট পড়ে গেল। ওপনিং ব্যাটসম্যান মানকাদ এবং পরে তাঁর ছুটী লাঞ্চ্যে এই ভাঙ্গনের মুখ রক্ষা করলেন। তাঁদের খেলা দর্শকদের খুবই আনন্দদায়ক হ'ল। প্রায় প্রতি মিনিটেই ভারতীয় দলের ১ রান ক'রে উঠতে লাগলো এবং এ গড়পড়তা দলের মোট ১৪৭ রান পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। নোবলেটের নতুন বলে খেলতে গিয়ে রাজারী রাইডিংসের হাতে নিজস্ব ২৪ রানের মাথায় ধরা পড়ে আউট হ'লেন। তিনি ২ঘণ্টা ২৮মিঃ ব্যাট করেছিলেন এবং তাঁর রানে ১৩টা বাউণ্ডারী ছিল। দলের রান তখন ১৫৪। এর পর আবার এক ভাঙ্গন দেখা দিল। কোন রান যোগ না হওয়ার পূর্ব্বেই মানকাদ নিজস্ব ৫৭ রানের মাথায় ওনীলের বলে বোল্ড হ'লেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২২৪ রান উঠলো। লালা অমরনাথ ৩৮ ও সারডাতে ২ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

ফটো—কে-কে-গাঙ্গোলী

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের থেকে ২৯৪ রান পিছনে থেকে এবং হাতে মাত্র ৪টা উইকেট নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় দলের পূর্ব্বদিনের ছুটী খেলতে নামলেন। মাঠে সমবেতদের মুখে এক প্রশ্ন ভারতীয় দল 'ফলো-অন' থেকে মাত্র অব্যাহতি পাবে না তার থেকেও আশাতীত ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাতে পারবে। অমরনাথ ও সারডাতের ছুটী ভারতীয় দলের মুখ রক্ষা করলো। ঠিক লাঞ্চের পূর্ব্বের শেষ বলে রান ক'রে অমরনাথ তাঁর শতরান পূর্ণ করলেন। শতরান তুলতে তাঁর ২ ঘণ্টা ৯ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী ছিল ১১টা। ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যান-ক্রমপর্য্যায়কার ওয়ে ব্যাটসম্যানের যে সমস্যা ছিল তিনি শতরান পূর্ণ ক'রে সে সমস্যার সমাধান করলেন। এখন ওপনিং ব্যাটসম্যান আবিষ্কার করতে পারলেনই অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সারডাতে এবার ক্রিকেট খেলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নি। কিন্তু

ভারতের মুখে যেরূপ ধৈর্য্য সহযোগে তিনি অমরনাথের সঙ্গে খেলে ছুটী রক্ষা ক'রে ৪৭ রান করেছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়। অমরনাথ নিজস্ব ১৪৪ রানে ষ্ট্যাম্পড হ'ন। তিনি ১৪টা বাউণ্ডারী করেন এবং ঐ রান তুলতে তিনি ৩ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন। সোহনীর ২৭ এবং সি এস নাইডুর ১৯ রান দলের পক্ষে খুবই কার্য্যকরী হয়েছিল। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৪৪১ রানে শেষ হয়। নোবলেট ৬৮ রানে ৩ উইকেট পান।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ১০১ রান করে। ক্রেগ ওব্রাডম্যানকে পি সেন দক্ষতার সঙ্গে 'ষ্ট্যাম্পড আউট' করেন। নিহাস ৪১ এবং হোয়েল ১০ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট আউট থাকেন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের ফিল্ডিং খুব উচ্চ শ্রেণীর হয়েছিল। ব্রাডম্যান ঠিক ঠিক জায়গায় খেলোয়াড় সাজিয়ে যেমন ভারতীয় খেলোয়াড়দের বেশীরান তুলতে দেননি তেমনি অপরদিকে অমরনাথের মাঠ সাজানোও প্রথম থেকে যথেষ্ট কার্য্যকরী হয়েছিল।

ইনসেটে দ্বিতীয় বিবাহী নিম্বালকর অমেন্ত ফটো—বে-বে-সাম্বাদ

খেলার চতুর্থ দিনে ব্রাডম্যান দলের ৮ উইকেটের ২১৯ রানের উপর লাঞ্চের সময় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করলেন। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন নোবলেট নট আউট ৫০, এর পরই নিহাসের ৪১ রান। হাতে মাত্র ৩ ঘণ্টা সময় নিয়ে ২৮৭ রান তুলে খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে জয়লাভ করা নিশ্চয়ই খুব বড় আশা।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন মানকাদ এবং সোহনী। সূচনা মোটেই আশাপ্রদ হ'ল না। দলের মাত্র ১৩ রানের মাথায় সোহনী ২ রান ক'রে আউট হলেন। তার পর থেকেই ভাঙ্গন। একদিকে মানকাদ উইকেট রক্ষা ক'রে চলেছেন অপরদিকে তাঁর ছুটীরা একে একে আউট হয়ে বিদায় নিচ্ছেন। এইভাবে মাত্র দলের মোট ৬০ রানে ৪টা উইকেট পড়ে গেল। শেষে মানকাদের সঙ্গে ছুটী হলেন স্বয়ং ক্যাপটেন লালা অমরনাথ। এরা দু'জনে চতুর্থ দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত নট আউট থেকে দলকে রক্ষা করলেন। মানকাদ ১১৬ এবং অমরনাথ ৯৮ রান করে নট আউট থাকেন। ৫ উইকেটে দলের ২৩৪ রান উঠলে পরে খেলা বন্ধ হয়। আর ৫২ রান তুলতে পারলেই ভারতীয় দল জয়লাভ করতে পারতো। হাতে উইকেট ছিল কিন্তু সময় ছিল না। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

তৃতীয় খেলা : (৩০শে অক্টোবর—৩রা নভেম্বর)

ভারতীয় দল : ৪০৩ ও ২০৩

ভিক্টোরিয়া : ২৭১ ও ১৩৮ (২ উইঃ)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম ভিক্টোরিয়া দলের চারদিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা এই প্রথম আরম্ভ করলো। খেলার সূচনা খুবই নৈরাশ্যজনক হ'ল। দলের কোন রান হবার আগেই মানকাদ, রঙ্গনেকার এবং হাজারে এই তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আউট হলেন। সাহতাবের সঙ্গে অমরনাথ জুটী হয়ে দলের ভাঙ্গনের গতিরোধ করলেন। তিনি সারাদিন ধরে ব্যাট ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ১৪৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। তাঁর সঙ্গে জুটী হয়ে প্রথমদিকে সাহতাবে এবং শেষের দিকে

আমীর ইলাহী এবং সি এস নাইডু তাঁকে এবং দলকে রান তুলতে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ভারতীয় দলের ২৮৩ রান উঠে। অমরনাথ ১৫৭ এবং নাইডু ২২ রান করে ঐ দিনের মত নট আউট থাকে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলায় উভয় দলের ক্যাপটেনদ্বয়ের করমর্দন
ফটো—জে-কে-সান্যাল

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অমরনাথ ও নাইডুর জুটী ভেঙ্গে গেল যখন নাইডু নিজস্ব ৫৮ রান ক'রে দলের ৩১২ রানের মাথায় আউট হলেন। নাইডু তিনটে বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী করেন। মোট দু'ঘণ্টা নাইডু ও অমরনাথের জুটী খেলে দলের জন্য ১৫৩ রান তুলে দেন। এরপর ব্রহ্মচারী জুটী হ'লেন অমরনাথের সঙ্গে; কিন্তু কোন রান না করেই আউট হলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে ৩৮৩ রান উঠেছে, অমরনাথ ২১৬ এবং ইরানী ৪ রান করে নট আউট। লাঞ্চের পর রান খুব ধীরে উঠতে লাগলো। ৩৮৪ মিনিট খেলার পর ভারতীয় দলের ৪০০ রান উঠল। ইরানী দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হ'লে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৪০৩ রানে শেষ হয়ে যায়। ইরানী ২৭ রান করেন আধ ঘণ্টার খেলায়। অমরনাথের নট আউট ২২৮ রান এই ইনিংসের খেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে মেলবোর্ণ মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় যে সব খেলোয়াড়ের ক্রীড়াচাতুর্য্য স্মরণীয় হয়ে আছে অমরনাথের এই নট আউট ২২৮ রান তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। এই রান নিয়ে তিনটে ইনিংসের খেলায় যোগদান ক'রে অমরনাথ মোট ৪৬৬ রান করেন, তার মধ্যে মাত্র একবার আউট হ'ন। আলোচ্য খেলায় জনষ্টোন ৫৬ রানে ৩ এবং ইয়ান জনসন ১০৮ রানে ৩টে উইকেট পান।

ভিক্টোরিয়া দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হ'ল না কিন্তু পরে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলেন হার্ভে এবং লক্সটোন। তাঁরা যথাক্রমে ৮৭ ও ৭১ রান করে আউট হলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা বন্ধ হ'লে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ৬ উইকেটে ২০৮ রান উঠেছে।

খেলার তৃতীয় দিনে ভিক্টোরিয়া দলের প্রথম ইনিংস ২৭৩ রানে শেষ হ'ল। ঐদিন ফোদারগিলের ৫৪ রান উল্লেখযোগ্য। মানকাদ ৫৫ রানে ৪ উইকেট পান।

সেণ্ট্রাল স্থইমিং ক্লাবের খেলায় বিজয়ী নেস্থানাল স্থইমিং ক্লাব
ফটো—জে-কে-সান্যাল

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যায় ভিক্টোরিয়া দলের থেকে ১৩০ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা বন্ধ হলে দেখা গেল ভারতীয় দল ৬ উইকেটে ১৭০ রান করেছে। মানকাদ ৫৯ এবং অমরনাথ ১৬ রান করে আউট হ'ন। হাজারী ৭৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ঐদিন অমরনাথের ভুল বিবেচনার ফলে 'ব্যাটিং অর্ডার' ঠিক হয় নি; ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় দলকে ২টো উইকেট

হারাতে হয়েছিল। সরকারীভাবে জানা যায় ঐদিনের খেলায় ২১৫২১জন দর্শক উপস্থিত ছিল। টিকিট বিক্রী হয়েছিল ১৫৫৭ পাউণ্ডের।

খেলার চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৩ রানে শেষ হয়। হাজারী ৮৩ রানে আউট হ'ন। জনষ্টোন ৪০ রানে এবং জনসন ৫৭ রানে ৩টে ক'রে উইকেট পান।

৩৩৪ রান পিছনে থেকে ভিক্টোরিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে। চা পানের সময় তাদের ২ উইকেটে ১৩৮ রান উঠে। চা পানের পর আর খেলা হয় না বৃষ্টির জন্য এবং খেলার উপযুক্ত আলোর অভাবে। হ্যামেট ৬৭ এবং লক্সটন ৩৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলাটি অমীমাংসিতভাবে পরিত্যক্ত হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটিতে কোন পক্ষে গোল না হওয়ায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ১৯৪১ এবং ১৯৪৪ সালের ফাইনালেও বাঙ্গলা জয়ী হয়।

ইণ্ডিয়ান শীল্ড ফাইন্যালে কোয়াইকেস রেজিমেণ্ট দলের ... ফটো—জে-কে-সান্যাল

১৯৪৮ সালের অলিম্পিক ঃ

আগামী ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে যে অলিম্পিক খেলা হবে তার জোর তোড়জোড় চলছে। মোট ৩৭টি দেশকে এই বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৭টি দেশ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে যোগদানের ইচ্ছা জানিয়েছে। এ পর্য্যন্ত জানা গেছে। ৪০০০ হাজার প্রতিযোগী যোগদান করবে। অবিশ্যি এই সংখ্যার আরও বেশী হবে কারণ অনেক দেশের অভিপ্রায় এখনও জানা যায়নি। গ্রুপের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিদের সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

৩,৯৫৬—বার্লিন (১৯৩৬); ৩,৯০৫; প্যারিস (১৯২৪) —৩,৩০৫; ষ্টকহলম (১৯১২)—৩,২৮২; এন্টরপ

ফাইনালের আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল টুর্ণামেণ্টের খেলোয়াড়গণ ফটো—জে-কে-সান্যাল

ফাইনাল খেলায় বাঙ্গলা ১-০ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে তৃতীয়বার 'সন্তোষ ট্রফি' বিজয়ী হয়েছে।

আমষ্টারডাম (১৯২৮)—৩,১০৫;

(১৯২০)—২,৭৪১ ; লণ্ডন (১৯০৮)—২,০৮২ ; লসএাঞ্জলস (১৯১২)—১,৭৯০ ; সেণ্ট লুই (১৯০৪)—৫৯৫ ; এথেন্স (১৮৯৬)—৪৮৪ ; প্যারিস (১৯০০)—৪২৭।

মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু সংখ্যক যোগদান করবে এবং মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে আগামী বছর কয়েকটি নতুন খেলা থাকবে। তেরটি দেশ জানিয়েছে যে, তারা মেয়েদের খেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

১৯৪৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ১-০ গোলে তাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারিয়ে সুদীর্ঘ ৩৬ বছর পর পুনরায় শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় ফুটবল দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ ক'রে ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে; আজ সুদীর্ঘ ৩৬ বছর পর স্বাধীন ভারতে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে তাদের এ শীল্ড বিজয় সেই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান ক্লাব ১৯২৩, ১৯৪০ এবং ১৯৪৫ সালের শীল্ড ফাইনালে উঠে পরাজিত হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম শীল্ড খেলার ফাইনালে উঠে ১৯৪২ সালে, কিন্তু তারা হেরে যায়। ১৯৪৩ সালে তারা প্রথম শীল্ড বিজয়ী হয়। এর পর ১৯৪৫ সালে ১-০ গোলে মোহনবাগানকে ফাইনাল খেলায় হারিয়ে দ্বিতীয়বার শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে। সুতরাং এবারের মোহনবাগান ক্লাবের বিজয় পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ বলা যেতে পারে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উপর্য্যুপরি পাঁচবার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠে রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ক্লাব উপর্য্যুপরি এত অধিকবার শীল্ড ফাইনালে উঠতে সক্ষম হয় নি। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলাটি গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে হবার কথা ছিল কিন্তু এক-শ্রেণীর দর্শকদের গোলমালের দরুণ ঐদিন খেলা হয়নি, ১৫ই নভেম্বর বিশেষ পুলিস পাহারায় নির্ব্বিঘ্নে খেলা শেষ হয়েছে। ফাইনাল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটেই ভাল হয় নি। এ খেলাটি ১৯৪২ সালের ফাইনাল খেলার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ঐ বছর এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলই খেলেছিল তবে এবার খেলার ফলাফল যা বিপরীত হ'ল। মোহনবাগান দলের রাইট আউট ডি রায়ের পাশ থেকে সেলিম গোলটি দেন। মোহনবাগান ক্লাব ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলেছে কিন্তু খেলার সমস্ত দিক বিচার ক'রে দর্শকবৃন্দ ফাইনাল খেলা দেখে মোটেই খুসী হ'তে পারেনি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "বাঙ্গলার প্রতাপ"—২৲
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত "ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান"—২৲
শ্রীকাননী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জাগ্রত যৌবন"—৩৲০
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সুর সপ্তক"—২৷
শ্রীনীরোদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "পলাতক"—৪৲
শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত "ভবনুরের ভিন্‌দেশী বন্ধু"—১৷০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বর্ম্মা-ফেরত"—১৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "তত্ত্বের আলো"—৪৲
আবদুর রহমান প্রণীত "মানুষের মানচিত্র"—১৲
শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী প্রণীত "মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র" (১ম ভাগ)—২৲
শ্রীহরিনাথ কাব্যতীর্থ প্রণীত উপন্যাস "আমার নাটক"—২৷০
শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত "রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান"—৸০
সমরেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "বহ্নি-কণা"—১৲
শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মনোতোষিণী"—২৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ভোগবতী"—৩৲
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পতিয়ান"—২৷৷০
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "ছায়াপথ"—২৲
শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী প্রণীত "স্বাধীন ভারতের জন্মপত্রিকা"—৸৵০

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাষিক-গ্রাহকের টাকা পাইব না, তাঁহাদের পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৷৵০ টাকা লাগে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

৩২।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY